ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ



ভারত-সংস্কৃতির উৎসধারা

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৭২

প্রকাশক
অবিনাশ সাহা
ভারতী লাইব্রেরী
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯।এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

রেখাচিত্রশিল্পী
বন্দনা সেনগুপ্ত

দাম ২০.০০

সূচী

সংস্কৃতি ও সাহিত্য

দর্শন, ধর্ম ও সম্প্রদায়

চিত্রসূচী

সংকেত

A.S.B.—Asiatic Society of Bengal

A.S.I., A.R.—Archæological Survey of India Annual Report

A.S.R.···Archæological Survey Report

B.E.F.E.O.····Bulletin de l'e'cole francise d'extreme Orient

Buddh Icn.····Coomerswany : Buddhist Iconography

Ceylon Ant.···Celyon Antiquary

Corpus...Corpus Inscriptimoun Indicarum

D. Col.····Deccan College

Ency.····Encyclopædia

Farg.···Farguson

Hist.…History

IA., Ind. Ant.····Indian Antiquary

JAOS...Journal of American Oriental Society

JASB....Journal of the Asiatic Society of Bengal

JRAS....Journal of the Royal Asiatic Society

n. s....New Series.

OST.....Oriental Sanskrit Text.

Phil....Philosophy

P. T. S.····Pali Text Society

Rel.···Religion

Rv.....Rigveda.

S.B.E....Sacred Books of the East

S.I.I.G.···Krishna Sasti : South Indian Images of gods and goddess

Z.D.M G.....Zeitschrift der Deutchen Morgenlandisschen Gesllschaft

অ°...অথর্ববেদ-সংহিতা

অঃ....অধ্যায়

অগ্নিপু°...অগ্নিপুরাণ

অঙ্গুত্তর....অঙ্গুত্তরনিকায়

অনু°....অনুবাক

আশ্ব-শ্রৌ°...আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র

ঋ°...ঋগ্বেদ-সংহিতা

কেন-উ°...কেনোপনিষৎ

কৌ-ব্রা°…কৌষীতকী-ব্রাহ্মণ
খ্রী°…খ্রীস্টাব্দ
খ্রী-পূ°…খ্রীস্টপূর্বাব্দ
গৃ°…গৃহ্যসূত্র
ছা-উ°…ছান্দোগ্যোপনিষৎ
জৈ-উ°…জৈমিনী-উপনিষৎ
ড°…ডক্টর
তা-ব্রা°…তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ
তুল°…তুলনীয়
তৈ-উ°…তৈত্তিরীয়-উৎপনিষৎ
তৈ-স°…তৈত্তিরীয়-সংহিতা
দ্র°…দ্রষ্টব্য
নাট্যশা°…নাট্যশাস্ত্র
নি°…নিরুক্ত
পা°…পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী
পু°…পুরাণ
বাজ-স…বাজসনেয়ী-সংহিতা
বৃহ-উ°…বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ
বৃহদ্দে°…বৃহদ্দেবতা
বৌধা°…বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র
ভা°…ভাগবত পুরাণ
মনু°…মনুসংহিতা
মহা°…মহাভারত
মহাম°…মহামহোপাধ্যায়
মুণ্ড-উ°…মুণ্ডকোপনিষৎ
মৈত্রী-উ°…মৈত্র্যুপনিষৎ
মৈ-স°…মৈত্রায়ণীসংহিতা
যা°…যাস্কের নিরুক্ত
রা°…রামায়ণ
শ-ব্রা°…শতপথব্রাহ্মণ
শাংখ্যা-শ্রৌ°…শাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্র
শ্বেতা-উ°…শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
সংযুক্ত°…সংযুক্তনিকায়
হরি°…হরিবংশ



স্বর্গগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

২৪এ অগ্রহায়ণ ১২৮৬]　　　　[১০ই বৈশাখ ১৩৪৭

অমূল্যচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতায় ৫২।২, বীডন স্ট্রীটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উদয়চাঁদ ঘোষ। চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটীতে তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ছিল।

অমূল্যচরণ অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি কেশব অ্যাকাডেমি, জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ও কাশী-নরেশের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করেন। কেশব অ্যাকাডেমিতে পড়িবার সময় তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ১৩ বৎসর। পাঠ্যাবস্থাতেই অনুবাদ ও প্রবন্ধ রচনায় অমূল্যচরণ বিশেষ শক্তি ও আগ্রহের পরিচয় দেন। কেশব অ্যাকাডেমিতে পাঠকালীন স্কুলের হেড পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রায়ই অমূল্যচরণের গৃহে আসিতেন এবং তাঁহাকে দিয়া ইংরেজী হইতে বাঙলায় তর্জমা করাইয়া লইতেন। এই সময়েই মন্মথ দত্তের 'Queen' কাগজে তিনি অনেকগুলি ইংরেজী প্রবন্ধ লেখেন। সত্যকার আগ্রহী ও কৃতী ছাত্রের মতো অমূল্যচরণের জ্ঞানপিপাসা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তাঁহার মনকে আবদ্ধ না রাখিয়া তিনি পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ের অন্তরঙ্গ চর্চায় মনোনিবেশ করেন। শোনা যায় স্কুলে পাঠকালীন তিনি চৈতন্য লাইব্রেরির প্রায় সমস্ত বই পড়িয়া ফেলেন।

স্কুলে পাঠ করিতে করিতেই অমূল্যচরণ সংস্কৃতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া উপাধি পরীক্ষা দেন। তিনি ইহুদী কোহেনের ছেলেকে সংস্কৃত পড়াইয়া মাসিক ৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন। এই টাকা দিয়াই তিনি পুস্তক ক্রয় করিয়া একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করেন।

প্রথম হইতেই বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার দিকে অমূল্যচরণের ঝোঁক দেখা যায়। অ্যাসেমব্লিজের বৃদ্ধ এডওআর্ডের নিকট তিনি গ্রীক ভাষা শিক্ষা করেন এবং একজন মৌলবী রাখিয়া তাঁহার সাহায্যে উর্দু ও ফারসী ভাষাও শিখিয়া লন। তিনি অপরকে ভাষা শিক্ষা দিয়া নিজের ভাষা শিক্ষার খরচ সংগ্রহ করিতেন। তিনি জন পিটার্সনকে প্রথমে সংস্কৃত ও পরে গ্রীক পড়াইতেন। নবম শ্রেণীতে পাঠকালীনই তিনি ১২টি ভাষা আয়ত্ত করেন। এই সময় তাঁহার ধর্মভাব প্রবল হয় এবং তিনি 'প্রেয়ার ফ্রেটারনিটি'র সভ্য হন। এণ্ট্রান্স পাস করিয়া এফ. এ. পড়িবার সময় আরও ৮।১০টি ভাষায় তাঁহার অধিকার জন্মে।

তিনি অত্যন্ত অধ্যবসায়ী ছিলেন। প্রত্যহ প্রায় ১৮ ঘণ্টা পড়িতেন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে এক কঠিন শিরঃপীড়ায় তাঁহাকে প্রায় ৬ মাস পড়াশুনা স্থগিত রাখিতে হয়। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি কাশীধামে গমন করিয়া কাশী-নরেশের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হন এবং সেখানে শিক্ষা সমাপন করিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি লাভ করেন। অল্পকালের মধ্যে তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় ২৬টি ভাষা আয়ত্ত করিয়া নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেন। বস্তুত বাঙলাদেশে বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিতরূপে হরিনাথ দের পরেই তাঁহাকে স্থান দেওয়া হয়।

বিভিন্ন ভাষার চর্চাকে অবলম্বন করিয়া অমূল্যচরণ কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে Translating Bureau নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়া তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পত্র ও পুস্তকাদির অনুবাদ করা। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অমূল্যচরণ নানা সাংসারিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। এই সময় তাঁহার বড় ভগিনীপতি মারা যাওয়াতে বড় ভগিনী ও তাঁহার ৭টি সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব অমূল্যচরণের উপর পড়ে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতাও পরলোক গমন করেন। তাঁহার বড় ভাই সামান্য বেতনের কেরানী। সুতরাং সমস্ত সংসার চালানোর গুরু দায়িত্ব অমূল্যচরণকেই পালন করিতে হইত।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার পুরাতন গ্রীকশিক্ষক এডওআর্ডের নামে বিদ্যালয়ের নাম এডওআর্ড ইনস্টিটিউশন রাখা হয়। ইহার পূর্বে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে ছিল না। তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা সার্ আলেকজাণ্ডার পেডলার এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "The best school in Calcutta maintained by private enterprise." প্রথমে কেশব অ্যাকাডেমিতেই এডওআর্ড ইনস্টিটিউশন স্থাপিত ছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুআরি ইহা ৫৮নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে উঠিয়া আসে এবং ক্রমে ভাষাশিক্ষার সহিত সাধারণ বিদ্যালয়ও খোলা হয়। বিদ্যালয়ের কোনও ক্লাসে ১০টির অধিক ছাত্র লওয়া হইত না। এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা খুব ভাল হইলেও অর্থাগমের দিক দিয়া লোকসান হইত। তবে Translating Bureau হইতে প্রচুর আয় হওয়াতে এই লোকসান পোষাইয়া যাইত।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি বড় বাড়ির প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় বিদ্যালয়টিকে ৬৬নং মানিকতলা স্ট্রীটে তুলিয়া আনা হয়। তিনি নিজে এডওআর্ড ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহার হেড মাস্টার ছিলেন চারুচন্দ্র মিত্র। অন্যান্য মাস্টারদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ দে, হরিমোহন ন্যায়রত্ন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এডওআর্ড ইনস্টিটিউশন ১৫ বৎসর চলিয়াছিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অমূল্যচরণ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (N. N. Ghose) মহাশয়ের কথায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ)-এ পালি, বাঙলা ও হিন্দী পড়াইতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি কোন বেতন লইতেন না। পরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে তিনি পাকাপাকিভাবে মেট্রোপলিটন কলেজে চাকরি গ্রহণ করেন। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে যোগদান করিবার পূর্বে তিনি কিছুকাল মিশনরী প্রতিষ্ঠান Doveton College-এ পড়াইয়াছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাস্টিস সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুরোধে National Council of Education-এ হিন্দী, বাঙলা ও পালি পড়ানোর কাজ গ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত অরবিন্দ ঘোষের মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে তাঁহার উপর হিন্দু ও শিখ আমলের ইতিহাস পড়াইবার ভার পড়ে। সেই সঙ্গে তাঁহাকে জার্মান ভাষা ও দর্শন পড়াইতে হইত। তাঁহার নিকট শিখ আমলের ইতিহাস যাঁহারা পড়িতেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বিনয়কুমার সরকার। দুই বৎসরকাল তিনি National Council of Education-এ অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন পরে তিনি এখানকার অধ্যাপনা ছাড়িয়া দেন।

ছাত্রাবস্থাতেই অমূল্যচরণের অনুবাদ কর্ম ও ইংরেজী প্রবন্ধ রচনাশক্তির স্ফূর্তি হয়। কর্মজীবনের শুরুতেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যক্তিগত প্রেরণায় তিনি বাঙলা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। এই সময় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় হরি ঘোষ স্ট্রীটে বাস করিতেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে লেখা তাঁহার প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া বিদগ্ধমণ্ডলীতে তাঁহাকে

বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া তুলে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মতো বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তি বাঙলাদেশে বেশী জন্মগ্রহণ করেন নাই।

অমূল্যচরণের পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও পরিধি ছিল বিস্ময়কর। তদানীন্তন বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। এ বিষয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়াছেন—

"...অমূল্যচরণের অগাধ জ্ঞান-ভাণ্ডারের রত্ন সংগ্রহ করবার জন্যে এসেছেন কত শ্রেণীর কত অনুসন্ধিৎসু লোক। কেউ সাধারণ প্রবন্ধ লেখক, কেউ ঐতিহাসিক, কেউ প্রত্নতাত্ত্বিক। অমূল্যচরণও ছিলেন যেন মূর্তিমান বিশ্বকোষ। প্রায়ই কোন পুস্তকের পাতা না উল্টেই মুখে মুখে দিতে পারতেন প্রশ্নের উত্তরে দুর্লভ তথ্যের সন্ধান। যেমন বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল তাঁর অধীত বিদ্যার পরিধি, তেমনি বিস্ময়কর ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। এই জন্যেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একটি প্রশ্ন করে তাঁকে লিখেছিলেন : 'তোমার তো সব নখদর্পণে। এক লাইন লিখিয়া তোমার মতামত জানাইবে।' " [হেমেন্দ্রকুমার রায় : যাঁদের দেখেছি (দ্বিতীয় পর্ব) কলিকাতা পৌষ ১৩৫৯ (১৯৫২) : পৃ ১১৬-১১৭]

তাঁহার নিকট নানা বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি পত্র লিখিতেন। কয়েকটি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলেই অমূল্যচরণের পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতার বিষয়ে বিদগ্ধসমাজের ধারণার আভাস পাওয়া যাইবে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় লিখিয়াছিলেন (বহরমপুর, মুর্শীদাবাদ, ১৫।৬।২০), "উদয়নের কতদূর কি হইল। নৃসিংহপুরাণ হইতে নোটটি অবশ্য অবশ্য চাই।" তাঁহার আর একটি চিঠি (ইথোরা পোঃ ২২।১২।২১), "মঙ্গলবার হইতে আশায় আশায় থাকিয়া নিরাশ হইয়া পত্রখানি লিখিতেছি, আমার কাজগুলির কি কিছুই করিবেন না? প্রথমে নবদ্বীপ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ১৯০৮, পৃষ্ঠা ২৮৫তে কিছু আছে কিনা অথবা ১৯০৫ খৃঃ অব্দের জার্নালে তাহাই লেখা আছে কিনা তাহা দেখিয়া লিখিয়া জানাইবেন। ১৯০৫ সালে যাহা আছে তাহা পাঠাইতে হইবে না, তাহা আমি আনিয়াছি। ১৯০৮ সালে যদি কিছু থাকে তবে তাহাই পাঠাইবেন। অন্যান্য বিষয়গুলিরও উত্তর সত্বর দিবেন।" আর একটি চিঠিতে নিখিলনাথ লিখিয়াছিলেন (ইথোরা, ২৯।৫।২১) "আমি যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা আবার

স্মরণ করাইয়া দিতেছি। দশকুমার চরিতের ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাসে শুহন দেশ ও দামলিপ্তি সম্বন্ধে যে প্রকৃত পাঠ আছে সেইটুকু লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। আর যিনি অনুগ্রহ করিয়া পবনদূতটি নকল করিয়া দিয়াছেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবেন।" তাঁহার অপর একটি চিঠি (ইথোরা, ৯।৯।২১), "আমি আগামী বুধবার কলিকাতা যাইতেছি। সোম অথবা মঙ্গলবার প্রাতে আপনার নিকট উপস্থিত হইব। শেষবার জিজ্ঞাস্যগুলির উত্তর যেন অবশ্য অবশ্য পাই। বিশেষতঃ দুর্বল সিংহের সংবাদটা পাওয়াই চাই জানিবেন।"

প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস অমূল্যচরণকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন (চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল ১।৬।১৯২৮),

"আপনার মূল্যবান সময়ের উপর জুলুম না করিয়া আমি প্রস্তাব করি আপনি নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন:

১। আমাদের দেশে স্ত্রীলোক Nurse ছিল কিনা।

২। যদি ছিল, তাহাদের কি নাম ও duty ছিল?

৩। তাহারা কি পুরুষরোগীর শুশ্রূষা করিত?

৪। তাহাদের কি কোন বিশেষ পোষাক ছিল?

৫। কোন সেবিকা বিশেষের যদি কোন বিশেষ বিবরণ থাকে তাহাও দয়া করিয়া জানাইবেন।"

বিশ্ববিশ্রুত ভাষাতত্ত্ববিৎ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন (৩ সুকিয়াস্ রো, ৩০ মে ১৯২৫), "কোথায় পড়িয়াছিলাম যে জয়দেবের পদ্মাবতী মন্দিরের দেবদাসী ও লক্ষ্মণসেনের সভার নর্তকী ছিলেন, পদ্মাবতীর নৃত্যকালে জয়দেব ছাড়া আর কেহও মৃদঙ্গে তান লয় অনুসারে সঙ্গত করিতে পারিত না। তাই জয়দেব হইতেছেন "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী", এই উক্তি কোথাও আপনি দেখিয়াছেন কি? এবং ইহার মূলে কোনো প্রাচীন প্রবাদ পুস্তক আছে? আপনার সুবিধামত এই সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিয়া যদি আমায় দেন, বড়ই ভাল হয়।"

সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন (রমনা, ঢাকা, ২৯।৪।২৭), "কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে—

১। "অহিংসা পরম ধর্ম" এই বাক্যটি কোন শাস্ত্রে আছে? কার উক্তি?

২। "তেজীয়সাং ন দোষায়" বাক্যটি ভাগবতের কোন স্কন্ধে আছে?

৩। "ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্ম রক্ষতি রক্ষিত" এই উক্তি কোন শাস্ত্রের বা কার?

৪। শান্তিনিকেতনের উপাসনার মন্ত্র—"ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি মা মাং হিংসীঃ।" এই মন্ত্রটি কোন উপনিষদের? Jacob's Concordance-এ পেলাম না।

৫। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ।

মন্ত্রটি কোন উপনিষদের?"

চারুচন্দ্রের আর একটি পত্রে আছে (রমনা, ঢাকা, ২২৷৩৷২৭), "ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল, শূন্যপুরাণ, রামায়ণ, ইত্যাদি পাঠ্য, অথচ বইগুলি ছাপবার চাড় পরিষদের নেই। কিছু ব্যবস্থা হয় না?

আমাকে একখণ্ড করে ঐ তিনখানি বই সংগ্রহ করে দিতে পারেন? যদি একেবারে আমার হয়ে যাবে এ রকম ভাবে নাও দিতে পারেন, তবে অন্ততঃ মানিক গাঙ্গুলির বইখানি যদি মাস খানেকের জন্যে ধারে পাঠাতে পারেন তো উপকৃত হই। আমার একবার দীনেশবাবুর ভূমিকাটা পড়া দরকার হয়েছে।

মানিক গাঙ্গুলি গণেশকে দ্বৈমাতুর বলেছেন এবং শিব বৃকাসুরকে হরিভক্ত করেছিলেন। এমন কথা তো কখনো শুনিনি। আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডারে এর কোনো সন্ধান আছে?"

চারুচন্দ্র অপর একটি পত্র (রমনা, ঢাকা, ১২৷৩৷২৬)-এ লিখিয়াছিলেন, "আবার জিজ্ঞাসু হয়ে শরণাপন্ন হচ্ছি। জিজ্ঞাসা এই—শতপথব্রাহ্মণ ৩৷২৷১৷২৩-২৪ পাঠটি কি? এখানে বই নেই যে দেখি। তার মধ্যে যে "হেলবো হেলবঃ" শব্দ আছে তার সঙ্গে হলুধ্বনির কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কি? ছান্দোগ্য উপনিষদে উলুলবঃ আছে আমি আপনার কাছ থেকে পেয়েছি। এখন শতপথব্রাহ্মণের ঐ শব্দের তাৎপর্য জানতে চাই।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা বুদ্ধদেবকে তথাগত বলে কেন? কিসে কে কোন্ উপলক্ষ্যে তাঁকে তথাগত বলেছেন? এই জিজ্ঞাসা দুটির মীমাংসা জানালে উপকৃত ও সুখী হব।"

অমূল্যচরণের নিকট তদানীন্তন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই নানাভাবে উপকৃত হইয়াছেন। যদিও পুস্তকাকারে অমূল্যচরণের রচনা অতি অল্পই প্রকাশিত

হইয়াছে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার রচনার সংখ্যা কিন্তু মোটেই উপেক্ষণীয় নয় এবং এই রচনাবলী তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষরে উজ্জ্বল। তবে এ কথা ঠিক যে, পাণ্ডিত্যের তুলনায় তাঁহার রচনার স্বল্পতা অনস্বীকার্য।

তথ্য যোগাইয়া, ভূমিকা লিখিয়া দিয়া বা অনুবাদকর্মে সহায়তা করিয়া অমূল্যচরণ অনেক বিদ্বজ্জনের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্য' (১৩১৩) গ্রন্থের জন্য তিনি পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত 'Histoire Des Indes Orientales' (পৃ ৪০৭-৪৩৮) ও 'Historica Relatio De India Orientali' (পৃ ৪৬৩-৪৭২) অনুবাদ করিয়া দেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের পিছনে স্থান পাইয়াছে (পৃঃ ৪৩৯-৪৫৯ ও ৪৭৩-৪৭৫)। নিখিলনাথ ভূমিকায় অমূল্যচরণের ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "পরিশেষে এই গ্রন্থ সম্পাদনে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সর্বাপেক্ষা যাঁহার নিকট হইতে আমরা বহুল পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নানা ভাষাবিৎ ও ঐতিহাসিক তত্ত্বজ্ঞ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থ সম্পাদনে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হইব না। বিশেষতঃ তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমরা ডুজারিক ও পাইমেণ্টার প্রকাশে বা অনুবাদে কৃতকার্য হইতে পারিতাম না।" তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার বেগম' (১৯১২) ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' (১৯০৯) গ্রন্থদ্বয়ের জন্য তথ্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দেন। অনেক গুণী ব্যক্তি তাঁহার উপকার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পত্রে (১৫।৬।২৯) লিখিয়াছিলেন, "আপনার কাছে আমি চিরঋণে আবদ্ধ।" কবিকঙ্কণ সম্পাদনে অমূল্যচরণের অমূল্য সাহায্যকে স্মরণ করিয়া চারুচন্দ্র অন্য একটি পত্র (২৪।১১।২৮)-এ লিখিয়াছিলেন, "আপনার বন্ধুত্ব লাভ আমার পরম ভাগ্য। আমি নিতান্ত সামান্য অকিঞ্চন, আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি কবিকঙ্কণ সম্পাদনের দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারতাম না। আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।" আর একটি পত্রে (কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৩৩২) চারুচন্দ্রের উক্তি, "আপনাকে ভুললে যে আমি অমানুষ কৃতঘ্ন প্রতিপন্ন হয়ে যাবো।" কিন্তু কেউ কেউ অমূল্যচরণের

উপকার বিস্মৃত হইয়াছেন, এমন কি তাঁহার নামে অপবাদও প্রচার করিয়াছেন বা তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু সত্যদর্শী পণ্ডিতের মতোই তিনি এই সব নিন্দার বহু উর্ধ্বে ছিলেন।

সম্পাদক হিসাবে অমূল্যচরণের কৃতিত্ব সুবিদিত। বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা তাঁহার সম্পাদিত পত্রপত্রিকাগুলিকে উচ্চ মর্যাদার চোখে দেখিতেন এবং তাঁহার মতামতকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। প্রকৃত সম্পাদকের মতো তিনি যেমন নূতন প্রতিভাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতেন, তেমনি প্রতিষ্ঠিত প্রতিভাকে তাহার যোগ্য সৃষ্টিকর্মে উৎসাহিত করিতেন। কালিদাস রায় ১৩৬১ সালের শারদীয় 'যুগান্তরে' তাঁহার 'সাহিত্যক গোষ্ঠী' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "সেকালে সম্পাদকও ছিলেন বাঘা বাঘা। রামানন্দবাবু, সুরেশ সমাজপতি, প্রমথ চৌধুরী, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি। হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবু এঁদের তুলনায় ছিলেন তরুণতর।"

অমূল্যচরণের সম্পাদিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। ১৩১২ সালে তিনি 'বাণী' নামে একটি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র বাহির করেন। ইহা ১৩১৯ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। ৬৬ নং মানিকতলা স্ট্রীটে তিনি 'বাণী প্রেস' নামে একটি ছাপাখানাও স্থাপন করেন।

১৩২২ সালে অমূল্যচরণ ও জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'মর্মবাণী' আত্মপ্রকাশ করে। ২৫শ সংখ্যার পর ইহা 'মানসী'র সহিত যুক্ত হইয়া 'মানসী ও মর্মবাণী' নামে পরিচিত হয়।

প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ' প্রথমে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। তিনি হঠাৎ লোকান্তরিত হওয়ায় এর সম্পাদনার দায়িত্ব অমূল্যচরণ ও জলধর সেনের উপর ন্যস্ত হয়। ১৩২০ সালের আষাঢ় মাস হইতে ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদনা করিবার পর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটায় অমূল্যচরণ কাজ ছাড়িয়া দেন।

চারুচন্দ্র মিত্রের সহিত অমূল্যচরণ ১৩২১ সালের মাসিক 'সংকল্প'-এর প্রথম আটটি সংখ্যার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। বৈতনিক লেখক ও কর্মী হিসাবে 'সংকল্পে'র সম্পাদকীয় বিভাগে হেমেন্দ্রকুমার রায় কাজ করিতেন। এই পত্রিকা আকারে, প্রকারে ও রচনায় 'ভারতবর্ষে'র যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাবে পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া যায়। ফাল্গুন ১৩২৫-মাঘ ১৩২৬ সাল

হইতে ১৩৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত মাসিক 'শ্রীগৌরাঙ্গসেবক' তাঁহার সম্পাদনায় বাহির হয়। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে মাসিক 'পঞ্চপুষ্প' [১৩৩৬-১৩৩৯ (বৈশাখ-আশ্বিন)] বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকা সম্পর্কে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পত্রে (ভট্টবাজার, পূর্ণিয়া, ১৫.৪.২৯)-এ লিখিয়াছিলেন, "আপনার সম্পাদিত ও প্রেরিত পঞ্চপুষ্প দেখিয়া সত্যই মনে হইল—প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা আর কাহাকে বলে। লেখায়, আকারে, সৌষ্ঠবে, কোন পত্রিকা অপেক্ষা হীন নহে। তবে সব জিনিষেরই ভাগ্য আছে এবং তাহাই মূল। প্রার্থনা করি পঞ্চপুষ্প তাহাতে যেন হীন না হয়। ভাগ্যদোষে আমরা অনেক ভাল জিনিষ হারাইয়াছি।" অমূল্যচরণের সম্পাদিত অন্যান্য পত্রপত্রিকাগুলি হইতেছে ইংরেজী ত্রৈমাসিক 'Indian Academy of Arts' (১৩২১-২৩); মাসিক 'কায়স্থ পত্রিকা' (১৩২৬, কিরণচন্দ্র দত্তের সঙ্গে ১৩৩৪ ও মৃণালকান্তি ঘোষের সঙ্গে ১৩৩৫) এবং মাসিক 'শ্রীভারতী' (১৩৪৪-৪৭)।

অমূল্যচরণ অনেকগুলি গ্রন্থের সম্পাদনায় অগাধ পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা, ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—'জৈনজাতক' (Punjab Sanskrit Series-এর অন্তর্গত), 'শ্রীশ্রীসংকীর্তনামৃত' (১৩৩৬), 'Sheir Mutakserin' Vol 1, 'আপিশলী শিক্ষা' (১৩৪২, Indian Research Institute প্রকাশিত), 'বিদ্যাপতি' (১৯৩৪), 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' (১৩২৬) ও 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃতম্' (১৩১৯, চারুচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে)।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে অমূল্যচরণের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে 'বঙ্গীয় মহাকোষ' (Encyclopaedia Bengalensis)। ইহা তাঁহার বিদ্যাবত্তা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার জয়স্তম্ভস্বরূপ।

'বঙ্গীয় মহাকোষ' প্রকাশিত হইবার পূর্বে একটি ছাপানো বিজ্ঞপ্তিতে গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী প্রচারে বলা হয়, "'বঙ্গীয় মহাকোষ' সংখ্যাকারে বাহির হইতেছে, ইহার প্রতিসংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা থাকিবে। এইরূপ ২৪টি সংখ্যায় (৭৬৮ পৃষ্ঠায়) একটি খণ্ড হইবে। সর্বসমেত ২২ খণ্ডে (১৬৮৯৬ পৃষ্ঠায়) সমগ্র 'বঙ্গীয় মহাকোষ' পূর্ণ হইবে। নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক 'বঙ্গীয় মহাকোষ' মুদ্রিত হইবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৹ আনা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ১২৲ টাকা ও সম্পূর্ণ 'বঙ্গীয় মহাকোষে'র (২২ খণ্ডের) মূল্য ২৬৪৲ টাকা। যাঁহারা নিম্নলিখিত ভাবে গ্রাহক হইবেন, কেবল তাঁহারাই নির্দেশিত সুবিধাগুলি পাইবেন।

১। প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহক—[Founder-Subscriber]

যাঁহারা 'বঙ্গীয় মহাকোষে'র প্রকাশার্থ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সাহায্য করিবেন তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহক নামে অভিহিত করা হইবে। মাত্র আড়াইশত প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহক লওয়া হইবে। তাঁহাদের নামের তালিকা 'বঙ্গীয় মহাকোষ' সম্পূর্ণ হইলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইবে। প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহকের জন্য অগ্রিম ৩৭৫৲ টাকা নির্দেশিত হইয়াছে।

২। অগ্রিম-গ্রাহক [Pre-Publication Subscriber]

(ক) সমগ্র 'বঙ্গীয় মহাকোষে'র জন্য এককালে অগ্রিম দেয়—২২৫৲ টাকা

(খ) একখণ্ড " " " " —১১৲ টাকা"

'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর কার্যাধ্যক্ষের অফিস ছিল ৩১, তেলিপাড়া লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

১৩৪১ সালের পৌষ-সংক্রান্তির দিনে 'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করে। ইহার 'নিবেদন' হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইহার তথ্যসংগ্রহের কাজ আটত্রিশ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭০ মানিকতলা স্ট্রীটের Indian Research Institute ইহার প্রকাশক ছিলেন। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮৬০ (নামপত্র ১৪ সমেত) এবং দাম ১২৲ টাকা।

'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন অমূল্যচরণ। ইহার ১৪ জন সহকারী সম্পাদকের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, ত্রিদিবনাথ রায়, চারুচন্দ্র মিত্র প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রথম খণ্ডের আলোচিত প্রসঙ্গ ছিল অ স্বরবর্ণ হইতে অণ্ডালমূত্র অবধি। এই খণ্ডে অমূল্যচরণের লিখিত অ স্বরবর্ণ, অগ্নি, অতিরাত্র, অত্রি, অথর্ববেদ, অদিতি প্রবন্ধগুলি বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল।

'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর দ্বিতীয় খণ্ড সম্ভবত ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে আলোচিত বিষয় ছিল অণ্ডগজ হইতে অপরোক্ষানুভূতি পর্যন্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৭৩২ (নামপত্র ৮ পৃষ্ঠা সমেত)। সহসম্পাদক মণ্ডলীর মধ্যে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষের অন্তর্ভুক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর তৃতীয় খণ্ডের জন্য ৩২ পৃষ্ঠা হিসাবে ৩টি সংখ্যা সম্ভবত ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার পর 'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

'বঙ্গীয় মহাকোষে'র প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষে'র মতো 'বঙ্গীয় মহাকোষ'ও ২২ খণ্ডে সমাপ্ত হইবে বলিয়া পরিকল্পিত হয়। কিন্তু বিষয় বিস্তারে, রচনা-ঐশ্বর্যে ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় 'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর উৎকর্ষ অনস্বীকার্য। অমূল্যচরণ 'বঙ্গীয় মহাকোষ' প্রকাশের পূর্বে 'বিশ্বকোষ'-এর সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ইহার সাফল্যের পশ্চাতে তাঁহার পরিশ্রম ও পরিকল্পনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রথম সংস্করণে অমূল্যচরণের কয়েকটি প্রবন্ধ ছিল এবং উন্নততর দ্বিতীয় সংস্করণের রচনাকার্যের দায়িত্ব তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকালের অল্প কিছুকাল পূর্বে নগেন্দ্রনাথ বসুর সহিত মতানৈক্য দেখা দিলে অমূল্যচরণ 'বিশ্বকোষে'র কাজ পরিত্যাগ করেন।

'বঙ্গীয় মহাকোষ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছিলেন,—

"বঙ্গসাহিত্যের যে পরিমাণ উৎকর্ষ ও বিস্তার হইলে বঙ্গীয় মহাকোষ প্রকাশের সংকল্প রূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে তাহা আমাদের গৌরবের বিষয়। এই মহাকোষ সম্পূর্ণ হইলে বাংলাদেশের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে পারিবে কল্পনা করিয়া উৎসাহ বোধ করিতেছি। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নেতৃত্বে এই মহদনুষ্ঠান সিদ্ধিলাভ করিবে আশা করিয়া একান্ত মনে ইহার সফলতা কামনা ও সম্পাদকের প্রতি বঙ্গদেশের নামে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।"

প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"ভারতবর্ষে ইহার পূর্বে এরকম মহাকোষ (Encyclopaedia) কখনও বাহির হয় নাই। ইহাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অভিধানও আছে। তাহা এমন কি Worterbuch-এর চেয়েও ভাল। Encyclopaedia হিসাবে ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার সমস্ত খুঁটিনাটি ইহাতে আছে। গবেষণার চূড়ান্ত। ভারতের বাহিরের কথাও আছে। সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা বর্তমান সময় পর্যন্ত টানিয়া আনা হইয়াছে। প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত। আমার বিশ্বাস এই মহাকোষ সকলেরই উপকারে লাগিবে। ইহা বাঙ্গলার গৌরব হউক।"

'বঙ্গীয় মহাকোষ' একাধারে অভিধান ও কোষগ্রন্থ হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। তবে কোষগ্রন্থরূপেই ইহার মূল্য ছিল সমধিক। এই গ্রন্থের অভিধানে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় শব্দ গ্রথিত হইয়াছে সেগুলি শব্দকল্পদ্রুম, বাচস্পত্য, অমরকোষ, মেদিনী, এমন কি রাশিয়ান Worterbuch প্রভৃতি অভিধানেও পাওয়া যায় না। বস্তুত এই অভিধান থাকিলে অন্য অভিধানের প্রয়োজন হয় না। কোষগ্রন্থ হিসাবে ইহাতে ভারতবর্ষ ও বাঙলাদেশের বিবিধ প্রসঙ্গ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নানা তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়াছে।

পাণ্ডিত্যের তুলনায় অমূল্যচরণের গ্রন্থাবলীর সংখ্যা স্বল্প। তবে তাঁহার বহুপ্রবন্ধ সাময়িক পত্রপত্রিকায় ইতস্তত ছড়াইয়া রহিয়াছে। ভারতের এবং সেই সঙ্গে অন্য দেশের সংস্কৃতি, সাহিত্য, নৃত্যনাট্যকলা, মূর্তিতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, মুদ্রা ইত্যাদি তাঁহার প্রিয় বিষয় ছিল। প্রাচীন মূর্তি দেখিতে বা প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিবার জন্য তিনি ভারতের বহু জায়গায় ভ্রমণ করেন এবং বহু জাতির মধ্যে গিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া নৃতত্ত্ব সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'সরস্বতী' ১ম খণ্ড (১৩৪০), 'চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ' (১৩২৯), লক্ষ্মী ও গণেশ (১৩৭০), 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (১৩৬৯), 'মহাভারতের কথা (১৯৪০) প্রভৃতি। তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'সরস্বতী' (১ম খণ্ড) বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'সরস্বতী' (১ম খণ্ড) সম্পর্কে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস একটি পত্র (আগড়পাড়া, ২৪ পরগনা, ১৪।৩।৩৪)-এ লিখিয়াছেন, "আপনার সরস্বতী গ্রন্থখানি উপহার পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি এবং তাহা পাঠ করিতে করিতে পরম আনন্দ ও শিক্ষা পাইতেছি। তজ্জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। একাধারে দার্শনিক, তান্ত্রিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা এবং কৌতূহলোদ্দীপক তত্ত্বের সমাবেশে গ্রন্থখানি প্রকৃতই উপাদেয় হইয়াছে। অন্য খণ্ডের অপেক্ষায় রহিলাম। বাণীর বহুবিধ অজ্ঞাতসম্পন্ন দুষ্প্রাপ্য কল্পনামূর্তি সকলের সুলভ করিয়া দিয়া আপনি সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। আপনার গ্রন্থ সরস্বতী আজ আপনার দেবী সরস্বতীর সেবক এবং আপনার উপাধিকে সার্থক করিল।" ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বই সম্বন্ধে বলেন, "এই ধরনের বই বাংলা ভাষায় এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল, এবং

মনে হয়, কিছুকাল ধরিয়া এই বই একক ও অদ্বিতীয় হইয়াই থাকিবে" (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪০)।

কখনও কখনও অমূল্যচরণ সমালোচনার ক্ষেত্রে শ্যামল বর্মা ও সত্যব্রত বর্মা এই ছদ্মনাম দুইটি ব্যবহার করিতেন। এই দুই নামে তাঁহার অনেকগুলি সমালোচনা 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হয়।

সেকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। অমূল্যচরণের 'বাণী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া এমনি একটি সাহিত্য বৈঠক বসিত। এই বৈঠক ছিল সার্বজনীন। প্রতি সন্ধ্যাকালে এডওআর্ড ইনষ্টিটিউশনে এই বৈঠক বসিত। এই বৈঠক সম্পর্কে হেমেন্দ্রকুমার তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন,—

"অমূল্যচরণ নিজে কোন বিশেষ দলের লোক ছিলেন না, সেইজন্যে তাঁর আসরে আসবার পথ ছিল সকলেরই কাছে খোলা। প্রবীণদের মধ্যে সেখানে দেখেছি সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল, কবি বেনোয়ারীলাল গোস্বামী, পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এবং ব্যোমকেশ মুস্তোফী প্রভৃতিকে। নবীনদের সংখ্যা অল্প ছিল না, সকলের নাম করতে গেলে জায়গায় কুলোবে না। তবে এইটুকু উল্লেখযোগ্য যে তখনকার ঐ নবীনদের মধ্যে কয়েকজন আজ প্রবীণ হয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। যেমন শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। কেউ ফুটতে ফুটতে ঝরে গিয়েছেন। যেমন বগলারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।" (হেমেন্দ্রকুমার রায় : যাঁদের দেখেছি, দ্বিতীয় পর্ব : পৃ ১১৬)

এই সাহিত্যিকগোষ্ঠী সম্পর্কে কালিদাস রায় 'সাহিত্যিকগোষ্ঠী' প্রবন্ধে (শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬১) যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"এই (রবীন্দ্রবিমুখ মানসী, ভারতী ইত্যাদি) দলাদলির বাইরে একটা সাহিত্যিকগোষ্ঠী ছিল—পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'বাণী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন—চারুচন্দ্র মিত্র, গিরিজা বসু, কবিবর করুণানিধান, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, সুধীন ঠাকুর, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতন্য লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি সেন। অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তকে এই গোষ্ঠীতে ধরা যেতে পারে। জলধরও ছিলেন, কিন্তু তিনি বক্তা ছিলেন না,

শ্রোতাও ছিলেন না, নীরবে চুরুট টানতেন। এঁরা কবিবর দেবেন্দ্র সেনের খুব ভক্ত ছিলেন। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ তাঁর শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায় কলকাতায় এলে আসর জমাতেন। তখন এঁরা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন।"

সত্যকার সজ্জন পণ্ডিতের মতোই অমূল্যচরণ ছিলেন নিরহঙ্কার, মৃদুভাষী, বন্ধুবৎসল, গুণগ্রাহী ও আত্মপ্রচারবিমুখ। এই সব গুণ বর্তমানে বড়ই দুর্লভ।

গুণগ্রাহিতা ও অপরকে আত্মপ্রকাশের দুর্লভ সুযোগদানে অমূল্যচরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয়স্বরূপ কালিদাস রায়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। কালিদাস রায়ের কথায়,—

"তারপর যখন ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি—তখন একদিন কলেজের পথে 'বাণী' পত্রিকা অফিসে গেলাম। সেখানে ছিলেন কবি করুণানিধান, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র মিত্র, ব্রজেন বাড়ুয্যে প্রভৃতি। কবিতাটি শোনাইলাম। তাঁদের সকলেরই কবিতাটা ভাল লাগিল। অমূল্যবাবু কবিতাটা একরূপ কাড়িয়া লইলেন 'বাণী'তে ছাপিবেন বলিয়া। 'বাণী' উঠিয়া গেল। অল্পদিন পরে অমূল্যবাবু 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হইলেন। 'ভারতবর্ষে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইল। 'নন্দপুর চন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।' "
(মর্মবাণী, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৯)

অমূল্যচরণের প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে তাঁহাকে বিভিন্ন গৌরবজনক পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি কিছুকাল ত্রিপুরা রাজ্যের Raj Historian ছিলেন। তিনি মালদহ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি (১৩১৯), শান্তিপুর সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি (১৩২৭), দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন (বর্তমানে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন)-এর মূল সভাপতি (১৩৪২), বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি (১৩২৯), বিহার সাহিত্য সম্মেলনের দর্শন শাখার সভাপতি (১৩৩৪) ও মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহ-সভাপতি হন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক, সহসম্পাদক, সহ-সভাপতি ও ন্যাসরক্ষক হিসাবেও কাজ করেন। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সভ্য ছিলেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ঘাটশীলায় অমূল্যচরণের দেহান্ত ঘটে।

ভূমিকা

॥ ১ ॥

বর্তমান গ্রন্থে অমূল্যচরণের একান্নটি প্রবন্ধ গ্রথিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিষয়বস্তু অনুসারে বিভক্ত সংস্কৃতি ও সাহিত্য; দর্শন, ধর্ম ও সম্প্রদায় এবং নাটক ও নাট্যশালা বিভাগে যথাক্রমে নয়, ত্রিশ ও বারটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে।

অমূল্যচরণের প্রবন্ধাবলীর বিষয়বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। বাঙলা সাহিত্যে প্রবন্ধের যে ধারা রামমোহন রায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের মধ্য দিয়া প্রবহমান অমূল্যচরণ সেই ধারারই যোগ্য উত্তরসাধক। অনেকে বলিয়া থাকেন অমূল্যচরণ যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন সেই তুলনায় তাঁহার রচনার পরিমাণ নগণ্য। কিন্তু এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধাবলীর তালিকা এবং এখনো পর্যন্ত সাময়িক পত্রপত্রিকায় আবদ্ধ প্রবন্ধরাজির অসম্পূর্ণ তালিকাটির উপর চোখ বুলাইলেই বুঝা যাইবে (দ্রঃ পরিশিষ্ট—গ ও ঘ)। তবে এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে পুস্তকাকারে গ্রথিত তাঁহার প্রবন্ধসমূহের সংখ্যা অপ্রত্যাশিত-ভাবে স্বল্প। এই দিক দিয়া বর্তমান সংকলনের গুরুত্ব সমধিক। অমূল্যচরণের পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য থাকায় তিনি বাঙলা সাহিত্যের বহু প্রবন্ধালোচনা হইতে বাদ পড়িয়াছেন, কেননা দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক ক্ষেত্রেই গবেষকেরা প্রস্তুত গ্রন্থের উপরেই তাঁহাদের রচনার ভিত্তি স্থাপন করেন। এ বিষয় আশা করা অন্যায় হইবে না যে, এই গ্রন্থপ্রকাশের পর অমূল্যচরণের দিকে বর্তমান গবেষকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহার প্রবন্ধাবলী সাহিত্যের গঠন-পাঠনে যথাযোগ্য স্থান লাভ করিবে।

॥ ২ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া বাঙালী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হইলে তাহার জীবনে প্রবল আলোড়ন জাগিয়া উঠে। ক্রমে এই আলোড়ন তাহার

অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনে নবজাগরণ উপস্থিত করে। বস্তুত উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, এই দুই বিপরীত ধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষ ও মর্মগত বিরোধের ফল। প্রথমে এই নবজাগরণের উত্তাল তরঙ্গে এ দেশের চিত্ত ভাসিয়া গিয়াছিল। দেশবাসীরা জাতির সনাতন ধ্যানধারণার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া পাশ্চাত্যের সব কিছুরই মহিমা কীর্তনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। যেহেতু ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়া পাশ্চাত্যের ভাবচিন্তার সহিত পরিচয়ের ফলে এই নবজাগরণ উপস্থিত হইয়াছিল সেই হেতু ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই এই জাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য অধিক মাত্রায় দেখা গিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দুকলেজে ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের শিক্ষায় শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত তরুণ ছাত্রসমাজের বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ বিশেষভাবে স্মরণীয়। শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যগণই জাতির ভাবচিন্তার আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র দেব, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল বসাক প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধের প্রবল বিক্ষোভ ও বিদ্রোহজনিত উত্তেজনা ইহার উত্তরার্ধে ক্রমশ শান্ত ও সংহত হইয়া আসিল। জাতি তখন নূতন অনুভবের প্রেরণায় নিজের ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে পাশ্চাত্য আদর্শ ও এদেশের সংস্কৃত ধ্যানধারণার মর্মগত বৈপরীত্য সত্ত্বেও একটি মিলন ঘটানো সম্ভবপর হইল। ইহার কারণ পাশ্চাত্যের আদর্শের মূলে ছিল হিউম্যানিজম নামে একটি সুপরীক্ষিত সত্য।

শতাব্দীর প্রথম দিকেই দেশের ধর্মবিশ্বাস ও ধ্যানধারণার পুনর্বিচার করিতে গিয়া রামমোহন শঙ্করাচার্যের সূত্রের অন্তর্নিহিত মর্ম বিশ্লেষণ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মোপাসনার আদর্শ প্রচার করেন। ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদের অপৌরুষেয়ত্বে অবিশ্বাসী হইয়া বেদ ও উপনিষদ হইতে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তত্ত্বসমূহ গ্রহণ করিয়া ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রকাশ করেন। অন্যদিকে যাঁহারা হিন্দুধর্ম রক্ষায় বিশেষভাবে তৎপর হইয়া উঠেন তাঁহাদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। শতাব্দীর উত্তরার্ধে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাবের স্থলে একটি সংস্কারমূলক আগ্রহ জন্মলাভ করে। এই সংস্কার-

প্রবণতার মূল লক্ষণ হিন্দুধর্মের বিচারবিশ্লেষণ। একটি সর্বাঙ্গীণ জাত্যভিমান ও স্বদেশপ্রীতি এই বিচারবিশ্লেষণের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল বলিয়া সাধারণত পাশ্চাত্য আদর্শের তুলনায় দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ প্রতিপাদনের একটা প্রয়াস দৃষ্ট হইত। এই প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রশেখর বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার পর বিংশ শতাব্দীতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া যে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল তাহা স্বদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চর্চায় বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অমূল্যচরণের কর্মজীবন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ হইতে বিংশ-শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বৎসর পর্যন্ত। তিনি ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখের ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারি দশক ধরিয়া বাঙলা তথা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কর্ষণে নিত্য ক্রিয়াশীল ছিলেন। বহু ভাষাবিৎ অমূল্যচরণ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত থাকায় দেশীয় বিষয়বস্তুর মূল্যায়নে তৎপর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের কল্যাণকর ভাবসম্পদ আহরণে আগ্রহের পরিচয় দেন। অমূল্যচরণের মানস বিশেষ করিয়া ভারতীয় ছিল সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার আন্তর্জাতিক দিকটিও উপেক্ষা করিবার নহে। বস্তুত তাঁহার বিশ্ববোধ স্বাদেশিকতার অঙ্গীভূত। ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন ইত্যাদির বিচার-বিশ্লেষণে অমূল্যচরণ স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির মধ্যে বিশ্বসচেতনতার পরিচয় দিয়াছেন এবং এই পরিচয় দেশীয় বিষয়বস্তুর উৎকর্ষ প্রমাণেই বিশেষ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বর্তমান সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা' প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মাত্র একটি বাঁচিয়া আছে। সেই অদ্বিতীয় গৌরবের স্থান ভারতীয় সভ্যতার। অন্যদেশে অন্য যে সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল তন্মধ্যে এমন প্রেরণা ছিল না, এমন গভীরতা ছিল না, যাহার ব্যাপকতা এত বেশী। সে সকল সভ্যতার সমস্যা ছিল সাময়িক, তাহাদের চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেখানে পরের সভ্যতা নূতন কথা লইয়া আসিয়াছে, পরের চিন্তা নূতন আলোক লইয়া আসিয়াছে,

সেই নূতন বাণীকে বাধা দিবার মত শক্তি পুরাতনের ছিল না। সে সমস্ত পুরাতন সভ্যতা ছিল মাত্র পাথরের—ইটের সভ্যতা—সেনবাহিনীর সভ্যতা। বাহ্যজীবনের বহু প্রয়োজনের, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের, আরামের বন্দোবস্ত তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু অন্তর্জীবনের গূঢ় সমস্যার—সত্যকার জীবনসমস্যার কোন বাণী সে সকল সভ্যতায় নাই। প্রাণহীন এ রকম বস্তুসভ্যতা বাঁচিতে পারে না। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছিল বলিয়াই ইহাকে 'আধ্যাত্মিক' বলিয়া কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত অধরপ্রান্তে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছেন। ইহার বস্তু-সভ্যতার অংশ কতটা তাহা এখানে বিচার্য নয়। কিন্তু এটুকু বুঝিতে হইবে যে, ইহা বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়াই বাঁচিয়াছে। মাত্র এই সভ্যতার আত্মা আছে—তাই সে মরে নাই।" [পৃ ৫]

এই প্রবন্ধেই তিনি অন্যত্র মন্তব্য করিয়াছেন,—

"ভারতবর্ষের সহিত এসিয়া-মাইনরের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল। সেই সুদূর দেশে হিন্দু দেবতারা শান্তিদেবতারূপে দেখা দিয়াছেন। শান্তির বাণী লইয়াই ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়। শান্তিই ভারতের সনাতন বাণী, শান্তিই ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রতীক। সেযুগের অপর সকল সভ্যতার আন্তর্জাতিক পরিচয় গ্রহণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, সে-পরিচয় তাদের লুণ্ঠনে। যে লুণ্ঠন হয় ব্যবসাচ্ছলে, নয় প্রকাশ্য সৈন্যবলে।" [পৃ ৮]

এইসব স্থলে অমূল্যচরণের ব্যক্তিস্বরূপের অভ্রান্ত পরিচয় বিধৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সামাজিক গঠনের ধারাবাহিকতা সুদূর অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত যে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে পানিক্করের নিম্নলিখিত মন্তব্যে,—

"The society described in the *Mahabharata* is not essentially different from what holds sway today in India. The life that the Buddha witnessed 2,500 years ago continues over the continent with no fundamental modifications. People argue about the same questions of *karma* and *maya*, believe in the same doctrines and lead the same lives. The rules of marriage, the rituals of burial, and the organisation of social relationship are not basically different. The Buddha born today would recognise the people of India as his own." [K. M. Panikkar : A Survey

of Indian History, Third Edition Reprinted: Bombay 1962 : p. 2]

পানিকরের মতে এই ধারাবাহিকতা হিমালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমতও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি তাঁহার 'Indian History, its nature, scope and method' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"The icons discovered at Mohenjo-daro are those of gods and goddesses who are still worshipped in India, and Hindus from the Himalaya to Cape Comorin repeat even today the Vedic hymns which were uttered on the banks of the Indus nearly four thousand years ago. This continuity in language and literature, and in religious and social usages, is more prominent in India than even in Greece and Italy, where we can trace the same continuity in history." [R. C. Majumdar (General Editor) : The History and Culture of the Indian People, Vol. 1 Second Impression : London 1952 : pp. 38-39]

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব কেবলমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনীতিক চিন্তার চর্চায় নহে। তাহার প্রকৃত পরিচয় অধ্যাত্মজীবনোদ্ভূত ধর্মদর্শন, শিল্পসাহিত্য, সামাজিক ও নীতিবিষয়ক ধারণা প্রভৃতিতে। এই কথা মনে রাখিয়াই ভারতের ইতিহাস পাঠ করা কর্তব্য। রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়,—

"The wars and conquests, the rise and fall of empires and nations, and the development of political ideas and institutions should not be regarded as the principal object of our study, and must be relegated to a position of secondary importance. On the other hand more stress should be laid upon philosophy, religion, art, and letters, the development of social and moral ideas, and the general progress of those humanitarian ideals and institutions which form the distinctive feature of the spiritual life of India and her greatest contribution to the civilisation of the world." [Ibid, vol. 1 : p. 43]

অমূল্যচরণও লিখিয়াছেন,—

"ভারতের চিন্তা পৃথিবীর বস্তুতেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। বস্তুর আশ্রয় যাহা, বস্তুর অতীত যাহা তাহারই সন্ধান সে পাইয়াছে। ভারত রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা করিয়াছে। নশ্বর ভঙ্গুরকে অতিক্রম করিয়া ভারতের সাধনা হইতেছে শাশ্বত নিত্যের। এই জগতের প্রাণের সন্ধানে তাহার যাত্রা। অমৃতের পথ পাইয়া সে চলিয়াছে। ভারতে জীবন অতি দীর্ঘ সাধনা—অবিদ্যা হইতে মুক্তির সাধনা, বিদ্যার আবির্ভাবের সাধনা।" [পৃ ৫]

'আর্য ও অনার্য' এবং 'অসুরজাতি' প্রবন্ধ দুটিতে অমূল্যচরণ আর্য ও অনার্যের উৎপত্তির ইতিহাস, ভারতবর্ষে তাহাদের আগমন এবং ভারতীয় সভ্যতায় তাহাদের দানের বিষয়ে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় সভ্যতা আর্য ও আর্যেতর দ্রাবিড় জাতির দানে সমৃদ্ধ এবং কোনো কোনো দিক দিয়া ইহাতে দ্রাবিড়দের দানই অধিক। সুদূর হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দারো সভ্যতায় কেউ কেউ দ্রাবিড় প্রভাব আবিষ্কার করিয়াছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে,—

"It has been generally admitted, particularly after a study of both the bases of Dravidian and Aryan culture through language and through institutions, that the Dravidians contributed a great many elements of paramount importance in the evolution of Hindu civilization, which is after all (like all other great civilizations) a composite creation, and that in certain matters the Dravidians and Austric contributions are deeper and more extensive than that of the Aryans. The pre-Aryans of Mohenjo-daro and Harappā were certainly in possession of a higher material culture than what the Semi-nomadic Aryans could show." [S. K. Chatterjee: Race-Movements and Prehistoric Culture (The History and Culture of the Indian People, Vol. 1 : pp. 157-158)]

আর্য সভ্যতার পূর্বে হিন্দু সভ্যতার অংশীভূত দ্রাবিড় ও অন্যান্য সভ্যতার অস্তিত্ব থাকিলেও আর্য সভ্যতার সহিত দ্রাবিড় সভ্যতার মিলনেই ইহার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। পানিক্করের ভাষায়,—

"...the unity of India is a conscious achievement of

Hinduism *after the great Aryo-Dravidian synthesis had taken place.* Before that time civilised communities existed in India in different and perhaps in isolated areas ; the people who created the Indus Valley Civilisation, the Aryans in Panchanad and later in the Gangetic Valley, and the communities in the South." [K. M. Panikkar : A Survey of Indian History : p. 3]

আর্যসভ্যতার পূর্বে হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দারোর মতো হিন্দুসভ্যতার আবিষ্কারে তাহার অগ্রদূতের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইলেও ভারতীয় সভ্যতার মূলে আর্যদের দান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। কেহ কেহ সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত মহেঞ্জো-দারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানের সভ্যতায় ঋগ্বেদের আর্য উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন। এ বিষয়ে এ. ডি. পুসলকারের মন্তব্য,—

"It would not, therefore, be correct to ascribe the authorship of the Indus Valley culture to the Aryan or any particular race. It represents the synthesis of the Aryan and non-Aryan cultures. The utmost that we can say is that the Rigvedic Aryans probably formed an important part of the populace in those days, and contributed their share to the evolution of the Indus Valley civilization." [A. D. Pusalker : The Indus Valley Civilisation (The History and Culture of the Indian People : p. 195)]

অমূল্যচরণও মহেঞ্জো-দারো, হরপ্পা প্রভৃতির স্থানে আবিষ্কৃত মৃৎশিল্পের নিদর্শন, মূর্তিক্ষোদিত ফলক প্রভৃতিতে আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন [পৃ ১৭]। ভারতীয় সভ্যতায় দ্রাবিড় জাতির দান সম্পর্কে তাঁহার অভিমত,—

"আর্য ভিন্ন অন্তজাতির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রবিড় জাতির দান বড় কম নয়। প্রাচীন দ্রবিড়-সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে আর্যপ্রভাবশূন্য। আর্যদের সহিত ইহাদের সমাজগঠনেরও পার্থক্য রহিয়াছে। দ্রবিড়-সমাজে মাতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠিত, আর্যসমাজে কিন্তু পিতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠিত। তথাকথিত 'অসুর' সমাজের সহিত দ্রবিড় সমাজ গঠনের অনেকটা মিল আছে। আর্যগণ যাহাকে ময় অসুর বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন সেই ময়ই

দ্রবিড়-সভ্যতার বিজ্ঞানসাধনার চরম সাক্ষ্যদান করিতেছে। পূর্ত ও স্থপতি বিভার আর্য আদর্শ বিশ্বকর্মা, দ্রবিড় আদর্শ ময়দানব।" [পৃ ১৮]

সিন্ধু সভ্যতার প্রসঙ্গে মার্শালের 'Mohenjo-daro and the India Civilization' তিন খণ্ড (১৯৩১), ম্যাকের 'The Indus Civilization' (১৯৩৫) এবং মর্টিমার হুইলারের গ্রন্থসমূহ পাঠ করা যাইতে পারে।

'বিষ্ণু', 'অগ্নি' ও 'অদিতি' প্রবন্ধে অমূল্যচরণের মূর্তিতত্ত্বজ্ঞানের গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান হিন্দুধর্মে যে সব দেবদেবীর প্রভাব সর্বাধিক তাহাদের অনেকগুলির অস্তিত্বের নিদর্শন প্রাগ্‌বৈদিক হিন্দুধর্মে পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে পানিক্করের একটি অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—

"Not only is Indian civilisation pre-Vedic, but the essential features of the Hindu religion as we know it today were perhaps present in Mohenjo-Daro···In fact, Siva and Kali, the worship of Linga and other features of popular Hinduism were well-established in India long long before the Aryans came." [A Survey of Indian History : p. 4]

আর্যেরা দস্যুদের জয় করিবার পর বৈদিক দেবতা বরুণ, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যের গুরুত্ব ও মহত্ব বহু পরিমাণে হ্রাস পায় এবং সেই সঙ্গে অনার্য দেবতা শিব ও বিষ্ণুর মহিমা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁহার বিপদে শিব ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"The popular gods of the Vedic Aryans—Indra, Agni, Varuṇa, Soma, Sūrya, Ushas, Pūshan, Parjanya and the rest—gradually recede into the background, and a group of more puissant and more personal gods, more profound and cosmic and more philosophical in their conception, the Puranic gods of Hinduism headed by Śiva-Umā and Śri Vishṇu, become established." [S. K. Chatterjee : Race Movements and Prehistoric Cultute (The History and Culture of the Indian People : pp. 161-162)]

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে অনার্য দেবতারা আর্যদের ভাব কল্পনায় নব নব রূপ লাভ করিয়াছেন। বস্তুত আর্যেরা নিজেদের ধর্মের মধ্যে অনার্যদের

ধর্মকে মিশাইয়া লইয়া তাহাতে সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন, "আর্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা কূট রাজনীতি অনুসরণ করিয়া ভারতের আদিম জাতির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া, তাহাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের দেবতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া বেমালুম আপনাদের ধর্মের সঙ্গে মিশাইয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য দেশেও প্রাচীনকালে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়।" [পৃ ৪৮]

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "বৈদিক বিষ্ণু দ্যুস্থানের প্রধান দেবতা সূর্যের প্রকার ভেদ।…এই সূর্যই বেদোক্ত বিষ্ণুর রূপকল্পনার মূল উৎস।" [জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চোপাসনা : কলিকাতা ১৯৬০ : পৃ ৩৩]। সাম্প্রদায়িক দেবতা বিষ্ণু ও শিবের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া তিনি অন্যত্র মন্তব্য করিয়াছেন, "…বাসুদেবকেন্দ্রিক বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছিল উত্তর বৈদিক ঐতিহাসিক যুগে, কিন্তু শিবের উৎপত্তি যে প্রাকবৈদিক—তথা প্রাগৈতিহাসিক যুগে হইয়াছিল, ইহা অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করিয়া থাকেন।" [পঞ্চোপাসনা : পৃ ১২০-১২১] কিন্তু অমূল্যচরণ বলিয়াছেন, "….যে আকারেই হউক, সূর্যপূজা প্রাগ্‌বৈদিক যুগে ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচলিত ছিল। বিষ্ণু সেই সূর্যদেবতা" [পৃ ৪৯]। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে,—

"*Vishṇu* is partly Aryan, a form of the Sun-God, and partly at least the deity is of Dravidian affinity, as a sky-god whose colour was of the blue sky (cf. Tamil. *viṇ* "sky" and the Middle Indo-Aryan or Prākrit form of Vishṇu, which was *viṇhu, veṇhu.*" [S. K. Chatterjee : Race Movements and Prehistoric Culture (The History and Culture of the Indian people, Vol. 1 : p. 162)]

ঋক্‌, সাম, যজুঃ ও অথর্ব, এই চারিবেদেই বিষ্ণুর কথা পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে বিষ্ণু সাধারণের পূজা পাইতেন এবং বৈদিক দেবতাদের মধ্যে তাঁহার স্থান উচ্চই ছিল। বেদের ঋক্‌গুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি সূর্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

অগ্নি ঋগ্বেদের প্রধান দেবতাদের অন্যতম এবং তাঁহার স্থান ইন্দ্রের পরেই। বেদের ভাষ্যকারগণ আর্য বলিতে অগ্নি উপাসকদিগকেই বুঝাইয়াছেন। শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহারা বহুলভাবে অগ্নির ব্যবহার

করিতেন। এইভাবে তাঁহাদের ধর্মে অগ্নির সহিত জড়িত যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্ভব হইয়া থাকিবে।

বেদে পুরুষ দেবতাদিগেরই বিশেষ প্রাধান্য। সেখানে দেবীর সংখ্যা যেমন স্বল্প, তাঁহাদের গুরুত্বও তেমনি অধিক নয়। বৈদিক দেবীদের মধ্যে একমাত্র অদিতিই উচ্চস্থানের অধিকারিণী, কেননা তিনি দেবগণের মাতা। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে তাঁহাকে পৃথিবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন, "বৈদিক দেবতত্ত্বে অদিতি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করেন। কিন্তু সমগ্র ঋগ্বেদে কোন একটি সম্পূর্ণ সূক্ত তাঁহার নাই। অধিকাংশ সূক্তে তাঁহার পুত্র আদিত্যগণের সহিত অদিতি উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কোথাও বলা হয় নাই। তবে তাঁহার সমগ্রভাব, বিস্তৃতভাব, ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতিষ্মত্তার উক্তি বেদে আছে।" [পৃ ১৬০]

বর্তমান ক্ষেত্রে দেবদেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'দেবতত্ত্ব' প্রবন্ধটি (নানা প্রবন্ধ : কলিকাতা ১৮৮৫) স্মর্তব্য।

এই সূত্রে গোপীনাথ রাও-এর 'Elements of Hindu Iconography' দুই খণ্ড এবং এ. কে. কুমারস্বামীর 'Early Indian Iconography' প্রথম খণ্ড পড়া যাইতে পারে।

'ঋষি অত্রি' প্রবন্ধে ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অত্রির কথা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ হইতে শুরু করিয়া পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে অত্রির প্রসঙ্গ দেখা যায়। ঋগ্বেদের অত্রি কি করিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের কাল পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন সে বিষয়ে অমূল্যচরণ বলিয়াছেন, "…গোত্রপিতার নামে সেই সেই বংশীয় প্রধান পুরুষগণের পরিচয় দেওয়ার প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান ছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহু প্রমাণ পাইয়াছেন।" [পৃ ১৭৬]

'অথর্ববেদ' প্রবন্ধে অথর্ববেদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা খুবই চিত্তাকর্ষক। ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদকে লইয়াই প্রধানত বৈদিক সাহিত্য গঠিত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে বৈদিকোত্তর যুগেই বেদগুলির বিভাগ ও নামকরণ করা যায়। অথর্ববেদের কিছু অংশ যে ঋগ্বেদ হইতে প্রাচীন সে বিষয়ে ঋগ্বেদ হইতেই প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে [পৃ ১৮৯]। উপর্যুক্ত চারিটি বেদের মধ্যে অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বটকৃষ্ণ ঘোষের একটি উক্তি অভিনিবেশযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—

"For the history of the Indian people of the Vedic age the *Atharvaveda* is certainly the most important and interesting of the four Saṁhitās, describing, as it does, the popular beliefs and superstitions of the humble folk, as yet only partly subjugated by Brahmanism." [B. K. Ghosh : Vedic Literature—General View (The Hisrory and Culture of the Indian People : p. 225)]

অথর্ববেদের প্রসঙ্গে এন. জে. শেণ্ডের 'The Religion and Plilosophy of the Atharvaveda' ও এম. ব্লুমফিল্ডের 'The Atharvaveda' গ্রন্থ দুইটি পঠনীয় (১৮৯৯)।

'মহাভারত' প্রবন্ধটিতে অমূল্যচরণ 'মহাভারতে'র যে জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন তাহা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। 'মহাভারত' ভারতবর্ষের মানসদর্পণ। ভারতের সামাজিক জীবনকে আমরা যেভাবে জানি তাহা ঠিক সেই ভাবেই 'মহাভারতে' প্রতিফলিত হইয়াছে। বর্তমান আকারে 'মহাভারতে'র যে রূপ পাওয়া যায় তাহা চতুর্থ শতাব্দীতে সৃষ্ট হইলেও 'মহাভারতের' গল্প যে বহুপূর্বে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে পাণিনি (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) 'মহাভারতে'র প্রধান চরিত্রগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাতন কাহিনী সংস্কৃত আকারে বর্তমান মহাকাব্যে বিধৃত হইলেও মূল ঘটনা ও চরিত্রের বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই। এই প্রবন্ধটির প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সুলিখিত প্রবন্ধ 'মহাকাব্যের লক্ষণ' (নানা কথা : ১৯২৪) প্রবন্ধে 'মহাভারতে'র স্বরূপ নিরূপণকে স্মরণ করা যাইতে পারে।

বাঙলা 'মহাভারতে'র আলোচনাকালে অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন, "শ্রীকর নন্দী বাঙলায় সর্বপ্রথম মহাভারত রচনা করেন। আদি হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বমেধ পর্বে ইহার পরিসমাপ্তি। এখানি 'পরাগলী মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধ" [পৃ ২৫১]। কিন্তু সুকুমার সেনের মতে "পরমেশ্বর দাসের 'পাণ্ডববিজয়-পঞ্চালিকা'-ই বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ভারত-পাঁচালী কাব্য। পরমেশ্বরদাস 'কবীন্দ্র' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।" [সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড ২য় সং : কলিকাতা ১৯৪৮ : পৃ ২২৩]। এই পাঁচালী 'মহাভারতে'র মতো অষ্টাদশপর্বে বিভক্ত।

অমূল্যচরণ অন্যত্র লিখিয়াছেন, "বিজয় পণ্ডিতের নামে একখানি মহাভারত দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয় পণ্ডিত বলিয়া কেহ ছিলেন না।

এই মহাভারতখানি পরাগলী মহাভারতেরই সংক্ষিপ্তসার। ...'বিজয়পাণ্ডব' কয়েকস্থানে লিপিকর প্রমাদবশত বিজয় পণ্ডিতের সৃষ্টি করিয়াছেন" [পৃ ২৫২]। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নগেন্দ্রনাথ বসু মুর্শিদাবাদে কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ভারতপাঁচালীর সংক্ষিপ্ত একটি পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পুস্তকের শেষ ভণিতায় 'বিজয়পাণ্ডবকথা'র স্থলে লিপিকর প্রমাদে 'বিজয় পণ্ডিতকথা' থাকায় তিনি এটিকে বিজয়পণ্ডিত নামে এক কবির রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে, "পরাগলী মহাভারত পড়িয়া 'বিজয়-পাণ্ডবকথা' হয়। আর তাহাই ফাঁপিয়া ফুলিয়া 'সঞ্জয়ী মহাভারত' হইয়াছে" [পৃ ২৫৩]। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গে ভারতপাঁচালীর নানা প্রবাহ একত্র হইয়া 'সঞ্জয়' মহাভারতের সৃষ্টি হইয়াছে। এর আদিপর্বে রাজেন্দ্রদাসের, অশ্বমেধ পর্বে গঙ্গাদাসসেনের এবং স্বর্গারোহণপর্বে ষষ্ঠীবরসেনের ভণিতা দেখা যায়।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় বিভাগে ভারতবর্ষের দর্শন, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কথা বিবৃত হইয়াছে। কারো কারো মতে 'ইণ্ডাস' নদীর নাম হইতে 'ইণ্ড' এবং তাহা হইতে 'ইণ্ডিয়া' কথার উৎপত্তি। 'ইণ্ডাস'-এর ভারতীয় নাম 'সিন্ধু'। 'সিন্ধু' হইতে 'হিন্দ', 'হিন্দু' (হিন্দের লোক) ও 'হিন্দুস্থান' শব্দগুলি জন্ম লাভ করিয়াছে।

হিণ্ডুইজম বা হিন্দুধর্ম প্রকৃত পক্ষে কোনো ধর্ম নয়। ইহা একটি দর্শন বা জীবনযাপনপ্রণালী। কোনো একটি গ্রন্থ হইতে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। কোনো একজন প্রফেট ইহার প্রচারক নহেন। কালক্রমে বৈদিক ধর্মের সহিত ইহাকে বহুল পরিমাণে একাত্ম হইতে দেখা যায় এবং বৈদিক ধর্ম অর্থে অনেকাংশে হিন্দু ধর্মকে বুঝাইতে থাকে। কিন্তু আসলে "প্রচলিত হিন্দুধর্ম আর্য ও আদিম জাতির মিশ্রিত ধর্ম।" হিন্দু দর্শনের মূলকথা এই যে সকল মানুষকেই নিজেদের জীবনযাত্রারীতি নির্ণয়ে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার 'History of Indian Philosophy' নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মত ও তাহার উপরে লেখা টীকাগ্রন্থগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। উপনিষদের তাৎপর্য লইয়া লিখিত বাদরায়ণের 'ব্রহ্মসূত্র'-এর যতগুলি ভাষ্য পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে অষ্টম শতাব্দীতে রচিত শঙ্করাচার্যের ভাষ্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। শঙ্করাচার্যের

ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'শারীরক-মীমাংসা ভাষ্য' নামে সুপরিচিত। অমূল্যচরণ 'শঙ্করদর্শন ও অধ্যাস' প্রবন্ধে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ এবং বৌদ্ধধর্মের সহিত ইহার ঐক্যানৈক্য সম্পর্কে অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মধ্যকার প্রভেদ দূর করিয়া শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের নবজাগরণ আনিয়াছিলেন বলিয়া কোনো কোনো সমালোচক তাঁহাকে 'প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধচিন্তাধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতে,—

"শঙ্করের মতগুলি যে উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের একটি সরল ও বলিষ্ঠ পরিণতি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই মতগুলির মধ্যে শঙ্কর এমন নূতন কিছুই আনেন নাই যাহার উৎস অনুসন্ধানের জন্য বৌদ্ধপ্রভাব স্বীকার করিতে হইবে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা আজ ভুলিয়া গিয়াছি যে, উপনিষদে যে ভিত্তির প্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধধর্ম তাহার উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। একই পীঠভূমি হইতে সমান্তরালভাবে বৌদ্ধ ও বেদান্তমত উৎসারিত হইয়াছিল। পার্থক্য এই যে, ঐ দুইটি মত যে সব বিষয়ের উপর জোর দিয়াছে, সেগুলি ভিন্ন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সহিত বৌদ্ধদর্শনের কয়েকটি শাখার মতবাদের সাদৃশ্য অস্বাভাবিক কিছু নহে।" [এস. রাধাকৃষ্ণন: বেদান্ত—অদ্বৈতবাদ শঙ্কর (অনূদিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ: কলিকাতা ১৯৬১ : পৃ ৩৪৮)]

অমূল্যচরণও লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতে পারেন যে, তিনি বাস্তবিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নহেন, তবে তিনি পূর্ণাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে গিয়া বিশেষ গোলযোগে পড়িয়া উক্ত কৌশলের অবতারণা করেন ও তাহাতে তাঁহাকে একটু গোঁজ দিতে বাধ্য হইতে হয়।···তাঁহার উদ্দেশ্য শূন্যবাদ প্রচার করা নহে, পূর্ণাদ্বৈতবাদ প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।" [পৃ ২৯৯]।

'বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন', 'নারায়ণতত্ত্ব', 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব', 'রাধাতত্ত্ব', 'বৈষ্ণবের প্রেম' ও 'মাধ্ব দর্শন বা পূর্ণপ্রজ্ঞমত' প্রবন্ধগুলিতে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই সূত্রে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত ও চৈতন্যের অচিন্ত্য-ভেদাভেদের ব্যাখ্যায় অমূল্যচরণ গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। শাক্ত, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মতো বৈষ্ণবধর্মও ব্রহ্মসূত্র, ভগবদ্গীতা ও

উপনিষদকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গ্রন্থগুলির সঠিক কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে "ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা ঠিক কোন্ সময়ে রচিত তাহা বলা যায় না। উপনিষদ্গুলি সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হয়। গীতা বোধ হয় উপনিষদের অল্পকাল পরেই রচিত হয় এবং পরবর্তীকালে মহাভারতের মধ্যে তাহা ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। ব্রহ্মসূত্র সম্ভবত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়।" [সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা : পৃ ৯]

বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিবাদ খুবই প্রাচীন। "শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষে 'ভক্তি' শব্দ উৎপন্ন হইয়া পরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পারিভাষিক শব্দরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে" [পৃ ৩৪৪]। রামানুজ, মধ্বাচার্য, বল্লভ প্রমুখ সকলেই বেদান্তদর্শনের ভক্তিবাদী বলিয়া উপনিষদ্কেই মহাকাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের সার গীতাই ভক্তিশাস্ত্রের বেদ। এই কারণে বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ধর্মকে ভাগবতধর্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন, "শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, ভাগবতধর্ম প্রাচীন সাত্বতধর্ম নামে অভিহিত হয়। ভাগবতধর্মের অপর নাম 'পরধর্ম'। কালে ভাগবতধর্ম পঞ্চরাত্র মত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে" [পৃ ৩৪৪]। পঞ্চরাত্রে বাসুদেবকে পরব্রহ্মরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। অমূল্যচরণের মতে "পঞ্চরাত্রেই রাধাতত্ত্ব প্রথম বিধৃত হয়" [পৃ ৩৫৩]। রাধাতত্ত্বের সূত্রে শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে' গ্রন্থটি পড়া যাইতে পারে।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "পাঞ্চরাত্র বা পাঞ্চরাত্রিক নামটির তাৎপর্য যে কি তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।" [পঞ্চোপাসনা : পৃ ৩৮]। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন নারদীয় পাঞ্চরাত্র সংহিতাতে পাওয়া যে তত্ত্ব, মুক্তিপ্রদ, ভক্তিপ্রদ, যৌগিক ও বৈশেষিক, এই পাঁচ প্রকার জ্ঞান (রাত্র)-এর বিষয়ে আলোচনা করে বলিয়া ইহার নাম পাঞ্চরাত্র। অন্যান্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা শ্রেডার এই ব্যাখ্যাকেই অধিকতর গ্রহণীয় বলিয়াছেন। [F. O. Schrader : Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya Samhita : pp. 24-25]। শতপথ ব্রাহ্মণে পাঞ্চরাত্র কথাটি প্রথম পাওয়া যায়। এখানে পুরুষ নারায়ণ কর্তৃক পঞ্চদিবসব্যাপী পঞ্চরাত্রসত্র অনুকল্পিত হইয়াছে। অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন, "নারায়ণের পঞ্চরাত্রসত্রের

দার্শনিক ব্যাখ্যা হইতে পঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের পঞ্চরাত্র নাম হইয়া থাকিবে। পঞ্চরাত্রসত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যায় হরির পঞ্চরূপের (self-manifestation) কথা আছে। পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চা।" [পৃ ৩৭৩]

বিষ্ণুর আদি বৈদিক রূপকে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের ইষ্ট দেবতার পূর্ণরূপ বলা যায় না। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "'বৈষ্ণব' এই নামটি 'বিষ্ণু' হইতে ব্যুৎপন্ন ইহা সত্য, কিন্তু এই সম্প্রদায়গত নাম অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। সুপ্রাচীনকালের সাহিত্য ও লেখমালা অনুসন্ধান করিলে 'বৈষ্ণব' নামটি পাওয়া যায় না।" [পঞ্চোপাসনা: পৃ ৩৬]। ইহার পর তিনি আবার মন্তব্য করিয়াছেন, "বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত 'বৈষ্ণব' নামটির সর্বপ্রথম উল্লেখ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কয়েকটি লেখে এবং মুদ্রায় পাওয়া যায়।... গুপ্তযুগেও এই ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণকে 'ভাগবত' বা 'পরমভাগবত' বলিয়া নির্দিষ্ট করা প্রশস্ত ছিল, এবং তখন বৈষ্ণব নামটির আংশিক প্রকাশ হইলেও, উহার ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বেদের আদিত্য বিষ্ণু আলোচ্যমান ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মের আদি ও প্রধান পুরুষ ছিলেন না।" [পঞ্চোপাসনা: পৃ ৩৮-৩৯]। শেষপর্যন্ত তাঁহার সিদ্ধান্ত "...বৈষ্ণবধর্মসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর প্রকৃত রূপ প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন দেবসত্তার, যথা মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতা বাসুদেব-কৃষ্ণের, আদিত্য বিষ্ণুর এবং নারায়ণের একীকরণের ফলেই পূর্ণ পরিণতিলাভ করিয়াছিল।" [পঞ্চোপাসনা: পৃ ৪৯]। অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন, "রামায়ণ ও মহাভারত যুগে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়। ইহার পূর্বে সম্ভবত নারায়ণোপাসনা প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে যখন বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়, তখন বাসুদেব নারায়ণের সহিত একত্বলাভ করেন" [পৃ ৩৮৭]। অন্যত্র তাঁহার উক্তি, "বিষ্ণু ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং পরবর্তী বৈষ্ণবগ্রন্থেও কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এক বলা হইয়াছে। দুই এক স্থলে কৃষ্ণকে বিষ্ণু হইতে সামান্য তত্ত্বত পৃথক করা হইয়াছে" [পৃ ৪১০]।

'শক্তিতত্ত্ব' প্রবন্ধে অমূল্যচরণ শক্তির স্বরূপ ও তাঁহার উপাসনার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়াছেন। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন, "ইতিহাস... বলিবে ভারতবর্ষের দেবীতন্ত্রের পিছনে মূলে এক দেবী ছিলেন, সেই এক দেবী হইতেই বহু দেবী, বহু পূজাবিধি ও উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে এই কথা

সম্পূর্ণ সত্য নহে: বহু স্পষ্ট-অস্পষ্ট উৎসমূল হইতে আবির্ভূতা বহু দেবী, তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া বহু পূজাবিধি, বহু উপাখ্যান; সেই দেবীগণের ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে বঙ্কিমগতিতে আসিয়া ঘটিয়াছে এক ধারার সহিত অন্য ধারার মিলন; তাহার সহিত আবার যুক্ত হইয়াছে আমাদের ক্রমবর্ধমান তত্ত্ববুদ্ধি—তখন যে স্থানে যে কালে যত দেবী ছিলেন সকলকে মিলাইয়া গড়িয়া উঠিয়াছেন এক মহাদেবী।" [শশিভূষণ দাশগুপ্ত: ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য: কলিকাতা ১৯৬০: পৃ ২]

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "...গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রধান ইষ্ট দেবতার বিবর্তনে যেমন নানাবিধ দেবতার রূপসংমিশ্রণ কার্যকরী হইয়াছিল, শক্তিউপাসকের আরাধ্যা দেবীও তেমনি নানাপ্রকার এক বা ভিন্নজাতীয় দেবী-কল্পনার সংমিশ্রণের ফলে পূর্ণরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।" [পঞ্চোপাসনা: পৃ ২৫০]

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনা বৈদিক নহে এবং আর্যেতর সমাজ হইতে হিন্দুসমাজসংস্কৃতির মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। নৃতাত্ত্বিক দিক হইতে ইহার সপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি ছিল এই যে, বৈদিক আর্যগণের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক ছিল ও বৈদিকধর্মে পুরুষ দেবতার বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায় এবং অন্যদিকে মাতৃতান্ত্রিক আর্যেতর ধর্মে মাতৃদেবতার আধিক্য ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই মত সর্বাংশে গ্রহণ করা যায় না। কেননা প্রাচীন বৈদিকসূক্তে মাতৃদেবীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হইলেও যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদ্ প্রভৃতির কোনো কোনো জায়গায় নানাভাবে দেবীর উল্লেখ থাকায় মাতৃপূজা ও শক্তিসাধনাকে একেবারে অবৈদিক বলা যুক্তিযুক্ত নয়। অমূল্যচরণও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "শক্তি-উপাসনার বীজ বেদে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রচলিত শাক্তমতে বেদ-বহির্ভূত অনেক ধর্মমত মিশাইয়া আছে" [পৃ ৪৫৮]। ইহা ব্যতীত দেখা গিয়াছে যে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশে যখন মাতৃপূজা প্রচলিত ছিল সেই সময় সেখানকার সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ছিল না।

তন্ত্র ভারতের একটি স্বতন্ত্র প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান-প্রণালী। তন্ত্রের মধ্যে দার্শনিক মতবাদ মুখ্য বিষয় নহে। ইহাতে প্রধান বিষয় হইতেছে, দেহকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কতকগুলি গুহ্য সাধন-পদ্ধতির আচরণ। এই সাধনপদ্ধতিগুলি লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বভাব ও চিন্তাধারার সহিত মিলিত হইয়া বৌদ্ধতন্ত্রের

সৃষ্টি করিয়াছে, আবার পরে হিন্দুধর্মের তত্ত্বভাব ও চিন্তাধারার সহিত একীভূত হইয়া হিন্দুতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। তন্ত্রপ্রসঙ্গে সর্ জন উডরফ (আর্থার অ্যাভেলন), গোপীনাথ কবিরাজ, তারানাথ তর্কতীর্থ প্রভৃতির গ্রন্থগুলি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে যোগাভ্যাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে মহেঞ্জো-দরোতে প্রাপ্ত একটি মূর্তির চক্ষু তাহার নাসিকার উপর নিবদ্ধ দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে ইহা যোগাভ্যাসের মূর্তি। হিন্দু ও বৌদ্ধমতের সহিত যোগের পদ্ধতিকে যুক্ত করিয়া যে তন্ত্রের সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন,—

"পরবর্তী বৌদ্ধ ও হিন্দুমতে যখন নানা দেবদেবীর কল্পনা হইল, তখন সাংখ্য ও অদ্বৈত মতকে মিশাইয়া ও তাহার সহিত যোগের উপায়কে সংযুক্ত করিয়া, একটি নূতন রকমের সাধনা-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল। ইহাই সাধারণত তন্ত্র নামে অভিহিত। 'তন্' ধাতুর অর্থ 'বিস্তার', এইজন্য সাধারণভাবে 'তন্ত্র' বলিতে 'বিস্তৃতি সাহিত্য' বোঝায়। এই হিসাবেই ইহা মন্ত্র বা সূত্র হইতে ভিন্ন।" [সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা: কলিকাতা, প্রকাশকাল নাই: পৃ ১৬৪-১৬৫]

অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন, "তন্ত্রই শাক্তদিগের প্রধান শাস্ত্র। শ্রুতির ভাগত্রয়ের মধ্যে তন্ত্র উপাসনাকাণ্ডের অংশবিশেষ। সাধন, ভজন ও যোগকেই তন্ত্র বলিতে পারা যায়। ইহার যাহা কিছু সমস্তই আনুষ্ঠানিক (practical)। তন্ত্র সংখ্যায় বহু।" [পৃ ৪২৩]

'জৈনধর্ম' প্রবন্ধে জৈনধর্মের স্বরূপ এবং হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সহিত ইহার সম্পর্কের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অমূল্যচরণের মতে "...জৈনধর্ম বহুপ্রাচীন ও বৌদ্ধধর্ম ইহার বহুপরে উৎপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সকল যুক্তিবলে জৈনধর্মকে বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ যুক্তিসাহায্যে ইহাও প্রমাণ করা যায় যে, জৈনধর্মের পর বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছে" [পৃ ৪৮৪]। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন,—

"অনেকে মনে করেন জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মেরই একটা অঙ্গ। অনেকে বা ইহাও মনে করেন যে বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্ম সমসাময়িক; কিন্তু ইহা সত্য নহে। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যেও জৈন বা নিগন্থদের উল্লেখ পাওয়া

যায়। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন নাতপুত্ত বর্ধমান মহাবীর। মহাবীর ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক। কিন্তু মহাবীর জৈনধর্ম বা দর্শনের প্রণেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন জৈন সন্ন্যাসীমাত্র।" [ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা : পৃ ৮৭]

জৈনধর্মের ব্যাখ্যায় স্টিভেন্সনের 'Heart of Jainism' ও এ. সি. সেনের 'Schools and Sects in Jaina Literature' গ্রন্থদুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'রামানন্দী সম্প্রদায়', 'নাথপন্থ', 'কবীরপন্থী', 'বল্লভাচার্য', 'তুকারাম', 'দাদূপন্থী', 'রাধাবল্লভী', 'নিমাবৎ', 'রয়দাসী', 'উদাসী', 'সেনপন্থী', 'গোসাঁই', 'লিঙ্গায়ত' ও 'অঘোরপন্থী' এই চৌদ্দটি প্রবন্ধে অমূল্যচরণ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্য সহকারে চৌদ্দটি ধর্মসম্প্রদায়ের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই চৌদ্দটি সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানন্দী সম্প্রদায় বা রামাৎ, কবীরপন্থী, বল্লভাচার্যপন্থী বা বল্লভাচারী, দাদূপন্থী, রাধাবল্লভী, নিমাবৎ বা নিমাৎ, রয়দাসী বা রৈদাসী ও সেনপন্থী এই আটটি সম্প্রদায়কে বৈষ্ণবসম্প্রদায় বলা হয়। নাথপন্থ, লিঙ্গায়ত ও অঘোরপন্থী শৈবসম্প্রদায়। তুকারাম কৃষ্ণ ও শিবকে পূজা করিলেও তাঁহার মতবাদে বৈষ্ণবদর্শনের প্রাধান্য দেখা যায়। তুকারাম তাঁহার একটি অভঙ্গে (J. Nelson Fraser Ed. : The Poems of Tukarama, Vol I : p. 31) বাবা চৈতন্য, কেশব চৈতন্য ও রাঘব চৈতন্যকে তাঁহার গুরু বলিয়াছেন। গোসাঁই শৈব ও বৈষ্ণব এই উভয়ই হইতে পারে। উদাসীরা শিখ সম্প্রদায় এবং ইহাদের উপর বৈষ্ণবপ্রভাবই বেশী।

অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম বাঙলা ভাষায় ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়সমূহের বিবরণ সংবলিত একটি প্রামাণিক গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম ভাগ ১৮৭০ ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৭৩) রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রধান উৎস হোরেস হেম্যান উইলসনের 'A Sketch of the Religious Sects of the Hindus' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধটি। এইটি প্রথম কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন মুখপত্র 'Asiatic Researches'-এর ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে (১৮২৮) প্রকাশিত হয়। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় অক্ষয়কুমার লিখিয়াছেন, "ইদানীং এ দেশে পাঁচ প্রকার উপাসক সর্ব-প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ; বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য। বিষ্ণু-পূজকেরা বৈষ্ণব, শিবার্চকেরা শৈব, শক্তি-

সেবকেরা শাক্ত, সূর্যোপাসকেরা সৌর ও গণেশোপাসকেরা গাণপত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ঐ সমস্ত ইদানীন্তন উপাসক-সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত এই পুস্তকে যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।" [অক্ষয়কুমার দত্ত : ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, ১ম ভাগ, ২য় সং : কলিকাতা ১৮৮৮ : পৃ ১]।

উইলসন তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"The Hindu religon is a term, that has been hitherto employed in a collective sense, to designate a faith and worship of an almost endlessly diversified description : to trace some of its varieties is the object of the present enquiry." [Ernst R. Rost Ed. : H. H. Wilson-এর A Sketch of the Religious Sects of the Hindus, 2nd Edition : Calcutta 1958 : p. 1.]

বিভিন্ন হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে উইলসনের বক্তব্য, "The worship of the populace being addressed to different divinities, the followers of the several gods naturally separated into different associations, and the adores of Brahma, Vishnu, and Siva or other phantoms of their faith, became distinct and insulated bodies, in the general aggregate : the conflict of opinion on subjects, on which human reason has never yet agreed, led to similar differences in the philosophical class, and resolved itself into several Darsanas or schools of philosophy." [Ibid]

উইলসনের প্রবন্ধে সর্বসমেত ৪৫টি সম্প্রদায়ের বিবরণ ছিল। কিন্তু অক্ষয়কুমার ১৮২টি সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি অনেক জায়গায় উইলসনের বিবরণকে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করিয়াছেন। নিজে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও তিনি শীতল সিংহ ও মথুরানাথ রচিত পারস্যগ্রন্থদ্বয়; হিন্দী, সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষায় লিখিত ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অনেক বৃত্তান্ত আহরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

ইহার পর যে সব গ্রন্থের মধ্যে হিন্দু উপাসকসম্প্রদায়ের বিবরণ পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'Hindu Castes and Sects' (১৮৯৬), রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের 'Vaiṣṇavism, Śaivism and Minor Religious Systems' (১৯১৩), চার্লস এলিয়টের 'Hinduism and Buddhism' তিন খণ্ড (১৯২১), ডি. এ. পাই-এর 'Religious Sects

in India among the Hindus' (১৯২৮), ফারকুহারের 'An Outline of the Religious Literature of India' (১৯২০), রাধাকৃষ্ণনের 'Indian Philosophy' দুই খণ্ড (১৯২৩ ও ১৯২৭), মনিয়ার উইলিয়মসের 'Religious Thought and Life in India' (১৮৯১) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রামাৎ, কবীরপন্থী, সেনপন্থী, দাদূপন্থী, বল্লভাচারী, লিঙ্গায়ত, অঘোরপন্থী, বৈরাগী, রৈদাসী, রাধাবল্লভী ও উদাসীর বর্ণনা 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ে' পাওয়া যায়। অমূল্যচরণ এই সব সম্প্রদায়ের বিবরণে অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের তৃতীয়ভাগে নাটক, নাট্যশাস্ত্র, নাট্যশালা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে।

'ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা' প্রবন্ধে ভারতে নাটকের উৎপত্তি সম্পর্কে অমূল্যচরণ মন্তব্য করিয়াছেন, "নাটকের অস্তিত্ব না থাকিলেও বৈদিকযুগে নৃত্য, গীত, অনুকরণাভিনয়, রঙ্গভঙ্গী, কথোপকথন—এগুলি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি ক্রমশ বদলাইয়া অন্য ছাঁচে আসিয়া নাটকাভিনয়ে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে। আর নাচ-গান যখন অভিনয়ের একটি অঙ্গ, তখন এরূপ মনে করাও অসঙ্গত মনে হয় না" [পৃ ৬২৪]। তাঁহার অভিমত মোটামুটিভাবে ম্যাক্সমুলার, হার্টেল, লেভি প্রমুখের সিদ্ধান্তের অনুরূপ। ইহাদের মতে বৈদিক যাগযজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে নাটকের জন্ম এবং উক্তি-প্রত্যুক্তিবন্ধে রচিত সংবাদসূক্তগুলির মধ্যে এই ধরনের নাটকের প্রাথমিক রূপটি বিধৃত হইয়াছে। অপরপক্ষে পিশেল মনে করেন পুতুলনাচ হইতেই নাটকের উৎপত্তি। লুডার্সের মতে ছায়ানাট্যই সংস্কৃত নাটকের প্রাথমিক রূপ। আবার হিলেব্রাণ্ট ও কনো সংস্কৃত নাটকের উৎস খুঁজিয়াছেন বৈদিক যুগের লৌকিক আনন্দানুষ্ঠানে। অন্যদিকে কীথ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাকাব্যের আবৃত্তিপদ্ধতির সহিত কৃষ্ণোপাসনার মিলনের ফলেই সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব।

ভারতের নাট্যশাস্ত্র অনুসরণ করিলে জানা যায় যে ইন্দ্রধ্বজোৎসবের সূত্রেই ভারতে নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে। 'নাট্যশাস্ত্রে নাটকের উৎপত্তি' প্রবন্ধে এবিষয়ে অমূল্যচরণ মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার অভিমত, "ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে নাট্য বা নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না"

[পৃ ৬৩৯]। তবে ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে কোনো কিছু সিদ্ধান্ত করা যায় না, এমন মনে করিবার হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না। অমূল্যচরণ আবার নাটকের উৎপত্তি নির্ণয়ে লিখিয়াছেন, "পুতুলনাচের প্রথা ভারতবর্ষে খুব প্রাচীন। মহাভারতেও এ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুতুল-নাচ সূত্রের সাহায্যেই হইত। যিনি সূত্রের সাহায্যে এই অভিনয়-কার্য সম্পন্ন করিতেন তাঁহাকে সূত্রধার বলা হইত।...এই সূত্রধার হইতে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে পুতুল-নাচের রীতি নাটকীয় অভিনয়প্রথার পূর্ববর্তী। নাটকীয় অভিনয়ের উৎপত্তি পুতুল-নাচ হইতে না হইলেও এই রীতি কিছু সহায়তা করিয়াছে" [পৃ ৬৩৯]। তাঁহার এই মত কতকাংশে পিশেলের সিদ্ধান্তের সমর্থক।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র একটি সুপ্রাচীন গ্রন্থ। অমূল্যচরণ 'ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "...ভরত ঠিক কোন্ সময়ের লোক তাহা জানা যায় না" [পৃ ৬২১]। অন্যত্র তাঁহার মন্তব্য "ভরত পাণিনির পরবর্তী" [পৃ ৬২১]। কিন্তু এ কথা মনে করিবার সঙ্গত হেতু আছে যে নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ের একটি বিশেষ ঐতিহ্যের সৃষ্টি না হইলে নাট্যশাস্ত্র প্রণয়নে উৎসাহ না আসাই স্বাভাবিক এবং ব্যাকরণে তাহার শব্দাবলীর ব্যাখ্যাও যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ভারতীয় নাট্যাভিনয়ের সুমহান ঐতিহ্যকে যথাযথ মূল্য দিতে হইলে এবং কোনো সৃষ্টিধারার ক্রমবিকাশের স্বাভাবিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ভরতকে পাণিনির পূর্ববর্তী মনে করাই সঙ্গত। ঐতিহ্য অনুসারে ভরতই নাট্যশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতা এবং সেই হিসাবে পাণিনির ব্যাকরণে উল্লিখিত শিলালিন ও কৃশাশ্ব তাঁহার পরবর্তী।

ভারতীয় নাট্যাভিনয় ভারতের সহিত গ্রীক সম্পর্কের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে কিনা এ প্রশ্নটি লইয়া অমূল্যচরণ 'ভারতীয় নাট্যশালার গোড়ার কথা' ও 'রামগড়ের নাট্যশালা' অধ্যায় দুটিতে অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে ওয়েবার পরে ভিণ্ডিশের প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হন যে গ্রীক প্রভাবেই ভারতে নাট্যাভিনয়ের জন্ম। কিন্তু পিশেল ভিণ্ডিশের এই মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। কীথও ভারতীয় নাটকের অঙ্কবিভাগ, মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থানরীতি, চরিত্র, ঐক্যবিধি, কাহিনী, প্রস্তাবনা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই গ্রীক নাটকের সহিত কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাকে একই পরিস্থিতির ঐক্যের ফলস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অমূল্যচরণ ঠিকই লিখিয়াছেন,

"ভিণ্ডিশ নানা যুক্তিসহকারে দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, ভারতীয় নাট্যশালার উৎপত্তি গ্রীক আদর্শ হইতে। কিন্তু তাঁহার যুক্তিতে সারবত্তা আদৌ নাই।" [পৃ ৬৭৮]

ব্লক সীতাবেঙ্গার গুহাভ্যন্তরের নাট্যশালার সহিত গ্রীক থিয়েটারের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ইহাতে গ্রীক প্রভাবের কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন [পৃ ৬৮৮]। কিন্তু ভরতের নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় 'মণ্ডববিধান' হইতে ভারতে স্থায়ী মঞ্চনির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ক্রমনিম্ন পর্বতগাত্রকে দর্শকের আসনশ্রেণীরূপে ব্যবহৃত করিবার রীতি নির্দেশিত হইয়াছে। সেই দিক দিয়া সীতাবেঙ্গার ক্রমনিম্ন পর্বতগাত্রের সারিবদ্ধ আসনের অস্তিত্বকে গ্রীক প্রভাবের ফল মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। পর্বতগাত্রে ক্রমোচ্চ আসনশ্রেণী নির্মাণের রীতিই স্বাভাবিক। সুতরাং সীতাবেঙ্গার গুহারঙ্গমঞ্চের সহিত গ্রীক অ্যাম্ফিথিয়েটারের সাদৃশ্য একই অবস্থার সৃষ্টি মনে করাই যুক্তিযুক্ত।

ভারতীয় নাটকে গ্রীক প্রভাবের আলোচনার সূত্রে অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন, "সংস্কৃতনাটকেও যবনিকা শব্দ আছে। তাই দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, সংস্কৃতনাটক গ্রীক নাটকের অনুকরণে রচিত। কিন্তু একমাত্র 'যবনিকা' শব্দে এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়।" [পৃ ৬৬৬]। 'যবনিকা' শব্দ গ্রীক Ionian শব্দ হইতে সৃষ্ট হইলেও গ্রীকনাটকে ইহার ব্যবহার ছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। পক্ষান্তরে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে 'যবনিকা'র সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সম্প্রতি প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Indian Drama' নামে সংকলনের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে 'যবনিকা' শব্দ সংস্কৃত 'যম' ধাতু হইতে বন্ধন করা বা খাটানো অর্থে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার সহিত কোনো গ্রীক শব্দের যোগ নাই।

'প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা' প্রবন্ধটি কতকাংশে অসম্পূর্ণ হইলেও মূল্যবান। নৃত্যকলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা। প্রাচীন ভারতের নৃত্যকলা এই প্রাচীনতম ধারার এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভারতে নৃত্যকলার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার যুগে হরপ্পা ও মোহেঞ্জো-দরোর প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণগুলি হইতে সংগীত ও নৃত্যকলার অস্তিত্ব বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে নৃত্যকলার যে বিশেষ চর্চা হইত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অমূল্যচরণ এ বিষয়ে সুন্দর

আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক যুগের নৃত্যধারা বৌদ্ধযুগ ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। শুধু নৃত্যকলা নয়, সমস্ত চৌষট্টিকলা সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য। হ্যাভেল স্পষ্টই বলিয়াছেন, "The Vedic period is all important for the historian, because, except for a very brief period of its history, the Vedic impluse is behind all Indian art." ভারতীয় নাট্যচিন্তা ও নৃত্যকলার সুপ্রাচীন পরিচয় বিধৃত হইয়াছে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' ও নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয়দর্পণ' গ্রন্থ দুইটিতে। 'অভিনয়দর্পণ' 'নন্দীশ্বর-সংহিতা' নামে বিশাল গ্রন্থের পরিশিষ্ট।

'বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা' প্রবন্ধে অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন, "যাত্রা হইতেই আমাদের দেশে থিয়েটারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস" [পৃ ৬৯৩]। এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন,—

"বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপত্তি ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা বিদেশী আদর্শে, এ কথাটি ভাল করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। পুরাতন যাত্রার সহিত বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নাই। যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই, বরং নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়াছিল।" [বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ১৭৯৫-১৮৭৬ পরিবর্তিত ৩য় সং : কলিকাতা ১৯৪৭ : পৃ ১৮]

পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই এ দেশের যাত্রার রূপান্তর ঘটিতে আরম্ভ হয়। এই রূপান্তরিত যাত্রার উদাহরণ হিসাবে 'কলিরাজার যাত্রা'র নাম করা যায়। ইহা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুআরি তারিখের 'সমাচার দর্পণ' নামে বাঙলা পত্রিকা হইতে এই যাত্রার বিবরণ জানা যায়। অমূল্যচরণ যাত্রার এই পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন, "এখনকার যাত্রা অনেকটা আধুনিক থিয়েটারেরই সুস্পষ্ট অনুকরণ।" [পৃ ৬৯৩]

অমূল্যচরণের মতে 'কলিরাজার যাত্রা'র অভিনয়ের পর বাঙ্গালায় দ্বিতীয় নাটক 'কৌতুকসর্বস্ব' বা বিদ্যাসুন্দর। এই নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালার নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়" [পৃ ৬৯৩]। কিন্তু নাটকের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে হেরাসিম লেবেডফের অনূদিত নাটক ও বিদ্যা-সুন্দরের কথা ছাড়িয়া দিলে গৌরীভা গ্রামের বৈদ্য নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান

শকুন্তলা' (অগস্ট ১৮৫৫)-কেই প্রথম অভিনীত নাটক হিসাবে ধরা যায়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুআরি তারিখে ইহা সিমলার আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর বাড়িতে অভিনীত হয়। ইহার পূর্বে 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' (১৮২২); 'হাস্যার্ণব' (১৮২২), 'কৌতুকসর্বস্ব' (১৮২৮) প্রভৃতি যে নামেমাত্র নাটকগুলি প্রকাশিত হয় সেগুলি সম্ভবত কোথাও অভিনীত হইবার সৌভাগ্যলাভ করে নাই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় প্রকৃতপক্ষে প্রথম বাঙালীদের দ্বারা বাঙলা নাটকের অভিনয় শুরু হয়। ইহাতেই সুপরিচিত বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নাট্যাকারে অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই অভিনয়ের বিবরণ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর তারিখের 'হিন্দু পাইওনিয়ারে' প্রকাশিত হয়।

ডক্টর সুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে যাত্রার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব।" [দ্বিতীয় সং ১৯৪৮ : পৃ ৯১৯]। পাঁচালীর বিষয়ে তিনি উক্ত গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন, "পাঁচালী কাব্য শুরু হয় কবে জানি না, তবে পঞ্চদশ শতকের পূর্বে লেখা কোন পাঁচালী কাব্যের উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই [ঐ : পৃ ৮৪]। পক্ষান্তরে অমূল্যচরণের মতে, "প্রাচীন যাত্রার পালায় ছিল কালিয়দমন অভিনয়।...কৃষ্ণলীলার যাহা কিছু সব কালিয়দমনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।... তারপর কালে এই যাত্রার প্রভাব কমিতে থাকে; তখন পাঁচালী, কীর্তন প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল" [পৃ ৭৩৯]। শ্রীচৈতন্যই বিশেষ করিয়া কৃষ্ণযাত্রার প্রবর্তক। আবার ষোড়শ শতাব্দীর শেষে যে বিখ্যাত রসকীর্তনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয় শ্রীচৈতন্য তাহার সূচনা করিয়া যান। কৃষ্ণযাত্রার পূর্বে পাঁচালীর অস্তিত্বও অস্বীকার করিবার নহে। তবে পাঁচালী হইতে যাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে, এ মত বিশেষভাবে গ্রহণ করা যায় না।

কোনো কোনো জায়গায় তথ্যের ব্যাপারে কিছু ত্রুটি থাকিলেও অমূল্যচরণ যাত্রার যে ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মতে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'স্বপ্নবিলাস' ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ বা ইহার কাছাকাছি সময়ে ছাপা হয় [পৃ ৭৪১]। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার প্রকাশকাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ।

'কবিগান' প্রবন্ধটিও বিশেষভাবে তথ্যসমৃদ্ধ। এখানেও কয়েকটি স্থলে কিছু তথ্যের ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই ব্যতিক্রমের প্রধান কারণ কবিওয়ালাদের

সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে মতানৈক্য। কবিগানের প্রামাণিক বিবরণ ও আলোচনা হিসাবে যে গ্রন্থগুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয় সেগুলি হইতেছে S. K. De-র 'Bengali Literature in the Nineteenth Century', গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' ১ম খণ্ড, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীতসংগ্রহ', হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' ১ম ভাগ, শিবরতন মিত্র সংকলিত 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক' (খণ্ডিত), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংগৃহীত 'কবিজীবনী' ('সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লোকসাহিত্য'। অমূল্যচরণ কবিগানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সাহিত্যিক মূল্যায়ণে প্রবেশ না করিয়া ইহার একটি প্রামাণিক রূপরেখা দিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এ কথা বলা বোধহয় অন্যায় হইবে না যে, কবি সংগীতগুলিতে ধর্মের বন্ধনমুক্ত মানবিক চেতনা, অন্তর্মুখিতা, জীবনানুগত্য, রসরসিকতা প্রভৃতির দিক দিয়া আধুনিক কাব্যের প্রথম পদধ্বনি শোনা গিয়াছিল বলিয়া সেগুলি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্যে গরীয়ান।

অমূল্যচরণ লিখিয়াছেন যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিশেষ চেষ্টায় রাম-নারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) ১৮৫৪-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল [পৃ ৬৯৭]। ইহা ঠিক নয়। নূতন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত এই অভিনয়ের সংবাদ সম্পর্কে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' কখনো অভিনীত হয় নাই।

নূতন নূতন তথ্য উদ্ধারের ফলে বর্তমানে নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে অনেক ধারণা পরিবর্তিত হইয়াছে। তাই অমূল্যচরণের 'বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা' প্রবন্ধটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে ভালো হয়। বঙ্গীয় নাট্যশালার আলোচনার পর অমূল্যচরণ কমড নাটক ও কেরল নাটকচক্র সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা তথ্য সম্পদে সমৃদ্ধ।

অভিনয়পদ্ধতি ও উপকরণের দিক দিয়া যাত্রা ও নাটকের মধ্যে একটি পার্থক্য টানা হয়। বাঙলা সাহিত্যে এই দুই ধরনের রচনার প্রভেদ লক্ষ্য

করা গেলেও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগে যাত্রার বিষয়ে কোনো উল্লেখ নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, এই সংস্কৃত শব্দটি সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় যে বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় সেই বিশেষ অর্থেই ইহা এক বিশেষ রীতির নাট্যানুষ্ঠানের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটক যাত্রা-প্রসঙ্গে অভিনীত হইলেও সব নাটক যে যাত্রানাটক নহে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রেই এক বিশেষ রীতির নাট্যরচনাকে যাত্রা নাম দেওয়া হয়। 'যাত্রা' শব্দের মূল অর্থ দেবতার উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া শোভাযাত্রা ও উৎসব। তাহার পর দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে গীতিময় নাট্যরচনা অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইতে লাগিল। প্রথমে এই গীতিময় নাট্যরচনার বিষয় ছিল দেবদেবীর লীলাকাহিনী। পরে অন্য কাহিনীও ইহার বিষয়ীভূত হইল। দৃশ্যপটহীন অভিনয় ও গীতিপ্রাধান্য যাত্রার বৈশিষ্ট্য।

॥ ৩ ॥

ইংরেজী 'Essay' নামধেয় রচনার রূপ ও রীতি লইয়া বহু বিতর্ক দেখা যায়। হিউ ওআকার (Hugh Walker) তাঁহার 'The English Essay and Essayists' গ্রন্থে 'Essay'-র স্বরূপ বিচার করিতে গিয়া এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ওআকার লিখিয়াছেন,—

"While, therefore, we know fairly well what to expect of a poem called a lyric, and even of one called an epic or a tragedy, we have hardly the vaguest idea of what we shall find in a composition entitled an essay. This extreme indefiniteness is partly inherent in the nature of the thing : etymologically, the word essay indicates something tentative, so that there is justification for the conception of incompleteness and want of system. But partly also it is factitious : sometimes the modesty of an author, and sometimes his fear of criticism, have led to the adoption of the vague name instead of one which, if it was more precise, might also seem more pretentious."

[Hugh Walker : The English Essay and Essayists : London 1915 : p. 2]

'Essay'-র রূপ ও রীতি নির্ধারণে প্রতিবন্ধ সৃষ্টির জন্য ওআকার শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং লেখকের অনির্দিষ্ট ও অভিসন্ধিমূলক মনোবৃত্তিকেই দায়ী করিয়াছেন। 'Essay' কথাটির আভিধানিক অর্থ প্রয়াস এবং সেই দিক দিয়া ইহাতে কোনো কিছু প্রকাশ করিবার চেষ্টা বুঝাইতেছে, কিন্তু তাহা কি রূপ গ্রহণ করিবে তাহার ইঙ্গিত নাই। 'Essay'-র স্বরূপ নির্ণয়ে কোনো সংজ্ঞার্থ সৃষ্টির অসম্ভাব্যতার কথা মনে রাখিয়া স্টিওআর্ট এ বিষয়ে যাহা মন্তব্য করিয়াছেন তাহা গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"The many subjects, purposes, and manners of treatment make it impossible any very narrow and binding definition of the genre. Today we simply give the name of essay to any short, unified work of nonfictional prose having some degree of complexity and dealing with a single subject."

[John L. Stewart Ed.: The Essay, General Introduction: New York 1952 : p. xiii]

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লুসিয়ান (Lucian)-এর লঘু ও উজ্জ্বল রচনাগুলিতে আত্মভাবমুখ্য বা ব্যক্তিগত (Informal বা Subjective) প্রবন্ধের নিদর্শন পাওয়া গেলেও আধুনিক অর্থে এই শব্দটি তখনই প্রথম ব্যবহৃত হয় যখন ফরাসী লেখক মন্টেইন (Montaigne) ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গদ্যরচনাগুলিকে 'Essais' নাম দিয়া বাহির করেন। পরে জ্ঞানগর্ভ, মননশীল ও বিষয়নিষ্ঠ (Formal বা Objective) রচনাসম্পর্কেও এই 'Essay' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে।

ইংরেজী 'Essay' শব্দটির স্থলে বাঙলায় প্রবন্ধ, রচনা, নিবন্ধ, সন্দর্ভ, প্রস্তাব ইত্যাদির প্রয়োগ দেখা যায়। সব দিক বিচার করিলে 'Essay'-র সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রবন্ধ কথাটিই গ্রহণীয়। প্রবন্ধ অর্থে প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনা। সংস্কৃত সাহিত্যে গদ্যে ও পদ্যে রচিত একজাতীয় লেখাকে প্রবন্ধ বলিত। বাঙলা সাহিত্যে প্রবন্ধ শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত তাহা উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের ফলে সৃষ্ট হইয়াছে। প্রবন্ধ যে কোনো বিষয়বস্তু লইয়া বিবিধ রীতিতে রচিত হইতে পারে। ওআকারের ভাষায়,—

"Apparently there is no subject, from the stars to the dust-heap and from the amœba to man, which may not be

dealt with in an essay. Neither in respect of manner of treatment is the range much less wide."

[Hugh Walker : The English Essay and Essayists : London 1915 : p. 2]

প্রবন্ধের রূপবৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বোনামি ডোব্রী (Bonamy Dobre'e) লিখিয়াছেন,—

"Indeed the essay is the most varied form of writing. It can be descriptive, moralistic, whimsical, exhorting or pleadingly self-revealing, critical or historical ; it can be anything you like."

[Bonamy Dobre'e : English Essayists : London 1945 : p. 9]

অমূল্যচরণ সত্যকার প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ প্রধানত যুক্তিনির্ভর, মননশীল ও বিষয়নিষ্ঠ (Formal বা Objective)। এই দিক দিয়া তিনি রামমোহন, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, রাজকৃষ্ণ, হরপ্রসাদ, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখের সমধর্মী। বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধরাজি মুখ্যত তত্ত্বাশ্রয়ী, তথ্যনির্ভর ও চিন্তামূলক।

প্রবন্ধই লেখকের বক্তব্য প্রকাশের সর্বাপেক্ষা সরাসরি মাধ্যম এবং সেইজন্য ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ ইহার বিশেষ গুণ। খ্রীস্টোফার বেনসন (Christopher Benson) তো স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন,—

"An essay is a thing which some one does himself ; and the point of the essay is not the subject, for any subject will suffice, but the charm of personality"

[C. H. Lockitt Ed. : The Art of the Essayist : London 1954 : p. 139.]

বেনসনের এই মত পুরাপুরি মানিয়া লওয়া যায় না। ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ বিশেষভাবে অভিপ্রেত হইলেও যে বিষয়ের আশ্রয়ে তাহা ব্যক্ত হয় তাহার গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

অমূল্যচরণের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিস্বরূপের সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়াছে। প্রচুর তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশ ও বিচারবিশ্লেষণের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিস্বরূপকে অনুভব করা যায়। তিনি জোর করিয়া কোনো সিদ্ধান্তকে পাঠকের উপর চাপাইয়া দেন না, সুকৌশলে যুক্তিসহকারে তথ্যবিন্যাস করিয়া পাঠকের পক্ষে তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ রচনা করেন।

বাহান্ন

বর্তমান গ্রন্থের কোনো কোনো প্রবন্ধ, যেমন 'অগ্নি', 'বিষ্ণু', 'অথর্ববেদ', 'নাথপন্থ', 'ভারতীয় নাট্যশালার গোড়ার কথা' প্রভৃতি তথ্য ও তত্ত্বের ভারে কিঞ্চিৎ ভারাক্রান্ত মনে হইলেও বিষয়ের বিস্তার ও গভীরতার বিচারে এই ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে হয় এবং এই ধরনের গবেষণামূলক প্রবন্ধে তথ্যের চাপ সহ্য করিবার জন্য সহৃদয় পাঠকমাত্রই অনেকাংশে পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকেন। অমূল্যচরণ ভারতীয় মানসের অধিকারী। তাঁহার বাঙালীত্বও এই ভারতীয়ত্বের অঙ্গীভূত। আবার তিনি ভারতীয় তথা প্রাচ্য সমস্ত কিছুকেই ইওরোপ ও অন্যান্যদেশের বিষয়বস্তুর সহিত যাচাই করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রতিপাদনে যত্নবান ছিলেন। তাঁহার এই ব্যক্তিস্বরূপ এই গ্রন্থের অনেক প্রবন্ধের মধ্যেই পরিস্ফুট। তাঁহার রচনা অযথা আড়ম্বররহিত, প্রাঞ্জল, সাবলীল, যুক্তিনির্ভর ও বিষয়নিষ্ঠ। একসঙ্গে এতগুলি গুণের সমাবেশ সুদুর্লভ। ডোব্রী ইংরেজী সাহিত্যের বিখ্যাত প্রবন্ধাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন।

"...at their best they are little gems of literature which give delight by their form, by what they have to tell us, and by the spirit they convey."

[Bonamy Dobre'e : English Essayists : p. 9]

অমূল্যচরণের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধাবলী সম্পর্কে এই উক্তি বহুলাংশে সত্য।

॥ ৪ ॥

অমূল্যচণের অমূল্য রচনাবলী সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের মধ্যেও যে আগ্রহ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা বিশেষ আনন্দ ও আশার কথা। ১৩৬৯ সালের আশ্বিন মাসে ভারতী লাইব্রেরী অমূল্যচরণের দশটি প্রবন্ধের একটি সংকলন 'প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য' নামে প্রকাশ করেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রসারকল্পে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত ও সুলভ মূল্যে প্রচারিত হয়। গ্রন্থটি রসিকমহলে অত্যন্ত সমাদরের সহিত গৃহীত হওয়ায় বর্তমান বৃহদায়তন সংকলনটি প্রকাশে উৎসাহী হওয়া গিয়াছে। ভারত সরকার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং সেইজন্যই ইহার সুলভ মূল্য সম্ভবপর হইয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থে অমূল্যচরণের মাত্র একান্নটি প্রবন্ধ গ্রথিত হইয়াছে। এইগুলি ছাড়াও তাঁহার বহু প্রবন্ধ পত্রপত্রিকাদিতে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থটি সম্পর্কে সুধী সমাজে প্রত্যাশিত আগ্রহ দেখা গেলে অমূল্যচরণের আরও একটি সংকলন বাহির করিবার বিষয় চিন্তা করা হইবে।

অমূল্যচরণের প্রতিভাদীপ্ত জীবনের সহিত পাঠকদিগকে পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে এবং সেটিকে 'ভূমিকা'র আগে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয় করিয়া এই সংকলনের 'সংস্কৃতি ও সাহিত্য' এবং 'ধর্ম, দর্শন ও সম্প্রদায়' পর্যায়ের প্রবন্ধগুলির সম্পাদনায় সাহায্য ও পরামর্শ দান করিয়াছেন। তাঁহার ঋণ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থটির সম্পাদনায় শ্রীঅশোক গুহের অভিজ্ঞ পরামর্শ আন্তরিক উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীতুলসী দাসের সহৃদয় সহযোগিতা ও সাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পরিশেষে এই বিপুলায়তন মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শ্রীঅবিনাশ সাহা একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করিয়াছেন এবং সেইজন্য তিনি অবশ্যই সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।

কলকাতা
১৪ই ভাদ্র, ১৩৭২ সাল
(৩০শে অগস্ট, ১৯৬৫)

সুশীলকুমার গুপ্ত

সংস্কৃতি ও সাহিত্য

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা বলিতে হইলে নানা কথারই আলোচনা আসিয়া পড়ে; ব্যাপারও বিরাট হইয়া উঠে। প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ের অবতারণা না করিলে বিষয়টিও পরিস্ফুট হয় না। কাজেই সর্বপ্রথমে দিগ্‌দর্শন হিসাবে কয়েকটা কথা বলিব। পরে মূল বিষয়ের সূচনা করিব।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই যে মানবজাতি বিভক্ত হইয়া গিয়াছে তাহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। আর্য, নিগ্রো, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিভাগের পশ্চাতে নৃতত্ত্বও বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের সংস্কৃতি (culture) ও সভ্যতার (civilisation) বৈশিষ্ট্যও অস্বীকার করা যায় না। ভৌগোলিক সংস্থানের ফলে দীর্ঘ যুগ যাপন করিয়া বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড মানবসমাজে এক একটি সংস্কৃতি—তথা সভ্যতা বিশিষ্ট সত্তা বা ব্যক্তিত্ব লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই মানব-সমাজের আকৃতির বৈশিষ্ট্য যেমন অস্বীকার করা সম্ভব নয়, তেমনি তাহার প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যও অবশ্য স্বীকার্য।

আবার সকল মনুষ্যের মধ্যে এমন একটি সাধারণ বস্তু আছে যাহা মানুষকে অন্য সকল জীব হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে; তাহা মানব-মনের সর্বসাধারণত্ব। আর ইহাই বিশ্বমানবতার নিদানভূত।

একটা জাতিকে সাধারণ মনুষ্যজাতি হইতে পৃথক করিয়া বিশেষ নামে যে অভিহিত করি তাহার নীতি হইতেছে এই যে, সকল মনুষ্যসমাজ হইতে এক একটি বিশেষ অংশ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ খণ্ডে প্রাচীনকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। ফলে, এক একটি বিশেষ অংশের

অনুষ্ঠান ও ধর্মের স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাই এক একটি জাতির ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য বা সংস্কৃতি। এই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বহু ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে পরস্পরের ঐক্য ও সাধারণত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। এক জাতি যাহা ভাবিয়াছে, অন্য জাতিও হয়তো সেই একই ভাবনা করিয়াছে ; এক জাতির সমস্যা হয়তো অন্য জাতির সমস্যার সঙ্গে অনেকাংশে মেলে, তাহার সমাধানেও হয়তো অদ্বিতীয়ত্ব নাই ; কিন্তু একটি জাতির চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্বত্ব থাকিবেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল দেশেই আছে, অথচ তজ্জন্য পরিচ্ছদ, আবাস, আহার ইত্যাদি পৃথিবী জুড়িয়া এক নয়। ইহাদের পার্থক্য অসামান্য। দেশ-কাল-পাত্রে এই সমস্যার রূপের বিশেষ হের-ফের হইয়াছে। চিন্তার ক্ষেত্রে ইহা আরও বেশী সত্য। বিভিন্ন দেশের প্রশ্ন হইয়াছে বিভিন্ন, সমাধানেও বিভিন্ন। বাহ্য জীবনের বৈচিত্র্য অপেক্ষা অন্তর্জীবনের বৈষম্য এত অধিক তীব্র যে কল্পনাই করা যায় না, তাই অন্তর্জীবনের এই বৈষম্য বা ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই একটি বিশেষ জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি টিকিয়া থাকিতে পারে।

পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। অধুনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নূতন সভ্যতার মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার কোন কোন রেশ আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের নিকট তাহার প্রাত্যহিক জীবনে ইজিপ্ট, বাবিলোনিয়া, আসিরিয়া বা মায়া-সভ্যতা মৃত। এমন কি গ্রীস রোমও যেন প্রত্নাগারে স্থান হইয়াছে। ইহাদের সভ্যতা মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে মরিয়া গিয়াছে। আজ অতীতের বক্ষের কঙ্কাল-পঞ্জর দেখি, দেখিয়া বিস্মৃত হই, উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করি—সে প্রশংসা এমন কি কাব্যের আকারও পাইতে পারে, তাহা কোন শিল্পীর অনুপ্রেরণাও যোগাইতে পারে। কিন্তু মানুষের জীবনে তাহার স্থান ও সার্থকতা কোথায় ?

সকল প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে মাত্র একটি বাঁচিয়া আছে। সেই অদ্বিতীয় গৌরবের স্থান ভারতীয় সভ্যতার। অন্যদেশে অন্য যে সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল তন্মধ্যে এমন প্রেরণা ছিল না, এমন গভীরতা ছিল না, যাহার ব্যাপকতা এত বেশী। সে সকল সভ্যতার সমস্যা ছিল সাময়িক, তাহাদের চিন্তা বর্তমানকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেখানে পরের সভ্যতা নূতন কথা লইয়া আসিয়াছে, পরের চিন্তা নূতন আলোক লইয়া আসিয়াছে, সেই নূতন বাণীকে বাধা দিবার মত শক্তি পুরাতনের ছিল না। সে সমস্ত পুরাতন সভ্যতা ছিল মাত্র পাথরের—ইটের সভ্যতা—সেনাবাহিনীর সভ্যতা। বাহ্যজীবনের বহু প্রয়োজনের, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের, আরামের বন্দোবস্ত তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু অন্তর্জীবনের গূঢ় সমস্যার—সত্যকার জীবন-সমস্যার কোন বাণী সে-সকল সভ্যতায় নাই। প্রাণহীন এরকম বস্তু সভ্যতা বাঁচিতে পারে না। ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন ছিল বলিয়াই সে ইহাকে 'আধ্যাত্মিক' বলিয়া কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত অধরপ্রান্তে একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছেন। ইহার বস্তু সভ্যতার অংশ কতটা তাহা এখানে বিচার্য নয়। কিন্তু এটুকু বুঝিতে হইবে যে, ইহা বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়াই বাঁচিয়াছে। মাত্র এই সভ্যতার আত্মা আছে—তাই সে মরে নাই।

ভারতের চিন্তা পৃথিবীর বস্তুতেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। বস্তুর আশ্রয় যাহা, বস্তুর অতীত যাহা তাহারই সন্ধান সে পাইয়াছে। ভারত রূপের মধ্যে অরূপের সাধনা করিয়াছে। নশ্বর ভঙ্গুরকে অতিক্রম করিয়া ভারতের সাধনা হইতেছে শাশ্বত নিত্যের। এই জগতের প্রাণের সন্ধানে তাহার যাত্রা। অমৃতের পথ পাইয়া সে চলিয়াছে। ভারতে জীবন অতি দীর্ঘ সাধনা—অবিদ্যা হইতে মুক্তির সাধনা, বিদ্যার আবির্ভাবের সাধনা।

ভারতবর্ষে লেখাপড়া ও সংস্কৃতি কোন দিন এক বস্তু বলিয়া

বিবেচিত হয় নাই। সংস্কৃতি ভারতের অন্তরের বস্তু, অক্ষর পরিচয়ে সাহিত্য-জ্ঞান কোন দিন তাহার জ্ঞাপক ছিল না। এদেশে বিদ্যা কখনও academic ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বিদ্যা তাহার অন্তরের সামগ্রী। দর্শনও কোন দিন বুদ্ধির পরিচয়-জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই—ইহা ছিল ভারতবাসীর প্রাণস্বরূপ। দর্শন ও ধর্ম কোন সময়ে এদেশে দুটি পৃথক্ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ধর্মের গোড়ার কথাটি হইয়াছে সর্ববস্তুর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ; সর্ববস্তু একটি অখণ্ড পূর্ণত্বের প্রকাশ মাত্র। তাহার macrocosm ও microcosm ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চতুঃষষ্টি শিল্পকলাও ধর্মের বাহন হইয়াছে। শিল্পকলা গ্রন্থেরও তাই নাম হইয়াছে শাস্ত্র। ধর্মের মত ব্যাপক শব্দও ভারতীয় ভাষায় আর নাই। ধর্ম সকলের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে তাহা সকলকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, সুতরাং এ-দেশে (ভারতে) কোন বিদ্যা watertight compartment-এর মত হয় নাই। সর্ববিদ্যার শেষ বাণীই ধর্ম; তাহাদের মধ্যে কোন বিভাগ বা বিদ্বেষ ঘটে নাই। ভারতে প্রাচীন যুগে তাই ধর্মকে বাদ দিয়া কাব্য হয় নাই, স্থাপত্য হয় নাই, শিল্প-সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের শিল্পে বিদেশীরা বস্তুতন্ত্রের অভাব বোধ করেন। সত্য বটে, বাস্তবের সঙ্গে আমাদের শিল্প মেলে না। কিন্তু সাধনার দিক দিয়া দেখিলে কোন গোল-যোগও থাকে না। ভারতে concrete-এর মধ্য দিয়া abstract-এর রূপের মধ্য দিয়া অরূপের সাধনা। লিঙ্গ-পূজার মধ্যে আমরা ইহারই সাক্ষাৎ পাই; মূর্তিপূজার অবিকল নিছক মনুষ্য মূর্তি যে দেখি না তাহারও ব্যাখ্যা ইহাই। ভারতে abstractকে মূর্তি দিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে, তাই তাহা concrete-এর হুবহু নকল হইতে পারে না।

অতি প্রাচীন যুগেই আমরা পরিব্রাজকদের কথা শুনিতে পাই। চির-পথিক তাঁহারা। দেশ-দেশান্তরে বিরামহীন যাত্রার ব্রত তাঁহারা

গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের সাধনার ফল তাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। দরিদ্রতম কৃষকের কুটীরেও তাঁহাদের গতি, রাজ-অতিথিও তাঁহারা। তাই প্রাচীন যুগে গ্রামে গ্রামে এই পরিব্রাজকদের জন্য কুটাহনশালার অস্তিত্ব। গ্রামবাসীরাও কুটাহনশালার গর্বে গৌরব বোধ করিয়াছে। যেখানে ইহাদের বিচার-সভা বসিত সেখানে ইহারা গ্রামবাসীদের উপদেশ দিতেন। রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে কি সাহায্য করিয়াছে তাহা আজও নিরূপিত হয় নাই। প্রতি ভারতবাসীর মর্মে ইহারা প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। ভারতের অষ্টাদশ পুরাণকথা ভারতেরই মর্মকথা।

অতি প্রাচীন যুগে আমরা যাত্রা ও কথকতার পরিচয় পাই। এ-গুলি যে কত বড় শিক্ষার বাহন তাহা আজও আমরা বুঝি নাই। নিরক্ষর কৃষকের মুখে কত অজানা সাধক-কবির যে-গান আজও শুনা যায় তাহা দর্শনের গভীরতম মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা। চর্যাপদ, দেহতত্ত্ব, বাউল, ভাসান, মঙ্গল-গান প্রভৃতি সংগীত এ-যুগেও কত শত বৎসর ধরিয়া নিরক্ষরদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ভারতের বারব্রতও সেই প্রাচীন সংস্কৃতি বহন করিয়া আসিয়াছে। শিক্ষা ও লেখাপড়া এক বস্তু নয়—এ কথাটি যদি একবার উপলব্ধি করিতে পারি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমাদের নিরক্ষর গ্রামবাসীদের মত শিক্ষিত গ্রামবাসী পৃথিবীতে আর নাই।

ভারতবর্ষে আর্যদের কেমন করিয়া দেখা পাওয়া গেল সে প্রশ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মীমাংসা আজও হয় নাই। তবে আদিম যুগের কয়েকটি আর্য-দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সুদূর বোগাসকুই-শিলালিপিতে। তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে এবং বাবিলনের কাসাইটদের দলীলপত্রে। কাসাইটরা হিমালয়ের (সিমলিয়ার) উল্লেখ করিয়াছে। মিটানিদের সহিতও আর্যদের সম্পর্ক ভারতবর্ষে আর্যাগমনের পূর্বে হইয়াছিল, একথা এখন আর বলা চলে না।

তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে সংস্কৃত নাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বোগাসকুই-লিপিতে সংস্কৃত সংখ্যা আছে। ভারতবর্ষের সহিত এসিয়া-মাইনরের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল। সেই সুদূর দেশে হিন্দু দেবতারা শান্তি দেবতারূপে দেখা দিয়াছেন। শান্তির বাণী লইয়াই ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়। শান্তিই ভারতের সনাতন বাণী, শান্তিই ভারতীয় সংস্কৃতির যথার্থ প্রতীক। সেযুগের অপর সকল সভ্যতার আন্তর্জাতিক পরিচয় গ্রহণ করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, সে-পরিচয় তাদের লুণ্ঠনে। যে লুণ্ঠন হয় ব্যবসাচ্ছলে, নয় প্রকাশ্য সৈন্যবলে।

মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত সুমেরীয় সভ্যতার একটা সহজ ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে। মার্শাল (A.S.I., A.R.1923-24) বলিয়াছেন, সিন্ধু-উপত্যকায় যে-সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার উৎপত্তি, অতিবৃদ্ধি ও পরিণতি ঐ-স্থানেই রহিয়াছে। নীল নদীর তীরে ফারওয়াদের সভ্যতার মতে উহা ঐ-স্থানের একান্ত সম্পত্তি। আর মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয় সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে বেশ ধারণা করিতে পারা যায় যে, ভারতবর্ষের অঙ্কপ্রদেশেই ঐ সভ্যতার আদি ভূমি, এবং বাবিলন, আসিরিয়া ও পশ্চিম-এসিয়ার সাধারণ সংস্কৃতি পরে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়া বদ্ধমূল হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির দ্রবিড়ীয় অংশের ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই। কিন্তু ইহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার তাহা অস্বীকার করা যায় না। দ্রবিড়ী রক্তের মত সেই সংস্কৃতি আর্যসংস্কৃতির সহিত বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে। লিঙ্গপূজা, নাগপূজা, বৃক্ষপূজা, মাতৃকাপূজা প্রভৃতি দ্রবিড়ীয় ভিন্ন অন্য ব্যাখ্যায় এই সংস্কৃতিতে স্থান পাইতে পারে না। যজ্ঞস্থলে প্রতিমাপূজার ব্যাখ্যা দ্রবিড়ীয় বলিয়া সম্ভব হয়।

বেলুচিস্তানের দ্রবিড়ী ব্রাহুই ভাষা অনেক ব্যাপারেরই সূচনা

করে। আবার দ্রবিড়ীরও পূর্ব-নেগ্রিটো-সম্পর্কও প্রমাণিত হইতেছে।

বৈদিক যুগ হইতেই ইরানের সহিত ভারতের সম্বন্ধ। অশোকের সময় ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইরান-সম্পর্কের অকাট্য নিদর্শন পাওয়া যায়। মৈত্রী-বাণীর প্রচারক এই অশোক প্রথম প্রচার করিলেন—পৃথিবীবাসী সকলেই ভ্রাতা। ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বাণী আর নাই। তিনি পৃথিবী বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র এই বাণী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য। তাই সেই বিজয়ের তিনি নাম দিয়াছিলেন 'ধর্ম বিজয়'। তিনি চাহিয়াছিলেন বিশ্বের কল্যাণ। তিনি বলিয়াছিলেন—ধর্মের দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ জয়ই একমাত্র জয়।

খ্রীস্টপূর্ব শতকে প্রবল প্রতাপ মেনেন্দরকে একাগ্র ও ঐকান্তিক বৌদ্ধরূপে দেখি এবং বৈষ্ণব ভাগবতরূপে হেলিওডোরসের পরিচয় পাই। চীনে বৌদ্ধ প্রচারক মেলে, আর তথাকথিত গান্ধার-শিল্পে গ্রীক সংস্কৃতির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই যুগের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়—ভারতবর্ষ সকলকে গ্রহণ করিয়াছে, কত অজানাকে স্থান দিয়াছে। এমন সময় গিয়াছে যখন ভারতে পর-সংস্কৃতির একটা রাসায়নিক সংমিশ্রণ চলিয়াছিল। ইজিপ্ট, এসিয়া-মাইনর, পারস্য সকলের সহিতই ভারতের কোলাকুলি। তারপর পরের যুগে দলে দলে অসভ্য বর্বর আসিয়া ভারতের দুয়ারে হানা দিয়াছে। তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হয় নাই। ভারতবর্ষ শক, হুন, মোঙ্গল, পহ্লব, চীন সকলকেই গ্রহণ করিল। ভারতের অপূর্ব সবল সংস্কৃতিকে ইহারা নষ্ট করিতে পারে নাই, ভারতের আশ্চর্য প্রভাবে তাহারা গর্বিত 'হিন্দু' হইয়া গেল। ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অংশ ইহাদেরই কীর্তি—রাজপুতরূপে। দ্রবিড়ী অন্ধ্রসম্রাট্ গোতমীপুত্র শাতকর্ণি নিজেকে এক-ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব করিলেন, চতুর্বর্ণের সংমিশ্রণ বন্ধ করিয়াছেন

বলিয়া শিলালিপিতে অঙ্কিত করিলেন ; শক উসভদাত, রুদ্রদামা হিন্দুধর্মের প্রতিপালক হইলেন। সংস্কৃতির এমন বিরাট্ রাসায়নিক সংমিশ্রণ পৃথিবীর ইতিহাসে বড় ঘটে নাই। ভারতের উদারনীতিতে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্বন্ধ সকল দেশেরই হইয়াছে। আর ইহার পরেই ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ঐতিহাসিক উপকরণ জুটিতে আরম্ভ হইল। বৃহত্তর ভারতের সূচনা দেখা গেল। চীনে তো বহু পূর্বেই বৌদ্ধভিক্ষু গিয়াছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা বেজায় বাড়িয়া উঠিল। ভারতীয় নাবিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ছাইয়া গেল। বৌদ্ধভিক্ষু পৌঁছিল, ব্রাহ্মণও পৌঁছিল। এ-সব ঘটিল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষে। আফগানিস্তান পার হইয়া বৌদ্ধভিক্ষু মধ্য-এসিয়া ছাইয়া ফেলিল। চীন পার হইয়া তাহারা জাপানে দেখা দিল। ভারতের প্রতিবেশী তিব্বত, সেও বৌদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইল।

আর্য ও অনার্য

আর্য শব্দটি অতি প্রাচীন শব্দ। অনার্য শব্দে বুঝায় আর্যেতর। আর্য-সংস্কৃতির যাহা বাহিরে তাহাকেও অনার্য বলিতে পারা যায়। বর্তমান কালে আর্য এবং অনার্য—জাতি হিসাবে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু এই আর্য শব্দ বৈদিক যুগে কখনও জাতিবাচক ছিল না। ঋগ্বেদে আর্য শব্দের প্রয়োগ বত্রিশ বার* দেখিতে পাওয়া যায়। বত্রিশটি সূক্তে ভাষ্যকার সায়নাচার্য এই আর্য শব্দের নয় প্রকার অর্থ করিয়াছেন। যথা,—

(১) বিজ্ঞ যজ্ঞানুষ্ঠাতা

(২) বিজ্ঞ স্তোতা

(৩) বিজ্ঞ

(৪) অরণীয় বা সর্বগন্তব্য

(৫) উত্তম বর্ণ

(৬) ত্রৈবর্ণিক

(৭) মনু

(৮) কর্মযুক্ত, দেবোপাসক

(৯) কর্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ

দেখা যাইতেছে যে, আর্য শব্দ সর্বত্র শ্রেষ্ঠ জাতি বা সম্মানসূচক সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। আর্যেরা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন,

---

* ঋ° ১. ৫১. ৮; ১. ১০৩. ৩; ১. ১১৭. ২১; ১. ১৩০. ৮; ১. ৫৯. ২; ১. ১৫৬. ৫; ২. ১১. ১৮; ৩. ৩৪. ৯; ৪. ২৬. ২; ৪. ৩০. ১৮; ৫. ৩৪. ৬; ৬. ২২. ১০; ৬. ৩৩. ৩; ৬. ২৫. ২; ৬. ৬০. ৬; ৭. ৫. ৬; ৭. ৮৩. ১; ৭. ১৮, ৭; ৮. ২৪. ২৭; ৮. ১০৩. ১; ৯. ৬৩. ৫; ৯. ৬৩. ১৪; ১০. ৩৮. ৩; ১০. ৪৯. ৩; ১০. ৬৫. ১১; ১০. ৮৩. ১; ১০. ১০২. ৩; ১০. ১৩৮. ৩; ১০. ৮৬. ১৯; ১০. ৪৩. ৪; ১০. ৬৯. ৬; ১০. ১১. ৪।

অগ্নিপূজা করিতেন, যজ্ঞে স্তুতিপাঠ করিতেন, সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন।

অথর্ববেদে (৪. ২০. ৪ ; ১৯. ৬২. ১) 'সমগ্র মানব জাতি' অর্থে আর্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণগ্রন্থে আর্য শব্দ শূদ্রেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে বুঝাইত। এই তিন বর্ণই যজ্ঞ-ক্রিয়াধিকার প্রাপ্ত বলিয়া যে কেবল আর্য, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। এমন কি তাঁহারা শূদ্রের সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিতেন না; কোন প্রয়োজন হইলে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়া প্রয়োজন জানাইবার বিধি ছিল।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে আর্য শব্দের স্বল্প প্রয়োগ দেখা যায়। 'আর্যভূমি', 'আর্যদেশ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনু 'জাতি' অর্থে আর্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। নিরুক্তকার যাস্ক 'জাতি সংজ্ঞা' রূপে আর্য শব্দ ব্যবহার করিলেও 'আর্যঃ=ঈশ্বরপুত্রঃ' এরূপও দেখাইয়াছেন। নিঘণ্টুকার ঈশ্বরার্থে আর্য শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহা অর্য শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ঞ প্রত্যয় করিয়া আর্য=ঈশ্বরপুত্র এরূপ অর্থ করিয়াছেন। এই সময় আর্যগণ এরূপ জ্ঞানী, বিদ্বান্ এবং উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পন্ন ছিলেন যে, সেই শুদ্ধাত্মা বিমল ঋজুস্বভাব আর্যদিগকে "ঈশ্বরপুত্র" নামে অভিহিত করিয়া নিরুক্তকার আদৌ অত্যুক্তি দোষে দোষী হন নাই।

পাণিনি তাঁহার সূত্রবিশেষ (পা° ৬. ২. ৫৮) 'আর্যো ব্রাহ্মণ-কুমারয়োঃ' এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি অর্য শব্দের অর্থ যে 'বৈশ্য' ও 'স্বামী' তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। একটি সূত্রের বার্তিকে অর্য ও ক্ষত্রিয়ের পার্থক্যও বিশেষ করিয়া বুঝানো হইয়াছে।

ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে যে, আর্য শব্দ অর্য শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৈদিক সংহিতার পরবর্তী যুগে এই শব্দে বৈশ্যদিগকে বুঝাইত। কারণ, তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সমাজে

পুরোহিত ও সৈনিক ব্যতীত অপর সকলেই বৈশ্যভাবাপন্ন ছিলেন। বেদে মাত্র এক স্থানে শূদ্রেতর আর্য অর্থে অর্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৪. ৩০ ; ২০. ১৭) আর্য শব্দের এই একই অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। বাজসনেয়ী সংহিতার এক স্থানে (২৬. ২) ব্রাহ্মণ, রাজন্য ও শূদ্রের সহিত অর্থ শব্দের প্রয়োগ আছে। সুতরাং তথায় বৈশ্য ভিন্ন অন্য কোনও অর্য হইতে পারে না। লাট্যায়ন সূত্রে (৪. ৩. ৬) লিখিত আছে 'অর্যাভাবে যঃ কশ্চার্যোবর্ণঃ'। ভাষ্য যথা—'যদি বৈশ্যো ন লভ্যতে যঃ কশ্চার্যোবর্ণঃ স্যাৎ, ব্রাহ্মণো বা ক্ষত্রিয়ো বা'। শতপথ-ব্রাহ্মণেও (৮. ৪. ৩. ১২) এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে। Ludwig (Der Rigveda, iii. 213) ইহার অর্থ বৈশ্যই বুঝিয়াছেন। Zimmer (I. C. 11714, 204, 216, 435) এও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক যুগের পর 'বৈশ্য' ও 'কৃষক' অর্থে 'অর্য' শব্দ ব্যবহৃত হইত। শুক্ল-যজুঃ-সংহিতায় এই অর্য শব্দের প্রয়োগ কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। মহীধর ১৪. ৩০ সূত্রের ভাষ্যে 'স্বামী' ও 'বৈশ্য' অর্থই ধরিয়াছেন।

অবেস্তাপন্থীদের জে.ন্দ ভাষায় 'অইর্য' (Airya) আর্য শব্দের অর্থদ্যোতক। অইর্য বলিলে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বা সম্ভ্রান্ত (of good family, noble) বুঝাইত। ইহাদের ভাষায় আর্যেতর যদি কাহাকেও বুঝাইতে হইত, তাহা হইলে তাঁহারা অনইরান (Anairan) শব্দ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু এই অনইরানের বিপরীত শব্দ ছিল 'অইরান'। নিজেদের শ্রেণীকে বুঝাইতে হইলে ইহারা 'অইরান' শব্দ এবং আপনাদের শ্রেণীর বহির্ভূত কাহাকেও বুঝাইতে হইলে 'অনইরান' শব্দ ব্যবহার করিতেন। সম্ভবত এই জেন্দ ভাষা হইতে পরে গ্রীক ও রোমান ভৌগোলিকেরা অনিয়রকই (Aniarakai) বা লাটিন অনরিয়াকে (Anariacae) নামক মিডিয়া-বাসী জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের সময় এই বৈদিক আর্য শব্দের অরিয়, অয়্যির ও অয্য এই তিন প্রকার রূপ

ছিল। আর্যেতর বুঝাইতে তাঁহারা অনরিয় শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই অরিয় শব্দের অর্থ ছিল right, good, ideal, noble. আর অনরিয় বুঝাইতে undignified, uncultured প্রভৃতি বুঝাইত। বৈদিক যুগে যাহারা আর্য সংস্কৃতি মানিয়া চলিত না তাহাদের বিশেষ কোন নাম বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক সাহিত্যে শেষে যখন বেদের ব্যাখ্যা চলিতেছিল সেই সময় যাস্ক আর্য-সভ্যতা, আর্য-শিষ্টাচার বিগর্হিত কিছু বুঝাইবার জন্য বোধ হয় সর্বপ্রথম 'অনার্য' শব্দ প্রয়োগ করেন। তাঁহার উক্তি এইরূপ, 'কীকট নামদেশো অনার্যনিবাসঃ'—নিরুক্ত, ৬.৩২।

পরবর্তীকালে মনুসংহিতায়ও কয়েকবার 'অনার্য' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনার্য শব্দের ব্যাখ্যায় কুল্লূট ভট্ট ও মেধা তিথি অনার্য শব্দে জাতি বুঝিয়াছেন। কিন্তু মনুসংহিতার শ্লোক হইতে এইরূপ অর্থের কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত শ্লোকে অনার্য শব্দে আর্য সংস্কৃতি বহির্ভূত আর্যেতর শ্রেণীকেই বুঝাইয়াছে। আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকেও 'অনার্য' শব্দের প্রয়োগ পাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'অনার্য-জুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন'। টীকাকারগণের মধ্যে আনন্দগিরি 'অনার্যজুষ্ট' শব্দে বুঝিয়াছেন 'শিষ্টগর্হিতম্', শ্রীধরস্বামী বুঝিয়াছেন 'আর্যৈরসেবিতম্', নীলকণ্ঠ বুঝিয়াছেন 'ভীরুভিজুষ্টসেবিতম্', বিশ্বনাথ অর্থ করিয়াছেন 'সুপ্রতিষ্ঠিত লোকৈরসেবিতম্'; কেবল বলদেব ও মধুসূদন এই অনার্য শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'আর্যৈমুমুক্ষুভির্নজুষ্টং ন সেবিতম্'।

ঋগ্বেদে কৃষ্ণগর্ভ (১. ১০১), শিশ্নদেব (৭. ২১. ৫ ; ১০. ৯৯. ৩) শিম্যু (১. ১১৮ ; ৭. ১৮. ৫), ক্রব্যাদ (১০. ৮৭. ২.), ও কিমিদিন (১০. ৩৭. ২৪) প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে এই সমস্ত শব্দে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনার্য জাতি বুঝিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত যাতুধান (?) অযজ্বন, মূসদেব, ব্রহ্মবিস (?), দাস, দস্যু প্রভৃতি শব্দে অনার্য

বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে যাঁহারা আর্য ও আর্যেতর তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

বৈদিক যুগে যেমন আর্যগণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ঐ সময়ে আর্যেতরগণের অস্তিত্ব ছিল। এই আর্যেতরগণের ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য আর্যগণ হইতে অনন্যসাধারণ ছিল। শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি, সভ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের ধারা এবং ধর্ম, আচার ও অনুষ্ঠানের অবদান আর্য ও আর্যেতর এই পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই আর্য যাহা ভাবিয়াছে, আর্যেতর কোনও সম্প্রদায় হয়তো সে একই ভাবনা করিয়াছে, আর্যে সমস্যা হয়তো আর্যেতরের সমস্যার সহিত অনেকাংশে মিলিতে পারে, তাহার সমাধানেও হয়তো অদ্বিতীয়ত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু উভয়ের চিন্তার ধারা এবং সমাধানের ধারায় অপূর্বত্ব থাকিবেই। বৈদিক যুগের আর্য ও আর্যেতর সম্প্রদায়ের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে বৈদিকযুগের প্রকৃতির সন্ধান প্রথমে লইতে হইবে।

আর্য ও আর্যেতরগণ লইয়াই বৈদিক ভারত। ভারতবর্ষে আর্যদের কেমন করিয়া প্রথমে দেখা পাওয়া গেল যে সমস্যার সমাধান আজও ভাল করিয়া হয় নাই। ভাষাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতির সাহায্যে অনেক দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত বিপুল পরিশ্রম করিয়া আর্যদের আদি নিবাস স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অটো শ্রাডের (Otto Schrader) স্থির করিলেন, দক্ষিণ-রাশিয়া, জেয়াঁ দে মরগ্যান (J. de Morgan) দেখাইলেন সাইবেরিয়া, ডক্টর গাইল্‌স (Dr. Giles) প্রমাণ করিলেন—আর্যদের আদি নিবাসের পূর্ব সীমান্তে কার্পেথিয়ান। দক্ষিণ সীমা বলকান, পশ্চিম সীমা অস্ট্রিয়ান আল্‌পস্‌ ও উত্তর সীমা এর্জগেবির্গে। এইরূপ কেহ দেখাইলেন এসিয়া-মাইনর কেহ বা বলিলেন

ভারতবর্ষ। আর্যরা যে বাহির হইতে আসিয়াছেন এই মত প্রায় সকলেই একরূপ নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন। মানিয়া লইবার পক্ষে বা বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে, সেগুলি বড়ই ফাঁকা—চূড়ান্ত তো নয়ই।

ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যে যথেষ্ট তাহা অস্বীকার করা চলে না। আর্যদের যে একটা প্রাচীন আবাসস্থল ছিল ইহারই দু'এক জায়গায় তাহার একটু ইঙ্গিত আছে। তাঁহাদের সেই প্রাচীন নিবাসভূমি—বেদের 'প্রত্ন ওকঃ' ভারতের ভিতরে কি বাহিরে তাহা বুঝিবার কোনই উপায় নাই। তাঁহারা যে বাহির হইতে আসিয়াছিলেন তাহার একটিও প্রমাণ বেদে নাই। বরং কতিপয় জাতিকে তাঁহারা ভারতের বাহিরে পশ্চিম দিকে বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে আছে (৭.৫.৬)। যাহা হউক, আর্যরা ভারতবাসী হউন অথবা বাহির হইতে আসুন তাঁহাদের সংস্কৃতি বা culture সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঋগ্বেদ যে শুধু আর্য-সংস্কৃতির ক্রমপরিণতির ইতিবৃত্ত নির্ণয়ে সহায়তা করে তাহা নহে, এইগুলি হইতে আমরা সেই সময়ের আর্য-অধ্যুষিত স্থানাদি-সম্বন্ধেও অনেক সন্ধান পাইতে পারি। ইহাতে কতকগুলি স্থানের ভৌগোলিক বর্ণনাও পাওয়া যায়। সেই সকল বর্ণনা রাবি নদীতীরস্থ প্রদেশকে নির্দেশ করে। রাবির তীর হইতে পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তানকে কেন্দ্র করিয়া যে আর্যসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। কয়েক বর্ষ পূর্বে সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে 'মোহেঞ্জোদড়ো'কে কেন্দ্র করিয়া সকল ধ্বংসস্তূপ হইতে যে সমস্ত প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার হইয়াছে সেগুলি ঋগ্বেদের সূক্তগুলির উক্তিরই প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি অন্তত খ্রী-পূ° ৩০০০ বর্ষ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার সাক্ষ্য দেয়। এই আবিষ্কারগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন পরিচয় কি না সে-সম্বন্ধেও

কথা উঠিয়াছে। মোহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি স্থানে ভূগর্ভ খননে যে সমস্ত মন্দির ও অট্টালিকার উদ্ধার হইয়াছে বিশেষজ্ঞদের মতে সেগুলি শুধু একটি যুগের সাক্ষ্য দেয় না, ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে সঞ্চিত বিভিন্ন যুগের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের পরিচয় দিয়া থাকে। বিশেষত এইগুলি যে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিরই পরিচায়ক সে-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এক মত প্রকাশ করিয়াছেন। মোহেঞ্জোদড়োর মন্দিরগুলির সহিত পরবর্তীকালের দ্রবিড় পদ্ধতির মন্দিরগুলির সাদৃশ্য আছে। সুল্ব ও বৈখানস-সূত্রানুযায়ী যজ্ঞবেদীর আদর্শে কল্পিত মন্দিরের অনুযায়ী হরপ্পার একটি মন্দিরও রহিয়াছে। এ ছাড়া ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন দ্রব্যগুলি ভারতীয় ইতিবৃত্তের অনেক উপকরণ যোগাইয়াছে।

আবিষ্কৃত মন্দিরগুলি হইতে অনেকগুলি চক্রাকার প্রস্তর, বিভিন্ন প্রকার দাবার ঘুঁটি, বিভিন্ন জন্তুর মূর্তি-ক্ষোদিত ফলকাদি, আসবাবপত্র, অলঙ্কার, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রপাত্রাদিও পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির সহিত ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ বর্ণিত দ্রব্যাদিরও সাদৃশ্য আছে। ঐতিহাসিকগণ ইহাকে তাম্রযুগের নিদর্শন বলিয়া নির্দেশ করেন। মন্দিরগুলিতে কূপ ও স্নানাগার প্রভৃতি সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে। আবিষ্কৃত এই মন্দিরগুলি তখনকার সভ্যতার সুন্দর চিত্র। ঋগ্বেদে আর্য ও দস্যুগণের প্রাসাদগুলির যে বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহার সঙ্গে মোহেঞ্জোদড়োর মন্দিরগুলি সাদৃশ্য বড় কম নয়।

এই সকল স্থানে অনেকগুলি প্রতিমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি আর্য ও দ্রবিড় সভ্যতার নিদর্শন। ড° হলের ধারণা, ভারতীয় মৃৎশিল্পে সুমেরীয়-পূর্ব (pre-sumerian) প্রভাব পড়িয়া ছিল; কিন্তু এ ধারণা অমূলক। আবিষ্কৃত মৃৎশিল্পের নিদর্শন ও মূর্তিক্ষোদিত ফলকগুলিতে আর্য ও দ্রবিড় চিহ্নই বর্তমান।

তদানীন্তন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বাবিলন ও ভূমধ্যসাগরের

পূর্বতীরস্থ অনেক প্রদেশের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের মধ্যেও আর্য ও দ্রবিড়ের যে সম্বন্ধ তাহা লক্ষ্য করা যায়।

আর্য ভিন্ন অন্য জাতির মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রবিড় জাতির দান বড় কম নয়। প্রাচীন দ্রবিড়-সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে আর্যভাবশূন্য। আর্যদের সহিত ইহাদের সমাজগঠনেরও পার্থক্য রহিয়াছে। দ্রবিড়-সমাজে মাতৃপক্ষ পরিবার হইতে পরিবার গঠিত, আর্যসমাজে কিন্তু পিতৃপক্ষ হইতে পরিবার গঠিত। তথাকথিত 'অসুর' সমাজের সহিত দ্রবিড় সমাজ গঠনের অনেকটা মিল আছে। আর্যগণ যাহাকে ময় অসুর বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন সেই ময়ই দ্রবিড়-সভ্যতার বিজ্ঞান সাধনার চরম সাক্ষ্য-দান করিতেছে। পূর্ত ও স্থপতি-বিদ্যার আর্য আদর্শ বিশ্বকর্মা, দ্রবিড় আদর্শ ময়দানব।

সুমেরীয়, কাল্ডীয়, ঈজীয় ও মিশরীয় সভ্যতার উপর দ্রবিড় প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। দ্রবিড় জাতি নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, দ্রবিড় ভাষায় তাহার পরিচয় রহিয়াছে। সংস্কৃত নৌ-সম্বন্ধীয় শব্দাবলী দ্রবিড় ভাষা হইতেই গৃহীত। এই দ্রবিড় জাতি যে বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণই নাই। অতি প্রাচীনকালে যে ভারতবর্ষ ও মেসোপোটেমিয়ার যোগাযোগ ছিল ২১০০ খ্রী-পূ°-র একখানি ফলক ও অন্যান্য নিদর্শন হইতে তাহা প্রমাণিত হয়। কয়েক বৎসর হইল প্রত্নানুসন্ধানে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ছয়জনকে ভারতের বাহিরে অতি দূরদেশে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, নাসত্য, সূর্য ও মরুৎ—এই ছয়জন দেবতার উল্লেখ আছে বোগাসকুই-শিলালেখে, তেল-এল-অমরনার পত্রাবলীতে এবং বাবিলনের কাসাইটদের রেকর্ডসমূহে। মিটানি রাজ্যের সহিত আসিরীয় রাজ্যের যুদ্ধ ব্যাপার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তেল-এল-অমরনার হইতে তুস্রত্ত যে পত্রগুলি মিশরের তৃতীয় অমেনহোতেপ লিখিয়া-

ছিলেন সেগুলি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির সময় বোগাসকুই-লিপির সময়ের অনুরূপ। এই পত্রগুলিতে উত্তর-পশ্চিম মেসোপোটেমিয়ার মিটানি জাতির উল্লেখ আছে। এখানে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম পাওয়া যায়। এই রাজাদের মধ্যে তুস্‌রত্ত, অর্ততম, সুত্তর্ন, অর্তসুমর প্রভৃতি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও নাসত্যের পূজা করিতেন। এগুলি যে আর্য নাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তারপর পাঁচ শত বৎসর কাশীয় জাতি (১৭৪৬-১১৬০ খ্রী-পূ°) মিডিয়া হইতে গিয়া সমগ্র বাবিলন অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরও রাজাদের এবং দেবতাদের নাম আর্য নাম। ইঁহাদের সুরিয়স্‌ ও মরীতস্‌ সূর্য ও মরুৎ। সিমলিয় আর্যদের হিমালয়। দেখা যাইতেছে, কাসাইটরা হিমালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং মিটানির সহিত আর্যদের সম্পর্ক ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্বে, এই পুরাতন ভ্রান্ত ধারণা আর টিকিতে পারে না। আর্যদের ধর্ম পারস্যের মধ্য দিয়া এসিয়া-মাইনরে যায় নাই। ভারত হইতেই আর্য ধর্ম বরাবর এসিয়া-মাইনরে গিয়াছে। এই অভিগমনে পারস্যের মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজনও হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে এই দেবতাদের নামগুলিতে পারস্যদের ভাষার অন্তত একটু ছিটে-ফোঁটাও থাকিত। পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে, অমরনার পত্রাবলীতে দেবতাদের নামগুলি আদৌ ম্লেচ্ছিত হয় নাই। সেগুলিতে ভারতীয় রূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পারস্য মধ্যস্থ থাকিলে খ্রী-পূ° ১৪শ শতকে এমন কি ১৭৬০ খ্রী-পূর্বাব্দেও তুস্‌রত্ত ও সুতর্ন প্রভৃতি শব্দগুলিকে অম্লেচ্ছিতরূপে দেখিতে পাইতাম না। বোগাসকুই-লিপিতে যে সমস্ত সংখ্যাবাচক নামের উল্লেখ আছে তাহাদের সহিত বৈদিক সংখ্যা নামের সাক্ষাৎ সাদৃশ্য আছে। এছাড়া বৈদিক শব্দের সহিত কয়েকটি শব্দেরও বেশ মিল আছে। এই সুদূর প্রদেশে আর্য দেবতারা শান্তির ভাবই প্রকটিত করিয়াছেন। আর শান্তির এই বাণী লইয়াই ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচয়।

ইরানী জাতিও সম্ভবত ভারত হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহারাও বেদবর্ণিত অসুর জাতির সমপর্যায়ভুক্ত। বেদ ও অবেস্তার আলোচনায় ঋগ্বেদকেই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বেদের অনেক আখ্যানের সঙ্গে অবেস্তার আখ্যানের সাদৃশ্য আছে। তাহাদের ক্ষৌরকর্মের প্রণালী, পরিধেয়ের পদ্ধতি, তাহাদের জয়ধ্বনি-সূচক শব্দের সহিত আর্যদের অনেক মিল আছে। যণ্ড, মর্ক, বেরেত্রেয়, ত্রেতন—অথর্ববেদের যণ্ড, মর্ক, বৃত্রঘ্ন, ত্রিতআপ্ত্য। বেদ-পন্থী ও অবেস্তাপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ পূর্বে এক স্থানে এক সঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহারা যেখানে থাকিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে 'স্বর্গ' বলিতেন। বেদপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে 'দেব' বলিতেন ও অন্য দলকে 'অসুর' নামে পরিচিত করিতেন। তখন দেব ও অসুর 'ঈশ্বর' (Lord) অর্থেই প্রযুক্ত হইত। দেব ও অসুরদের মধ্যে পরস্পর বেশ মিল ছিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃব্য বলিয়া বুঝিতেন। সহোদর ভ্রাতা না হইলে তখন 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া পরিচয় দিবার কথা ছিল। এখন যেমন পিতৃব্য বলিলে বাপ না বুঝাইয়া খুড়া, জেঠা বুঝায়, তখন তেমনি ভ্রাতৃব্য বলিলে সহোদর ভ্রাতা না বুঝাইয়া অপর সকলকে বুঝাইত। ক্রমে উভয় দলের ধর্মমতের পার্থক্য ঘটিল। ভৃগু অগ্নিপূজার প্রবর্তন করিলেন। দেবগণ যজ্ঞ করিতে শুরু করিলেন। প্রথম প্রথম অসুররাও তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা যজ্ঞে রাজি হইলেন না। শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, দেব বলিলে যজ্ঞকারী মাত্রই বুঝাইত। শতপথ-ব্রাহ্মণ (১. ৫. ৫. ২৬) তাই দেবের সংজ্ঞা দিয়াছেন—'যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ'। অসুরেরা সারা বৈদিক সাহিত্যে স্বর্গবাসী। প্রথম প্রথম 'অসুর' শব্দ বৈদিক যুগে দেবতাদের নিকট খুব শ্রদ্ধা-বাচক, মর্যাদাব্যঞ্জক ছিল। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যাঁহারা খুব বড় হইতেন, তাঁহারা অসুর উপাধিতে ভূষিত হইতেন। মরুৎ, দ্যৌঃ, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পুষা, সবিতা, পর্জন্য—ইহারা সকলেই

বেদে সম্মানসূচক 'অসুর' পদবাচ্য ছিলেন। ইহাদের অলৌকিক শক্তি ছিল বলিয়া ইহাদিগকে বৈদিক ঋষিরা অসুর বলিতেন।

বেদে ১৫০ বার অসুর শব্দ আছে। সবই ভাল অর্থে প্রযুক্ত। কেবল ১৫ বার দুষ্ট অর্থে প্রযুক্ত। যতদিন দেব ও অসুর মিল ছিল, ততদিন 'অসুর' বলিলে মর্যাদা, প্রভাব বুঝাইত। কিন্তু যখন মনের অমিল হইতে লাগিল তখন উভয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ ভুলিয়া গেলেন। উভয় দলে বেশ শত্রুতাও চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম এক এক জন অসুরের সঙ্গে এক এক জন দেবতাদের যুদ্ধ হইত। শেষে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একদল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে গোড়ায় অসুররা দেবতাদের জ্বালাইয়া মারিতেন। শেষে দেবতারা বহু কষ্টে ছলে-কৌশলে জয়ী হইলেন। এই সম্পর্কে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের উদাহরণ খুব প্রসিদ্ধ। যুদ্ধের সময় দেব ও অসুর উভয়েই ইন্দ্রকে পাইবার জন্য, তাঁহার সাহায্যের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে (১. ৭. ১০) ইন্দ্র সম্পর্কে দেবতারা বলিয়াছেন—"অস্মাকংস্তু কেবলঃ'। অসুরদের বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবার জন্য ইন্দ্রকে তাঁহারা বার বার ডাকিয়াছেন (৮. ৮৫. ৯.)।

অগ্নি তাঁহাদের ভরসা দিয়াছিলেন যে, অসুরদের বিধ্বস্ত করিবার জন্য তিনি মন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিবেন (১০. ৫৩. ৪)। অসুরদের বড় বড় বীর ছিল। পিপ্রু অসুরের, শম্বর অসুরের অনেকগুলি দুর্গ ছিল। শম্বরের ছিল অন্তত ৯০টি (১. ১৩০. ৭) কিংবা ৯৯টি (২. ১৯. ৬)। বর্চী অসুরের লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ছিল। নিজেও তিনি খুব দুর্দান্ত। দেবতাদের অনেক সময় এই সব দুর্দান্ত অসুরদের উপর নির্ভর করিতে হইত (১০. ১৫১. ৩১)। যখন যুদ্ধ বাধিত ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য—দেবতাদের হইয়া যুদ্ধ করিতেন। ইন্দ্র অসুর পিপ্রুর দুর্গ নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন (১০. ১৩৮. ৩)। ইন্দ্র ও বিষ্ণু অসুর বর্চীর লক্ষ বীরকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন (৭. ৯৯. ৫)। অসুরদের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইন্দ্র

(৬. ১২. ৪), অগ্নি (৭. ১৩. ১) ও সূর্যের (১০. ১৭০. ২) নাম হইয়াছিল—'অসুরহা'। রুদ্র ছিলেন মহা অসুর (৫. ৪২. ১১), অসুররা তাঁহার ভক্ত ছিল। দেবাসুরের যুদ্ধের পর হইতে যখন দেবতারা অসুরদের একেবারে হটাইয়া দিলেন (১০. ১৫৭. ৪) তখন দেবতা অসুরদিগকে শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তাঁহাদিগকে 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন।

আমরা দেখিতে পাই, বেদে দস্যু, দাস—ইহাদের উল্লেখ আছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণত্বক্। বৈদিক দেবতাদের শ্বেতবর্ণ বলা হইয়াছে। এই দস্যুদের অনার্য বলা হয়। আর্য ও অনার্য এই যে দুইটি জাতি বলিয়া দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তজ্জন্য প্রধানত আমরা মনীষী ম্যাক্সমুলর-কেই দায়ী করিব।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ম্যাক্সমুলর 'আর্য' বলিয়া এক জাতির ধুয়া তোলেন। এই জাতিকে তিনি গৌরবর্ণ ও বিশিষ্ট সুসভ্য বলিয়া পরিচয় দেন। আর তাঁহার এই অভিমত সাধারণে বিশেষ আদৃত হইয়া পড়ে। ম্যাক্সমুলর বলেন যে, এই আর্য জাতি নানা দলে দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পশ্চিমে সভ্যতা বিস্তার করিতে করিতে ভারতবর্ষে, পারস্যে, আরমেনিয়ায় এবং ইউরোপের নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মতবাদের খুব প্রতিবাদ চলে। ফলে ভাষা এক হইলে জাতিও এক হইবে, এ সিদ্ধান্ত টিকিল না। শেষে ১৮৯১ খ্রী° ম্যাক্সমুলর নিজে যে ভ্রান্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লেখেন—"To me an ethnologist who speaks of an Aryan race, Aryan blood, Aryan eyes and hair, is as great a sinner as a linguist who speaks of a dolicho-cephalic dictionary or a brachycephalic grammar. It is worse than a Babylonian confusion of tongues, it is downright theft." কিন্তু তথাপি আজও জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ

আর্যজাতিরূপ মতবাদের মোহ ছাড়িতে পারেন নাই। এই মোহে পড়িয়া তাঁহারা ছয় প্রকার মতবাদকে ধ্রুবসত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে সেগুলির কোনটির মধ্যে সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের ছয়টি মতবাদ এই—

(১) ১২০০ খ্রী-পূ° গৌরবর্ণ এক যোদ্ধৃজাতি উত্তর-ভারত জয় ও অধিকার করে—ইহারা আপনাদিগকে আর্য নামে পরিচিত করিত।

(২) আর্যগণ দুইবার ভারত জয় করে। প্রথম বারে তাহারা আপন আপন স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া উত্তর-পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে প্রবেশ করে এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়া তথায় বসবাস করে। আর ইহাদেরই বংশে জাঠ ও রাজপুতগণ উৎপন্ন হয়। ইহাদের শারীরিক আকার ও গঠনে একটা বিশেষত্ব আছে। তারপর দ্বিতীয় বারে আর এক দল আর্য গিলগিট ও চিত্রলের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করে ও মধ্যদেশ জয় করে। এই আর্যেরা কিন্তু বর্বর জাতিদের মধ্য হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিয়া মিশ্র জাতি উৎপাদন করে।

(৩) যে সমস্ত বর্বর জাতিকে আর্যেরা একেবারে নষ্ট করিয়া দেয় অথবা বশীভূত করে তাহাদের নিতান্ত অসভ্যতার জন্য আর্যেরা তাহাদিগকে 'দস্যু' এই ঘৃণিত নামে পরিচিত করিত।

(৪) ভারতীয় আর্যগণ অসভ্য দস্যুদিগের সংসর্গ-হেতু বর্ণের আবিষ্কার করে।

(৫) বিজেতা আর্যগণ যে ধর্ম-বিশ্বাস নিজেদের সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহাই হিন্দু পুরাণ বলিয়া অভিহিত হয়।

(৬) এই আর্যেরা বৈদিক ভাষায় বাক্যালাপ করিত। এই ভাষাই বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর হইতে এবং মহারাষ্ট্র প্রদেশে এই সমস্ত জাতিকে আর্য করিয়া লইয়া অসভ্য জাতির ভাষাকে বিতাড়িত করে। এই জন্য এখানকার বর্তমান ভাষা বৈদিক ভাষা সঞ্জাত।

কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে ইহারা যথেষ্ট বাধা পায়। কাজেই এখনকার ভাষা প্রধানত নিজস্ব ভাষা বজায় রাখিলেও বৈদিক ভাষা হইতে ব্যুৎপন্ন কোন সংস্কৃত রীতির শব্দ ভাষায় প্রবেশ করে।

ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষায় অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্যই আর্যদের ভারত-বিজয়ের মতবাদ আবিষ্কৃত হয়। ১৭৮৬ খ্রী° স্যর উইলিয়ম জোন্স সপ্রমাণ করেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, জর্মান ও কেলটিক একটি বিশিষ্ট ভাষা হইতে ব্যুৎপন্ন। ১৮৩৫ খ্রী° বপ্ (Bopp) এই মতটি যুক্তিদ্বারা দৃঢ় করেন। ইহা হইতে এবং বৈদিক মন্ত্রের ভাষা ও অবেস্তার ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া স্থির হয় যে, বৈদিক ভাষা নিশ্চয়ই ভারতের বহির্ভূত অঞ্চল হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই পর্যন্ত ভিত্তিটা ছিল দৃঢ়।

তারপর প্রশ্ন হইয়াছে যে, বৈদিক ভাষা কেমন করিয়া ভারতে প্রবেশ করিল? বিজেতারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, এইটিই প্রচলিত মত। এই মতের পক্ষপাতীরা এই বিজয়ের প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। যদি আমরা ধরিয়া লই যে, বৈদিক ভাষা ভারতে প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পরেই বৈদিক মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে এই বৈদিক মন্ত্রগুলি হইতে কিছু কাজ হইতে পারে। এই মতটি আমরা বেশ মানিয়া লইতে পারি। কেননা যদিও অবেস্তা ও বেদের শব্দ ও পদের উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তথাপি দুইটি ভাষা পরস্পরের এত সন্নিকট যে, অবেস্তার একটা সম্পূর্ণ ছত্র শুধু অক্ষর-পরিবর্তনের সূত্রের সাহায্যে বৈদিক ছত্রে পরিবর্তিত করিতে পারা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, অবেস্তা ভাষার সহিত বৈদিক ভাষার যে পার্থক্য, তাহা অধিক দিনের নয়। সুতরাং তাহাদের ভাষা ভারতে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই বৈদিক মন্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল।

যদি ভাষাটি বিজেতাদের ভাষারূপেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এই কল্পিত বিজয়ের অনতিকাল পরেই যে সমস্ত

বৈদিক মন্ত্র বিরচিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ে বিজয়কাহিনীর কোন না কোন ঘটনার উল্লেখ থাকিবেই। এ কথা সত্য যে, দস্যুদের সঙ্গে আর্যদের পরস্পর যুদ্ধের কথার প্রায়ই উল্লেখ আছে। কিন্তু সেগুলি শুধু গরু, বাছুর, রমণী প্রভৃতি সম্পদলাভের জন্য যুদ্ধ। মনুষ্য সৃষ্টির পর হইতেই সমগ্র পৃথিবীতে অসভ্য জাতিরা এই দ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিত। একটা জাতিকে সরাইয়া বা হটাইয়া দিবার অথবা বিদেশী শত্রুদের নিকট হইতে দেশ কাড়িয়া লইবার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য সম্প্রতি হোর্নলে-গ্রীয়ার্সন-রিজলি মতবাদের আবিষ্কার হইয়াছে।

আর্যদের প্রথম দল দলবদ্ধ হইয়া অথবা এক এক দল ক্রমান্বয়ে সপরিবারে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তভূমির বহির্দেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করে। তাহারা সঙ্গে করিয়া স্ত্রীলোক লইয়া আসিয়াছিল। এরূপ অনুমান না করিয়া কোন প্রকারে পঞ্জাব ও রাজপুতানার লোকদের আর্যলক্ষণের সমধিক বিশুদ্ধি-বিষয়ে কল্পনাই করিতে পারি না। Typeএর বিশুদ্ধি বলিলে তাঁহারা বোঝেন যে, জাঠ ও রাজপুতগণ কয়েকটি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন। রিজলি লিখিয়াছেন—'They have a dolicho-cephalic head, leptorhine nose, a long, symmetrical narrow-face, a well-developed forehead, regular features, a high facial angle, tall stature, a very light brown skin.' যখন আর্যগণ 'dolicho-cephalic leptorhine type' বলিয়া জাতিতত্ত্ব-জগতে Penkaর মতবাদের জয়জয়কার চলিতেছিল, তখনই রিজলি এই রায় দিয়াছেন। রিজলি তখন জানিতেন না যে, তারপর বহু dolicho-cephalic (দীর্ঘকপালী) জাতির আবিষ্কার হইবে। ডক্টর হডন proto-nordics-এর আবিষ্কার

করিয়াছিলেন। তারপর তুর্কিস্তানের উস্থন (Wusun) জাতি, সাকা জাতি, অস্ট্রেলিয়ার দীর্ঘকপালী (dolicho-cephal) জাতি প্রভৃতি অনেক জাতির সংবাদ বাহির হইয়াছে। ইহার উপর অধ্যাপক বোয়াস (Prof. Boas) দেখাইয়াছেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় শারীরিক লক্ষণের যথেষ্ট ব্যত্যয় হইয়া থাকে। আমরা যে সমস্ত শারীরিক লক্ষণের উপর জোর দিয়া থাকি, সেগুলি একেবারে ভুল হইয়া যায়। ম্যারেট এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া বোয়াসের পক্ষই সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও পঞ্জাব ও রাজপুতনার লোকেদের আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পূর্বলিখিত মতের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার উপর এই অংশে এত বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষ ঘটিয়াছে যে, ইহাদের বিশুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, একথা কোন ঐতিহাসিকই বলিতে পারেন না। পারস্য, ইউরোপীয়, গ্রীক, পার্থিয়ান, বাক্‌ট্রিয়, সিথীয়, হূন, আরব, তুর্কী ও মোঙ্গলেরা ক্রমান্বয়ে এই স্থানটি যে শুধু জয় করিয়াছিল, তাহা নয়—এইখানে বসবাস করিয়া লোকদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

বৈদিক মন্ত্রগুলি আর্যদের দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের উপকারের জন্যই রচিত হইয়াছিল। বহু মন্ত্রে দস্যুদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে। যে সমস্ত জায়গায় দস্যুদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, দস্যুরা অলৌকিক শত্রু, অল্পসংখ্যক স্থানেই তাহারা মানুষ। বেদ হইতে বেশ বোঝা যায় যে, আর্য ও দস্যু বা দাসের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সভ্যতা ও জাতিগত পার্থক্য নয়—cult বা ধর্মগত পার্থক্য। আর্য ও দস্যু বা দাস শব্দ প্রধানত ঋগ্বেদ-সংহিতায় আছে। ঋক্‌সংহিতায় আর্য শব্দ ৩৩ বার মাত্র মন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে জাতি বিজেতা, সে জাতি আপনার গৌরবকাহিনীর উল্লেখ বার বারই করিবে। আর্য শব্দের বিরল প্রয়োগে মনে হয়, ইহারা বিজেতৃজাতি নয়—ইহারা দেশ জয় করিয়া অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করেন নাই।

দাস শব্দের উল্লেখ ৫০ বার এবং দস্যু শব্দের উল্লেখ ৭০ বার আছে। কয়েকটি স্থানে এই দুইটি শব্দের উল্লেখ দুই অর্থে দেখিতে পাওয়া যায়। দাস শব্দের অর্থ চাকর এবং দস্যু শব্দের অর্থ ডাকাত। যেখানে এই দুই অর্থে ইহাদের প্রয়োগ নাই, সেখানে আর্যদের বিরোধী দানব বা মানুষ।

ইন্দ্রারাধনায় আর্য শব্দ ২২ বার এবং অগ্নি-আরাধনায় ৬ বার আছে। ইন্দ্র-ব্যাপারে দাস শব্দ ৪৫ বার, দুই বার অগ্নি-ব্যাপারে। দস্যু শব্দ ইন্দ্র-ব্যাপারে ৫০ বার এবং অগ্নি-ব্যাপারে ৯ বার। ইন্দ্র ও অগ্নির সহিত আর্য ও দাস বা দস্যু শব্দের পুনঃপুনঃ প্রয়োগ দেখিয়া বলিতে পারা যায় যে, আর্যগণ ইন্দ্র ও অগ্নির উপাসক ছিলেন এবং দাস বা দস্যুরা বিরোধী ছিল। আর্যগণ যে ইন্দ্রকে পূজা করিতেন এবং ইন্দ্রও যে তাঁহাদিগকে গরু প্রভৃতি লইয়া দ্বন্দ্বের সময় সাহায্য করিতেন, তাহা ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণিত হয়। অগ্নিকে মাঝে রাখিয়া আর্যগণ ইন্দ্রকে আহুতি দিতেন। আর ইন্দ্রের পরেই অগ্নি তাঁহাদের সহায় ছিলেন।

দাস বা দস্যুরা কাহারা? ইহারা ইন্দ্র, অগ্নি-পূজার বিরোধী। যে যে স্থানে দস্যু বলিলে মানুষ বুঝায়, সেই সেই স্থানে এই অর্থটি স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ১. ৫১. ৮, ১৯; ১. ৩২. ৪; ৪. ৪১. ২; ৬. ১৪. ৩ সূত্রে ইহাদিগকে অব্রত অর্থাৎ আর্যদিগের ব্রত-বিরহিত বলা হইয়াছে। ৫. ৪২. ৯ সূক্তে অপব্রত, ৮. ৫৯. ১১ ও ২০. ২২. ৮ সূক্তে অন্যব্রত বলা হইয়াছে। ১. ৩১. ৪; ১. ৩৩. ৪ ও ৮. ৬৯. ১১ সূক্তে দস্যুদিগকে অয়জমান বলা হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা যজ্ঞ করে না। ৪. ১৬. ৯; ১০. ১০৫. ৮ সূক্তে অব্রহ্ম—ইহারা আরাধনা করে না এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাখে না বলা হইয়াছে। অন্যান্য ঋকে ইহাদিগকে অনৃচঃ ব্রহ্মদ্বিষঃ, অনিন্দ্র বলা হইয়াছে। এইরূপে ঋগ্বেদের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, দস্যুরা যাদু ও মন্ত্র ব্যাপারে দেবতার ধার ধারিত না।

ঋগ্বেদের যে কোন স্থান হইতে প্রমাণিত হইবে যে, ধর্ম ও পূজা-পদ্ধতি লইয়া আর্য ও দস্যুর বিবাদ (cult with cult and not one of race with race), ইহাদের বিবাদ জাতিগত বিবাদ নয়।

এতদিন ধরিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্য ও দস্যু বলিলে দুইটি বিভিন্ন জাতি বুঝিতেন বলিয়া বেদে তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন, ফলে কিন্তু পর্বতের মূষিক প্রসব হইয়াছে। ঋগ্বেদে ৬. ২৯. ১০ সূক্তে দস্যুদিগকে 'অনাস' বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ম্যাক্‌সমুলর ও হডন বলেন যে, দস্যুদের নাক চ্যাপ্টা ছিল। সুতরাং তুলনায় আর্যদের নিশ্চয়ই টিকলো নাক হইবে। সায়ন প্রভৃতি ভাষ্যকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—মুখহীন, অর্থাৎ শোভন-ভাষাশূন্য। দস্যু ও রাক্ষসদের যে সকল নাক মন্দির প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি বেশ টিকলো। উল্লিখিত সূক্তে অনাস মনুষ্যদের লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই—দানবদের নির্দেশ করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে এই একটিমাত্র শব্দ হইতে দস্যুদের আকৃতি ঠিক করা আদৌ সমীচীন হয় নাই।

হোলকার কলেজের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ও দাস বা দস্যুদিগের প্রাধান্য ও উন্নত অবস্থা সম্বন্ধেও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারা আর্যদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না। তিনি Indo-Aryan Polity during the Period of the Rigveda—Jour. Dept. of Letters, vol. v হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। সেই সমস্ত উক্তি আলোচনা করিলে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, দাসগণ পাঁচ শত পুরীর অধিপতি ছিল। দস্যুগণ আর্যদের সমকক্ষ শত্রু ছিল। ইন্দ্র যেমন দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন, আর্যদের বিরুদ্ধেও তেমনি যুদ্ধ করিতেন। একটি ঋকে আছে ইন্দ্র আর্য ও দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন।

অসুর জাতি

বেদপন্থী ও অবেস্তাপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ পূর্বে এক সঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহারা যেখানে থাকিতেন, তাহাকে তাঁহারা 'স্বর্গ' বলিতেন। বেদপন্থীদের পূর্বপুরুষগণ আপনাদিগকে 'দেব' বলিতেন ও অন্য দলকে 'অসুর' নামে পরিচিত করিতেন। তখন দেব ও অসুর 'ঈশ্বর' (Lord) অর্থেই প্রযুক্ত হইত। দেব ও অসুরদের বেশ পরস্পর মিল ছিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া বুঝিতেন। দেবাসুরের যুদ্ধের পর হইতে যখন দেবতারা অসুরদের একেবারে হটাইয়া দিলেন তখন দেবতারা অসুরদের শত্রু বলিয়াই উল্লেখ করিতেন, তাঁহাদের ভ্রাতৃব্য বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে তাই দেখিতে পাই—

"এতয়া বৈ দেবা অসুরান্নতৎ ক্রামন্নতি পাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং ক্রামতি য এতয়া স্তুতে।"

এ সময় ভ্রাতৃব্য আর ভাই ছিল না ; ভাষ্যকার বলেন, ভ্রাতৃব্য শব্দের অর্থ শত্রু। পরে যে কারণেই হউক, এমন হইল যে, দুই দলে কোন সম্পর্ক রহিল না। (এ সম্বন্ধে 'আর্য ও অনার্য' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

অসুরদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহারা গুহ্য বিদ্যা জানিতেন। এই বিদ্যার নাম ছিল মায়া। ইহারই প্রভাবে তাঁহারা অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যখন দেবতারা অসুরদের নিকট হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, সেই সময়ে বা তাহার পরে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, সেগুলি অসুরদিগকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন না। শতপথ-ব্রাহ্মণেও দেখা যায়, দিন দেবতাদের, আর অসুরদের সঙ্গে

অন্ধকার (২. ৪. ২. ৫)। তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলেন, রাত্রি অসুরদের (১. ৫৯. ২)। তবে একথা সকলেই বলেন, অসুররা প্রজাপতির সন্তান। পূর্বে তাঁহারা দেবতাদের সমান ছিলেন। বৈদিক যুগের শেষাশেষি অসুর বলিলে আর দেবতা বুঝাইত না; পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অসুর শব্দের একেবারে অর্থ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া দাঁড়াইল—অপদেবতা। শতপথ-ব্রাহ্মণে অসুরদিগকে রাক্ষস বলা হইয়াছে। ইহারা দেবনিন্দক। তবে প্রজাপতি যে দেব ও অসুরের পিতা, শতপথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শতপথ অসুরদিগকে মেরু-নিম্নবাসী বলিয়াছেন। মায়া অসুরদের বেদ। পরাবাসু ইহাদের হোতা। ইহাতে নমুচি অসুর, স্বর্ভাবু অসুর, কপিল অসুর, কালকাঙ্গ অসুর প্রভৃতির কথা আছে। কালকাঙ্গ অসুর রাশীকৃত অগ্নিবেদী করিয়া স্বর্গে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পুরাণে অসুরদিগের অনেক কথা আছে। পুরাণ বর্বরদিগকে অসুর ও রাক্ষস এই সাধারণ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অসুরগণ রুদ্রোপাসক ছিলেন। তাঁহাদের শৈবও বলা যাইতে পারে। লিঙ্গপুরাণ বলেন, অসুর ও রাক্ষসগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম করিয়া দেবাদিদেব শিবের নিকট কয়েকটি বর পান। শিবের রক্ষিত হইয়া তাঁহারা দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও তাঁহাদিগকে পরাভূত করেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ শিবের নিকট একজন বিঘ্নবিনাশকারী বিঘ্নেশ্বরকে সৃষ্টি করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। বিঘ্নেশ্বর অসুর ও রাক্ষসদের পুণ্য সঞ্চয়ে বাধা জন্মাইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর শিবের নিকট বর পাইবেন না। শিব সন্তুষ্ট হইলেন। পার্বতীর গর্ভে শিবাংশ বিঘ্নেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে ও দেবতাদের শুভফল উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

মৎস্যপুরাণ বলেন, দেবাসুরে ১২ বার যুদ্ধ হয় (৩৯-৫২ অঃ)। (৫৮ অঃ) প্রহ্লাদ যখন পরাজিত হন, তখন ইন্দ্র ত্রিলোকের

অধিপতি হন। অসুরগুরু শুক্র অসুরদের ত্যাগ করিয়া দেবতাদের কাছে যান। অসুরগণ প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ না করেন। শুক্র সাহায্য করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করেন (৬০ অঃ)। কিন্তু দেবতারা আবার অসুরদিগকে আক্রমণ করেন। অসুররা শুক্রের নিকট গমন করায় আক্রমণ-কারীরা চলিয়া যান। শুক্র তাঁহাদের পূর্বকৃত অপরাধের কথা স্মরণ করাইয়া সৌভাগ্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন, 'যাও, শিবের ধ্যান কর; শিবের নিকট কয়েকখানি শস্ত্র প্রার্থনা কর; তাহাদেরই প্রভাবে তোমাদের জয় হইবে (৬৫ অঃ)।' তখন তাঁহারা দেবতাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর শত্রুতাচরণ করিবেন না; তাঁহারা তপ করিবেন। শুক্র মহাদেবের নিকট গিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী গ্রন্থ প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে একটি কঠিন অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। এক হাজার বৎসর ঊর্ধ্বপদ হইয়া তাঁহাকে তিনি তপ করিতে বলেন। শুক্র তাহাতেই রাজি হইলেন। অসুরদের এই নিঃসহায় অবস্থার সুযোগ পাইয়া দেবতারা তাঁহাদের আক্রমণ করিলেন। অসুররা শুক্রের মাতার নিকট গেলেন। তিনিও সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু দেবতারা আবার আক্রমণ করিলেন। শুক্রমাতা তখন মায়া বলে ইন্দ্রকে অসহায় করিলেন। ইত্যাদি—

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে, অসুর হয়গ্রীব ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ অপহরণ করেন। বিষ্ণু তাঁহাকে হত্যা করেন। ভাগবতপুরাণে দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনের কথা আছে। কূর্ম ও বায়ুপুরাণে হিরণ্য-কশিপুর কাহিনী আছে। ইনিও অসুর। এইরূপ পুরাণাদিতে অসুরদের বহু কথাই আছে। মহাভারতে বাণাসুরের কথা আছে। বাণাসুর রুদ্রোপাসক। তিনি বাণ প্রতীকে লিঙ্গোপাসনা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'বাণ' হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ তাঁহাকে দেব

রুদ্রোপাসক বলিয়াছেন। হরিবংশ, ভগবত ও বিষ্ণুপুরাণ তাঁহাকে 'বাণরাজ' বলিয়াছেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ তাঁহাকে 'ইযুক্রিকাণ্ড' বলিয়াছেন। বাণরাজ ও তাঁহার অনুব্রত অসুররা বাণেরই রুদ্রোপাসনা করিতেন। মূর্তিতত্ত্বে যেখানে অসুর থাকে, তাহার হাতে একটি বাণ দিবার ব্যবস্থা আছে।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ প্রতীচ্য সত্ব শ্যাপর্ণগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন—"পূতায়ৈ বাচো বদিতারঃ।" ইহারা পবিত্র ভাষা বলিতেন। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে ব্রাত্যবাণের ভাষা জঘন্য বলিয়া তাহার নিন্দা আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৩. ২. ১. ২৪) অসুরদের ভাষার নিন্দা করা হইয়াছে আর ব্রাহ্মণগণ যাহাতে ভাষা ম্লেছিত না করেন, তজ্জন্য উপদেশ করা হইয়াছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের উক্তি তাই "ন ব্রাহ্মণো ম্লেচ্ছেৎ।" পতঞ্জলিও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—'তেঽসুয়া হেলয়ো হেলয়ো ইতি কুর্বন্তঃ পরাবভূবুঃ তস্মাৎ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতং বৈ নাপভাষিতং বৈ।" পাণিনি (৬. ১. ১৬০) ম্লেচ্ছ বা অসুরদের শব্দকে 'উহ্য' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পাণিনির সময়ে অসুররা বিশেষ যোদ্ধজাতি ছিল। যোদ্ধৃ পশুজাতির সঙ্গে পশুগণের ম্লেচ্ছভাষাভাষী অসুরের উল্লেখ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে ম্লেচ্ছ বলিতে 'বর্বর' (barbarian) বুঝাইত।

পুরাণে অসুর শব্দ অসু (অর্থাৎ প্রাণ) হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। বায়ুপুরাণের নবম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতির জঘন হইতে অসুরদের উৎপত্তি।

"ততোঽস্য জঘনাৎ পূর্বমসুরা জজ্ঞিরে সুতাঃ।
অসুঃ প্রাণঃ স্মৃতো বিপ্রাস্তজ্জন্মানশ্চতোঽসুরাঃ" ॥৪॥

ঋগ্বেদে 'অসুর' শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। ১. ৩৫. ৬ ঋকের ভাষ্যে সায়নাচার্য বলিয়াছেন—'অসুরঃ অসু ক্ষেপণে অস্যতি শত্রূন্ ইত্যাসুরঃ। অসেরুরন্। উ, ১. ৪৩ নিত্বাদাহ্যদাত্তত্বম্। যদ্বা। অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি ইত্যসুরঃ।''

আরও আমরা পাই—

"সমৎসরেণাসুর ইত্যুপেয়ুষা চিরায়
নাম্নঃ প্রথমাভিধেয়তাম্।
ভয়স্য পূর্বাবতরস্তরস্বিনা মনঃসু
যেন দ্যুসদাংন্যধীয়ত ॥৪-৩॥

যে উড়াইয়া দেয়, তাহাকে অসুর বলে। বহুকাল পরে এই বলবান্ দানব অসুর নামের প্রকৃত পাত্র হইয়া উঠিল; হিংসায় দেবগণের মনে ভয়ের প্রথম সঞ্চার হইল।

যাস্কের নিরুক্তে (৩-৮) অসুর শব্দের একটি নিরুক্তি দেওয়া হইয়াছে। যাস্ক বলেন, ব্রহ্মা 'সু' অর্থাৎ যাহা ভাল, তাহা হইতে 'সুরে'র উৎপত্তি করিয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধ। আর 'অসু', অর্থাৎ খারাপ ধাতু হইতে 'অসুরের' সৃষ্টি করিয়াছেন।

বৈদিক যুগের শেষভাগে অসুররা আর্যদিগের সঙ্গে পৃথক্ হইয়া পড়েন এবং ভারতের গণ্ডী পার হইয়া পারস্য বা তুর্কীস্তানে গিয়া বাস করেন। আর্যগণ যখন ভারতে বেশ জাঁকিয়া বসিলেন, তখন যে সমস্ত অসুর ভারতের বাহিরে যাইবার উপায় করিতে পারিলেন না, তখন হাটিতে হাটিতে প্রয়াগ, ছোটনাগপুর, মির্জাপুরের দিকে গিয়া আড্ডা গাড়িলেন। কেহ বা তিব্বত দিয়া কামরূপ গিয়া উপস্থিত হইলেন। কতক দক্ষিণ-ভারত পর্যন্ত গিয়া আশ্রয় লইলেন। যাঁহারা ভারতের বাহিরে গেলেন, তাঁহাদের প্রভাব ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইলে এখন হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে তাঁহারা বাবিলনের শত ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্যের নাম হয় অসুর বা আসিরিয়া। টাইগ্রীস নদীর উপকূলে অসুর নামে ইহার রাজধানীও স্থাপিত হয়। এসিয়া-মাইনর হইতে ককেসস পর্বত পর্যন্ত এই অসুরদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে সুবীররা সুমেরিয়া স্থাপন করেন। মেসোপটেমীয় জাতিরা

দ্রবিড় সভ্যতা অর্জন করিয়াছিল। দ্রবিড়রা ভারতবাসী। বড় বড় পণ্ডিতদের মতে কাহারও কাহারও ধারণা, ভারতবাসীরা বিদেশীয় সভ্যতা ধার করিয়া আত্মসাৎ করিতে খুব পটু। আবার কাহারও বা বিশ্বাস, ভারতবাসী সভ্যতাব্যাপারে গ্রীস ও বাক্‌ট্রিয়ার নিকট অনেকাংশে ঋণী। ইহাদের মধ্যে আবার এক শ্রেণীর লেখক বলিয়া থাকেন যে, পারস্য প্রভাব ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে। এক সময় যে সুমেরগণ পারস্যোপসাগরের অন্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, একথা কিন্তু অস্বীকার করিতে পারা যায় না। আর এই সুমেররাই যে দ্রবিড় জাতীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মেসোপটেমিয়ায় বাবিলনীয় ও আসিরীয় জাতির প্রাচীন সভ্যতার যে বিস্ময়জনক নিদর্শন পাওয়া যায়, সেই সভ্যতার জন্য তাহারা সুমেরদের নিকট ঋণী।

দ্রবিড় জাতির উৎপত্তির ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন। দ্রবিড়রা ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন জাতি। কেহ কেহ বলেন ইহারা সর্বপ্রথমে ভারতের বাহিরে কোন দেশে বাস করিত। যদি তাহাই হয়, এখন তবে তাহাদের আদিম নিবাসের সন্ধান পাওয়া অতি দুরূহ। ইহাদের আদিম বাসস্থান সম্বন্ধে কেহই কোন কথা বলিতে পারেন নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে দ্রবিড়জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতেই অবস্থিত। হনলি (Hunley) মত প্রকাশ করিয়াছেন, দ্রবিড়দের অস্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। স্ক্লাটারও (Sclater) অনুমান করেন, পূর্বে একটি বহুবিস্তৃত মহাদেশ ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াকে সংযুক্ত করিয়া অবস্থিত ছিল। ইহা এখন ভারত মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত। স্ক্লাটারের অনুমান সত্য হইলে দ্রবিড় জাতির পক্ষে অতি প্রাচীনকালে স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা বিচিত্র নহে। কিন্তু স্যর উইলিয়ম টবনর (Sir William Turner) প্রমাণ করিয়াছেন যে, দ্রবিড়গণ ভারতবাসী।

বেলুচিস্তানের সুদূরবর্তী উচ্চ ভূখণ্ডের মধ্যভাগে ব্রাহুইগণের বাস। ইহাদের ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের ভাষার সহিত দ্রবিড় ভাষার নিকট সম্বন্ধ। ইহা ভিন্ন ইহারা যে সুমের-বংশভুক্ত, তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রীয়ারসনের লিখিত মতগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দ্রবিড়দিগের মধ্যে ব্রাহুইরাই বিশেষভাবে জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। অতএব সুমেররা যে ভারতবর্ষ ও তন্নিকটবর্তী স্থান সকল হইতে ঐ প্রদেশে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ব্রাহুইরা যদি দ্রবিড়দের জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা হইলে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, দ্রবিড়রা পূর্বে বেলুচিস্তানেই থাকিত, সেখান হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিল।

ভ্রেড্রেনবার্গের ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, এক সময়ে বেলুচিস্তানের মরুপ্রদেশ অত্যন্ত উর্বর ও জনাকীর্ণ ছিল। কিন্তু পরে জলাভাব হওয়ায় ঐ স্থান অজন্মা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়। সেই জন্য লোক বাধ্য হইয়া অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করে। সিন্ধুনদের তীরভূমি উর্বর দেখিয়া অনেকে দলে দলে সেইখানে আসিয়া বাস করে। দ্রবিড় জাতির অন্য এক শাখা অদৃষ্টান্বেষণে পশ্চিমদিকে গমন করিয়া ইউফ্রেটিস নদের তীরে উপস্থিত হয়। ইহারা হয় পারস্যের পার্বতীয় প্রদেশ হইতে বাবিলোনিয়ার সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিল, নয় সমুদ্রপথে বেলুচিস্তানের মাকরানের (Makran) সমুদ্রোপকূল হইতে উপস্থিত হইয়াছিল। সুমের ও দ্রবিড়দের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।*

ইউফ্রেটিস উপত্যকার প্রাচীন জাতিরা উচ্চ সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। সুমের জাতিই সেই সভ্যতার পথিপ্রদর্শক। হল (H. R.

*Anukul Ch. Ghosh: First Town Planners (Jourl. of the Mythic Society) দ্রষ্টব্য।

Hall) এই স্থমের জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্থমের সভ্যতা বাহির হইতে মেসোপটেমিয়ায় আনীত হয়, এরূপ অনুমান করিবারও অনেক কারণ আছে। স্থমেররা যে ভারতবর্ষীয় কোন জাতি, ইহারা যে জলপথে এবং স্থলপথে পারস্যের মধ্য দিয়া ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের মধ্যবর্তী উপত্যকায় উপনীত হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব নহে। ভারতবর্ষ মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম একটি কেন্দ্র, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু নাই। যে সকল অ-সেমেটিক ও অনার্য জাতি পূর্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে সভ্যতা বিস্তার করিতে আসিয়াছিল, তাহারা এতটা ভারতীয় ভাবাপন্ন যে, তাহাদিগকে ভারতীয় জাতি বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক। হল স্থমেরদিগকে বিশেষরূপ ভারতীয় ভাবাপন্ন বলিয়াই মনে করেন। বাবিলোনিয়ার প্রাচীর নগরগুলির ভূগর্ভ খনন করিয়া যে সকল ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, প্রত্নবস্তুতাত্ত্বিকগণ সেইগুলির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ বাবিলোনিয়ায় উপনিবেশ-স্থাপনকারী স্থমেররাই বাবিলোনীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা। নগরের নিম্নতম সমতল ভূমির অভ্যন্তর খনন দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, স্থমের-সভ্যতা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, লোক তাম্র ব্যবহার করিতেছিল। তেল্লায় (Tella) স্থমের জাতির খ্রীস্ট-জন্মের ৪ হাজার বৎসর পূর্বের তাম্রনির্মিত যন্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ভারতের মধ্যপ্রদেশে কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক তাম্র-যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেখা যায়, বাবিলোনিয়ায় প্রাপ্ত যন্ত্রসকলের সহিত ইহাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। স্থমেররা নগরনির্মাণে ও জল-প্রণালী খননকার্যে বিশেষ নিপুণ ছিল। যতদূর ইতিহাসে জানিতে পারা যায়, স্থমেররাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের পূর্বে নগর কৌশল আবিষ্কার করে।* তাহাদের প্রত্যেক নগরে একটি করিয়া

*Anukul Ch. Ghosh : First Town Planners.

নগর-দেবতা থাকিত। ইনিই নগরস্বামী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই দেবতার যিনি প্রধান পুরোহিত, তিনি বংশানুক্রমে নগর শাসন করিতেন। প্রাচীন বাবিলোনিয়ার প্রধান নগর নিপ্‌পুরে যে দেবমন্দির ছিল, তাহা এনিল (Ennil) দেবকে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এই এনিলদেবের নামের সহিত দ্রবিড় জাতির চন্দ্রদেবের নামের বেশ মিল আছে। বাবিলোনীয় পুরাণে দ্রবিড়দের সূর্যদেবের নাম Bal পাওয়া যায়। নিপ্‌পুরের মন্দিরে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। সেইগুলির সাহায্যে নির্ধারিত হইতে পারে যে, খ্রীস্ট-জন্মের ৬ হাজার বৎসর পূর্বের সুমেরগণ বহু জনাকীর্ণ সুশাসিত নগরে বাস করিত। ঐ সময়েরও বহু পূর্বে তাহারা সভ্যতাসম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ সময়েও তাহারা ধাতুনির্মিত বস্তু ব্যবহার করিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, তখনও তাহারা লিখিতে জানিত।

সুমেরদের যে সকল ক্ষোদিত লিপি পাওয়া যায়, সেই সকল মূর্তিতে দেখা যায় যে, সুমেররা মুণ্ডিত মস্তক ও লোহিত পরিচ্ছদাবৃত। তাহাদের আকৃতি ও পরিচ্ছদে দ্রবিড়জাতিদের সঙ্গে এতটা মিল যে, এই উভয় জাতি যে একই সাধারণ জাতিসম্ভূত, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

এই সুমেরদিগের দ্বারা মেসোপটেমিয়ায় বাবিলোনীয় ও আসিরীয় সভ্যতা সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। সুমের-আগমনের পূর্বে আসিরীয় সভ্যতা বাবিলোনীয় সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সুমের-সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া আসিরীয় সভ্যতা বাবিলোনীয় সভ্যতা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। এই উভয় জাতির শারীরিক গঠনের পার্থক্য ছিল না। ভাষাতেও সম্বন্ধ নিকটতর ছিল। কিন্তু তাহাও শেষে জাতীয় চরিত্রে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। আসিরীয়গণ সবল, দৃঢ় এবং যোদ্ধৃ জাতি, সমরসজ্জাতেই ইহাদের সভ্যতাবিস্তার। ইহাদের বন্দীরা বড় বড় মন্দির, রাজপ্রাসাদ,

প্রাচীর প্রভৃতি নির্মাণ করিত। স্ত্রীলোকরা শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি করিত। কৃষি ব্যাপার ক্রীতদাসদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। আসিরীয়গণ বীরের পূজা করিত। অস্‌সুর বা অসুর ইহাদের জাতীয় দেবতা। ইনি প্রথমে গ্রাম্য দেবতা ছিলেন, পরে জাতির উপাস্য হয়েন। আসিরীয় প্রভাবের সময় এই দেবতার বলে আসিরীয় রাজার শত্রু জয় করিয়াছিলেন। ইহারা দেবতার মন্দির নির্মাণ করিত। ইহাদের লিপি বা অনুশাসনগুলি সুমেরীয় ভাষায় লিখিত। ইহাদের মধ্যে গুরু পুরোহিতের প্রাধান্য খুব বেশী ছিল। আসিরীয়গণ এক সময় এত দূর প্রভাবান্বিত হইয়াছিল যে, তাহাদের শাসনদণ্ড ককেসাস হইতে ভারতসাগর পর্যন্ত এবং ভূমধ্য-সাগর হইতে গঙ্গার উপত্যকাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই বীরজাতির শৌর্যবীর্যের প্রভাব চারিদিকে বিঘোষিত হইয়াছিল।

আসিরীয়ার প্রাচীন রাজধানীর নাম 'অস্‌সুর'। পূর্বে অস্‌সুর ইহার মাত্র গ্রাম্য দেবতা ছিল। আসিরিয়া যেমন মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল, অমনি তাহার গ্রাম্য দেবতা জাতীয় দেবতায় পরিণত হইল। কিন্তু অস্‌সুর নাম অক্ষুণ্ণ রহিল। এই দেবতা একটু জটিল রকমের ছিল। ইহার উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল, তাহাও সমস্যার বিষয়।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা নানা রকমে অসুর শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে, অস্‌সুর দেবতা সুমেরিয়া হইতে সমানীত হইয়াছিল। এই কথা বলিবার পক্ষে একটা যুক্তি আছে। বাইবেলের Genesis-এর ১০ম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে পাওয়া যায়,—"Out of that kind (shiner) went forth Asshur, and builded Nineveh". Delitzsch ও Jastraw Asshur বা Ashur-কে Ashir-এর সহিত অভিন্ন মনে করেন। অস্‌সুর হয়ত Etna বা Gilgamesh-এর মত একজন বীর ছিলেন। ইঁহারই নাম হইতে অস্‌সুর নাম হইয়াছে। আসিরীয় লিপির অক্ষরগুলি

শরমণ্ডিত। আসিরীয়গণ 'শ'র স্থানে 'স' উচ্চারণ করিত আর 'অস্সুর, ও 'অসুর' উভয় পদই ব্যবহার করিত। দেববাচক অসুরের বানানে দুইটি শায়িত শর। কিন্তু কোথাও আবার একটি শরও দেখা যায়। ঐরূপ শায়িত শর আমাদের 'স' স্থানেই ব্যবহার করা হইত। কাজেই আসিরীয়গণ যে অসুর শব্দ ব্যবহার করিত, তাহা বলিতে পারা যায়। অসুর শব্দ হইতে আরও অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। "অসরিদ" (asarid), 'অসরিদুত' (asari-duta), 'অসরিদ্দন' (asariddan), 'অসুরিতে' (asurite), 'অসর্‌রিতে' (asarrite), 'টেলসুর্‌রি' (telasurrie) পদগুলি সবই 'অস্সুর' হইতে ব্যুৎপন্ন। এইসকল পথে দুইটি 'স'র একটি সমূলে বিলুপ্ত। সুতরাং অসুর ও অস্সুর লইয়া বিশেষ গোলে পড়িতে হয় না। আসিরিয়ার ভাষায় অস্সুর বা অসুর শব্দ পদ-মর্যাদাসূচক। ঐ শব্দ হইতে জাত অসরিদ শব্দের অর্থ প্রধান, বিখ্যাত ; অসরিদুতের অর্থ প্রাধান্য, খ্যাতি ; অসরিদ্দনের অর্থ প্রধান ; অসুরিতে বলিলে প্রধান বুঝায়। অস্‌ররিতের অর্থ উচ্চ ; তেলসুর্‌রি একটি উন্নত বা বিখ্যাত দেশের নাম।

ভারতীয় অসুর ও আসিরীয় অসুর যে এক সময় এক জাতি ছিল, তাহা বলিবার পক্ষে কয়েকটি প্রমাণ দিতে পারা যায়।

প্রথমত দেখিতে পাওয়া যায় যে, আসিরীয় অসুররা তাঁহাদের শ্মশান করিতেন দুই রকমে। এক রকম শ্মশান ছিল তাঁবুর আকারের ; আর এক প্রকার শ্মশান তাঁহাদের ছিল ডিম্বাকৃতি মৃৎপাত্রাকারের। এদিকে আমরা শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখি, দেবতাদের শ্মশান ছিল চতুরস্রাকার, আর এক শ্রেণীর অসুরদের শ্মশান গোলাকৃতি ছিল। 'যা আসুর্য প্রাচ্যাস্ত্বদ্ যে ত্বৎ পরিমণ্ডলানি (শ্মশানানি কুর্বতে)"—১৩. ৪. ১. ৫। এই প্রাচ্য অসুররা কাহারা এবং কোথায় থাকিত, এখন স্থির করা সহজ নহে। কোন কোন পণ্ডিত প্রাচ্য অর্থে মগধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা

ভুলিয়া গিয়াছেন শতপথের লেখক মিথিলাবাসী। তাঁহার উল্লিখিত প্রাচ্যদেশ বলিলে মিথিলা হইতে পূর্বদিগ্‌বর্তী কোন স্থান বুঝিতে হইবে। বিশেষত প্রাচ্য এবং মগধ পৃথক্ পৃথক্ দেশ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ থাকায় প্রাচ্য অর্থে মগধ ধরিয়া লওয়া সঙ্গত নহে। যাহা হউক আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতীয় অস্থর ও আসিরীয় অস্থরদের শ্মশান একই রকমের হইত।

দ্বিতীয়ত আসিরীয় অস্থররা মার্ডুকের প্রতীকপূজা করিত। এই প্রতীক বাণাকৃতি। ইহারা Storm Godএর উপাসনা করিত। ভারতীয় অস্থরগণ ছিল রুদ্রোপাসক। বেদে রুদ্রও Storm God। অস্থরদের উপাসনার প্রতীক যে বাণ ছিল, তাহা আমরা পূর্বে বাণাস্থর প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। তাহার পর ভারতীয় অস্থরদের বিদ্যা ছিল মায়া। আসিরীয় অস্থরগণও ইহার যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে G. Smith 'Assyrian Discoveries' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেবীর মূর্তি আছে। এগুলি যাদুতে ব্যবহৃত হইত। British Museum. Bab. Roomএ (Nos. 996—1009) সেগুলি রক্ষিত আছে। এই মিউজিয়মে আর একটি bronze রাক্ষস-মূর্তি আছে (No. 574)। এটিও যাদুতে ব্যবহৃত হইত। ইহারা যে নানা রকমের রক্ষাকবচ ব্যবহার করিত তাহার বহু নিদর্শন এখন পাওয়া গিয়াছে। (Western Asiatic Inscription, 11, 67, r. 29 দ্রষ্টব্য।)

ভারতীয় অস্থরগণ দুর্গ-নির্মাণপটু ছিল। বেদে তাহার বহু নিদর্শন আছে। আসিরীয় অস্থররাও এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তাহার পর মিটানি রাজ্যের সহিত যে আসিরীয় রাজ্যের যুদ্ধব্যাপার, তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তেল-এল-অমরনার পত্রগুলিতে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ার মিটানি জাতির উল্লেখ আছে। এখানে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের কাহারও

কাহারও নামও পাওয়া যায়। এই রাজাদের মধ্যে তুস্‌রত্ত, অর্ততম, সুত্তর্ন, অর্তসুমর প্রভৃতি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও নাসত্যের পূজা করিতেন, তাহারও বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। সে অনেক কালের কথা। এগুলি যে আর্য নাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (আর্য ও অনার্য দ্রষ্টব্য) অনেক পরে অসুরবনিপালের লাইব্রেরিতে (৭০০ পূ খ্রী°) আসিরিয়ার ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে যে সকল দেবতা পূজিত হইতেন, তাঁহাদের একটি তালিকা পাওয়া গিয়াছে। ৭ জন ভাল angel এবং ৭ জন খারাপ spiritএর পূর্বেই একটি নাম আছে Assara-Mazas Assara-Mazas যে অসুর মজদা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, ইহার নাম ৭ জন Amesha spentas ও ৭ জন Daivaর সঙ্গে থাকে। এখানেও তাই। ইরানীদের অহুর শব্দও অসুর শব্দের মত মর্যাদামূলক।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আসিরীয় অসুরদিগকে ভারতীয় অসুরদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। তবে এ কথা স্বীকার্য, প্রমাণের জন্য আরও উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক।

এখন একটা মস্ত কথা বিচার্য। আসিরীয় লিপিগুলি পাঠ করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্বকালে ইঁহারা তাম্রপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহাদের ব্যবহার্য তাম্র এসিয়া-মাইনর হইতে আনিতেন। বর্তমান ভারতে আমরা একটি জাতি দেখিতে পাই। এই জাতির নামও অসুর। ইহারা ছোটনাগপুরে বাস করে। ইহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার। ইহারা আজও প্রাথমিক জাতির ন্যায় কাঠের বুমেরাং অস্ত্র ব্যবহার করে। জাতিতত্ত্বে ইহারা কোলেরীয়। প্রাচীনকালের বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত অসুরদের ইহারা বংশধর কি না তাহা বলিবার মত কোন প্রমাণ নাই। তবে ইহারা যে প্রাচীন জাতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উত্তর-পশ্চিম হইতে কোলেরীয় ও দ্রবিড় জাতি ছোটনাগপুরে প্রবেশ করিবার বহু পূর্বে উত্তর ভারতের কোন স্থান হইতে আর্য-

দিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ইহারা সম্পূর্ণরূপে না হইলেও আংশিকভাবে এখানে বাস করিত। ছোটনাগপুরে এখনও তামার খনির চিহ্ন পাওয়া যায়। এখানকার প্রবাদ যে, অসুররাই এই তামার খনিতে কাজ করিত। তামার খনিগুলিও অতি প্রাচীন। যে সময় সে খনিগুলিতে কাজ হইত, তাহা এখন হইতে দুই হাজার বৎসরেরও কম নহে। কোলরা তখন আর্যদের ভয়ে ছোটনাগপুরের পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন তাহারা এখানে এই অসুরদিগকে দেখে।

তমোলুক অতি প্রাচীন স্থান। ইহার প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি নামের কারণ এতদিন ঠিক ধরা পড়ে নাই। কেহ কেহ ভাবিতেন, তামল না দামল জাতিরা এখানে বাস করিত বলিয়া ইহার নাম তামলিপ্তি বা দামলিপ্তি। এ নামেও যে এক সময়ে তমোলুকের প্রসিদ্ধি ছিল, তাহারও সাহিত্যিক প্রমাণ আছে। তামল-দ্রবিড়গণ এক সময় তমোলুক অধিকার করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু ইহাদের অধিকারেরও পূর্বে তমোলুকের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। তামার লেপা (তাম্র দ্বারা লিপ্ত) বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল তাম্রলিপ্তি। কিছুকাল পূর্বে তমোলুকের নিকট সিংভূম ও ধলভূমের মধ্যে তামার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সিংভূম হইতে গাঙ্পুর স্টেট পর্যন্ত ৪০ ক্রোশ ব্যাপিয়া তামার খনি ছিল। ভূতাত্ত্বিকরা এই তামার খনিগুলির নিদর্শন মাটি খুঁড়িয়া পাইয়াছেন। অনেক dolmenও পাইয়াছিলেন। এই ৪০ ক্রোশ স্থানকে ‘অসুরগড়’ বলে। ‘অসুরগড়’ দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। পূর্ণিয়াজেলার দুলালগঞ্জ গ্রাম হইতে ইহা ৪ মাইল ও মহানন্দার সামান্য একটু পূর্বে। দুর্গটি খুব প্রাচীন। এই সমস্ত স্থানের তামা তমোলুক বন্দর দিয়াই যাইত। তমোলুক বন্দরে তামা অপর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিত। নিজাম রাজ্যেও ঠিক এইরূপ তামার খনি পাওয়া গিয়াছে। এখানেও অনেক dolmen

আছে। বর্তমানে মুসলমানরা এই জায়গাকেও 'অস্থরগড়' বলে দ্রবিড়গণ ইহাকে 'রাক্ষসগুড়িয়ম' বলে। সু-প্রাচীনকালে এখানকার তামাও তমোলুক বন্দরে আসিয়া জমা হইত। তমোলুক বন্দর দিয়া যে তামা ভারতে ও ভারতের বাহিরে যাইত, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে।* আমরা দেখিতে পাই যে, আসিরীয় অস্থররা তামা ব্যবহার করিত। তাহারা যে ভারতীয় অস্থরদিগের ন্যায় তাম্রপ্রিয় জাতি, এসিয়া-মাইনর হইতে তাম্র-আনয়নই তাহার প্রমাণ। তাম্রশাসনেও অস্থরদের রাজত্বের কথা পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত আমি দুইটি অনুশাসনের সন্ধান জানিতে পারিয়াছি। ১৮৮৯ খ্রী° কীলহর্ন ১০৮৪ বিক্রমাব্দের পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর রাজ্যপালদেবের পাদানুধ্যাত ত্রিলোচন পালের অনুশাসন সম্পাদন করেন।** ত্রিলোচন পাল প্রয়াগ-সন্নিকটে গঙ্গাতীরে বাসকালে অস্থরাডকবিষয়ান্তর্গত লেডুণ্ডাক গ্রামে যে সমস্ত রাজপুরুষ ও ব্রাহ্মণোত্তরগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ প্রদান করেন। তাম্রশাসনের কিয়দংশের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"৺ওঁ স্বস্তি শ্রীপ্রয়াগসমীপ-গঙ্গাতটাবাসে পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীবিজয়পালদেব-পাদানুধ্যাত-পরম ভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীমত্রিলোচনপালদেবঃ। অস্থরাডাক-বিষয়ে লেডুণ্ডাকগ্রামে সমুপগতান্ রাজপুরুষন্ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ।"

* তাম্রলিপ্তি নাম যে তামায় লেপা বলিয়া হইয়াছিল, তাহার সন্ধান ও কারণগুলি আমার বন্ধু সুপণ্ডিত শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রথমে আমাকে বলেন। তাঁহার এই সাহায্যের জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। দ্রবিড় সম্পর্কেও তিনি কয়েকটি উপকরণ দিয়াছেন। সেই উপকরণগুলিও এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে জন্যও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

** Indian Antiquary, ১৮৮৯ পৃ° ৩৩।

কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের দ্বিতীয় তাম্রশাসনেও অসুর রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অনুশাসনে ২০শ ছত্রে আমরা পাই—

"অসুরেশপত্তলায়াং কমোলীগ্রামবাসিনো নিখিলজন-পদানুপগ-তানপি চ রাজরাজ্ঞী-যুবরাজ-মন্ত্রি-পুরোহিত-প্রতীহার, সেনাপতি—"

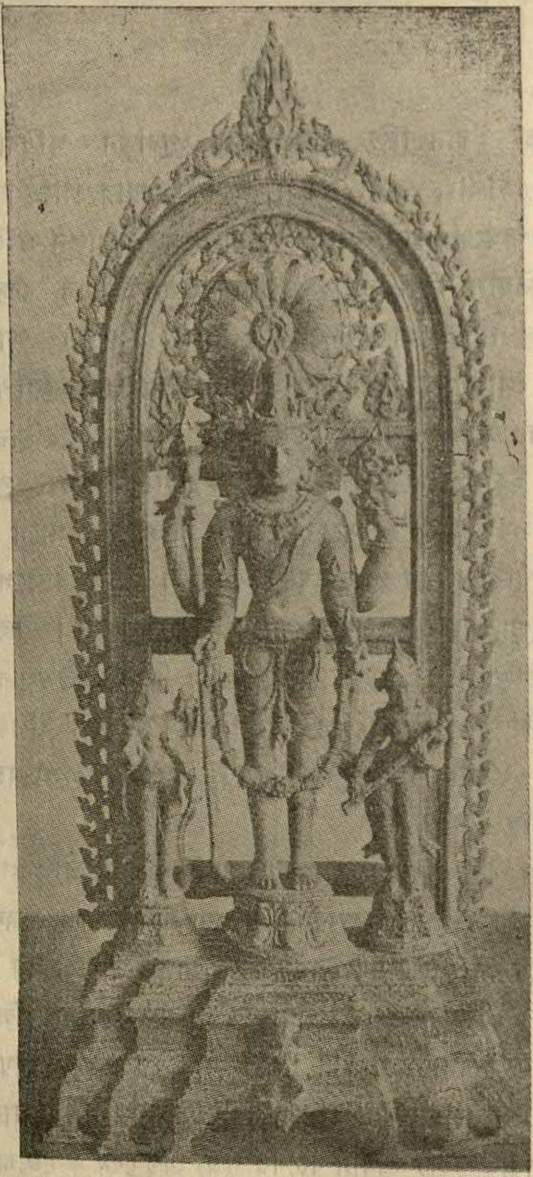
বেহারের অন্তর্গত রাজগীরে 'জরাসন্ধকী বৈঠক' আছে। ইহা অতি প্রাচীন। ফর্গুসনের মতে ইহা প্রাক্‌মৌর্যযুগে নির্মিত। আসিরিয়ার Birs Nimrud-এর ইহা ঠিক নকল বলিলেও চলে। আসিরিয়ার অসুরদের সঙ্গে ভারতীয় অসুরদের আদান-প্রদান ছিল। ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

বিষ্ণু

ব্রাহ্মণ ও ইরানজাতি প্রত্নওকসের পুরাতন অধিবাসী। এ প্রত্নওকঃ কোথায়, তাহা লইয়া অনেক বিচার আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে সে-সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। এই পুরাতন অধিবাসীদের কোন ইতিহাস ছিল না। ব্রাহ্মণদের রস-ভাণ্ডার বেদ আছে, আর ইরানজাতির আছে—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লিপি। আর আছে অবেস্তা। আমাদের বেদ এবং ইরানদের অবেস্তা ও লিপি পড়িলে একটা বিষয় জানিতে পারা যায়। সেটি হইতেছে, ইহাদের সৌখ্য। পূর্বে যখন ইহারা এক জায়গায় ছিল—তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃব্য বলিয়া বুঝিত। সহোদর ভ্রাতা না হইলে, আগে 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়াই পরিচয় হইত। এখন যেমন 'পিতৃব্য' বলিলে বাপ না বুঝাইয়া খুড়া, জ্যাঠা বোঝায়, তখন এইরূপ বুঝাইত। কিন্তু যখন ইহাদের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল, তখন ক্রমশ উভয়ের প্রতি আকর্ষণ উভয়ে ভুলিয়া গেল। বৈদিকগণ 'ভ্রাতৃব্য' বলিয়া ইরান-জাতিকে ভৎ'সনা করিতে লাগিল। তাই তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণে দেখিতে পাই—

"এতয়া বৈ দেবা অসুরান্নতৎক্রামন্নতিপাপ্মানং ভ্রাতৃব্যং ক্রামতি য এয়া স্তুতে।"—ভাষ্যকার বলেন, ভ্রাতৃব্য শব্দের মানে শত্রু।

পরে যে কারণেই হউক, এমন হইল যে দুই দলে কোন সম্পর্কই রহিল না। কি জন্য যে তাহাদের এ রকম মনোমালিন্য হইল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দুঃখের বিষয়, কোন Thucydides তাহাদের এই বিবাদের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। এখন এসিয়ার দুইটি প্রধান বংশের পূজ্য গ্রন্থ বেদ ও জে.ন্দ অবেস্তা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া, ইহাদের বিষয় কিছু জানিতে হইবে। বেদ ও অবেস্তা মিলাইয়া আমরা পাই যে, পূর্বে দুই জনেরাই



বিষ্ণু
(রঙপুর সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত মূর্তি হইতে)

সূর্য, অগ্নি ও প্রকৃতির মহাপূজক ছিল। যদিও তাহাদের এইরূপ উপাসনার কি উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারা যায় না, তবুও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যে, উভয়েরই পূজানুষ্ঠান ছিল। উভয়েরই যজ্ঞানুষ্ঠান ছিল—তবে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি স্বতন্ত্র ছিল। অর্মজ্দ্ অহুরমজ্দা এবং অঙ্গ্র্মৈন্যুস্ ঋগ্বেদে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ২৪ সূক্তে বরুণকে বিচক্ষণ 'অসুর' বলা হইয়াছে। আর সেই একই সূক্তে নির্ঋতি বা পাপ দেবতার নাম করা হইয়াছে। নির্ঋতি ও অঙ্গ্র্মৈন্যুস্ একার্থবাচক। বরুণের সৃষ্টিশক্তিও যেরূপ, অর্মজ্দেরও সেইরূপ। এত মিল থাকা সত্ত্বেও ইহাদের যজ্ঞপদ্ধতি অন্যরূপ। যাহারা ভারতে প্রবেশ করে, তাহারা Zoroasterএর উপদেশের ঘোর বিরুদ্ধাচারী বলিয়াই বোধ হয়। উভয়েই অগ্নির পূজক ; ঋগ্বেদে আছে—

"অগ্নিঃ পূর্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত"—১.১.২।

সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—"অয়মগ্নিঃ পুরাতনৈর্ভৃগ্বঙ্গিরঃপ্রভৃতি-ভিরীড্যো স্তুত্যঃ।" বৈদিকগণ অগ্নিকে "অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্" বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন, আর ইরানগণ অগ্নিকে অর্মজ্দের পুত্রদের বলিয়া সম্পূজিত করিয়াছেন (Vendidad, Farg. xix, 112)। দেব ও অসুরগণ উভয়েই সূর্যকে উপাসনা বিষয়ে একচেটিয়া করিবার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ তাই বোধ হয় উপদেশ করিতেছেন—"দেবাসুরাঃ সংযতা আসন্। ত আদিত্যে ব্যাযচ্ছন্ত। তং দেবা সমজয়ন।"

আদিত্য-ব্যাপার লইয়া দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিল। দেবগণ জয়লাভ করিলেন।

ইন্দ্র-সম্পর্কেও এইরূপ বিবাদ হয়। ঋগ্বেদ (১.৭.১০) বলিয়াছেন—"অস্মাকমস্তু কেবলঃ।" ইরানদেরও বেরেথ্ঘ্ন অতি মান্য দেব। বৈদিকগণ ইরানদের গুরুকে গুরু বলিয়া স্বীকার

করেন নাই। তবে কয়েকজন অসুরগুরুর প্রাধান্য তাঁহারা অঙ্গীকার করেন। ইহারাই পুরাতন ঋষি। ইহারা সম্ভবত প্রত্নওকসের ঋষি। অসুরগুরু শুক্রের পিতা ভৃগু। শুক্রের অপর নাম উশনা, ভার্গব, কবি। জে.ন্দের 'উস' (Yasna. 19) ও উসনা বোধহয় অভিন্ন। 'বহ্‌রম্ ইরস্ত.'এ 'উস'কে 'কবি উস' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। খোর্দ অবেস্তায়ও বোধ হয় 'উশিনেমো' ও 'উশনাক' ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

বেদ ও অবেস্তা সূর্য-পূজার অনেক উদাহরণ দিয়াছে। শত-পথ-ব্রাহ্মণ, তৃতীয় কাণ্ডে (১.৩.১৭ ; ২.২.৪) উপদেশ করিয়াছেন যে, যজ্ঞ, বৎসরের পরিমাণের সমান, আর সেই বৎসরই প্রজাপতি, সেই বৎসরই বিষ্ণু। প্রজাপতি প্রাগ্-বৈদিক যুগে সোম-দেব ছিলেন—প্রাচীন চান্দ্র বর্ষের দেবতা ছিলেন এবং বিষ্ণু প্রথমে যিনি বাসুকি ছিলেন, তিনি সৌরচান্দ্র বৎসরের অধিদেব হইলেন। প্রতীচ্য পণ্ডিত Hewitt (J.R.A.S., 1890 p, 319), বিষ্ণুকে snake sungod বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আর্যগণ ভারতে আসিবার পূর্বেও ভারতের তদানীন্তন অধিবাসীদের সৌর দেবতা ছিল, তাহার মাথার চারিদিকে সর্প বিরাজ করিত, এ কথা দ্রবিড়-সভ্যতার প্রাচীনতম যুগের আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আর্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা কূট রাজনীতির অনুসরণ করিয়া ভারতের আদিম জাতির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া, তাহাদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের দেবতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া বেমালুম আপনাদের ধর্মের সঙ্গে মিশাইয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য দেশেও প্রাচীনকালে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিশিষ্ট জাতি কোন নূতন দেশ বা জাতিকে জয় করিয়া সেই দেশবাসীর দেবতার প্রতি ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করিয়া, তৎপরিবর্তে সেই দেশের দেবতার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন।

এখন দেখা যাইতেছে, যে আকারেই হউক, সূর্যপূজা প্রাগ্-বৈদিক যুগে ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচলিত ছিল। বিষ্ণু সেই সূর্য-দেবতা।

আর এক জাতির সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্য-সভ্যতার সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। হিটাইটদিগের ধর্ম কতকটা বাবিরুষ ধর্মের মত। হিটাইটদিগের দেবতার তালিকায় প্রথমে সূর্যদেবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ধর্ম সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার মত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। তবে Boghas Keui Tabletগুলির উপর চারিটি মিতান্নি দেবতার নাম পাওয়া যায়। "Mitteilungen der deutschen Orient-Geselschaft"-নামক জর্মান প্রাচ্য-ইতিহাসের ভূমিকা গ্রন্থের ৩৫শ অধ্যায়, ৫১ পৃষ্ঠায় এই চারিটি নাম আছে। সেই চারিটি নাম এই,—

(১) mi-it-ra-as′-si-il

(২) u-ru-w-ra-as′-si-el

(৩) in-da-ra

(৪) na-s′a-at-ti-ia-an-na

এট চারিটি নাম যে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্য, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এইগুলি দেখিয়া কে না স্বীকার করিবে যে, হিটাইটদের সহিত খ্রীস্টপূর্ব দুই হাজার বৎসর পূর্বেও এখানকার আর্যের কোন না কোন সম্পর্ক ছিল? ইহাদের কত ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে। হয় ত কোন দিন বিষ্ণুরও সন্ধান বাহির হইয়া পড়াও অসম্ভব নয়।

বিষ্ণু বৈদিক যুগের এক পুরাতন দেবতা। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব, চারি বেদেই বিষ্ণুর কথা আছে। আর সকল বেদেই এরূপ উক্তি আছে, যাহা দ্বারা বলিতে পারা যায় যে, বিষ্ণুর স্থান দেবতাদিগের মধ্যে উচ্চই ছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে,

বিষ্ণু ছোট দেবতা ছিলেন। এ কথা নিতান্তই অগ্রাহ্য। ঋগ্বেদে ১০৫ বার, সামবেদে ২৪ বার, যজুর্বেদে ৫৯ বার এবং অথর্ববেদে ৬৬ বার বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। সপ্তম মণ্ডলের ২৫শ, ৩৬শ, ৩৯শ, ৪০শ, ও ৯৩ সূক্তে আরও দশজন দেবতার সঙ্গে বিষ্ণুকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত সূক্তে তাঁহার গুণক্রিয়ার কোন পরিচয়ই নাই। অবশ্য এ কথা অস্বীকার্য নয় যে, সেই সমস্ত দেবতা সম্মানে ইন্দ্রের অপেক্ষা ছোট। ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু বেশ জমকাল দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ৫ম মণ্ডলের ৩য়, ৪৬শ, ৫১শ ও ৮৭ সূক্তে অন্যান্য দেবতাদের নিকট 'রিক্‌থ' প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি বা সোমের মত বিষ্ণু তেমন নাম করিতে পারেন নাই। এই মত ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়; কেন না, প্রথম মণ্ডলের ১৫৬ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু মরুদগণসেবিত এবং রাজা বরুণ ও অশ্বিগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতেছেন।

"তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা
ক্রতুঙ্ সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ॥"—৪

বিষ্ণু পূর্বে অন্যান্য দেবতার ন্যায় একজন দেবতামাত্র থাকিলেও পরে তিনি বড় হইয়া ইন্দ্রের সখ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আর পরে তিনি ইন্দ্রকে উপযুক্ত সখা রূপেও পাইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ বলিতেছেন—দৈব বিষ্ণু, যিনি নিজে সুকৃত্তর হইয়াও সুকৃৎ ইন্দ্রের সঙ্গে সখিত্ব লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন,—

"আ যো বিবায় সচথায় দৈবঃ
ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ সুকৃতে সুকৃত্তরঃ॥"—১.১৫৬.০

এই বিষ্ণু যে ইন্দ্রের সখা ও সহায়ক, তাহা ঋগ্বেদ ঈরিত করিতেছে,—

"বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।"—১.২২.১৯

ঋগ্বেদে আছে, ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, সখে বিষ্ণু, বেশ ভাল করিয়া লাগিয়া যাও,—

"অথ অব্রবীদ্ বৃত্রমিন্দ্রো হবিষ্যন্
সখে বিষ্ণো বিতরং বিক্রমস্ব॥"—৪.১৮.১১

৮.৬৬.১০ ঋকে ইন্দ্রপ্রার্থিত হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। বেদে বিষ্ণু প্রাচীন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন,— "যঃ পূর্বায় বেধসে" (১.১৫৬.২)—"যিনি পূর্ব প্রাচীন যে বিষ্ণু, তাঁহার পূজা করেন।" আমরা সাধারণত বলিয়া থাকি, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা এবং প্রলয়ের অধীশ্বর ছিলেন মহাদেব। আমাদের উক্তিতে বিষ্ণুর একটি গুণ 'জগৎপালন'। এই বিশেষণের সার্থকতা আমরা বেদ অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাই,—

"বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি" (৩.৫৫.১০)—বিষ্ণু পালনকর্তা, পরম স্বর্গকে রক্ষা করিয়া থাকেন। 'বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্য' ১.২২.১৮।

বিষ্ণু, দুর্গত মানুষের জন্যই পার্থিব ধামে বিচরণ করিয়াছিলেন —'যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।" —৬.৪৯.১৩

বিষ্ণু পরমলোক অবগত আছেন। (বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে—৭.৯৯.১) ; বিষ্ণুর শক্তিতে দ্যুলোক ঊর্ধ্বে অবস্থিত, তাঁহারই প্রভাবে তাহা নিপতিত হইতেছে না (৭.৯৯.২), ঋগ্বেদের কয়েকটি ঋকে তাঁহার মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। বৈদিক যুগে লোকে প্রার্থনা করিত—যাহাতে আমরা যথেষ্ট অন্ন ও প্রচুর ধনলাভ করিতে পারি, তাহার উপায় করিয়া দাও। বিষ্ণুর নিকট লোকে পার্থিব ভোগ-বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিত।

বিষ্ণু শুধু বিশ্বকে ধারণ ও পালন করিয়া ক্ষান্ত নহেন। তিনি এই পৃথিবীকে মনুষ্যের বাসের উপযোগী করিয়া বিশেষ করিয়া নির্মাণ করেন। তিনি প্রবৃদ্ধ। তিনি রজোলোকের পরপারে বাস করেন।

বিষ্ণু শতসংখ্যক কিরণবিশিষ্ট। বিষ্ণুর রূপ কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে তিনি 'শিপিবিষ্ট'—অর্থাৎ কিরণবিশিষ্ট ছিলেন, বেদে ইহারই উল্লেখ আছে। বৈদিক বিষ্ণু একবার নিজের রূপ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য রূপ ধরিয়া সংগ্রামে বশিষ্ঠের সাহায্য করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন,—তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছ—আমাদের নিকট হইতে তোমার রূপ লুকাইও না।

বিষ্ণু বৈদিক যুগে সাধারণের পূজা পাইতেন। সূর্যের নানা গুণাবলী তাঁহাতে দ্যোতিত হইয়াছে। যে কয়েকটি ঋকে শুধু তাঁহারই গুণগাথা কীর্তিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা পাঁচের বেশী নয়। বেদের যে কয়টি স্থানে বিষ্ণু পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন, সেই ঋক্‌গুলি আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, বিষ্ণু ও সূর্য অভিন্ন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একটি ঋকে দেখা যায়, বিষ্ণু তিন পদ বাড়াইয়াছিলেন—

(১) "ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।" ১.২২.১৮

(২) বিষ্ণু তাঁহার সুদীর্ঘ বিচক্রমণে ত্রিপদ দ্বারা সমস্ত জগৎকে পরিমাণ করিয়াছিলেন,—

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং
সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥ —ঋ°১.২২.১৭

তাঁহার প্রথম দুই পদ মনুষ্য লাভ করিতে পারে ও জানিতে পারে—কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। পক্ষিগণও তত দূর গমন করিতে পারে না। এই কথাই ঋগ্বেদ এইরূপভাবে উপদেশ করিয়াছেন,—

"দ্বে ইদস্য ক্রমণেস্বর্দৃশোঽভিখ্যায় মর্ত্যোভুরণ্যতি।
তৃতীয়মস্য নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চ ন পতয়ন্ত পতত্রিণঃ॥"—১.১৫৫.৫

যাঁহারা সূরি অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁহারাই স্বর্গে সন্নিবিষ্ট চক্ষুর ন্যায় পরমপদ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন,—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং পদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥"—১.২২.২০

এই বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস বিদ্যমান, ইহাতে দেবগণ আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন,—

"তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধবিথা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥"
—১.১৪৫.৫

(৩) বিষ্ণু সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, তিন বার পদনিক্ষেপ করিবার সময় ঊর্ধ্বমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।

"বিষ্ণোর্নু বীর্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণস্ত্রেধোরুগায়॥"—১.১৫৪.১

(৪) তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিয়াছিলেন,—

"যঃ পার্থিবানি ত্রিভি বিদ্বিগামভিরুরুক্রমিষ্টো রুগায়ায়
জীবাম॥"—১.১৫৫.৪

তিন বার ভূলোক পরিক্রম করিয়াছিলেন,—

"যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি ত্রিশ্চদ্বিষু মনবে বাধিতায়।"

(৫) এই পৃথিবী তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন,—

"বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং...." ইত্যাদি।—৭.১০.৪

"ত্রির্দেবঃ পৃথিবীমেষ এতাং...."
ইত্যাদি।—৭.১০০.৩

(৬) দেবতারা যেখানে আনন্দ করেন, বিষ্ণু তিন পদবিক্ষেপে তথায় উপনীত হইলেন।

"ত্রীণ্যেক উরুগায়ো বিচক্রমে যত্র দেবাসো মদন্তি।"—৮.২৯.৭

এই সমস্ত ঋকে বিষ্ণুর পদবিক্ষেপের স্থান সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, বিষ্ণু ভূলোক, পৃথিবী, অথবা জগৎ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন।

এই বিবরণের দ্বিতীয় প্রকরণের ঋকে পৃথিবী বুঝাইতে পারে,

তৃতীয় প্রকরণের ঋকে তাহার সহিত স্বর্গও বুঝায়। শেষের (৬) নির্দিষ্ট ঋকে বিষ্ণু পদবিক্ষেপ দ্বারা কোথায় পৌছিলেন, তাহাও বিবৃত হইল। কোন একটি ঋকে এক এক বিশেষ দেবতা সূচিত হইতেছে, নাম অপ্রকাশ, তবে বিশেষত্বে মনে হয়, বিভিন্ন প্রকৃতির দুই দেবতার কথা বলা হইয়াছে। তিনবার পরিক্রম করাই বিষ্ণুর বিশেষত্বসূচক, তাহা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যেখানে দেবতারা ও পুণ্যাত্মারা থাকেন, যেখানে সোম বিদ্যমান, সে স্থান বিষ্ণুর সর্বোচ্চ পদের বিশেষত্বজ্ঞাপক বলা যাইতে পারে। স্বর্গের যে স্থানে দেবতারা আনন্দ করেন, সে স্থান নিশ্চয়ই স্বর্গের সর্বোচ্চ ধাম। এই ত্রিপদ সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন ভাষ্যকার শাকপুণি বলেন, তিনটি পদ পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও আকাশে স্থাপিত হইয়াছিল (পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবীতি শাকপুণিঃ)। দুর্গাচার্য বলেন, ত্রিপদের অর্থ, পার্থিব অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্য ;—পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে, তদধিতিষ্ঠতি ; অন্তরীক্ষে বিদ্যুতাত্মনা ; দিবি সূর্যাত্মনা।" বাজসনেয়ী-সংহিতার ভাষ্যকার কার্যত এই মতই মানিয়া লইয়াছেন। তিনি অর্থ করেন—অগ্নি, বায়ু, সূর্য। বাজসনেয়ী-সংহিতা, তৈত্তিরীয়-সংহিতা এবং শতপথ-ব্রাহ্মণে বরাবরই এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে। Max Muller ও Oldenburg এই মতের অনুবর্তী। কিন্তু ঔর্ণবাভ এই মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, —"সমারোহণে, বিষ্ণুপদে গয়াশিরসি।" সমারোহণে অর্থাৎ উদয়গিরিতে সমুত্থানপূর্বক একপদ নিধান করেন। (নিরুক্ত, ১২শ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ, ১৯) রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডেও এই অর্থের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়,—

"তত্র পূর্বপদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমঃ।
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ ॥"—৪০.৫৭

কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল (Ind. Ant. 1918. p. 84.) মনে করেন

যে, বিষ্ণু সত্য সত্যই গয়াপর্বতোপরি বিষ্ণুপাদে সমুত্থিত হইয়া বিচক্রমণ করেন।

বেদে উক্ত আছে যে, অদিতিনন্দন বা আদিত্য সংখ্যায় সাত বা আট। শতপথ-ব্রাহ্মণে এক বার অষ্ট আদিত্যের কথা বলা হইয়াছে, আর একবার বলা হইয়াছে যে, আদিত্যগণ সংখ্যায় দ্বাদশটি। আর বিষ্ণু আদিত্যদিগের মধ্যে একজন। মহাভারতেও অদিতি-পুত্র ১২জন আদিত্যের উল্লেখ আছে এবং বিষ্ণুই দ্বাদশ আদিত্য ; বিষ্ণু গুণে ও গরিমায় অন্যান্য আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর সৌরত্ব প্রমাণ করিতে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না। বিষ্ণুকে যে অনেক করিয়া বড় হইতে হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। শতপথ-ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে, বিষ্ণু দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিলেন। অন্যান্য দেবেরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং নানা কৌশলে তাঁহার মস্তককে দেহচ্যুত করাইলেন। কিন্তু এমন ঘটনা হইল, যাহাতে তাঁহারা শীঘ্র আপনাদের ভুল বুঝিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন এবং বিষ্ণুকে পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা স্বর্বৈদ্য অশ্বিদ্বয়ের আরাধনা করিতে লাগিলেন। ফলে বিষ্ণু পুনর্জীবিত হইয়া দেবতাদের মধ্যে আসিলেন। এই বিষ্ণু আদিত্য—সূর্যনারায়ণ। বেদে বিষ্ণুর আর এক মূর্তির কল্পনা আছে। এটি তাঁহার যজ্ঞমূর্তি। শতপথ-ব্রাহ্মণেও বিষ্ণুর যজ্ঞমূর্তির কথা কয়েকবার উল্লিখিত আছে। যজ্ঞনারায়ণরূপে আজও বিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের সংহিতাভাগে বিষ্ণুর স্থান যেরূপ ছিল, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মণ ভাগে বিষ্ণুর বিশেষ সমাদরের উপক্রম হইতে আরম্ভ হয়, ইহা ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে বিষ্ণু পরম-পুরুষের স্থান অধিকার করেন। বিষ্ণু কেন এই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, জনগণ তাঁহার

তৃতীয় পদ অর্থাৎ মানবজ্ঞানের অতীত পরমপদের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পরিশেষে বিষ্ণুকে এই শ্রেষ্ঠতম পদ প্রদান করেন। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন,—

"অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমস্তদন্তরেণ সর্বা অন্যা দেবাঃ।"
—১.১

ঐ যে অগ্নি, তিনি দেবগণের অবম (প্রথম), আর বিষ্ণু দেবগণের পরম (অন্তিম); অন্য দেব ইঁহাদের মধ্যে অবস্থিত।

শ্রুতিতে অগ্নিকে দেবতাগণের মুখ-স্বরূপ ও প্রথম এবং বিষ্ণুকে উত্তম অর্থাৎ অন্তিম বলা হইয়াছে।

"অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং সঙ্গতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।"

অন্য দেবগণ অর্থে অগ্নিষ্টোমের অঙ্গীভূত শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য (শাস্ত্র-গীতিরহিত ঋক্স্তুতিবিশেষ—আনন্দগিরি, তৈ-উপ°, ১.৮) ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি প্রধান দেবতা কয়েকজনকে বুঝাইতেছে। অগ্নি ও বিষ্ণু তাঁহাদের আদিতে ও অন্তে রক্ষকবৎ বর্তমান।

শতপথ-ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে একটি কাহিনীর উল্লেখ আছে। দেবতাগণ শ্রী, শৌর্য ও অন্নলাভের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি তাঁহার নিজ ক্রিয়া দ্বারা অন্যান্য দেবের পূর্বে যজ্ঞের চরম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন, তিনিই দেবগণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান স্থান লাভ করিবেন। বিষ্ণু অন্য সকলের পূর্বেই তাহা লাভ করেন; সুতরাং তিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন এবং এই জন্যই বিষ্ণুকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে।

এই কাহিনীটি নিবদ্ধ হইবার পূর্বেই কিন্তু বিষ্ণু "পরমপদ" লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার পরমপদ-প্রাপ্তির কারণ নির্দেশ করিবার জন্যই এই কাহিনীর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

আবার এই একই ব্রাহ্মণে বামনরূপী বিষ্ণুর কাহিনী আছে। এই কাহিনী উপদেশ করে যে, এক সময়ে সুর ও অসুরগণের মধ্যে

যজ্ঞের স্থান লইয়া বিবাদ হয়। অসুরগণ বলেন যে, তাঁহারা সুরদিগকে শয়ান বামনদেহের পরিমিত স্থান প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন। কাজেই বিষ্ণুকে শয়ন করিতে হইল। কিন্তু তিনি এরূপভাবে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইলেন যে, তিনি সমস্ত পৃথিবী নিজ শরীর দ্বারা ব্যাপিয়া ফেলিলেন; সুতরাং দেবতারা সমস্ত পৃথিবীই প্রাপ্ত হইলেন। সুরগণের যজ্ঞানুষ্ঠানও সুসিদ্ধ হইল।

এই কাহিনীতে বিষ্ণুর প্রতি অপূর্ব অত্যাশ্চর্য শক্তি আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে যে তাঁহাকে পরমপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ বুঝায় না।

মৈত্রেয়ানী-উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে বিশ্বভৃৎ অন্নকে ভগবদ্‌বিষ্ণুর তনু বলা হইয়াছে।

"বিশ্বভৃৎ বৈ নামৈষা তনূর্ভগবতো বিষ্ণোর্যদিদমন্নম্"।

কঠোপনিষদে কিন্তু বিষ্ণুকে পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানসারথি ও মনঃপ্রগ্রহবান, তিনিই পন্থার অপর পারে গমন করেন, তিনিই বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন।

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥—৩য় বল্লী, ৯

ইহাতে মানবাত্মার গতি পর্যটনরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মানব এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে পথের শেষে উপনীত হইলে, পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই পরমপদই জীবের চরম লক্ষ্য—ইহাই তাহার অনন্ত সুখ-নিকেতন।

অতঃপর বিষ্ণুকে গৃহদেবতারূপেও পূজিত হইতে দেখা যায়। বিবাহের সপ্তপদী রীতিতে আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী ও পারস্করের গৃহ্যসূত্রমতে কন্যা যখন চতুর্থ পদ প্রক্ষেপ করে, তখন বরকে বলিতে হয়, "বিষ্ণু তোমাকে নয়ন করুন", "বিষ্ণু তোমার সহিত অবস্থান করুন।"

রামায়ণ ও মহাভারত-যুগে বিষ্ণু সর্বথা ব্রহ্মপদবাচী হইয়াছিলেন। ভীষ্মপর্বের ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে ব্রহ্মাকে নারায়ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ও বাসুদেব যে অভিন্ন, তাহা বলা হইয়াছে।

বৈদিকযুগে অবতারের ইঙ্গিত

মৎস্য, ভাগবত ও অগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণুর অবতার একটি মৎস্যের দ্বারা মানবের আদিপুরুষ মনু রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই পুরাণগুলির বর্ণনা ও মহাভারতের বর্ণনা একই রকমের। তবে মহাভারতে বিষ্ণুর পরিবর্তে ব্রহ্মা প্রজাপতিই মৎস্যাবতার হইয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১.৮.১.১) কাহারও অবতারের কথা কিছু নাই। আছে শুধু একটি মৎস্য মনুকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করেন। মৎস্য ও কূর্মের অবতার পরে বিষ্ণুর সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়।

বরাহ ও বামন অবতারের মূল ঋগ্বেদ হইতে বাহির করিতে পারা যায়। আর সেই দুইটি অবতারের সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ক আছে।

বামন অবতার

অসুররাজ বলির হস্ত হইতে লোক-রক্ষার জন্য বিষ্ণুর ত্রিপদগমন অবলম্বন করিয়া বামন অবতারের কথা রচিত। রামায়ণে এই অবতারের কথা এইরূপ,—

বিরোচনপুত্র বলি দেবেন্দ্র ইন্দ্রকে জয় করিয়া ত্রিলোক শাসন করেন। তখন ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সহিত বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলেন, বলি যজ্ঞ করিতেছেন। যজ্ঞান্তে তিনি দানে সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করিবেন। বামনরূপ ধরিয়া বলির নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার জন্য তাঁহারা বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন। বিষ্ণুও তাঁহাদের অনুরোধক্রমে বামনরূপ ধরিয়া, বলির নিকট ত্রিপদ-

পরিমিত স্থান প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহা দান করিতে স্বীকার করিলে, তিনি আশ্চর্য মূর্তি ধারণ করিয়া, প্রথম পদে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিলেন। দ্বিতীয় পদে অন্তরীক্ষ ও তৃতীয় পদে আকাশ অধিকার করিলেন। তার পর, বলিকে পাতালে পাঠাইয়া তিনি ইন্দ্রকে পুনরায় ত্রিলোকের অধীশ্বর করিলেন। মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের আখ্যান-বস্তু একই রকমের।

শতপথ-ব্রাহ্মণে (১.২.৫) আখ্যায়িকাটি এইরূপ,—অসুরগণ দেবতাদের জয় করিয়া পৃথিবী ভাগ করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে অগ্রে করিয়া তাহাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন,—আমাদেরও পৃথিবীর কিছু ভাগ দাও। তাহারা দেবগণকে বলিল, বিষ্ণু শয়ন করিয়া যতটুকু অধিকার করিতে পারিবেন,তাহারা দেবতাদের ততটুকু স্থান দিবে। বিষ্ণু বামন হইলেন। দেবতারা অসুরদের প্রস্তাবে রাজি হইল। তাহারা ভাবিল, তাহারা যখন যজ্ঞ-পরিমিত ভূমি পাইয়াছে, তখন তাহারা যথেষ্টই পাইয়াছে। তারপর বিষ্ণুর সহিত যজ্ঞ করিয়া তাহারা সমগ্র পৃথিবী পাইল। এই আখ্যায়িকায় বিষ্ণুর ত্রিপদ সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। কিন্তু শতপথ-ব্রাহ্মণের অন্যত্র (১.৯.৩৯) দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু তিন পদবিক্ষেপ দ্বারা দেবতাদের জন্য সর্বব্যাপক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৬.২.৪) এ সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। পূর্বে পৃথিবী অসুরদিগেরই ছিল। কেবল একজন মানুষ বসিয়া যত দূর দেখিতে পায়, তৎপরিমিত ভূমি দেবতাদের ছিল। যখন দেবতারা পৃথিবীর ভাগ চাহিল, তখন অসুরগণ বলিল, তোমাদিগকে কতটুকু স্থান দেওয়া হইবে? দেবতারা উত্তর দিল, "এই শৃগালী তিন পদচারণে যত দূর যাইতে পারে, তত দূর।" অসুরেরা স্বীকার করিল। তখন ইন্দ্র শৃগালীর বেশ ধরিয়া, তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী গমন করিল। ইহাতে দেবতারা পৃথিবীর অধিকার লাভ

করিল। এখানে ত্রিপদ আছে বটে, কিন্তু বিষ্ণুর পরিবর্তে ইন্দ্রের। ঋগ্বেদে এই দুই দেবতার স্তব বহু স্থলে একত্র নিবদ্ধ থাকায় বোধ হয়, বিষ্ণুর স্থানে ইন্দ্রের আদেশ হইয়া থাকিবে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৬.১৫) আছে যে, ইন্দ্র ও বিষ্ণু অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তিন পদক্ষেপে বিষ্ণু যত দূর যাইতে পারিবেন, তাহা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর প্রাপ্য হইবে—এই সর্তে অসুরেরা সম্মত হয়। বিষ্ণু তদনুসারে লোকসমুদয়, বেদ ও বাক্য অতিক্রম করেন। তারপর ঋগ্বেদে বহুবার বিষ্ণুর ত্রিপদ বিক্রমণের কথা পাওয়া যায়। তৎসম্বন্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

কূর্ম ও মৎস্য অবতারের প্রাচীনতম আখ্যায়িকা শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত-পুরাণকার বলেন, জলপ্লাবনে নষ্ট বস্তু উদ্ধারের জন্য ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু কূর্মাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। দেবাসুরগণ সেই সাগর মন্থনে যোগ দিয়াছিল (ভাগবত, ১.৩.১৬)। এই বিবরণের সঙ্গে ব্রাহ্মণযুগের বিবরণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শতপথ-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির পূর্বে কূর্মাকার ধারণ করিয়াছিলেন (৭.৫.১.৫); তৈত্তিরীয়-আরণ্যকেও (১.২৩.৩) দেখা যায়, প্রজাপতির মেদাংশ কূর্মাকার ধারণ করিয়া জলে বিচরণ করিয়াছিলেন। এখনও নষ্ট বস্তুর উদ্ধারের জন্য বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের কথা বলা হয় নাই। প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রজাপতি কূর্মাকার ধারণ করিয়াছিলেন।

নরসিংহ অবতারের সূত্র বা ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে (১০.১.৬) একবার মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যের আর কোথাও কিছু পাওয়া যায় না।

বেদে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কথা আছে। ব্রাহ্মণ-যুগে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি জীবের আপৎকালে কয়েকটি রূপ ধারণ করিয়া কূর্ম বরাহাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তার পর নারায়ণের অস্তিত্ব আমরা উপনিষদে সর্বপ্রথম উপলব্ধি করি। বেদে নারায়ণের

নামগন্ধ নাই। তবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৮২.৫.৬) দেখিতে পাই,—

"পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।
তমিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।"
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥

বেদের এই বাণী উপদেশ করিতেছে,—যখন আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, দেবগণও ছিলেন না, তখন যাহা জলে ভাসিয়াছিল এবং দেবগণ যাহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই যে অণ্ড, তাহা কি? দেবগণ যে অণ্ডমধ্যে অবস্থিত, তাহা জলমধ্যে অবস্থিত ছিল। জন্মরহিত যিনি, তাঁহার নাভির উপর এমন কিছু অবস্থিত ছিল, যাহার মধ্যে সকল প্রাণীই ছিলেন। জন্মরহিত যিনি নারায়ণ-পদবাচ্য হইলেন, তাঁহার নাভির উপরিস্থিত যে অণ্ড, তাহা ব্রহ্মা হইলেন।

নারায়ণ জলমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। মনু ও পুরাণের বচনে বিষয়টি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনু বলেন, জলের নাম 'নারা'; কারণ, জলই বস্তুত নরের পুত্র। জল ব্রহ্মার প্রথম আশ্রয় বা অয়ন ছিল বলিয়া, পরমপুরুষের নাম নারায়ণ। বৈদিক এই বাণীর সঙ্গে নারায়ণের অভিন্নতা ঘটাইয়া উপনিষদ্‌যুগে নারায়ণ পরমপুরুষ-পদবাচ্য হইলেন। কাজেই পরমপুরুষ পদবাচ্য বিষ্ণুর সহিত তাহার অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়া গেল। এইরূপে আবার বৈদিক যুগের শেষভাগে সকলের প্রিয় দেবতা বাসুদেব ও বিষ্ণু একত্ব—অভিন্নতা সম্পাদিত হইল। এই নারায়ণ ও বাসুদেব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

হিন্দু চিরদিনই নারায়ণ শব্দের সহিত পরিচিত। বেদ, উপনিষৎ, মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে হিন্দু যেমন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিত, এখনও সে তেমনই করিয়া থাকে। ভক্তিতে হউক

বা না হউক, আজও তাঁহার সেই নারায়ণ নাম তাঁহার ভিতর বাহিরে সাড়া দিয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও ভূতসমষ্টি যে পুরুষ হইতে জন্মিতেছে, সঞ্জীবিত হইয়া থাকিতেছে এবং পরিশেষে পুরুষেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তিনি পরব্রহ্ম নারায়ণ। বেদ ইহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে সর্বপ্রথম পুরুষ নারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুরুষ নারায়ণ ও পরমতত্ত্ব নারায়ণ বোধ হয়, পূর্বে একতত্ত্ব ছিলেন না: কেন না, শতপথ-ব্রাহ্মণে (১২.৩.৪) দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষনারায়ণ যজ্ঞ করিতেছেন, যজ্ঞভূমি হইতে বসু, রুদ্র ও আদিত্য-সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায় যজ্ঞ করিতে বলিলেন। যজ্ঞ করিয়া নারায়ণ সর্বভূতে ওতপ্রোত হইলেন এবং পরমাত্মায় পরিণত হইলেন। শতপথের আর এক স্থানে (১৩.৬.১) দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ-নারায়ণ পঞ্চরাত্র সত্র করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। এই সত্রের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সকল জীবের শ্রেষ্ঠতম হইবেন এবং সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা হইবেন।

তিনি সত্র সম্পন্ন করিয়া অন্তরাত্মাই হইয়াছিলেন। গর্ভোপনিষৎ ও মহোপনিষৎ নারায়ণকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আত্মপ্রবোধ উপনিষৎ ও সাকল্যোপনিষদে তিনি পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। মৈত্রেয়োপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, স্কন্দোপনিষৎ, রামোপনিষৎ, রামতাপনীয়োপনিষৎ এবং মুক্তিকোপনিষদে নারায়ণের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষৎ আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, নারায়ণ বেদের পরবর্তী ব্রাহ্মণভাগে পরমপুরুষ পরতত্ত্ব বলিয়া পূজিত হইতেন। প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র ও নারায়ণ একতত্ত্ব বলিয়া উক্ত আছে। তৎকালে বাসুদেবের অর্চনার কথা বিশেষ জানা যায়। বাসুদেবের উপাসনা

পরিজ্ঞাত থাকিলেও তাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। রামায়ণ ও মহাভারত-যুগে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়। ইহার পূর্বে সম্ভবত নারায়ণোপাসনা প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে যখন বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়, তখন বাসুদেব নারায়ণের সহিত একত্ব লাভ করেন।

তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদে নারায়ণ-উপাসনার একটি মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেটি এই,—

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।" —১০.১.৬।

বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য চতুর্ব্যূহবাদের আলোচনা করিয়াছেন। বেদান্তভাষ্যেও তিনি চতুর্ব্যূহবাদের কথা বলিয়াছেন। সেখানে তিনি নারায়ণের চতুর্ব্যূহবাদ ভাগবত-মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভাগবতমতের এই চতুর্ব্যূহবাদ অগ্রাহ্য। আনন্দগিরি, বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে চতুর্ব্যূহবাদকে দ্রবিড়চার্যের মত বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীরামানুজচার্য শঙ্কর মত খণ্ডনচ্ছলে বলিয়াছেন যে, "সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ, তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে পারে না। যাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্রের (পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের) প্রতিপাদন-প্রণালী অবগত নহেন, তাঁহারাই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। কেন না, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয় প্রদানার্থ স্বেচ্ছায় আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতিপাদনপ্রণালী। যথা,—পৌষ্করসংহিতায়— "যাহাতে গুরু-শিষ্য-ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্ব্যূহের উপাসনা করেন, তাহাই আগম অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র।" সেই চাতুরাত্মোপাসনাই যে বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা, তাহাও এই সাত্বতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। নিত্যসিদ্ধ ষড়্‌বিধগুণ-

সম্পন্ন এবং সূক্ষ্মব্যূহরূপ বিশিষ্টসম্পত্তিশালী সেই বাসুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কর্মদ্বারা অর্চনা করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বলেন,—ভগবদ্বিভব অর্চনার প্রথমে ব্যূহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর ব্যূহের আরাধনায় আবার বাসুদেবাখ্য সূক্ষ্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। বিভব শব্দের অর্থ—রাম কৃষ্ণাদি অবতারসমূহ। ব্যূহ বলিলে বুঝিতে হইবে—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহ। আর সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতেছেন—কেবলই ষড়্‌বিধ নিত্যসিদ্ধগুণময় দেহধারী বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম। পৌষ্করসংহিতা বলিয়াছেন,—

"যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্
অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্বেণ কর্মণা ॥"

অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ব্যূহত্রয় এই পরব্রহ্মেরই স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ, সেই হেতুই, "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে"—'যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।' এই এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিত-বাৎসল্য নিবন্ধন, স্বীয়-ইচ্ছাকৃত অথচ পাপপুণ্য-কর্মাধীন নহে, এরূপ শরীর-ধারণরূপ জন্মপ্রতিপাদন করায়, তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই ব্যূহত্রয়ই জীব, মন ও অহঙ্কার নামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নারদ শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া পরমপুরুষের উপাসনায় নিরত হইলে, পরমপুরুষ নারায়ণ তাঁহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, ঐকান্তিকতা ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। নারদ তাঁহাতে একান্ত নিরত, তাই তিনি নারদকে দেখা দিলেন। তৎপরে তিনি নারদের নিকট বাসুদেবধর্ম বিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন, বাসুদেব পরমাত্মা ও সকল জীবের অন্তরাত্মা। তিনি পরমস্রষ্টা। তিনি সঙ্কর্ষণ-মূর্তিতে সকল জীবের অধিষ্ঠাতা।

সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন বা মনের উৎপত্তি। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। পরমপুরুষ বলিলেন, যাহারা আমার উপরি-উক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই মূর্তিচতুষ্টয়ে প্রবেশ করে, তাহারা বিমুক্ত হয়। এই চতুর্ব্যূহবাদ বহুদিন হইতেই চলিতেছে। বৌদ্ধদিগের আজীবক সম্প্রদায় বা মগ্‌গলী-পুত্ত-মতবাদে ব্যূহবাদের সামান্যরূপ ইঙ্গিত আছে বলিয়া বোধ হয়। মৌর্যদিগের সময় যে ব্যূহবাদ বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহা তৎকালে এবং কিয়ৎকাল পরে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি বিগ্রহপূজায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। পাণিনি সূত্রে (৬.৩.৯৮) বাসুদেব শব্দ আছে। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে এই শব্দটিকে নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা কোন ক্ষত্রিয়ের নাম নহে, ইহা সেই পরম উপাস্যের নাম। উল্লিখিত নির্দেশে "বাসুদেব" "বলদেব" শব্দ দৃষ্ট হয়। স্যর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও গোপীনাথ রাও সংবাদ দিয়াছেন যে, নানাঘাটের বৃহৎ গুহায় একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ঐ শিলালিপিতে অন্যান্য দেবের নামের সহিত দ্বন্দ্বসমাসে 'সঙ্কর্ষণ', 'বাসুদেব' নামও দৃষ্ট হয়। এই শিলালিপির অক্ষর পরীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে,ইহা খ্রীস্টপূর্বে প্রথম শতকে ক্ষোদিত। রাজপুতনায় ঘোষুণ্ডিতে যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার অক্ষর পরীক্ষায় বুঝা যায় যে, উহা অন্তত খ্রীস্টপূর্ব দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

দুঃখের বিষয়, শিলালিপিখানি বিকালাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। উহাতে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার দালানের চারিদিকে একটি প্রাচীর নির্মাণের বিষয় উল্লিখিত আছে। বেসনগরে সম্প্রতি একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে যাহা ক্ষোদিত আছে, তাহার মর্মার্থ এই যে, Diyaর পুত্র Heliodora একজন ভাগবত বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন, তিনি তক্ষশিলার অধিবাসী ছিলেন, কোন রাজনীতিক কার্যের ভার লইয়া যবনের রাজদূতরূপে Antalikita হইতে পূর্বমালোয়ায় ভগভদ্রের নিকট গমন

করিয়াছিলেন। এই ভাগবত Heliodora দেবদেব বাসুদেবের সম্মানার্থ গরুড়ধ্বজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিপি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভেই ক্ষোদিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় দেবদেবরূপে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়।

ক্ষত্রিয় বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব ও বলদেবের কথা আমরা পুরাণাদিতে পাই। এই বলদেবের আর এক নাম সঙ্কর্ষণ। আমরা পাণিনি-সূত্রে বাসুদেবের সহিত বলদেবের এবং ঘোষুণ্ডি ও নানাঘাটের শিলালিপিদ্বয়ে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণের নাম পাই। অধিকন্তু ঘোষুণ্ডি শিলালিপি পতঞ্জলি অপেক্ষাও প্রাচীন; সুতরাং পাণিনি-সূত্রোল্লিখিত বাসুদেব বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব হইতে পৃথক নন।

শিলালিপি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, অন্তত খ্রীস্টাব্দের ২০০ বৎসর পূর্বে বাসুদেব উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং ঐ উপাসকেরা ভাগবত বলিয়া অভিহিত হইতেন। গীতায় পুরুষ পরমেশ্বরের সঙ্কর্ষণ ও অন্যান্য ব্যূহ বা মূর্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে এক স্থলে (৭.৪.৫) তাঁহার একাধিক অষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥"

গীতোক্ত জীব—ভাগবত-পদ্ধতিতে সঙ্কর্ষণ, অহঙ্কার—অনিরুদ্ধ, এবং মন ও বুদ্ধি সম্ভবত একত্র প্রদ্যুম্নে পরিণত হইয়াছে। ভাগবত একটি ধর্মসম্প্রদায়রূপে পরিণত হইবার পূর্বে গীতা রচিত হয়; সুতরাং গীতোক্ত ভগবানের প্রকৃতিগুলির মধ্যে তিনটি ভাগবতমতে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধমূর্তিতে পরিণত হইয়া বাসুদেবের পরিবার-ভুক্ত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। ভগবদ্গীতার পরে রচিত

অনুগীতার দশম অধ্যায়ে একটি প্রাচীন আখ্যানে নারায়ণের চাতুর্হোত্রের কথা আছে। এই চাতুর্হোত্রতত্ত্বের সহিত চতুর্ব্যূহতত্ত্বের কি কোন সম্বন্ধ আছে? অনুগীতার চাতুর্হোত্রের হোতা—আত্মা; অধ্বর্যু—বলির জন্য উদ্‌গীতব্য আত্মা; প্রশস্তার শস্ত্র—সত্য; দক্ষিণা—মুক্তি। অনুগীতা বলেন, যাহারা নারায়ণকে বুঝেন, তাঁহাদের দ্বারা ও তাঁহাদের সম্পর্কে ঋঙ্‌মন্ত্র উদ্গীত হইয়া থাকে। ইনিই সেই নারায়ণ, যাঁহার নিকট তাঁহারা পূর্বে জীব বলি দিতেন। নারায়ণ ও বাসুদেব যে অভিন্ন, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহারা যে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তৎসম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছি। যাদবজাতি উত্তর ও পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিল। যাদববীর দেবকীপুত্র কৃষ্ণ প্রকৃত ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া, তত্ত্বদর্শিরূপে যাদবদিগের মধ্যে যশোলাভ করিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। যাদবেরা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। এই সময় সম্ভবত বিষ্ণুর অবতাররূপে বাসুদেবের পূজা যাদবদিগের পরমধর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা এদিকে আবার স্বজাতিবীর শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। এই উভয়বিধ আরাধনা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া, কালে শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম বিষ্ণুর অবতাররূপে সকলের শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছিলেন।

ইহার কিছু পর হইতে বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, কৃষ্ণ, রাম, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদি অবতার সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আলোচনা হইতে লাগিল। পুরাণ, তন্ত্র ও আগমে সেই সমস্ত নানা প্রকারে চিত্রিত হইয়া বিবিধ প্রকারে বর্ণিত হইতে লাগিল। ইঁহাদের নানা অবস্থায় ভক্তহৃদয়ে যেমন নানাভাবের স্ফূর্তি হইতে লাগিল, পুরাণাদিতেও তাঁহাদের বহুরূপ কল্পনাও চলিতে লাগিল।

শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, চতুর্বর্গচিন্তামণি, অংশুমৎতন্ত্র, পঞ্চরাত্রাগম, বৈখানসাগম প্রভৃতি গ্রন্থে বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণ

ও প্রকারভেদ বহুপ্রকার আলোচিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সময়-সাপেক্ষ ও প্রবন্ধের কলেবর অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

মহীশূর সোমনাথপুরস্থ ও বেলুড় গ্রামস্থ কেশব-মন্দিরের গাত্রে বিষ্ণুর নানা মূর্তি চিত্রিত আছে। ইহাতে শিল্পের এত বৈচিত্র্য আছে যে, প্রত্যেক মূর্তিকে পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লেখা যায়। আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য তাহা নয়। তবে দিগ্‌দর্শন হিসাবে দু'একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আলোচনা করিলাম মাত্র। উল্লিখিত মন্দিরে বিষ্ণুর দশাবতারেরও মূর্তি আছে।

দক্ষিণ-ভারতে বিষ্ণুবর্ধন নৃপতি এক অপূর্ব কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পূর্বে জৈন ছিলেন, পরে রামানুজ কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন এবং ১১১৭ খ্রীস্টাব্দে বিষ্ণুর বিজয়নারায়ণ নামক মূর্তি স্থাপন করেন। ঐ বিষ্ণুবর্ধন কর্তৃক প্রবর্তিত দক্ষিণ-ভারতে যে হয়সড়-স্থাপত্য সমস্ত ভারতবর্ষের স্থাপত্যকে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাহার ভাস্কর্যের বিশেষত্ব বিষ্ণুমূর্তি লইয়া।

বেলুড়ের কেশব-মন্দিরে একটি সুন্দর লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্তি আছে। এই মূর্তির এক পার্শ্বে হনুমান্ এবং এক পার্শ্বে গরুড়। হনুমান্ রামের ভক্ত, তাহা সর্বজনবিদিত, কিন্তু বিষ্ণুমূর্তিতে হনুমান্ একটি নূতন ঘটনার সূচনা করিতেছে। প্রাচীন বৈষ্ণব মতানুসারে কোথাও সীতারামের আরাধনা, কোথাও বা অন্য নামে পূজা হইত। ক্রমশ ঐ উপাসনা সীতারামে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণে পর্যবসতি হইয়াছিল। এই লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত হনুমান্ দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, শিল্প-হিসাবে বিষ্ণুমূর্তির উপর রামের প্রভাব হইয়া, এই নূতন স্থাপত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা মহারাষ্ট্র ও গুর্জর প্রদেশে হইয়া থাকে।

বদরীনারায়ণেও লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে। প্রাচীনতর সত্যনারায়ণ—হরিদ্বার ও কেদারনাথ হইতে যে পথ গিয়াছে, তথায়

শিবের সহিত পূজাধিকার লইয়া বিবাদ করেন। শেষে শ্রীনগর হইতে বদরী পর্যন্ত নূতন তরঙ্গেরই প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনেরও বড় একটা ব্যবস্থা হয়। ফলে কেদারনাথ ও বদরীনাথের জন্য মহান্ত বা রাউল দক্ষিণ-ভারত মাদ্রাজ হইতে আনিবার ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থা আজও সংরক্ষিত আছে। ইহাতে হিমাচল অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

দ্রবিড়দেশে অথবা গয়াধামের বেদীতে নারায়ণ এক। ইহাতে লক্ষ্মী নাই। পুরুষমূর্তির সহিত স্ত্রীমূর্তির প্রচার দক্ষিণ-ভারত হইতেই উত্তর-ভারতে প্রথমে হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। দক্ষিণ-ভারতের পূর্বে পুরুষমূর্তির সহিত স্ত্রীমূর্তি কোথাও ছিল না। এখনকার নারায়ণ নিশ্চয়ই বদরী বা মহারাষ্ট্রীয় নারায়ণের বহু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণের বিষ্ণুপূজা গুপ্তযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এখনকার বিষ্ণুপূজা বৈষ্ণবধর্ম নামে চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের আখ্যান বস্তুগুলিকেও বেশ রসান দেওয়া হইয়াছে।

একমাত্র দক্ষিণে মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে কৃষ্ণমূর্তি পার্থসারথিরূপে পূজিত হইয়া থাকে। অদ্যাবধি গুপ্তদিগের প্রভাব দক্ষিণে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে দক্ষিণের নারায়ণমূর্তিগুলি প্রাচীন মগধের সত্যনারায়ণমূর্তি। স্কন্দগুপ্ত ভিটারি-লাটের উপর ৪৮০ খ্রীস্টাব্দে যে নারায়ণমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইহা সেই নারায়ণমূর্তি। তিনি তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ ও হূনবিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নারায়ণমূর্তিই পালরাজাদিগের সময়ে বাঙলাদেশে খুব প্রচলিত ছিল।

বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে দেবী-সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এই দেবী—লক্ষ্মী। ভূমি বা ভূদেবীও বিষ্ণুর পত্নী। বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মীর ইঙ্গিত বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আছে,—

"যঃ পূর্বায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে
বিষ্ণবে দদাশতি।"—১.১৫৬.২

বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে ভূদেবী পৃথিবীর কল্পনা বোধ হয়, বরাহ অবতার হইতে পাওয়া গিয়াছে। সাধারণত স্ত্রী বা লক্ষ্মী তাঁহার দক্ষিণে এবং মহী, পৃথ্বী বা ভূদেবী তাঁহার বামে থাকেন। পঞ্চরাত্রাগমে নীলাদেবীর কথা লিখিত হইয়াছে। এই লক্ষ্মীর আবার নানা ভেদ আছে—অষ্ট মহালক্ষ্মী নামে আট প্রকারের লক্ষ্মী আছেন। ইহাদের মধ্যে গজ-লক্ষ্মী খুব প্রচলিত। 'মানসার' ইহার নাম দিয়াছেন—সামান্যলক্ষ্মী; শিল্পসার-প্রদত্ত নাম ইন্দ্র-লক্ষ্মী। পদ্মপুরাণে বিষ্ণুর শক্তির নাম—শ্রী, ভূ, সরস্বতী, প্রীতি, কীর্তি, শান্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি। ইঁহাদের সকলেরই চারি হাত। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের সঙ্গে অপর দেবীর সংস্থানের বিধি আছে। যেমন রামের পার্শ্বে সীতা; কৃষ্ণ-দম্পতিরূপে—রুক্মিণী, সত্যভামা ও রাধা। কৃষ্ণভগিনী-সুভদ্রা—বিষ্ণুর অবতার জগন্নাথের পাশে অবস্থিত।

পুরাণ এবং সংহিতার মধ্যে বিষ্ণুর নানাবিধ মূর্তিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিনের অন্যতম বিষ্ণুকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিষ্ণু বলা যায়। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ইহার ত্রিবিধ মূর্তির উল্লেখ আছে।—অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ এবং দ্বিভুজ। অষ্টভুজ বিষ্ণুর প্রহরণ—শঙ্খ, চক্র, গদা, গড়্গা, শর, অভয় মুদ্রা, কার্মুক, খেটক। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর—শঙ্খ, চক্র, গদা ও অভয় মুদ্রা। দ্বিভুজ বিষ্ণুর—শঙ্খ, অভয় মুদ্রা। সাধারণত আমরা বিষ্ণুকে "শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণং"-রূপেই বর্ণিত এবং ক্ষোদিত দেখি। কিন্তু এখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বরাহমিহিরের বর্ণিত বিষ্ণুর প্রহরণের মধ্যে "পদ্ম" নাই—তৎ-পরিবর্তে অভয় মুদ্রা রহিয়াছে। কানিংহাম সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত একটি বিষ্ণুমূর্তিতে পদ্মের :সংস্থান দেখা যায় না। এই মুদ্রিত মূর্তিটি খ্রীস্টীয় ৩য় শতকের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণেও অষ্টভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"ক্বচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপরং।
দ্বিভুজশ্চাপি কর্তব্যো ভবনেষু পুরোবসা॥"

বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনা অনুসারে অষ্টভুজ, ষড়্‌ভুজ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ— এই চারি প্রকার মূর্তির উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে ষড়্‌ভুজের প্রহরণ—শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, বর, অসি। ইহার মধ্যেও বিষ্ণুর হাতে পদ্মের অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে পরবর্তী অংশে পদ্মের উল্লেখ দেখা যায় বটে।

ইহার পরেই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, বিষ্ণুর এই চতুর্ব্যূহ মূর্তির বর্ণনা নানাবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) কালিকাপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হেমাদ্রিধৃত সিদ্ধার্থ-সংহিতা ও বিষ্ণুধর্মোত্তরে বাসুদেবের নানাবিধ মূর্তিভেদের বর্ণনা আছে। কালিকাপুরাণে ইনি গরুড়ে সমাসীন, চতুর্ভুজ, দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বামকক্ষে বাণপূর্ণ তূণীর, দক্ষিণে কোষবদ্ধ খড়্গ ও শরাসন। কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে ও গলে আজানুলম্বিত স্বর্ণমালা, পীতবস্ত্র পরিধান। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ। কালিকাপুরাণেরই অপর এক বর্ণনায় বাসুদেব কেবল নীলোৎপলদলশ্যাম ও চতুর্ভুজরূপে বর্ণিত। অগ্নিপুরাণের এক বাসুদেবের বর্ণনায় ব্রহ্মা ও শিব দুই পার্শ্বে অবস্থিত আছেন। ঐ পুরাণের অন্যবিধ বাসুদেব এইরূপ—"শ্রী-পুষ্টি চাপি কর্তব্যে পদ্মবীণা-করান্বিতে" অর্থাৎ বাসুদেবের পার্শ্বে পদ্মপাণি শ্রী ও বীণাপাণি পুষ্টি থাকিবেন। ঐ পুরাণের অপর এক মূর্তিতে চারি হাতের এক হাতে বরদ মুদ্রার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরে বাসুদেবের বর্ণন খুব প্রকাণ্ড। নূতনের মধ্যে স্ত্রীরূপধারিণী পৃথিবী এবং চামরধারিণী গদাদেবী বাসুদেবের প্রতি চাহিয়া থাকিবেন এবং পৃথিবীর করতলে বাসুদেবের চরণ দুইখানি স্থাপিত থাকিবে। (২) সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের

স্বরূপ। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ইহার বর্ণনা এইরূপ,—তিনি শুক্লবর্ণ, পরিধানে নীলবাস, গদা ও চক্রের পরিবর্তে মুষল ও লাঙ্গল প্রহরণ। এই মুষল ও লাঙ্গল আবার "কর্তব্যৌ নৃরূপৌ রূপসংযুতৌ।" (৩) প্রদ্যুম্নের দ্বিবিধ মূর্তি অগ্নিপুরাণে বর্ণিত আছে;—চতুর্ভুজ আর দ্বিভুজ। চতুর্ভুজের প্রহরণ বজ্র, শঙ্খ, ধনু, গদা। দ্বিভুজের ধনু ও শর। হেমাদ্রির মতে ইনি দূর্বাঙ্কুরশ্যাম এবং সিতবাসা। বৃহৎ-সংহিতার মতে প্রদ্যুম্ন চাপভৃৎ ও নিস্ত্রিংশধারিণী স্ত্রীর সহিত বর্তমান। (৪) অনিরুদ্ধের মূর্তি হেমাদ্রিতে এই, পদ্মপত্রাভ বপুঃ, রক্তাম্বরধর, চক্র ও গদার পরিবর্তে ইনি চর্ম ও অসিধারী। অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধার্থ-সংহিতায় (হেমাদ্রিধৃত) বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহা এই—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, উপেন্দ্র, জনার্দন, হরি, কৃষ্ণ। এই চতুর্বিংশতি মূর্তির প্রত্যেকেই চতুর্ভুজ এবং প্রত্যেকেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। ইহাদের মূর্তির বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে—বাম ও দক্ষিণহস্তের ঊর্ধ্ব অধঃক্রমে শঙ্খ-চক্রাদির অবস্থান-ভেদে। তদ্ভিন্ন এই মূর্তিসমূহের মধ্যে অপর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুর আরও কতিপয় মূর্তি আছে; তাহা এই,—(১) ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণু, (২) লক্ষ্মীনারায়ণ বিষ্ণু, (৩) যোগস্বামী বিষ্ণু, (৪) হরিশঙ্কর বিষ্ণু, (৫) নারায়ণ, (৬) লোকপাল বিষ্ণু। (১) ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণুর আট হাত, দুই পার্শ্বে পদ্ম ও বীণাধারিণী লক্ষ্মী সরস্বতী, দক্ষিণে বিশ্বরূপ। (২) লক্ষ্মীনারায়ণ—হেমাদ্রি, পদ্মপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণের মতে এই মূর্তি ত্রিবিধ। প্রথম ইহাতে লক্ষ্মী, নারায়ণের বাম জঙ্ঘায় উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মীর হাতে পদ্ম ও চামর থাকিবে। দ্বিতীয়—ইহাতে মাত্র লক্ষ্মী বামকেশাঙ্কে থাকিবেন। তৃতীয়—লক্ষ্মী

ও নারায়ণের মূর্তি সংলগ্ন হইবে। নারায়ণের বামহস্ত লক্ষ্মীর কুক্ষিদেশে এবং লক্ষ্মীর দক্ষিণহস্ত নারায়ণের কণ্ঠলগ্ন হইবে। চামরগ্রাহিণী সিদ্ধি সমীপে থাকিবেন। বাহন নিম্নে বামভাগে। সম্মুখে শঙ্খচক্রধারী দুইজন বামন পুরুষ থাকিবেন। ব্রহ্মা এবং শিব উপাসকভাবে নিকটে থাকিবেন। (৩) যোগস্বামী—ইনি চতুর্বাহু, অল্প নিমীলিতলোচনে পদ্মাসন করিয়া শ্বেতপদ্মের উপর আসীন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। (৪) হরিশঙ্কর—ইনি বিংশবাহু, চতুর্মুখ, ত্রিনেত্র, বামপার্শ্বে জলশায়ী, লক্ষ্মী কর্তৃক একটি চরণ ধৃত এবং বিমলাদি কর্তৃক স্তুত। (৫) নারায়ণ—পদ্মাসীন, দক্ষিণে লক্ষ্মী বসুপাত্র, স্বর্ণপদ্ম ও মাতুলুঙ্গ ধারণ করিয়া থাকিবেন, বামে পৃথিবী ধান্যপাত্র ও রক্তোৎপল ধরিয়া থাকিবেন। বিমলাদি শক্তিগণ চামর ধরিয়া থাকিবেন। (৬) লোকপাল—ইনি "একবক্ত্রো দ্বিবাহুশ্চ গদাচক্রধরঃ প্রভুঃ।"

পুরাণে বিষ্ণুর অবতারের কথা আছে।* প্রথম প্রথম বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য বলিয়াই কল্পিত হইত। তারপর ক্রমে সংখ্যা নির্দিষ্ট করিবার প্রচেষ্টা হইতে লাগিল। হরিবংশে (১ম অধ্যায়, ৪২ প্রভৃতি শ্লোক) আটটি অবতারের নাম পাওয়া যায়,—বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, জামদগ্ন্য (পরশুরাম), রাম, কৃষ্ণ ও কল্কি। মহাভারতের শান্তিপর্বে (১) হংস, (২) কূর্ম, (৩) মৎস্য, (৪) বরাহ, (৫) বামন, (৬) পরশু (রাম), (৭) রাম দাশরথি, (৮) সাত্বত (কৃষ্ণ) ও (৯) কল্কি, এই নয়টি অবতারের নাম আছে। দেবীপুরাণে (১ অঃ, ৫ শ্লোক) বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণুর অবতার ৬০টি।

---

* প্রথম প্রথম "অবতার" শব্দের প্রয়োগ ছিল না। অবতারকে "প্রাদুর্ভব" বলা হইত। হরিবংশে, মহাভারতে প্রাদুর্ভব শব্দ আছে। হরিবংশ "দশপ্রাদুর্ভবাঃ" স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নাম করিবার সময় ৮টির বেশী নাম করেন নাই।

ভাগবতপুরাণ (১.৩.১ ইত্যাদি) বিষ্ণুর অবতার অসংখ্য বলিয়া পরে ২২টি অবতারের উল্লেখ করিয়াছেন; ২২টি অবতারের নাম, যথা—

১। পুরুষ
২। বরাহ
৩। নারদ
৪। নর অথবা নারায়ণ
৫। কপিল
৬। দত্তাত্রেয়
৭। যজ্ঞ, যজ্ঞমূর্তি অথবা যজ্ঞেশ
৮। ঋষভ
৯। পৃথু
১০। মৎস্য
১১। কূর্ম
১২-১৩। ধন্বন্তরি
১৪। নরসিংহ
১৫। বামন
১৬। পরশুরাম
১৭। বেদব্যাস
১৮। রাম
১৯-২০। বলরাম ও কৃষ্ণ
২১। বুদ্ধ
২২। কল্কি

ভক্তমাল ২৬টি এবং পঞ্চরাত্র ৩৯টি অবতারের কথা বলিয়াছেন। আমরা সাধারণত মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি—এই দশটিকে বিষ্ণুর দশাবতার বলিয়া থাকি। কিন্তু পুরাণাদিতে দশাবতারের মধ্যে ঠিক এই কয়টি নাম পাওয়া যায় না। ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতায় সর্বপ্রথম দশাবতারের মধ্যে এই দশটি নাম পাওয়া যায়। অতঃপর কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে পুনরায় এই নাম দশটি দেখিতে পাই। দশাবতারের তালিকায় এই দশটি নাম কেমন করিয়া কখন প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুসন্ধেয়। যাহা হউক, স্থাপত্যে আমরা দশাবতারের বহু প্রকার মূর্তি যথেষ্টই দেখিতে পাই। সেগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দিতে চেষ্টা না করিয়া, সাধারণ মূর্তিগুলির একটি তালিকা দেওয়া হইল,—

অবতার—

১। মৎস্য—

(ক) হয়গ্রীব

২। কূর্ম—

৩। বরাহ—

(ক) যজ্ঞ-বরাহ

(খ) ভূ-বরাহ

(গ) আদি-বরাহ

(ঘ) প্রলয়-বরাহ

৪। নরসিংহ—

(ক) উগ্র-নরসিংহ

(খ) লক্ষ্মী-নরসিংহ

(গ) যোগ-নরসিংহ

(ঘ) কেবল-নরসিংহ

(ঙ) গিরিজা-নরসিংহ

(চ) স্থৌন-নরসিংহ

(ছ) যানক-নরসিংহ

৫। বামন

(ক) ত্রিবিক্রম

৬। পরশুরাম—

জামদগ্ন্য রাম

৭। রাম—

(ক) রামচন্দ্র, রামভদ্র বা রাঘব রাম

(খ) বলভদ্র রাম

৮। কৃষ্ণ-রুক্মিণী—

(ক) গোপাল

(খ) নবনীত নৃত্যমূর্তি বা বালকৃষ্ণ নবনীত-নট

(গ) সন্তান-গোপাল

(ঘ) বটপত্রশায়ী

(ঙ) কালীয়-কৃষ্ণ

(চ) কালীয়াদিমর্দক

(ছ) বেণু-গোপাল

(জ) গান-গোপাল

(ঝ) মদন-গোপাল

(ঞ) গোবর্ধন-কৃষ্ণ

(ট) গোবর্ধনধর

(ঠ) গোপীবস্ত্রাপহারক

(ড) পার্থ-সারথি

(ঢ) রাধাকৃষ্ণ

৯। বুদ্ধ—

১০। কল্কি—

আসনাদি অনুসারে বিষ্ণুমূর্তির নামভেদও হইয়া থাকে। আসন অনুসারে বিষ্ণুর কিরূপ নামভেদ হয়, তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বিষ্ণু—(চতুর্ভুজ ও অষ্টভুজ)

মধ্যমযোগস্থানকমূর্তি

মধ্যমভোগাসনমূর্তি

অধমবীরাসনমূর্তি

ভোগস্থানকমূর্তি	বীরাসনমূর্তি
অধমস্থানকমূর্তি	অভিচারিকাসনমূর্তি
বীরস্থানকমূর্তি	যোগশয়ানমূর্তি
অভিচারিকাস্থানকমূর্তি	মধ্যমযোগশয়ানমূর্তি
স্থানকমূর্তি	ভোগশয়ানমূর্তি
মধ্যমভোগস্থানকমূর্তি	উত্তমভোগশয়ানমূর্তি
যোগস্থানকমূর্তি	বীরশয়ানমূর্তি
ভোগাসনমূর্তি	অভিচারিকাশয়ানমূর্তি

এছাড়া বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্তির কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

বিষ্ণুর অন্যান্য মূর্তি

১। অনন্তশায়ী	১৩। যোগেশ্বর-বিষ্ণু
২। বৈকুণ্ঠ-নারায়ণ (বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠনাথ)	১৪। পাণ্ডুরঙ্গ বা বিঠোবা
৩। লক্ষ্মীনারায়ণ	১৫। গরুড়
৪। আদিমূর্তি	১৬। পদ্মনাভ অথবা রঙ্গনাথ
৫। জলশায়ী	১৭। দত্তাত্রেয়
৬। কবিবরদ	১৮। হরিহর পিতামহ
৭। বরদরাজ	১৯। ত্রৈলোক্যমোহন
৮। বিট্‌ঠল	২০। বিশ্বরূপ
৯। জগন্নাথ	২১। ধর্ম
১০। রতি-মন্মথ	২২। বেঙ্কটেশ
১১। গরুড়-নারায়ণ	২৩। হরিকৃষ্ণ
১২। ঐ এবং গজেন্দ্রমোক্ষ	

বিষ্ণুর গরুড়ধ্বজের উল্লেখ দেবীপুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিত

গরুড়ধ্বজের ব্যাপারটি গ্রীক ভাগবত Diya বা Heliodora সম্পর্কে সূচিত বলিয়া মনে করেন। দেবীপুরাণে আছে, ঘোর দৈত্য বিষ্ণুকে খড়্গ, চক্র ও গদাধারী বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। আর একবার তিনি স্তবে বিষ্ণুকে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গধারী বলিয়াছেন। এই উভয় স্তবে দেখা যাইতেছে যে, বিষ্ণুর হস্তে পদ্ম নাই। প্রথম স্তবে শঙ্খও নাই। বিষ্ণুর হস্তে যে পদ্ম থাকিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। তবে তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ-শোভিত হওয়া চাই। সকল বিষ্ণুমূর্তিতেই তাহা থাকিবে। কেবল বঙ্গদেশের বিষ্ণুমূর্তিতে কৌস্তুভচিহ্ন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুমূর্তির বক্ষে বা হস্তে শ্রীবৎসলাঞ্ছন থাকিতেও পারে, নাও পারে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় (বঙ্গদর্শন, ১৩১০, পৃঃ ৬৫, ৬৬) মনে করেন যে, বিষ্ণুর পূর্বে গদা ছিল না। বিষ্ণু সম্ভবত বৈদিক পূষার গদাটি কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন। চক্রটি বিষ্ণুর পৈতৃক সম্পত্তি, এবং তাহা নিশ্চয়ই আদিত্যের চক্র। তিনি আরও বলেন যে, বিষ্ণু যে পদ্মপাণির পদ্মটি হাতে করিয়া উপস্থিত, তাহা তাঁহার শান্তিময় স্বরূপ-বর্ণনা হইতেও কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এগুলি সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পূর্বে আমাদের উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপাদান যথেষ্ট নহে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও বিষ্ণু স্থান পাইয়াছেন। তবে বিষ্ণুর স্থান তাঁহারা উচ্চ করেন নাই। সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধেরা বুদ্ধের চারিপাশের দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুকে ধরেন নাই। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বিষ্ণুর (কেঙ্গুরে) উল্লেখ আছে। জৈনসূত্রভূমিকায়, (S. B. E., Vol. 22) বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। (৫৩৭ সংখ্যক জাতক) সুতসোমজাতকে অমোঘসিদ্ধি ও বিষ্ণু অভিন্ন বলা হইয়াছে। সুতসোম গৌতমের কোন পূর্বজন্মের নাম। যবদ্বীপে এই জাতকের অনুরূপ কাহিনী। যবদ্বীপবাসীরা বলে, বুদ্ধ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশ্বর।

আর সুতসোম সেই বুদ্ধের অবতার। ব্যাঙ্ককেও বিষ্ণুমূর্তির পূজা হইয়া থাকে। এই স্থানের রাজকীয় মন্দিরগুলিতে রামায়ণের বহু মূর্তি ও চিত্র আছে। এখানে গরুড়ারূঢ় "নরৈ" বা নারায়ণ-বিষ্ণুর একটি মূর্তি আছে। যবদ্বীপে বোরোবদর হইতে অল্পদূরে "প্রম্বনম্" মন্দিরমালা অবস্থিত। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও নন্দীর স্বতন্ত্র চারিটি মন্দির আছে। বিষ্ণুর পূজা হয় না। তবে শিল্পে গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যা বড় কম নয়।

বলিদ্বীপে আমাদের যেমন হরি-হর মূর্তি আছে, যবদ্বীপে তেমনই বিষ্ণু-বুদ্ধমূর্তি আছে। এখানে শিবের স্থান সর্বোচ্চ—তাহার পর বিষ্ণুর স্থান। এইখানের "কমহাযানিকন" নামক একাদশ শতকের মহাযানিক গ্রন্থেও বিষ্ণু-বুদ্ধের কথা আছে।

চম্পার লোকেরা শৈব। তবে সেখানেও বিষ্ণুপূজার যে প্রভাব ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৮১১ খ্রীস্টাব্দের একটি শিলা-লিপিতে (Corpus 11, pp. 229, 230) শঙ্করনারায়ণের মূর্তির উল্লেখ আছে। এখানে গোবর্ধনধারী নারায়ণের একটি মূর্তি আছে। ১১৫৭ খ্রীস্টাব্দের একখানি লিপিতে রাম ও কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে ক্ষোদিত আছে যে, প্রথম জয়হরিবর্মরাজ বিষ্ণুর অবতার (B.E.F.E.O., 1904, pp. 954, 969)। গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্তি এখানে অতি অল্পই আছে (B. E. F. E. O, p. 1901, p. 18)। সিংহলের অধিবাসীর প্রায় চতুর্থাংশ হিন্দু তামিল। উত্তরাঞ্চলে দ্রবিড়-রীতিতে নির্মিত অনেকগুলি হিন্দু-মন্দির আছে। এখানকার বৌদ্ধ-মন্দিরেও হিন্দুদেবতা স্থান পাইয়াছেন। এই সমস্ত মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণদিকের শ্রেণীতে প্রায়ই বুদ্ধমূর্তি থাকে এবং বামদিকের শ্রেণীতে মহাব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্তিকেয় ও মহাসামনের মূর্তি থাকে। তন্মধ্যে বিষ্ণুমূর্তির বিশেষ পূজা ও সম্মান করা হয়। এইখানকার বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে, বিষ্ণু বুদ্ধের সম্মান করিয়া থাকেন (Ceylon, Ant., July, 1916)।

সম্প্রতি অনগারিক ধর্মপাল-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবিহারেও একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি স্থান পাইয়াছে।

তিব্বতে হয়গ্রীবকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয় (Journal Buddhist Text Society, Vol. II, pt. II, Appendix II. p. 6. 1904)। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বাহিরেও এক সময়ে বিষ্ণুর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।*

---

* উপসংহারে বক্তব্য যে, প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত যে সমস্ত পুস্তক হইতে বা যাঁহাদের নিকট সাহায্য লইয়াছি, সেই সমস্ত গ্রন্থ ও ব্যক্তির নাম নিম্নে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি,—

R. G. Bhandarkar : Vaishnavism, Saivism &c. ; Binodebehari Kavyatirtha : Varieties of Vishnu Image ; Sir Charles Eliot ; Hinduism & Buddhism ; শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সরস্বতী, বি ই ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য।

অগ্নি

অগ্নির সাহায্যে মানব-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অগ্নিকে বর্তমান যাবতীয় শিল্পের মূলীভূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলেই অগ্নি। কোন্ সময়ে মানব-জাতি প্রথমে অগ্নি উৎপাদন ও উহার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। শুষ্ক কাষ্ঠাদির ঘর্ষণে অরণ্যমধ্যে অথবা বজ্রপাতে স্বভাবতই যে অগ্নির উৎপত্তি হয় আদিম মানব তাহা হইতেই অগ্নি-সম্বন্ধে সম্ভবত কৌতূহলী হইয়া উঠে। কিন্তু বাস্তব জগতে যে দ্রব্য কোন কাজে লাগে না, আদিম মানব নিশ্চয়ই তাহার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিতে পারে নাই। বজ্রপাতে ভীতিরই সঞ্চার হয়। কিন্তু অরণ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে অরণ্যের জীবজন্তু প্রাণভয়ে পলাইতে থাকে। ইহা হইতে হিংস্র জন্তু-তাড়নে অগ্নি-ব্যবহারের ইচ্ছা স্বভাবতই জন্মিবার কথা। হয়তো অরণ্যে দগ্ধ অথবা অর্ধদগ্ধ ফলমূলাদি ও পশুমাংসাদির ঘ্রাণে আকৃষ্ট হইয়া মানব তাহার আস্বাদগ্রহণে কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ কারণ হইতেই প্রথমত মানবের অগ্নির প্রতি আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ কৌতূহল হইতেই মানব কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি-উৎপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করিবার কৌশল আয়ত্ত করিবার পূর্বেই অনেক জাতি অগ্নির ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আদিম অসভ্য জাতিরাও অগ্নির ব্যবহার স্মরণাতীত কাল হইতে জানে। যে সকল জাতি অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন তাহারাই অগ্নির উৎপাদন-কৌশল আয়ত্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়। বিশেষত অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত না করিলে সভ্য জাতিসকল পৃথিবীর

নানা অংশে, প্রধানত শীতপ্রধান দেশগুলিতে, ছড়াইয়া পড়িতে পারিত না। অসভ্য জাতিরা অধিক শৈত্য হইতে শরীররক্ষার কৌশলস্বরূপ বস্ত্রাদি ও অগ্নি-ব্যবহারের কৌশল না জানায় উষ্ণদেশে বাস করিতে ভালবাসে।

প্রথমে মানব অগ্নি উৎপাদন করিতে শেখে নাই এবং অগ্নি-উৎপাদনের কৌশলগুলিও তাহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। সুতরাং অগ্নি-উৎপাদন-কৌশলের আবিষ্কারক অনেক জাতির মধ্যে দেবতারূপে গণ্য হইয়াছেন। অগ্নি-উৎপাদন-সম্বন্ধে অনেক রহস্য-পূর্ণ পৌরাণিক আখ্যানও বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। বিখ্যাত 'শাহ্‌নামা' কাব্যে দেখা যায়, বীরবর হুশেঙ্ক সর্প বধ করিবার জন্য একটি আশ্চর্য প্রস্তর নিক্ষেপ করেন; সেই প্রস্তর সর্পের গায়ে না লাগিয়া একটি পাষাণস্তূপে আঘাত করে, উহাতে অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয়। উত্তর আমেরিকার একটি কাহিনীতে আছে, একটি মহিষ রাত্রিকালে পাষাণস্তূপে বিচরণ করিবার সময় তাহার খুরের আঘাতে পাষাণস্তূপ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার কুইচি জাতিদের ধারণা যে তোহিল নামক একজন দেবতা তাঁহার পাদুকাঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন। পর্বতীয় পাষাণময় প্রদেশগুলির অগ্নি উৎপাদনের আখ্যানগুলিতে এইরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায়। সম্ভবত প্রস্তরাদির ঘর্ষণে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয় দেখিয়া সহজে দাহ্য শুষ্কপত্রাদির সাহায্যে পর্বতীয় অঞ্চলের লোকেরা অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিয়াছিল। অন্যান্য অঞ্চলে ও অরণ্যে গ্রীষ্মকালে বাত্যাতাড়িত শুষ্ক বৃক্ষশাখাদির পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদিত হইতে দেখিয়া কৃত্রিম উপায়ে অনুরূপভাবে অগ্নি উৎপাদন করিবার কৌশল ক্রমশ আয়ত্ত করা আশ্চর্য নহে।

সংঘাত ও ঘর্ষণ এই দুই উপায়ে অগ্নি-উৎপাদন ও তাহার ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সভ্যজাতিগুলির মধ্যেও

প্রচলিত ছিল। নিউজিল্যাণ্ড, হাউআই, টোঙ্গা, সামোয়া প্রভৃতি দেশে মাটির উপরে একটি কাঠের লাঠি শোয়াইয়া রাখিয়া খুব জোরে উহার উপর অন্য একটি লাঠির আঘাত করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করা হয়। এই সকল দেশে আদিম জাতিরা নিমেষমধ্যে এইরূপে অগ্নি উৎপাদন করে। অস্ট্রেলিয়া, কামাস্কাট্‌কা, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপেও এইরূপ প্রথায় আদিম জাতিদিগের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করিবার বিধি ছিল। দিয়াশলাই আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে সভ্যজাতিদিগের মধ্যেও দুইটি প্রস্তরের ঘর্ষণে অগ্নি-উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত ছিল। সত্তর বৎসর পূর্বেও ভারতে চক্‌মকি পাথরের সাহায্যে অগ্নি-উৎপাদন করা অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল।

দর্পণ ও সূর্যরশ্মির সাহায্যে অগ্নি-উৎপাদনও অতি প্রাচীন পদ্ধতি, কিন্তু তাহার ব্যবহার কোন কোন জাতি জানিলেও উহা বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিজ্ঞানী আর্কিমিডিজ কর্তৃক দর্পণ ও সূর্যরশ্মির সাহায্যে রোম-দেশীয় আক্রমণকারীদিগের পোতাদি ভস্মীভূত করার কাহিনী ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হইয়াছে। চীনদেশে দর্পণের সাহায্যে অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল ইহার পূর্বেও প্রচলিত ছিল।

পরবর্তী যুগে ফস্‌ফরাস, গন্ধক প্রভৃতির সংমিশ্রণে ঘর্ষণ করিয়া (দিয়াশলাইয়ের সাহায্যে) অগ্নি-উৎপাদন-প্রথা আবিষ্কৃত হয় (১৮৩০ খ্রী°)। ইহার পূর্বে চক্‌মকি পাথর ও ইস্পাতের সাহায্যে অগ্নি-উৎপাদন প্রক্রিয়া সর্বত্র প্রচলিত ছিল। আধুনিক যুগে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের সাহায্যে অগ্ন্যুৎপাদন করা হয়।

অতি প্রাচীন যুগে অগ্নি-উৎপাদন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল; এজন্য প্রত্যেক জাতিই প্রজ্বলিত অগ্নি রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নশীল ছিল। বর্তমান যুগেও অনেক আদিম জাতি প্রজ্বলিত অগ্নি বিভিন্ন উপায়ে রক্ষা করিয়া থাকে। আন্দামান ও পপুয়ার আদিম জাতি অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল জানে না;

তাহারা কুটীরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখে। এমন কি, পপুয়াবাসীরা দৈবক্রমে অগ্নি নিবিয়া গেলে বহুদূর হইতে অন্য জাতির নিকট হইতে প্রজ্বলিত অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া আনে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরাও অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল জানে না, বরং বহুদূর হইতে অগ্নি-সংগ্রহের কষ্ট স্বীকার করে। এই সকল আদিম জাতিদের অনেকেই প্রজ্বলিত অগ্নি দৈবক্রমে নিবিয়া গেলে তাহা দুর্ভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করে। সভ্য জাতিদিগের মধ্যেও সেই আদিম সংস্কার রূপান্তরিত ভাবে এখন পর্যন্তও বর্তমান আছে। ধর্মোৎসবে অথবা কোন শুভকার্যে প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া রাখা অনেক সভ্য জাতির মধ্যে বর্তমান। এইরূপ প্রদীপ হঠাৎ নির্বাপিত হইলে উহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া সেই সকল জাতি মনে করে। হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ ধারণা বিশেষ বদ্ধমূল। কথিত আছে, যীশুখ্রীস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সপ্তাহে (passion week) সকল ধর্মমন্দিরের প্রদীপ ক্রমশ নির্বাপিত হইতে থাকে ; শেষ প্রদীপটি নির্বাপিত হইলে পুনরায় প্রদীপগুলি নূতন অগ্নিতে প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হয়। কথিত আছে, এই 'নূতন অগ্নি' হইতে দেশের সর্বত্র অগ্নি-গ্রহণ করা হয়। পূর্বদেশীয় ধর্মান্ধ যাত্রীরা দলে দলে জেরুজালেম হইতে এই অগ্নি গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে, সেই যুগে অনেক দেশে অগ্নিপ্রজ্বালন বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না এবং কোথাও অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে বহু দূরদেশের লোকও তাহার সংবাদ পাইয়া অগ্নি লইতে আসিত। বিশেষত কোন ধর্মানুষ্ঠান অথবা মহাপুরুষের সহিত যে অগ্নি-প্রজ্বালন জড়িত, সকলে সেই অগ্নি গ্রহণ করিতে ও রক্ষা করিতে ব্যগ্র হইত। এই জন্যই অগ্নির উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানাবিধ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। গ্রীক পুরাণে দেখা যায়, প্রোমেথিয়স (Prometheus) পৃথিবীতে অগ্নি আনয়ন করেন; কোন কোন গল্পে দেখা যায়, তিনি সূর্যের রথ হইতে একটি মুষল

প্রজ্বলিত করিয়া আনেন। কুকদ্বীপের অধিবাসীদের আখ্যানে আছে, বীরবর মউই পাতাল হইতে দুইটি কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি-উৎপাদনের কৌশল শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে অগ্নি উৎপাদন করেন।

অগ্নি পূজা—এই সকল ধারণা হইতে অগ্নির গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং প্রায় সকল জাতিই অগ্নিরক্ষায় যত্নবান্ হয়। অনেক জাতি আবার অগ্নিরক্ষা ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছে। গ্রীক, রোমান, ইরানী ও ভারতীয় আর্যগণের নিকট অগ্নি অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পূজিত হন। প্রাচীন রোমে গৃহদেবীর মন্দিরে নিয়োজিত কুমারী পরিচারিকাগণ দেবীর সম্মুখে নিত্য পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিত। পেরুদেশেও এইরূপ রীতি ছিল।

সকল জাতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, অগ্নিপূজা সকল জাতিরই একটি সাধারণ ব্যাপার। ভারতবর্ষ হইতে পেরু পর্যন্ত সমুদয় স্থানের সকল জাতি বেদীর উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে। সমুদয় জাতির মধ্যে যাঁহারা শুদ্ধচিত্ত তাঁহারা যাহাতে অগ্নি নির্বাপিত হইয়া না যায় তজ্জন্য অগ্নিতে অবিরত কাষ্ঠ যোগাইয়া আসিয়াছেন। সাগ্নিকগণ-রক্ষিত অগ্নিমধ্যে কোন অপবিত্র বস্তুর প্রবেশাধিকার নাই। সমুদয় জাতিই অগ্নিকে সর্বোচ্চ শক্তির নিদর্শন বলিয়া স্বীকার করে। আলোকরূপে অগ্নি সত্যের আদর্শ। সমুদয় দ্রব্য অগ্নি হইতে উৎপন্ন এবং উহা সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অণু-পরমাণু সমস্তই অগ্নির লীলাসম্ভূত।

আসিরিয়া, কাল্‌ডিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ প্রধানত অগ্নির উপাসক ছিল। পারস্যবাসীদের অগ্নির উপাসনা সুবিখ্যাত। ইহাদের বংশীয় য়জ.দ কির্মান ও বোম্বাইয়ের পার্সীরা আজিও অগ্নির পূজা করিয়া থাকে।

এসিয়ায় অগ্নির পূজা বড় কম ছিল না। এসিয়ার কাঞ্চড়লেরা অন্যান্য দেবপূজার সহিত অগ্নির পূজা করে। জাপানের য়েসো

দেশবাসীদের অগ্নিই প্রধান দেবতা। তুঙ্গুজ. মুগল ও তুর্কীরাও অগ্নির পূজা করে।

ইউরোপেও গ্রীকদিকের মধ্যে Vulcan Hephaistos, Hestia অগ্নিদেবতা। প্রাচীন প্রুশিয়া, রুশ ও লিথুনিয়ান জাতি অগ্নির পূজা করিত। এখনও ইউরোপে অগ্নিপূজার ছিটা-ফোঁটা আছে। প্রাচীন ইহুদী ধর্মেরও অগ্নিপূজা একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহুদীগণ দেবতা ও পূর্বপুরুষদিগের উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিত।

মেক্সিকোবাসীরাও অগ্নিপূজক ছিল তাহাদের অগ্নিদেবতার নাম ছিল Xiuheuctli ; বাইবেলে (Old Testament) দেখা যায়, ইহুদীজাতির মধ্যে অগ্নির নিকট সন্তানসন্ততি উৎসর্গ করার প্রথা ছিল। আব্রাহামের সময়েই ইহার সংস্কার আরম্ভ হয় ; আব্রাহাম নিজপুত্র আইজাককে (Isaac) অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে সম্মত হন নাই।

ভারতবাসী ও ইরানীদের ধর্মে অগ্নির উপাসনা একটি প্রধান ব্যাপার। ভারতবাসীদের যেমন অগ্নিদেব ছিল, ইরানীদেরও সেইরূপ ছিল। কিন্তু উভয় জাতির অগ্নিদেবের নাম এক নয়। ইরানীদের অগ্নিদেবের নাম 'আতর্', ভারতবাসীদের এই দেবতার নাম 'অগ্নি'। স্লাভদিগের মধ্যেও অগ্নিদেবের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তাহাদের অগ্নির নামের সহিত ভারতবাসীদের অগ্নিদেবের নামের বিশেষ পার্থক্য নাই। বৈদিক ভাষায় এই দেবতার নাম 'অগ্নি, স্লাভদিগের অগ্নিদেবের নাম ogun, প্রাচীন স্লাভ রূপ ogni. স্লাভ, ভারতবাসী এবং ইরানীগণ সকলেই আর্য। এক সময় ইহারা সকলেই অগ্নিদেবের উপাসক ছিল এবং ইহাদের সকলের অগ্নিদেবের নামও এক ছিল। এক সাধারণ শব্দ হইতে যে অগ্নিদ্যোতক শব্দ উৎপন্ন তাহা বেশ বুঝা যায়। আর্যদের পরস্পর ছাড়াছাড়ির পূর্বে সকলেরই অগ্নিবোধক সাধারণ শব্দ ছিল। কিন্তু অগ্নিদেবের

উপাসনা কোন্ সময়ে প্রবর্তিত হয়, তাহা এইভাবে স্থির করা খুব কঠিন। ভারতীয় হিন্দুধর্ম প্রাচীন আর্য-ধর্মেরই একটি শাখা—সুপ্রাচীন আর্যরীতি এই ধর্মে অনেক রহিয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আলোচনা করিলে অগ্নি-সম্বন্ধে বহু তথ্য নির্ণয় করিতে পারা যায়।

আমরা দেখিতে পাই যে স্লাভদিগের অগ্নিদেববোধক একটি শব্দ বর্তমান; বেদের অগ্নির সহিত সেই শব্দটির বেশ সাদৃশ্য আছে। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভারতবর্ষীয় আর্যেরা যেমন অগ্নির উপাসক ছিলেন, স্লাভেরাও তেমনই অগ্নির উপাসক ছিলেন। ইরানীদের অগ্নিদেবের নাম এতটা পরিবর্তিত হইবার কারণ আমরা বুঝিতে না পারিলেও উহাদের মধ্যেও যে অগ্নি-উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহা তাহাদের অগ্নিদেবের নামের অস্তিত্ব হইতেই প্রতিপন্ন হয়।

ভারতীয় আর্য ও ইরানীদের মধ্যে প্রধান একটি দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবতার উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া বৈদিক 'অপাম্ নপাৎ' হইতে বেশ একটু পরিচয় পাওয়া যায়।[১] 'অপাম্ নপাৎ' শব্দটি অতি প্রাচীন। ইহার অর্থ 'জল-জাত'। জলদ হইতে যে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, 'অপাম্ নপাৎ' বলিতে সেই বিদ্যুতের দেবতা বুঝায়। ইনি দেব এবং মনুষ্যের মধ্যবর্তী। অবেস্তায় এই দেবতাকে একবার মাত্র অপর একজন অগ্নিদেবতার সহিত একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার নাম নইরোসংঘ। নইরোসংঘ অর্থে 'দেবদূত'।[২] পরবর্তী গ্রন্থে নইরোসংঘের আরাধনা খুব বেশী আছে। 'য়স্ত্' নামক গ্রন্থে ইহাকে মানবের নির্মাতা ও আকৃতিদাতা বলা হইয়াছে। বেদেও একটি শব্দ আছে—

---

১ Spiegel বলেন, 'অপাম্ নপাৎ' অতি প্রাচীন ও বিশেষভাবে সম্পূজিত দেবতা।—Die arische Periode, 313.

২ অবেস্তা ১৯. ২২।

'নরাশংস'। ইহাও দেবদূত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইরানী ভাষার 'নইরোসংঘে'র সহিত বৈদিক নরাশংসে'র সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয়।

ইরানীরা অগ্নিদেবকে 'আতর্' বলে। অগ্নিদেবের এই নামটি বহু প্রাচীন। কিন্তু ভারতীয় আর্যেরা এই নামটি ভুলিয়া গিয়াছে। তবে এই নামটি হইতে 'অথর্বন্' বলিয়া যে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে বেদে তাহা স্থান পাইয়াছে; উহার অর্থ 'অগ্নি-পুরোহিত'। ইরানীরা কিন্তু 'আথ্রবন্' শব্দে 'পুরোহিত'ই বুঝিয়া থাকে। অথর্বন্ শব্দের 'অথরে'র সহিত 'আতরে'র সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নয়। ভারতবাসীরা তাহাদের অগ্নিকে 'আতর্' বলে না বটে কিন্তু তাহাদের অগ্নির পুরোহিতকে অথর্বন্ বলে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন, আতর শব্দের অর্থ 'ভক্ষক'—কারণ আতর্ শব্দের মূলাংশ 'অদ্' ধাতু। এই 'অদ্' ধাতু বলিতে ভক্ষণ করা বুঝায়। তদনুসারে আতর্ বলিতে 'ভক্ষক' বুঝিতে হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অগ্নিদেবের নামের সার্থকতা ইরানীভাষায় ঠিক বজায় থাকে। আর্যগণও অগ্নিকে সর্বভুক্ বলিয়া থাকেন। অগ্নিকে যাহাই অর্পণ করা যায়, অগ্নি তাহাই ভক্ষণ করিয়া ফেলে। সুতরাং অগ্নিকে ভক্ষক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেহ কেহ এইরূপও অনুমান করিয়াছেন যে প্রাচ্য আর্যদের সময়ে অগ্নিদেব আতর্ নামেই অভিহিত হইতেন। কারণ, বেদে অগ্নি পুরোহিতকে অথর্বন্ বলা হইয়াছে। অগ্নি পুরোহিতেরা স্বর্গ হইতে অগ্নিকে আনয়ন করিয়াছিলেন, একথাও বেদে উক্ত হইয়াছে।

ভারতবাসী ও ইরানীদের পরস্পর নৈকট্যবশত এক জাতি অপর জাতির নিকট হইতে অগ্নি-উপাসনা গ্রহণ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ভারতবাসী ও ইরানীরা স্বাধীনভাবে স্ব স্ব পদ্ধতি-অনুসারে অগ্নি-উপাসনা করিত।

ভারতবাসীদের ন্যায় ইরানীদের অগ্নিযাগ ও সোমযাগ প্রচলিত ছিল। ভারতবাসীদের সোমযাগ যাহা, ইরানীদের মধ্যে 'হওম' যাগ প্রায় তাহাই। ভারতবাসী সোমরসকে দেবভোগ্য অমৃত বলিত। অমৃত দেবভোগ্য, উপাদেয় দিব্য পেয়। ইরানীদেরও দেবভোগ্য দিব্য পেয় ছিল, তাহার নাম 'অমেরেতাৎ'। অমৃত ও অমেরেতাতের শব্দগত সাদৃশ্য যথেষ্ট আছে। ইরানীদের এ ছাড়া আর একটি দেবভোগ্য পবিত্রভোগ্য ছিল, তাহাকে তাহারা হউরবতাৎ বলিত।[১] হউরবতাৎ খাদ্য, অমেরেতাৎ পেয়। শুধু খাদ্য ও পেয় নয়, ইহারা যমজ দেবতা; স্বর্গবাসীদের ইহারা পোষণ করে। ভারতীয় দেব—বিবস্বান্, যম, ত্রিত অপ্ত্য সোম-উপাসক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে ইরানী দেবতা বিবজ্বৎ, যিমের পিতা, থ্রিত ও অথ্ব্য সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হওম-উপাসক। সোমরস পান করিলে মনের যে অবস্থা হয় বেদে তাহাকে 'মদ' বলিত, অবেস্তায় তাহার নাম 'মধ'। সুতরাং সোমযাগ যে অতি প্রাচীন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। একথাও অন্তত বলিতে হইবে যে যখন ইরানী ও ভারতবাসীরা একত্র থাকিত তখন তাহাদের মধ্যে অগ্নি-উপাসনা ও সোমযাগ প্রচলিত ছিল। প্রাচ্য আর্যযুগেই যে অগ্নি-উপাসনা ও সোমযাগ আরম্ভ হয় তাহা বলা যাইতে পারে না। এই যুগের অনেক পূর্বে যে উভয় যাগ প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

বেদে অগ্ন্যুৎপত্তি-প্রসঙ্গ—দুই খণ্ড সমিৎকাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়। ইহাতে অগ্নি-উপাসকেরা মনে করিতেন যে সমিৎকাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি লুক্কায়িত থাকে। তাই সমিধ্‌কে স্বস্তিক বলা হইত। সমিৎকাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের মধ্যে এক খণ্ড হইতে দিব্যাগ্নি ও অপর খণ্ড হইতে পার্থিবাগ্নি উৎপন্ন হইত। যজ্ঞে আর তিনখানি

১ এই দুইটি শব্দকে সর্বদা এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বর্তমান ও অনাগত সম্পূর্ণ মুক্তিদ্যোতক।

কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। এই কাষ্ঠত্রয়কে পরিধি বলা হইত। পরিধিও অগ্নির জনক। অগ্নি পূর্বে ইন্দ্রের বজ্রমধ্যে নিহিত ছিলেন। ইন্দ্র বজ্রমধ্য হইতে তিন প্রকার অগ্নিকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করেন। তখন হইতে এক অগ্নি পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, এক অগ্নি বিশ্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছেন, আর এক অগ্নি জীবান্তর্গত হইয়া জীবগণের অধিনায়ক হইয়া রহিয়াছেন। অগ্নি, মাতা পৃথ্বীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, অগ্নিই পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তির জনক এবং অগ্নিই জীব-হৃদয়ে প্রাণ। পরিধিকাষ্ঠত্রয়ের একটি মাতা পৃথ্বীর প্রতিনিধি, একটি তাঁহার উৎপাদিকা শক্তির জনক বলিয়া অগ্নি পিতৃরূপী, আর একটি কাষ্ঠ জীবের প্রাণের স্বরূপ। যজ্ঞে পরিধিকাষ্ঠত্রয় ত্রিকোণাকারে সজ্জিত হয় এবং প্রথম সমিদুৎপন্ন অগ্নিদ্বারা তাহার নিম্নে কাষ্ঠ প্রজ্বালিত করা হয়। পরিধির তলকাষ্ঠ জীবনীশক্তিরূপে পৃথ্বিদেবী ও বিশ্বপিতাকে সমুত্তেজিত ও একত্র সম্বন্ধ করে। ত্রিকোণাকারে সজ্জিত পরিধিকাষ্ঠত্রয়ের মধ্যে যে সকল উপকরণ থাকে পুরোহিত তারপর তাহাও প্রজ্বালিত করেন। প্রথম সমিধ্ দিব্যাগ্নি ও দ্বিতীয় সমিধ্ পার্থিবাগ্নি। পুরোহিত এই দ্বিতীয় সমিদগ্নি দ্বারা বসন্ত ঋতুকে প্রজ্বালিত করেন এবং ইহা দ্বারা উৎপাদনক্ষম সমগ্র বর্ষকে প্রজ্বালিত করেন।

বৈদিক আখ্যানে পাওয়া যায়, অগ্নি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতরিশ্বার নিকট প্রথম প্রকট হইলেন। মনোবল ও মাহাত্ম্য দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্বর্গ ও পৃথিবী আলোকে উদ্ভাসিত করিল। মাতরিশ্বা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিলেন। তিনি অগ্নিকে অথর্বা ভৃগুর নিকট আনয়ন করিলেন। ভৃগু ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া নিরাপদে রক্ষা করিবার জন্যে মনুকে প্রদান করিলেন।

নানা ঋষিবংশদ্বারা অগ্নি প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বেদে উল্লেখ আছে। ঋষি অঙ্গিরা অগ্নিকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন বলিয়া শতপথ উপদেশ করিয়াছে। অঙ্গিরার জন্য অগ্নি হূত ও

তাঁহা দ্বারা স্তুত হইয়াছিল বলিয়াই বেদে উল্লেখ আছে। বেদ বলে অপ্নবান অগ্নিকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন। ভৃগুবংশীর ঋষিগণ সলিলাবাসে অগ্নির পূজা করিয়া আয়ু-পরিবারে তাঁহাকে স্থাপন করেন। আয়ু-পরিবারে প্রথম অতিথি হইয়া অগ্নি তাঁহাদিগের দ্বারাই গৃহে গৃহে নীত হন। বস্তুত ভৃগুগণই মনুষ্যমধ্যে অগ্নিকে প্রথম প্রচার করেন। বসুগণ ও ভরদ্বাজদিগের মধ্যেও অগ্নিকে প্রথম স্থাপিত দেখা যায়। উসিগেরা তাঁহাকে প্রথম হোতা ও বিবস্বান্ প্রথম দূতরূপে নিযুক্ত করেন। মনুগণও প্রথম অগ্নিস্থাপন করেন। ইঁহারা ইহাদের গৃহে অগ্নি প্রজ্বালিত করেন। অগ্নি মনুদিগের পুরোহিত হইয়া পড়িলেন। শতপথে আছে, দেবগণ, মনু ও ঋষিগণ তাঁহাকে প্রথম প্রজ্বালিত করেন।

অগ্নি নহুষদিগের গোষ্ঠীপতি হন। পুরুনীথ শাতবানের গৃহে অগ্নি প্রথম স্থাপিত। পুরুগণ তাঁহাকে প্রথম পূজা করেন।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতি অগ্নিপূজায় প্রবর্তিত হইয়াছিলেন। নানা রূপে ও নানা নামে অগ্নি নানা স্থানে পরিচিত। প্রাচীন স্লাভেরা অগ্নিকে বলিত Ogni, পরবর্তী স্লাভেরা তাহার নাম দিয়াছিল Ogun. লাটিন ভাষায় ইহা Ignis, লিথুয়ানিয়ানে Ugnis. শব্দতত্ত্বালোচনায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে অগ্নি ignis, ugnis, ogni প্রভৃতি এক সুপ্রাচীন সাধারণ শব্দের রূপান্তর। কিন্তু অগ্নির ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব সংস্কৃত 'অগ্নি'-শব্দে যত স্পষ্ট, অন্য কোন দেশের ভাষায় তাহা তত স্পষ্ট নয়। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশেষ সমস্যার বিষয়। ইহার ব্যুৎপত্ত্যর্থ লইয়া ভারতের বিভিন্ন সময়ের পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার একটু আভাস নিম্নে দেওয়া হইল।

নিরুক্তি—অমরটীকায় ক্ষীরস্বামী 'অগ্নি'র ব্যুৎপত্ত্যর্থ দিয়াছেন—'অঙ্গতি ঊর্ধ্বং যাতি ইতি অগ্নিঃ' (১. ৫৩)। সাধারণত অগ্নির

নিরুক্তিতে এই অর্থই দেওয়া হইয়া থাকে। এই ব্যুৎপত্তির পক্ষে সাধারণ যুক্তি এই যে পদার্থবিশেষের এক একটি ধর্ম আছে। জলের যেমন ধর্ম নিম্নে গমন করা, অগ্নির তেমনি ধর্ম ঊর্ধ্বে গমন করা। অগ্নির এই ধর্ম দেখিয়া ক্ষীরস্বামীর এই ব্যুৎপত্তি।

ঋগ্‌ভাষ্যকার শাকপুণি অগ্নি শব্দের এক অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে অগ্নিতে এই কয়টি বর্ণ আছে—'অ'—'গ্‌'—'নি'। এই তিনটির আখ্যাত তিনি কৌশলে বাহির করিয়া অগ্নি শব্দকে ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। 'অঞ্জ্‌'র 'অ', দহ্‌ ধাতু হইতে যে দগ্ধ পদ হয়, তাহার 'গ' এবং 'নী' ধাতুর 'নী' কে ছান্দস প্রণালীতে হ্রস্ব করিয়া তিনি 'অগ্নি' শব্দ খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য এইরূপ—

"ত্রিভ্য এব আখ্যাতেভ্যঃ জায়তে। অঞ্জু ব্যক্তিম্রক্ষগতিষু, অঞ্জেঃ অকারমাদত্তে, দহতের্দগ্ধশব্দাদ্‌গকারমাদত্তে, ততঃ নীপরাৎ তস্যৈষা ভবতি। নী ছান্দসত্বাৎ হ্রস্বো ভূত্বা নির্দিশ্যতে।" অগ্নির এই এক নিরুক্তি।

ঋগ্বেদের অন্যতম ভাষ্যকার যাস্ক তাঁহার প্রণীত নিরুক্তে বলিয়াছেন,—"অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে, প্রথমং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে, [ততঃ] অগ্রণীর্ভবতি"—যজ্ঞের অগ্রে—প্রথমে অগ্নিস্থাপনা না করিয়া কোন কাজেরই অনুষ্ঠান হয় না, এই জন্য ইহার নাম 'অগ্নি'।

স্থুলাষ্ঠীবানের পুত্র বলেন, 'অক্নোপনো ভবতীতি অগ্নিঃ', ইনি দ্রবীভূত করেন না, রুক্ষতা সম্পাদন করেন, এই জন্যই ইহার নাম 'অগ্ন'।

অগ্নি সকলকে 'অঙ্গং নয়তি' আত্মসাৎ করেন, অতএব ইহার নাম 'অগ্নি'।

'সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ'—এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১. ২. ২৮) শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—"অগ্নিশব্দোঽপ্যগ্রণীত্বাদিযোগাশ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি। গার্হপত্যাদিকল্পনং প্রাণাহুত্যধিকরণত্বঞ্চ

পরমাত্মনোঽপি সর্বাত্মত্বাদুপপদ্যতে।"—অগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি-নিষ্পন্ন অর্থ 'অগ্রণী' অর্থাৎ যাহা অগ্রে নয়ন করে, এইরূপ করিলে অগ্নি-শব্দকেও পরমেশ্বর-অর্থে ধরা যায়; যেমন 'অঙ্গয়তি প্রাপয়তি কর্মণঃ ফলম্ ইত্যাদিঃ।' যিনি উচ্চাবচ কর্মফলের প্রাপক তিনি অগ্নি। অগ্নি ও পরমেশ্বর সমান। গার্হপত্যাদিকল্পনাও পরমেশ্বরে সঙ্গত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য এখানে এই একই সিদ্ধান্ত 'অগ্রে নয়তি' দ্বারা করিয়াছেন।

বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণে নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। বেদের প্রথম ব্যাখ্যা ব্রাহ্মণই করিয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণের মধ্যে অগ্নির নিরুক্তি পাওয়া যায়। শতপথের (১. ১. ১১) নির্দেশ এইরূপ—যে গর্ভ অভ্যন্তরে ছিল, তাহা 'অগ্রি'রূপে সৃষ্ট হইল। যেহেতু, ইহা সর্বাগ্রে (অগ্রম্) সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই হেতু ইহার নাম 'অগ্রি'। বস্তুত, 'অগ্রি' তিনি যাঁহাকে লোকে 'পরোঽক্ষ'ভাবে (mystically) বলে 'অগ্নি'; কারণ দেবতারা 'পরোঽক্ষকামা' অর্থাৎ mysticদিগকেই ভালবাসে। শতপথের উক্তি (৬. ১. ১. ১১) যথা—"অথ যো গর্ভোঽন্তরাসীৎ। সোঽগ্রিরসৃজ্যত স যদস্য সর্বস্যাগ্রমসৃজ্যত তস্মাদগ্রিরগ্রির্হবৈ তমগ্নিরিত্যাচক্ষতে পরোঽক্ষং পরোঽক্ষকামা হি দেবাঃ।'

জৈমিনীয় উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণে অগ্নি-শব্দের এক ব্যাখ্যা আছে। অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি শব্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই ব্রাহ্মণ ইহাদের বাচ্য-বাচকভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে এই ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে 'অ' বর্ণে অমৃতের দৃষ্টি এবং 'গ্নি' বর্ণে মর্ত্যের দৃষ্টি করিতে হয়। এই ব্যাখ্যা-অনুসারে দেখা যায় যে অগ্নি শব্দের দুইটি অংশ আছে—একটি অমৃত, অপরটি মর্ত্য। দেবতাদের মধ্যে দুইটি অংশ আছে। একটি অমৃত বা মর্ত্য, আর একটি সত্য বা অমৃত। নামরূপাদির অংশটুকু মিথ্যা, আর সেই নামরূপাদির আশ্রয় যে অংশ তাহা সত্য

বা অমৃত। বাচ্য অংশের দ্বিত্ব লক্ষ্য করিয়া তাহার যে বাচক শব্দ তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটি অংশের প্রতিপাদক-রূপে শিষ্যের বোধসৌকর্যার্থ এক একটি অর্থ করা হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

'এত্যগ্নেরমৃতমপহতপাপ্মশুদ্ধমক্ষরম্। গ্নিরিত্যস্য মর্ত্যমনপতাপ্মাক্ষরম্।' (৮ অনু° ৩. ৪) বৃহদ্দেবতা (২. ১৪) অগ্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপে স্থির করিয়াছেন,—

'জাতো যদগ্রে ভূতানামগ্রণীরধ্বরে চ যৎ।
নাম্না সন্নয়তে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ॥'

ঋষিগণ যে ইহাকে অগ্নি নামে স্তুতি করিয়া থাকেন তাহার কারণ—(১) তিনি সমস্ত ভূতসৃষ্টির পূর্বে জাত হইয়াছিলেন, (২) যজ্ঞে তিনি অগ্রণী এবং (৩) তিনি অঙ্গকে সংযুক্ত করেন।

অগ্নির নাম—বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী সংহিতাদি গ্রন্থে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। তৈত্তিরীয়সংহিতা বলেন (২. ২. ৪২)—পার্থিব অগ্নির নাম বিপ্রগণ দিয়াছেন 'পবমান', অন্তরীক্ষের অগ্নির নাম 'পাবক' এবং দ্যুলোকস্থ অগ্নিকে বলা হয় 'শুচি'। অথর্ববেদ (৫. ২৪. ২) পাবককে 'বনস্পতি' নামে অভিহিত করিয়াছে। পুরাণগুলি একটু প্রকারভেদ করিয়া সাধারণত সংহিতারই অনুসরণ করিয়াছে। পুরাণকারগণ বলেন, অগ্নির পত্নী স্বাহার গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র হয়; পববান—ঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নি, পাবক—বিদ্যুদগ্নি ও শুচি—সৌরাগ্নি। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছে—ইহলোকে ঋষিগণ অগ্নিনামেই অগ্নির স্তুতি করেন, অন্তরীক্ষে ইনি জাতবেদ বলিয়া পূজিত হন এবং দ্যুলোকে বৈশ্বানর নামে স্তুত হইয়া থাকেন। বৃহদ্দেবতায় এই তিনটি নামের উল্লেখ আছে।[১]

১ ইহাগ্নিভূতস্ত্বৃষিভির্লোকে স্তুতিভিরীড়িতঃ। জাতবেদাঃ স্তুতো মধ্যে স্তুতো বৈশ্বানরো দিবি॥—১. ৬৭।

নিঘণ্টুকার দৈবতকাণ্ডের প্রথমেই এই তিনটি নামের উল্লেখ করিয়াছেন। যাস্ক (৭. ২৩) বলেন, প্রাচীন যাজ্ঞিকেরা অগ্নি বৈশ্বানর বলিতে সূর্য বুঝিতেন। শাকপুণির মতে কিন্তু বৈশ্বানর পার্থিব অগ্নি। পরে যাস্ক (৭. ৩১) শাকপুণির মতই মানিয়া লইয়াছেন।

বৃহদ্দেবতা বলে, অগ্নির একটি নাম 'ইন্দ্র'। নিজের রশ্মিজাল দ্বারা রস গ্রহণ করিয়া বায়ুর সাহায্যে তাহা পুনরায় পৃথিবীতে বর্ষণ করেন বলিয়া অগ্নির এই নামের সার্থকতা।

নিরুক্ত (৭. ৫) ও সর্বানুক্রমণী (২. ৮) পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র ও বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্যকে 'ত্রিদেব' নামে পরিচিত করিয়াছে।

অগ্নিত্রয়—অগ্নিত্রয় বলিলে অগ্নি, জাতবেদ ও বৈশ্বানর, এই তিন অগ্নিকে বুঝায়। এই তিন স্বরূপত অভিন্ন হইলেও তাঁহাদের পার্থক্য দেখানো হইয়া থাকে। ইহাদের প্রসূতি, বিভূতিস্থান বা জন্ম নির্বাচন করা অসম্ভব বলিয়া বৃহদ্দেবতা নির্দেশ করিয়াছে ; এইরূপ করিবার কারণ, সমস্ত জগৎ তাঁহাদের দ্বারা ব্যাপ্ত।

আবার অগ্নি বৈশ্বানরে আশ্রিত, বৈশ্বানর অগ্নিতে এবং জাতবেদ উভয়ে আশ্রিত, এইরূপে অগ্নি ও বৈশ্বানর জাতবেদের দুই রূপ হইয়াছে।[১]

সালোক্য, একজাতত্ব ও ব্যাপ্তিমত্তায় তাহারা এক হইলেও তাহাদের পৃথক্ দেবত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। যখন কোন সূক্তে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইবে তখন সেই সূক্তভাক্ হইবেন 'পার্থিব' অগ্নি। জাতবেদকে উদ্দেশ করিয়া কোন সূক্তের কথা বলিলে সেই সূক্তভাক্ হইবেন মধ্যমাগ্নি। বৈশ্বানর-সম্বোধিত কোন সূক্তের কথা বলিলে সেই সূক্তভাক্ হইবেন সূর্য।[২]

---

১ 'এতে উত্তরে জ্যোতিষী জাতবেদসী উচ্যেতে।'—যা° ৭. ২৩।

২ বৃহদ্দেবতা ১. ৯৮-১০০।

এই পৃথিবীস্থান অগ্নি মনুষ্যদিগের দ্বারা নীত হয় এবং সেই দ্যুস্থান তাঁহাকে নয়ন করেন। এই জন্য এই উভয় একনামযুক্ত হইয়াও প্রত্যেকে পৃথগ্‌ভাবে আপন কার্য করিয়া থাকে।

জাতবেদ নামের কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছে—যাঁহারা জাত, তাঁহারা তাঁহাকে জানেন বলিয়া তাঁহার এই নাম, অথবা তিনি যখনই জাত হন, জন্মগ্রহণ করেন, তখন জাত—বিদিত হন বলিয়া তাঁহার নাম 'জাতবেদ'।

পৃথিবীস্থান অগ্নি অর্চিরূপ কেশযুক্ত বলিয়া, অন্তরীক্ষস্থান অগ্নি বিদ্যুদ্‌রূপ কেশযুক্ত বলিয়া এবং দ্যুস্থান অগ্নি রশ্মিরূপ কেশযুক্ত বলিয়া কবিরা তাঁহার নাম দিয়াছেন 'কেশী'।[১] তবে প্রক্রিয়ায় তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি।[২]

শাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে পার্থিব ও মধ্যমাগ্নি সূর্য হইতে প্রসূত। প্রত্যেক যজ্ঞে অগ্নি ও মরুৎকে চিকীর্ষা করিবার সময় বৈশ্বানরীয় সূক্ত দিয়া কার্য করিতে হয়।[৩] এই বৈশ্বানর হইল দ্যুলোকস্থান সূর্য। এই কার্য ত্রিলোকের অবরোহপ্রণালীতে নিষ্পন্ন হয়। প্রথমে এই দ্যুলোক-দেবতার স্তুতি করিয়া মধ্যমস্থান বা অন্তরীক্ষ-দেবতা রুদ্র ও মরুতের স্তুতি করিতে হয়; তারপর পুনরায় স্তোত্রিয়[৪] দেবতা অগ্নির স্তুতি করিতে হয়।

চতুরগ্নি—অগ্নি চারি প্রকার—আহিত, উদ্ধৃত, প্রহৃত ও বিহৃত।[৫] এই লোক আহিত, অন্তরীক্ষ উদ্ধৃত, দ্যৌ প্রহৃত,

---

১ যা° ১২. ২৫-২৭।

২ বৃহদ্দেবতা ১. ৯৫।

৩ বৃহদ্দেবতা ১. ১০১ ; যা° ৭.২৩।

৪ অগ্নিদেবতা সম্পর্কেই স্তোত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য। যাস্ক বলেন—'তত আগচ্ছতি মধ্যমস্থানা দেবতা, রুদ্রঞ্চ মরুতশ্চ, ততোঽগ্নিমিহস্থানম্ অত্রৈব স্তোত্রিয়ং শংসতি।'—যা° ৭. ২৩। এই প্রসঙ্গে Rothএর Erlauterungen দ্র°।

৫ শ-ব্রা° ১১. ৮. ২. ১।

দিক্‌সকল বিহৃত। সুতরাং অগ্নি আহিত, বায়ু উদ্ধৃত, আদিত্য প্রহৃত এবং চন্দ্রমা বিহৃত। গার্হপত্য আহিত, আহবনীয় উদ্ধৃত। গার্হপত্য, আহবনীয়, অন্বাহার্য এবং পচন-চতুরগ্নি বলিয়াও খ্যাত।[১]

অগ্নির পঞ্চনাম—বৃহদ্দেবতা (২. ২২) বলেন, বৈদিক সূক্তে অগ্নির পাঁচটি নাম, ইন্দ্রের ছাব্বিশটি এবং সূর্যের সাতটি।

অগ্নির পাঁচটি নাম বলিলে বুঝাইবে—দ্রবিণোদা, তনূনপাৎ, নরাশংস, পবমান ও জাতবেদা।

১। বৈদিক ঋষি কুৎস দেখিলেন, অগ্নি ধন বা বল দান করিয়া থাকেন। দ্রবিণ বলিলে ধন ও বল বুঝায় সুতরাং তিনি অগ্নিকে 'দ্রবিণোদাঃ' নামে প্রচার করিলেন।[২]

২। পার্থিব অগ্নির নাম 'তনূনপাৎ'। দিব্যাগ্নিকে তনু বলে। তনন (প্রসরণ) হইতে তনু নিষ্পন্ন। তনু হইতে মধ্যমাগ্নির জন্ম। মধ্যমাগ্নি হইতে 'তনূনপাৎ' জাত হইয়াছে।

পৌত্রকে কবিরা 'নপাৎ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাস্কও বলিয়াছেন—'নপাদিতি অনন্তরায়াঃ প্রজায়াঃ নামধেয়ম্' (৮. ৫)। পুত্রের ঠিক পরবর্তী যিনি, 'অনন্তর' বলিলে তাঁহাকেই বুঝায়। তাই বৃহদ্দেবতা (২. ২৭) বলিয়াছেন—

অনন্তরং প্রজামাহুর্নপাদিতি কপন্থবঃ।
নপাদমুষ্য চৈবায়মগ্নিস্তেন তনূনপাৎ॥

পার্থিবাগ্নি দিব্যাগ্নির পৌত্র ; সুতরাং ইনি তনূনপাৎ।

৩। সমবেত নরগণের দ্বারা যজ্ঞের অগ্নি পৃথগ্‌ভাবে পূজিত (শংসিত) হন বলিয়া আপ্রী-সূক্তে অগ্নির নাম হইয়াছে—'নরাশংস'। যাস্কের উক্তিতে কাত্থক্যের মত এইরূপ—'নরাশংসো যজ্ঞ ইতি কাত্থক্যো নরা অস্মিন্নাসীনাং শংসন্তি'। শাকপূণির মত—'অগ্নিরিতি শাকপূণির্নরৈঃ প্রশস্যো ভবতি'। কাত্থক্যের ন্যায়

১ শ-ব্রা° ২. ২. ২. ১৮।

২ বৃহদ্দেবতা ২. ২৫ ; ঋ° ১. ৯৬. ৮।

বৃহদ্দেবতাও বলেন—যজ্ঞে আসীন হইয়া অগ্নি স্তুত হয় বলিয়া 'নরাশংস' যজ্ঞ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪। পার্থিবাগ্নি এই বিশ্বকে পবিত্র করেন বলিয়া বৈখানস ঋষিগণ তাঁহাকে 'পবমান' নামে স্তব করিয়াছেন।

৫। অগ্নির একটি নাম 'জাতবেদাঃ'। জাত হইয়াই অর্থাৎ জন্মিয়াই—

(ক) ইনি ভূতগণকে জানেন বলিয়াই ইঁহার নাম 'জাতবেদাঃ'।

(খ) বিদ্যা হইতে জাত বলিয়া ইঁহাকে 'জাতবেদাঃ' বলে।

(গ) জাত হইয়াই বিত্ত (ধন) অবগত হইয়াছেন বলিয়া ইঁহার এই নাম।

(ঘ) বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি ভূতগণ-দ্বারা বিদিত হন, তাই বিশ্বের 'মধ্যভাগেন্দ্রে'র ন্যায় তিনি 'জাতবেদাঃ' বলিয়া স্তুত হন।

নিরুক্তকার যাস্ক (৭. ১৯) অগ্নিকে বলিয়াছেন—'জাতবিদ্য', 'জাতবিত্ত', 'জাতে জাতে বিদ্যতে'।

অগ্নির পৌরাণিক নাম—পুরাণে অগ্নির বিবরণ কিছু স্বতন্ত্র। মহাভারতে দেখা যায়, অগ্নি এক, কিন্তু তাঁর রূপ বহু। কোথাও কোথাও অগ্নি ত্রিবিধ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু কর্মে তাঁহার বহুত্ব—'বহুত্বং কর্মসু'। সকল সময়েই তিনি 'সপ্তার্চির্জ্বলনঃ', তিনি 'সপ্তজিহ্বানন'। কখনও কখনও সাতটি অগ্নির উল্লেখ দেখা যায়; তিনটি যাজ্ঞিক অগ্নি—'অগ্নিত্রেতা' বা ত্রেতাগ্নয়ঃ'; ইহাদের মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি হইলেন পিতা, দক্ষিণাগ্নি হইলেন মাতা এবং আহবনীয় হইলেন গুরু। আর বাকী চারিটি অগ্নি হইল—সভ্য, আবসথ্য, স্মার্ত ও লৌকিক। হরিবংশ (১২. ২৯২) বলেন, সপ্তার্চির পরিবর্তে অগ্নির তিনটি শিখা আছে, তাই তাঁর নাম 'ত্রিশিখ'। পুরাণে অগ্নির এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। তদনুসারে অগ্নি পঞ্চ—আত্মা, অগ্নি, পিতা, মাতা, গুরু। যজ্ঞাগ্নির

হিসাব অনেক রকমের হয়—পাঁচ, ছয়, আট। অথর্ববেদও এই আটের কথা বলিয়াছেন। মহাভারতের সভাপর্বে (৭. ২১) পাওয়া যায়—ইন্দ্রের প্রসাদে অগ্নির সংখ্যা সাতাশ। অন্যত্র (১৩. ১০৩) ত্রিশ। পুরাণে অগ্নির একটি সাধারণ নাম 'যুগান্তার্ক', 'সম্বর্তক বহ্নি'। মহাভারতে সূর্যের ক্রোধ হইতে জাত অগ্নির নাম হইয়াছে—'পাতালজ্বলন'; হরিবংশ কিন্তু এই নামে বুঝেন, ঔর্ব ভার্গবের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন যে অগ্নি তাঁহাকে। এ ছাড়া দেশ ও কালবিশেষে অগ্নির বহু নাম পুরাণে পাওয়া যায়; যেমন 'তোয়াগ্নিঃ সাগরে'। 'কালাগ্নি' থাকেন মাল্যবান্ পর্বতে অথবা নাগলোকে। 'সপ্তার্চি' প্রভাতে ও সায়ংকালে হেমকূটের উপরে উদিত হন।

বেদ বলেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি। বিষ্ণুপুরাণ স্থির করিয়া দিলেন, তিনি ব্রহ্মার বড় ছেলে। কোন পুরাণ বলিলেন, অগ্নি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। ধর্মের বসু নামক পত্নীর গর্ভে কেহ অগ্নির জন্ম স্থির করিলেন। কাহারও মতে অগ্নি হইলেন অঙ্গিরার পুত্র, শাণ্ডিলের পৌত্র। কোন পুরাণমতে দেবী শাণ্ডিলী শৃঙ্গবান্ পর্বতে থাকিতেন, অগ্নি তাঁহারই পুত্র। ভাগবত বলেন, এই অগ্নিমাতা শাণ্ডিলী দক্ষপ্রজাপতির অপর পত্নী। মহাভারত এক স্থানে বলিয়াছেন, অগ্নি বায়ুদেবতা অনিলের পুত্র। রামায়ণও তাহা সমর্থন করিয়াছে। স্বাহা হইলেন অগ্নির স্ত্রী। ইনি কশ্যপের কন্যা। বায়ুপুরাণ-মতে দক্ষের কন্যা। স্বধা ও বসুধারা তাঁহার অপর স্ত্রী। পূর্বে পাবক, শুচি ও পবমান, অগ্নির এই তিন পুত্রের নাম করা হইয়াছে। পাবকের পুত্র 'কব্যবাহন'—ইনি পিতৃগণের অগ্নি। শুচির পুত্র 'হব্যবাহন'। ইনি দেবতাদিগের অগ্নি। পবমানের পুত্র 'সহরথ', ইনি অসুরদিগের অগ্নি। বায়ু ও অগ্নিপুরাণে ইহাদের বিস্তৃত বংশবিবরণ আছে।

কোন কোন পুরাণে অগ্নির কন্যার নাম পাওয়া যায়।

ব্রহ্মপুরাণে (২ অঃ) তাঁহার কন্যার নাম 'ধিষণা'—ইনি হবির্ধানের পত্নী। বায়ুপুরাণও তাহাই বলেন। তবে অগ্নির আর একটি কন্যা হবির্ধানের উর্ধ্বতম পঞ্চম পুরুষ উরুর পত্নী।

পুরাণকারগণ অগ্নির নানা রূপ সংখ্যা দিয়াছেন। বসুধারার পুত্র ও পৌত্র লইয়া ৪৫ জন অগ্নি। বায়ুপুরাণে এই ৪৫ জন অগ্নি, স্বয়ং অগ্নি ও পাবক, পবমান ও শুচি, এই কয়জনকে লইয়া ৪৯ অগ্নির বিষয় বর্ণিত আছে। ষষ্ঠ মন্বন্তরে পুরাণোক্ত সর্বমেলিতাগ্নির সংখ্যা ৬১।

পুরাণমতে অগ্নি পিতৃগণের রাজা। চতুর্থ মনু তমঃ যখন রাজা ছিলেন তখন ইতি সপ্ত ঋষির মধ্যে অন্যতম ঋষি ছিলেন। মহাদেবের রুদ্র নামক যে মূর্তি, তাহার নাম অগ্নি। অগ্নি সকল দেবতা ও পিতৃলোকের মুখস্বরূপ।

পুরাণে কর্মবিশেষ অগ্নির নামবিশেষে পূজার বিধি আছে। নবগৃহপ্রবেশকালে পাবক নামক অগ্নির আরাধনা করিতে হয়। গর্ভাধান-উপলক্ষে মারুত, অন্নপ্রাশনে শুচি, নাম-করণে পার্থিব, চূড়াকরণে সত্যনাম, গর্ভিণীর চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম মাসে কর্তব্য সংস্কারে মঙ্গল, জাতকরণে সংস্কারবিশেষে প্রগল্ভ, প্রায়শ্চিত্তে (মহাব্যাহৃতি হোমে) বিধু, লক্ষহোম বহ্নি, কোটিহোম হুতাশন, শান্তির জন্য বরদ, বরদানে দূষক ও বশীকরণে শমন নামক অগ্নির পূজার ব্যবস্থা আছে।

সৃষ্টিতত্ত্বে অগ্নি—উপনিষৎ উপদেশ করে—চক্ষুর্দৃশ্য পদার্থের মধ্যে অগ্নি সর্বপ্রথম পদার্থ। মনুর মতে অপ্ হইতে অগ্নির উৎপত্তি। মনু জলকেই অগ্নির জনক বলিয়াছেন, এই উক্তিতে তাঁহার উদ্দেশ্য এই 'অপ্' সাধারণ জল নয়; ইহা ভূতসমূহের সম্মিলিত তরলাবস্থা। শাস্ত্রে বহু স্থলে ইহাকেই কারণবারি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদ্ বলে, অগ্নিই জলের জনক। বেদান্ত-মতে বায়ু অগ্নির জনক।

কঠোপনিষদে 'লোকাদিং অগ্নিম্' বলিয়া যে অগ্নির উল্লেখ আছে তাহা এই স্থূল অগ্নি নহে। সেই অগ্নি হিরণ্যগর্ভ বা প্রথম শরীরী।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষাত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত ……" বলিয়া একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম হইতে তেজ বা অগ্নির উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছে; ইহা দ্বারাও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে স্থূল অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না; কেন না, শ্রুতির সকল স্থলেই আকাশাদিক্রমে ভূতের উৎপত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে প্রাণ, মন ও আকাশাদি সৃষ্টির পরই অগ্নির সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং এখানে তৎশব্দে তেজের কারণ যে 'বায্যাত্মা' তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তবে যে এখানে জগতের কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া ভূতের মধ্যে প্রথমে তেজেরই উল্লেখ করা হইল তাহার উদ্দেশ্য এই যে, এখানে দৃশ্যমান (অর্থাৎ যাহা চোখে দেখা যায়) জগতের মূল কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে। দৃশ্যমান জগতের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজোময় জগতের মূল কারণ —তেজ বা অগ্নি।

মনু প্রথমেই জলের সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। ইহা মনুর স্বকপোল-কল্পিত কথা নয়। শ্রুতিতেও ইহা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছে—'সোঽর্চন্নচরত্তস্যার্চত আপোঽজায়ন্ত।' মনু তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন। এখানে বুঝিতে হইবে, এই জলসৃষ্টি ক্ষিতি বা পৃথিবীর পূর্বসৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যে প্রথম সৃষ্টি নয়। সকল শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এইরূপই বুঝিতে হইবে যে জল সৃষ্টির পূর্বে প্রাণাদিক্রমে যে সৃষ্টিক্রম শ্রুতিতে নির্দিষ্ট আছে এখানে জলসৃষ্টিতেও সেই ক্রমই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ জলের পূর্ববর্তী অগ্ন্যাদি প্রাণান্ত সৃষ্টি ইহার অন্তর্ভূত। তবে পৃথিবীর কারণ প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য বলিয়া শ্রুতি এখানে সেইগুলির উল্লেখ করা

আবশ্যক বোধ করেন নাই। এই জন্য জলেরই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার পূর্ববর্তী কারণগুলির করেন নাই।

শ্রুতির অনেক স্থলে প্রথমেই জল সৃষ্টির কথা উল্লিখিত আছে। সকল স্থলেই যে পৃথিবীমাত্রের কারণ-নির্দেশই শ্রুতির অভিপ্রেত তাহা বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, সৃষ্টির আদিভূত জলসৃষ্টি যে ভূতভৌতিক জলসৃষ্টি তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত নয়। সকল ভূতের অসংহত অবস্থা ক্রমে সংহত হইয়া সমস্ত বিশ্বে পরিণত হইয়াছে, শাস্ত্রে অনেক স্থলে যাহাকে কারণার্ণব বলা হইয়া থাকে সেই কারণবারি বা অসংহত ভূতরাশিকেই লক্ষ্য করিয়া সকল স্থলে শ্রুতিতে 'অপ্' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কাজেই সকল ভূতের সৃষ্টির পূর্বে সেই অপ্ বা কারণসমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত।

প্রথম শরীরীর নাম অগ্নি কেন—মহাপ্রলয়ে গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করে। তখন কোন গুণেরই কোন ক্রিয়া হয় না। তারপর যখন সৃষ্টির আরম্ভ হয়, তখন প্রথমেই রজঃশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। রজের উদ্বোধ ব্যতীত কোন ক্রিয়াই সম্ভবপর নয়; কারণ, ক্রিয়া রজেরই মূর্তি। আর ক্রিয়া না হইলে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সৃষ্টিও সম্ভবপর নয়। কাজেই সাম্যাবস্থার ভিতর দিয়াই রজঃ বা ক্রিয়াশক্তিরই প্রথম উদ্বোধ হয়। এই যে উদ্বুদ্ধ রজঃপ্রধান কারণ-শরীর ইহাই প্রথম শরীর—ইহাই হিরণ্যগর্ভ, আর ইহাকেই অগ্নি বলা হইয়াছে। ইহাকে অগ্নি বলিবার একটু তাৎপর্য আছে। আমাদের মনে হয়, রজোগুণ তাপস্বরূপ। আর অগ্নিও রজঃপ্রধান বলিয়া তাপময়। রজোগুণের পরিচয় দিতে হইলে তাপ-জনকতা হিসাবেই রজোগুণের পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। স্থূল জগতে অগ্নি তাপজনক বলিয়া এই হিসাবে সূক্ষ্ম প্রথম শরীরীকে রজঃপ্রধান বলিয়া অগ্নি নামে অভিহিত করা হয়।

ঋগ্বেদের ঋষি ও অগ্নি—ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল। প্রথম ও দশম মণ্ডল বিভিন্ন বংশের ঋষিগণের দ্বারা উদ্গীত। দ্বিতীয় মণ্ডলে শুধু

একজন ঋষির সূক্ত আছে—ঋষির নাম গৃৎসমদ। তৃতীয় মণ্ডলে কেবল বিশ্বামিত্রেরই সূক্ত। বামদেব চতুর্থ মণ্ডলের এবং অত্রি পঞ্চম মণ্ডলের ঋষি। ভরদ্বাজ ষষ্ঠ এবং বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা। অষ্টম ও নবম মণ্ডলের বাণী যথাক্রমে কণ্ব ও অঙ্গিরার কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। এই সমস্ত ঋষি বলিতে শুধু তাঁহাদিগকেই বুঝায় না, তাঁহাদের বংশকেও বুঝায়।

প্রত্যেক মণ্ডলের সূক্তগুলি ঋষিসম্বোধিত দেবতাদের ক্রম-অনুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ক্রম-হিসাবে অগ্নির প্রতি উদ্দিষ্ট সূক্তগুলি প্রথম স্থান অধিকার করে; তারপর ইন্দ্রের প্রতি আরাধিত সূক্তের স্থান এবং অতঃপর অন্য দেবতার প্রতি ঈরিত বাণীর স্থান। প্রথম আটটি মণ্ডলে প্রধানত এই ক্রম অনুসৃত হইয়াছে। কেবল সোমস্তুতিতেই নবম মণ্ডল পরিপূর্ণ—সামসংহিতার সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ, আর দশম মণ্ডলের সহিত অথর্বসংহিতার আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঐতরেয় আরণ্যক এবং আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে পূর্বোল্লিখিত ক্রমের প্রাচীনতম উল্লেখ আছে।

ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে দেখা যায়, কয়েকজন ঋষি ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়া ক্রমশ তাঁহাকে প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন; আবার জন কয়েক ঋষি অগ্নির স্তুতি করিয়া ক্রমশ তাঁহাকেই প্রধান করিয়াছেন। ইন্দ্র-স্তুতিকারক ঋষিগণের মধ্যে আঙ্গিরস সব্য ইন্দ্রের প্রধান উপাসক; আর অগ্নিস্তুতিকারক ঋষিগণের মধ্যে শাক্ত্য পরাশরকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

কুৎস—কুৎস ঋষি নবম মণ্ডলের ঋষি অঙ্গিরার বংশোদ্ভব। ইনি অগ্নি ও ইন্দ্রকে এক করিয়াছেন। অঙ্গিরা অগ্নি-উপাসক ছিলেন। তাঁহার বংশমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কুৎস অগ্নিকে প্রধান করিয়া ইন্দ্রকে অগ্নির অন্তর্গত করিলেন। তিনি দেখিলেন, ইন্দ্র ও অগ্নির কার্য একই। ইন্দ্র পৃথিবীকে

শস্যশালিনী করেন। সমস্ত পদার্থ হইতে তিনি রস আকর্ষণ করেন (১. ৯৫. ৭)। সেই রসকে ঊর্ধ্বে আকৃষ্ট করিয়া মেঘাকারে পরিণত করেন। পরে সেই মেঘ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করেন। (মেঘগণ অগ্নির মাতা; কারণ, মেঘ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ অগ্নিরই একটি আকার-বিশেষ।) কুৎস অগ্নিকে ইন্দ্রের মধ্যে এবং ইন্দ্রকে অগ্নির মধ্যে দেখিয়াছেন। অগ্নি ইন্দ্রের এক রূপ, সূর্য ইন্দ্রের অপর রূপ। তিনি সূর্যরূপে আকাশে ও অগ্নিরূপে পৃথিবীতে বিরাজ করেন (১. ১০৩. ১)।

যখন বজ্রপাত, বৃষ্টিপতন হয়, নক্ষত্রের বিমল ঔজ্জ্বল্য বা সূর্যের প্রখর জ্যোতি প্রকাশ পায় তখন তন্মূলে যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে যেমন ইন্দ্রশক্তি বলা যায়, তেমনই আবার অগ্নি-শক্তিও বলা যাইতে পারে। কুৎসের অত্যুচ্চ ঔদার্যে ইন্দ্রশক্তি ও অগ্নিশক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সব্য ইন্দ্রকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, পরাশর অগ্নিকে সেইভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। অগ্নি যে শুধু পার্থিব অগ্নি তাহা নহে। তিনি আকাশেও বিরাজ করেন, বায়ুমণ্ডলেও অবস্থিতি করেন। যেখানে যত শক্তির কার্য, পরাশর সেই সমস্তের মূলে অগ্নিকে দেখিতেছেন। কাজেই সব্য ঋষির ইন্দ্র ও পরাশরের অগ্নির মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকে না। সব্যের চিন্তা ইন্দ্রের ও পরাশরের চিন্তা অগ্নির উৎকর্ষসাধন করিয়াছে। পরবর্তীকালে কুৎস তৎফলে অগ্নি ও ইন্দ্রের সমীকরণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। যখনই সব্যের ইন্দ্র ও পরাশরের অগ্নি তাঁহার স্তম্ভিত বিমুগ্ধ হৃদয়ে সম্মিলিত হইলেন, তখনই তিনি বিদ্যুতের প্রোজ্জ্বল জ্যোতির সঙ্গে বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষ মিশাইয়া গান করিলেন—

“চক্রাথে হি সধ্র্যঙ্‌নাম ভদ্রং সধ্রীচীনা বৃত্রহনা উতস্থঃ।
তাবিংদ্রাগ্নী সধ্র্যংচা নিষদ্যা বৃষ্ণঃ সোমস্য বৃষণা বৃষেথাং॥”
—১. ১০৮. ৩

হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদের কল্যাণকর নাম দুটি একত্র সম্মিলিত করিয়াছ; হে বৃত্রহন্তৃদ্বয়। তোমরা বৃত্রবধের জন্য সঙ্গত হইয়াছিলে। হে অভীষ্টদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা এক সঙ্গে বসিয়া অভিষিক্ত সোম আপনাদের উদরে সেচন কর।

কুৎস দেখিলেন, অগ্নি ধন বা বল দান করিয়া থাকেন। দ্রবিণ বলিলে ধন ও বল বুঝায়; সুতরাং তিনি অগ্নিকে 'দ্রবিণদাঃ' নামে প্রচার করিলেন।

দীর্ঘতমা—গৃৎসমদ—কুৎসের পর দীর্ঘতমার আবির্ভাব। এই ঋষিও অগ্নির উপাসক। আদিত্যরূপ অগ্নি ইঁহার উপাস্য।[১] এই অগ্নির মধ্যে ইনি শুধু ইন্দ্রকে কেন, মিত্র, বরুণ, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতিকেও দেখিয়াছেন। দীর্ঘতমা আদিত্যরূপী অগ্নিকে জন্মরহিত ও একা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সকল দেবকে তিনি অগ্নির মধ্যেই দেখিয়াছেন।[২] দ্বিতীয় মণ্ডলের ঋষি গৃৎসমদ দীর্ঘতমার পথ অনুসরণ করিয়া অগ্নির মধ্যে ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, অর্যমা ও ত্বষ্টাকে দেখিয়াছেন।[৩] তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র ও তাঁহার বংশোদ্ভব ঋষিগণ অগ্নির উপাসক। ইহারা অগ্নিকে প্রধান করিয়াছেন। ইহাদের মতে অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নিয়ামক।[৪] বিশ্বামিত্র উক্তি করিয়াছেন—অগ্নি সর্বজ্ঞ, চিত্তবান্, চেতনাবান্[৫] ও জগৎপতি[৬]। অগ্নিকে সকল দেবতার পূজ্য বলিবার জন্য তিনি বলিতেছেন—

---

১ ১. ১৪৬. ৪—৬

২ ১. ১৪৬. ৪৬

৩ ২ মণ্ডল। ১ম সূক্ত (সম্পূর্ণ)

৪ ৩. ২০. ৪

৫ ৩. ২৫. ১

৬ ৩. ২৩. ৩

"ত্রীণি শতা-ত্রী সহস্রাণ্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্যন্।—৩.৯.৯
৩৩৩৯ দেবতা অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন।[১]

ষষ্ঠ মণ্ডলের ঋষি ভরদ্বাজও অগ্নির উপাসক। তিনি অগ্নির যজ্ঞ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—

"বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্বীদং জ্যোতিহৃর্দয় আহিতং যৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিং স্বিদ্বক্ষ্যামি কিমু নূ মলিষ্যে॥"
—৬. ৯. ৬

(তোমার গুণ শুনিবার জন্য) আমার কর্ণ এবং (তোমার রূপ দেখিবার জন্য) আমার চক্ষু ধাবিত হইতেছে। হৃদয়ে যে (বুদ্ধি-স্বরূপ) জ্যোতি নিহিত রহিয়াছে, তাহাও তোমার স্বরূপ জানিবার জন্য (উৎসুক হইয়াছে)। দূরস্থ বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত আমার মন (তাঁহারই দিকে) ধাবিত হইতেছে। আমি কেমন করিয়া (বৈশ্বানরের) স্বরূপ বলিব। আর কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিব?

আবার তিনি ইন্দ্রেরও বীর্যে আস্থাবান্ হইয়া তাঁহারও স্তুতি করিয়াছেন। শেষে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়কে এক সঙ্গে স্তুতি করিতে করিতে বলিতেছেন—

'বলিত্থা মহিমা বামিন্দ্রাগ্নী পনিষ্ঠ আ।
সমানো বাং জনিতা ভ্রাতরা যুবং যমাবিহেহ-
মাতরা।"—৬. ৫৯. ২

হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমাদের যে জন্মমহিমা কীর্তিত হয়, সে সমস্ত সত্য ও প্রশংসার যোগ্য। তোমাদের দুজনেরই এক জনক; তোমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা; তোমাদের মাতা সকল স্থানেই আছেন।

---

১ সায়ণ বলিলেন, দেবতা ৩৩—৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁহাদের মহিমা মাত্র।

ইন্দ্রাগ্নি—ঋগ্বেদে অগ্নির উদ্দেশে যত মন্ত্র আছে ইন্দ্র ব্যতীত কোন দেবতারই উদ্দেশে তার চেয়ে বেশী মন্ত্র নাই। শুধু তাহাই নয়, ইন্দ্র ও অগ্নির একসঙ্গে সম্মিলন যেমন দেখা যায়, তেমন অন্য কোন দুটি দেবতার দেখা যায় না। কিন্তু যে সকল সূক্তে ইন্দ্রের সহিত অগ্নির বর্ণনা দেখা যায়, সেই সকল সূক্তে ইন্দ্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে অতি অল্পই আভাস পাওয়া যায়।

অগ্নির তিন প্রকৃতিযুক্ত তিন মূর্তি। তিনি সূর্য রূপে কালের বিভাগকারী—দিবা-রাত্রির তিনিই একমাত্র জনক। এই অবস্থায় তিনি বরুণের সমভিব্যাহারী। আকাশে তিনি বিদ্যুদগ্নির পরিচালক। এই অবস্থায় তিনি ইন্দ্রের অন্তরীক্ষস্থ বীরকীর্তির সহায় রূপে পার্শ্ববর্তী। ভূমণ্ডলও অগ্নিদেবের লীলাভূমি। এখানে তিনি যে মূর্তিতে অবস্থান করেন, সেই মূর্তিতে তিনি দেবতা ও মনুষ্যের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত থাকেন। এ অবস্থায় তিনি যজ্ঞাগ্নিরূপে দেবগণকে যজ্ঞভূমিতে নিমন্ত্রিত ও পরিচালিত করেন। যজ্ঞাগ্নি কখন কখন হব্যবাহনরূপে দেবগণের নিকট যজ্ঞহবিঃ বহনও করিয়া থাকেন।

অগ্নিকে ইন্দ্রের সহগামী করিবার দুইটি কারণ দেখা যায়। অগ্নিকে দেব ও মানবগণের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়; সুতরাং দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়া অন্যান্য দেবগণের অপেক্ষা অগ্নিকে ইন্দ্রেরই সহিত অধিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিতে হয়। বৃত্রসংহার কার্যে কুলিশাগ্নিরূপে অগ্নি ইন্দ্রের সহকারিতায় নিযুক্ত ছিলেন। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার ইন্দ্রের সহিত খুব গাঢ় সম্বন্ধ।

অগ্নি প্রতিনিয়ত ইন্দ্রের সহিত একত্র থাকিলেও, ইন্দ্রের আসন অবশ্য অগ্নির উপর। ইন্দ্রের সঙ্গে সাহচর্যে সকল দেবেরই জ্যোতি ম্লান হইয়া পড়ে। বৈদিক ঋষিরা সাধারণত কোন দেবতার গৌরব বৃদ্ধি করিবার সময় প্রায়ই ইন্দ্রের সহিত তাঁহাদের তুলনা

করিতেন।[1] কতকগুলি মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্নি ইন্দ্রের সমতুল্য বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। একটি মন্ত্রে (ঋ° ৭. ৬. ১) অগ্নিকে বলা হইয়াছে—'ইন্দ্রস্যেব প্র তবসস্কৃতানি বন্দে দারুং বন্দমানো বিবক্মি'—যিনি ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী আমি তাঁহার কর্মসমূহের কীর্তন করি। এই মন্ত্রে অগ্নি যে ইন্দ্রের সমপদারূঢ় তাহা বুঝিবার কারণ নাই।

আনব অগ্নি – বেদে আছে, সুদাস দশজন রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইন্দ্র অনুর পুত্রের গৃহাদি সম্পত্তি সমস্ত তৃৎসুকে দান করিয়াছিলেন। 'ব্যানবস্য তৃৎসবে গয়ং ভাগ্‌জেস্ম' (ঋ° ৭. ১৮. ১৩)। মহাভারতে (আদি—সম্ভবপর্বে) অনুর পুত্রদিগকে ম্লেচ্ছজাতি বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে দেখা যায়, অনুদের সহিত পুরুদের সম্বন্ধ ছিল। অনুরা পুরুরাজের সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ ও তাঁহার প্রজা ছিল। পুরুষ্ণী নদীর উত্তর তীরে তৃৎসুরা থাকিত। এই নদীর তীরেই যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহারা নদী পার হইয়া দক্ষিণ দিক্ হইতে অনুদের রাজ্যে আসিয়া পড়ে। অনুদের তখন রাজা ছিলেন শ্রুতর্বা। ইনি ঋক্ষপুত্র। —ঋ° ৮. ৭৪. ৪। আর্যেরা অনুদিগের মধ্যে অগ্নি-উপাসনা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। অনুরা অগ্নির এত ভক্ত হইয়া পড়িল যে শেষে তাহারা নিজেদের দেবতা পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিকে পূজা করিতে লাগিল। অনুরা যে এক সময়ে নিজেদের দেবদেবী ছাড়িয়া অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা 'আনব অগ্নি' এই কথাটিতেই বেশ প্রমাণিত হয়। ঋগ্বেদে (৮. ৭৪. ৪) আমরা উদ্গীত দেখিতে পাই—

"আগন্ম বৃত্রহন্তমং জ্যেষ্ঠমগ্নিমানবং।
যস্য শ্রুতর্বা বৃহন্নার্ক্ষো অনীক এধতে॥"

---

১ পূষা সম্পর্কে—'ইন্দ্রো ন সুক্রতুঃ' (৬. ৪৮. ১৪) মন্যুসম্পর্কে—'বিজেষকৃদ্ ইন্দ্র ইব' (১০. ১৫৭, ৫); পেদুর বলবান্ অশ্ব সম্পর্কে—'চকৃতাম্ ইন্দ্রম্ ইব (১. ১১৯. ১০) ইত্যাদি।

আমরা সেই বৃত্রহন্তা জ্যেষ্ঠ আনব অগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়াছি, যাঁহার নিকট ঋক্ষপুত্র শ্রুতর্বা শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং যাঁহাকে অন্নুদের শত্রুরা ভয় করে।

ভারত অগ্নি—ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে 'ভারত অগ্নি'র কথা পাওয়া যায়। এই মণ্ডলের সূক্তগুলি ভারতদিগের পুরোহিত ভরদ্বাজগণ-কর্তৃক উদ্গীত। ভারত অগ্নি দানবনিধনকারী বলিয়া এই মণ্ডলে প্রশংসিত হইয়াছেন।

"আগ্নিরগামি ভারতো বৃত্রহা পুরুচেতনঃ।
দিবোদাসস্য সৎপতিঃ।"—৬. ১৬. ১৯
"উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ দবিদ্যুতৎ।
শোচা বি ভাহ্যজর। —৬. ১৬. ৪৫

আমরা হব্যবাহক দিবোদাসের শত্রুনিধনকারী, সর্বজ্ঞ ভারত অগ্নিকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। হে ভারত অগ্নি! তুমি উদ্ধত ভাবে প্রদীপ্ত হও। হে অক্ষয় দীপ্তিমান্ অমর! তুমি বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হও।

অসুর অগ্নি—বেদে অনেক দেবতাকে অসুর বলা হইয়াছে। মরুৎ (১. ৬৪. ২), দ্যৌ (১. ১৩১. ১), ইন্দ্র (১. ৫৪. ৩), বরুণ (২. ২৭. ১০), ত্বষ্টা (১. ১১০. ৩), বায়ু (৫. ৪২. ১), পূষা (৫. ৫১. ১১) প্রভৃতি দেবের বিশেষণরূপে 'অসুর'কে কখনও কখনও দেখা যায়। সেইরূপ অগ্নিকেও ১৫. ১২. ১ ঋকে অসুর নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে অসুর শব্দের অর্থ বলবান্—দেব-বিদ্বেষ্টা অর্থ নয়।

পার্থিবাগ্নি দেবতা—জাতবেদ অগ্নিতে আশ্রিত, বৈশ্বানর অগ্নিতে আশ্রিত ; দ্রবিণোদ, ইধ্ম ও তনূনপাৎ ইহারাও অগ্নিতে আশ্রিত।

নরাশংস, ইল. বর্হি ও দিব্য দ্বার অগ্নিতে সংশ্রিত। নক্ত ও উষা, দিব্য হোতৃদ্বয়, দেবীত্রয় এবং ত্বষ্টা তাহাতে আশ্রিত।

বনস্পতি, স্বাহাকৃতিগণ, অশ্ব, শকুনি ও মণ্ডূকগণ তদাশ্রিত।

গ্রাবা, অক্ষ, নরাশংস, রথ, ছুন্দুভি, ইষুধি, হস্তঘ্ন, ভীশব ও ধনু অগ্নিতে আশ্রিত।

জ্যা, ইষু, অশ্বাজনী (চাবুক), বৃষভ, দ্রুঘণ (mallet) ঐল (draught), উলূখল, তাঁহাতে আশ্রিত।

নদীগণ, অপ্‌সমূহ এবং সমস্ত ওষধি তাহাতে সংশ্রিত। রাত্রি, অপ্‌বা, অগ্নায়ী, অরণ্যানী, শ্রদ্ধা, ইড়া ও পৃথ্বী উর্বী, রোদসী, মুষল, উলূখল, হবির্ধানদ্বয় তাঁহাকে ভজনা করে।

ছুই জোষ্ট্রী, ছুই উর্জাহুতী, বিপাট্ ও শুতুদ্রু, শুন ও সীর নামক অগ্নিদ্বয় তাঁহাতে আশ্রিত।

এই লোক, প্রাতঃসবন, বসন্ত ও শরৎ ঋতু, অনুষ্টুভ্ ও ত্রিবৃৎ স্তোম তাঁহাতে আশ্রিত।

অগ্নি-সহচর অন্যান্য দেবতা—গায়ত্রী একবিংশ স্তোম, রথন্তর সাম, বিরাজ সাম, সাধ্য, আপ্ত্য ও বসুগণ; ইহারা অগ্নিস্থান দেবতা। ইন্দ্র ও মরুৎ, সোম ও বরুণ, পর্জন্য ও ঋতুগণ এবং বিষ্ণুর সহিত অগ্নি স্তুত হইয়া থাকেন।

এই একই অগ্নি পূষা ও বরুণের সহিত সাম্রাজ্য অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে অগ্নি-প্রতীক—প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পকলায় বিভিন্ন প্রতীকরূপে চক্র, পাছুকা, ত্রিশূল, বৃক্ষ প্রভৃতি দেখা যায়; এই সকল প্রতীক বৌদ্ধধর্মের অভিনব আবিষ্কার নহে,বেদ ও উপনিষদাদি বুদ্ধপূর্ব যুগের ধর্মগ্রন্থাদি আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।[১]

---

১ ঋ° ১. ২৪. ৭; ৪. ১৩. ৫; ১০. ৮২. ৫; অ° ১০. ৭. ৩৮; ছা-উ° ৬. ৮. ৪; ৬. ১১. ১; ৬. ১২. ২; শ্বেতা-উ° ৩. ৯; তৈ-উ° ১. ১০। Coomarswamy : Yaksas, i. & ii, Washington, 1928, 1931; Do : Early Indian Architectureii ; Bodhi-gharas, in Eastern Art, iii. 1931.

আমরা সেই বৃত্রহন্তা জ্যেষ্ঠ আনব অগ্নির নিকট উপস্থিত হইয়াছি, যাঁহার নিকট ঋক্ষপুত্র শ্রুতর্বা শ্রীবৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং যাঁহাকে অসুদের শত্রুরা ভয় করে।

ভারত অগ্নি—ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে 'ভারত অগ্নি'র কথা পাওয়া যায়। এই মণ্ডলের সূক্তগুলি ভারতদিগের পুরোহিত ভরদ্বাজগণ-কর্তৃক উদ্গীত। ভারত অগ্নি দানবনিধনকারী বলিয়া এই মণ্ডলে প্রশংসিত হইয়াছেন।

"আগ্নিরগামি ভারতো বৃত্রহা পুরুচেতনঃ।
দিবোদাসস্য সৎপতিঃ।"—৬. ১৬. ১৯
"উদগ্নে ভারত দ্যুমদজস্রেণ দবিদ্যুতৎ।
শোচা বি ভাহ্যজর। —৬. ১৬. ৪৫

আমরা হব্যবাহক দিবোদাসের শত্রুনিধনকারী, সর্বজ্ঞ ভারত অগ্নিকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। হে ভারত অগ্নি! তুমি উদ্ধত ভাবে প্রদীপ্ত হও। হে অক্ষয় দীপ্তিমান্ অমর! তুমি বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হও।

অসুর অগ্নি—বেদে অনেক দেবতাকে অসুর বলা হইয়াছে। মরুৎ (১. ৬৪. ২), দ্যৌ (১. ১৩১. ১), ইন্দ্র (১. ৫৪. ৩), বরুণ (২. ২৭. ১০), ত্বষ্টা (১. ১১০. ৩), বায়ু (৫. ৪২. ১), পূষা (৫. ৫১. ১১) প্রভৃতি দেবের বিশেষণরূপে 'অসুর'কে কখনও কখনও দেখা যায়। সেইরূপ অগ্নিকেও ১৫. ১২. ১ ঋকে অসুর নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে অসুর শব্দের অর্থ বলবান্—দেব-বিদ্বেষ্টা অর্থ নয়।

পার্থিবাগ্নি দেবতা—জাতবেদ অগ্নিতে আশ্রিত, বৈশ্বানর অগ্নিতে আশ্রিত ; দ্রবিণোদ, ইধ্ম ও তনূনপাৎ ইহারাও অগ্নিতে আশ্রিত।

নরাশংস, ইল. বর্হি ও দিব্য দ্বার অগ্নিতে সংশ্রিত। নক্ত ও উষা, দিব্য হোতৃদ্বয়, দেবীত্রয় এবং ত্বষ্টা তাহাতে আশ্রিত।

বনস্পতি, স্বাহাকৃতিগণ, অশ্ব, শকুনি ও মণ্ডূকগণ তদাশ্রিত।

গ্রাবা, অক্ষ, নরাশংস, রথ, দুন্দুভি, ইষুধি, হস্তঘ্ন, ভীশব ও ধনু অগ্নিতে আশ্রিত।

জ্যা, ইষু, অশ্বাজনী (চাবুক), বৃষভ, দ্রুঘণ (mallet) ঐল (draught), উলূখল, তাঁহাতে আশ্রিত।

নদীগণ, অপ্ সমূহ এবং সমস্ত ওষধি তাহাতে সংশ্রিত। রাত্রি, অপ্‌বা, অগ্নায়ী, অরণ্যানী, শ্রদ্ধা, ইড়া ও পৃথ্বী উর্বী, রোদসী, মুষল, উলূখল, হবির্ধানদ্বয় তাঁহাকে ভজনা করে।

দুই জোষ্ট্রী, দুই উর্জাহুতী, বিপাট্ ও শুতুদ্রু, শুন ও সীর নামক অগ্নিদ্বয় তাঁহাতে আশ্রিত।

এই লোক, প্রাতঃসবন, বসন্ত ও শরৎ ঋতু, অনুষ্টুভ্ ও ত্রিবৃৎ স্তোম তাঁহাতে আশ্রিত।

অগ্নি-সহচর অন্যান্য দেবতা—গায়ত্রী একবিংশ স্তোম, রথন্তর সাম, বিরাজ সাম, সাধ্য, আপ্ত্য ও বসুগণ; ইহারা অগ্নিস্থান দেবতা। ইন্দ্র ও মরুৎ, সোম ও বরুণ, পর্জন্য ও ঋতুগণ এবং বিষ্ণুর সহিত অগ্নি স্তুত হইয়া থাকেন।

এই একই অগ্নি পূষা ও বরুণের সহিত সাম্রাজ্য অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে অগ্নি-প্রতীক—প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্পকলায় বিভিন্ন প্রতীকরূপে চক্র, পাদুকা, ত্রিশূল, বৃক্ষ প্রভৃতি দেখা যায়; এই সকল প্রতীক বৌদ্ধধর্মের অভিনব আবিষ্কার নহে,বেদ ও উপনিষদাদি বুদ্ধপূর্ব যুগের ধর্মগ্রন্থাদি আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।[১]

---

১ ঋ° ১. ২৪. ৭; ৪. ১৩. ৫; ১০. ৮২. ৫; অ° ১০. ৭. ৩৮; ছা-উ° ৬. ৮. ৪; ৬. ১১. ১; ৬. ১২. ২; শ্বেতা-উ° ৩. ৯; তৈ-উ° ১. ১০। Coomarswamy : Yaksas, i. & ii, Washington, 1928, 1931; Do : Early Indian Architectureii ; Bodhi-gharas, in Eastern Art, iii. 1931.

বেদাদি গ্রন্থে বনস্পতি ব্যক্ত ব্রহ্মের প্রতীক।[1] মৈত্র্যুপনিষদে (৬. ১-৪ ; ৭. ১১ ; ৬. ৩৫) বিশ্ববৃক্ষের বর্ণনায় আমরা বৌদ্ধ-শিল্পকলার প্রতীকের সহিত হিন্দু প্রতীকের সম্পর্কে বিশেষভাবে বুঝিতে পারি। এখানে আমরা অগ্নির (তেজঃ) প্রতীকের আলোচনা করিব। বেদে দেখা যায়, অগ্নি পৃথিবী ও স্বর্গের ভাররক্ষণে স্তম্ভরূপী মেরুদণ্ডস্বরূপ।[2] বৌদ্ধকলায় এই প্রতীক পূর্ণভাবে গৃহীত হইয়াছে।[3] মৈত্র্যুপনিষদে দেখা যায়—ব্রহ্ম সমস্ত বিশ্বব্যাপ্ত বৃক্ষস্বরূপ ; ঊর্ধ্বে এই বৃক্ষের মূল ; আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল প্রভৃতি ইহার শাখা। এই একক অশ্বত্থবৃক্ষে (এক অশ্বত্থ) তেজঃ অর্থাৎ মহাসূর্য অবস্থান করিতেছে, ইহাই সম্বোধয়িতা। এইরূপে পূর্ণব্রহ্মের তেজোরাশিকে অগ্নি, সূর্য ও আত্মা এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 'ওম্' শব্দব্রহ্ম। 'ওম্' দ্বারা তেজ উদ্বুদ্ধ হয়, ইহাই ব্রহ্মদৃষ্টির চির-আলম্ব ইত্যাদি।

অধিকাংশ বৈদিক গ্রন্থে অগ্নি নিখিল বিশ্বব্যবস্থা-সম্বন্ধীয় স্তম্ভরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই প্রতীক গৃহীত হইয়াছে। বৈদিক 'ব্রহ্মে'র স্থান বৌদ্ধশাস্ত্রে গ্রহণ করিয়াছেন 'বুদ্ধ'। বৌদ্ধশাস্ত্রে অশ্বত্থ 'মহাসম্বোধি'রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদের 'বিশ্ববৃক্ষের' সহিত ইহার মিল দেখা যায়।[4] মৈত্র্যুপনিষদে বৃক্ষকে উদ্বোধয়িতা বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে অগ্নিকে উষর্বুধ (ঊষাকালে জাগরিত) বলা হইয়াছে। ইহা বুদ্ধের উপরে আরোপ করা যায়। মহাসম্বোধি বৃক্ষমূলেই বুদ্ধ জাগরিত বা প্রবুদ্ধ

---

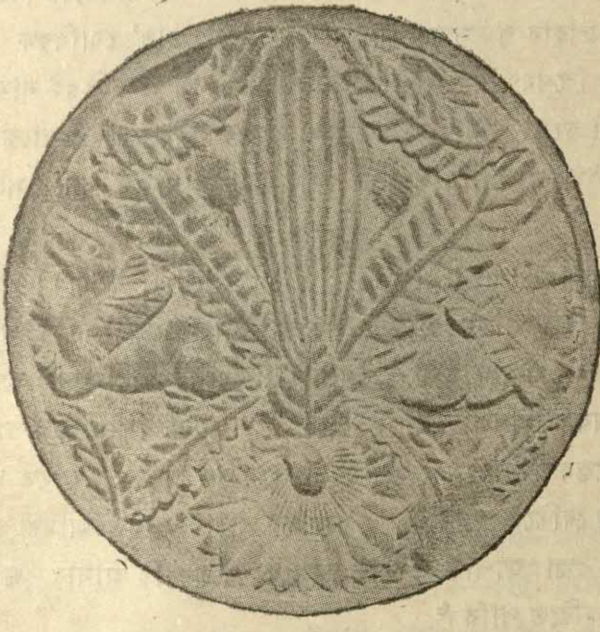
১ ঋ° ১. ২৪. ৭ ; ১. ১৬৪. ২০-২১ ; অ° ১০. ৭. ৩৮ ; কেন-উ° ১৬. ২৬।

২ ঋ° ১. ৫৯. ১-২ ; ৪. ১৩. ৫ ; ৬. ১৬. ১৩।

৩ Coomarswamy : Buddh. lcn., Figs. 4-10.

৪ তুল° সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, পৃঃ ৩১৮ ; অভির্বর্মকোষ ১. ৩৪ ; ২. ৩৪ ; মহাসুখাবতী ব্যূহ ৩২ ; মৈ-উ° ৬. ১-৪ ; ৭. ১১।

হন। বৌদ্ধশাস্ত্রে মহাসম্বোধি (অশ্বত্থ) জাগরণের প্রতীকস্বরূপ। তেজঃ বুদ্ধের মধ্যেই প্রতিভাত হইয়াছিল; বুদ্ধই উগ্রতেজে (উগ্‌গতেজো) দীপ্ত হইয়াছিলেন, ইহার শিখাই প্রজ্ঞা (পঞ্‌ঞা)।[১] এই রূপে দেখা যায়, অগ্নি বৌদ্ধগণ-কর্তৃক প্রবুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীকরূপে গৃহীত হন।



বৈদিক অগ্নি (রেড মেডেলিয়ান)

অমরাবতীতে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত প্রাচীরগাত্রাদিতে উৎকর্ণ অন্ধ্র-ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে অধিকাংশ স্থলে বুদ্ধের প্রতীকরূপে অগ্নিস্তম্ভ ও তৎসহ পদ্মোপরি স্থাপিত চক্র চিহ্নিত পদতল এবং একটি ত্রিশূল আছে।[২] বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের

১ ধম্মপদ ৩৮৭; সংযুক্তনিকায় ১, ১৪৪; থেরগাথা ৯০৯৫; তুল° ঋ° ১. ১৫৭. ১; ৩. ৫. ১; ৫. ১. ১; ৭. ৯. ১।

২ Coomarswamy: Buddh. Icn. Figs 4-40.

আলোচনা এই দিক্ দিয়া বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। অমরাবতীর এই বৌদ্ধভাস্কর্য আমাদিগকে বেদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অগ্নি জল বা পৃথ্বী হইতে উদ্ভূত, সুতরাং পদ্মের (পুষ্করের) উপরে প্রতিষ্ঠিত। ঋগ্বেদে অগ্নিকে বিশ্বরক্ষক স্তম্ভরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।[১] সাঁচি-স্তূপে বুদ্ধকে কল্পবৃক্ষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।[২] বৌদ্ধাচার্যগণ সাঁচির কল্পবৃক্ষের যে বর্ণনা করিয়াছেন বৈদিক ও উপনিষদের বিশ্ববৃক্ষের সহিত তাহার পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। 'অমিতায়ু' বোধিবৃক্ষ অগ্নির বৈদিক বিশেষণ 'বনস্পতি', 'বিশ্বায়ু' ও 'একায়ু' প্রভৃতিরই নামান্তর। অগ্নি বা সূর্যের উপাধি অমিতায়ু ও অমিতাভকেও বৌদ্ধশাস্ত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে।[৩] বৌদ্ধশাস্ত্রে ত্রিশূল ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের) প্রতীক। Senart এই ত্রিশূলকে অগ্নির প্রতীক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (La legende du Bouddha, 484)। শিবের সহিত বেদে অগ্নির অভিন্ন সম্পর্ক, আবার নন্দীপদ ত্রিশূলেরই নামান্তর। ঋগ্বেদে অগ্নিকে বৃষভ এবং বৃষভের পদচিহ্নের অন্বেষণে জ্ঞানান্বেষণের রূপক করা হইয়াছে।[৪] বৌদ্ধ শিল্পকলার পদ্ম ও অগ্নিস্তম্ভের সম্পর্ক-নির্ণয়ে আমরা ঋগ্বেদে পদ্ম (পুষ্কর) হইতে অগ্নির উৎপত্তি দেখিতে পাই।[৫] পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মার সহিত আমরা বৌদ্ধ-শাস্ত্রের ব্রহ্মা প্রজাপতি ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যের পদ্মোপরি আসীন বুদ্ধদেবের তুলনা করিতে পারি।[৬]

মূর্তিতত্ত্বে অগ্নি—অগ্নির মূর্তি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। অগ্নি একজন দিক্‌পাল-বিশেষ। পূর্বদক্ষিণ কোণের নাম

---

১ ঋ° ৬. ১৬. ১৩ ; ১. ৫৮. ১-২ ; ৪. ১৩. ৫।

২ Coomarswamy : Buddh. lcn. Fig. l.

৩ ঋ° ১. ৬৫. ৫ ; ৬. ১০. ৪।

৪ ঋ° ১.৬৫. ১ ; ৪. ৫. ৩ ; ১০. ৭১. ৩ ; ৩. ৩৯. ৬।

৫ ঋ° ৬. ১৬. ১৩ ; তুল° তৈ°-স° ৪. ১. ৩. কৌ-ব্রা° ৮. ১।

৬ Coomarswamy : Buddh. lcn. Fig. 35, 39, 40.

অগ্নিকোণ। অগ্নি এই বিদিকের অধিপতি। ইনি অষ্ট লোকপালের এক লোকপাল। মহাযান বৌদ্ধেরা বলে, দশ জন লোকপাল দশ দিক্ রক্ষা করেন; অগ্নি তাঁহাদের একজন।[১] মহাযানান্তগত বৌদ্ধদিগের মতে অগ্নির স্থানে বরুণ লোকপালদিগের অন্যতম নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 'ধর্মসংগ্রহ'[২] নামক বৌদ্ধগ্রন্থের মতে দিক্পাল বা



হরিহরেশ্বরের অষ্টদিকপাল

লোকপাল চারি, আট, দশ বা চৌদ্দ। তন্ত্রে[৩] দশজন দিক্পালের পূজার কথাই আছে। এই দশ দিক্পালের নাম—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋর্ত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু (অনন্ত)। অষ্টদিক্পালের মূর্তি সাধারণত মন্দিরের মহামণ্ডপে বিতান মধ্যভাগে দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] দিক্পালগণের মধ্যে অগ্নিই প্রধান। দেবতাদিগের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া মূর্তিতত্ত্বে তাঁহাকে বৃদ্ধ করিয়া দেখানো হয়। অগ্নির সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ, মস্তক

১ Waddel: Buddhism, 84.

২ Annecdota Oxoniensia, i pt.-v, verses 8, 9.

৩ যথা, মহানির্বাণতন্ত্র, ৬ষ্ঠ উল্লাস, ১৪৯ শ্লোক।

৪ IA. 1903, ××xii. 464.

দুইটি ; তাঁহার ছয় চক্ষু, সাত হাত, সাত জিহ্বা, চারিটি শৃঙ্গ, তিনটি চরণ ; তাঁহার চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডল। অগ্নি পদ্মাসনে আসীন। চতুরস্র যজ্ঞকুণ্ডের অনুকরণে তাঁহাকে চতুঃশালের মধ্যে সংস্থিত করা হয়। প্রোক্ষণী, স্রুক্, স্রুব, পূর্ণপাত্র, চামর, ব্যঞ্জনী ও ঘৃতপাত্র তিনি হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি যজ্ঞোপবীতধারী, স্থূলজঠর ; তাঁহার রক্ত বেশ, তাঁহার কেশ বেণীরূপে সংগঠিত। তাঁহার বাহন মেষ ; তাঁহার কেতু মেষচিহ্নযুক্ত। তাঁহার উভয় পার্শ্বে তাঁহার দুই পত্নী স্বাহা ও স্বধা। অগ্নিমূর্তির এই এক বর্ণনা। [১]

বিষ্ণুধর্মোত্তরে অগ্নিমূর্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই শাস্ত্র বলে, মন্দিরে অগ্নিমূর্তি স্থাপন করিতে হইলে এইরূপ মূর্তি প্রস্তুত করিতে হইবে—অগ্নির বর্ণ রক্ত হইবে ; মস্তকে জটা থাকিবে। অগ্নি সৌম্যমূর্তি, ধূম্রবসন ; জ্বালামালাকুল, ত্রিনেত্র, শ্মশ্রুধারী হইবেন। ইঁহার চারিটি বাহু। বাগ্দণ্ড, ধিগ্দণ্ড, ধনদণ্ড ও বধদণ্ড এই চারি দণ্ডের দ্যোতক চারিটি দংষ্ট্রা ; সারথি—বায়ু। ইনি ধূমচিহ্ন রথে অবস্থিত। ইঁহার রথ চারিটি শুকযুক্ত—চারি শুক চারি বেদদ্যোতক। ইন্দ্রের শচীর ন্যায় ইঁহার বামাঙ্কে স্বাহা। দেবীর হস্তে রত্নপাত্র। অগ্নির দুইটি দক্ষিণ হস্তে জ্বালা ও ত্রিশূল, বাম হস্তে অক্ষমালা। তেজের রূপ রক্ত বলিয়া ইনি রক্তবর্ণ।

বিষ্ণুধর্মোত্তরের উক্তি এইরূপ—

(ভার্গবকে সম্বোধন করিয়া অনিরুদ্ধ-পুত্র বজ্রের উক্তি)

রক্তং জটাধরং বহ্নিং কুর্যাদ্ বৈ ধূম্রবাসসম্।
জ্বালামালাকুলং সৌম্যং ত্রিনেত্রং শ্মশ্রুধারিণম্ ॥১
চতুর্বাহুং চতুর্দংষ্ট্রং দেবেশং বাতসারথিম্।
চতুর্ভিশ্চ শুকৈর্যুক্তে ধূমচিহ্নরথে স্থিতম্ ॥২
বামোৎসঙ্গগতা স্বাহা শক্রস্যেব শচী ভবেৎ।
রত্নপাত্রকরা দেবী বহ্নের্দক্ষিণহস্তয়োঃ ॥৩

১ SIIG, 142-43.

জ্বালাত্রিশূলৌ কর্তব্যৌ চাক্ষমালা তু বামকে।
রক্তং হি তেজসো রূপং রক্তবর্ণং তত স্মৃতম্ ॥৪
বাতসারথিতা তস্য প্রত্যক্ষং ধূম্রক্ষেত্রতা।
প্রত্যক্ষা চ তথা প্রোক্তা যাগধূম্রাভবস্ত্রতা ॥৫
অক্ষমালাং ত্রিশূলঞ্চ জটাজূটত্রিনেত্রতা।
সর্বাভরণধারিত্বং ব্যাখ্যাতং তস্য শম্ভুনা ॥৬
জ্বালাকারং পরং ধাম হুতং তেন প্রতীচ্ছতি।
গৃহীত্বা সর্বদেবেভ্যো ততো নয়তি শক্রহন্ ॥৭
বাগ্‌দণ্ডমথ ধিগ্দণ্ডং ধনদণ্ডং তথৈব চ।
চতুর্থং বধদণ্ডঞ্চ দংষ্ট্রাস্তস্য প্রকীর্তিতাঃ ॥৮
শ্মশ্রু তস্য বিনির্দিষ্টং দর্ভাঃ পরমপাবনম্।
যে বেদান্তে শুকাস্তস্য রথযুক্তা মহাত্মনঃ ॥৯
আগ্নেয়মেতত্তবরূপমুক্তং পাপাপহং সিদ্ধিকরং নরাণাম্।
ধ্যেয়ং তবৈতন্নৃপ হোমকালে সর্বাগ্নিকর্মণ্যপরাজিতেন ॥১০

'বিশ্বকর্মশিল্প' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে অগ্নির রূপ-বর্ণনা এইরূপ:—

ধ্বজহস্তো মহাবীর্যস্তাম্রাক্ষো ধূমসন্নিতঃ।
জ্বালামালাকুলং দীপং চাম্বাশস্তাংশুমণ্ডলম্ ॥
মেষারূঢ়ং চ কুণ্ডস্থং যোগপট্টেন বেষ্টিতম্।
দক্ষিণঞ্চ স্থিতং স্বাহা রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্।
সর্বযাগহিতং পুণ্যং পিঙ্গভূষণভূষিতম্ ॥

অগ্নির হস্তে ধ্বজ সংস্থিত; তিনি মহাবীর্য, তাঁহার অক্ষি তাম্রবর্ণ, বর্ণ ধূমের ন্যায়। তিনি জ্বালামালা-বেষ্টিত, উজ্জ্বল ও জ্যোতির্মণ্ডিত, মেষারূঢ়, কুণ্ডস্থ, যোগপট্ট-বেষ্টিত। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্বাহা। তাঁহার কর্ণ রত্নকুণ্ডলমণ্ডিত, তিনি সর্বযজ্ঞহিতকর পুণ্য ও পিঙ্গভূষণ-দ্বারা ভূষিত। হেমাদ্রি অগ্নিমূর্তির অন্যরূপ একটি বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার মতে অগ্নির এক মুখ, তিন চক্ষু, চারি হস্ত। তাঁহার বর্ণিত অগ্নির গোঁফ আছে। তিনি রথারূঢ়।

বায়ু তাঁহার সারথিরূপে রথ চালান। রথ টানে চারিটি শুক। রত্নপাত্রহস্তে তৎপত্নী সাবিত্রী তাঁহার বাম উরুর উপর আসীনা। অগ্নির দুই হস্তে জ্বলন্ত ত্রিশূল, এক হস্তে অক্ষমালা। এই বর্ণনায় স্বাহার পরিবর্তে সাবিত্রী।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য-লিখিত প্রপঞ্চসারতন্ত্রে অগ্নিমূর্তির পরিচয় আছে। প্রপঞ্চসার অগ্নির নমস্কার-ছলে বলেন—

ত্রিনয়নমরুণাপ্তাবদ্ধমৌলিং সুশুক্লাং
শুকমরুণমনেকাকল্পমম্ভোজসংস্থম্।
নমত কনকমালালঙ্কৃতাংসং কৃশাণুম্॥—৬ পটল ৮৮ শ্লোক

আদিত্য-পুরাণমতে আগ্নর সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ, জঠর স্থূল, ভ্রূ, কেশ ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র, সাতটি শিখা। বাহন—ছাগ। 'পিঙ্গভ্রূ শ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ .জঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ॥' অগ্নিপুরাণ বলেন—'ইন্দ্রো বজ্রী গজারূঢ়শ্ছাগগোঽগ্নিশ্চ শক্তিমান্'[১]—ইন্দ্র বজ্রী ও গজারূঢ়, অগ্নি ছাগারূঢ ও শক্তিমান্। ময়মুনি তাঁহার ময়মতে বলিয়াছেন, অগ্নির একটি সুবর্ণের মেষ ও শক্তি থাকিবে। মহাভারতে অগ্নির এক বর্ণনা আছে, তাহাতে অগ্নির সাতটি রক্তজিহ্বা বা রক্ত অশ্ব, সপ্তমুখ, রক্তকণ্ঠ, পিঙ্গলচক্ষু, উজ্জ্বল কেশ, স্বর্ণবীজ।

যাহা হউক, সাধারণত অগ্নির দুই মুখ, তিন পা, সাত হাত; বর্ণ লোহিত, বাহন মেষ। অগ্নির সম্মুখে ধ্বজপতাকা থাকে—তাহাতে মেষ অঙ্কিত থাকে।

অগ্নিমূর্তি-পরিচয়—ওড়িষা ও দক্ষিণ ভারতের মন্দিরমণ্ডপে দিক্‌পতিদের মূর্তি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বাহনাদি সর্বত্র একরূপ নয়।

বাহন—ওড়িষার মন্দিরমণ্ডপে ছাগ ও মেষ উভয় বাহনই

---

১ অগ্নিপু° ৫১. ১৪।

আছে। মহীশূরের হরিহরেশ্বরের মন্দিরে অগ্নির বাহন ছাগ, বাগলির কল্লেশ্বরের মন্দিরস্থ অগ্নির বাহন অশ্ব।

ভারতবর্ষের প্রথম প্রোটেস্টান্‌ট পাদরে Bartholomacus Ziegenbalg ১৮৬৯ খ্রী° মলবর দেবতাদের নির্ঘণ্ট পুস্তক প্রকাশ করেন। ইঁহার গ্রন্থের নাম—Genealogie der Malabarischen Gotter. ইহাতে তিনি অষ্টদিক্‌পালের বাহনের নাম দিয়াছেন। Rhea তাঁহার Chalukyan Architecture গ্রন্থে তুলনামূলক একটি তালিকা দিয়াছেন Ziegenbalg শুধু ছাগেরই উল্লেখ করিয়াছেন। Rhea ছাগ ও অশ্বের নাম করিয়াছেন। কিন্তু মূর্তিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে অগ্নি পদ্ম, ছাগ, মেষ ও অশ্বের উপর বসিয়া থাকেন। অশ্ব যে অগ্নির বাহন তৎ-সম্বন্ধে বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

অগ্নির তিনটি নাম—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ; এই তিন অগ্নিই শ্রৌত অগ্নি। বিবাহের পর অগ্ন্যাধান কার্য অনুষ্ঠেয়। অগ্ন্যাধানের সময় যখন অরণি দ্বারা অগ্নি মন্থন করা হয় তখন একটি অশ্বের প্রয়োজন হইত। গার্হপত্যের অগ্নি লইয়া আহবনীয় স্থানে যাইবার সময় এই অশ্বটি অগ্রে অগ্রে গমন করে। যজমান ইহার পিছনে পিছনে যান। কোন কোন মূর্তিতে অশ্বকে যে অগ্নির বাহনরূপে দেখা যায়, তাহার মূল সূত্র বোধ হয় অগ্ন্যাধানের এই অশ্ব-সম্বন্ধীয় ব্যাপার হইতে কল্পিত হইয়া থাকিবে।

সাধারণত অগ্নির বাহন ছাগ। ছাগের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ কি? উপনিষদে আছে, পুরুষ, আপনাকে স্ত্রী ও পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, সমস্ত জীব সৃষ্টি করিলেন। আজ প্রথমে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয়। এদিকে আবার অগ্নি তাঁহার প্রথম সৃষ্টি। আবার 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ'। অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও ছাগের সেই জন্যই বোধ হয় একটা অচিন্ত্য (mystic) সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণযজুঃসংহিতায় (১. ৩. ৩) অগ্নিকে 'অজ একপাদ্' বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। এই সংহিতায় সোমযাগের নিয়মে দেখা যায় যে সোমযাগের 'সুত্যা'র (pressing-day) পূর্ব দিন অগ্নি ও সোমের জন্য ছাগ-বলির ব্যবস্থা। পরে ছাগের পরিবর্তে 'নিরূঢ় পশু'র ব্যবস্থা হয়। ঋগ্বেদ ভিন্ন অন্যান্য সংহিতায় অশ্বমেধ-যজ্ঞে বলির পশুর একটা বড় তালিকা আছে। ঋগ্বেদে কেবল ছাগ ও অশ্ব পাওয়া যায়। দেবতাদের নিকট সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ঘোড়ার আগে আগে ছাগলকে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয়। শাঙ্খায়ন-(১৬. ৩. ২৭-৩৪) মতে ছাগকে দুইটিতে পরিণত করিয়া অশ্বের অঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাজসনেয়ি-(২৪. ১) ও মৈত্রায়ণী-সংহিতার (৩. ১২) মতে একটি ছাগ অগ্নির ললাটে, অপরটি পূষা অথবা সোম ও পূষার নাভিদেশে বাঁধা হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (৩. ৮-২৩) অগ্নির জন্য ছাগের ব্যবস্থা দিয়াছে। ওড়িষার রামচণ্ডীমন্দিরের ভোগমণ্ডপের অঙ্গনে একটি মেষ-সমাসীন অগ্নিমূর্তি আছে। পূর্বে ইহাকে কেহ কেহ বিভাণ্ডক মুনি বলিতেন। বিষণস্বরূপ এই মূর্তিকে বৃহস্পতি বলিয়া স্থির করেন। সুপণ্ডিত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সর্বপ্রথম ইহাকে অগ্নিমূর্তি বলিয়া নির্দেশ করেন। মূর্তিপ্রস্তরটি chlorite-নির্মিত—পরিমাণে ২½—১০½″×১—৫½″। মূর্তিটির শিরোভূষণ অতি সুন্দর। এই অগ্নিমূর্তির জঠর বেশ স্থূল। মূর্তিটি গুম্ফশ্মশ্রুযুক্ত। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, দাড়িটি মুসলমানী ধরণের।

নীলগিরির অন্তর্গত অযোধ্যা ও অযোধ্যা হইতে আড়াই ক্রোশ পূর্বে শোন নদের তীরবর্তী ডোম-গণ্ডরায় অগ্নিমূর্তি আছে। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ডোমগণ্ডরার অগ্নিমূর্তি প্রকাশ করেন।

এই অগ্নি দণ্ডায়মান। অগ্নির গলায় পৈতা। কোঁচা দিয়া

কাপড় পরা মূর্তি। অগ্নির জটা ও দাড়ি-গোঁফ আছে। উভয় হাতের সম্মুখভাগ ভগ্ন। অগ্নির দুইপাশে উর্ধ্ব-অধোভাবে দুইটি করিয়া কুণ্ড। অগ্নির দুই পার্শ্বে নীচের দিকে অসিহস্তে দুই জন দ্বারপাল। দক্ষিণস্থ দ্বারপালের সম্মুখে একটি মেষ।



ডোমগণ্ডরার অগ্নিমূর্তি

রুষপণ্ডিত C. Oldenburg ১৯০৩ খ্রীঃ তিব্বতে প্রাপ্ত ৩০০ মূর্তির চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ চিত্রগুলির মধ্যে ২৮৬ সংখ্যক চিত্র অগ্নিদেবের। আগ্ন ছাগোপরি আসীন। মূর্তির দুই হস্ত; দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা, বাম হস্তে ধৃত অঙ্কোপরি পূর্ণঘট। মস্তকে পঞ্চরত্নখচিত শিরোভূষণ। কণ্ঠে বৈদূর্যমণির হার।[১] তিব্বতে অগ্নিদেবের নাম—'মেল্‌হা' বা 'মেল্‌হা মর-পো' (Melha

১ 'ঐন্দ্রে মরত কং বিদ্যাদ্‌ বৈদূর্যং বহ্নিগোচরে।'—পৃঃ ১১২ শ্লোঃ ১৪৮।

বা Melhad morpo)। অগ্নির মোঙ্গোলীয় নাম 'গুল্উন্‌তগ্‌রি' (Gul-untagri)।

এলোরার ডুমরলেনা বা সীতার চাবড়ী নামক গুহামন্দিরে দক্ষিণ দিকের পূর্ব প্রাচীরের উপর হরপার্বতীর বিবাহদৃশ্য। হর ও পার্বতী উভয়েরই বাম হস্তে একটি করিয়া ফুল। নীচের দিকে দক্ষিণে ত্রিমুখ ব্রহ্মা পুরোহিতরূপে হোমাগ্নির নিকট নতজানু হইয়া বসিয়া আছেন। বাম দিকে মেনা ও হিমালয় পুষ্প ও নারিকেল-হস্তে। উর্ধ্বে দেবদেবীগণ; বামে—গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু, মহিষারূঢ় যম, মৃগারূঢ় বায়ু, ছাগারূঢ় অগ্নি এবং সম্ভবত বরুণ; দক্ষিণ দিকে ঐরাবতের উপর ইন্দ্র এবং মকরের উপর নিঋর্তি।

এলোরার কৈলাসপর্বত মন্দিরে মহামণ্ডপে একটি সুন্দর মূর্তি আছে। যে অলিন্দ দিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করা যায় তাহার পার্শ্বে এবং উত্তর প্রাচীরের মূর্তিগুলির মধ্যে একটি মহিষমর্দিনী মূর্তি আছে। মহিষমর্দিনী অসুর বিনাশ করিয়াছেন, দেবতা ও মহর্ষি-গণ সানন্দে দেখিতে আসিয়াছেন। এই দেবতাদের মধ্যে দেখিয়া চিনিতে পারা যায় ঐরাবতে ইন্দ্রকে, মেষোপরি অগ্নিকে, মহিষোপরি যমকে, গরুড়োপরি বিষ্ণুকে ইত্যাদি।

কলিকাতার চিত্রশালায় একটি অগ্নিমূর্তি আছে। মূর্তিটি ১' ৮½" × ১১½। এখানেও অগ্নি মেষারূঢ়। ইঁহার দুই হাত। এক হস্তে অক্ষমালা, অন্য হস্তে কমণ্ডলু। এই মূর্তিটি স্থূলবামনাকৃতি। এই অগ্নি শ্মশ্রুবিশিষ্ট এবং ইহার দেহের চতুর্দিকে অগ্নিশিখা। মূর্তিটি বিহার হইতে প্রাপ্ত। দেবমূর্তির মধ্যে যম, সূর্য, অগ্নি ও নবগ্রহের অন্যতম শনির দাড়ি থাকিতে দেখা যায়। শিবগুরু মূর্তিতে কখন কখন দাড়ি থাকিতে দেখা যায়। ৫টি দাড়িওয়ালা শিবগুরু আছে। এছাড়া ঋষিদের মূর্তিতেও দাড়ি থাকিতে দেখা যায়। অগস্ত্যের মূর্তিতে দাড়ি থাকে। চিদম্বরমের পূর্বগোপুরে শ্মশ্রুধারী অগস্ত্যের মূর্তি আছে; অন্যত্রও আছে। কুমারস্বামীর

'বিশ্বকর্মা'র শ্মশ্রুবিশিষ্ট নৃত্যশীল একটি ঋষির কাষ্ঠমূর্তির চিত্র আছে। এ মূর্তিটি ৭ম বা ৮ম শতকের। Havellএর Ideals of Indian Art, কৃষ্ণ শাস্ত্রীর South Indian Images of Gods & Goddesses প্রভৃতি গ্রন্থেও শ্মশ্রুবিশিষ্ট ঋষির চিত্র আছে।



কলিকাতার চিত্রশালায় অগ্নিমূর্তি

সারনাথ-চিত্রশালায় অষ্টদিক্‌পালের মধ্যে আগ্নর একটি মূর্তি আছে। এই চিত্রশালার তালিকায় ৯১৮ পৃষ্ঠায় G ২৪ সংখ্যক মূর্তির বিবরণে দয়ারাম সহনি একটি ভ্রমপূর্ণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে অষ্টদিক্‌পালের মূর্তি আছে। ইহার অগ্নির মস্তকের চারিদিকে শিখা। দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা, হাতে কিছু আছে বলিয়া বোধ হয়। বাম হস্তে কমণ্ডলু।

হরিহরেশ্বর মন্দিরের অন্তরালমণ্ডপে একটি ছাদের ভিতরকার দিকে অষ্টদিক্‌পালের মূর্তি আছে। এই মূতিগুলির মধ্যভাগে দণ্ডায়মান ঈশ্বরমূর্তি। ঈশ্বরের চতুর্দিকে দিক্‌পালদিগের নিজ নিজ বাহন। দিক্‌পালগণ বাহনের উপর আসীন।

এই স্থানের মহামণ্ডপ গম্বুজ-আকারে নির্মিত। ইহার ভিত্তিস্থল কতকগুলি ক্রমসংকীর্ণ মণ্ডলাকৃতি ক্ষেত্র। শিখরে (crown) মধ্য দিয়া এক খণ্ড ভারি পাথর নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পাথরের সম্মুখে ও পশ্চাদ্‌ভাগে দেবমূর্তি, নীচের দিকে জীবজন্তুর মূর্তি ক্ষোদাই করা। ভিত্তিমণ্ডলগুলি কোণবিশিষ্ট আর ঐ কোণগুলিতে অর্ধচন্দ্র কাটা। সকলের নীচের ক্ষেত্রে আট দিকের প্রলম্বিত শিলায় অষ্টদিক্‌পালের মূর্তি ক্ষোদিত।

বেণুগোপাল স্বামীর মন্দিরে মহামণ্ডপের মধ্যবর্তী কক্ষের ছাদের ভিতরকার দিক্‌টি বেশ সুন্দরভাবে ক্ষোদিত। এইটিই প্রধান এবং সকলের চেয়ে সুন্দর। উপরের মণ্ডলাকৃতি অংশ চারি কোণের চারিটি থামের উপরিভাগে অবস্থিত। আট দিকের আটটি কোণে ঠিক কড়ির উপর ভর করা অষ্টদিক্‌পালের মূর্তি। এইগুলি নীচের দিক্ থেকে উপরের দিকে চক্রকারে গড়িয়া উঠিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের বাদামী মন্দিরে দ্বিতীয় ভাগে সর্বোচ্চ স্থানে অধিপতিরূপে চতুর্বাহু বিষ্ণু উপবিষ্ট। দক্ষিণের একটি হস্তে চক্র এবং বাম দিকের এক হস্তে শঙ্খ। ইঁহার উভয় পার্শ্বে ভূমিদেবী ও শ্রী বা লক্ষ্মী। বিষ্ণুর চারিদিকে চক্রাকারে অষ্টদিক্‌পাল। সপরিবারে অগ্নি মেষারূঢ়।

মহানির্বাণতন্ত্রে (৯. ২১) 'ধনঞ্জয়' নামক অগ্নির একটি ধ্যান আছে। তাহাতে অগ্নি দ্বিমস্তকবিশিষ্ট।

ধ্যানটি এই—

বালার্কারুণসঙ্কাশং সপ্তজিহ্বং দ্বিমস্তকম্।
অজারূঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্॥

দুইটি মুখযুক্ত অগ্নির মূর্তি বড় একটা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ-শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ একটি মূর্তির চিত্র দিয়াছেন। এই চিত্রটি চিদম্বরমের অগ্নিমূর্তি হইতে গৃহীত। মূর্তিটি দণ্ডায়মান। চরণ দুইটি। হাত সাতটি। মস্তকের উষ্ণীষ অতি সুন্দর। অগ্নির বাহন মেষটি তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান।



চিদম্বরমের অগ্নিমূর্তি

দ্বিমুখবিশিষ্ট আর দুইটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন চিত্র আমরা Moorএর Hindu Pantheon নামক গ্রন্থে পাই। এই চিত্রের অগ্নি মেষারূঢ়। ইনি ত্রিপদ ও সপ্তহস্ত। সম্মুখে ও পশ্চাতে দ্বারপাল, একজন মেষাঙ্কিত ধ্বজ লইয়া, আর একজন চামর হস্তে। এই মূর্তির অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

মূরের আর একটি চিত্রে অগ্নি পদ্মাসীন। সপ্তহস্তের মধ্যে এক হস্তে ধ্বজ। পদ্মাসীন অগ্নিমূর্তির আর দুটি নিদর্শন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে Bridge সংগ্রহে পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটি মূর্তিই দ্বিদল পদ্মাসনে উপাসীনা। 'প্রপঞ্চসার-তন্ত্রে'র ষষ্ঠ পটলে (৮৮ শ্লোকে) 'অম্ভোজসংস্থ' বলিয়া অগ্নির পরিচয় আছে। দ্বিমুখবিশিষ্ট অগ্নির মূর্তি পাওয়া গেলেও ত্রিমুখবিশিষ্ট অগ্নিমূর্তি কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রপঞ্চসার-তন্ত্রে ত্রিমুখযুক্ত অগ্নির ধ্যান আছে। এই গ্রন্থের ষোড়শ পটলে এইরূপ উক্তি আছে।

শক্তিস্বস্তিকপাশান্‌সাঙ্কুশবরদাভয়ান্ দধত্রিমুখঃ।

মুকুটাদিবিবিধভূষোঽবতাচ্চিরং পাবকঃ প্রসন্নো বঃ॥ ২৮ শ্লোক।

অগ্নি প্রহরণ—কোন কোন দেবমূর্তির হস্তে বিবিধ প্রহরণের সহিত 'অগ্নি' বা 'বহ্নি' নামক প্রহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

'পঞ্চরাত্রাগমে' উল্লেখ আছে যে সুদর্শন-চক্রের সম্মুখভাগে বিষ্ণুর একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি থাকে। এই বিষ্ণুমূর্তির প্রহরণগুলির মধ্যে 'অগ্নি' একটি প্রহরণ। 'শিল্পরত্নানুসারে' কিন্তু চক্ররূপী বিষ্ণুর হাতে অগ্নির উল্লেখ নাই।

অর্ধনারীশ্বর-মূর্তির আট হাত। ইহার একটি হাতে 'বহ্নি' থাকে। প্রপঞ্চসার-তন্ত্রের ২৯ পটলে এইরূপ উল্লেখ আছে—

অহিশশধরগঙ্গাবদ্ধতুঙ্গাপ্তমৌলি-
স্ত্রিদশগণনতাঙ্ঘ্রিস্ত্রীক্ষণঃ স্ত্রীবিলাসঃ।
ভূজপরশুশূলান্ খড়্গবহ্নী কপালং
শরমপি ধনুরীশো বিভ্রদব্যাচ্চিরং বঃ। ৩ শ্লোক।

সদাশিবের দশ হাত। 'অগ্নি' ইহার একটি প্রহরণ। প্রপঞ্চসারে (২৬. ৪) এইরূপ আছে—'শূলাহী টঙ্কঘণ্টাসিশৃণিকুলিশপাশাগ্ন্য-ভীতীর্দধানম্।'

'হেবজ্রতন্ত্রে' হেবজ্রের রূপ-বর্ণনা আছে। তন্ত্রখানি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের। হেবজ্রের ৮টি মুণ্ড, ১৬ হাত, ৪ পা। সকল হাতেই

নরকপাল। দক্ষিণ-দিকের আট-হাতে হস্তী, অশ্ব, অশ্বতর, বৃষভ, উষ্ট্র, মনুষ্য, হরিণ ও মার্জার-মূর্তি। বাম দিকের হস্তে—

১। বরুণ—পীত বর্ণ
২। বায়ু—হরিদ্ „
৩। অগ্নি—রক্ত „
৪। চন্দ্র—শ্বেত „
৫। সূর্য—রক্ত „
৬। যম—নীল „
৭। বসুধারা—পীত বর্ণ
৮। ? পীত বর্ণ

Grunwedel এই মত মানিয়া লইয়াছেন। Alice Getty লিখিত Gods of Northern Buddhism নামক গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠায় হেবজ্রের মূর্তি আছে।

শিল্পশাস্ত্রে অগ্নি পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। এই অগ্নির দুই প্রকার তাৎপর্য। প্রথমত ইহা যুদ্ধের অস্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। আর সাধারণত শিবের হস্তেই এই অস্ত্র দেখা যায় এবং দ্বিতীয়ত হবন ব্যাপারে অগ্নি দেওয়া হইয়া থাকে। গোপীনাথ রাও মহাশয়ের গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১ম ভাগে (পৃঃ ৭) এই উভয়বিধ চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মথুরার প্রত্নশালায় (museum) অগ্নির একটি মূর্তি আছে। এই মূর্তির চতুর্দিকে অগ্নিশিখা চক্রকারে আবর্তিত। মূর্তির দুই পার্শ্বে দুইটি অনুচর। দক্ষিণ পার্শ্বের অনুচরের দেহ মানুষের কিন্তু মস্তকটি ছাগের। ত্রিবাঙ্কুরে কণ্ডীয়ূরের শিবমন্দিরে দুইটি ছাগমুখ-বিশিষ্ট অগ্নিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। চিদম্বরমের শিবমন্দিরে যে অগ্নিমূর্তি আছে তাহারও দুইটি মুখ, কিন্তু এ মুখ দুইটি মনুষ্যাকৃতি। এই মূর্তির পিছনে একটি বৃষের মূর্তি অঙ্কিত। সম্ভবত এটি বাহন। কোণারকে কয়েকটি সূর্য-মূর্তি আছে। এই মূর্তিগুলির দ্বারপাল—পিঙ্গল ও দণ্ডনায়ক, পিঙ্গল অগ্নি, দণ্ডনায়ক যম।

বিশ্বকর্মশিল্পে মিত্র বা সূর্যের দুইটি দ্বারপাল—একটি দণ্ড (যম)[১] আর একটি পিঙ্গল (অগ্নি)। দণ্ড ও পিঙ্গলের হস্তে অসি। 'দণ্ডশ্চ পিঙ্গলশ্চৈব দ্বারপালৌ চ খড়্গিনৌ।'—বিশ্বকর্মশিল্প।

অগ্নি-সম্পর্কে আর্য ও দস্যু—নিরুক্ত-কারগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বেদ-ভাষ্যকার সায়ণাচার্যের সময় পর্যন্ত বেদের প্রত্যেক ভাষ্যকার আর্য বলিতে যাঁহারা অগ্নিউপাসক তাঁহাদিগকেই বুঝিয়াছেন। বেদের বহু মন্ত্রে দস্যুদিগকে নিরগ্নি বলা হইয়াছে। আর্যগণের বিশ্বাস ছিল যে দেবগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যস্থ অগ্নি, তিনি দেব ও মানবের দূত। অগ্নি দেবগণের মুখস্বরূপ, অর্থাৎ দেবগণ অগ্নির মুখেই আহার করেন। আর্যদের ন্যায় দস্যুরাও যজ্ঞ করিত, যজ্ঞে পশুবধ করিত ; কিন্তু তাহারা অগ্নির সাহায্যে দেবগণকে তুষ্ট করিত না। এই অপরাধে তাহারা আর্যগণের নিতান্ত অপ্রিয় ছিল। আর্যগণ অগ্নির উপাসনা করিত বলিয়া দস্যুরাও তাহাদিগকে ঘৃণা করিত, তাহাদের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিত। নিরুক্তে দস্যুকে 'অগ্নি-যজ্ঞ-ধ্বংসকারী' বলা হইয়াছে। আর্যেরা তাঁহাদের দেবতার নিকট যে পশুবলি দিতেন তাহা তাঁহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন। এ ছাড়া ইন্দ্রের তৃপ্তির জন্য তাঁহারা আরও কিছু করিতেন। আর্যদের দেবতা ইন্দ্র বৃষভ ও ছাগমাংস ভালবাসিতেন, কিন্তু সোমরস তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল।

দ্রবিড় ও মুণ্ডা অগ্নিপূজক নয়—বেদের ভাষা অগ্নি-সোম-উপাসকদিগের পবিত্র ভাষা। অগ্নি-সোম-উপাসক আর্যগণ উত্তর-ভারত অধিকার করিবার পূর্বে বৈদিক ভাষা এখানে প্রচলিত ছিল না। তখন ভারতবর্ষে দুইটি বিভিন্ন জাতীয় ভাষার অস্তিত্ব ছিল। তাহাদের একটি দ্রবিড়, আর একটি মুণ্ডা। এই দ্বিবিধ ভাষাভাষী জাতি অগ্নি-উপাসক নহে। ইহাদের মধ্যে এখনও যাহারা আর্যরীতি

---

১ ভবিষ্যপুরাণে দণ্ডের যে বর্ণনা আছে তাহাতে দণ্ড=দণ্ডনায়ক=দেব-সেনাপতি=স্কন্দ।

অবলম্বন করে নাই তাহাদের কোন ক্রিয়াকলাপের সহিত অদ্যাপি আগ্নির সম্পর্কমাত্র নাই।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে জাতি ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ চান্দ্রমাসে বর্ষগণনা প্রবর্তিত করে সেইজাতি পূর্বে ইউফ্রেটিস উপত্যকার অধিবাসী ছিল। ইহারা উত্তরাঞ্চলের অক্কডীয় উপাসক ছিল। ইহারা যে অক্কডীয় দেবের উপাসনা করিত সেমাইট্‌রা সেই দেবকে 'অদর্' বলিত। এই অদর্ দেবই প্রথম অগ্নিদেব। ইউফ্রেটিসের উপত্যকার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে অক্কডেরা বাস করিত। উত্তরাঞ্চলের অক্কডরা অগ্নি পূজক ছিল। ইহারা ভারতবর্ষে কশ্যপপুত্র বলিয়া পরিচিত হইত। প্রসিদ্ধি আছে, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে কাবুলাঞ্চলে কশ্যপের রাজ্য ছিল।

অক্কডরা ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে এখানে চান্দ্রোপাসকেরা বাস করিত। অক্কডরা দ্রবিড় জাতিরই একটি শাখা। ইহাদিগকে সুমের-অক্কডও (Sumero-Akkadian) বলা হয়। এই অক্কড জাতি যজ্ঞকার্যের উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিষা-লোচনার সূচনা করে।

আর্যদের পঞ্জাবপ্রদেশ অধিকারের বহু পূর্বে দ্রবিড়েরা ভারতবর্ষে তাহাদের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দ্রবিড়দিগের প্রবর্তিত ধর্মভাব জড়াত্মক ছিল। আর্যেরা তাহাদের জড়াত্মক ধর্মভাবে আধ্যাত্মিক ভাব সংযুক্ত করিয়াছিল। তৎপরে ভারতবর্ষে ধর্মনীতির প্রবর্তন আর্যজাতিই করে। স্বার্থসিদ্ধি, বিপদ হইতে পরিত্রাণ, সম্পদ্‌লাভ প্রভৃতি হিসাবে পূর্বে ধর্মানুষ্ঠান হইত। ধর্মই যে ধর্মের পুরস্কার, এই নীতি আর্যরাই প্রবর্তিত করে।

দ্রবিড়জাতীয় লোকেদের দুইটি দল ভারতবর্ষে ছিল। একদল পৃথ্বী ও চন্দ্রের উপাসক ছিল। চন্দ্র তাহাদের নিকট দেবী বলিয়া পরিগণিত হইত। আর একদল সর্পোপাসক ছিল। বহুকাল ধরিয়া এই দুই সম্প্রদায়ের দ্রবিড় জাতি ভারতবর্ষে আধিপত্য

করিয়াছিল। ইহারা যে এক সময়ে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্যন্ত শাসন করিত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহাদের পরে ভারতবর্ষে অগ্নি-উপাসনা প্রবর্তিত হয়।

সোমযাগ ও অগ্নিযাগ—ভারতীয় আর্যগণ সোমযাগ করিতেন। সোমযাগ ভারতবর্ষে বিশেষ উৎকর্ষলাভও করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সোমযাগের আরম্ভ ভারতবর্ষে হয় নাই। এই যাগটি ভারতবর্ষের পক্ষে বৈদেশিক অনুষ্ঠান। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও আছে। একটি বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে সোমলতা ভারতের দ্রব্য নয়। গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের দূরবর্তী পর্বতে সোমলতা উৎপন্ন হইত। আজকাল যেমন শুষ্ক করিয়া চরস সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, পূর্বকালে কিঞ্চিৎ আয়াস-সহকারে ঐ সকল অঞ্চল হইতে সোমলতা সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইত। কিছুকাল পরে ভারতীয় আর্যগণ সোমলতা কিরূপ তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন; শেষে এমন কি সোমলতার পরিবর্তে অন্য একপ্রকার লতা সোম নামে ব্যবহৃত হইত। সোমলতা যে পারস্য, গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের পর্বতীয় স্থানে জন্মিত, এখানে পাওয়া যাইত না, বেদমন্ত্রেই তাহা উল্লিখিত আছে। বিশেষজ্ঞগণের অনুমান, প্রাচীনকালে পারস্যদেশে সোমযাগের প্রাদুর্ভাব হয়। সে যাহাই হউক, অতটা স্বীকার না করিলেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সোমযাগ খাঁটি ভারতীয় যাগ নয়।

অতি প্রাচীনকালে সোমযাগের ন্যায় অগ্নিযাগেরও প্রাদুর্ভাব পারস্যদেশে ছিল। তবে ভারতের অগ্নিযাগে ও পারস্যের অগ্নিযাগে কিছু প্রভেদ আছে। পার্থক্য এই যে, ভারতীয় আর্যরা নিবেদিত দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন, কিন্তু পারসিকেরা বলির পশুশরীরের অংশবিশেষ অগ্নিকে দেখাইয়া অন্য দিকে ফেলিয়া দিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, মাংস অগ্নিতে স্পর্শ করাইলে অগ্নি অপবিত্র হইবে।

ত্রিমূর্তি ও অগ্নি—তিন এই সংখ্যাটি ভারতীয় ধর্মেতিহাসের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বেদ ও বৈদিক ধর্মে 'তিন' ও 'সাত' সংখ্যা প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে তিন এই সংখ্যাটির পবিত্র ভাব স্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে। এই 'তিন' সংখ্যা অবলম্বন করিয়াই বিশ্বের তিনটি মূলতত্ত্বই কালে উপাস্য ত্রিমূর্তিতে পরিণত হয়। হিন্দুদর্শনানুসারেও রজোগুণ-প্রভাবে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি এবং তমোগুণে প্রলয় হয়। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—বিশ্বের এই তিন মূলতত্ত্ব। এই মূলতত্ত্বত্রয়ই ক্রমান্বয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। সাধারণত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তির সহিত আমরা পরিচিত। এই ত্রিমূর্তির ধারণা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। পৌরাণিক যুগেই ত্রিমূর্তির কল্পনা হইয়া থাকাই সম্ভব। কেন না, ইহার পূর্ববর্তী যুগে কোথাও এই ত্রিমূর্তির উল্লেখ বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না ; পক্ষান্তরে আমাদের শাস্ত্রে অন্য ত্রিমূর্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিমূর্তির মূল কি এবং 'তিন' এই সংখ্যাটিই বা এত পবিত্র কেন তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিবার কোনও উপায় নাই। যাস্ক ত্রিমূর্তি বলিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,মহেশ্বর বুঝায় একথা কোথাও বলেন নাই। সকল স্থানেই তিনি অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য এই তিনটিকে ত্রিমূর্তি বলিতে বুঝিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনটি পরবর্তী ত্রিমূর্তি। যাস্কের সময়ে সম্ভবত পরবর্তী ত্রিমূর্তির বিষয় জানা ছিল না। নতুবা তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সম্বন্ধে নীরব থাকিতেন না। যাস্কের গ্রন্থে তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন কতিপয় পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। তাঁহারা সকলেই সর্বসমেত তিনটি মাত্র দেবতারই অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

অগ্নিতীর্থ ও মন্দির—অগ্নির কোন তীর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। অগ্নির মন্দিরও কোথায় আছে বলিয়া জানা যায় না। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশ সর্গে অগ্নির মন্দিরের উল্লেখ আছে। অগস্ত্যাশ্রমে যখন অগস্ত্যের সহিত রামচন্দ্রের মিলন হয় তখন

তিনি আঠারটি দেবতার জন্য নির্মিত আঠারটি মন্দির দেখিয়াছিলেন। সেই আঠারটি মন্দিরের মধ্যে অগ্নির মন্দিরও ছিল।

প্রশান্তহরিণাকীর্ণমাশ্রমং ব্যবলোকয়ন্।
স তত্র ব্রাহ্মণঃ স্থানমগ্নেঃ স্থানং তথৈব চ ॥১৭
বিষ্ণোঃ স্থানং মহেন্দ্রস্য স্থানঞ্চৈব বিবস্বতঃ।
সোমস্থানং ভগস্থানং কৌবেরমেব চ ॥১৮

অগ্নিতীর্থের উল্লেখ রামটেক-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় (IA, 1908, 202)।

নারায়ণকৃত 'তন্ত্রসমুচ্চয়ে' অগ্নিমন্দিরে মূর্তিসংস্থান-সম্বন্ধে একটি উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়—

বহ্নিভূবি বজ্রহস্তঃ প্রাসাদে শক্তিপাণিশ্চ।
সদসি পুনরগ্নিকেতুর্দ্বাঃস্থৌ স্তঃ সূর্যকেতুশ্চ ॥
—৯ম পটল, ২য় শ্লোক।

তক্ষশিলার নিকটবর্তী ঝাণ্ডিবালার মন্দির সম্প্রতি মৃত্তিকা খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই মন্দিরটি পরীক্ষা করিয়া Dr Modi ও Sir John Marshall ইহাকে জোরোয়স্ত্রীয় সূর্যাগ্নি-মন্দির বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ অনুসারে প্রথম সূর্যমন্দির নির্মাণ করেন শাকদ্বীপরাজ প্রিয়ব্রতপুত্র। এইটি বিমানাকারে প্রস্তর-নির্মিত।

সম্প্রতি মোহেঞ্জোদড়োয় একটি অগ্নিমন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোহেঞ্জোদড়োর প্রথম দ্বীপের উপরে দুইটি মন্দির আছে ; একটি খ্রী° ২য় শতকের বৌদ্ধস্তূপ, আর একটি 'পবিত্র-অগ্নিমন্দির'।

বুনের (Buner) হইতে প্রাপ্ত একটি হোমকুণ্ড ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। রাজা ও রাণী আদর্শ ভারতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া অনুচরদিগের সহিত এই কুণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। কুণ্ডটি কুষাণ-মুদ্রায় প্রাপ্ত কুঞ্জ-সদৃশ। পণ্ডিত কে. এন.

সীতারাম ইহাকে সাসানীয় কুণ্ড বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন (Jour. Cama. Oriental Inst. i. pt.-ii, 83)।

শাস্ত্রে অগ্নিতত্ত্ব—বৃহদারণ্যক-উপনিষদে বাক্যকে 'অগ্নি' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। দূর্নামক দেবতা যখন বাক্য বা শব্দকে মৃত্যুর পরপারে আনয়ন করেন তখন শব্দ 'অগ্নি' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু অতিক্রান্ত হইয়াই অগ্নি দীপ্তি পাইয়া থাকে (বৃহ-উ° ১. ৩. ১২)। মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ্ আবার অগ্নি, বায়ু প্রভৃতিকে অক্ষর, অব্যয় ব্রহ্মের প্রধান প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। যাহারা অগ্নি প্রভৃতির উপাসক তাহারা পার্থিব সুখ ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু পরব্রহ্মে যাহাদের আসক্তি তাহারা পুরুষের সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হয় (মৈ-উ° ৪. ৬)।

আত্মা কি দেবলোক, কি জীবলোক সমস্তেরই সমষ্টিভূত (মনু° ১২. ১১৯)। অগ্নি এই আত্মার শব্দস্বরূপ (মনু° ১২. ১২১)। আত্মা অগ্নিরূপেও অনেক স্থানে পরিচিত (মনু° ১২. ১২৩) প্রতিনিয়ত আত্মা পঞ্চভূতের সৃষ্টি ও লয়ের কারণ।

শতপথ-ব্রাহ্মণেও অগ্নি বাক্য বা শব্দ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ (১০. ৩. ৩১) এইরূপে বর্ণনা করিয়াছে—ধীর শাতপর্ণেয় একদিন জাবাল সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'বিজ্ঞান লাভ করিয়া আপনি আমার সমীপাগত হইয়াছেন কি?' 'আমি অগ্নির বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়াই এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি।' 'কোন অগ্নির বিষয় আপনি পরিজ্ঞাত আছেন কি?' 'শব্দ' অগ্নির এই বিষয় জ্ঞান লাভ করিলে তাহার কি হইয়া থাকে?' 'শব্দজ্ঞান তাহার সম্যক্ লাভ হয়।'

এইরূপে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করায় তিনি অগ্নিকে চক্ষু বলিয়া উল্লেখ করেন এবং বলেন, অগ্নির এই স্বরূপ অবগত হইয়া মানব সর্ব-দ্রষ্টা হইয়া থাকে; পরে অগ্নির অন্য স্বরূপ মন বলিয়া তিনি বর্ণনা করেন—ইহার সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ মননশীল হয়।

তাঁহার মতে অগ্নি শ্রোত্র বলিয়া কথিত হন—এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া মানব সমস্ত শব্দ শ্রবণ করিতে সমর্থ হয়। পরিশেষে সর্ববস্তুর সার বলিয়া অগ্নি অভিহিত হইয়াছে।

শব্দ-প্রকাশক অগ্নি নিদ্রাবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসে (বায়ুতে) পরিণত হয়; তখন চক্ষু, মন, কর্ণ প্রভৃতিরও পৃথক্ অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না। জাগ্রদাবস্থায় তাহারা বিভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অগ্নি নির্বাপিত হইয়া বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে এবং এই বায়ু হইতেই আবার তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে সমাগত হয়, যিনি অগ্নির এই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের (পরিবর্তনের) বিষয় সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনি অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে শব্দে, চক্ষুর সাহায্যে সূর্যে, মনের সাহায্যে চন্দ্রে, কর্ণের (শ্রোত্রের) দ্বারা দিঙ্মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হন এবং তিনি কোনও দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া সাম্যাবস্থায় অবস্থান করেন।

প্রসঙ্গক্রমে জীবের উক্ত প্রকার মূর্তিরও উল্লেখ করা হইয়াছে। মৃত্যুর পরে জ্ঞানী ব্যক্তি প্রকৃতির ঐ সমস্ত বিভিন্ন প্রকাশে উপনীত হন। মুক্তাবস্থায় জীব তাহার উপাদান-কারণের যে কোন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন (শ-ব্রা° ১০. ৩. ৩. ৬-৮)।

শতপথ-ব্রাহ্মণে অগ্নিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। শব্দই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং এই শব্দ অগ্নিসম্ভূত (৯. ৩. ১. ৪)।

শাত্যায়নি বলেন—অগ্নিই বৎসর, অগ্নির মস্তকই বসন্তকাল, দক্ষিণ পক্ষ গ্রীষ্ম, বাম পক্ষ বর্ষা, মধ্যভাগ শরৎ, পুচ্ছ শীত এবং পদ হেমন্ত। এই অগ্নিই বায়ু, সূর্য (চক্ষু), চন্দ্র (মন), দিক্ (কর্ণ), উৎপাদিকাশক্তি (জল), পদ মুখ, অর্ধচন্দ্র দিন, রাত্রি এবং এই প্রকারে ঈশ্বরস্থানীয় এই অগ্নিই দৃশ্যমান বস্তুর স্বরূপ (শ-ব্রা° ১০. ৪. ৫. ২)।

অগ্নির এই প্রকৃতি যেন পঞ্চ ভূতের ভিতর নিহিত সূক্ষ্ম শক্তি-সমষ্টি। বিশ্বপ্রকৃতি যেন কারণরূপে অগ্নির ভিতরে অবস্থান

করেন। বিশ্বজগৎ কার্যরূপে যেন অগ্নিরই বহিঃপ্রকাশ, ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের কোথাও অগ্নির এতটা প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই।

জলদ্বারাই অগ্নি পরিতৃপ্ত হন, উক্ত কারণেই যজ্ঞাগ্নিকে জলদ্বারা শান্ত করিবার ব্যবস্থা। যাজ্ঞিক চতুর্দিকে জল নিক্ষেপ করিবেন এবং তদনুসারে চতুর্দিক্ প্রশমিত হইবে; অগ্নির স্বরূপ ত্রিধা বিভক্ত; সুতরাং যাজ্ঞিককে তিনবার জল প্রক্ষেপ করিতে হইবে এবং তবেই অমিততেজা অগ্নি শান্ত হন। চতুর্দিকে জল প্রক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই ভূমণ্ডলের চতুর্দিকে সমুদ্র বিদ্যমান।

বাম হইতে দক্ষিণে জল প্রক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই সমুদ্র বাম হইতে দক্ষিণে প্রবহমান। অগ্নীধ প্রস্তর হইতে জল প্রক্ষেপ করেন বলিয়াই পর্বতগাত্র হইতে জলরাশি উদ্গত হইয়া থাকে (শ-ব্রা° ৯. ১. ২. ২-৪)। উপরি উক্ত বিবরণে বাস্তব ব্যাখ্যার সহিত দার্শনিক মতবাদের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

অগ্নি ঊর্ধ্বে (ঊর্ধ্বলোকে) এবং অধোলোকে (জগতে) এই উভয় স্থানে অবস্থান করেন।

অগ্নি শব্দরূপে পরিণত হইয়া মুখে প্রবেশ করেন, (বেদান্ত-সূত্র ২. ১. ৬) অর্থাৎ যাহার শব্দস্বরূপে অবস্থান, মুখবিবর হইতে জিহ্বার সাহায্যে তাহা বাক্যরূপে প্রকাশিত হয়। বেদান্তসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত প্রাণাদি অগ্নি এবং অন্যান্য দেবতাগণের সাহায্যেই পরিচালিত হয় (২. ১. ৫)। অগ্নিই পৃথিবী (মুণ্ড-উ° ২. ১. ৪)।

এই সৃষ্টিরহস্য অগ্নির সাহায্যেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে এই অগ্নিকেই সৃষ্টির প্রধান সহায়ক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—জীবন-ধারণের সর্বাপেক্ষা প্রযোজক বলিয়াই যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে শাস্ত্র অগ্নির জন্য বিশিষ্ট স্থান নির্বাচন করিয়াছেন, জগৎ-সৃষ্টির উল্লেখ-প্রসঙ্গে শতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন—(পিতা)

প্রজাপতি পিতা হইয়াও অগ্নির পুত্র; কারণ অগ্নিকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন বটে কিন্তু রক্ষা করেন বলিয়া আবার তিনি প্রজাপতিরও জনক। বাক্যের সাহায্যে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেন (শ-ব্রা° ৬. ১. ২. ২৬-২৮); কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে অগ্নিই বাক্য বা শব্দ। অগ্নি কাহার সাহায্যে সৃষ্টি করিলেন শতপথ-ব্রাহ্মণের উক্ত প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে।

মুক্তি-প্রসঙ্গেও অগ্নির অধিকার বর্ণনা করা হইয়াছে। যজ্ঞে অগ্নিবেদী কেন নির্মিত হয় তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, পক্ষীর আকার ধারণ করিলে অগ্নি আমাদিগকে আকাশ-মার্গে পরিচালিত করিবেন (শ-ব্রা° ৬. ১. ২. ৩৬)। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পৌরাণিক দার্শনিকগণ বিশেষ বিবেচনার সহিত অগ্নির প্রাধান্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সৃষ্টি-কার্য অগ্নির সাহায্যেই পরিচালিত হয়; স্থিতিকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অগ্নিই পোষক; মৃত্যুর পরেও মুক্তি-সহায়ক হিসাবে অগ্নিরই স্থান সর্বোপরি।

অগ্নি দূতরূপে মাতরিশ্বা নামে পরিচিত (ঋ° ৩. ১৯. ১১)। ঋগ্বেদে কিন্তু মাতরিশ্বা হইতে পৃথগ্‌ভাবেও অগ্নির উল্লেখ আছে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (২. ১৫) অশ্বি, উষা এবং অগ্নিকে প্রাতঃকালের দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রজাপতির তপস্যায় অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা এবং উষা আবির্ভূত হন। কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে ইহার উল্লেখ আছে।

ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নির উদ্‌গমনের উল্লেখ ঋগ্বেদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। ভৃগু ব্যোম (আকাশ) হইতে অগ্নিকে আনয়ন করিলেন। অন্যত্র দেখা যায়, তিনি ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া মনুষ্যা-বাসে তাহাকে স্থাপন করিলেন।

ইন্দ্রের সহায়করূপে অগ্নি কাজ করেন। স্বর্গ এবং মর্ত্যের ভিতর সংবাদাদির আদান-প্রদান করিয়া তিনি উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন।

বেদান্তসূত্র অগ্নিকে বাক্যের অধিষ্ঠাতৃরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য তাহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার প্রয়োজন। কারণ, ইন্দ্রিয়-সমুদয় তাহাদেরই প্রয়োজনীয় কার্যাভিমুখী বৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। এজন্য বেদান্ত-সূত্র এখানে অগ্নিকে অধিষ্ঠাতৃদেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।—বেদান্তসূত্র ২. ১. ৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিদগ্ধ শাকল্যের কথোপকথন-প্রসঙ্গে অগ্নির বাসস্থান-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে—

শাকল্য—দীক্ষা বা মন্ত্রের অধিষ্ঠান কোথায় ?

যাজ্ঞ—সত্যের মধ্যে মন্ত্রের অধিষ্ঠান।

শাকল্য—সত্যের সন্ধান কোথায় মিলিবে ?

যাজ্ঞ—অনুসন্ধান করিলে সত্যকে তোমার হৃদয়ের ভিতরই সন্ধান পাইবে ; কারণ মাত্র হৃদয়ের (অন্তঃকরণের) সাহায্যেই সত্য অবগত হওয়া যায়।

শাকল্য—অধিষ্ঠাতা কে ?

যাজ্ঞ—অগ্নি, অগ্নির মধ্যেই সমস্ত অধিষ্ঠিত।

শাকল্য—অগ্নি কোথায় অবস্থান করে ?

যাজ্ঞ—বাক্যই অগ্নির অধিস্থান (৩. ৯. ২৩-২৩)।

প্রশ্নোপনিষদে অগ্নিকে প্রাণ বলিয়াও ঘোষণা করা হইয়াছে (১১. ৫)। অথর্ববেদে অগ্নিকে জীবনীশক্তি বৃদ্ধির মূলীভূত কারণরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বহু মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একমাত্র অগ্নিকে আবাহন করা হইয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা অগ্নি জীবজগৎকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন।—অ° ২. ২৮।

বেদান্তদর্শনে যাগযজ্ঞের ফলও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং উক্ত ফল-লাভ ব্রহ্মের সাহায্য ব্যতীত অসম্ভব ; উক্ত প্রসঙ্গে যজ্ঞের বিষয়ীভূত অগ্নির অধিষ্ঠাতৃরূপে ব্রহ্মকেই প্রতিপন্ন করা হয়। যাজ্ঞিক ব্রহ্মের সাহায্যেই যজ্ঞফল ভোগ করিয়া থাকে (১. ১. ১১)।

ব্রহ্মোপাসনার ফল অক্ষয় এবং অনন্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নি ব্রহ্মেরই প্রকাশ; অগ্নি, রুদ্র, ব্রহ্মা—ইহারা ব্রহ্মেরই প্রকাশ; ইহাদের উপাসনাদ্বারা দেহমাত্র ঐহিক সুখের অধিকারী হইয়া থাকে (মৈত্রায়ণ-ব্রা-উ° ৪. ৫. ৭)। সত্যকামের নিকট অগ্নিকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কঠোপনিষদে অগ্নি আত্মা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

পুরোহিতের নিকট অগ্নির স্থান ঠিক ইন্দ্রেরই নিম্নে। ঋগ্বেদে মাত্র অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়াই ন্যূনকল্পে দুই শত সূক্ত রচিত হইয়াছে। মাত্র কল্পনার বলেই অগ্নির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাঁহার বিভূতির ভিতরই তাঁহার উপাসককে সুখসম্পদ দান করিয়া থাকেন, জগতের মঙ্গলের অধিকাংশ তাঁহার হস্তেই নিহিত। জীবজগতের শুভাশুভের নিয়ামক বলিয়াই অগ্নি অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা জগতের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

হস্তাপদাদিশূন্য অগ্নিগর্ভ বলিয়াই অগ্নির বর্ণনা করা হয়। অন্যত্র ইহার ভিন্ন বর্ণনাও দেখা যায়।

দেবতাগণ অগ্নির সাহায্যেই যজ্ঞভাগ ভক্ষণ করিয়া থাকেন; সেই জন্য পুরোহিত যজ্ঞে অগ্নিকে বিশেষভাবে আবাহন করেন।

দৌত্যকার্যে অথবা যজ্ঞে দেবতাদের পথ-প্রদর্শক-(নায়ক-) রূপে অগ্নির গমনাগমনের অতি সুন্দর বর্ণনা আছে। অন্ধকারময় পথ আলোকিত করিয়া বিদ্যুদ্দীপ্তিতে অরণ্যানীর ভিতর দিয়া তিনি ঘোটকচালিত যানে ধাবিত হন। উক্ত শকটে দেবতাগণ তাঁহার সহিত মর্ত্যভূমিতে আগমন করেন।

অগ্নিতত্ত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি—অগ্নি ঋগ্বেদের এক প্রধান দেবতা। ইনি অমর এবং ইনি মানুষের অতিথিরূপে মানুষের সহিত বাস করিতেছেন। বেদে অগ্নিকে হোতা, ঋত্বিক্ ও পুরোহিত বলা হইয়াছে। যজ্ঞে ইনি দেবতা ও মনুষ্য-দ্বারা নিযুক্ত হন। অগ্নি জ্ঞানী, সকল প্রকার যজ্ঞের বিষয় তিনি অবগত আছেন। ইনি

কর্মকুশল ও সকল যজ্ঞের রক্ষক। অগ্নি দেবপুরোহিত। দেবগণ ও মনুষ্যগণ ইহাকে দূতরূপে নিযুক্ত করেন ; মনুষ্যেরা দেবগণের উদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণ করিলে সেই মন্ত্রের বার্তা ইনি দেবগণের নিকট নিবেদন করেন এবং মনুষ্যেরা দেবতাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলে অগ্নি যজ্ঞ-হবি দেবতাগণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান। আকাশের সকল স্থানের সহিত ইহার বিশেষ পরিচয় আছে, সেই জন্য যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করিবার পক্ষে অগ্নির উপযোগিতা। অগ্নি কখনও কখনও আহূত দেবগণের সহিত এক রথেই আরোহণ করিয়া আসেন, আবার কখনও কখনও তাঁহাদের পূর্বেই যজ্ঞস্থলে ফিরিয়া আসেন।

অগ্নি বরুণকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করেন, ইন্দ্রকে আকাশ হইতে এবং মরুদ্‌গণকে বায়ুমণ্ডল হইতে আনয়ন করেন। অগ্নি ব্যতীত দেবতাদিগের তৃপ্তি হয় না। অগ্নি দেব ও মনুষ্যগণের মুখ ও জিহ্বাস্বরূপ। অগ্নি না থাকিলে মনুষ্য ও দেবগণ যজ্ঞের আস্বাদ পাইতেন না।*

ধর্ম, অর্ক শুক্র, জ্যোতিঃ ও সূর্য—অগ্নির নাম। (শ-ব্রা° ৯. ৪. ২. ২৫)। অগ্নির অষ্টরূপ—রুদ্র, সর্ব=শর্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদ্দেব, ঈশান। (শ-ব্রা° ৬. ১. ৩. ১৮)। অগ্নির দ্বিবিধ নাম—ইতর ও শান্ত। প্রাচ্যগণ অগ্নিকে বলেন—শর্ব ; বাহীকগণ বলেন—ভব, পশুপতি ও রুদ্র। এগুলি তাঁহার ইতর নাম। অগ্নির শান্ততম নাম—অগ্নি।

'যৌ বৈ রুদ্রঃ সোঽগ্নি' (শ-ব্রা° ৫. ২. ৪. ১৩)। যিনি রুদ্র

---

* এইরূপ নানা ভঙ্গীতে অগ্নির গুণাবলীর বর্ণনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গুণবর্ণনা দ্বারাই একখানি গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। A. Macdonell তাঁহার Vedic Mythology নামক গ্রন্থে ও JRAS (n. s.) ১ম খণ্ডে এবং Muir তাঁহার Oriental Sanskrit Textsএর ৫ম খণ্ডে অগ্নির গুণাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

তিনিই অগ্নি। 'অগ্নির্বাঽঅর্কঃ' (শ-ব্রা° ২. ৫. ১. ৪ ; ১০. ৬. ২. ৫)। অগ্নিই অর্ক। অগ্নিই অরুষ।[১] পশুযজ্ঞে অগ্নি।[২] সমস্ত পশুই অগ্নি।[৩] অগ্নিই দেবতাগণের পশু।[৪]

অগ্নি—দেবতাদিগের অবম, বিষ্ণু পরম।[৫] অগ্নি দেবতাদিগের অবরার্ধ্য,[৬] দেবতাদিগের বশিষ্ঠ,[৭] যজ্ঞের শিরঃ,[৮] যজ্ঞের যোনি,[৯] যজ্ঞমুখ,[১০] সর্বদেবতা,[১১] সকল দেবতার আত্মা[১২] আত্মাই অগ্নি।[১৩]

---

১ অগ্নির্বা অরুষঃ।—তৈ-ব্রা° ৩. ৯. ৪. ১।

২ অগ্নির্বৈ পশূনামীষ্টে।—শ-ব্রা° ৪. ৩. ৪. ১১।

৩ এতেসর্বে পশবো যদগ্নিঃ। অগ্নিহ্যেষ যৎপশবঃ।—শ-ব্রা° ৬. ২. ১. ১২। পশুরেব যদগ্নি।—শ-ব্রা° ৬. ৪. ১. ২ ; ৭, ১. ৪. ৩০ ; ৭. ৩.২. ১৭।

৪ অগ্নির্হি দেবানাং পশুঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ১৫। তে দেবা অব্রুবন্ পশুর্বাঽঅগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৩. ১. ২২।

৫ অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ১।

৬ অগ্নির্বৈ যজ্ঞস্যাবরার্ধ্যো বিষ্ণুঃ পরার্ধ্যঃ।—শ-ব্রা° ৩. ১, ৩. ১. ; ৫. ২. ৩. ৬। অগ্নির্বৈ দেবানামবরার্ধ্যো বিষ্ণুঃ পরার্ধ্যঃ।—কৌ-ব্রা° ৭. ১।

৭ অগ্নির্বৈ দেবানাং বশিষ্ঠঃ।—ঐ-ব্রা° ১.২৮।

৮ শির এবাগ্নি।—শ-ব্রা° ১০. ১. ২. ৫। শির এতদ্‌যজ্ঞস্য যদগ্নিঃ। —শ-ব্রা° ৯. ২. ৩. ৩১।

৯ অগ্নির্বৈ যোনি যজ্ঞস্য।—শ-ব্রা° ১. ৫. ২. ১১, ২৪ ; ৩. ১. ৩. ২৮ ; ১১. ১. ২. ২।

১০ অগ্নির্বৈ যজ্ঞস্য মুখম্।—তৈ-ব্রা° ১. ৬. ১. ৮।

১১ অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ।—ঐ-ব্রা° ২. ৩ ; তৈ-ব্রা° ১. ৪. ৪. ১০। অগ্নির্বৈ সর্বা দেবতাঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ১ ; শ-ব্রা° ১. ৬. ২. ৮ ; ৩. ১. ৩, ১ ; তা-ব্রা° ৯. ৪. ৫ ; ১৮. ১. ৮ ; ষ° ৩. ৭ ; গো-উ° ১. ১২. ১৬। সর্ব-দেবত্যোঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ১. ২. ২৮। অগ্নের্বা এতাঃ সর্বাস্তন্বো যদেতা (বায়্বাদয়ঃ) দেবতাঃ।—°ঐ-ব্রা° ৩. ৪।

১২ অগ্নির্বৈ সর্বেষাং দেবানামাত্মা।—শ-ব্রা° ১৪. ৩. ২. ৫। সর্বোষামু হৈষ দেবানামাত্মা যদগ্নি।—শ-ব্রা° ৭. ৪. ১. ২৫ ; ৯. ৫. ১. ৭।

১৩ আত্মৈবাগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৭. ১. ২০ ; ১০. ১. ২. ৪। আত্মা বাঽঅগ্নি।—শব্রা° ৭. ৩. ১. ২।

অগ্নি প্রথম সৃষ্টি।[১] দেবগণ অগ্নিমুখ।[২] সমস্তই অগ্নির অন্ন[৩]। অগ্নি সর্বতোমুখ।[৪] তিনি অন্নপতি,[৫] বাজপতি,[৬] অন্নের শময়িতা।[৭] তিনি দেবযোনি,[৮] সুহৃদয়তম,[৯] মৃড়হৃদয়তম,[১০] অন্নাদ।[১১] অগ্নিতে দেবতারা আহার করেন।[১২] অগ্নি—জঠর,[১৩] বিরক্ষমস্তম,[১৪] ব্রতপতি,[১৫] যষ্টা,[১৬] হোতা,[১৭] দূত,[১৮] নেদিষ্ট,[১৯]

---

১ প্রজাপতির্দেবতাঃ সৃজমানঃ। অগ্নিমেব দেবতানাং প্রথমমসৃজত। —তৈ-ব্রা° ২. ১. ৬. ৪। সঃ (প্রজাপতিঃ) অগ্নিমব্রবীত্ত্বং বৈ মে জ্যেষ্ঠঃ পুত্রাণামসি। ত্বৎপ্রথমো বৃণীষ্বেতি। সঃ (অগ্নিঃ) অব্রবীন্মদ্রং সাম্নো বৃণেঽন্নাদ্যামিতি।—জৈ-উ° ১. ৫১. ৫-৬।

২ অগ্নিমুখা বৈ দেবতাঃ।—তা-ব্রা° ২৫. ১৪. ৪; অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখম্।—কৌ-ব্রা° ৩. ৬. ৫. ৫; তা-ব্রা°ঃ ৬. ১. ৬; গো-উ° ১. ১৩।

৩ তস্মাদ্দেবা অগ্নিমুখা অন্নমদন্তি।—শ-ব্রা° ৭. ১. ২. ৪।

৪ সর্বতো মুখোঽয়মগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ২. ৬. ৩. ১৫।

৫ অগ্নিরন্নাদোঽন্নপতিঃ।—তৈ-ব্রা° ২. ৫. ৭. ৩। অন্নাদো বা এষোঽন্নপতির্যদগ্নিঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ৮।

৬ এষ (অগ্নিঃ) হি বাজানাং পতিঃ।—ঐ-ব্রা° ২. ৫।

৭ অগ্নির্বা অন্নানাং শময়িতা।—কৌ-ব্রা° ৬. ১৪।

৮ অগ্নির্বৈ দেবযোনিঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ২২. ২. ৩।

৯ অগ্নির্বৈ দেবনাং মুখং সুহৃদয়তমঃ।—ঐ-ব্রা° ৭. ১৬।

১০ অগ্নির্বৈ দেবানাং মৃড়হৃদয়তমঃ।—শ-ব্রা° ১. ৬. ২. ১০।

১১ অগ্নির্বৈ দেবানামন্নাদঃ।—তৈ-ব্রা° ৩. ১. ৪. ১। স যো হৈবমেতমগ্নিমন্নাদং বেদান্নাদো হৈব ভবতি।—শ-ব্রা° ২. ২. ৪. ১।

১২ তস্মাদ্দেবা অগ্নিমুখা অন্নমদন্তি।—শ-ব্রা° ৭. ১. ২. ৪। অগ্নৌ হি সর্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহ্বতি।—শ-ব্রা° ১. ৬. ২. ৮।

১৩ অগ্নির্দেবানাং জঠরম্।—তৈ-ব্রা° ২. ৭. ১২. ৩।

১৪ তে (দেবাঃ) হরিহুঃ। অয়ং (অগ্নিঃ) বৈ নো বিরক্ষস্তমঃ। —শ-ব্রা° ৩. ৪. ৩. ৮।

১৫ অগ্নির্বৈ দেবানাং ব্রতপতিঃ।—শ-ব্রা° ১. ১. ১. ২; ৩. ২. ২. ২২।

১৬ অগ্নির্বৈ দেবানাং যষ্টা।—শ-ব্রা° ৩. ৩. ৭. ৬।

১৭ অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতা।—ঐ-ব্রা° ১. ২৮. ৩. ১৪।

১৮ স (অগ্নি) হি দেবানাং দূত আসীৎ।—শ-ব্রা° ৩. ৫. ১. ২১। অগ্নিরের দেবানাং দূত আস।—শ-ব্রা° ৩. ৫. ১. ২১।

১৯ অগ্নির্বৈ দেবনাং নেদিষ্টম্।—শ-ব্রা° ১. ৬. ২. ১১।

ও গোপা।[1] অগ্নির সহিত সকল ব্যাপারেরই সম্বন্ধ; ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। অগ্নি প্রজা প্রজনন করেন,[2] তিনি মিথুনের কর্তা,[3] প্রজনয়িতা,[4] রেতোধা।[5] আবার অগ্নি = প্রজনন।[6] পৃথিবী = অগ্নি।[7] সংবৎসর = অগ্নি।[8] তেজ = অগ্নি।[9] জ্যোতি = অগ্নি।[10] তপ = অগ্নি।[11] পুরুষ = অগ্নি[12]। যোষা = অগ্নি[13]। যোষা, অপ্ = বৃষাগ্নি[14]। অগ্নি —প্রাণ, মন।[15] গায়ত্রছন্দ, বীর্য—অগ্নিদ্যোতক।[16] অগ্নি =

১ অগ্নির্বৈ দেবানাং গোপাঃ।—ঐ-ব্রা° ১. ২৮।

২ অগ্নিঃ প্রজানাং প্রজনয়িতা।—তৈ-ব্রা° ১. ৭. ২. ৩।

৩ অগ্নির্বৈ মিথুনস্য কর্তা প্রজনয়িতা—শ-ব্রা° ৩. ৪. ৩. ৪।

৪ অগ্নিঃ প্রজানাং প্রজনয়িতা।—তৈ ব্রা° ১. ৭. ২. ৩।

৫ অগ্নির্বৈ রেতোধা।—তৈ ব্রা° ২. ১. ২. ১১; ৩. ৭. ৩. ৭.।

৬ প্রজননং বা অগ্নি।—তৈ-ব্রা° ১. ৩. ১. ৪।

৭ ইয়ং (পৃথিবী) হ্যগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ১. ১. ১৪; ৬. ১. ১. ২। ইয়ং পৃথিবী বাঽঅগ্নি।—শ-ব্রা° ৭. ৩. ১. ২২।

৮ সংবৎসর এষোঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৭. ১. ১৮। সংবৎসরোঽগ্নি। —শ-ব্রা° ৬. ৩. ১. ২৫। সংবৎসর এবাগ্নি।—শ-ব্রা° ১০. ৪. ৫. ২।

৯ তেজো বাঽঅগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ২. ৫. ৪. ৮; ৩. ৯. ১. ১৯; তৈ-ব্রা° ৩. ৯. ৫. ২।

১০ অগ্নির্বৈ জ্যোতি রক্ষোহা।—শ-ব্রা° ৭. ৪. ১. ৩৪।

১১ তপো বাঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৩. ৪. ৩. ২।

১২ পুরুষোঽগ্নি।—শ-ব্রা° ১০. ৪. ১. ৬। পুরুষো বাঽঅগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ২৪. ৯. ১. ১৫।

১৩ যোষা বাঽঅগ্নি।—শ-ব্রা° ১৪. ৯. ১. ১৬।

১৪ যোষা বাঽআপো বৃষাগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ১. ১. ১. ১৮।

১৫ প্রাণো বা অগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৯. ৫. ১. ৬৮। মন এবাগ্নিঃ।— শ-ব্রা° ১০. ১. ২. ৩।

১৬ গায়ত্রছন্দা হ্যগ্নিঃ—তা-ব্রা° ৭. ৮. ৪। বীর্যং বা অগ্নিঃ।—তৈ-ব্রা° ১. ৭. ২. ২; গো-উ° ৬. ৭।

গায়ত্রী।[১] অগ্নি=ব্রহ্ম,[২] ক্ষত্র[৩] পর্জন্য,[৪] সোম,[৫] অহঃ[৬] দিক্,[৭] আয়ু।[৮] আবার অগ্নি=মৃত্যু।[৯] অগ্নি=স্বর্গলোকের অধিপতি,[১০] ভূতগণের ও জনগণের অতিথি।[১১] তিনি অর্বা, ত্রিবৃৎ।[১২] দ্যৌ অগ্নির পরম জন্ম।[১৩] অগ্নি অশ্বমেধের যোনি,[১৪] আয়তন।[১৫] ওষধিগণ অগ্নির তনু।[১৬] তিনি একদিকে পৃথিবীপতি[১৭]

---

১ অগ্নির্বৈ গায়ত্রী।—শ-ব্রা° ১০. ৪. ১, ৩.১৯। যো বা অত্রাগ্নির্গায়ত্রী স নিদানেন।—শ-ব্রা° ১. ৮. ২. ১৫।

২ অগ্নিরেব ব্রহ্ম।—শ-ব্রা° ১০. ৪. ১, ৫। ব্রহ্ম বা অগ্নি।—কৌ-ব্রা° ৯, ১, ৫; ১২, ৮.; শ ব্রা° ২, ৫, ৪৮; ৫.৩. ৫. ৩২ তৈ-ব্রা° ৩. ৯. ১৬. ৩। ব্রহ্মাগ্নি।—শ-ব্রা° ১. ৩. ৩. ১৯।

৩ অয়ং বাঽঅগ্নিব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ।—শ-ব্রা° ৬. ৬. ৩. ১৫। ব্রহ্ম বা অগ্নিঃ ক্ষত্রংসোম।—কৌ-ব্রা° ৯. ৫।

৪ পর্জন্যো বাঽঅগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ১৪. ৯. ১. ৬৩।

৫ ৫১ সংখ্যা দ্র°।

৬ অগ্নির্বাঽঅহঃ।—শ-ব্রা° ৩. ৪. ৪. ১৫।

৭ দিশোঽগ্নি।—শ-ব্রা° ৬. ২. ২. ৩৪।

৮ আয়ুর্বাঽগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৭. ৩. ৭। অগ্নির্বায়ুআয়ুষ্মানাঽষ ইষ্টে।—শ-ব্রা° ১৩. ৮, ৪. ৮।

৯ অথ যোঽগ্নির্মৃত্যুঃসঃ।—জৈ-উ° ১. ২৫. ৮। সো (অগ্নিঃ=মৃত্যুঃ) ঽপাপমম্ম্।—শ-ব্রা° ১৪. ৬. ২. ১০।

১০ অগ্নির্বৈ স্বর্গস্য লোকস্যাধিপতিঃ।—ঐ-ব্রা° ৩. ৪২।

১১ অগ্নিমতিথিং জনানাম্।—তৈ-ব্রা° ২. ৪. ৩. ৬। সর্বেষাং বা এষ (অগ্নিঃ) ভূতানামতিথিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৭. ৩. ১১।

১২ ত্রিবৃদগ্নিঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৩. ১. ২৫। ত্রিবৃদ্বা অগ্নিরঙ্গারা অর্চিধূম ইতি।—কৌ-ব্রা° ২৮. ৫।

১৩ দৌর্বা অস্য (অগ্নেঃ) পরমং জন্ম।—শ-ব্রা° ৯. ২. ৩. ৩৯।

১৪ ৬৩ অগ্নির্বা অশ্বমেধস্য যোনিরায়তনম্।—তৈ-ব্রা° ৩. ৯. ২১. ২, ৩।

১৫ অগ্নের্বা এষা তনূঃ। যদোষধয়ঃ।—তৈ-ব্রা° ৩. ২. ৫. ৭।

১৬ অগ্নে পৃথিবীপতে;—তৈ-ব্রা° ২. ১১. ৪. ১।

আবার অপরদিকে অন্তরীক্ষের প্রতিষ্ঠা।[১] আখুরূপে তিনি পৃথিবীতে প্রবেশ করেন,[২] অশ্বরূপে পৃথিবীতে প্রবেশ করেন।[৩] আবার রোহিত অগ্নির অশ্ব।[৪] আহুতিগণ অগ্নির প্রিয় ধাম।[৫]

অগ্নির বর্ণনার শেষ নাই। অগ্নি যজ্ঞের হোতা, আবার পঞ্চহোতাদিগের মধ্যে অগ্নিহোতা।[৬] তিনি যজ্ঞের প্রাতঃসবন,[৭] তিনি পঞ্চচিতিক,[৮] তিনি সপ্তচিতিক।[৯] এইরূপে দেখা যায়, অগ্নি—সর্বকাম।[১০]

অগ্নি বৃক্ষে অবস্থান করেন, পৃথিবীর নাভিদেশে ইহার অবস্থিতি। জল হইতে অগ্নি উত্থিত হন। অথর্ববেদে জলে অবস্থিত অগ্নি জ্যোতিষ্ক পদার্থে সংস্থাপিত অগ্নি অপেক্ষা পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। বায়ুর সহিত অগ্নির যোগাযোগও সর্ববাদিসম্মত।

স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় বিদ্যুৎ হইতে[১১] অগ্নি উৎপন্ন হইয়া জলগর্ভে প্রবিষ্ট হন, তৎপরে জীব-জগতের হিতার্থে

---

১ অগ্নিরসি পৃথিব্যাং শ্রিতঃ। অন্তরীক্ষস্য প্রতিষ্ঠা।—তৈ-ব্রা° ৩. ১১. ১. ৭।

২ আখুরূপং কৃত্বা স পৃথিবীং প্রাবিশৎ।—তৈ-ব্রা° ১. ১. ৩. ৩।

৩ অশ্বো রূপাং কৃত্বা সোঽশ্বত্থে সংবৎসরমতিষ্ঠৎ।—তৈ-ব্রা° ১. ১. ৩. ৯।

৪ রহিতো হাগ্নেরশ্বঃ।—শ-ব্রা° ৬. ৬. ৩. ৪।

৫ আহুতয়ো বাঽঅস্য (অগ্নেঃ) প্রিয়ং ধাম।—শ-ব্রা° ২. ৩. ৪. ২৪।

৬ তস্য (যজ্ঞস্য) অগ্নির্হোতাঽসীৎ।—গো-পূ° ১. ১৩। অগ্নির্হোতা পঞ্চহোতৃণাম্।—তৈ-ব্রা° ১. ১২. ৫. ২।

৭ অগ্নের্বৈ প্রাতঃসবনম্।—কৌ-ব্রা° ১২. ৩; ১৪. ৫; ২৮. ৫।

৮ পঞ্চচিতিকোঽগ্নি।—শ-ব্রা° ৬. ৩. ১. ২৫; ৮. ৬. ৩. ১২।

৯ সপ্তচিতিকোঽগ্নি।—শ-ব্রা° ৬. ৬. ১. ১৪; ৯. ১. ১. ২৬।

১০ অগ্নিরু সর্বে কামঃ।—শ-ব্রা° ১০. ২. ৪. ১।

১১ ইহা অগ্নির স্বর্গীয় অবস্থান এবং পূর্বোল্লিখিত মাতরিশ্বা।

নানাভাবে কার্য করিয়া থাকেন। জলের সহিত বৃক্ষলতাগুল্মের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া অগ্নিকে বৃক্ষস্থায়ী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অগ্নি ধূম্রাকারে উত্থিত হইয়া মেঘে পরিণত হয়। এই জন্যই বেদে মেঘাগ্নির বহু উল্লেখ দেখা যায়। এই মেঘই পুনরায় জলে পরিণত হয়। এই চক্রাকারই অগ্নির গতি, সুতরাং ইহার বিভিন্ন অবস্থিতির অংশমাত্র অবলম্বন করিয়াই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশেষত অগ্নির অনন্ত যৌবনের বর্ণনাও বোধ হয় চক্রাকারে নিয়ত অবস্থানেরই উল্লেখমাত্র।

প্রতি বৎসরান্তে অগ্নির তেজ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; তখন অগ্নিষ্টোম-যাগদ্বারা তাহাকে পুনর্জীবিত করার ব্যবস্থা আছে। যাগযজ্ঞাদিতে অগ্নির তিন অবস্থার উল্লেখ দেখা যায়—তিনটি বিভিন্ন বেদীতে ইহারা অবস্থান করেন। এই তিন ভিন্নাবস্থা যথাক্রমে গার্হপত্য আহবনীয় এবং দক্ষিণ বলিয়া অভিহিত হন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে অগ্নি—পালি ভাষায় অগ্নিকে 'অগ্‌গি বলা হয়। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে 'অগ্‌গি শব্দ আছে। কিন্তু টীকাকারগণ তাহার অর্থ অগ্নিদেব বলিয়া মনে করেন না। কয়েক স্থানের অর্থ যে অগ্নিদেব সে বিষয়ে কোনই ভুল নাই। জাতকটীকায় অগ্নিদেব বুঝাইতে 'অগ্‌গি-ভগবা' বলা হইয়াছে (জাতক, ১ম খণ্ড, ২৮৫, ৪৯৪; ২য় খণ্ড ৪৪)। জাতকের এই দুই স্থানের টীকায় দেখা যায় যে গৃহে শিশু প্রসূত হইলে সেই দিন হইতে তাহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা হইত।

বিনয়পিটকে (১. ৩১) পাওয়া জটিলগণ অগ্নিপরিচর্যা করিত। 'জটিলা অগ্‌গী পরিচরিতুকামা'। অঙ্গুত্তরনিকায়ে (৫. ২৬৩, ২৬৬) ও থেরীগাথায় (২. ১৪৩) 'অগ্‌গীহুত্তং পরিচরতি' ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিহোত্রের কথা পাওয়া যায়। সংযুক্তনিকায়েও (১. ১৬৬) এইরূপ উক্তি আছে। অঙ্গুত্তর (৫. ২৩৬) অগ্নিপূজার উল্লেখও করিয়াছে—'অগ্‌গীং নমতি সন্তপ্পেতি'। অঙ্গুত্তর ও সংযুক্তনিকায়ে

অগ্নিত্রয়কে উপলক্ষ্য করিয়া 'তি' শব্দের উল্লেখ আছে (সংযুক্ত° ৪. ১৯ ; অঙ্গুত্তর° ৪. ৪১)। সপ্তাগ্নি-অবশিষ্ট চতুরাগ্নিরও উল্লেখ আছে ; যথা—আহুনেয্য, গহপত, দক্খিণেয্য ও কট্ঠ।

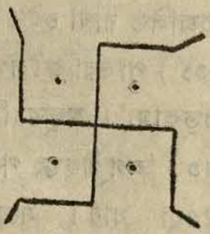
জৈনশাস্ত্রে অগ্নি—জৈনদিগের বড় বড় মন্দিরের চারিদিকে দিক্‌পালের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় (IA, 1903, × × ×ii. 464) জ্ঞানার্ণব খ্রী° ১১শ শতকের একখানি প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীশুভচন্দ্র। এই গ্রন্থের অষ্টবিংশ প্রকরণে বহ্নিমণ্ডলের বিবরণ আছে।

যঃ প্রাণায়ামমধ্যাস্তে স মণ্ডলচতুষ্টয়ম্।
নিশ্চিনোতু যতঃ সাধ্বী ধ্যানসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥১৫
তত্রাদৌ পার্থিবং জ্ঞেয়ং বারুণং তদনন্তরম্।
মরুৎপুরং ততঃ স্ফীতং পর্যন্তে বহ্নিমণ্ডলম্ ॥১৮

বহ্নিমণ্ডল

স্ফুলিঙ্গপিঙ্গলং ভীমমূর্ধ্বজ্বালাশতার্চিতম্।
ত্রিকোণং স্বস্তিকোপেতং তদ্বীজং বহ্নিমণ্ডলম্ ॥২২

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সমান, পিঙ্গল বর্ণ, ভীম, রৌদ্ররূপ, উর্ধ্বগমনস্বরূপ শতজ্বালাসমন্বিত, ত্রিকোণাকার, স্বস্তিক সহিত বহ্নিবীজমণ্ডিত যাহা তাহা বহ্নিমণ্ডল। এই গ্রন্থে অগ্নির ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা আছে। ত্রৈবার্ণাচার বা ধর্মরসিকশাস্ত্রে হোমশালা, হোমকুণ্ডস্থান, হোমকাল, হোমবিধি



প্রভৃতির বিশেষ ও বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ শ্রীসোমসেন ১৬৬৭ বিক্রমাব্দে রচনা করেন। হোমকুণ্ডস্থানে সপ্তম শ্লোকে

স্বস্তিকের উপরি প্রদত্ত আকারের বর্ণনা আছে। ইহাতে দেখা যায় যে গার্হপত্যাগ্নি = চতুষ্কোণ কুণ্ড। আহবনীয় অগ্নি = ত্রিকোণকুণ্ড।[১] দক্ষিণাগ্নি = বর্তুলকুণ্ড। ইহাদের প্রতিকৃতি এইরূপ—

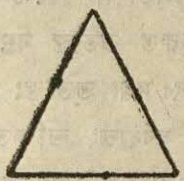
গার্হপত্যাগ্নি—



দক্ষিণাগ্নি—



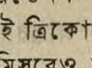
আহবনীয়াগ্নি—



আরও দুইখানি প্রাচীন গ্রন্থে অগ্নি-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। একখানির নাম 'তত্ত্বার্থসূত্র', এখানি উযাস্বাতি-রচিত ;

---

১ রাসায়নিক চিহ্নের সমস্ত তালিকায় সমত্রিকোণ (equilateral triangle) দ্বারা অগ্নি বোঝানো হইয়া থাকে। শত বৎসর পূর্বে বিলাতী মতের চিকিৎসকেরা সমত্রিকোণ চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। এই পুরাতন পদ্ধতি এখনও লোপ পায় নাই। অগ্নিজ্ঞাপক এই ত্রিকোণের চূড়াগ্র উপরের দিকে থাকে। অগ্নি বুঝাইতে হইলে মিসরেও ঠিক এইরূপ ত্রিকোণ প্রতীক (symbol) ব্যবহৃত হইত। অগ্নিশিখা উপরের দিকে উঠিয়া এইরূপ ত্রিকোণাকার ধারণ করে বলিয়া ত্রিকোণের চূড়াগ্র (apex) উপরের দিকে করিবার নিয়ম। জল কিন্তু নিম্নগামী বলিয়া নীচের দিকে যায়। নীচের দিকে ইহার গতি বুঝাইবার জন্য জলদ্যোতক ত্রিকোণের চূড়াগ্র নীচের দিকে থাকে।



গ্রন্থের রচনাকাল বিক্রমাব্দ ৪৫-৪৭। অপরখানির নাম 'মহাপুরাণ' বা 'আদিপুরাণ' ; জিনসেন ও ভদ্রসেন ৭৬০ শকাব্দে ইহা রচনা করেন।

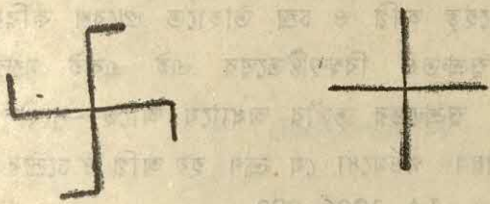
নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিং সিংঘী মহাশয়ের 'সংগৃহীত পুথি হইতে উদ্ধৃত 'কল্পলতা' নামক কল্পসূত্রের একখানি টীকা হইতে পাওয়া যায়—

"তস্মিন্ [যুগলিনাং আহার] প্রস্তাবে বনমধ্যে বংশঘর্ষণাৎ অগ্নিরুত্থিতং তং জ্বলনং দৃষ্টা অপূর্বমিদং রত্নমিতিবুদ্ধ্যা গ্রহীতুং লগ্না স্ততো দহ্যমানা ভীতাঃ সংতঃ শ্রীঋষভদেবসমীপে আগত্য কথয়ামাসুঃ হে স্বামিন্ একং অপূর্বরত্নং উৎপন্নং বর্ততে পরং মহাক্রোধী অত্যাসন্ন-গমনে জ্বালনায় ধাবতী ভগবতা জ্ঞাতং অগ্নিরুত্থিতঃ ততো ভগবতা প্রোক্তং পার্শ্বস্থানে তৃণলতাদীনি চ্ছেদয়িত্বা অগ্নিরত্নং গৃহ্নীতং ততস্তস্মিন্ ধান্যপাকং কুরুত ততস্তে মনুষ্যাস্তথাকৃতা অগ্নৌ ধান্যং প্রক্ষিপন্তিস্ম ততো ধান্যং দগ্ধং ততস্তৈঃ আগত্য স্বামী বিজ্ঞপ্তো হে অয়মস্মত্তোপি ক্ষুধাতুরঃ সর্বধান্যং ভক্ষিতং ন কিমপি পশ্চাদ্দত্তং ততঃ প্রভুনা প্রোক্তং যদা অহং হস্তিস্কন্ধারূঢ়ো নিস্সরামি তদা ভবদ্ভি মৃৎপিণ্ডং আনীয়দেয়ন্তৈঃ তথাকৃতে ভগবতা হস্তিকুম্ভ-স্থলোপরি মৃৎপিণ্ডং স্থাপয়িত্বা নানাপ্রকারাণি হাণ্ডী কুন্ডী প্রমুখানি ভাজনানি কৃত্বা দত্তানি অথ ঈদৃশানি কৃত্বা অগ্নৌ পাচয়িত্বা পানীয়ং...... ....ধান্যঞ্চমধ্যে প্রক্ষিপ্য অগ্নিরুপরিস্থাপয়িত্বা পাকঃ কর্তব্যঃ তথাকৃতে পচনারম্ভপ্রবৃত্তির্জাতা ইতি যুগলিনামাহারবিধিঃ।"

অগ্নির ধ্বজপতাকার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় কোথাও কোথাও ধ্বজপতাকাও আছে। কয়েক বর্ষ পূর্বে India Museum South Kensingtonএ অষ্টদিক্‌পালের ধ্বজ-পতাকা সংরক্ষিত হয়। এগুলি যেখানে অস্ত্রশস্ত্র আছে তাহাদেরই উপরে ঝোলানো আছে।—IA. X. 54.

পঞ্জাব প্রদেশে 'ক্রিয়াকাণ্ডে' কয়েকটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

তাহাদের মধ্যে স্বস্তিক একটি। সতিয়া নামক ক্রিয়ার সাধারণ আকার নিম্নরূপ। কিন্তু ডেরা গাজিখাঁয় একটি অদ্ভুত রকমের বাহু যোগ করিয়া দেওয়া হয়। এই সতিয়ার একটি বিশেষ অর্থ আছে। নিম্নরূপ চারিটি প্রধান রেখার সতিয়া তৈয়ারি করা হয়। এই



চারিটি রেখায় চারিটি দিকের অধিপতি বুঝায়। কুবের উত্তরের, যম দক্ষিণের, ইন্দ্র পূর্বের এবং বরুণ পশ্চিমের অধিপতি দেবতা। ইহাতে আর চারিটি রেখা জুড়িয়া দিয়া এইরূপ আকারের যুক্ত রেখাগুলিতে চারিটি অর্ধদিকের কোণের অধিপতিদের বোঝায়— ইসর (উত্তর-পূর্বে), অগ্নি (দক্ষিণপূর্বে), বায়ু (উত্তর-পশ্চিমে), নৈনিত্ (দক্ষিণ-পশ্চিমে)। দেবতাদের অধিপতি গণপতির স্থান সকলের মধ্যস্থলে। 'বরিবস্যারহস্য' নামক তান্ত্রিক গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

বিশ্ববিসৃক্ষাবশতস্বাধৌ শক্তি বালোকয়দ্ব্রহ্মা।
বিন্দুর্ভবতি তমিন্দুং প্রবিশতি শক্তিস্তু রক্তবিন্দুতয়া
এতদ্বিন্দূদ্বিতয়ং বিসর্গসঞ্জ্ঞয়ং হকারচৈত্যন্যম্।

বিশ্বসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁহার অর্ধাঙ্গী শক্তির দিকে অবলোকন করিলেন। তাহার ফলে চন্দ্রাকার একটি বিন্দু হইল। শক্তি রক্তবিন্দুরূপে শ্বেতবিন্দুমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই উভয় বিন্দুর সহযোগে বিসর্গ হইল ; ইহা হকারচৈতন্য।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গ্রন্থকার বলেন—উল্লিখিত অর্থে 'বিসর্গ' শব্দ বৈদিক অগ্নিষ্টোমের সমর্থক। ইহা অগ্নি ও চন্দ্রের মিলিত আকার। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণেরও বচন এখানে উদ্ধৃত

হইয়াছে ; তাহার অর্থ—"অগ্নি উদীয়মান সূর্যে প্রবেশ করে অথবা সূর্য অস্তকালে অগ্নিতে প্রবেশ করে। অমাবস্যায় সূর্য ও চন্দ্র মিলিত হয়।"

টীকাকার শেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সূর্য রক্ত ও শ্বেত বিন্দুর সম্মিলন, যেহেতু অগ্নি ও চন্দ্র তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। সুশ্রুতকার সুশ্রুতও বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের এই একই মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সুশ্রুতের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে—পুংবীর্য চান্দ্র ও স্ত্রীবীর্য আগ্নেয়। গর্ভমধ্যে যে ভ্রূণ হয় অগ্নি ও চন্দ্রের সম্মিলনই তাহার কারণ।—IA, 1906, 280.

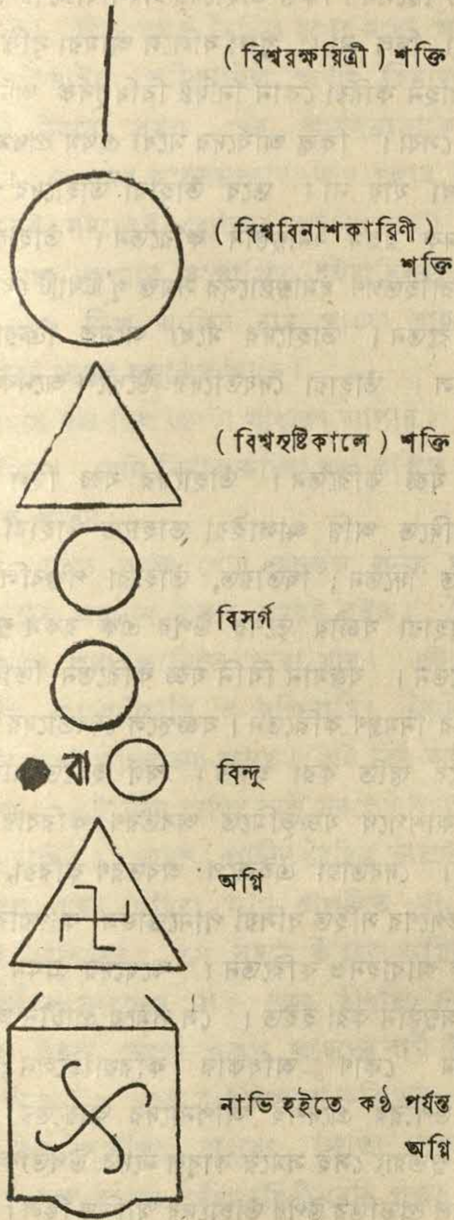
প্রপঞ্চসারতন্ত্রে ৮ম পটলের প্রথমভাগে প্রাণাগ্নি হোমের বিবরণ আছে। এই সাধনের অবস্থায় সাধককে শক্তি সত্ত্ব অর্থাৎ কুণ্ডলিনী সাধন করিতে হয়। সাধক "মায়াবীজ" দ্বারা বেষ্টিত থাকে। মূলাধারের মধ্যে একটি ত্রিভুজ ও পাঁচটি কুণ্ড থাকে। এই পাঁচটি কুণ্ডে ৫টি অগ্নির অবস্থিত। আবসথজ, সভ্য, আহবনীয় অন্বাহার্য এবং গার্হপত্য। এই পাঁচটি কুণ্ডে অক্ষরগুলি হোমে প্রদত্ত হয়। ব্যঞ্জনগুলি সাতভাগে ভাগ. বিভক্ত এবং স্বরবর্ণগুলি আটটি করিয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত। এই বর্ণগুলির প্রত্যেক অংশ নবরত্নের নামানুসারে সংজ্ঞিত হয়। কোন্ কোন্ কুণ্ডে আহুতিস্বরূপ দেওয়া হইবে তাহারও বিধি আছে। এই অনুষ্ঠানে সাধকের সূক্ষ্মদেহের উপলব্ধি হয়। বিশেষ বিবরণ প্রপঞ্চসারতন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

তান্ত্রিকমতে অগ্নি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আছে। তন্ত্রাভিধানে 'ঐ' = অগ্নি। মাতৃকানিঘণ্টুতে 'ই' = অগ্নি।

মন্দিরের অভিব্যক্তি অগ্নিতে—ভারতের প্রায় সকল জায়গাই মন্দির ও শ্রীমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত মন্দির ও শ্রীমূর্তিকে অবলম্বন করিয়া লোকে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বৈদিকযুগে ধর্মানুষ্ঠান কিন্তু এরূপে হইত না।

আর্যগণ যখন পঞ্জাবে ছিলেন তখন তাঁহাদের পূজার কোন দেবতা

বা মন্দির ছিল না। কিন্তু এই আর্যদের নিকট হইতেই ভারত তাহার ধর্মকে গড়িয়া তুলিয়াছে। ভারতের হোতা, ভারতের



বিদ্যালয়, ধর্মের বিধিনিষেধ সমস্তই আর্যদের দান। আর্যরা খুব ধর্মপ্রবণজাতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সর্বসাধারণের উপযোগী পূজার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পূজা বলিলে আমরা বুঝি কোন দেব বা দেবীকে আবাহন করিয়া কোন নির্দিষ্ট বিধিপূর্বক অর্চনা, আরাধনা, উপাসনা ও সেবা। কিন্তু আর্যদের মধ্যে প্রথম প্রথম এরূপ কোন অনুষ্ঠান দেখা যায় না। তবে তাঁহারা তাঁহাদের গৃহকে উপলক্ষ্য করিয়া অনেক রকম ধর্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের পুরোহিত ছিল। পুরোহিতগণ ধর্মানুষ্ঠানের সমস্ত খুঁটিখাটি বেশ ভাল করিয়া অভ্যাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান ছিল। তাঁহারা দেবতাদের উদ্দেশে অনেক স্তোত্র আবৃত্তি করিতেন।

আর্যরা যজ্ঞ করিতেন। তাঁহাদের যজ্ঞ ছিল তিন রকমের। প্রথমত, বেদিতে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহাতে তাঁহারা দুগ্ধ, নবনীত ও শস্য আহুতি দিতেন; দ্বিতীয়ত, তাঁহারা পশুবলি দিতেন, এবং তৃতীয়ত তাঁহারা যজ্ঞীয় তৃণের উপর এক রকম ন্যুব্জাকৃতি পাত্রে সোম ঢালিতেন। যজমান যিনি যজ্ঞ করিতেন তিনি তাঁহার গৃহে পুরোহিতদের নিমন্ত্রণ করিতেন। যজ্ঞস্থলে দেবতাদের অবতরণের জন্য নানা প্রকারে স্তুতি করা হইত। স্বর্গ হইতে বায়ুরথে আরোহণ করিয়া আকাশপথে যজ্ঞভূমিতে অবতরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইত। দেবতারা এইরূপে অবতরণ করিয়া, যজমানের পত্নী ও পুরোহিতগণের সহিত বসিয়া পানভোজন করিবার জন্য যজমান তাঁহাদিগকে আবাহনও করিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম দিক্‌কার সময়ে এই সমস্ত অনুষ্ঠান করা হইত। সে সময়ে প্রাচীন আর্যগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণ অধিকার করিয়াছিলেন; তখন তাঁহারা সিন্ধুনদের উপরের প্রদেশই আপনাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সময়ে কাবুল নদের উপত্যকা, সোয়াট নদী, কুরম, গোমল প্রভৃতির উপর তাঁহাদের স্বামিত্ব ছিল। ঋগ্বেদের শেষের

দিকের সময় আর্যসভ্যতা যমুনা ও গঙ্গাপর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন আর্যরা নর্মদা বা বিন্ধ্যপর্বত জানিতেন না, ঋগ্বেদে তাহাদের উল্লেখও নাই। কিন্তু সমগ্র বৈদিক যুগের মধ্যে আর্যসভ্যতা সমস্ত হিন্দুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণে ও বিন্ধ্যগিরির উত্তরে সমস্ত দেশ আর্যসভ্যতাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। যে সময় আর্যসভ্যতার কেন্দ্র গঙ্গার উপত্যকায় ছিল যজুর্বেদে সেই সময়েরই দ্যোতনা পাওয়া যায়। যজুর্বেদের সময় চারি বর্ণ তো দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছিলই, অধিকন্তু পরবর্তী যুগে যে সমস্ত মিশ্র জাতির নাম পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই উল্লেখ যজুর্বেদে আছে।

এই সময়ে যজ্ঞ ছিল একটা সাধারণ ব্যাপার। যজ্ঞ না করিলে প্রত্যবায় ছিল। বেদি নির্মাণ করিয়া যজ্ঞ করিতে হইত। বেদিও ছিল অনেক প্রকার।

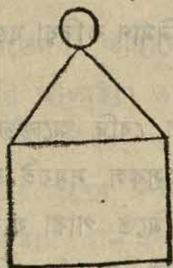
অগ্নির সহিত সকল বেদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। বৈদিক ভারতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সকল সময়ই হইত। বৈদিক যজ্ঞে তিন প্রকার অগ্নির কথা জানিতে পারা যায়। এই তিন অগ্নির নাম গার্হপত্যাগ্নি, আহবনীয়াগ্নি ও দক্ষিণাগ্নি। বৈদিক সাহিত্যে এই তিন অগ্নির যথেষ্ট আলোচনা আছে। এই তিন অগ্নির আকার ১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই তিন অগ্নির সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ। লোকে এই তিন অগ্নি রাখিত। ক্রমশ প্রাচীন বৈদিক ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়াই রাখিতেন। সে সময়ে তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্য কোন অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সযত্নে বেদি রক্ষা করিতেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ ঋগ্বেদের বাণী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদ (১. ১৩৬. ৩) উপদেশ করিতেন—

'জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়েৎ ক্ষিতিং সর্বতীমা।'—যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ঋষিরা এই বেদি বা কুণ্ডের সম্মুখে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তারপর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়া গেল, তখন তাঁহাদের অগ্নির নিকট হবি প্রভৃতি দানের প্রয়োজন হইত। ঋষিরা কিন্তু পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত না করিয়া কুণ্ডের উপর অর্থাৎ দক্ষতনার উপর পীতবর্ণের মূর্তি স্থাপন করিতেন। এই মূর্তিকে তাঁহারা অগ্নি বলিয়া বুঝিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে ইহাকে 'হব্যবাহনী' বলিতেন। ঋগ্বেদেও তাই (১০. ১৮৮. ৩) ঈরিত হইয়াছে—

"যারুচো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ।
তাভির্ণো যজ্ঞনিন্বচু॥"

এই কুণ্ডও তিন তিন অগ্নির আকারে নির্মিত হইত। কালে বোধ হয় এই তিনটির প্রতীক নিম্নে মুদ্রিত আকারে সংস্থিত হইত।



আমাদের মন্দিরের কল্পনাও ইহা হইতেই হইয়া থাকিতে পারে, আর তাহা অসম্ভবও নয়।

পূর্বকালে ভারতে বিশ্বের উপাদান সূচক স্তূপাদির প্রচলন অধিক ছিল—আজকালও আছে, তবে কম। জ্যামিতিক রেখাদ্বারা ভৌতিক উপাদানগুলির প্রতীক নির্দেশ করা হইত। এ শুধু আমাদের দেশে নয়, গ্রীসেও হইত—জাপানেও হইত, এখনও হয়। সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে স্তূপ বলা হয় জাপানীরা তাহাকে 'সতোবা' বলে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—জগতের ভৌতিক উপাদান। জাপানীদের সতোবার অংশগুলির এক একটি ভৌতিক উপাদানের প্রতীক।

Macdonell—JRAS, xxvi. 12-22, 40 Hopkins : Religions of India, 10S-12 ; Oldenberg : Die Religion des Veda, 102-33 ; Hardy : Vedish-brahmanische Periode, 63 8 ; Kuhn Herabkunft des Feuers und des Gotteranks, 1-105 : Whitney—JAOS, iii. 317-8 ; Bloomfield—JAOS, xvi. 16-41 ; Muir : Original Sans. Texts, 5, 199-220 ; Kaegi : Der Rigveda, 35-7 ; i. ii. 99ff ; Hillebrandt : Vedische Mythologie, Breslau, 1891-1902 i. 339-55 ; ii. 57-153, Weber : Indische Studen, x. 89 95 ; Grassmann : Tran. of the Rigveda, i. 6-52 ; Max Muller : Physical Religon, (cp. Kirste, Wiener Zeitschrift fur die kunde des Morgenlandes—Veinna Oriental Journal), 117, 144-203, 252, 302 ; Whitney : American Jour. of Philology, iii. 409 ; Pischel : Vediche Studien, i. 94 ; Macdonell ; Vedic Mythology, Strassburg, 1897 88 101 ; Bergaigne : La Religion Vedique, i. 11-31, 38-45, 70-74, 100ff, 103, 139-45, 153-56 ; ii. 99ff. 217 ; Roth : Nirukta, lntr. 36ff ; Erl. 7, 19-15, 117-18, 121-24 ; Max Muller : History of Ancient Sanskrit Literature, 463-66 ; Ludwig : Tran. Rigveda, iii. 355 ; v. 504 5 ; Mund Up. i. 24 ; ZDMG xxxv. 552 ; Oldeburg—ZDMG, xxxix. 68-72 ; 1, 425-26 ; W, E. Hearn : The Aryan Household, Lond. & Melbourne, 1897 Frazer : Totemism & Exogamy, Lond, 1910 ; G. G. F. Riedel : De sluik-en kroesharige rassen, Hague, 1886, 303 ; D. G. Brinton : Myths of the New World, Philadelphia, 1896, 151 ; W. M. Thomson : The Land and the Book, 1859, 280ff ; R. Taylor : Te lka a Maui, 1870, 501 ; E. Crawley : The Mystic Rose, Lond. 1902, 197 ; Monier Willams : Brahmanism & Hinduism, Lond. 1891, 280ff. 282ff. 365ff. ; Frazer : Golden Bough, i. 308 ; ii. 326, 331, 333, 465, 469ff, 470 ; iii. 237-307 ; Frazer —Jour. Philology, xiv. 145-172 ; E. B. Tylor : Early Hist. of Mankind, Lond. 1870 ; SBE Series ; Spiegel : Die arische Periode, 313 ; Roth : Erlauterungen ; Coomarswamy :

Yaksas i & ii, Washington 1928, 1931 ; Do : Early Indian Architecture ; Do : Bodh. Icn. Figs, i, 4-10, 35, 39, 40. Bodhi-gharas, in Eastern Art, iii. 1931. Waddel : Budhism, 84 ; Annecdota Oxoiensia, I. v. 8, 9 ; IA, 1903, xxxii, 464 ; SHG. 142-43 ; যা° ৭. ২৩ ; ১২. ২৫, ২৭ ; বৃহদ্দেবতা ১. ৯৫, ৯৬. ৯৮-১০১, ১৬৭ ; ২. ২৫ ; ঋ° ১. ২৪. ৭ ; ১. ৫৯ ১-২ ; ১ ৬৫. ১. ৫ ; ১. ৯৫. ৭ ; ১. ১০৩. ১ ; ১. ১১৯. ১০ ; ১. ১৪৬. ৪-৬, ৪৫ ; ১. ১৫৭. ১ ; ১. ১৬৪. ২০-২১ ; ২. ১ ; ৩. ৫ ১ ; ৩. ২০. ৭ ; ৩. ২৩. ৩ ; ৩. ২৫. ১ ; ৩. ৩৯. ৬ ; ৪. ৫. ৩ ; ৪. ১৭. ৫ ; ৫. ১. ১ ; ৬. ১০. ৪ ; ৬. ১৬. ১৩ ; ৬. ৪৮. ১৪ ; ৭. ৯. ১ ; ১০. ৭১. ৩ ; ১০. ৮২. ৫ ; ১০. ১৪৭. ৫ ; শ-ব্রা° ১১. ৮. ২. ১ ; ২ ২. ২. ২৮ ; ৪. ৩. ৪. ১১ ; ৬. ২. ১. ১২ ; ৬. ৪. ১. ২ ; ৭. ১. ৪. ৩০ ; ৭. ৩. ২. ১৭ ; ৬. ৩. ১. ২২, ২৫ ; ৩. ১. ৩. ১ ; ৫. ২. ৩. ৬ ; ১০. ১. ২. ৫ ; ৯. ২. ৩. ৩১ ; ১. ৫. ২. ১১, ২৪ ; ৩. ১. ৩. ২৮ ; ১১. ১. ২. ২ ; ১. ৬. ২. ৮ ; ৩. ১. ৩. ১ ; ৬. ১ ২. ২৮ ; ১৪. ৩. ২. ৫ ; ৭. ৪. ১. ২৫ ; ৯. ৫. ১. ৭ ; ৬. ৭. ১. ২০ ; ১০. ১. ২. ৪ ; ৭. ৩. ১. ২ ; ৭. ১. ২. ৪ ; ২. ৬. ৩. ১৫ ; ১৪. ৬. ২. ১০ ; ১৩. ৮. ৪. ৮ ; ৬. ৭. ৩. ৭ ; ৬. ২. ২. ৩৪ ; ৩. ৪. ৪. ১৪ ; ১৪. ৯. ১. ৬৩ ; ৬. ৬ ; ১. ৩. ৩. ১৯ ; ২. ৫. ৪. ৮ ; ৫. ৩. ৫. ৩২ ; ১. ৮. ২. ১৫ ; ৩. ৪. ১. ১৯ ; ১০. ১. ২. ৩ ; ৯. ৫. ১. ৬৮ ; ১৪. ৯. ১. ১৬ ; ১. ১. ১. ১৮ ; ১০. ৪. ১. ৫-৬ ; ৩. ৪. ৩. ২ ; ৭. ৪. ১. ৩৪ ; ২. ৫. ৪. ৮ ; ৩. ৯. ১. ১৯ ; ৬. ১. ১. ১৪ ; ৬. ৭. ৩. ১১ ; ৯. ২. ৩. ৩৯ ; ৬. ৬. ৩. ৪ ; ২. ৩. ৪. ২৪ ; ৮. ৬. ৩. ১২ ; ৬. ৬. ১. ১৪ ; ৯. ১. ১. ২৬ ; ১০. ২. ৪. ১ ; অ° ১০. ৭. ৩৮ ; ছা-উ° ৬. ৮. ৪ ; ৬. ১১. ১ ; ৬. ১২. ২ ; অগ্নিপু° ৫১. ১৪ ; শ্বেতা-উ° ৩. ৯ ; তৈ-উ° ১. ১০ ; কেন-উ° ১৬. ২৬ ; তৈ-স° ৪. ১ ; কৌ-ব্রা° ৮. ১ ; ৭. ১ ; ৩. ৬ ; ৫. ৫ ; ৬ ১৪ ; ৯. ৫ ; ১২. ৩ ; ১৪. ৫ ; ২৮. ৫ ; মৈ-উ° ৬. ১-৪ ; ৭. ১১ ; ঐ-ব্রা° ১. ১, ৮, ১৫, ২২, ২৮ ; ২.৩, ৫, ৪২ ; ৩. ৪ ; ৭. ১৬ ; তৈ-ব্রা° ১. ৬. ১. ৮ ; ১. ৪. ৪. ১০ ; ২. ১. ৬. ৪ ; ১. ৭. ২. ২-৩ ; ২. ১. ২. ১১ ; ৩. ৭. ৩. ৭ ; ১. ৩. ১. ৪ ; ৩. ৯. ১৬. ৩ ; ২. ৪. ৩. ৬ ; ৩. ৯. ২১. ২৩ ; ৩. ২. ৫. ৭ ; ৩. ১১. ৪. ১ ; ৩. ১১. ১. ৭ ; ১. ১. ৩. ৩ ; ১. ৩. ৯ ; ১. ১২. ৫. ৬ ; তা-ব্রা° ৬. ১. ৬ ; ৭. ৮. ৪ ; ৯. ৪. ৫ ; ১৮. ১. ৮ ; ২৫. ১৪. ৪ ; গো-উ° ১. ১২. ১৬ ; ৬. ৭ ; জৈ-উ° ১. ২৫ ৮ ; ১. ৫১. ৫ ; সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, পৃ° ৩, ৮ ; অভিধর্মকোষ ১. ৩৪ ; ২. ৩৪ ; মহাস্থথাবতীব্যূহ ৩২ ; ধম্মপদ° ৩৮৭ ; সংযুক্তনিকায় ১. ১. ১৪৪ ; থেরগাথা ৯০৯৫ : মহানির্বাণতন্ত্র. ৬. ১৯ উঃ ১৭৯ শ্লো° ।

অদিতি

ঋগ্বেদে যে সমস্ত দেবতার উল্লেখ আছে তাঁহাদের দৃশ্যরূপ যে ভৌতিক তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু সেই সমস্ত দেবতার দৃশ্যরূপ কি প্রকার তাহা এ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হয় নাই। এই দৃশ্যরূপ সম্বন্ধে বৈদিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অগ্নি, সবিতা, সূর্য, মরুৎ, বায়ু, উষা, রাত্রি, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতির স্বরূপ স্পষ্ট ও সুপরিচিত। কিন্তু এমন অনেকগুলি দেবতা আছেন যাঁহাদের স্বরূপ এরূপ নয়। এইজন্য প্রাচীনকাল হইতে দেবতাগণের স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদের অনুসন্ধান-ফল ভিন্ন হইয়াছে। অধুনাতন পণ্ডিতগণের মতও নানা প্রকার। এ অবস্থায় অদিতির স্বরূপ-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা কঠিন।

বেদে ও বৈদিক সাহিত্যে অদিতি—কোন দেবতার স্বরূপদ্যোতক শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে সেই দেবতা বা শব্দের যত বেশী বার উল্লেখ থাকে, অর্থনিরূপণের পক্ষে সুবিধা তত বেশী হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে 'অদিতি' শব্দের প্রয়োগ কমপক্ষে ১৪০ বার আছে। এই শব্দে শতাধিক স্থানে অদিতি নামক দেবী লক্ষিত হইয়াছে। এই সকল স্থানে অদিতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে কিংবা অন্যান্য দেবতার সহিত অথবা শুধু অদিতির উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট স্থানগুলিতে অদিতি শব্দে অন্যান্য দেবতা অথবা তাঁহাদের গুণোদ্যোতক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঋগ্বেদে 'অদিতি'-শব্দ কোন কোন স্থানে অগ্নির গুণবাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।—

"যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশোঽনাগাস্ত্বমদিতে সর্বতাতা"—ঋ° ১. ৯৪. ১৫ (হে শোভনধনযুক্ত অখণ্ডনীয় অগ্নি। হে সর্বযজ্ঞে বর্তমান যজমানকে তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর)।

"ত্বমগ্নে অদিতির্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী সর্বসে গিরা।
ত্বমিলা শতহিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী।"
—ঋ° ২. ১. ১১।

(হে দেব অগ্নি, তুমি হব্যদাতার পক্ষে অদিতি। তুমি হোত্রা, ভারতী, তুমি স্তুতি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। তুমি শতবৎসরের ইলা, তুমি দানসমর্থ। হে ধনপালক, তুমি বৃত্রহন্তা, তুমি সরস্বতী)।

'বিশ্বেষামদিতির্যজ্ঞিয়ানাম্'—৪. ১. ২০ (অগ্নি সমস্ত যজ্ঞীয় দেবতার অদিতিস্বরূপ অর্থাৎ পোষক)। 'সমিধা যো নিশিতী দাশদদিতিং ধানভিরস্য মর্ত্যঃ'—৮. ১৯. ১৪. (যে মনুষ্য এই অগ্নি অবয়বের সহিত অখণ্ডনীয় অদিতিকে সমিধের দ্বারা পরিচর্যা করে)। ৭. ৯. ৩ ঋকেও অগ্নির বিশেষণরূপে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। —'অমূরঃ কবিরদিতি বিবস্বান্ত্সুসংসন্মিত্রো অতিথিঃ শিবো নঃ' (অমূঢ়, কবি, অদীন, দীপ্তিমান্, শোভনগৃহবিশিষ্ট, মিত্র, অতিথি ও আমাদের মঙ্গলকর অগ্নি)। আবার ৮. ৪৮. ২ ঋকে সোমকে (চন্দ্র বা সোমলতাকে) আদিত্যরূপে সম্বোধ করা হইয়াছে। ৫. ৪৪ ১১ ঋকে সোমরস পান করিয়া যে মত্ততা হয় তাহাকে অদিতি অর্থাৎ অদিতির ন্যায় বিস্তৃত বলা হইয়াছে।—'শ্যেন আসামদিতিঃ কক্ষ্যো মদো বিশ্ববারস্য যজতস্য মায়িনঃ' [বিশ্ববার, যজত ও মায়ী (এই তিন ঋষির সোমরসজনিত) মত্ততা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী ও অদিতির ন্যায় বিস্তৃত]। 'বৃষ্ণে যত্তে বৃষণো অর্কমর্চানিন্দ্র গ্রাবাণো অদিতিঃ সজোষা।' এই ৫. ৩১. ৫ ঋকের 'গ্রাবাণো অদিতিঃ' পদের অর্থ সম্ভবত 'অতি বিস্তৃত পাষাণ সকল'। ১০. ১১, ১ ঋকেও 'অদিতি'র অর্থ 'অতি বিস্তৃত'।—'বৃষা বৃষ্ণে দুদুহে দোহসা দিবঃ পয়াংসি যহ্বো অদিতের দাভ্যঃ'।

প্রায় পঞ্চষষ্টিরও অধিক ঋকে দেবী অদিতিকে আবাহন করা হইয়াছে। অন্যান্য দেবতার সহিত অন্তত ৪০ বার তিনি সম্বোধিত হইয়াছেন। দেখা যায়, অন্যূন ৩৮ বার মিত্র ও বরুণের সহিত

অদিতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে। দ্যাবাপৃথিবীর সহিত অন্তত ২৭ বার এবং সিন্ধুর সহিত ২০ বার, অমর্যা ও ইন্দ্রের সহিত ১২ বার, ভগদেবতার সহিত ৯ বার, অগ্নি ও মরুদ্‌গণের সহিত ৬ বার, পূষা, বিষ্ণু ও সবিতার সহিত ৪ বার, সোম ও বায়ুর সহিত ৩ বার, রুদ্রগণ, বসু ও ব্রহ্মণস্পতির সহিত ২ বার এবং অন্যান্য দেবতার সহিত ১ বার দেবী অদিতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের বহু স্থানে যেখানে অদিতির কথা বলা হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার অনেকগুলি গুণেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। ৫. ৬৯. ৩; ৭. ৩৮. ৪; ৮. ১৮. ৪; ১০. ১০. ২; ১০. ২৬. ৩. প্রভৃতি সূক্তে তাঁহাকে দেবী আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। ১. ২৪. ১, ২ ও ৮. ৫. ৩ ঋকে অদিতিকে 'মহতী'—বিরাট্ বলা হইয়াছে। অদিতি 'অনর্ব্বা' অর্থাৎ স্থির ও অপরিবর্তনীয়া (২. ৪০. ৬; ৭. ৪০. ৪; ১০. ৯৭. ১৪)। তিনি নিষ্পাপা—অনাগা (১. ২৪. ১৫; ১. ১৬২. ২)। কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে না।—তিনি 'অনেহস' (সায়ণ—১০. ৬৩. ১০)। অদিতি মাতা (৮. ২৫. ৩)। তিনি 'সর্বতাতি', 'উরুবাচা' অর্থাৎ 'সর্বব্যাপিনী' (৫. ৪৬. ৬; ১০. ১০০. ১)। তিনি সুসন্তানবিশিষ্টা (৩. ৪.১১) —তাঁহার পুত্রগুলি রাজা, তিনি 'রাজমাতা' (২. ২৭. ৭)। তিনি 'সুহবা'—সম্যক্ আহুতা (৭. ৪০. ৪)। তাঁহার দেহ অতি সুন্দর বলিয়া তিনি 'সুশর্মা' (১০. ৬৩. ১০)। তিনি অদ্বিতীয়া (৮. ১৮. ৬)। তিনি সমুজ্জ্বলদেহা 'ঋতাবতি' (৮. ২৫. ৩)। তাঁহার গতি প্রোজ্জ্বল ('ঋতাবৃধ'—৮. ৮২. ১০)।

অদিতি সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাপার ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে। ঋষি শুনঃশেপ[১] যূপে আবদ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—'কে

১ শুনঃশেপকে যূপে বন্ধন করা হইয়াছিল (৫. ২. ৭)। এখানে 'আবদ্ধ' বুঝাইতে 'দিত' [দা (বন্ধন করা)+ক্ত] পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার বিশেষ্যপদ 'দিতি'=বন্ধন binding. সুতরাং অদিতি—বন্ধন

আমাকে এই মহতী অদিতিতে (পৃথিবীতে) আবার মুক্তিদান করিবে যাহাতে আমি পিতা ও মাতা (দ্যাবাপৃথিবী) দর্শন করিতে পারি' (১. ২৪. ১)। দীর্ঘতমার মতে মিত্রাবরুণ একত্র ভ্রমণ করিয়া অদিতিকে রক্ষা করেন (১. ১৫২. ৬)। একদা ইন্দ্র মহিমা দ্বারা অদিতি (পৃথিবী) ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন (৭. ১৮. ৮)। ১০. ৬৩. ২ ঋকে বিশ্বদেবগণকে আহ্বান করিয়া প্রার্থনা করা হইতেছে, তাঁহারা যেন অদিতি ও আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। ১. ১১৩. ১৯ ঋকে উষাকে দেবগণের মাতা ও অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী বলা হইয়াছে। ১০. ৫. ৭ ঋকে বলা হইয়াছে— অগ্নি অসৎও বটেন, সৎও বটেন; তিনি পরম ব্যোমে সংস্থিত আছেন। তিনি অদিতির উপরে সূর্যরূপে জন্মিয়াছেন। এখানে সায়ণ বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির পূর্বে যে অপরিণত অবস্থা ছিল তাহাকে 'অসৎ' বলা হইয়াছে, আর, সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা 'সৎ'। ১০. ৭২ সূক্তে' জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপার সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বকালে ব্রহ্মণস্পতি দেবকর্মকারের ন্যায় দেবতাদিগের নির্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল (১০. ৭২. ২)। দেবোৎপত্তির পূর্বতনকালে অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ (বৃক্ষ—সায়ণ) হইতে দিক্ সকল জন্মগ্রহণ করিল। উত্তানপদ হইতে ভূ জন্মিল। ভূ হইতে দিক্‌সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন (অতএব অদিতি দক্ষের কন্যা; দক্ষ আবার অদিতির পুত্র—১০. ৭২. ৪.)। অদিতি যে জন্মিলেন তিনি দক্ষের কন্যা; তাঁহার পরে দেবতারা জন্মিলেন, ইহারা কল্যাণ-

---

রাহিত্য, bondlessness, unbinding. ৮. ৬৭. ১৪ ঋকে আদিত্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে—'তোমরা হিংসাকারীদিগের মুখ হইতে বদ্ধ চোরের ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা কর'—'তে ন আস্নো বৃকাণামাদিত্যাশে মুমোচত। স্তেনং বদ্ধনিবাদিনে।'

মূর্তি ও অবিনাশী (১০ ৭২. ৬)। দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই নৃত্য হইতে প্রচুর ধূলি উৎপন্ন হইল। মেঘসমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন। এই সমুদ্রতুল্য আকাশের মধ্যে সূর্য নিগূঢ় দিলেন। দেবতারা সেই সূর্যকে প্রকাশ করিলেন। অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তিনি তন্মধ্যে সাতটিকে লইয়া দেবলোকে গেলেন; কিন্তু মার্তণ্ড নামক পুত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই অতি পূর্বতনকালে অদিতি সপ্তপুত্র লইয়া চলিয়া গেলেন, আর মার্তণ্ডকে জন্মের জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রসব করিলেন (১০. ৭২. ৫-৯)।

অদিতির পুত্রগণ বা আদিত্যগণের সহিত অদিতির সম্বন্ধের গুরুত্ব যথেষ্ট। আদিত্যগণ অদিতির পুত্র। ২. ২৭. ১ ঋকে (=উ° ম° য° ৩৪. ৫৪ = কা°১১. ১২ = নি° ১২. ২৬) ছয় জন আদিত্যের নাম আছে। ছয় আদিত্য—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। ঋক্‌টি এই—

'ইমা গির আদিত্যেভ্যো ঘৃতস্নূঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহ্বা জুহোমি।
শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্তুবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ॥'

মৈত্রায়ণী-সংহিতাতে দক্ষের নাম নাই। তাহাতে আছে— অদিতির্বৈ প্রজাকামৌদনমপচৎ সোচ্ছিষ্টমাশ্নাত্তস্যাধাতা চার্যমা ···মিত্রশ্চ···বরুণশ্চ···অংশশ্চ ভগশ্চাজাযেতাম্' (১. ৬. ১২ = তৈ- ব্রা° ১. ১. ৯. ১০২)। আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। এ অদিতি কিন্তু কশ্যপ-পত্নী নহেন। ইনি সকল দেবের জনয়িত্রী—আদিদেব-মাতা। যাস্ক ইহাকে 'আদিনা দেবমাতা' বলিয়াছেন। ৯. ১১৪. ৩ ঋকে 'দেবা আদিত্যা যে সপ্ত তেভিঃ' প্রভৃতি বচনে আদিত্যের সংখ্যা ৭ বলা হইয়াছে, কিন্তু কাহারও নাম করা হয় নাই। অতঃপর ১০. ৭২. ৮ ঋকে আছে যে, অদিতির আট পুত্র; তন্মধ্যে

অদিতি মার্তণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাতটিকে লইয়া দেবলোকে গমন করেন। এখানেও আদিত্যগণের নাম নাই। আট জন আদিত্যের নাম সর্বপ্রথম তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (১. ১. ৯. ১-৩) পাওয়া যায়। নামগুলি এই—ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্। অতএব দেখা যাইতেছে, পূর্বে ছয় জনের মধ্যে দক্ষ স্থানে হইলেন 'ধাতা'। নূতন দুই জন যুক্ত হইল—'ইন্দ্র' ও 'বিবস্বান্'। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণমতে অংশ অষ্ট আদিত্যের অন্যতম। শতপথ-ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা আছে। তাঁহারা দ্বাদশ মাসের আদিত্য—'দ্বাদশ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈতঽআদিত্যাঃ এতে হীদং সর্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্বমাদদানা যন্তি অস্মাদাদিত্যা ইতি (১১. ৬. ৩. ৮)।

বৈদিক দেবতত্ত্বে অদিতি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করেন। কিন্তু সমগ্র ঋগ্বেদে কোন একটি সম্পূর্ণ সূক্ত তাঁহার নাই। অধিকাংশ সূক্তে তাঁহার পুত্র আদিত্যগণের সহিত অদিতি উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কোথাও বলা হয় নাই। তবে তাঁহার সমগ্রভাব, বিস্তৃতভাব, ঔজ্জ্বল্য ও জ্যোতিষ্মত্তার উক্তি বেদে আছে। মিত্র ও বরুণের ন্যায় তিনি জীবকুলের পুষ্টিদাত্রী। তিনি প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় স্তুত হইয়া থাকেন। আদিত্যগণ তাঁহার পুত্র, কিন্তু একবার মাত্র তাঁহাকে তাঁহাদের ভগিনী বলা হইয়াছে। তাঁহাকে বসুগণের কন্যাও বলা হইয়াছে।[১] ৮. ১০. ১৫ যজুর্বেদে অদিতি একবার বিষ্ণুর পত্নী নামে অভিহিত হইয়াছেন।[২]

বৈদিক যুগের পরবর্তী সাহিত্যে তিনি দক্ষের কন্যা, বিবস্বান্, বিষ্ণু ও দেবগণের মাতা। অথর্ববেদে (৭. ৬. ২ = বাজ-স° ২১. ৫) তাঁহাকে ঋতের পত্নী বলা হইয়াছে। মাতৃত্বকে তাঁহার বৈশিষ্ট্য

১ ঋ° ৮. ১০১. ১৫; তু° অ° ৬. ৪. ১ ঋকে অদিতির ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণের উল্লেখ আছে।

২ তৈ-স° ৭. ৫. ১৪; বাজ-স° ২৯. ৬০।

বলা যাইতে পারে। তাঁহার একটি আখ্যা 'পস্ত্যা' (=গৃহিণী—৪. ৫৫. ৩; ৮. ২৭. ৫) হইতেও তাঁহার মাতৃত্বের আভাস পাওয়া যায়। পাপ হইতে মুক্তি দিবার জন্য সতত তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। এই ব্যাপারে বরুণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যেহেতু বরুণ পাপিগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া থাকেন। পাপ হইতে মুক্তি দিবার জন্য বরুণ (১. ২৪. ১৫), অগ্নি (৫. ১২. ৪) সবিতা (৫. ৮২. ৬) ও অন্যান্য দেবতাকে তাঁহার পূর্বে আহ্বান করা হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার নামের আদিম ধারণা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অদিতির আদিম ধাত্বর্থ বন্ধন হইতে মুক্তি। অনপরাধ ও অদীন করিয়া দিবার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠাতা আদিত্যগণের আশ্রয় প্রার্থনা করিত (ঋ° ৭. ৫১. ১)।

পাপ হইতে মুক্তিদান ব্যতীত অন্য সম্পর্কেও অদিতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু আদিত্যগণ নয়, অন্য সকল দেবতাও অদিতি হইতে উৎপন্ন। আকাশস্বরূপে তিনি তাহাদিগকে মধু মিশ্রিত দুগ্ধ যোগাইয়া থাকেন। কিন্তু তৈত্তিরীয়-সংহিতা[১] ও অন্যান্য গ্রন্থ তাঁহাকে পৃথিবী হইতে অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করে। নৈঘণ্টুকদিগের সময় এই মত এত প্রবল হইয়াছিল যে এই শব্দটি পৃথিবীর পর্যায়শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু অদিতি ঋগ্বেদে (১০. ৬৩. ১০) প্রায়ই পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র। অদিতি আকাশ, অন্তরীক্ষ, মাতা, পিতা, সকল দেব, পঞ্চজন এবং জন্ম ও জন্মের কারণ হইতে অভিন্ন (ঋ° ১. ৮৯. ১০)। দক্ষ যিনি তাঁহার পুত্র তিনিই আবার তাহার পিতা (ঋ° ১০. ৭২. ৪, ৫)।

অদিতি গাভী—ঋগ্বেদের কয়েকটি স্থানে (১. ১৫৩. ৩; ৮. ৯০. ১৫; ১০. ১১ ই°) এবং পরবর্তী সংহিতায় (বাজ-স° ১৩. ৪৩. ৪৯) অদিতি গাভী নামে উক্ত হইয়াছে। ৯. ৯৬. ১৬ ঋকে

১ ঋ° ২. ১২. ৯; অ° ১৩. ১. ৩৮।

সায়ণ অদিতির অর্থ করিয়াছেন—গাভী; এখানে অদিতি হইতে (স্বর্গ বা গাভী হইতে) যে পয়ঃ (শুভ্র জ্যোতি বা দুগ্ধ) দোহন করা হয় তাহার সহিত সোমের (চন্দ্র বা সোমরসের) তুলনা হইয়াছে। যজুঃ-সংহিতায় (৩৮. ২) আছে—'অদিতির্হি গৌঃ' (শ-ব্রাঃ ১৪. ২. ১. ৭, ১. ৩. ৪. ৩৪)। মন্ত্রব্রাহ্মণও (২. ৮. ১৫) অদিতির গাভী অর্থ দিয়াছে—'মা গামনাগামদিতিং ব ধিষ্ট'। নিঘণ্টু (২. ১১) ও কৌ-নি° ৪. ২২ অদিতিকে বলিয়াছে —'গোনাম'।

অদিতি বাক্—নিঘণ্টু (১. ১১) ও কৌ-নি° (১০২) অদিতিকে বলিয়াছে 'বাঙ্‌নাম'। শতপথ-ব্রাহ্মণে কোথাও কোথাও বলিয়াছে —'বাগ্বাঽঅদিতিঃ' (৬. ৫. ২. ২০); 'অদিতিরস্থ্য যশীঙ্কী (বাক্) ইতি' (৩. ২. ৪. ১৬)। নিরুক্ত (১১. ২১) একস্থানে অদিতিকে অগ্নি নামে অভিহিত করিয়াছে—'অগ্নিবপ্যদিতিরুচ্যতে'। এ ছাড়া অদিতিকে 'অদীবা দেবমাতা'ও বলা হইয়াছে (নি° ৪. ২২)।

অদিতি পৃথিবী—পিশেল (Pischel) [PVS. 2. 86] অদিতি অর্থে পৃথিবী বুঝিয়াছেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থেও ইহার উক্তির সমর্থন আছে। নিরুক্ত ও নিঘণ্টুতেও অদিতির এই পৃথিবী অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ কয়েকস্থানে অদিতিকে পৃথিবী হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। 'ইয়ং (পৃথিবী) হ্যেবাদিতিঃ'—শ-ব্রা° ৩. ২. ৩. ৬; 'ইয়ং (পৃথিবী) বাঽঅদিতির্মহী' (ঐ, ৬. ৫. ১. ১০)। এ সম্পর্কে তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের বচন এইরূপ—'ইয়ং (পৃথিবী) বৈ দেব্যদিতির্বিশ্বরূপী' (১. ৭. ৬. ৬); 'ইয়ং (পৃথিবী) বৈ দেব্যদিতিঃ' (১. ৪. ৩. ১)। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণও (১.৮) বলিয়াছে—'ইয়ং (পৃথিবী) হ্যদিতিঃ'। 'অদিতি ইতি পৃথিবীনাম' ইহা নিঘণ্টু (১.১) ও কৌৎস্যবনিঘণ্টুর (৭২) উক্তি। 'অদিতেঃ উপস্থ', 'অদিতেঃ উপস্থাৎ', 'অদিতে উপস্থে' এই বৈদিক উক্তির অর্থ 'অদিতির উপর'।

নিঘণ্টু, নিরুক্ত ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে অদিতি শব্দের অর্থ 'পৃথিবী' বলা হইয়াছে ; সায়ণ তদনুসারে ঋগ্বেদের কয়েক স্থানে অদিতির অর্থ পৃথিবী প্রতিপাদন করিয়াছেন ; কিন্তু ঋগ্বেদের কয়েক স্থানে অদিতি ও পৃথিবীর পৃথক্ নির্দেশ আছে ; সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের ঐ সকল স্থানে অদিতির অর্থ, 'পৃথিবী' নয়। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত মন্ত্র প্রদত্ত হইল :

'ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবরুণাদিতিং স্বঃ পৃথিবীং
দ্যাং মরুতঃ পর্বতাঁ অপঃ।
হুবে বিষ্ণুং পূষণং ব্রহ্মণস্পতিং ভগং নু
শংসং সবিতারমূতয়ে ॥'—৫.৪৬. ৩।

'দ্যৌঽস্পিতঃ পৃথিবি মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্ব-
সবো মৃলতা নঃ।
বিশ্ব আদিত্যা অদিতে সজোষা অস্মভ্যং
শর্ম বহুলং বি যন্ত ॥'—৬. ৫১. ৫।

'সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণম্
অদিতিং সুপ্রনীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা
রুহেমা স্বস্তয়ে ॥'—১০. ৬৩. ১০।

'আ যে বিশ্বা স্বপত্যানি তস্থুঃ কৃণ্বানাসো
অমৃতত্বায় গাতুম্।
মহ্না মহদ্ভিঃ পৃথিবী বি তস্থে মাতা
পুত্রৈরদিতির্ধায়সে বেঃ ॥'—১. ৭২. ৯।

এই সমস্ত মন্ত্রে একই স্থানে পৃথিবী ও অদিতি স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ঋগ্বেদের এই সকল স্থানে অদিতি ও পৃথিবী বিভিন্ন দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ব্রাহ্মণগ্রন্থে অদিতি সম্পর্কে কয়েকটি উপাদান ও আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। ইহাতে অদিতি ও কশ্যপের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (২. ১) একটি আখ্যায়িকা আছে তদনুসারে যজ্ঞ সোমযোগাভিমানী দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন; তখন সেই দেবগণ কোন যজ্ঞাদি করিতে পারিতেন না এবং যজ্ঞ জানিতেও পারিতেন না। তৎপরে তাঁহারা অদিতিকে বলিলেন, তোমার প্রসাদে আমরা এই যজ্ঞকে প্রকৃষ্টরূপে জানি; অদিতি বলিলেন, তাহাই হউক; কিন্তু আমি তোমাদের নিকটে বর প্রার্থনা করিতেছি। দেবগণ কহিলেন, প্রার্থনা কর; তিনি এই বর চাহিলেন—যজ্ঞসকল সোমযাগাদি মৎপ্রায়ণ অর্থাৎ আমাকে লইয়া আরব্ধ হউক এবং মদুদয়ন অর্থাৎ আমাকে লইয়া অবসান হউক। দেবগণ কহিলেন, তাহাই হইবে। চরু অদিতির বরদ্বারা প্রার্থিত হইয়াছিল বলিয়া প্রায়ণীয় চরু অর্থাৎ যজ্ঞারম্ভের ইষ্টিতে প্রদত্ত চরু ও উদয়নীয় চরু অর্থাৎ যজ্ঞ-সমাপ্তির ইষ্টিতে প্রদত্ত চরু অদিতি দেবতার অংশ।

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৬. ১. ৫. ২) আছে—'পথ্যাং স্বস্তিময়জন্ প্রাচীমেব, তয়া দিশং প্রাজানন্ অগ্নিনা দক্ষিণা সোমেন প্রতীচীং সবিত্রোদীচীমদিত্যোর্ধ্বাম্'।

উত্তরদিকে সবিতার যাগ করা হয় বলিয়া উত্তর-পশ্চিম কোণে সমধিকভাবে পবন সঞ্চরণ করে। এই বায়ু সবিতার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই এই দিকে প্রবাহিত হয়। সবিতা প্রেরক দেবতা। উর্ধ্বদিকে অদিতির যাগবিধান হইয়া থাকে—'উত্তমামদিতিং যজতি' উর্ধ্বে অবস্থিত অদিতির যাগ করিতে হয়।

প্রাণ ও অপান বায়ু যথাক্রমে অগ্নি ও সোম; সবিতা যজ্ঞকর্মে প্রেরণের জন্য ও অদিতি প্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী। এইরূপ অগ্নি ও সোম দুই চক্ষু স্বরূপ। সবিতা যজ্ঞকর্মে নিয়োগের জন্য ও অদিতি প্রতিষ্ঠার জন্য উপযোগী।

দেবগণ অন্তর্হিত যজ্ঞকে চক্ষুদ্বারাই জানিয়াছিলেন; যাহা দুর্জ্ঞেয়। তাহা চক্ষুদ্বারাই জানা যায়; এবং সেই হেতু মুগ্ধ

দিগ্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইতস্তত বিচরণ করিয়া যখনই কোন চিহ্ন দেখিতে পায় তখনই পথ জানিতে পারে।

দেবগণ এই ভূমিতেই যজ্ঞকে জানিয়াছিলেন তৎপরে ইহাতেই যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন; ইহাতেই যজ্ঞ বিস্তার করা হয় এবং উপকরণাদি ইহাতেই সংগৃহীত হয়। এই ভূমিই অদিতি। সেই জন্য অন্তিম (উত্তমা) দেবতা অদিতির যজন হয়। উত্তমা অদিতির যে যজন হয়। তদ্দ্বারা যজ্ঞেরই জ্ঞান জন্মায় ও স্বর্গলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

প্রায়ণীয় চরু অদিতির উদ্দিষ্ট এবং উদয়নীয় চরুও অদিতির উদ্দিষ্ট। যজ্ঞকে ধরিবার জন্য, যজ্ঞকে অশিথিল করিবার জন্য ও যজ্ঞে গ্রন্থি-বন্ধনের জন্য এই দুই চরু বিহিত হইয়া থাকে। এই অদিতি সবনের দেবতা।—'যাঃ প্রায়ণীয়স্য যাজ্যাবত্তা উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ কুর্যাৎ, পরাঙমুং লোকমারোহেৎ প্রমায়ুকঃ স্যাদ্‌যাঃ প্রায়ণীয়স্য পুরোঽনুবাক্যাস্তাঃ উদয়নীয়স্য যাজ্যাঃ করোত্যস্মিন্নেব লোকে প্রতিতিষ্ঠতি' (৬. ১. ৫. ৫)।

যজ্ঞাগ্নির চতুর্দিকে জলসেচনের সময় অদিতির আবাহন করিতে হয় (খাদিরগৃহ্যসূত্র ১. ২. ১৭; গোভিলগৃহ্যসূত্র ১. ৩. ১)। বৈশ্বদেব ও অশ্বমেধ (শ-ব্রা° ১৩. ১. ৮. ৪) যজ্ঞে অদিতি আরাধিত হইয়া থাকেন (শাঙ্খায়নগৃ° বছর ২. ১৪. ৪)। শিশুর রক্ষা ও মঙ্গলের জন্য অদিতির আবাহন করিতে হয় (ঐ, ১. ২৭. ৭)। চৌলক্রিয়ায় (আশ্ব-গৃ ১. ১৭. ৭), উপনয়নে (হিরণ্য-গৃ° ১. ১. ৪. ৬) ও আপ্রীস্তোত্রে (আপ্রী-সূক্ত, ১১) অদিতিকে আবাহন করা কর্তব্য। যজমানের অগ্নিহোত্রী গাভী বৎসংযোগের পর দোহনকালে বসিয়া পড়িলে—'উদস্থাদ্ দেব্যদিতিবায়ুর্যজ্ঞ পতাবধাৎ। ইন্দ্রায় কৃণ্বতী ভাগং মিত্রায় বরুণায় চ।'—দেবী অদিতি উঠিয়াছেন, উঠিয়া যজ্ঞপতি যজমানে আয়ু স্থাপন করিয়াছেন, ইন্দ্রকে, মিত্রকে ও বরুণকে আপনার কন্যা দিয়াছেন। এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া গাভীকে উঠাইতে হয় (শ-ব্রা° ১২. ৪. ১. ৯; ঐ-ব্রা° ৫. ২)।

এতভিন্ন রাজ্যাভিষেকে অদিতির আবাহন প্রয়োজন (শ-ব্রা° ৫. ৩. ৫. ৩৭) পত্নীরক্ষার জন্য, অথবা দীর্ঘায়ু লাভের জন্যও অদিতিকে আহ্বান করা হয় (অ° ৯. ১১)।

পূর্ণাহুতি দিয়া অগ্ন্যাধেয় সমাপ্ত হয়। ইহার পর মৃদুস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অগ্নিহোত্র করিতে হয়। অগ্ন্যাধেয়ের ন্যূনকল্পে ১২ দিন পরে তিনটি ইষ্টি করিতে হয়। প্রথম ইষ্টি অগ্নিপবমানের উদ্দেশে, দ্বিতীয় ইষ্টি অগ্নিপবমান ও অগ্নিশুচির জন্য। তৃতীয় ইষ্টিতে অদিতির জন্য সিদ্ধান্নের পূর্ণপাত্র দিতে হয় (শ-ব্রা° ২. ২. ১০. ৬ ; SBE, 304n.) ইহার ফলশ্রুতি এই যে এই হবির্দ্বারা এই লোক হইতে যজমান ঊর্ধ্বলোকে সমারোহণ করে—'প্রচ্যবত ইব বা এসো স্মাল্লোকাৎ—ইমান্ হি লোকান্ সমারোহন্নোতি'। যেহেতু অদিতি এই পৃথিবী আর যজমান ইহাতে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হয়। অদিতির জন্য দুইটি সংযাজ্যাতে বিরাজ অথবা ত্রিষ্টভ্ বা জগতীছন্দের প্রয়োজন। কারণ ইহারা প্রত্যেকেই পৃথিবী। তথাপি বিরাজের বৈশিষ্ট্যহেতু বিরাজই হইবে। শাঙ্খায়ন ১৬. ১০. ১ পুরুষমেধযজ্ঞের পর এক বৎসর ধরিয়া অনুমতি, পথ্যাস্বস্তি ও অদিতিকে হবির্দান করিতে হয়।

প্রায়ণেষ্টিতে অদিতির জন্য চরুর বিধি। দেবতারা পৃথিবীতে যজ্ঞ করিবার সময় অদিতিকে যজ্ঞ হইতে বাদ দিয়াছিল। অদিতি ইহাতে যজ্ঞ বিশৃঙ্খল করিয়া দেন। ফলে দেবগণ অদিতির উপর যজ্ঞ বিস্তার করিয়া যজ্ঞ অবগত হইলেন না। তাঁহারা যখন বুঝিলেন যে অদিতিই ইহার কারণ, তখন অদিতির জন্য প্রায়ণীয়ে চরুর ব্যবস্থা হইল। এইরূপ উদয়নীয় চরুরও অদিতির জন্য ব্যবস্থা হয় (শব্রা° ৩. ২. ১-৬)। এইরূপ করিয়া তাহারা অদিতির সাহচর্য লাভ করে ও অদিতি হয় (ঐ, ১২. ১. ৩. ২)। অমাবস্যা ইষ্টিতে অদিতিকে চরু দেওয়া হয় (ঐ, ৯. ১. ৩. ১)। সৌত্রামণী যাগ ও তৃতীয় সাংবৎসর যাগে অদিতির জন্য চরু। দশ-

পেয়যাগে (প্রযুঙ্গাম্ হবীংষি) ছয়টি চরু দিতে হয়—একটি সরস্বতীর জন্য, একটি পূষার জন্য, মিত্র, ক্ষেত্রপতি, বরুণ ও অদিতির জন্য একটি। অদিতির জন্য একটি মঞ্জিষ্ঠা গাভী (বৎস-সমেত) ধরিয়া রাখা হয়। ইহা অদিতির জন্য বলি (৫. ৫. ২. ৭-৮)। সোমোৎসবে অদিতির জন্য প্রায়ণীয় হবিঃ।

পুরাণে অদিতি—মহাভারত-মতে অদিতি প্রাচেতস দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। দ্বাদশ আদিত্য অদিতির পুত্র (১. ৬৬. ১২)। বিবস্বান হইতে অদিতির উৎপত্তি হইয়াছে (১. ৬৩. ৪)।

অদিতি দেবতাদিগের মাতা (মহা° ৯. ৪৫. ১৩); বিশেষত তিনি তেত্রিশ দেবতার মাতা (রা° ৩. ১৪. ১৪)। এতদ্ব্যতীত পবন, মারুত (মহা° ১২. ৩২৯. ৫৯) প্রভৃতি তাঁহার সন্তান। রামায়ণে (২. ৯২. ২১) ধাতা তাঁহার পুত্র। আবার মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে ইন্দ্র সর্বপ্রধান ও প্রিয়তম। ইন্দ্র যখনই বাহিরে অবস্থান করিতেন অদিতি তাঁহার জন্য উদ্গ্রীব থাকিতেন। মহাভারতে (৩. ২৩০. ২৯) তিনি রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রেবতীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। রামায়ণে (৪. ১. ২০) তাঁহার গর্ভকে রাবণের গোপন আশ্রয় স্থল বলা হইয়াছে। কিন্তু কল্যাণী মাতৃত্বের দেবীরূপেই ইনি সমধিক পরিচিতা। এই মাতৃত্বের বশেই তিনি দেবতাদের জয়লাভের জন্য হিমবৎ-পর্বতে বিনশন শিখরে রন্ধন করিয়াছিলেন এবং রন্ধন করিবার সময় আপনার কর্ণাভরণ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন; এই কর্ণাভরণ নরকের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া সূর্যদেবকে দেওয়া হয় (মহা° ৩. ১৩৫. ৩; ৩০৭. ২১)। অসুরদিগের জনপদ প্রাগ্-জ্যোতিষে নরক ভৌম তাঁহার কর্ণকুণ্ডল রাখিয়াছিলেন। নাগগণ এই কর্ণকুণ্ডল চুরি করে এবং তাহাদিগের নিকট হইতেই নরক ভৌম তাহা লাভ করে। কর্ণের মৃত্যু হইলে অদিতি

সূর্যকে তাঁহার কর্ণকুণ্ডল দান করিয়াছিলেন (মহা° ৩. ৩০৭. ১৮ ই°)।

পুনর্বসুর উপরে অদিতির অধিষ্ঠান (ঝা° ১. ১৮. ৮)। দেবতাদের মাতৃরূপেই তিনি অসুরকুলের মাতা দিতির নিকট বাধাপ্রাপ্ত হন। দিতি ও অদিতি উভয়েই কশ্যপের পত্নী। তপশ্চর্যার জন্য অদিতি ব্রাহ্মণের নিকট আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন (মহা° ১৩. ৮৩. ২৭)। বিভিন্ন পুরাণে তাঁহার পুত্র আদিত্যগণ সংখ্যায় একাদশ হইতে ত্রয়োদশ জন। তবে মহাভারত মতে আদিত্যগণের সংখ্যা দ্বাদশ (৩. ১৩৪. ১৯)। ইঁহারা কশ্যপ প্রজাপতি মারীচের ঔরসে অদিতি-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই যোদ্ধা। ইন্দ্র ইঁহাদিগের মধ্যে প্রধান এবং বিষ্ণুকেও ইঁহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যত্র দেখা যায়, ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকারী বলিরাজকে হত্যা করিবার জন্য তিনি বিষ্ণুর প্রজনন করিয়াছিলেন।

মহাভারতে (১২. ৩২৮. ৫৩) বিশ্বে ব্যাপ্ত পবন অদিতির পুত্ররূপে কথিত আছে। বসু ও রুদ্রগণও তাঁহার পুত্র। পৃথিবী, পর্বতসমূহ পৃথিবীর কর্ণকুণ্ডল। বিষ্ণু পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে কশ্যপ তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য পৃথিবীর নাম হয় কাশ্যপী (মহা° ১২. ৪৯. ৭১ ই°) আবার হরিবংশে (অদিতিকে দুর্গা হইতে অভিন্ন প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এখানেই দেখা যায়, অদিতি দেবতাদিগের নিকট মাতৃরূপা, কৃষকদিগের নিকট সীতা, এবং ভূতদিগের নিকট পৃথিবী বা ধরণী। হ্রী, শ্রীপ্রভৃতি তাঁহারই নামান্তর।

পূর্বোল্লিখিত কুণ্ডল-সংক্রান্ত ব্যাপারের অন্যান্য পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি নরকাসুর অদিতির অমৃতস্রাবী কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিলে (বিষ্ণুপু° ৫. ২৯. ২১) শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া (ঐ, ৫.

২৯. ২০-২১) কুণ্ডলদ্বয় অদিতিকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য সত্যভামার সহিত স্বর্গে গমন করিলেন (ঐ, ৫. ১৯. ৫৫) ইন্দ্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণ অদিতির নিকট গমন করিয়া ঐ কুণ্ডলদ্বয় তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করিলেন (ঐ, ৫. ৩০. ৪)। ইন্দ্র অদিতির পুত্র (ঐ, ৫. ২৯. ১১)।

পুরাকালে কশ্যপ বরুণের গাভী অপহরণ করিয়াছিলেন। কশ্যপের দুই পত্নী ছিলেন—নাম অদিতি ও সুরভি (হরি° হরি. ৫৫. ২১-২২)। ব্রহ্মার শাপে অদিতি শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকীরূপে, সুরভি রোহিণীরূপে এবং কশ্যপ বসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করেন (হরি° হরি. ৫৫. ৩৫. ৩৮)।

অগ্নিপুরাণে (৪. ১-১১) বৈবস্বত মন্বন্তরে বিষ্ণুর অবতার বামন কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। ইনি বলিরাজকে বঞ্চনা করেন। ভাগবতে (২. ৭. ১৭) এবং বিষ্ণুপুরাণেও (৩. ১. ৪৩) এই একই কথা আছে।

মার্তণ্ডদেব (সূর্য) কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। অদিতির পুত্র দেবগণকে দৈত্যগণ কর্তৃক নির্যাতিত হইতে দেখিয়া অদিতি সূর্যের আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া সূর্যদেব অদিতিকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে অদিতি সূর্যকে তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে বলিলেন। যথাসময়ে গর্ভবতী অদিতি কঠোর ব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে কশ্যপ গর্ভ নষ্টের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন; ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এক অণ্ড প্রসব করেন। কশ্যপ ইহাকে মৃত অণ্ড মনে করেন। সেইজন্য এই অণ্ড হইতে প্রসূত সন্তান মার্তণ্ড নামে খ্যাত হইলেন (ব্রহ্মপু° ৩২. ১০-৪০)।

কশ্যপ দক্ষকন্যা সুরভিকে বিবাহ করেন। অদিতিও কশ্যপের পত্নী। কশ্যপের অপর পত্নীদের নাম দিতি, দনু, কালা, অরিষ্টা, সুরসা, খশা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা,

ইরা, কদ্রু এবং মুনি (বিষ্ণুপু° ১. ১৫. ১২৫-২৬ ; মৎস্যপু° ৭. ১-২)।

অদিতি—দক্ষকন্যা। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের উৎপত্তি হইলে পুনর্বার ব্রহ্মার বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের ভার্যা উৎপন্ন হইলেন ; তাহা হইতে অদিতি, দিতি, কালা, অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, প্রাধা, ক্রোধা, সুরভি, বিনতা, সুরসা, দনু ও কদ্রু নামে কন্যাগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল কন্যাকেই কশ্যপ বিবাহ করেন (হরি° ভবিষ্য. ৩৬. ২০-২৩)। অদিতির গর্ভে অর্যমা, বরুণ, মিত্র, পূষা, ধাতা, পুরন্দর, ত্বষ্টা, ভগ, অংশু, সবিতা ও পর্জন্য জন্মগ্রহণ করেন (ঐ, ৩৬. ৩০-৩. ১)।

পুরাণোক্ত এই সমস্ত আখ্যায়িকা ব্যতীত—দেবী-ভাগবত (৪. ৩), স্কন্দ, কালিকা (২৬. ২৮), ব্রহ্মাণ্ড (৬৬. ৬০-৬৭) প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে অদিতি সম্বন্ধে কোন কোন আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। বামনপুরাণ (২৮. ১২-১৩) যে ভাবে অদিতির ব্যাখ্যা করিয়াছে তাহাতে অদিতিকে রূপক বলিয়াই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অদিতি ভগবান্‌কে বলিলেন, 'হে কেশব, আমি তোমাকে উদরে বহন করিতে সমর্থ হইব না। কেন না, তুমি সমুদয় বিশ্বের উদ্ভব ক্ষেত্র ও সকলের ঈশ্বর। তোমাতে সমস্ত সংসার প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—'অহঞ্চ ত্বাং বহিষ্যামি স্বাত্মানং চৈব নন্দিনি। ন চ পীড়াং করিষ্যামি স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্।'

অদিতি সম্বন্ধে কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন। অধ্যাপক পিশেল অদিতির পৃথিবী অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন (Ved. Stud., ii. 86)। পরবর্তী ব্রাহ্মণাদি বৈদিক সাহিত্য পিশেলের মতের সমর্থন আছে। কিন্তু ঋগ্বেদের সহিত এই অর্থের ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই। হিলে-ব্রান্ড্‌ট (Ved. Myth, iii, 408f ; তু° ঋ° ১. ১১৫. ৫) ও রোট

(ZDMG, vi, 68ff) প্রায় এপরূপ মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে অদিতির অর্থ দ্যুলোকের প্রকাশাভ্যন্তরে অবস্থিত 'অনন্ত বা অনন্তত্ব'। দ্যুলোক ও প্রকাশের সহিত অদিতির সম্বন্ধ। তাঁহারা অদিতিকে অবিনাশী দিবালোকরূপে ব্যাখ্যা করেন। কোলিনে (Trans. 9th. Or. Congress, i. 396-410 ; Musem, xii. 81-90) প্রায় অনুরূপ মতাবলম্বী—তিনি অদিতিকে গগনের প্রকাশ (light of the sky) বলিয়াছেন। বেরগেনের মতে (SBE, xxxii. 241) 'দ্যৌরদিতি'-র পরিণতিতে অদিতির দেবীত্ব হইয়াছে। এই অদিতি অসীম আকাশরূপে দেবগণকে পীযূষ যোগাইয়া থাকেন। এই মতবাদে তিনি প্রকাশের (light) অবিনাশিত্বের উপরই মর্যাদাসম্পন্ন। ম্যাক্সমূলর (Rel. ved. iii, 88-98) বলেন অদিতি অসীম আকাশরূপে দৃশ্যমান অনন্ত প্রকৃতি। তিনি অদিতির অর্থ করিয়াছেন 'পৃথ্বী'; মেঘমণ্ডল ও আকাশ—প্রত্যক্ষগোচর অসীম ও অনন্ত শূন্যস্থান। এইরূপ অর্থও করিয়াছেন। তাঁহার নিজের উক্তি এইরূপ—"Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the infinite,...the visible infinite, visible, as it were, to the naked eye, the endless expanse beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky"—Ved. Hymns, 241. ডক্টর মুয়ের ঋ° ২. ৮৬. ১০ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অদিতির অর্থ 'সৃষ্টির সর্বাত্মকত্ব' অথবা 'তদ্রূপ দেবতা' করিয়াছেন ('a personification of universal, all embracing Nature or Being'—OST, v. 37)। গ্রিফিথ যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে অদিতি বলিতে 'অনন্ত বা অনন্তত্ব' বুঝায়। ঋগ্বেদের 'কস্য ন্যূনম্'...ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ করিবার সময় ম্যাক্সমুলর প্রমুখ পণ্ডিতগণ অদিতি অর্থে 'অসীম অথবা দৃশ্যমান অনন্ত শূন্যস্থান' না বুঝিয়া 'মুক্তি বা মুক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা' বুঝিয়াছেন। ওয়ালিস

(Cosmology, 45ff ; তু° von Schroeder, Arische Religion, ii. 400) ও ওল্‌ডেন্‌বার্গ (Rel. des veda, 202ff ; SBE, xlvi, 329) অদিতির অর্থ করিয়াছেন 'বন্ধন হইতে মুক্তি' (freedom from bondge), গেল্‌ডনর (Zur Kosmogonie des Rv., 5) বলেন, অদিতি অর্থে 'অখণ্ডত্ব' (undividedness) 'সম্পূর্ণত্ব' (completeness) বুঝায়। এই সমস্ত অর্থ কতদূর সুসঙ্গত তাহা অনুসন্ধেয়।

অদিতি যে সম্পূর্ণ রূপক, ইহাও কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমে অদিতি বলিলে কোন ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইত না। ক্রমশ ঋষিগণ-কর্তৃক তাহা অন্তরীক্ষ স্থানে প্রযুক্ত হইল। এইরূপে অদিতি ক্রমে দেবীত্বে পরিণত হয়।

শুনঃশেপ-ঘটিত আখ্যানে অদিতির 'পৃথিবী' অর্থে কেহ কেহ আপত্তি করেন। পণ্ডিত কৃষ্ণশাস্ত্রী ঘুলে শুনঃশেপ সম্পর্কিত মন্ত্রে 'পৃথিবী' যে অর্থ ভুল তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঋগ্বেদে পিতামাতার অর্থ 'দ্যাবাপৃথিবী'। উদাহরণ স্বরূপ তিনি ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন— 'পিতা মাতা চ ভুবনানি রক্ষতঃ'। —ঋ° ১. ১৬০. ২ ; 'দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্। তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎসমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরং চ'। — ঋ° ১০. ৮৮. ১৫।'; 'দৌর্বঃ পিতা পৃথিবী মাতা।' —ঋ° ১. ১৯১. ৬ ; 'দ্যৌঃষ্পিতঃ পৃথিবী মাতঃ'— ঋ° ৬. ৫১. ৫ ; 'আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রযন্ত্স্বঃ।'—ঋ° ১০. ১৮৯. ১। ঘুলে মহাশয় বলেন, শুনঃশেপ যে পিতৃ-কর্তৃক যূপে আবদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার নিকট যাইবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইবেন কেন? তাঁহার মাতাও তাঁহার এই দুর্দশার কারণ। আর পৃথিবীর উপরে থাকিয়া তাঁহাকেই বা তিনি চাহিবেন কেন? সুতরাং অদিতির 'পৃথিবী' অর্থ ভুল। তিনি বলেন 'অদিতি'র অর্থ

'উত্তরখগোলার্ধ' এবং দিতির অর্থ 'অধঃখগোলার্ধ'।—'দিতি ঔর অদিতি' (গঙ্গা, ১৯৩২, জানু. পৃ° ৯৫-১০৪)।

[A.A. Macdonell : Vedic Mythology ; A.B Keith : The Rel. and Phl. of the Veda and Upanishads, 1925, 215-19 ; Hopkins : JAOS, 17, 91 ; Vedic Hymns, SBE, 32, 241 ; Hilebrandt ; Aditi, 20 এবং নিবন্ধে প্রদত্ত নির্দেশ]

৪

ঋষি অত্রি

অত্রি ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদে অন্যূন চল্লিশবার এক বচনে 'অত্রি' এবং অত্রিবংশীয় ঋষিগণ অর্থে বহুবচনে 'অত্রয়ঃ পদের উল্লেখ আছে। অগ্নি, ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয় ও বিশ্বেদেবগণের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের বহু সূক্ত মহর্ষি অত্রি কর্তৃক ঈরিত। মনুর ন্যায় অত্রিও লোকপিতৃগণের অন্যতম বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন।—ঋ° ১. ৩৯. ৯। মহর্ষি অত্রি বৈদিক পঞ্চজাতির ('পঞ্চজনে'র) অন্তর্গত ছিলেন। —ঋ° ১. ১১৭. ৩।

অত্রি শব্দের নিরুক্তি—ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (৩. ১৩. ১০) একটি আখ্যায়িকা আছে—দেবগণ প্রজাপতির রেতঃ অগ্নিদ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেনম…রুতেরা তাহা কম্পিত করিয়াছিলেন। অগ্নি বৈশ্বানর তাহা কঠিন করিয়াছিলেন। সেই রেতোমধ্যে যে অংশ প্রথমে উদ্দীপ্ত হইল তাহাই আদিত্য হইল। দ্বিতীয় যে অংশ ছিল, তাহা ভৃগু হইল। বরুণ সেই ভৃগুকে গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য তিনি বারুণি ভৃগু। যে তৃতীয় অংশ দীপ্তি পাইয়াছিল, তাহা আদিত্য হইল। অবশিষ্ট সমস্ত দগ্ধ হইয়া অঙ্গার হইয়াছিল। তাহা হইতে অঙ্গিরোগণ হইলেন। ইত্যাদি। ইহারই অনুরূপ একটি আখ্যায়িকা শতপথ-ব্রাহ্মণে (১. ৪. ৫. ১৩) অত্রির উৎপত্তি সম্বন্ধে পাওয়া যায়। 'তদ্ধৈতদ্দেবাঃ। রেতঃ (বাচঃ সকাশাৎ পতিতং গর্ভং) চর্মন্বা যস্মিন্ বা বভ্রুস্তব্ধ স্ম পৃচ্ছন্ত্যত্রেব ত্যাঽদিতি ততোঽত্রিঃ সম্বভূবঃ।'—শ-ব্রা° ১. ৪. ৫. ১৩। যাস্ক (নি° ৩. ১৭) এই দুইটি আখ্যায়িকা জুড়িয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, অগ্নির অর্চি হইতে প্রথমে ভৃগু উদ্ভূত হন। তারপর অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং তৃতীয়ত সেই একই স্থান হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইলেন।—'অত্রৈব তৃতীয়মৃচ্ছতীত্যূচুস্তস্মাদত্রিঃ, ন ত্রয় ইতি'।—নি° ৩, ১৭ (শ-ব্রা°

অত্রেব ত্যদিতি—১. ৪. ৫. ১৩)। যাস্কের এই ব্যুৎপত্তি হইতে কেহ কেহ অত্রির অর্থ করিয়াছেন—'অত্রয়ঃ ত্রিভিঃ কামক্রোধলোভ-দোষৈঃ রহিতাঃ' অথবা 'অবিদ্যমানত্রিবিধদুঃখাঃ'। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—'আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকভেদভিন্নাস্ত্রিবিধা দুঃখানুভবা যস্য ন বিদ্যতে সঃ'। যাস্ক অত্রির অন্য অর্থও করিয়াছেন—'অত্রিমগ্নিরন্তরৌষধিবনস্পতিষ্বপ্‌সু তম্'—নি° ৬. ৩৬। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৪. ৫. ২. ২) অন্যত্র 'যিনি অন্নভক্ষণ করেন তাঁহাকে অত্রি' বলা হইয়াছে।—'বাগেবাত্রির্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হ বৈ নামৈতদ্যদত্রিরিতি'। সম্ভবত এই অর্থ প্রতিপাদন করিবার জন্য কেহ কেহ √অদ্+ঔণাদিক ত্রিপ্ প্রত্যয় করিয়া অত্রি শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন ['অদেস্ত্রিনিশ্চ'—উণা° ৬. ৬৬। অত্র চকারাৎ ত্রিবন্নুবর্ততে। তেনাদ্‌ধাতোস্ত্রিপ্]। বিশ্ববন্ধু শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতও এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ঋগ্বেদেও একবার মাত্র (২. ৮. ৫) এই অর্থের দ্যোতনা দেখিতে পাওয়া যায়।

'অত্রিমনু স্বরাজ্যমগ্নিমুক্থানি বাবৃধুঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়ো দধে॥'

অর্থাৎ শত্রুদিগের বিনাশক এবং স্বয়ং শোভমান অগ্নির উদ্দেশে উক্থ সকল বর্ধিত হইয়াছে। অগ্নি সমস্ত শোভা ধারণ করিয়াছেন। এখানে অগ্নি শব্দের বিশেষণরূপে 'অত্রি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই জন্য কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, অত্রি শব্দটি হব্যভুক্ অর্থে অগ্নিকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। পরে ইহাতে ঋষিত্ব আরোপিত হইয়াছে। এই অনুমান সমর্থনযোগ্য নয়। অত্রি শব্দের অর্থ হব্যভুক্ হইতে পারে এবং অশ্বিদ্বয় কর্তৃক শতদ্বার যন্ত্রগৃহ হইতে অত্রির উদ্ধার (৭. ৭৮. ৪; ১০. ৮০. ৩) কাল্পনিক রূপক হইতে পারে। তাই বলিয়া ইহা যে কোন ঋষিবিশেষের নাম হইতে পারে না, এ কথা স্বীকার করা যায় না। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলীর কয়েকটি সূক্তের ঋষি স্বয়ং অত্রি এবং এই মণ্ডলের

অপর সকল সূক্তের ঋষি তাঁহার কোন না কোন অপত্য। অত্রির কন্যা অপালা ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের অন্যতম উদ্দিষ্টা। অত্রি যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশেষত অগস্ত্য ঋষির ন্যায় অত্রির কার্যও যে বহু স্থানব্যাপক, সে সম্বন্ধেও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত তাঁহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে চীনদেশেও অত্রির উল্লেখ পাওয়া যায়।

হিন্দুর ধর্মগ্রন্থাদি ভারতীয় ইতিবৃত্তের প্রধান উপাদান। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে অত্রির কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অত্রি বা অগস্ত্য রামায়ণ অথবা মহাভারতের সময় পর্যন্ত বর্তমান থাকিতে পারেন না বলিয়া অনেকে অত্রি অথবা অগস্ত্যের আখ্যানগুলিকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। কিন্তু গোত্র-পিতার নামে সেই সেই বংশীয় প্রধান পুরুষগণের পরিচয় দেওয়ার প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান ছিল, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহু প্রমাণ পাইয়াছেন।

ঋগ্বেদে অত্রি—অত্রি ঋষিকে অসুরগণ মায়াদ্বারা রচিত শতদ্বার যন্ত্রগৃহে আবদ্ধ করিয়া তাহাতে তুষের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। অত্রি সেই সময়ে অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করিয়াছিলেন এবং অশ্বিদ্বয়ও তাঁহাকে সেই স্থান হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন (ঋ° ১. ১১৭. ৩; ১. ১১৬. ৮; ১. ১১২. ৭; ৫. ৭৮. ৪; ১০. ৮০. ৩)। ইন্দ্রও অত্রিকে পথ দেখাইয়া দস্যুদিগের মায়া হইতে উদ্ধার করেন (ঐ, ১. ৫১. ৩; ৮. ৩৬. ৬)। অশ্বিদ্বয় অত্রিকে পাপ ও অন্ধকার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন (ঐ, ৭. ৭১. ৫)। যুদ্ধের সময় অত্রি, ভরদ্বাজ, কণ্ব প্রভৃতি ঋষিকে অগ্নি রক্ষা করিয়াছিলেন (ঐ, ১০. ১৫০. ৫)। অশ্বিদ্বয় হিমদ্বারা দীপ্যমান অগ্নি নিবারণ করিয়া তাঁহাকে অন্নযুক্ত বলপ্রদ খাদ্য দিয়াছিলেন (ঐ, ১. ১১৬. ৮)।

অশ্বিদ্বয় অত্রিকে পথ দেখাইয়াছিলেন (ঐ, ১. ১১২. ১৬)। অত্রির অপত্য সপ্তবধ্রি ঋষিকে অশ্বিদ্বয় তাঁহার ভ্রাতৃব্যগণ-কর্তৃক বদ্ধ পেটিকা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন (ঐ, ৫. ৭৮. ৫-৯)। অশ্বিদ্বয়-কর্তৃক অত্রির জন্য রক্ষাগৃহ নির্মিত হইয়াছিল ; সপ্তবধ্রির কথা ঋগ্বেদের অন্যত্রও পাওয়া যায় (ঐ, ৮. ৭০. ৯ ; ১০. ৩৯. ৯)। ঋগ্বেদের এক স্থলে (১. ১১২. ৭) অশ্বিদ্বয়ের স্তুতিতে বলা হইয়াছে—

'যাভিঃ শুচন্তিং ধনসাং সুষংসদং
তপ্তং ঘর্মমোম্যাবন্তমত্রয়ে।'

অর্থাৎ, যে সকল উপায় দ্বারা শুচন্তিকে ধনবান ও শোভনীয় গৃহসম্পন্ন করিয়াছিলেন, সে সকল উপায় দ্বারা অত্রির জন্য গাত্র দাহকারী উত্তাপও সুখকর করিয়াছিলেন···ইত্যাদি।

সায়ণ তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—অসুরগণ অত্রিকে শতদ্বার যন্ত্রগৃহে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পীড়া দিবার জন্য অগ্নি জ্বালাইয়াছিল, অশ্বিদ্বয় শীতল জলদ্বারা সে অগ্নি নিবাইয়াছিলেন। যাস্ক এই উপাখ্যানটি উপমামাত্র মনে করেন। অত্রি অর্থে অগ্নি (অদ্ ধাতু ভক্ষণে, হব্যভুক্)। সূর্যকিরণতপ্ত গ্রীষ্মকালে অগ্নির ক্ষুধা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে বর্ষাকালের বৃষ্টির দ্বারা পুনরায় উত্তেজিত হয়।

অন্যত্র আছে (ঐ, ১০. ১৪৩. ১-৩), অত্রি ঋষি যজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন এবং অশ্বিদ্বয় তাহাকে পুনর্যৌবন দান করেন।

'ত্যং চিদাত্রিমৃতজুরমর্থমশ্বং ন যাতবে।
কক্ষীবন্তং যদী পুনা রথং ন কৃণুথো ন বং ॥'১
'ত্যং চিদশ্বং ন বাজিনমরেণবো যমত্নত।
দৃঢ় গ্রন্থিং ন বিষ্যতমত্রিং যবিষ্ঠমা রজঃ ॥'২॥—১০.১৪৩।

অর্থাৎ হে অশ্বিদ্বয়! অত্রি ঋষি যজ্ঞ করিয়া বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে তোমরা এরূপ করিলে যে, তিনি ঘোটকের ন্যায় গন্তব্যস্থানে গেলেন। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয় ; তদ্রূপ তোমরা কক্ষীবান্ ঋষিকে নবযৌবন প্রদান করিলে।

প্রবলপরাক্রান্ত শত্রুরা অত্রিকে শীঘ্রগামী ঘোটকের ন্যায় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। যেরূপ দৃঢ়তর গ্রন্থি খুলিয়া দেয়, তদ্রূপ তোমরা অত্রিকে মোচন করিলে, তিনি যুবা পুরুষের ন্যায় পৃথিবী অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৪০ সূক্তে দেখা যায়, অত্রি মহাতেজস্বী ঋষি ছিলেন। স্বর্ভানু নামক দৈত্যের দ্বারা চন্দ্র-সূর্য আচ্ছন্ন হইলে তিনি নিজের জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার দূর করেন ও চন্দ্র ও সূর্যকে স্বস্থানে স্থাপন করেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৪. ৩. ৪. ১১) ও অথর্ব-বেদেও (১৩. ২. ৪. ১২-৩৬) ইহার উল্লেখ আছে। বেদে রাহুর কথা নাই; পরন্তু পুরাণে স্বর্ভানু রাহুর একটি নাম। সুতরাং উক্ত সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণেরই কথা বলা হইয়াছে।

অত্রি বলিতেছেন—হে সূর্য! যখন অসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল, নিজ স্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভুবনও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল।

হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা কার্যবিঘাতক অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করিলেন।

[সূর্য বলিতেছেন] হে অত্রি! আমি তোমার আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশত ভীষণ অন্ধকার দ্বারা আমাকে গ্রাস না করে, তুমি মিত্র ও সত্যপরায়ণ; তুমি ও রাজা বরুণ উভয়ে আমাকে রক্ষা কর।

তখন সেই ঋত্বিক্ (অত্রি) সূর্যকে উপদেশ দিয়া প্রস্তরখণ্ডের ঘর্ষণ করিয়া এবং স্তোত্র দ্বারা দেবগণকে পূজা করিয়া, মন্ত্র প্রভাবে অন্তরীক্ষে সূর্যের চক্ষু সংস্থাপিত করিলেন—তিনি স্বর্ভানুর সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত করিলেন।

অসুর স্বর্ভানু অন্ধকারদ্বারা সূর্যকে আবৃত করিলে অত্রির পুত্রগণই

অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, অন্য কেহ তাহাতে সমর্থ হন নাই।—ঋ° ৫. ৪০. ৫-৯।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, চন্দ্র অথবা সূর্য গ্রহণকালে কোনরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত বা সূক্তদ্বারা ইন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি দেবগণকে আহ্বান করা হইত। অত্রিই এই সূক্তের ঋষি। অত্রি ও অত্রিপুত্রগণই এই সূক্তের দ্রষ্টা বলিয়া স্বর্ভানুর (রাহুর) মায়া হইতে তাঁহাদিগের দ্বারা সূর্য ও চন্দ্রকে মুক্ত করিবার কথা ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে।

শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখা যায়, অত্রি 'বাক্' হইতে উৎপন্ন (১. ৪. ৫. ১৩) এবং অত্রি ও বাক্ অভিন্ন (১৪. ৫. ২. ৫)।

রামায়ণ ও মহাভারতে অত্রি—রামায়ণে অত্রি সপ্তর্ষির (সপ্ত নক্ষত্র) অন্যতম, এবং অগ্নিকে সেখানে উত্তর গগনে অবস্থিত বলা হইয়াছে (রা° ৬. ১. ২ ই°)। তিনি অন্যতম মহর্ষি (মহা° ৩. ২৮১. ১৪; ৫. ১১৬. ৪৬; ১৩. ৬. ৩৭)। আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ঋষিবংশের সহিত আত্রেয় বংশেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (মহা° ৩. ২৬. ৭)। অত্রিকে এক স্থানে উশনার (শুক্রের) পুত্র বলা হইয়াছে। (মহা° ১. ৬৫. ৩৬; ৬৬. ৪১ ই°)। দুর্বাসা মুনি অগ্নির পুত্র বলিয়া উল্লিখিত (রা° ১. ২৫. ২১) কুবেরের সপ্তর্ষির মধ্যে অগ্নি একজন (মহা° ৫. ১১১. ১৪; ১৩. ১৫১. ৩৮)। তিনি অত্রিকে ব্রহ্মার পুত্রও বলা হইয়াছে (ঐ. ১৩. ৬৫. ১)। তিনি সোমের (চন্দ্রের) পিতা, এজন্য তাঁহাকে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ বলা হয় (ঐ, ৭. ১৪৪. ৪ ই°; ১২. ২০৮. ৯; ১৩. ১৫৫. ১২)। তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের অন্যতম (রা° ১. ৫. ৯)। সূর্য অস্ত গেলে যে সপ্তর্ষি পৃথিবী আলোকিত করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অত্রি একজন (মহা° ১২. ৩৩৬. ২৭ ই°; ১. ১২৩. ৫০; হরি° হরি. ৭. ৭-৮)। অত্রি হইতে অগ্নির উৎপত্তি (মহা° ৩. ২২২. ২৮)। অগ্নি নিমি রাজার পুরোহিত ছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম নিমিকে

পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা দেন (ঐ, ১৩. ৯১. ২০)। রাহু শরদ্বারা সূর্য ও চন্দ্রকে বিদ্ধ করিলে অত্রি সূর্য ও চন্দ্র হইয়া আলোক দান করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন (ঐ, ১৩. ১৫৭. ৮ ই°)। তিনি সমুদ্রতল পাইবার জন্য শতবর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করেন (ঐ, ১. ২১, ১৩)। দেহতত্ত্বে তিনি পারদর্শী ছিলেন (ঐ, ১২. ২১৪. ২৩)।

অত্রি ঋষি কুলপতি। পত্নী অনসূয়ার অনুরোধে তিনি বেণপুত্র পৃথুর যজ্ঞে গমন করেন। তিনি রাজাকে 'ঈশ্বরস্বরূপ' বলিয়া আশীর্বাদ উচ্চারণ করিলে গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠেন। সনৎকুমার সেই বিরোধের মীমাংসা করেন। পৃথু অত্রিকে ১৬ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও দশভার রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রগণকে তাহা অর্পণ করিয়া উত্তরে তপস্যার্থ গমন করেন। অগ্নিপত্নী অনসূয়া বিশেষ তপঃসম্পন্না রমণী ছিলেন। অনাবৃষ্টির সময়ে তিনি শুষ্ক গঙ্গার জল আনয়নপূর্বক পৃথিবীকে সিক্তা করেন। একবার তাঁহার কোন সখীকে মাণ্ডব্য ঋষি 'আগামী কল্য তুমি বিধবা হইবে' এই রূপ অভিশাপ দেন। অনসূয়া এই অভিশাপ ব্যর্থ করিবার জন্য এক রাত্রিকে দশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ করিয়া সে অভিশাপ ব্যর্থ করেন (রা° ২. ১১৭. ১১)। বনবাস কালে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশকালে রামচন্দ্র অত্রির আশ্রমে গমন করিলে অনসূয়া সীতাকে পাতিব্রত্য-ধর্মে উপদেশ দিয়া দিব্য মালা, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ ও অত্যাশ্চর্য অঙ্গরাগ অনুলেপন দিয়াছিলেন (রা° ১. ১১৮)।

পুরাণে অত্রি—কূর্মপু° (পূ° ২. ২২-২৪) মতে পিতামহ ব্রহ্মা যোগবিদ্যাপ্রভাবে মরীচি, ভৃগু, অত্রি প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী সাধক, ব্রাহ্মণোত্তম ব্রাহ্মণদিগকে সৃষ্টি করেন। এজন্য অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া কথিত (লিঙ্গপু° পূ° ৫. ৯-১০)। ব্রহ্মাণ্ডপু° (৯. ৯৫) মতে ব্রহ্মার কর্ণ হইতে অত্রির জন্ম। আবার ভাগবতে (৩. ২২. ২১-২৪) দেখা যায়, ব্রহ্মার নেত্র হইতে অত্রি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন

এবং তিনি দশজন প্রজাপতির অন্যতম। ব্রহ্মাণ্ডপু° (৯. ৬৩-৬৫) ও পদ্মপু° (সৃ° ৩. ১৬৬-৬৮)-এ ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ 'নবব্রহ্মা' নামে উল্লিখিত। অত্রিপত্নী অনসূয়া দক্ষের কন্যা (কূর্মপু° পূ° ৮. ১৯-২০; ব্রহ্মাণ্ডপু° ১০. ২৬-৩২)। কূর্মপু° (পূ° ১৩. ৭-৮) মতে অনুসূয়ার গর্ভে অত্রির সোম, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয় নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু লিঙ্গপু° (পূ° ৫. ৩৪-৫০) এবং ব্রহ্মাণ্ডপু° (২৮. ২০-২১) মতে অত্রি ও অনুসূয়ার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। কন্যার নাম শ্রুতি। লিঙ্গপু°-তে পাঁচ পুত্র—ভব্য, মূর্তি, মন্দচারী, অপ ও সোম এবং ব্রহ্মাণ্ডপু°-তে পাঁচ পুত্র—সত্যানেত্র, হব্য, আপোমূর্তি, শনীশ্বর ও সোম। ব্রহ্মাণ্ডপু°-এ (২৮. ২০) শ্রুতি শঙ্খপাদের মাতা ও প্রজাপতি কর্দমের পত্নী। ঘৃতাচীর গর্ভে বেদবেদাঙ্গনিরত স্বস্ত্যাত্রেয় প্রভৃতি পুত্রগণের জন্ম হইয়াছিল (কূর্মপু° পূ° ১৭. ১৮-১৯)। অন্যত্র ভদ্রার গর্ভে অত্রিপুত্র সোমের জন্ম; অন্যান্য পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ স্বস্ত্যাত্রেয় নামে প্রখ্যাত তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দত্ত ও কনিষ্ঠ দুর্বাসা। ব্রহ্মবাদিনী আমলা অত্রির কন্যা, ইনি সর্বকনিষ্ঠা। অত্রির দুই গোত্রের মধ্যে শ্যাব, প্রত্নস, বরস্ত এবং গহ্বর এই চারিজন ভূমণ্ডলে প্রথিত। আত্রেয়দিগের এই চারি প্রকারভেদ। অত্রি প্রভাকর বলিয়া কীর্তিত। কথিত আছে, সূর্য রাহুর আক্রমণে আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। তাহাতে ত্রিলোক অন্ধকারাভিভূত হইবার উপক্রম হইলে অত্রিই জগতে প্রভা প্রবর্তিত করেন। ভূতলে পতনোন্মুখ সূর্য ব্রহ্মর্ষির শুভাশিস লাভে আর আকাশ হইতে বিচ্যুত হন নাই। এই জন্য মহর্ষিরা অত্রিকে প্রভাকর আখ্যা দিয়াছিলেন (কূর্মপু° পূ° ৬৩. ৬৮-৮২)। সপ্তম মন্বন্তরে সপ্তর্ষির অন্যতম অত্রি (ঐ, পূ° ৫০. ২৫; হরি° হরি. ৭. ৮-৯)। দ্বাদশ কলিযুগে অত্রি মহাদেবের অবতার (কূর্মপু° পূ° ৫২. ৭; লিঙ্গপু° পূ° ৭. ২১-৩৫; ২৪. ৫৫-৮)। আবার চতুর্দশ দ্বাপরে আঙ্গিরস-বংশ গৌতমের পুত্র অত্রি (বায়ুপু° ২৩. ১৫২-৫৪)।

পৃথুর যজ্ঞে অত্রির গমন ও দান গ্রহণ সম্বন্ধে আখ্যান আছে; তিনি ইন্দ্রকে যজ্ঞবিঘ্নকারী বলিয়া ভৎর্সনা করেন এবং বধ করিতে আজ্ঞা দেন (ভা° ৪. ১৯. ১০-২০)।

বৈদিক ঋষি অত্রির নামের সহিত পৌরাণিক কালে আত্রেয়গণের নাম সদৃশ থাকায় অত্রি সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অত্রি ও অত্রিবংশীয়গণ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত Pargiter মহোদয় বহু পরিশ্রম করিয়া কয়েকটি যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত উপকরণ ও যুক্তির অনুবর্তী হইয়া নিম্নে এই ব্যাপার সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য প্রদত্ত হইল।

পৌরাণিক ঋষি অত্রির নাম বহু আত্রেয়ের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। আত্রেয়গণের বংশ তালিকা ব্রহ্মাণ্ডপু° (৩. ৮. ৭৩-৮৬), বায়ুপু° (৭০. ৬৭-৭৮) ও লিঙ্গপু° (পূ° ৬৩. ৬৮-৭৮) প্রদত্ত আছে। এই বংশতালিকা ব্রহ্মপু° (১৩. ৫. ১৪) হরি° হরি. (৩১. ১৬৫৮. ১৬৬১-৮-ASB-সং)-এ উল্লিখিত বংশতালিকার অনুরূপ। মৎস্যপু° (১৯৭)-এ আত্রেয় ঋষি ও গোত্র সমূহের একটি তালিকা আছে। বংশতালিকাটি খুবই সংক্ষিপ্ত।[১] উহাতে প্রথম পৌরাণিক সোমের পিতৃরূপ অত্রির সহিত প্রভাকরের একত্ব প্রতিপাদনে অস্পষ্টতার সৃষ্টি হইয়াছে। উহাতে দেখানো হইয়াছে যে একটি ব্রাহ্মণ্য আখ্যান হইতে প্রভাকর ও স্বস্ত্যাত্রেয় নামের উৎপত্তি।

যে প্রভাকর অত্রি বা আত্রেয় নামে কথিত হন,[২] তিনি এই বংশের প্রথম আত্রেয় এবং তাহার ঐতিহাসিক অস্তিত্বও স্বীকার করা হইয়াছে। ইনি ভদ্রাশ্ব[৩] বা রৌদ্রাশ্ব[৪] ও ঘৃতাচী দশ কন্যাকে

১ কূর্মপু° ১. ১৯. ১৮-১৯-এ বর্ণনাটি অধিকতর সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট।

২ বায়ুপু° ৯৯. ১২৭।

৩ মৎস্যপু° ৪৯. ৪ ; অগ্নিপু° ২৭৭. ৩।

৪ মহা° ১. ৯৪. ৩৬৯৮ ; বায়ুপু° ৯৯. ১২৩. ৭ ; বিষ্ণুপু° ৪. ১৯. ১ ;

বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রৌদ্রাশ্ব একজন পৌরব নৃপতি। বায়ু, মৎস্য ও ভাগবত পুরাণে তাঁহার মহিষীর নাম ঘৃতাচী এবং বায়ুপু°, ব্রহ্মপু° ও হরিবংশে তাঁহার দশকন্যার ও উহাদের সহিত প্রভাকরের বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। বংশতালিকা হইতে জানা যায়, প্রভাকরের পুত্র দশজন, তাঁহারা স্বস্ত্যাত্রেয় নামে কথিত হইয়াছেন[১] এবং প্রভাকর হইতেই শ্রেষ্ঠ আত্রেয় গোত্রগণের উৎপত্তি। তাঁহার স্বস্ত্যাত্রেয় বংশধরগণের (পুত্র নহে) মধ্যে দত্ত ও দুর্বাসা ঋষি বিশেষ প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য।[২]

দত্ত আত্রেয় বা দত্তাত্রেয়ী[৩] হৈহয়নৃপতি অর্জুন কার্তবীর্যের আখ্যানের সহিত সংশ্লিষ্ট।[৪] সুতরাং অর্জুন কার্তবীর্য দত্তাত্রেয়েরই একজন বংশধর। পরবর্তীকালের আখ্যায়িকা সমূহে তাঁহাকে ভ্রমবশত অন্যান্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে।[৫] এই দত্তাত্রেয় হিতৈষী ও নিষ্কলঙ্করূপে প্রসিদ্ধ[৬] এবং ইনি বিষ্ণুর ৪র্থ অবতাররূপে

গরুড়পু° ১. ১৪০. ২; ভা° ৯. ২০. ৩; ব্রহ্মপু° ১৩. ৪; হরি° ৩১. ১৬৫৮ (ASB-সং)।

১ একজন স্বস্ত্যাত্রেয় উল্লেখ বৃহদ্দে° ৩. ৫৬ ও হরি° ১৬৮. ৯৫৭১-এ, একজনকে ঋ° ৫. ৫০. ৫১ সূক্তের রচয়িতারূপে ও আর একজনের উল্লেখ বৃহদ্দে° ১. ১২৮-এ পাওয়া যায়।

২ মার্কপু° ১৭. ৩-১৬-এ ইঁহাদের জন্ম ও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

৩ ব্রহ্মপু° ২১৩; ১০৬; ১১০; মার্কপু° ১৭. ৭; মহা° ১৩. ১৫৩. ৭২২৪।

৪ মহা° ৩. ১১৫. ১১০৩৬; ১২. ৪৯. ১৭৫০-১; ১৩. ১৫২. ৭১৮৯, ১৫৩. ৭২২৪, ১৫৭. ৭৩৫৩; বায়ুপু° ৯৪. ১০-১১; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩. ৬৯. ১০-১১; ব্রহ্মপু° ১৩. ১৬২; হরি° ৩৩. ১৮৫২-৬, ৪২. ২৩০৯ (ASB-সং); মার্কপু° ১৮ ও ১৯; মৎস্যপু° ৪৩. ১৫; পদ্মপু° ৫. ১২. ১১৮; বিষ্ণুপু° ৪. ১১. ৩; ভা° ৯. ১৫, ১৭; ২৩. ১৪; অগ্নিপু° ২৭৪. ৫।

৫ দৃষ্টান্তস্বরূপ—ঐলরাজ আয়ু—পদ্মপু° ২. ১০৩. ১০১-৩৫; পরে অলর্ক—মার্কপু° ১৬. ১২; ৩৭. ২৬; ব্রহ্মপু° ১৮০. ৩১-২, গরুড়পু° ১. ২১৮।

৬ মার্কপু° ১৭. ৬, ১৩, ১৮।

প্রথিত।[১] অবশ্য কোথাও কোথাও ইঁহাকে কামোপভোগ ও মদ্যপান করিতে দেখা যায়।[২] কথিত আছে, তিনি নিমি নামে ইঁহার এক পুত্র ছিল, তিনিই প্রথম শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন।[৩]

দুর্বাসা আত্রেয় দত্তের ভ্রাতৃরূপে কথিত[৪] হইলেও তাহা আবার স্থির করিয়া বলা যায় না, কারণ কোন নৃপতির সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। আখ্যানসমূহেই প্রায় ইহার নাম পাওয়া যায়।[৫] ইনি একজন কোপন ও উগ্রস্বভাব ঋষি ছিলেন।[৬] ইহার চরিত্রের বিশেষ পরিচয় কৃষ্ণের কাহিনীতেই পাওয়া যায়। প্রায়ই ইহার অভিশাপ হইতে অনেকের দুর্ভাগ্য আনীত হইয়াছে।[৭] তবুও ইহাকে শিবের অবতার বলা হয়।[৮] ইহার বংশ হইতে কোন গোত্রের উৎপত্তি হয় নাই।

---

১ বায়ুপু° ৯৮. ৮৯; ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩. ৭৩. ৮৮; মার্কপু° ১৭. ৭; ব্রহ্মপু° ২১৩. ১০৬-১৩; হরি° ৪২. ২৩০৫-১২ (ASB-সং)।

২ মার্কপু° ১৭. ২০. ৫; ১৮. ২৩, ২৮-৩১; পদ্মপু° ৩. ১০৩, ১০৬-৯, ১১০।

৩ মহা° ১৩. ৯১. ৪৩২৮-৪৬। কিন্তু ১৪. ৯২. ২৮৮৭ শ্লোকে জমদগ্নিকে প্রথম শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকারী বলা হইয়াছে।

৪ অত্রির উভয় পুত্রের উল্লেখ—ব্রহ্মপু° ১১৭. ২; অগ্নিপু° ২০. ১২।

৫ দৃষ্টান্তস্বরূপ—অম্বরীষের কাহিনীর সহিত—ভা° ৯. ৪. ৩৫ ই°। প্রাচীন নৃপতি শ্বেতকির সহিত—মহা° ১২২৩. ৮০৯৮, ৮১৩২-৪২; রাম দাশরথির সহিত—পদ্মপু° ৬. ২৭১. ৪৪; ভীষ্মের সহিত—মহা° ১৩. ২৬. ১৭৬৩; কুন্তীর সহিত—মহা° ১. ৬৭. ২৭৬৮; ১১১. ৪৩৮৫; পাণ্ডবদের সহিত—মহা° ৩. ৮৫. ৮২৬৫; কৃষ্ণের সহিত—হরি° ২৯৮-৩০৩ (ASB-সং) পৌরাণিক—অগ্নিপু° ৩. ১. ২।

৬ মার্কপু° ১৭. ৯. ১৬; বিষ্ণুপু° ১. ৯. ৪. ৬; মহা° ৩. ২৫৯. ১৫৪১৫ ই°।

৭ মহা° ১৩. ১৫৯. ৭৪১৪ ই°।

৮ শকুন্তলাকাব্য, ৪র্থ অ° দ্র°।

বংশতালিকা হইতে জানা যায়, দত্ত হইতে যে সমুদয় গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে চারিটি প্রসিদ্ধ এবং সেগুলি শ্যাবাশ্ব, মুদ্গল (বা প্রত্নস), বলারক (বা বাগ্‌ভূতক বা ববল্‌গু) ও গবিষ্ঠিরের নামে পরিচিত। মৎস্যপু° (১৯৭. ৫, ৭, ৮)-এ মাত্র শ্যাবাশ্ব ও গবিষ্ঠিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ছয় জন আত্রেয় মন্ত্রকর্তা[১]—অত্রি অর্চনানঃ, শ্যাবাশ্ব, গবিষ্ঠির, বল্‌গূতক (বা অবিহোত্র বা কর্ণক) ও পূর্বাতিথি। বল্‌গূতক ঋষি ও বলারক গোত্র একই বলিয়া মনে হয়।

অর্চনানের পুত্র শ্যাবাশ্ব। ঋগ্বেদে উভয়েরই উল্লেখ আছে। শ্যাবাশ্ব বহু মন্ত্র রচয়িতা।[২] তাঁহার পুত্র অন্ধীগুও[৩] একটি মন্ত্র রচনা করেন। অর্চনান ও শ্যাবাশ্ব রাজা রথবীতি দর্ভ্যের জন্য স্বার্থ-ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শ্যাবাশ্ব তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। তরন্ত ও পুরুমীঢ় ইহাদের সমসাময়িক এবং উভয়েই বিদদশ্বের পুত্র।[৪] শ্যাবাশ্ব তাঁহার দুইটি সূক্তে ত্রসদস্যুর উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] এই ত্রসদস্যুর উল্লেখ আরও অনেক বৈদিক সূক্তে আছে। এক্ষেত্রে অর্চনান্ ও শ্যাবাশ্বকে তাঁহারই ঠিক পরবর্তী সময়ের বলা যাইতে পারে।

অন্যান্য আত্রেয়দিগের মধ্যে একজন (বা কয়েক জন) অত্রি ত্র্যরুণ, ত্রসদস্যু, অশ্বমেধ ও রাজা রৌসমের[৬] নিকট হইতে ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন। এই অত্রির যথানির্দেশ করিতে পারা যায় না। আর একজন আত্রেয় বভ্রু ঋণঞ্চয়ের পুরোহিত ছিলেন।[৭]

---

১ বায়ুপু° ৫৯. ১০৪; ব্রহ্মাণ্ডপু° ২. ৩২.১১৩-১৪; মৎস্যপু° ১৪৫.১০৭-৯।
২ ঋ° ৫. ৫২. ৬১, ৮১, ৮২; ৮. ৩৫-৩৮; ৯. ৩২—শ্যাবাশ্ব-রচিত।
৩ ঐ, ৯. ১০১ অন্ধীগুরচিত।
৪ ঋ° ৫. ৬১ ও বেদার্থ; বৃহদ্দে° ৫. ৫০-৮১; VI, i. 36; SBE, xxxii. 359.
৫ ঋ° ৮. ৩৬. ৭, ৩৭. ৭।
৬ বৃহদ্দে° ৫. ১৩ ৩১।
৭ ঐ, ৫. ১৩. ৩৩-৪।

ব্রহ্মা অত্রিকে প্রজাসৃষ্টি ও বেদরক্ষার ভার দিয়াছিলেন। অত্রিই সর্বপ্রথম পশ্চিমদেশে যাত্রা করেন। এখানেই তাঁহার তুহিনরশ্মি নামক কন্যার জন্ম হইয়াছিল। এই কন্যার জন্মের পর তিনি শঙ্খনাগা নদীতীরে শঙ্খপর্বতে গমন করেন। তথায় শ্বেতগিরিতে তিনি ব্রহ্মার তপস্যায় নিমগ্ন হন।

অত্রির জ্যেষ্ঠ পুত্র শাঙ্কায়ন অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত উগ্রস্বভাব, যথেচ্ছভোজী ও গুহাবাসী ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রও জ্যেষ্ঠের অনুরূপ হয়। অত্রি পুত্রদিগের সুমতি আনিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে, তাহারা কি ভাবে পর্বতে বাস করিবে, গ্রামসন্নিবেশ করিবে, যে সকল স্থানে তাহারা বাস করিবে সেই সকল স্থানকে 'অত্রি' নামে অভিহিত করিবার উপদেশ প্রভৃতি দিয়া সিন্ধুদেশে গমন করেন। এখানে দেবনিকা পর্বতে বাস করিবার সময় তিনি বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই প্রজাগণ বাসের জন্য 'দেবনগর' স্থাপন করিয়াছিল।

অত্রি-সংস্কৃতি ভারত হইতে ভারতের বাহিরে বহুদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ দেশগুলিতে অত্রিকে 'অদ্রিস্' বা 'ইদ্রিস্' নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। অত্রি চন্দ্রবংশের আদি পুরুষ, কারণ তিনি চন্দ্রের পিতা। চন্দ্রবংশীয় নৃপতি দেবনহুষকে মেরু পর্বতের নিম্নদেশে অত্রির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বিফল মনোরথ হইলে তথায় বিশ্বকর্মাকে দিয়া একটি নগর নির্মাণ করান এবং এই নগরের তিনি নামকরণ করেন 'দেবনহুষনগর'। কাহারও কাহারও মতে 'দেবনহুষনগর' ও 'দৈবনহুষ' শব্দ দুইটি ইউনানী disonysius ও dionysiopolis শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে অত্রিকে ইউনানী নৃপতি ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের পূর্বপুরুষ বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। অত্রির সহিত প্রাচীন ইউরোপেরও অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল বলিয়াও অনেক পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন।

অত্রিবংশে গোত্রপ্রবর্তক ঋষি—অত্রিগোত্র প্রধানত কর্দমায়ন

ও শারায়ণ, এই দুই শাখায় বিভক্ত। অর্ধপণ্য, উদ্দালকি, করজিহ্ব, কর্ণজিহ্ব, কর্ণিরথ, কর্দমায়নশাখেয়, গোণীপতি, গোণায়নি, গোপন, গৌরগ্রীব, গৌরজিন, চৈত্রায়ণ, ছন্দোগেয়, জলদ, তকীবিন্দু, তৈলপ, ভদগপাদ, লেদ্রাণি, বামরথ্য, শাকলায়নি, শারায়ণ, শৌণ, শৌক্রতব (শাক্রতব, শোক্রতব), সবৈলেয় (সচৈলেয়), সৌনকর্ণি, (শৌণরকর্ণিরথ), সৌপুষ্পি ও হরগ্রীতি (সরদ্বীচি)। এই সকল মহর্ষিবংশে আর্ষেয়প্রবর তিনটি, যথা—অত্রি, আর্চনশ (ত্রিবরাতাম) ও শ্যাবাশ্ব। এই সকল ঋষিবংশে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। উর্ণনাভি, গবিষ্ঠির, দাক্ষি, পর্ণবি, বলি, বীজবাপি, ভলন্দন, মৌঞ্জকেশ, শিরীষ ও শিলর্দনি। এই সকল ঋষিবংশেও আর্ষেয়প্রবর তিনটি, যথা—অত্রি, গবিষ্ঠির ও পূর্বাতিথি। এই সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিধান নাই।—মৎস্যপু° ১৯৭. ১-৮।

কালেয়, বালেয়, বামরথ্য, ধাত্রেয় ও মৈত্রেয়—ইঁহারা আত্রেয়-তনয়। এই সকল ঋষিবংশেও পরস্পর বিবাহ বিহিত নয়।—ঐ ৯.১০।

অত্রিবংশে মন্ত্রকর্তা ঋষি—বায়ুপু° (১. ৫৯.-১০৪), মৎস্যপু° (১৪৫. ১০৭-১০৮) ও ব্রহ্মাণ্ডপু° (২. ৩২. ১১৮)—মতে অত্রিবংশীয় মন্ত্রকর্তা ঋষিগণের নাম—

বায়ুপু°	মৎস্যপু°	ব্রহ্মাণ্ডপু°
অত্রি	অত্রি	অত্রি
অর্চিসন	অর্ধস্বন	অর্বসন,
	কর্ণক	অবিহোত্র
নিষ্ঠুর	গবিষ্ঠির	গবিষ্ঠির
পূর্বাতিথি	পূর্বাতিথি	পূর্বাতিথি
বল্গূতক		
শ্যামাবান্	শাবাস্য	শ্যাবাশ্ব

অথর্ববেদ

ভারতীয় আর্য-জাতির সর্ব-প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ। আর্য-সভ্যতার ইতিবৃত্ত আলোচনায় বেদের স্থান সর্বোপরি। এমন সুপ্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। এই বেদ হইতে প্রাচীন আর্যগণের রীতি-নীতি ও জীবনপ্রণালী-সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। বেদ ভারতীয় আর্যগণের ধর্মগ্রন্থ হইলেও, তাঁহারা যে মহাজাতি হইতে পৃথক্ হইয়া ভারতে বিস্তৃতিলাভ করেন, এই প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও তথ্যলাভ ও সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায়। বিশেষত প্রাচীন গ্রীক, রোমান, শ্লাভ ও টিউটন-জাতিসমূহের প্রাচীন আখ্যান-সমূহের সহিত বেদাদির বহু সামঞ্জস্য আছে। ভারতের প্রতিবেশী ইরানী জাতির প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার সহিতও বেদের সুস্পষ্ট ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদ চারি বেদের অন্যতম। ইহা ২০ কাণ্ডে বিভক্ত। কাণ্ডে সর্বসমেত ৭৩০ সূক্তে অন্যূন ৬০৯০ মন্ত্র আছে।[১] প্রাচীন আর্য-সভ্যতার আলোচনায় অথর্ববেদে বিশেষ গুরুত্ব লক্ষিত হয়। তাহার একটি কারণ এই যে, আর্য-জাতি প্রধানত অগ্নিপূজক ; ভৃগু, অঙ্গিরা ও অথর্বা—এই তিনজন ঋষি অগ্নিপুরোহিত নামে প্রসিদ্ধ ; বিশেষত ইঁহারাই অগ্নি,

---

১ ব্লুমফীল্ডের মতে ৭৩০, হুইট্‌নীর মতে ৫৯৮ ; শঙ্কর পাণ্ডুরঙ পণ্ডিতের মতে ৭৫৯ এবং অজমের-সংস্করণে ৭৩১ সূক্ত আছে। ব্লুমফীল্ডের মতে ৬০০০, হুইট্‌নীর মতে ৫০৩৮ (ভূমিকা পৃ° ৪৭) এবং পাণ্ডুরঙ পণ্ডিতের মতে ৬০১৫ ঋক্ আছে। পাণ্ডুরঙ পণ্ডিতের ভূমিকায় লিখিত আছে যে কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে ঋক্ বা মন্ত্রসংখ্যা ৬০১৫। গুজরাটের এক সংস্করণে গ্রন্থসংখ্যা ৬৬৮০ ঋক্ আছে। গ্রন্থ বলিলে ৩২ অক্ষর (letters) বোঝায়। সুতরাং অক্ষর-হিসাবে ৬৬৮০ × ৩২ = ২,১৩,৭৬০। কিন্তু ঋগ্বেদের অক্ষরসংখ্যা ৪,৩২,০০০। ঋগ্বেদের তুলনায় দেখা যায়, অথর্ববেদের সূক্ত ও অক্ষরসংখ্যা ঋগ্বেদের অর্ধেকের কিছু বেশী।

যাগযজ্ঞ ও হোমাদির প্রবর্তন করেন এবং অথর্ববেদ বিশেষভাবে এই তিনজন ঋষির নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। শ্লাভ, টিউটন ও ইরানীয় জাতির সুপ্রাচীন পৌরাণিক আখ্যানগুলিতে যে সকল দেবতা বা অসুরের আখ্যান আছে, তাহাদের সহিত বৈদিক দেবতা ও অসুরগণের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতি ভারতে স্বতন্ত্র একটি রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্বে বহির্ভারতের মূল আর্য-সংস্কৃতির সহিত ইহা যে সম্বন্ধ বিশিষ্ট ছিল তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্যসংস্কৃতি মূল আর্যসংস্কৃতির একটি শাখামাত্র। ইহা মূল হইতে পৃথক্ হইয়া বৈদিক যুগ হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শুধু ভারত কেন, অন্যান্য দেশেও আর্য-সংস্কৃতি মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে; অন্যান্য দেশে প্রতিদ্বন্দ্বী নবধর্মের প্রভাবে প্রাচীন ধারা লুপ্ত, কিন্তু ভারতে প্রাচীন ধারাই ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে; সেই জন্য ভারতের প্রাচীন ধারার সন্ধান পাইতে কষ্ট হয় না। ঋগ্বেদই সাধারণত সর্বপ্রাচীন বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু অথর্ববেদ অন্তত অংশত ঋগ্বেদ হইতেও যে বহু প্রাচীন তাহা ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়। অথর্বা, অঙ্গিরা ও ভৃগু—এই তিনজন অগ্নির ও যাগযজ্ঞের প্রবর্তক বলিয়া ঋগ্বেদে কীর্তিত। আবার অথর্বা ঋষির নামে অথর্ববেদ খ্যাত। ইহার নামান্তর—অথর্বাঙ্গিরসবেদ (অথর্বন + অঙ্গিরস), ভৃগ্বঙ্গিরসবেদ (ভৃগু + অঙ্গিরস) ও ব্রহ্মবেদ। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, এই তিন ঋষিই এই বেদের প্রবর্তক, কিংবা এই তিন বংশীয় ঋষিদিগের মধ্যে যে সকল যাগযজ্ঞ, হোমাদি ও মন্ত্রতন্ত্রের প্রচলন ছিল, সেগুলি পরে অথর্ববেদ (অথর্বাঙ্গিরসবেদ ও ভৃগ্বঙ্গিরসবেদ) নামে পরিচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে এরূপভাবে এই তিন ঋষির উল্লেখ আছে যে, ইহারা যে ঋগ্বেদীয় যুগের বহু পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় (ঋ° ১. ৮০. ১৬; ৬. ১৫. ১৭; ৬. ১৬. ১৩); সুতরাং

ইঁহাদিগের প্রবর্তিত ধর্ম যে ঋগ্বেদ হইতেও প্রাচীন তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীয় আর্যসভ্যতার আদি যুগে যে বেদ-বিভাগ হয় নাই, ভারতীয় শাস্ত্রগুলিই তাহার প্রমাণ দিতেছে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদ-বিভাগ করিয়া বেদব্যাস আখ্যালাভ করেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বেদব্যাসের সময় নিশ্চিতরূপ নির্ণীত না হইলেও তিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষত পাণিনিতে চারি বেদ তথা অথর্ববেদের উল্লেখ আছে (৪. ৩. ১৩৩ ; ৬. ৪. ১৭৪)। মহাভারত (৩. ২০৩. ১৫ ; ৫. ১০৮. ১০ ; ৩. ৩০৫. ২০ ; ২. ১১. ১৯), রামায়ণ (২. ২৬. ২১) প্রভৃতি গ্রন্থে অথর্ববেদের কথা আছে। বৌদ্ধ ও জনগণ বেদধর্ম-বিরোধী ; ইহারা প্রসঙ্গক্রমে বা প্রতিকূলভাবে বেদের নাম করিয়াছেন। বুদ্ধবচনে তিন বেদের কথা আছে ; জৈন ‘সূতকৃতাঙ্গ’ সূত্রে’ (২. ২৭) অথর্ববেদের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ সুত্তনিপাতের অট্‌ঠক বগ্‌গে (১৪. ১৩) অথর্ববেদের (অথব্বনবেদের) ক্রিয়াকাণ্ড-সম্বন্ধে নিন্দা আছে। এতদ্ভিন্ন পালি-পিটকের নানা স্থানে এইরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের নিন্দা আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায়, বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে বেদগুলির বিভাগ ও নামকরণ হয়। মূলত এইরূপ নাম বা বিভাগ ছিল না। সাধারণত দেবতাদিগের স্তুতি, তাঁহাদের নিকট আয়ু, আরোগ্য, ধন, গাভী প্রভৃতি কামনা, শত্রুনিধনের জন্য প্রার্থনা, শান্তি, পুষ্টি, অভিচার ও ঐন্দ্রজালিক নানারূপ ক্রিয়াকাণ্ডেই বৈদিক মন্ত্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে ; কোন কোন মন্ত্রে বা সূক্তে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের উপলব্ধির কথাও আছে। এই মন্ত্রগুলি প্রধানত ঋক্ (স্তুতি), যজূংষি (ক্রিয়াকাণ্ড), সামানি (সঙ্গীত) ও অথর্বাঙ্গিরসাঃ (শুভ ও অশুভ) নামে খ্যাত ছিল। পরবর্তীকালে এইগুলি সংকলন করিয়া গুণানুসারে বিভাগ করা হয়। কিন্তু এইরূপে বিষয়-অনুযায়ী বেদ-বিভাগ হইলেও সকল বেদেই উপরিউক্ত

চারি প্রকার মন্ত্র কতক কতক আছে। অথর্ববেদে শুভ এবং আভিচারিক মন্ত্রতন্ত্রের প্রাধান্য থাকিলেও তাহাতে ঋক্ কিংবা যজুঃষির অভাব নাই। অধিকন্তু ইহাতে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই জন্য ইহা 'ব্রহ্মবেদ' নামে খ্যাত (বৈতানসূত্র ১. ১ ; গো-ব্রা° ১. ১. ২২ ; ২. ১৬. ১৯ ; ৫. ১৫. ১৯ ; ২. ২. ৬))। এই হেতু এক হিসাবে অন্যান্য বেদ হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপন্ন হয়।[১]

---

১ ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে অথর্ববেদ চতুর্থ বেদ নয়। ইহা সর্বশেষেও সংকলিত হয় নাই। অন্যান্য বেদের তুলনায় ইহা অর্বাচীন নয়। তাঁহারা এসম্বন্ধে যে সকল যুক্তি সমীচীন বলিয়াছেন নিম্নে তাহাদের আভাস দেওয়া হইল।

বেদের একটি নাম যেমন 'ত্রয়ী', তেমনই তাহার আর একটি প্রসিদ্ধ নাম 'ব্রহ্ম'। একসঙ্গে চারি বেদের নাম লইতে হইলে ক্রম অনুসারে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং সর্বশেষে 'অথর্ব' বলিতে হয়। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অথর্বের নাম শেষেই করিতে হয়—পাণিনি সূত্র করিয়াছেন—'অল্পাচ্তরম্' —২. ২. ৩৪। যে সকল শব্দে কম স্বর থাকে সেগুলি পূর্বে বসিয়া থাকে। অথর্বশব্দে সর্বাপেক্ষা অধিক স্বর রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম সকলের শেষে আসিয়াছে। এই জন্য 'ত্রয়ী'র গণনা এক দিক্ দিয়া করা ঠিক নয়। অথর্বকে 'ত্রয়ী'র মধ্যে ধরিলেও কোন একটি ত্রয়ীর বাহিরে পড়িবে। কিন্তু 'ত্রয়ী' শব্দে 'ঋক্, যজুঃ ও সাম নামক তিন প্রকার মন্ত্রসংবলিত' এইরূপ অর্থই বুঝায়। এই নিমিত্তে ঋগ্বেদ,সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে— এই চারি বেদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে 'ত্রয়ী'—কেন না, এই চারিটির প্রত্যেকের মধ্যে তিন প্রকারের মন্ত্র আছে। তবে সংখ্যায় কম-বেশী। মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাসূত্রে স্পষ্ট লিখিয়াছেন—'তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা'— ২. ১. ৩২, 'শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ'—২. ১. ৩৩, 'তেষাং ঋগ্ মন্ত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা'—২. ১. ৩৫, 'গীতিষু সামাখ্যা'—২. ১. ৩৬, 'শেষে যজুঃশব্দঃ'— ২. ১. ৩৭। বেদের বিধি বাক্যাবলীর নাম মন্ত্র। মন্ত্র-সমুদয় পরিবর্জন করিলে অবশিষ্ট বেদ-ভাগের নাম হয় 'ব্রাহ্মণ'। আবার মন্ত্রসমুদয়ের মধ্যে যেগুলিতে অর্থানুসারে চরণের ব্যবস্থা সেগুলিকে 'ঋক্' নামে অভিহিত

পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ঐন্দ্রজালিক বিষয়ই অথর্ববেদের প্রধান ব্যাপার। ইহার শেষাংশ ও কৌলিকসূত্রের কর্মকাণ্ড অপদেবতা ও অসুরলোক-সম্বন্ধে আলোচনায় পরিপূর্ণ। ইহা হইতে ঋগ্বেদের পূর্ববর্তী যুগের ধর্মের প্রথম স্তরের আভাস পাওয়া যায়; এই অংশ বহু প্রাচীন। আবার ধর্মসম্বন্ধে চরম পরিণতির আদর্শও ইহাতে

করা হয়। 'গান'গুলিকে সাম বলা হয় এবং শেষ মন্ত্রগুলিকে 'যজুঃ' বলা হয়। এই তিন প্রকারের মন্ত্র চারি বেদে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যুত বেদ এক, মন্ত্ররূপে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়াছে। বেদব্যাস প্রথমে ইহাকে মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করেন। তারপর পুনরায় যজ্ঞকর্মের সুবিধার জন্য প্রত্যেককে চারি ভাগ করেন। বেদসমূহদ্বারা প্রধান ব্যাপার যে যজ্ঞ তাহা সাধিত হয়। আর যজ্ঞে (১) মন্ত্রোচ্চারক 'হোতা', (২) স্বরসংযোগে গানকারী 'উদ্গাতা' (৩) স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠাতা 'অধ্বর্যু' এবং (৪) প্রধান পুরোহিত 'ব্রহ্মা'। সমগ্র যজ্ঞকার্য নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য এই চারিজনের মধ্যে যদি একজন না থাকে তাহা হইলে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সর্বথা অসম্ভব হয়। এই জন্যই এই চারিজন পৃথক পুরোহিতের জন্য ব্যাসদেব মন্ত্রকে পৃথক্ পৃথক্ চার 'সংহিতা'তে বিভাগ করেন। হোতার জন্য ঋক্, উদ্গাতার জন্য সামগান, অধ্বর্যুর জন্য যজুর্মন্ত্র এবং ব্রহ্মার জন্য সাধারণত সকল প্রকারের মন্ত্র অথবা 'ব্রহ্ম' বিহিত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং দ্বৈপায়ন এক স্থানে বিশেষ ঋক্‌সমষ্টি, দ্বিতীয় স্থানে বিশেষ করিয়া সামগান। তৃতীয় স্থানে যজুর্মন্ত্র এবং চতুর্থ স্থানে সমস্ত ঐহিক আকস্মিক ফলপ্রদ 'ব্রহ্ম'মন্ত্রকে একত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন। আর ঐ সমস্ত মন্ত্রের প্রাধান্য ও বাহুল্য-বশত ইহাদের নাম ক্রমশ ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ বা ব্রহ্মবেদ হইয়াছে। এইরূপে আবার এই বেদচতুষ্টয়ের নাম—'বেদ', 'ব্রহ্ম' এবং 'ঋক্ যজু-সাম'ও হইয়াছে। এরূপ হইবার কারণ পূর্বে লিখিত তিন প্রকারের মন্ত্র প্রত্যেক সংহিতায় আছে। যেখানে যেখানে কেবল ঋক্, যজুঃ, সাম শব্দ আছে, সেখানে সেখানে ইহাদের তাৎপর্য জৈমিনীয় সূত্রানুসারে মন্ত্রবিশেষকেই বোঝায়, সংহিত বিশেষকে নয়।

আছে। ইহাতে গৌণভাবে বহু দেবতার কথা থাকিলেও মুখ্যত ইহা একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে কোন বিশেষ দেবতার স্তুতি না করিয়া একসঙ্গে বহু দেবতার স্তুতি করা হইয়াছে। এই স্তুতিগুলি ঋগ্বেদের ন্যায় একই ধারার। অথর্ববেদে সকল পৌরাণিক আখ্যানের ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈদিক বা শ্রৌত ক্রিয়াকাণ্ড হইতে আথর্ব ক্রিয়াকাণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইহা সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাপার। ইহাতে পারিবারিক অগ্নি-হোমাদির কথাই আছে; শ্রৌত ক্রিয়ার ন্যায় ইহাতে সোমাহুতি দিবার ব্যবস্থা নাই। এই হিসাবে গৃহ্যসূত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

ভারতীয় আর্যগণের জীবনযাত্রা-প্রণালীর ইতিবৃত্ত আলোচনায় অথর্ববেদ ও গৃহ্যসূত্রের আলোচনা অপরিহার্য। গৃহ্যসূত্র বহু পরবর্তী কালে গ্রথিত হইলেও সূত্রগুলি যে প্রাচীন এবং বংশানুক্রমে ইহার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তাহা বুঝা যায়। গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থের করণীয় কর্তব্য-সম্বন্ধে নানা বিধিনিষেধ, হোম ও মন্ত্রপাঠের কথা আছে। বিভিন্ন ঋষি-বংশের গৃহ্যসূত্রে নানারূপ পার্থক্যও আছে। গৃহ্যসূত্র-গুলির মন্ত্রব্রাহ্মণ বা মন্ত্রপাঠও আছে। পারিবারিক শুভ বা আভিচারিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে এই সকল মন্ত্র পাঠ করা হইত। অথর্ববেদের সংহিতাগুলি এইরূপ মন্ত্রেরই সমষ্টি; সুতরাং গৃহ্যসূত্রের মন্ত্রগুলি প্রধানত অথর্ববেদ হইতেই গৃহীত। অবশ্য গৃহ্যসূত্র ও অথর্ববেদ ঋগ্বেদের পরবর্তীকালে সংকলিত ও সুসংবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের ভাষা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষত অথর্ববেদ ও গৃহ্যসূত্রে রীতিমত নিয়মকানুন প্রবর্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদে অগ্নি, ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণের উল্লেখ আছে, কিন্তু কাহাকেও প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই; দেবগণ অথর্ববেদে অসুর, রক্ষ, দৈত্য, ডাকিনী ও পিশাচাদির হন্তৃরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার অধিকাংশ সূক্তই অতি প্রাথমিক

পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ঐন্দ্রজালিক বিষয়ই অথর্ববেদের প্রধান ব্যাপার। ইহার শেষাংশ ও কৌলিকস্থত্রের কর্মকাণ্ড অপদেবতা ও অস্থরলোক-সম্বন্ধে আলোচনায় পরিপূর্ণ। ইহা হইতে ঋগ্বেদের পূর্ববর্তী যুগের ধর্মের প্রথম স্তরের আভাস পাওয়া যায়; এই অংশ বহু প্রাচীন। আবার ধর্মসম্বন্ধে চরম পরিণতির আদর্শও ইহাতে

করা হয়। 'গান'গুলিকে সাম বলা হয় এবং শেষ মন্ত্রগুলিকে 'যজুঃ' বলা হয়। এই তিন প্রকারের মন্ত্র চারি বেদে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যুত বেদ এক, মন্ত্ররূপে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়াছে। বেদব্যাস প্রথমে ইহাকে মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করেন। তারপর পুনরায় যজ্ঞকর্মের স্থবিধার জন্য প্রত্যেককে চারি ভাগ করেন। বেদসমূহদ্বারা প্রধান ব্যাপার যে যজ্ঞ তাহা সাধিত হয়। আর যজ্ঞে (১) মন্ত্রোচ্চারক 'হোতা', (২) স্বরসংযোগে গানকারী 'উদ্গাতা' (৩) স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠাতা 'অধ্বর্যু' এবং (৪) প্রধান পুরোহিত 'ব্রহ্মা'। সমগ্র যজ্ঞকার্য নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য এই চারিজনের মধ্যে যদি একজন না থাকে তাহা হইলে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সর্বথা অসম্ভব হয়। এই জন্যই এই চারিজন পৃথক পুরোহিতের জন্য ব্যাসদেব মন্ত্রকে পৃথক্ পৃথক্ চার 'সংহিতা'তে বিভাগ করেন। হোতার জন্য ঋক্, উদ্গাতার জন্য সামগান, অধ্বর্যুর জন্য যজুর্মন্ত্র এবং ব্রহ্মার জন্য সাধারণত সকল প্রকারের মন্ত্র অথবা 'ব্রহ্ম' বিহিত হওয়া আবশ্যক। স্থতরাং দ্বৈপায়ন এক স্থানে বিশেষ ঋক্সমষ্টি, দ্বিতীয় স্থানে বিশেষ করিয়া সামগান। তৃতীয় স্থানে যজুর্মন্ত্র এবং চতুর্থ স্থানে সমস্ত ঐহিক আকস্মিক ফলপ্রদ 'ব্রহ্ম'মন্ত্রকে একত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন। আর ঐ সমস্ত মন্ত্রের প্রাধান্য ও বাহুল্য-বশত ইহাদের নাম ক্রমশ ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ বা ব্রহ্মবেদ হইয়াছে। এইরূপে আবার এই বেদচতুষ্টয়ের নাম—'বেদ', 'ব্রহ্ম' এবং 'ঋক্ যজু-সাম'ও হইয়াছে। এরূপ হইবার কারণ পূর্বে লিখিত তিন প্রকারের মন্ত্র প্রত্যেক সংহিতায় আছে। যেখানে যেখানে কেবল ঋক্, যজুঃ, সাম শব্দ আছে, সেখানে সেখানে ইহাদের তাৎপর্য জৈমিনীয় স্থত্রানুসারে মন্ত্রবিশেষকেই বোঝায়, সংহিত বিশেষকে নয়।

আছে। ইহাতে গৌণভাবে বহু দেবতার কথা থাকিলেও মুখ্যত ইহা একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহাতে ব্যক্তিগতভাবে কোন বিশেষ দেবতার স্তুতি না করিয়া একসঙ্গে বহু দেবতার স্তুতি করা হইয়াছে। এই স্তুতিগুলি ঋগ্বেদের ন্যায় একই ধারার। অথর্ববেদে সকল পৌরাণিক আখ্যানের ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈদিক বা শ্রৌত ক্রিয়াকাণ্ড হইতে আথর্ব ক্রিয়াকাণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইহা সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাপার। ইহাতে পারিবারিক অগ্নি-হোমাদির কথাই আছে; শ্রৌত ক্রিয়ার ন্যায় ইহাতে সোমাহুতি দিবার ব্যবস্থা নাই। এই হিসাবে গৃহ্যসূত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

ভারতীয় আর্যগণের জীবনযাত্রা-প্রণালীর ইতিবৃত্ত আলোচনায় অথর্ববেদ ও গৃহ্যসূত্রের আলোচনা অপরিহার্য। গৃহ্যসূত্র বহু পরবর্তী কালে গ্রথিত হইলেও সূত্রগুলি যে প্রাচীন এবং বংশানুক্রমে ইহার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তাহা বুঝা যায়। গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থের করণীয় কর্তব্য-সম্বন্ধে নানা বিধিনিষেধ, হোম ও মন্ত্রপাঠের কথা আছে। বিভিন্ন ঋষি-বংশের গৃহ্যসূত্রে নানারূপ পার্থক্যও আছে। গৃহ্যসূত্র-গুলির মন্ত্রব্রাহ্মণ বা মন্ত্রপাঠও আছে। পারিবারিক শুভ বা আভিচারিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে এই সকল মন্ত্র পাঠ করা হইত। অথর্ববেদের সংহিতাগুলি এইরূপ মন্ত্রেরই সমষ্টি; সুতরাং গৃহ্যসূত্রের মন্ত্রগুলি প্রধানত অথর্ববেদ হইতেই গৃহীত। অবশ্য গৃহ্যসূত্র ও অথর্ববেদ ঋগ্বেদের পরবর্তীকালে সংকলিত ও সুসংবদ্ধ হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের ভাষা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষত অথর্ববেদ ও গৃহ্যসূত্রে রীতিমত নিয়মকানুন প্রবর্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদে অগ্নি, ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণের উল্লেখ আছে, কিন্তু কাহাকেও প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই; দেবগণ অথর্ববেদে অসুর, রক্ষ, দৈত্য, ডাকিনী ও পিশাচাদির হন্তৃরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার অধিকাংশ সূক্তই অতি প্রাথমিক

স্তরের ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত চরম পরিণতি-মূলক ব্রহ্মবাদও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে (অ° ৮. ৬; ১০. ৭; ১০. ৮)। ইহাতে বলা হইয়াছে আত্মা ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভই প্রকৃষ্ট লক্ষ্য; 'অসৎ' (non being) সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ইহাতে আছে (অ° ৪. ১৯. ৬)। অথর্ববেদের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাতে বেদপূর্ব যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদের ব্রাহ্মণাংশ রচিত হইবার কাল পর্যন্ত আর্যজাতির গার্হস্থ্য জীবনের ধারা চিত্রিত হইয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু প্রাচীন হইলেও ইহাতে একাধারে প্রাচীন ও বৈদিক ভারতের তথ্য পাওয়া যায়।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তুকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। সাধারণত ইহার একটি ভাগ শুভ ও মঙ্গলজনক কার্যের দ্যোতক; এই ভাগ বৈদিক-সাহিত্যে 'ভেষজানি' (অ° ১৬. ৬. ১৪) 'শান্ত' ও 'পৌষ্টিক' নামে অভিহিত। অপর ভাগ ঐন্দ্রজালিক ও আভিচারিক ক্রিয়াবর্গ লইয়া গঠিত; বৈদিক সাহিত্যে তাহা যাতু বা অভিচার নামে অভিহিত (শ-ব্রা° ১০. ৫. ২. ১০)। অথর্ববেদের শুভ বা মঙ্গলকর ভাগ 'অথর্বন্' এবং ঐন্দ্রজালিক বা আভিচারিক অংশ 'অঙ্গিরস' বলিয়া পরিচিত। এই হেতু সমগ্র অথর্ববেদ 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে (অ° ১০. ৭. ২০)। অথর্ববেদ বলিতে মাত্র 'অঙ্গিরস' শব্দটি একবার মাত্র তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৭. ৫. ১১. ২) ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের কয়েক স্থলে দ্বন্দ্বসমাস-নিষ্পন্ন 'অথর্বাঙ্গিরস' নামটি পাওয়া যায় (মহা° ৩. ৩০১. ২০; ৮. ৪০. ৩৩; যাজ্ঞ° ১. ৩১২; মনু° ১১. ৩৩; বৌধা° ২. ৫. ৯. ১৪)। কোন কোন স্থলে অথর্ববেদের স্থলে ইহার প্রধান দুইটি ভাগ পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত আছে। ইহাতে মনে হয়, প্রথমে ইহার দুই ভাগ পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থরূপেই গণ্য হইত। গোপথ-ব্রাহ্মণে বেদের পাঁচটি নামই পাওয়া যায়—'ঋচি যজুষি সাম্নি শান্তেঽথ ঘোরে"—গো-ব্রা° ১. ২. ২১; ১. ৫. ১০। ঋক্, যজুঃ

ও সাম এই ত্রয়ীর ব্যাহৃতি 'ভূঃ', 'ভুবঃ' ও 'স্বঃ, ; কিন্তু অথর্ববেদের দুই ভাগের পৃথক্ পৃথক্ ব্যাহৃতি—'শান্ত' ভাগের 'ওম্' এবং 'ঘোরের' 'জনত্'—গো-ব্রা° ১. ২. ২৪ ; ১. ৩. ৩। এতদনুসারে আথর্ব ক্রিয়াকাণ্ডে ব্যবহৃত উদ্ভিদাদিকেও 'আথর্বণ বা শান্ত (শুভ)' এবং আঙ্গিরস (আভিচারিক)—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আরও দেখা যায়, প্রথমে আথর্বণ বেদ ও আঙ্গিরস বেদ সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল।—শ-ব্রা° ১৩. ৪. ৩. ৩ ; আশ্ব-শ্রৌ° ১০. ৭. ১ ; শাংখ্যা-শ্রৌ° ১৬. ২. ৯। পুরাণে-আঙ্গিরস-বেদ বহির্ভারতের মগদিগের (পারসীদিগের) চারি বেদের অন্যতম বলা হইয়াছে (Wilson in Reinaud's Memoire sur I' Inde, p. 394 ; Weber, IS, i. 292, note) ।

আভিচারিক ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াদি বৈদিক শাস্ত্রাদিতে নিন্দিত না হইলেও ইহার স্থান খুব উচ্চে নহে। সুতরাং শুভকর 'ভেষজ'কে বেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও আভিচারিক 'ঘোরে'র বেদে উল্লেখ না করিয়া অনেক স্থলে পরিত্যাগ করা হইয়াছে (অ° ১১.৬. ১৪)। 'যাতু' ভেষজের অপর ভাগ (অ° ৬. ১৩. ৩)। উভয়ই অথর্ববেদে পূজিত। অঙ্গিরা ঋষির নাম বেদের 'ঘোর' অংশের সহিত কি কারণে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে অঙ্গিরোগণের চরিত্রচিত্র হইতেই বুঝা যায় (ঋ° ১০. ১০৮.১০)। কৌশিক-সূত্রে (১৩৫. ১) আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে জাদুবিদ্যার দেবতা বলা হইয়াছে। সম্ভবত বেদের শান্ত ও ঘোর অংশ প্রথমে যথাক্রমে আথর্বণ ও আঙ্গিরস নামে অভিহিত হইত। ক্রমে তাহা যুক্ত হয় এবং পরবর্তীকালে শুধু 'অথর্ববেদ' নাম ধারণ করে।

অথর্ববেদের অপর দুইটি নাম হইতেছে—'ভৃগ্বঙ্গিরস' ও 'ব্রহ্মবেদ'। এই দুইটি নাম পরবর্তীকালের। ভৃগ্বঙ্গিরস (ভৃগু + অঙ্গিরস) নামটি শুধু অথর্ববেদের গ্রন্থাদিতেই পাওয়া যায়। গোপথ-ব্রাহ্মণে (১. ১. ৩) ভৃগু অথর্বনের পূর্ববর্তী ; আরও বলা হইয়াছে

(১. ২. ২২) অথর্বা ও অঙ্গিরোগণ ভৃগুর চক্ষু। চুলিকোপনিষদে (১০) অথর্বন্‌দিগের মধ্যে ভৃগুগণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও দেখা যায় (১০. ১৪. ৬; ১০. ৯২. ১০) ভৃগু, অঙ্গিরা ও অথর্বা— এই তিনটি নাম প্রায়ই সম্বন্ধবিশিষ্ট। সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয়, এই তিন ঋষি হয় একই বংশীয় ছিলেন, নতুবা বেদের শান্ত ও আভিচারিক মন্ত্রগুলি এই তিন ঋষি বা এই তিন বংশের ঋষিগণ-দ্বারা রচিত। সম্ভবত ভৃগু বা ভৃগু-বংশীয় ঋষিগণ-রচিত মন্ত্রগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। কিংবা আথর্বণ ও আঙ্গিরস মন্ত্রগুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই জন্য এই নামটির তত প্রচার নাই।

'ব্রহ্মবেদ' নামটি অত্যন্ত পরবর্তীকালে উৎপন্ন হইয়াছে। অথর্ববেদেও শব্দটির প্রয়োগ একান্ত বিরল। বেদাদির আলোচনা করিলে দেখা যায়, সমগ্রভাবে 'ধর্ম' বা 'শাস্ত্র' বুঝাইতে ঋগ্বেদে কোন নামের প্রয়োগ নাই। যাগাদিতে বিভিন্ন ব্যক্তির (হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্যু) প্রয়োজন হইত। সকলেই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন না। ব্রাহ্মণ-সমূহে সকল বেদের জ্ঞানকে 'সর্ববিদ্যা' বলা হইয়াছে। পরবর্তীকালে তাহার পরিবর্তে 'ব্রাহ্ম' এবং যে 'ব্রাহ্ম' বা 'ব্রহ্ম' জানে তাহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হইয়াছে (তৈ-স° ৭. ৩. ১. ৪)। বস্তুত দেব ও যজ্ঞের রহস্যকে ব্রহ্মবিদ্যা বুঝাইয়া এক অর্থে অথর্ববেদের নাম 'ব্রহ্মবেদ' হইয়াছে। বৈদিক যাগ সম্পন্ন করিতে যে চতুর্থ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, তাহাকে বুঝাইতে 'ব্রহ্মা বদতি জাতবিদ্যাম্' বলা হইয়াছে (SBE, xlii. p. liv, note 1)। ঋগ্বেদে (৭. ৭. ৫) অগ্নিকে 'ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। এই সকল কারণে অগ্নি-পুরোহিত-দিগের প্রণীত মন্ত্র 'ব্রহ্মবেদ' নামে খ্যাত হইতে পারে। বিশেষত অথর্ববেদে (১০. ২; ১০. ৭) ব্রহ্ম ও ব্রাহ্ম-সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনাও রহিয়াছে; সুতরাং ইহার 'ব্রহ্মবেদ' নাম নিরর্থক নহে।[১]

১ M. Bloomfield : The Atharvaveda, 10-11, 30-32.

বিভিন্ন ঋষি-পরম্পরায় বেদাদি শাস্ত্র চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ নয় জন ঋষির শিষ্য পরম্পরাক্রমে অথর্ববেদের নয়টি শাখার কথা জানিতে পারা যায়। অবশ্য নয়টি শাখার গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না। শৌনকীয় নামক শাখায় অথর্ববেদই পাওয়া যায়। অন্যান্য শাখার উল্লেখ বিভিন্ন স্থলে পাওয়া যায়। সায়ণ তাঁহার অথর্ববেদের ভাষ্যের ভূমিকায় অথর্ববেদের শাখাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন ; অথর্ববেদের চরণব্যূহেও শাখাগুলির কথা আছে। কোন কোন স্থলে শাখাগুলির ভুল নামও আছে। সর্বজনগ্রাহ্য নয়টি শাখার নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) **পৈপ্পলাদ**—(পৈপ্পলাদক, পৈপ্পলাদি, পিপ্পলাদ, পৈপ্পল, পৈপ্পলায়ন ই°) বা ঋষি পিপ্পলাদির শাখা। অথর্ববেদের পরিশিষ্ট এবং অথর্ব উপনিষদ্‌গুলি ভিন্ন অন্যত্র এই শাখার উল্লেখ নাই। এমন কি কৌশিকসূত্র, বৈতানসূত্র কিংবা গোপথ-ব্রাহ্মণে এই নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। শৌনকীয়-সূত্রের তিনটি মন্ত্র (অ° ১৯. ৫৬-৫৮) অথর্ববেদের ৮ম পরিশিষ্টে 'পৈপ্পলাদ-মন্ত্রাঃ' বলা হইয়াছে। অথর্বোপনিষদ্‌গুলির অধিকাংশই পৈপ্পলাদ কিংবা শৌনকীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত।

(২) **তৌদ বা তৌদায়ন**—এই শাখাসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। প্রায়ই ইহা স্তৌদ ও স্তৌদায়ন নামে অভিহিত হইয়াছে। অথর্ব-পরিশিষ্টে (২৩. ৩) আছে—'আস্কন্ধাহ্বরসো বাহ্পীহ্তি স্তৌদায়নৈঃ স্মৃতা'।

(৩) **মৌদ বা মৌদায়ন**—অথর্ববেদের পরিশিষ্টে বহুবার এই শাখার উল্লেখ আছে। এক স্থলে (২. ৪) বলা হইয়াছে যে, শৌনক ও পৈপ্পলাদ শাখার পুরোহিতগণই পৌরোহিত্যের উপযুক্ত পাত্র, জলদ বা মৌদশাখার পুরোহিতগণের উপর যে রাজ্যের ভার দেওয়া হয়, তাহা অবিলম্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

(৪) **শৌনকীয় বা শৌনকী**—শৌনকীয় শাখাই অধুনা

বিশেষভাবে প্রচলিত। অথর্ববেদের যে প্রাতিশাখ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 'শৌনকীয়া চতুরাধ্যায়িকা' নামে খ্যাত। অথর্ববেদের পরিশিষ্টগুলিতে বহুবার শৌনক, শৌনকি, শৌনকীয় প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত উপনিষদ্‌গুলিতে (মুণ্ড-উ° ১. ১. ৩; ব্র-উ° ১) শৌনককে অথর্ববেদের অন্যতম প্রধান ঋষি বলা হইয়াছে। এমন কি অথর্ববেদের উপনিষদের নামও 'শৌনকোপনিষদ্'।

(৫) **জাজল**—মহাভাষ্য-মতে ঋষি জজলি এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা। অথর্বপরিশিষ্টে (২৩. ২) আছে—'বাহুমাত্রা দেবদর্শৈর্জাজলৈরক্লুমাত্রিকা।'

(৬) **জলদ**—মৌদ-শাখার সহিত ইহার উল্লেখ আছে (অ°-পরিশিষ্ট ২. ৪)। অথর্ব-পরিশিষ্টে (২৩. ২) বলা হইয়াছে—

'জলদায়নৈর্বিতস্তির্বা ষোড়শেহতি তু ভার্গবঃ।'

(৭) **ব্রহ্মবেদ**—চরণব্যূহ ভিন্ন অন্য কোন আথর্ব-গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই।

(৮) **দেবদর্শ** বা **দেবদর্শী**—কৌশিক সূত্রে শৌনকীয়ের সহিত ইহার উল্লেখ আছে (৮৫. ৭-৮)। ব্যাকরণে 'শৌনক'গণের রূপ 'দেবনর্শনিনঃ'। অন্যত্রও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

(৯) **চারণবৈদ্য**—সর্বত্রই ইহার উল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন কৌশিকসূত্র (৬. ৩৭) ও অথর্ব-পরিশিষ্টে (২৩. ২) এই শাখার কথা বলা হইয়াছে—

'চারণবৈদ্যৈর্জঙ্ঘে চ মৌদেনাহষ্টাঙ্গুলানি চ।'

অথর্ববেদের সূত্রগুলির সহিত প্রত্যক্ষভাবে কোন ঋষির নাম সংশ্লিষ্ট নাই। নয়টি শাখার কয়েকটি নাম কোন ঋষি-বিশেষের নাম হইতেও উৎপন্ন নহে। দেখা যায়, শ্রৌতক্রিয়ার চতুর্থ পুরোহিত বা ব্রহ্মা হইতে 'ব্রহ্মবেদ' নামটির উৎপত্তি হইয়াছে। 'চারণবৈদ্য' বলিতে পরিব্রাজক চিকিৎসকগণ বা তাঁহাদিগের বিদ্যাকে

বুঝাইয়াছে। এইরূপ 'জলদ' (জলদানকারী) বলিতে জলদ্বারা নিষ্পন্ন আভিচারিক ক্রিয়াদিই বুঝায়।[১]

অথর্ববেদের সংহিতা-শাখার প্রধান দুইটি—শৌনকীয় ও পৈপ্পলাদ শাখা।

প্রাচীন ভাষায় লিখিত সংহিতা কিংবা কাশ্মীর হইতে প্রাপ্ত একখানি সংহিতা ভিন্ন কোন শাখারই কোন সংহিতা অথবা সূত্রগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন সংহিতাখানি এবং কৌশিকসূত্র, বৈতানসূত্র, ও গোপথ-ব্রাহ্মণকে শৌনকীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। অথর্ববেদের প্রাতিশাখ্যখানির নাম 'শৌনকীয়া চতুরাধ্যায়িকা'; ইহাকে প্রাচীন গ্রন্থখানিরই নবীন সংস্করণ বলা যাইতে পারে। অথর্ব-পদ্ধতির (কৌশিক° ১. ৬) মতে বৈতানসূত্র শৌনকীয়সূত্র; বৈতানসূত্র যে কৌশিকসূত্র অবলম্বনে রচিত, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং বৈতানসূত্রকে শৌনকীয়সূত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে দ্বিধা থাকে না। দেখা যায়, কোন কোন স্থলে 'দেবদর্শী' 'শৌনকে'র বিরোধী (কৌশিক° ৮৫. ৭. ৮)। কৌশিকসূত্রে মূল প্রাচীন গ্রন্থখানিরও বহু অংশ আছে। বৈতানসূত্রে ও কৌশিকসূত্রে কাশ্মীরে প্রাপ্ত সংহিতার বহু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কাশ্মীরে প্রাপ্ত সংহিতাখানিকে পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাকে 'আথর্বণিকা-পৈপ্পলাদ শাখা' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। অথর্ব-পরিশিষ্টকে (৫৪. ২০) 'পিপ্পলাদি-শান্তিগণ' বলা হয়; কেন না, কাশ্মীরে প্রাপ্ত সংহিতার প্রারম্ভ-প্রতীক হইতেছে —'শং নো দেবী'। তারপর পৈপ্পলাদ ও শৌনকীয় শাখার অনেক স্থলে মিলও রহিয়াছে; এই হেতু অনেকেই ভুল করিয়া থাকেন। সম্ভবত পিপ্পলাদি শৌনক হইতে প্রাচীন। সায়ণও শৌনকীয়

১ M. Bloomfield : The Atharvaveda, 13.

সংহিতার ভাষ্যে কোন কোন স্থলে পৈপ্পলাদের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।[১]

পৈপ্পলাদ শাখা—শৌনকীয় শাখার অথর্ববেদ-সংহিতার ন্যায় পৈপ্পলাদ শাখার অথর্ববেদও ২০ অংশে (কাণ্ডে) বিভক্ত। প্রত্যেক অংশ আবার অনুবাক ও সূক্তে বিভক্ত। দেখা যায় মূল প্রাচীন গ্রন্থের 'শং নো দেবী' (১. ১. ৬) বলিয়া যে মন্ত্র আছে, তাহার সহিত ইহার উদ্বোধন শ্লোকের বিশেষ সামঞ্জস্য আছে। শৌনকীয় সংহিতার উদ্বোধন-মন্ত্র দ্বিতীয় অনুবাকের প্রথম মন্ত্র। অবশিষ্ট খণ্ডগুলির প্রতীক এইরূপ—২ অরসং প্রাচ্যম্ (৪. ৭. ২); ৩ আ ত্বা গন্ (৩. ৪. ১); ৪ হিরণ্যগর্ভঃ (৪. ২. ৭); ৫ পিশঙ্গবাহ্বে সিন্ধুজাতায়ৈ; ৬ তদ্ ইদ্ আস (৫. ২. ১); ৭ সুপর্ণস্ত্বা (৫. ১৪. ১); ৮ কথা দিব অসুরায় (৫. ১১. ১); ৯ উর্ধ্বা অস্য (৫.২৭. ১); ১০ ন তদ্ বিদো যদ্; ১১ বৃষা তেহহম্; ১২ ইমং স্তোমমর্হতে (২০. ১৩. ৭); ১৩ অগ্নিস্তক্মানম্ (৫. ২২. ১); ১৪ ইন্দ্রস্য নু (২. ৫. ৫); ১৫ সম্যগ্ দিগ্ ভ্যঃ; ১৬ অন্তকায় (৮. ১. ১); ১৭ সত্যং বৃহদৃতম্ (১২. ১. ১); ১৮ সত্যেনোত্তভিতা (১৪. ১. ১); ১৯ দোষো গায় (৬. ১. ১); ২০ ধীতী বা যে (৭. ১. ১)।

শৌনকীয় শাখার প্রথম কাণ্ড হইতে সপ্তম কাণ্ড পর্যন্ত পৈপ্পলাদে প্রায় অবিকল রহিয়াছে (৮-১৪)। পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অংশ শৌনকীয় শাখার অনুরূপ। শৌনকীয় শাখার ১৬শ ও ১৭শ কাণ্ড প্রায় অবিকৃতভাবে পৈপ্পলাদে আছে। শৌনকীয়ের ১৯শ কাণ্ডের (ইহার ৭২ সূক্তের ১২শ ঋক্ ব্যতীত) ঋক্‌গুলি পৈপ্পলাদ শাখার গ্রন্থের নানা সূক্তে বিক্ষিপ্ত আছে। এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, উভয় শাখার বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে।[২]

---

১ Whitney : Festgruss an R. V. Roth, 29.

২ M. Bloomfield : The Atharvaveda, 14.15.

পৈপ্পলাদ শাখার একখানি পুঁথি ভিন্ন অন্য কিছুই পাওয়া যায় নাই। এখানি সংহিতা-গ্রন্থ, ইহার কোন পদপাঠ বা ভাষ্যও নাই।

শৌনকীয় শাখার সংহিতা, বহু পদপাঠের পুথি ও সূত্রগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কৌশিক-সূত্র ও বৈতানসূত্র শৌনকীয় শাখারই অন্তর্ভুক্ত। কৌশিক ও বৈতানসূত্রকে বিধানসূত্র বা সংহিতাবিধি বলা যায়। এইগুলির সহিত গৃহ্যসূত্রের কতক কতক সাদৃশ্য আছে। সায়ণকেই অথর্ববেদের ভাষ্যকার বলিতে পারা যায়। অথর্ববেদের একমাত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থ 'গোপথ-ব্রাহ্মণ' শৌনকীয় শাখারই অন্তর্ভুক্ত।

হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী অথর্ববেদের কর্মকাণ্ড (ritual literature) পাঁচটি কল্পকে বিভক্ত। এই পাঁচটি কল্পকে উপবর্ষ 'শ্রুতি' আখ্যা দিয়াছেন। যে সকল ঋষি পাঁচটি কল্পের কার্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা পঞ্চকল্প বা পঞ্চকল্পী নামে অভিহিত হন।[১] উল্লিখিত পঞ্চকল্প এইরূপ :—১ কৌশিকসূত্র বা সংহিতা-বিধি (বা সংহিতা-কল্প), ২ বৈতানসূত্র বা বৈতান-কল্প, ৩ নক্ষত্রকল্প, ৪ শান্তি-কল্প এবং ৫ আঙ্গিরস-কল্প বা অভিচার-কল্প (বা বিধান-কল্প)। শেষোক্ত তিনটি কল্প পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত।

অথর্বপরিশিষ্ট বহু বিষয়ক ; তন্মধ্যে কয়েকটি এইরূপ—১ নক্ষত্র-কল্প (জ্যোতিষ-বিষয়ক), ২ শান্তিকল্প (ঐ) ৩ ইন্দ্রমহোৎসব, ৪ স্কন্দ-যাগ বা ধূর্তকল্প (চৌরবিদ্যা), ৫ গণমালা, ৬ আসুরকল্প (ডাকিনী বা জাদুবিদ্যা), ৭ শ্রাদ্ধকল্প, ৮ উত্তমপটল, ৯ কৌৎসভ্যনিরুক্তনিঘণ্টু, ১০ চরণব্যূহ, ১১ গ্রহযুদ্ধ, ১২ অদ্ভুতশান্তি, ১৩ ঔশনসাদ্ভুতানি প্রভৃতি।

আথর্ব উপনিষদ—অথর্ববেদের (৪৯-শৎ) পরিশিষ্ট চরণব্যূহের মতে নিম্নোক্ত ২৭ খানি উপনিষদ্ অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত।—১ মুণ্ডক, ২ প্রশ্ন, ৩ ব্রহ্মবিদ্যা, ৪ ক্ষুরিকা, ৫ চুলিকা, ৬ অথর্বশির, ৭ অথর্বশিখা, ৮ গর্ভ, ৯ মহা, ১০ ব্রহ্ম, ১১ প্রাণাগ্নিহোত্র, ১২ মাণ্ডুক,

১ M. Bloomfield : The Atharvaveda, 16-17.

১৩ নাদবিন্দু, ১৪ ব্রহ্মবিন্দু, ১৫ অমৃতবিন্দু, ১৬ ধ্যানবিন্দু, ১৭ তেজোবিন্দু, ১৮ যোগশিখা, ১৯ যোগতত্ত্ব, ২০ নীলরুদ্র, ২১ পঞ্চতাপিনী, ২২ একদণ্ডিসংন্যাস, ২৩ অরুণি, ২৪ হংস, ২৫ পরমহংস, ২৬ নারায়ণ ও ২৭ বৈতথ্য।

সর্বসমেত প্রায় ২৩৫খানি উপনিষদ্ পাওয়া গিয়াছে, এগুলির মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত আধুনিক। অথর্ববেদের উপরিউক্ত ২৭খানি উপনিষদ্ সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। বিষয়বস্তু ও ভাষারীতি অনুযায়ী অথর্ববেদের উপনিষদ্গুলির বিভাগ ওয়েবার সাহেব করিয়াছেন। তৎকৃত বিভাগ[১] এইরূপ—১ পুরে বেদান্তোপনিষদ্ (প্রাচীন বেদান্ত), ২ যোগোপনিষদ্, ৩ সংন্যাসোপনিষদ্, ৪ শিবোপনিষদ্ ও ৫ বিষ্ণুপনিষদ্।

অথর্ববেদের বৈয়াকরণিক ও আভিধানিক গ্রন্থগুলির মধ্যে অথর্ববেদ-প্রতিশাখ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিকাণ্ডমণ্ডনে পাণিনি-কৃত আথর্বণসূত্রের উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন অথর্বপরিশিষ্টে নিরুক্ত নিঘণ্টু, চরণব্যূহ ও উত্তম পটল প্রভৃতি রহিয়াছে।[২]

শৌনকীয়-সংহিতা—শৌনকীয়-শাখার অথর্ববেদসংহিতা ২০ কাণ্ডে বিভক্ত; প্রত্যেক কাণ্ডে আবার অনুবাক (পাঠ) ও সূক্ত (স্তোত্র) রহিয়াছে। কাণ্ডগুলির অর্থসূক্ত (অর্থানুযায়ী বিভাগ) ও পর্যায়সূক্ত (কয়েকটি সূক্তের সমষ্টি) বিভাগও আছে। এতদ্ভিন্ন প্রথম ১৮ কাণ্ড প্রপাঠকেও বিভক্ত। গোপথ-ব্রাহ্মণে (১. ১. ৫ ও ৮ ২০ কাণ্ডের অঙ্গিরা ও অথর্বার বংশধর ২০ জন দ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ আছে। কিন্তু নানা কারণে তাহা সমর্থন করা যায় না।

অথর্ববেদের বিষয়বস্তুকে মোটামুটি ১৪টি ভাগে বিভক্ত করা

---

১ Indische Studien, 251 ; Weber : Indische Litt., 173 ; Deussen 543.

২ M. Bloomfield : The Atharvaveda, 20.

যায়।[১] যথা—১ ভৈষজ্যানি—রোগ ও ভূতপ্রেত নিবারণের মন্ত্র, ২ আয়ুষ্যাণি—দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্যলাভের মন্ত্র, ৩ আভিচারিকাণি ও কৃত্যাপ্রতিহরণানি—অসুর, জাদুকর ও শত্রুর উপদ্রববারণের মন্ত্র, ৪ স্ত্রীকর্মাণি—স্ত্রীলোকের আবশ্যক মন্ত্র, ৫ সাংমনস্যানি-সভায় আধিপত্য—নানা বিষয়কর্মে জয়লাভ প্রভৃতির মন্ত্র, ৬ রাজকর্মাণি—রাজার আবশ্যক মন্ত্র, ৭ ব্রাহ্মণগণের হিতকর মন্ত্র, ৮ পৌষ্টিকানি—সম্পদ্ লাভ ও আপদবারণের মন্ত্র, ৯ প্রায়শ্চিত্তানি—কুকর্ম ও পাপ হইতে নিষ্কৃতির মন্ত্র, ১০ সৃষ্টিতত্ত্ব ও দার্শনিক মন্ত্র, ১১ ক্রিয়াকাণ্ডমূলক মন্ত্র ১২ ব্যক্তিগত চিন্তাধারামূলক মন্ত্র, ১৩ বিংশকাণ্ড, ১৪ কুন্তাপ-সূক্ত।

১ ভৈষজ্যানি—অথর্ববেদে প্রাচীন ভারতে কিরূপে রোগনির্ণয় ও তাহার চিকিৎসা হইত তাহা জানিতে পারা যায়। পরবর্তী কালে চিকিৎসাশাস্ত্র 'আয়ুর্বেদ' নামে অভিহিত হয়, হিন্দু-শাস্ত্রমতে ইহা অথর্বেরই উপবেদ। ঋগ্বেদেও কয়েকটি ঋকে রোগ আরোগ্যের ইঙ্গিত আছে (ঋ° ১. ১৯১; ৭. ৫০; ৮. ৯১; ১০. ৫৭-৬০; ১০. ১৩৭, ১৬১, ১৬৩)। অথর্ববেদে রোগ আরোগ্যকর মন্ত্র, বা ক্রিয়া 'ভেষজম্' নামে অভিহিত। দেখা যায়, ওষধি বা উদ্ভিদাদির সাহায্যে চিকিৎসা করা হইত; এরূপ আরোগ্যকর উদ্ভিজ 'ভেষজী' নামে অভিহিত হইয়াছে। জলের চিকিৎসাও ছিল, এরূপ জল অথর্ববেদে 'ভেষজীঃ' নামে খ্যাত। সাধারণত রোগ আরোগ্যকর মন্ত্র বা ক্রিয়াগুলি ভূত-প্রেত-নিবারক ক্রিয়া বা মন্ত্রের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এবং 'ভেষজম্' বলিতে এইরূপ ক্রিয়াও বুঝাইয়াছে। অথর্ববেদে তক্মন্ (জ্বর), যক্ষ্মা, আস্রাব (অতিসার), অপচিৎ (অপচী=দুষ্টক্ষত), কুষ্ঠ, জলোদর, ক্রিমি প্রভৃতি নানা রোগের কথা আছে। রোগ প্রতিকারের জন্য ও ভূত-প্রেতাদির উপদ্রব নিবারণের জন্য মাদুলিধারণের ব্যবস্থাও অথর্ববেদে দেখা

১ M. Bloomfield : The Atharvaveda 57-58.

যায় (অ° ১. ২২. ; ১. ২৫ ; ৫. ৪ ; ৫. ২২ ; ৬. ২০ ; ৬. ১০৯ ; ১৯. ৩৯ ; ১. ১০ ; ৭. ৮৩ ; ৬. ২৪ ; ১. ২ ; ২. ৩ ; ৫. ১৩ ; ৫. ১৬ ; ৬. ১২ ; ৭. ৫৬ ; ৯. ৮. ১, ২ ; ৬. ১৩৭. ৩)।

২ আয়ুষ্যাণি—স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের মন্ত্র ও ক্রিয়াগুলির সহিত 'ভেষজম্'গুলি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট (অ° ২. ১৫. ৭ ; ২. ২৮, ৭. ৩২ ; ১. ৩০ ; ৩. ১১ ; ৫. ২৮, ৩০ ; ৬. ৪১, ৫৩ ; ১৯. ২৪, ২৭. ৫৮ ; ৭০)।

৩ আভিচারিকাণি ও কৃত্যাপ্রতিহরণানি—বেদ ও বৈদিক গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, প্রাচীন আর্যগণকে শত্রুর উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইত। এই ব্যাপারে সাধারণত তাঁহারা দেবগণের সাহায্য কামনা করিয়া স্তুতি করিতেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় ঐশ্বরিক শক্তি বা কোনরূপ দৈববলে শত্রুর অনিষ্ট হইবে, এইরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের ছিল। এতদ্ভিন্ন এক শ্রেণীর মন্ত্রে দেখা যায়, মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে অথবা তদনুযায়ী কাজ করিলে শত্রু, সর্প, ভূতপ্রেতাদি নিবারিত হয়। ঋগ্বেদেও অনুরূপ মন্ত্র রহিয়াছে (ঋ° ৭. ১০৪ ; ১০. ৮৪. ১২৮, ১৫৫)। অথর্ববেদের এইভাগে শত্রুর অনিষ্টকর, এমন কি প্রাণঘাতক মন্ত্রাদিও আছে। এতদ্ভিন্ন জাদুবিদ্যা বা মায়াপ্রভাবে জাদুকর ও শত্রুগণের বিনাশসাধন এবং তাহাদের অনুষ্ঠিত অভিচারক্রিয়া হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় আছে। এই সকল মন্ত্রের সহিত ঋষি অঙ্গিরার নাম সংশ্লিষ্ট (অ° ১. ৭, ৮, ২৮ ; ৬. ৩৭ ; ৭. ১৩, ৫৯ ; ৫. ২৯ ; ৭. ৩৪ ; ৮. ৩ ; ১৯. ৬৫. ৬৬ ; ২. ১১-২ ; ৮. ৫ ; ১০. ১. ৬ ; ৫. ৩১. ১২)।

৪ স্ত্রীকর্মাণি—অথর্ববেদে স্ত্রীলোকের করণীয় কর্তব্যগুলির বিশেষ বর্ণনা আছে এবং গৃহ্যসূত্রের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া আমরণ তাহাকে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। স্বামীর প্রেমলাভ ও তুষ্টিসাধনই তাহার প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য। কিন্তু পুরুষের মন নানা দিকে আকৃষ্ট

হয়, বিশেষত সপত্নী ও অন্য স্ত্রীলোকের আকর্ষণ হইতে তাহাকে রক্ষার জন্য, সন্তান-লাভ, সন্তানের ও স্বামীর মঙ্গলের জন্য, স্ত্রীলোককে নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হইত। অথর্ববেদে স্ত্রীলোকের মঙ্গলকর বহু মন্ত্র আছে (৬. ১৩০-২ ; ৭. ৩৫-৮)।

৫ সাংমনস্যানি—নানা কার্যে সাফল্যলাভের মন্ত্র ও ক্রিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত। হৃদ্য, সংবনন এবং বশীকরণ প্রভৃতি মন্ত্রও ইহার অন্তর্ভুক্ত। মিলন, আকর্ষণ, ক্রোধদমন প্রভৃতির মন্ত্রও আছে (কৌশিক° ৩৬. ২৮-৩১ ; ১৬. ৮. ৯ ; ১৯. ১০ ; অ° ৬. ৪২, ৪৩ ; ৪. ৩১-২ ; ৬. ৬৪, ৭৩ ; ৭. ৫২)।

৬ রাজকর্মাণি—অথর্ববেদের মন্ত্র ও কর্মকাণ্ড জনসাধারণের মঙ্গলকর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আথর্ব-পুরোহিত সাধারণের জন্য নানারূপ ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান করিতেন। এইরূপ শান্তি, হোম ও অভিচার-ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানের জন্য তিনি গ্রামযাজী ও পূগযাজ্ঞিয় বলিয়া অভিহিত হইতেন। অপর দিকে রাজা ও পুরোহিতগণের সর্ববিধ স্বার্থসংরক্ষণেও অথর্ববৈদিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। রাজা ও পুরোহিতগণকে এই সকল ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে অথর্ববৈদিক অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতে হইত। অথর্ব ব্রাহ্মণ যেমন রাজপুরোহিত থাকিতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে রাজাকে রক্ষা করাও তাহার ধর্ম ছিল। রাজার অভিষেক, নির্বাচন, শক্তি, সম্পদ, আত্মরক্ষা, রাজ্যরক্ষা, শত্রুদমন, এমন কি রাজার আধ্যাত্মিক মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই আথর্ব-পুরোহিতের উপর নির্ভর করিত। অথর্ববেদে এই বিষয়ক বহু সূক্ত আছে (১. ১৯. ২১ ; ৩. ১. ৫ ; ৬. ৬৫-৭)। কৌশিক-সূত্রেও এইরূপ বহু সূত্র 'রাজকর্মাণি' নামে অভিহিত (১৪-১৭)। সূত্রগুলিতে (অ° ৩. ৩. ২ ; ৪. ৬) রাজাকে ইন্দ্রের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে। একটি সূক্তে (৪. ৮) রাজার অভিষেকের কথা ও রাজোচিত গুণের কথা বর্ণিত আছে। অপর একটি সূক্তে (৩. ৪.) রাজার মর্যাদা স্পষ্টই বুঝা যায়।

রাজচক্রবর্তীত্ব লাভের প্রক্রিয়া কয়েকটি সূক্তে আছে (৪. ২২ ; ৬. ৫৪. ৮৬-৮ ; ৭. ৮৪)। রাজার রক্ষার জন্য পর্ণকাষ্ঠের মাদুলির ব্যবস্থা ছিল (৩. ৫)। হস্তীর শক্তি-বৃদ্ধির সুষ্ঠু উপায়ও ছিল (৩. ২২)। রাজা ও ব্রাহ্মণগণের যশের প্রার্থনা বহু শ্লোকে আছে। এগুলিতে রাজা এবং ব্রাহ্মণের বহু প্রশংসা পাওয়া যায় (৬. ৩৯, ৫৮, ৬১, ৬৯)।

৭ **ব্রাহ্মণ-সম্পর্কীয় সূক্ত**—অথর্ববেদে ব্রাহ্মণদিগের মর্যাদা ও স্বার্থসংরক্ষণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা 'দেব' আখ্যা গ্রহণ করিয়া নিজেদের মর্যাদা সুরক্ষিত করিয়াছেন দেখা যায়। ব্রাহ্মণেরাই দেবতা ও মানবসমাজের মধ্যবর্তী; তাঁহাদিগের পৌরোহিত্যে বা প্রতিনিধিত্বেই সাধারণে দেবতাদিগের নিকট নিজেদের ইহলৌকিক অথবা পারত্রিক সর্ববিধ মঙ্গলামঙ্গলের আবেদন জানাইতে পারে। রাজাও আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা ও প্রজারক্ষায় সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণের অধীন। সুতরাং ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থ যাহাতে কোন প্রকারে নষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থাও ছিল। ব্রাহ্মণের পত্নী-লোভী ও ধন-লোভিগণ অতিশয় পাপী ও ঘৃণ্য বলিয়া গণ্য হইত। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যাচারকারীদিগের প্রতিও কঠোর শাস্তির বিধান ছিল (অ° ৫. ১৭. ৯ ; ১২. ৫)।

ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে সাধারণের পূজার্হ করিবার জন্য জ্ঞান-চর্চায় পবিত্র জীবন-যাপনে কার্পণ্য করিতেন না (অ° ৬. ৫৮, ৬৯ ; ৪. ৩০ ; ৬. ১০৮ ; ১৯. ৪. ৪১-৩ ; ৭. ৫৪, ৬১)।

৮ **পৌষ্টিকানি**—প্রায় সমস্ত বৈদিক সূক্তকেই ঐশ্বর্য ও আপন্মুক্তির প্রার্থনা বলা যায়। অথর্ববেদে কামনাসিদ্ধির বহু প্রক্রিয়া রহিয়াছে। ইহাতে গৃহনির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া নির্বিঘ্নে জীবন-যাপনের প্রায় সকল প্রণালীই বর্ণিত আছে। ইহাতে গৃহ-নির্মাণ (৯. ১২) বজ্রপাত হইতে গৃহরক্ষা (১. ১৩ ; ৭. ১১ ; ৭. ৪১), অগ্নিদাহ হইতে গৃহরক্ষা (৬. ২১ ; ৬. ১০৬), নদীর গতি-

পরিবর্তন বা নূতন খালে নদী-পরিবর্তন (৩. ১৩), ক্ষেত্রকর্ষণ (৩. ১৭), শস্যবৃদ্ধি (৩. ২৪ ; ৬. ৭৯), শস্য হইতে কীটনিবারণ (৬. ৫০), অনাবৃষ্টি-নিবারণ (৪. ১৫ ; ৬. ২২ ; ৭. ১৮). গবাদি পশুর মঙ্গলকার্য (২. ২৬ ; ৩. ১৪ ; ৪. ২১ ; ৭. ৭৫) প্রভৃতি সংক্রান্ত বহু মন্ত্র-তন্ত্র আছে।

এতদ্ভিন্ন আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্যলাভের জন্য বহু মন্ত্র ও প্রক্রিয়া ইহাতে রহিয়াছে (অ° ১. ১৫ ; ২. ২৬ ; ১৯. ১ ; ৪. ১৩ ; ৭. ৬৯ ; ১. ৩১ ; ৬. ১০)।

আপদ্-নিবারণের মন্ত্রগুলির অধিকাংশই নানারূপ অভিচার-ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট (অ° ১. ২৬ ; ৪. ২৩-২৯ ; ৬. ৩, ৪, ৭ ; ৭. ১১২ ; ১১. ২ ; ১৯. ৪৭-৪৯)।

৯ প্রায়শ্চিত্ত—যজ্ঞকার্যে ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা শ্রৌতশাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। বেদে 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দটি নাই ; অথর্ববেদে 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দটি একবার মাত্র আছে (১৪. ১. ৩০)। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে ইহার অভাব নাই। ' জ্ঞানত কিংবা অজ্ঞানত কোন পাপকর্ম করিলে তাহার শাস্তি অনিবার্য ; সুতরাং সেই শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। অথর্ববেদে প্রায়শ্চিত্তের বহু মন্ত্র ও ক্রিয়ার কথা আছে। পাপমুক্তি, ঋণমুক্তি, রোগমুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এগুলিকে বিভক্ত করা যায় (অ° ৬. ১১০-১২১ ; ৬. ৬৩, ৮৪ ; ৬. ১৯, ৫১ ; ৩. ২৯ ; ৭. ৮ ; ৬. ৭১ ; ৭. ৫, ৩৭)।

১০ সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রহ্মবাদমূলক সূক্ত—অথর্ববেদের সৃষ্টিতত্ত্বমূলক সূক্তগুলির সহিত ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ব্রহ্মবাদ-মূলক সূক্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। সাধারণ পুরোহিতের কার্যের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর এই সকল সূক্তের সবই যে পরবর্তীকালে রচিত তাহাও মনে হয় না, কারণ অন্য ব্যাপারের মন্ত্রেও এসকল কথা

আছে (অ° ৪. :৯ ; ৯. ২)। কয়েকটি সূক্তে (১০. ২.; ১১. ৮) পুরুষের উৎপত্তি, প্রকৃতি, আকার ও দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে— মন্যু (ইচ্ছা) সংকল্পের গৃহ হইতে আকূতিকে (বুদ্ধি) পরিচালনা করে; তপ ও কর্ম পরিণয়ার্থী; ব্রহ্মই ইহাদের মধ্যে প্রধান। ইহাদের মিলনে আবার মন্যু (প্রাণ, অপান, চক্ষু প্রভৃতি) হইতে পুরুষের উৎপত্তি। অন্যত্র (৯. ২. ৫) আছে, বাক্ বিরাট্ হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি। বিরাট্ই সৃষ্টির মূল প্রকৃতি। তাঁহার দুই বৎস (সূর্য ও চন্দ্র) জল হইতে উদ্ভূত। আত্মা ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে চরমকথা সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় (১০. ৮, ৪৩, ৪৪)। এইরূপ নানা মন্ত্রে অথর্ববেদ পরিপূর্ণ।

১১ **বৈদিক কর্মকাণ্ড**—বৈতানসূত্রকে অথর্ববেদের শ্রৌতসূত্র বলা যাইতে পারে, কিন্তু বৈতানসূত্র অত্যন্ত পরবর্তীকালে রচিত; সুতরাং ইহাতে অন্যান্য বৈদিক কর্মকাণ্ডের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বৈতানসূত্রে অথর্ববেদের ২০শ কাণ্ড সম্পূর্ণভাবে পুনর্লিখিত হইয়াছে। ৬ষ্ঠ ও ৭ম কাণ্ডের বহু মন্ত্রও ইহাতে স্থান পাইয়াছে; এইগুলি বৈদিক কর্মকাণ্ডেরই দ্যোতক। বিশেষত অন্যান্য শ্রৌতশাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহাতে নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে। কৌশিকসূত্রের সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মূলত অথর্ববেদে এই সূক্তগুলি কর্মকাণ্ডমূলক ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অথর্ববেদের কর্মকাণ্ডমূলক সূক্তগুলি অবলম্বন করিয়াই বোধহয় পরবর্তী সূত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। বৈদিক কর্মকাণ্ডে 'অগ্নিষ্টোম' অন্যতম অনুষ্ঠান। অথর্ববেদের সূক্তে (৬. ৪৭-৪৮) কর্মকাণ্ডের একটা সাধারণ আভাস পাওয়া যায়। বৈতানসূত্রে (২১. ৭) তিন 'সবনের' সহিত ইহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু অথর্ববেদের এই সকল সূক্ত অন্যান্য বেদ হইতে বা অন্যান্য বেদের অনুসরণে রচিত কি না সন্দেহ হইতে পারে। একটি সূক্তে (৬. ৪৮) যজুর্বেদের বিধানের সহিত ইহার সম্পূর্ণ

সামঞ্জস্য থাকিলেও অন্যান্য শ্রৌত-বিধির সহিত ইহাতে পার্থক্য আছে। কৌশিকসূত্রে (৫৬. ৪ ; ৫৯. ২৬-২৭) ইহার উল্লেখ আছে। এই সূক্তগুলির বিষয়বস্তু বিচার করিয়া মনে হয় সবন হইতেই এগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। বহু সূক্তে এইরূপে অন্যান্য বেদের সহিত সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য আছে। সুতরাং অথর্ববেদের সহিত এগুলিকে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট করা যায় না।

এতদ্ভিন্ন অথর্ববেদে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক প্রকার কর্মকাণ্ডের কথা আছে, তাহা 'হবির্যজ্ঞের' সহিত সংশ্লিষ্ট। নানা উদ্দেশ্যে এইরূপ 'হবির্যজ্ঞ' সম্পন্ন হইত। হবির বিশেষণ হইতে এইরূপ যজ্ঞের উদ্দেশ্য বুঝা যায়।—'সাংশ্রাব্য হবিঃ' (১. ১৫ ; ২. ২৬ ; ১৯, ১), নৈর্বাধ্য হবিঃ (৬. ৭৫), সমান হবিঃ (৬. ৬৪), যশঃ হবিঃ (৬. ৩৯) ইত্যাদি।

১২ অথর্ববেদের একটি বৃহৎ অংশ (১৩শ কাণ্ড—১৮শ কাণ্ড) সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপারমূলক। ১৩শ কাণ্ডে রোহিতের (সূর্য দেবতা) উদ্দেশ্যে চারিটি সুদীর্ঘ স্তোত্র আছে। ইহাতে সূর্যকে বিশেষভাবে আথর্বগণের হিতকারী বলা হইয়াছে। এই কাণ্ডের নাম রোহিতকাণ্ড।

১৪শ কাণ্ডকে আথর্বগণের বিবাহ কাণ্ড বলা যায়। ঋগ্বেদের সূর্য-সূক্তের (ঋ° ১০. ৮৫) সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। ইহাতে অতিরিক্ত অনেকগুলি মন্ত্র আছে, সেগুলি ঋগ্বেদে নাই। গৃহ্যসূত্রে এই মন্ত্রগুলি কোথাও কোথাও একটু পরিবর্তিত আকারে আছে।

১৫শ কাণ্ডে ব্রাত্যগণের প্রশংসা আছে। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া সূক্তগুলি রচিত। এখানে ব্রাত্য বলিলে কি বুঝায় সায়ণ ও হুইট্‌নী তাহা বুঝান নাই। তবে ব্রাত্যগণ যে উপনয়ন-সংস্কার-বর্জিত স্মৃত্যুল্লিখিত আর্য নয় তাহা স্থির। ব্রাত্যেরা আর্য ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিল না। ইহারা অপবিত্র, অর্ধসভ্য ছিল (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ

১৭. ১. ২)। ব্রাত্যস্তোমের দ্বারা ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ-সমাজে গ্রহণ করা হইত (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ১৭. ১; লাট্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ৮. ৬)। অথর্ববেদে ইহারা ব্রহ্মচারী (১৫. ৫), ইহাদের ব্রাহ্মণ্যে দীক্ষার আভাসও আছে (অথর্ব ১৫. ২)। এই কাণ্ডে বহু সম-মন্ত্র স্থান পাইয়াছে।

১৬শ কাণ্ডের দুইটি অংশ। প্রথম অংশে (১ম অনুবাক) জলের স্তুতিমূলক মন্ত্র আছে; অথর্ব-পরিশিষ্টে (১০) এইগুলিকে 'অভিষেক'-মন্ত্র বলা হইয়াছে। অন্য অংশে (৫-৯) স্বপ্নভ্রমণ-নিবারক মন্ত্র আছে।

১৭শ কাণ্ড বিশেষভাবে 'আয়ুষ্যাণি'র সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাতে (বিষাসহির উদ্দেশ্যে) একটি সূক্ত আছে।

১৮শ কাণ্ডের চারিটি সূক্ত (চারি অনুবাক) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ামূলক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূক্তের সহিত এইগুলির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহার নাম যমকাণ্ড—অমঙ্গলপ্রদ বলিয়া বৈদিকগণ ইহা অভ্যাস করেন না।

১৯শ কাণ্ডে ৭২ সূক্ত। ইহার ২৩শ সূক্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ১৮শ কাণ্ড পর্যন্ত প্রথমে অথর্ববেদ ঈরিত হইয়াছিল। এই সূক্ত প্রকারান্তরে অথর্ববেদের সূচীর সন্ধান দিয়াছে এবং আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র পদ্ধতিক্রমে অথর্ববেদের ঋষিগণের (অর্থাৎ সূক্তগুলির) বর্ণনা করিয়াছে। শতর্চী, মাধ্যম, ক্ষুদ্রসূক্ত ও মহাসূক্ত—আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রপদ্ধতি। ২৩শ ও ২২শ সূক্তের বচন যথাক্রমে এইরূপ—

আথর্বণানাং চতুর্ঋচেভ্যঃ স্বাহা। ১। পঞ্চর্চেভ্যঃ স্বাহা। ২। ষড়্চেভ্যঃ স্বাহা। ৩। সপ্তর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৪। অষ্টর্চেভ্যঃ স্বাহা।৫। নবর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৬। দশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৭। একাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ৯। ত্রয়োদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১০। চতুর্দশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১১। পঞ্চদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১২। ষোড়শর্চেভ্যঃ

স্বাহা। ১৩। সপ্তদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৪। অষ্টাদশর্চেভ্যঃ স্বাহা। ১৫। একোনবিংশতিঃ স্বাহা। ১৬। বিংশতিঃ স্বাহা। ১৭। মহৎকাণ্ডায় স্বাহা। ১৮। তৃচেভ্যঃ স্বাহা। ১৯। একর্চেভ্যঃ স্বাহা। ২০। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ২১। একদ্বৃচেভ্যঃ স্বাহা। ২২। রোহিতেভ্যঃ স্বাহা। ২৩। সূর্যাভ্যাং স্বাহা। ২৪। ব্রাত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৫। প্রাজাপত্যাভ্যাং স্বাহা। ২৬। বিষাসহৈ স্বাহা। মঙ্গলিকেভ্যঃ স্বাহা। ২৮। ব্রহ্মণে স্বাহা। ২৯।

আঙ্গিরসানামাদ্যৈঃ পঞ্চানুবাকৈঃ স্বাহা। ১। ষষ্ঠায় স্বাহা। ২। সপ্তমাষ্টমাভ্যাং স্বাহা। ৩। নীলনখেভ্যঃ স্বাহ। ৪। হরিতেভ্যঃ স্বাহা। ৫। ক্ষুদ্রেভ্যঃ স্বাহা। ৬। পর্যায়িকেভ্যঃ স্বাহা। ৭। প্রথমেভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ৮। দ্বিতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ৯। তৃতীয়েভ্যঃ শঙ্খেভ্যঃ স্বাহা। ১০। উপোত্তমেভ্যঃ স্বাহা। ১১। উত্তমেভ্যঃ স্বাহা। ১২। উত্তরেভ্যঃ স্বাহা। ১৩। ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ১৪। শিখিভ্যঃ স্বাহা। ১৫। গণেভ্যঃ স্বাহা। ১৬। মহাগণেভ্যঃ স্বাহা। ১৭। সর্বেভ্যোহঙ্গিরোভ্যো বিদগণেভ্যঃ স্বাহা। ১৮। পৃথক্‌সহস্রাভ্যাং স্বাহা। ১৯। ব্রহ্মণে স্বাহা। ২০।

অর্থাৎ আথর্বগণের চারি ঋকে গ্রথিত ঋষিগণের (=সূক্তসমূহের) প্রতি স্বাহা। পাঁচ ঋকে গ্রথিত ঋষিগণের প্রতি স্বাহা। ক্রমশ এইরূপ ১৮শ ঋকে গ্রথিত ঋষিগণের প্রতি স্বাহা। অতঃপর, ১৯শ ও ২০শের প্রতি স্বাহা। পুনরায়, তিন ঋকে গ্রথিত এক ঋকে গ্রথিত, ক্ষুদ্র, এক হইতে ন্যূন ঋকে গ্রথিত মহাকাণ্ডের প্রতি স্বাহা। প্রথম ১২শ কাণ্ডকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। কেন না, তার পরের পাঁচটি তাহাদের নাম ও সংখ্যা-ক্রমে বিবৃতি হইয়াছে। যথা—রোহিতসূক্তের প্রতি স্বাহা (১৩শ), সূর্যার (২) সূক্তের প্রতি স্বাহা (১৪শ), দুই ব্রাত্যসূক্তের প্রতি (১৫শ), দুইটি প্রজাপতি সূক্তের প্রতি (১৭শ), মাঙ্গলিক সূক্তের প্রতি (১৮শ) স্বাহা। ব্রাত্য ও প্রজাপতি সূক্তের দ্বিসংখ্যা

এই কাণ্ডগুলিতে নিবদ্ধ বর্তমান সূক্তসংখ্যার সহিত সমঞ্জস নয়। কিন্তু অন্যান্য কাণ্ডের সংখ্যার সহিত হুবহু মিল সম্ভবত ১৯শ কাণ্ড সংযোজিত হইবার পর এই দুই কাণ্ডের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। হুইট্‌নী বলেন, এই (১৯শ) কাণ্ডের সূক্তগুলি পিপ্পলাদ-শাখার অন্য কাণ্ডে চলিয়া গিয়াছে। ব্লুমফীল্ড বলেন, বৈতানসূত্র-মতে সোমযাগে শস্ত্র ও স্তোত্ররূপে ঈরিত হইত বলিয়া কুন্তাপ সূক্ত ব্যতীত ২০শ কাণ্ডের সমস্ত সূক্তই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মোটের উপর অন্যূন ১২০০ অথর্বমন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত।

২০শ কাণ্ডে সর্বসুদ্ধ ১৪৩টি সূক্ত আছে। এগুলির মধ্যে মাত্র ১৩টি সূক্তে আথর্ব-বৈশিষ্ট্য আছে (২, ৪৮, ৪৯, ১২৭-১৩; ও ৩৪ সূক্তের ১২, ১৬ ও ১৭ ঋক্, ১০৭ সূক্তের ১৩ ঋক্)। কুন্তাপ-সূক্তগুলির (১২৭-১২৬) বৈশিষ্ট্য আছে। পৈপ্পলাদ-শাখায় এতগুলির কোন উল্লেখ নাই। উপরি-উক্ত সূক্তগুলি ভিন্ন অন্য প্রায় সকল সূক্তই ইন্দ্রের স্তুতি-বিষয়ক এবং ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডল হইতে গৃহীত; অবশ্য স্থানে স্থানে একটু-আধটু পরিবর্তন আছে। এই কাণ্ড শস্ত্রকাণ্ড নামে অভিহিত।

শৌনকীয় সংহিতার ২০শ কাণ্ডের সূক্তগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। আর এই কাণ্ডটি প্রথমে অথর্বসংহিতায় ছিল না, পরে সংযোজিত হইয়াছে। আর ১৯শ কাণ্ডটি মূলত সংহিতার অন্তর্গত ছিল না। এ ছাড়া অথর্ববেদ-সংহিতার সূক্তগুলির প্রায় ⅐ অংশ ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। অধিকন্তু অথর্ববেদে যতগুলি ঋক্ ঋগ্বেদের ঋকের সহিত অভিন্ন সেগুলি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির অধিকাংশ ১ম ও ৮ম মণ্ডলে পাওয়া যাইবে। ১২শ ও ২০শ কাণ্ড বাদ দিয়া ১৮টি কাণ্ডে সূক্তগুলি বেশ বিশিষ্ট পদ্ধতিতে অতি সাবধানে সাজানো হইয়াছে। প্রথম সাতটি কাণ্ডের প্রত্যেক সূক্তে চারিটি করিয়া ঋক্ আছে, দ্বিতীয় কাণ্ডে পাঁচটি, তৃতীয় কাণ্ডে ছয়টি, চতুর্থ কাণ্ডে সাতটি; পঞ্চম

কাণ্ডের কোন সূক্তে ৮টির কম অথবা ১৮টির বেশী ঋক্ নাই। ৬ষ্ঠ কাণ্ডে ১৪২টি সূক্ত এবং প্রত্যেক সূক্তে প্রায়ই তিনটি করিয়া ঋক্। ৭ম কাণ্ডে ১১৮টি সূক্ত আছে—তন্মধ্যে অধিকাংশতেই ১টি বা ২টি ঋক্।

৮ম কাণ্ড হইতে ১৪শ কাণ্ড, ১৭শ ও ১৮শ কাণ্ডের সূক্তগুলি সবই খুব দীর্ঘ, তবে ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতম ঋক্ ৮ম কাণ্ডের ১ম সূক্তে এবং বৃহত্তম ঋক্ ১৮শ কাণ্ডের ৪র্থ সূক্তে। ৮ম কাণ্ডের ১ম সূক্তের ঋক্-সংখ্যা ২১ এবং ১৮শ কাণ্ডের ৪র্থ সূক্তের ঋক্-সংখ্যা ৮৯। ১৫শ কাণ্ড ও ১৬শ কাণ্ডের বেশীর ভাগ গদ্যে ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের সদৃশ ভাষা ও পদ্ধতিতে রচিত।

এই তো গেল ঋক্‌সংখ্যা-সন্নিবেশের কথা। ঋক্‌গুলির বিষয়-সম্বন্ধেও একটা প্রণালীর সন্ধান পাওয়া যায়। ২, ৩, ৪, এমন কি অধিক সূক্ত যখন একই বিষয়ের হয় তখন প্রায় দেখা যায় সেগুলি পাশাপাশি বসিয়া থাকে।

কাণ্ডের মধ্যে আবার তিনটি প্রধান বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ১ ১ম হইতে ৬ষ্ঠ কাণ্ড—৭ম কাণ্ডে ইহাদের পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে ; এই সাতটি কাণ্ডের বিষয়বস্তু নানা রকমের এবং ইহাদের সূক্তগুলি ছোট ছোট। ২ ৮ম হইতে ১২শ কাণ্ড ; ইহাদেরও বিষয়-বস্তু নানাবিধ—কিন্তু এগুলির সূক্তসমূহ দীর্ঘ এবং ৩ ১৩শ হইতে ১৮শ কাণ্ড—১৯শ কাণ্ডে ইহাদের পরিশিষ্ট সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৩শ কাণ্ড হইতে ১৮শ কাণ্ড প্রত্যেক কাণ্ডের বিষয়বস্তু কোন একটি বিশিষ্ট প্রকরণ-সম্বন্ধে রচিত। যেমন ১৩শ কাণ্ড—রোহিত কাণ্ড (লোহিত সূর্যের সম্বোধন আছে বলিয়া) ১৪শ কাণ্ড—বিবাহ কাণ্ড ; ইহাতে কেবল বিবাহ-বিষয়ক স্তুতি। ১৫শ—ব্রাত্যকাণ্ড। ১৮শ কাণ্ড—যমকাণ্ড, ইহা মৃতসংকার-সম্বন্ধীয় সূক্ত। ১৬শ কাণ্ড—দুঃস্বপ্নবিষয়ে রচিত। ১৭ কাণ্ড—বিষাসহি সম্বোধনে লিখিত।

কুন্তাপ-সূক্ত—অথর্ববেদের ২০শ কাণ্ড (১২৭-১৩৬) কুন্তাপসূক্ত। এই সূক্তগুলি ঋগ্বেদীয় শাকল সংহিতায় নাই। এগুলি পরে যজ্ঞার্থে ঋগ্বেদের অন্য কোন শাখা হইতে সংযোজিত হইয়া থাকিবে। সায়ণ বলেন যে, ইহা খিলসূক্ত। একমাত্র যাগ-ব্যাপারের জন্যই যে এইগুলির প্রয়োজন হইত তাহা ঐতরেয় (৬. ৩২, ৩৩) ও কৌষীতকি (৩০. ৫) হইতে জানিতে পারা যায়। ঐতরেয়ে কুন্তাপ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু কৌষীতকিতে হইয়াছে। ঐতরেয়ে নারাশংস, রৈভি, কারব্যা পরিক্ষিতিয়া প্রভৃতির নাম কুন্তাপসম্পর্কে উল্লিখিত আছে। গোপথ ব্রাহ্মণেও ইহাই কুন্তাপের ব্যাখ্যারূপে একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।

গোপথ-ব্রাহ্মণ—গোপথ-ব্রাহ্মণের দুই ভাগ—পূর্ব-ব্রাহ্মণ ও উত্তর ব্রাহ্মণ। পূর্ব ব্রাহ্মণের পাঁচটি প্রপাঠক এবং উত্তর-ব্রাহ্মণের ছয়টি প্রপাঠক। পূর্ব-ব্রাহ্মণ ভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের রীতি অনুসরণ করে নাই। ইহাতে উপনিষদে বর্ণিতব্য বিষয়ের অবতারণা অত্যন্ত অধিক। কোন কোন অংশ সম্পূর্ণভাবে উপনিষদের প্রকৃতি ধারণ করিয়াছে; গোপথ-ব্রাহ্মণের একটি অংশ (১. ১. ১৬-৩০) সম্পূর্ণভাবে প্রণবোপনিষদের সমতুল্য। এক স্থলে ইহা উপনিষদ্ নামের দাবি করিতেছে (১. ১. ৩১-৩৮)। বৈতান-সূত্র কিংবা অন্য কোন শ্রৌতগ্রন্থের সহিত কর্মকাণ্ডাদি বিষয়ে ইহার কোন সাদৃশ্যও দেখা যায় না।

পূর্ব-ব্রাহ্মণের প্রথম প্রপাঠকের কয়েকটি মন্ত্রে (১. ১. ১-১৫) সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আছে; ইহা প্রায় উপনিষদের প্রকৃতি-সম্পন্ন। ইহাতে ব্রহ্মের ধর্ম হইতে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের উৎপত্তির কথা আছে। এই প্রপাঠকের অন্য অংশে (১. ১. ১৬-৩০) প্রণব অর্থাৎ 'ওম্' বিশ্বসৃষ্টির কথা আছে। অপর একটি অংশে গায়ত্রী-মাহাত্ম্য আলোচিত হইয়াছে (১. ১. ৩১-৩৮)।

১. ১. ৩৯ আচমন-বিধি। ইহাকে বৈতান (১. ১৯) ও

কৌশিকসূত্রের (৩. ৪; ৯০. ২২) টিপ্পনী বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রপাঠকে ব্রহ্মচারীর কর্তব্য-সম্বন্ধে আলোচনা আছে (১. ২. ১-৯)। ইহাতে বহু বিষয়ের অবতারণা আছে: অগ্ন্যাধেয় (১. ২. ১৮-২১), সান্তপন (১. ২. ২২-২৩), ব্রহ্মৌদন (১. ২. ১৫-১৭) প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় প্রপাঠকেও (১. ৩. ১-৫) অথর্বগণের প্রশংসা আছে। কোন কোন স্থলে তাহাদিগকে 'দেব' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (১. ৩. ১)। কয়েক স্থলে (১. ৩. ৬-১০) পূর্ণিমা ও অমাবস্যা যজ্ঞের রহস্যময় ব্যাখ্যাও আছে। অধিকন্তু এই প্রপাঠকে অগ্নিহোত্র (১. ৩. ১১-১৬), অগ্নিষ্টোম ও দীক্ষা (১. ৩. ১৭-২৩) প্রভৃতি বিষয় আছে।

চতুর্থ প্রপাঠকে বাৎসরিক সূত্রের রহস্যময় ব্যাখ্যা। পঞ্চম প্রপাঠকের প্রথম অংশ (১. ৫. ১-২২) সত্র-সম্বন্ধীয়, অন্য অংশ (১. ৫. ২৩-২৫) যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়।

উত্তরব্রাহ্মণের নাম যজ্ঞকর্ম বলা যাইতে পারে। ইহাতে প্রথম প্রপাঠকে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা যাগ (২. ১. ১-১২), কাম্যেষ্টি (২. ৬. ১৩-২৬), আগ্রায়ণ, অগ্নিচয়ন, চাতুর্মাস্য (২. ১. ১৭-২৬) প্রভৃতি বিষয় আছে। দ্বিতীয় প্রপাঠকে অগ্নিষ্টোমের তনূনপ্ত্র ক্রিয়া, (২. ২. ১-৪), প্রবর্গ্য কর্ম (২. ২. ৫-৬), উপসদদিন ও অগ্নিষ্টোম (২. ২. ৭-১২), স্তোমভাগমন্ত্র (২. ২. ১৩-১৫) প্রভৃতি আছে।

তৃতীয় প্রপাঠকে অগ্নিষ্টোম, বষট্‌কার, অনুবষট্‌কার, ঋতুগ্রহ (২. ৩. ১-১১), একাহের প্রাতঃসবন (২. ৩. ১২-১৯), মাধ্যন্দিন সবন (২. ৩. ২০-২. ৪ ৪) প্রভৃতি বিষয় আছে।

চতুর্থ প্রপাঠকে মাধ্যন্দিন সবন (২. ৪. ১-৪), তৃতীয় সবন (২. ৪. ৪. ৫-১৮), ষোড়শি-যাগ প্রভৃতি বিষয় আছে।

পঞ্চম প্রপাঠকে অতিরাত্র-কর্ম (২. ৫. ১-৫) সৌত্রামণী,

বাজপেয়, অপ্তোর্যাম-কর্ম (২. ৫. ৬-১০), অহীন-সত্র-যজ্ঞ (২. ৫. ১১-২. ৬. ১৬) প্রভৃতি বিষয় আছে।

ষষ্ঠ প্রপাঠকে অহীন-যজ্ঞের বিষয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে।

ছন্দ—অথবের্বদের মূল ভাগের ছন্দ অন্যান্য বৈদিক ছন্দের মত। স্বল্পপরিসর ঋকে গায়ত্রী, অনুষ্টুভ, পংক্তি, এবং দীর্ঘ-পরিসর ক্ষেত্রে ত্রিষ্টুভ ও জগতীছন্দ অনুবর্তিত হইয়াছে। শৌনকীয়-শাখার গ্রন্থের ১৫শ কাণ্ড এবং ১৬শ কাণ্ডের প্রায় সমস্তই গদ্যে রচিত। বিশেষত এই দুই কাণ্ডে গদ্য ও পদ্য স্থানে স্থানে এমনভাবে মিশ্রিত হইয়াছে যে, তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই ভগ্ন ছন্দের ও নানা ছন্দের মিশ্রণ দেখা যায়; ইহাতে মনে হয়, পরবর্তী কালে রচিত কোন কোন অংশ মূল রচনার সহিত মিশাইয়া দেওয়ায় এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। কোন কোন সূক্তের (১. ১৩; ১. ১৮; ২. ২৯; ৪. ১৬ প্রভৃতি) অনুষ্টুভে আরম্ভ ও ত্রিষ্টুভে শেষ হইয়াছে। কোন কোন স্থলে অনুষ্টুভ ও গায়ত্রীর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে (২. ৩২; ৪. ১২)। বিবাহ-সূক্ত ও শ্রাদ্ধ-সূক্ত বৈদিক অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত। ঋগ্বেদের অনুষ্টুভ ছন্দের রীতি অথর্ববেদের অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় নাই। পরন্তু গৃহ্যসূত্রের ছন্দোরীতির সহিত অথর্ববেদের ছন্দোরীতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে অথর্ববেদ-সংহিতা ব্রাহ্মণের ভাষা ও রীতিতে রচিত।

অথর্ববেদের সহিত অন্যান্য বেদ ও বৈদিক মন্ত্রের সাদৃশ্য—অথর্ববেদের কাণ্ডগুলির প্রায় সপ্তমাংশের সহিত ঋগ্বেদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। বিশেষত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতে ইহার প্রায় অর্ধেক বিষয়বস্তু গৃহীত হইয়াছে। সাদৃশ্যমূলক অংশগুলির মধ্যে সূর্য-সূক্ত (অ° ১৪) ও শ্রাদ্ধ-সূক্ত (অ° ১৮) ভিন্ন প্রায় সমস্ত মন্ত্রগুলিই ঋগ্বেদের অনুযায়ী।

যজুর্বেদের বিষয়বস্তুর সহিত বহুস্থলে অথর্ববেদের সাদৃশ্য থাকিলেও কোন্‌টির বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী তাহা বলা যায় না। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ মৈত্রায়ণি-সংহিতা (১. ৫. ২) ও আপস্তম্ব-শ্রৌতসূত্রের অগ্নিসম্বন্ধীয় পাঁচটি মন্ত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অথর্ববেদে (২. ১৯) এই পাঁচটি ছাড়াও এই সঙ্গে একই ভাবে বায়ু, সূর্য, চন্দ্র ও অপ্-সম্বন্ধে চারিটি সূক্ত আছে। এইরূপে মৃগারসূক্তগুলিতেও (অ° ৪. ২৩-৯) যজুর্বেদের মন্ত্র আছে।

শ্রৌতসূত্র এবং অথর্ববেদের এমন কয়েকটি বিষয় আছে যে, তাহাদের সহিত ঋগ্বেদ কিংবা যজুঃ-সংহিতার কোন সাদৃশ্য নাই। এই সকল বিষয়ে শ্রৌতসূত্র ও অথর্ববেদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অথর্ববেদের ২. ৬ সূক্ত বাজসনেয়ি-সংহিতা (২৭. ১), তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৪. ১. ৭. ১ই°), ও মৈত্রায়ণি-সংহিতায় (২. ১২. ৫) আছে ; অবশ্য দুই-এক স্থলে যে পাঠান্তর নাই তাহা নয়।

অথর্ববেদের ঋষি—পূর্বোল্লিখিত ১৯শ কাণ্ডের ২৩শ সূক্ত নিশ্চয়ই পরে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে কোন সূক্তের ঋষির উল্লেখ নাই, কেবল সাধারণভাবে আথর্বণ সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। দেখা যায়, পরে এই সংজ্ঞা অথর্ববেদে ঋষিগণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। আঙ্গিরস ও ভৃগুর নামও সংযুক্ত হইয়াছে। এখানে এই ঋষিগণকে আথর্বণ এই সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাণ্ডুরঙ পণ্ডিত-প্রকাশিত সায়ণ-ভাষ্যে এক একটি সূক্তের ঋষিনাম প্রদত্ত হয় নাই। অজমের-সংস্করণেও কোন ঋষির নাম নাই। গোপথ-ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে একটি আখ্যায়িকানুসারে ব্রহ্মা প্রথমে তাঁহার ঘর্ম হইতে ভৃগুকে সৃষ্টি করেন ; ভৃগু অথর্বা হইলেন এবং অথর্বা অঙ্গিরা হইলেন। এই এই অথর্বা তপ সাধন করিলেন এবং বিংশতি আথর্বণ ঋষি উৎপন্ন হইল। এক সূক্ত, দুই সূক্ত ও ততোধিক সূক্তের ঋষিগণ উৎপন্ন হইলেন। ইহারা সকলে আঙ্গিরস-মন্ত্র দর্শন করিলেন। ঋষিগণের সংখ্যা ২০ হওয়ায় বেদও ২০টি কাণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত ব্যাপারের যাথার্থ্যও স্বীকার করিতে পারা যায়

না। কেন না ২০টি কাণ্ডের প্রত্যেকটি এক একটি ঋষির নয়, মহামতি ব্লুমফীল্ডও ইহা পরবর্তীকালের বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আখ্যায়িকাটি কিন্তু গোপথ-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ইহা পরবর্তী যুগের। কিন্তু সর্বানুক্রমণী গোপথ-ব্রাহ্মণের আরও পরবর্তী কালের। প্রাচীনতর পঞ্চপটলিকাও গোপথ-ব্রাহ্মণের পরবর্তী। এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, সূক্তগুলির ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া আথর্বণ অথবা অথর্বন্ ও আঙ্গিরস এই সাধারণ নামে পরিচিত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে ভৃগু ও ব্রহ্মার নাম সংযোজিত হইত। এই দুইটি অনুক্রমণী কোন্ সময়ে রচিত তাহা জানা যায় না। সায়ণের সময়ে এই দুইটির নাম জানা থাকিলে, তাঁহার ভাষ্যে ইহাদের উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। এই জন্য সায়ণ-ভাষ্যে প্রত্যেক সূক্তের ঋষির নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু হুইট্‌নী তাঁহার অথর্ববেদের অনুবাদে সর্বানুক্রমণী হইতে সূক্তের ঋষিগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঋষিনামগুলি উচ্ছোচন, উন্মোচন প্রভৃতি নামের ন্যায় যথেচ্ছভাবে কল্পিত হইয়াছে। এই সূক্তের ঋষি-নামগুলি ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আর এইরূপ হওয়াও স্বাভাবিক। 'শং নো দেবী'-সূক্তকার ঋষির নাম সিন্ধুদ্বীপ। কিন্তু সর্বত্র এইরূপ হয় নাই, সূক্তের বিষয়বস্তু হইতে ঋগ্বেদেও ঋষি-নামের সূচনা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ পুরুষসূক্তে নারায়ণ ঋষির নাম করা যাইতে পারে। অথবা বিবাহ-সূক্তের ঋষি সূর্যারও নাম করা যাইতে পারে। এই নামগুলি ঋগ্বেদ ও অথর্ব উভয় বেদেই অভিন্ন। সর্বানুক্রমণীতেও অথর্ববেদের সূক্তকারের নাম করিবার সময় এই পদ্ধতি অনেক সময় অনুসৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে ব্রহ্মা-প্রজাপতি, যম প্রভৃতি নামের সহিত সূক্তের নাম সূচিত হইয়াছে। অনুক্রমণীতে উল্লিখিত ঋষিগণের নামের সংখ্যা বড় বেশী নয়। হুইট্‌নী অথর্ববেদের ঋষিদিগের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ডক্টর রাইডার ও ল্যানম্যান এই তালিকা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। পরে ১৯২০ খ্রী° চিন্তামণি বামন বৈদ্য

তাহা পুনরায় মিলাইয়াছেন। নিম্নে অথর্ববেদের ঋষিগণের নাম এই সমস্ত সংগ্রহ হইতে প্রদান করা হইল। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রাত্য-সূক্তের কোন ঋষির নাম প্রদান করা হয় নাই। যমকাণ্ডের ঋষির নাম অথর্বন্। ১৭৫টি সূক্ত অথর্বনকে উদ্দিষ্ট এবং ১০০টি সূক্ত ব্রহ্মার উদ্দেশ্য ঈরিত। 'অথর্বাঙ্গিরস'-এর উদ্দেশ্যে মাত্র ১৭টি সূক্ত এবং অঙ্গিরার উদ্দেশ্য ১৫টি। ক্রিমি-নিবারণ উদ্দেশ্যে ৩টি সূক্তের ঋষিও কণ্ব। দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ করিবার জন্য ৪টি সূক্তের ঋষি বাদরায়ণি। বশিষ্ঠ,গৃৎসমপ্রভাদির নাম এই তালিকায় নাই। দুই একটি সূক্তের ঋষি হইয়াছেন বিশ্বামিত্র কশ্যপ। তাঁহারা কিন্তু জাদুসম্বন্ধীয় সূক্তের ঋষি। অথর্ববেদে বিশ্বামিত্রের গায়ত্রীর নাম পাওয়া যায় না ; কণ্ব, কক্ষীবান্, পুরুমীঢ়, অগস্ত্য, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ ও বামদেব নামক কয়েকটি ঋগ্বেদীয় ঋষির নাম যমকাণ্ডের পিতৃগণের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।[১]

নিম্নলিখিত ঋষিগণের নাম অথর্ববেদের ভিন্ন ভিন্ন কাণ্ডের সূক্তে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :—

অগস্ত্য (৬. ১৩৩)।

অঙ্গিরা, অথর্বাঙ্গিরা, প্রত্যঙ্গিরা বা ভৃগ্বঙ্গিরা (১.১২-৪, ২৫ ; ২. ৩, ৫-১০, ৩৫ ; ৩. ৭ ; ৪. ৮, ১১, ৩৯, ১৮ ; ৫. ১২, ১৪-২২ ; ৬. ১০, ১১-৩, ৭২, ৮৩-৪, ৯১, ৯৪-৬, ১০১, ১২৩-৩২, ১২৭ ; ৭. ৩০-৩১, ৫০-৫১ ৭৪, ৭৭, ৯০, ৯৩, ১১২-৮ ; ৮. ৮ ; ৯. ৩, ৮ ; ১০. ১, ২৭, ৩৯ ; ১১. ১০; ১৯. ৩-৪, ২২, ৩৪-৫)।

---

১ 'কণ্বঃ কক্ষীবান্‌পুরুমীঢ়ো অগস্ত্যঃ শ্যাবাশ্বঃ সোভর্য্যর্চনানাঃ।
বিশ্বামিত্রোহয়ং জমদগ্নিরত্রিরবন্তু নঃ কশ্যপো বামদেবঃ ॥
বিশ্বামিত্র জমদগ্নে বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ গোতম বামদেব।
শর্দির্নো অত্রিরগ্রভীন্নমোভিঃ সুসংশাসঃ পিতরো
মৃড়তা নঃ ॥'—অ° ১৮. ৩. ১৫-১৬।

অঙ্গিরা প্রচেতা (৬. ৪৫-৭)।

অথর্বা, বৃহদ্দিব অথর্বা বা সিন্ধুদ্বীপ অথর্বকৃতি (১. ১-৩, ৬, ৯-১৩, ১৫, ২০-১, ২৩, ২৭, ৩০, ৩৪-৫ ; ২. ৪, ৭, ১৩, ১৯-২৩, ২৯, ৩৪ ; ৩. ১-৫, ৮, ১০, ১৫-৬, ১৮, ২৬-৭, ৩০ ; ৪. ৩-৪, ১০, ১৫, ২২, ৩১, ৩৪ ; ৫. ১-৩, ৫-৮, ১১, ২৪, ২৩ ; ৬. ১-৭, ১৩, ১৭-৮, ৩২-৩, ৩৬-৪০, ৫০, ৫৮-৬২, ৬৪-৯, ৭৩-৪, ৭৮-৮০, ৮৫-৯০, ৯২, ৯৭. ৯, ১০৯-১৩, ১২৪-৬, ১৩৮-৪০ ; ৭. ১-৭, ১৩-৪, ১৮, ৩৪-৮, ৪৫, ২, ৪৬-৯, ৫২, ৫৬, ৬১, ৭০-৩, ৭৬, ৭৮-৮১, ৮৫-৭, ৯১-২, ৯৪, ৯৭-৯. ১০১-৬ ; ৮. ৭, ৯ ; ৯. ১-২ ; ১০. ৩, ৭, ৯ ; ১০, ২-৩, ৭ ; ১২. ১ ; ১৭. ১-৪ ও অবশিষ্ট কা° ; ১৯. ১৪-২০, ২৩-৪, ২৬, ৩৭-৮)।

অথর্বা বীতহব্য (৬. ১৩৬-৭)।

অথর্বাচার্য (৮. ১০ ; ১২. ৫ কশ্যপ)।

অপ্রতিরথ (১৯. ১৩)।

আথর্বণ (ভৃগু আথর্বণ ২. ৫)

উপরিবভ্রব (৬. ৩০-১)।

ঋভু (৪. ১২)।

কবন্ধ (৬. ৭৫-৭)।

কশ্যপ (১০. ১০ ; ১২. ৪-৫)।

কশ্যপ মারিচ (৭. ৬২-৩)।

কাঙ্কায়ন (৬, ৭০ ; ১১. ৯)।

কাণ্ব (২. ৩১- ; ৫. ২৫)।

কাপিঞ্জল (২. ২৯ ; ৭. ৯৫-৬)।

কুৎস (১০. ৮)।

কৌরুপথি (৭. ৫৮ ; ১০. ১৮)।

কৌশিক (৬. ৩৫, ১৭-১২ ; ১০. ৫, ২৮-৩৫)।

গরুৎমা (৪. ৬-৭ ; ৫. ১৩ ; ৬. ১২, ১০০ ; ৭. ৫৮ ; ১০. ৪)

১, ৫ ; ১৩. ১-৪ ; ১৯. ১. ৯-১২, ২১, ২৮-৩০, ৩৬, ৪০-৩, ৫১-২ ৪৮-৭১)।

ব্রহ্মা ভৃগ্বঙ্গিরস (৩. ১১ ; ১৯. ৭২)।

ব্রহ্মস্কন্দ (৪. ৩১-২)।

ভরদ্বাজ (১১. ১২)।

ভরদ্বাজ গোপথ (১৯. ৪৯)।

ভাগলি (৬. ৫২)।

ভার্গব (১১৩-৪)।

ভার্গব বৈদর্ভী (১০. ১, ৪)।

ভৃগু (৩. ১৩, ২৪-৫ ; ৪. ৯, ১৪ ; ৬. ২৭-৯, ১২২-৩ ; ৭. ১৫-৭, ৫৪-৫, ৮৪, ১০৭-৮, ১১০ ; ৯. ৫ ; ১২. ২ ; ১৯. ৩১-২, ৪৪-৫)।

ভৃগু আথর্বণ (২, ৫)।

ময়োভূ (৫. ১৭-৯)।

মাতৃবামন্ (২. ২ ; ৪. ২০ ; ৮. ৬)।

মৃগর (৪. ২৩-৯)।

মেধাতিথি (৭. ১৫-২৯)।

যম (৭. ২৩, ৬৪, ১০০-১ ; ১২. ৩ ; ১৬. ৫-৭, ৮-৯ ; ১৯, ৫৬-৭)।

বরুণ (৭. ১১২)।

বশিষ্ঠ (১. ২৯ ; ৩. ১৯-২২ ; ৪. ২২)।

বামদেব (৩. ৯ ; ৭. ৫৭)।

বিশ্বামিত্র (২. ১৭ ; ৫. ১৫-৬ ; ৬. ৪৪, ১৪১)।

বিহব্য (১০. ৫, ৪২-৫০ অথর্বা)।

বেণ (২. ১ ; ৪. ১-২)।

বেণ শিস্তাতি (১. ৩৩ ; ৪. ১৩ ; ৬. ১০. ১৯, ২১-৪, ৫১, ৫৬-৭, ৯৩, ১০৭ ; ৭. ৬৮-৯ ; ১১. ৬)।

শম্ভু (২. ২৮)।

শিস্তাতি (১. ৩৩ ; ৪. ১৩ ; ৬. ১০, ২১-৪, ৫১, ৫৬-৯ ; ৯৬, ১০৭ ; ৭, ৫৮-৯ ; ১১. ৬)।

শুক্র (২. ১১ ; ৪. ১৭-৯. ৪৯ ; ৫. ১৪, ৩১ ; ৬. ১৩৪-৫ ; ৭. ৬৫ ; ৮. ৫, ৮, ১২)।

শুনঃশেপ (৬. ২৫ ; ৭. ৮৩)।

শৌনক (৬. ১৬ ; ৭. ৬, ১০৮ ; ৮. ৫)।

সাবিত্রি (২. ২৬ ; ১৯. ৩১)।

সবিতা সূর্যা (১৪ কা°)।

সিন্ধুদ্বীপ (১. ৪-৫ ; ৭. ৩৯ ; ১০. ৫, ৭-২৪ ; ১৯. ২)।

সিন্ধুদ্বীপ অথর্বাকৃতি (১. ৬ অথর্বা)।

অথর্ববেদের বিভাগ

কাণ্ড-সূক্ত-ঋক্

কাণ্ড	সূক্ত	ঋক্
১	৩৫	১৫৩
২	৬৬	২০৭
৩	৩১	২৩১
৪	৪০	৩২৪
৫	৩০	৩৭৬
৬	১৪২	৪৫৪
৭	১১৮	২৮৬
৮	১০	২৫৯
৯	১০	৩০২
১০	১০	৩৫০
১১	১০	৩১৩
১২	৫	৩০৪

কাণ্ড	সূক্ত	ঋক্
১৩	৪	১৮৮
১১	২	১৩৯
১৫	১৮	১৪১
১৬	৯	৯৩
১৭	১	৩০
১৮	৪	২৮৩
১৯	৭২	৪৫৬
২০	১৪৩	৯৪১

কাণ্ড-অনুবাক-প্রপাঠক

কাণ্ড	অনুবাক	প্রপাঠক
১	৬	২
২	৬	৪
৩	৬	৬
৪	৮	৯
৫	৬	১২
৬	১৩	১৫
৭	১০	১৭
৮	৫	২১
৯	৫	২১
১০	৫	২৩
১১	৫	২৫
১২	৫	২৭
১৩	৪	২৮
১৪	২	২১
১৫	২	৩০

কাণ্ড	অনুবাক	প্রপাঠক
১৬	২	৩১
১৭	১	৩২
১৮	৪	৩৪
১৯	৭	৩৪
২০	৯	৩৪

অথর্ববেদে ঐতিহাসিক গুরুত্ব[১]—অথর্ববেদের সূক্তগুলির অধিকাংশই অভিচারমন্ত্র হওয়ায় অতি অল্প সূক্ত হইতেই ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 'ভৃগুং হিংসিত্বা সৃঞ্জয়া বৈতহব্যা পরভবান্' (৫. ১৯) এইরূপ মন্ত্রের নিদর্শন অতি অল্পই আছে; তবে এইরূপ মন্ত্র হইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির যুগের সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। একটি মন্ত্রে (৫. ২২) দেখা যায়, আর্যগণ তক্‌মন্ নামক জ্বরের বিরুদ্ধে মগধ ও অঙ্গ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তক্‌মন্‌কে পূর্বাঞ্চলে মগধ ও অঙ্গরাজ্যে এবং গান্ধার ও মূজবান্ পর্বত অতিক্রম করিয়া বাহিরে বাল্‌হিকে যাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, সে যুগে আর্যদিগের রাজ্য পশ্চিমে গান্ধার হইতে পূর্বে অঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সূক্তটি হইতে ইহাও দেখা যায়, মূজবান্ পর্বতের পরে বাল্‌হিক। সুতরাং সম্ভবত গান্ধারও আর্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তক্‌মনের উল্লেখ হইতে স্থির করা যায় যে, আর্যদিগের রাজ্যের তখন জ্বরের প্রকোপ ছিল; এই রোগকেই আর্যরাজ্যের বাহিরে ইহার স্বভূমি মূজবান্, বাল্‌হিক ও মহাবৃষে বিতাড়নের ব্যবস্থা হয়। (মহাবৃষ কোথায় জানা যায় না, তবে বর্তমানে বল্‌খ্ই প্রাচীন বাল্‌হিক)।

'ওকো অস্য মুজবন্ত ওকো অস্য মহাবৃষাঃ।
যাবজ্জাতস্তক্মংস্তাবানসি বল্‌হিকেষু ন্যোচরঃ ॥'
—অ° ৫. ২২. ৫।

---

১ C. V. Vaidya : Hist. of Sans. Litt. 1930, 167-72.

একটি মন্ত্রে (৫. ২২. ৭) পাওয়া গিয়াছে, একজন স্থূলদেহা শূদ্রা রমণীকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে কম্পিতা করিবার জন্য তক্‌মন্‌কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

'তক্মন্মূজবতো গছ বল্‌হিকান্বা পরস্তরাম্।
শূদ্রামিছ প্রফর্ব্যং তাং তক্মন্বীব ধুনুহি॥'

—অ° ৫. ২২. ৭

ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, ভারতীয় আর্যগণের রাজ্যে আর্যগণের অপেক্ষা শূদ্রদিগের মধ্যে এই ম্যালেরিয়া জাতীয় জ্বরের প্রকোপ ছিল বেশী।

উপরোক্ত মন্ত্র ও অন্যান্য কয়েকটি মন্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়, তৎকালে ভারতীয় জাতি চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তিনটি উচ্চ শ্রেণী 'আর্য' নামে অভিহিত হইত। চতুর্থ শ্রেণী, ইতর শ্রেণী এবং এই শ্রেণীর নাম শূদ্র। অবশ্য আর্যগণ শূদ্রদিগকে অযথা উৎপীড়ন বা অবজ্ঞা করিত না ('প্রিয়ং সর্বস্য উত শূদ্র উত আর্যে'—(১৯. ৬)। ৪. ২২ সূক্তে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উল্লেখ আছে এবং উহাতে এই দুই শ্রেণীকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। বিশ্‌গণ চাষী আর্য এবং ইহারাই প্রজা-সাধারণ; একজন ক্ষত্রিয় ইহাদিগের নৃপতি এবং তিনি ইহাদিগকে শাসন করেন। কয়েকটি সূক্তে ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি সূক্তে (৫. ১৯) দেখা যায়, এই সময় ব্রাহ্মণগণ নৃপতিগণ-কর্তৃক উৎপীড়িত ও ঘৃণিত হইতেন। কিন্তু যে সমুদয় নৃপতি বা জাতি ব্রাহ্মণদিগের উপর অত্যাচার করিত তাহারা সমৃদ্ধিলাভ করিত না। 'উগ্রো রাজা মন্যমানো ব্রাহ্মণং যজ্জিঘৎসতি। পরা তৎসিচ্যতে রাষ্ট্রং ব্রাহ্মণো যত্র জীয়তে॥'—৫. ৯. ৬। তখন ব্রাহ্মণের মর্যাদা পূত ছিল এবং উত্তরকালে তাঁহারা সামাজিক জীবনে বিশেষ স্থান লাভ করেন। গাভীকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করা হইত, তাহার বিশেষ মূল্যও ছিল। একটি দীর্ঘ সূক্তে (১২. ৪) গাভীর গুণকীর্তন আছে; এখানে

গাভী 'বশা' নামে উল্লিখিত ; এই সূক্তে ব্রাহ্মণকে গাভীদানের বিশেষ প্রশংসা আছে। ভারতীয় আর্যগণ যে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং চতুর্থ শ্রেণী শূদ্র যে তাহাদের সেবার জন্য ছিল তাহার উল্লেখ ঋগ্বেদেও আছে। ঋগ্বেদে তাহারা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগের মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলির উল্লেখ অবশ্য অথর্ববেদে নাই ; পরবর্তীকালে সামাজিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ সংঘটিত হইয়াছিল।

অথর্ববেদের সময়েও আর্যেরা কৃষিকর্মে ব্রতী ছিল। অথর্ববেদে কৃষি, গো ও অশ্বের শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্তোত্র আছে। প্রজা-সাধারণের নাম ছিল বিশ্। তাহারা রাজগণ কর্তৃক শাসিত হইত। সাধারণত রাজাদিগের একটা নির্বাচনেরও প্রথা ছিল। রাজাদের নির্বাচনের সময় উপযুক্ত স্তোত্র আবৃত্তি করা হইত। রাজাদের জন্য মণি ও দর্ভবন্ধনের বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল (ঐ, ১৯. ২৭-৩৩)। ১৯শ কাণ্ডের শেষ সূক্তে রাজসূয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজারা প্রায়ই পরস্পর যুদ্ধ করিতেন—অনার্য শত্রুদের সহিত তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। শত্রুরা ভ্রাতৃব্য নামে অভিহিত হইত। ইহারা সম্ভবত ইরানী বা অসুর।

রাজাদের শাসিত প্রদেশগুলি (state) বড় ছিল না—সেগুলিকে সকল সময়ই রাজ্যও (kingdoms) বলা হইত না। সেগুলি ছোট ছিল এবং 'রাষ্ট্র' নামে অভিহিত হইত (অ° ১৯. ২৪)। এ-যুগের প্রজারা দুর্বল ছিল না।

অথর্বদের সময় সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বলিতে পারা যায় যে, ঋগ্বেদের যুগে বিবাহ-প্রথা যেরূপ ছিল এ সময়েও ঠিক সেইরূপই ছিল। তবে সূক্তাদির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। দেখা যায়, ঋগ্বেদের বিবাহ-সূক্ত (১০. ৮৫) একেবারে সম্পূর্ণভাবে অথর্ববেদে গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে বিবাহ-সূক্তে ঋক্‌সংখ্যা ৪৭; কিন্তু অথর্ববেদের ২টি বিবাহ-সূক্তে ঋক্‌-সংখ্যা যথাক্রমে ৬৪ ও ৭৫। ঋগ্বেদের যুগের মত অথর্ববেদের সময়েও বর-কর্তৃক কন্যার পাণিগ্রহণ বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রধান ব্যাপার ছিল। কন্যাদানের অধিকার কন্যার পিতারই ছিল, আর বরকেই কন্যার জন্য তাঁহার নিকট যাইতে হইত। অধুনাতন রীতির ন্যায় কন্যার পাণিগ্রহণ কন্যার গৃহেই হইত—বরের গৃহে হইত না। বিবাহের জন্য বরের বিপুল সমারোহে শোভাযাত্রার উল্লেখ অথর্ববেদে আছে। যাহাতে নবদম্পতী দীর্ঘায়ু ও প্রজা লাভ করিতে পারে তজ্জন্য গাভী ও কম্বল দান করা এবং নানা মন্ত্রোচ্চারণ করা হইত।

অথর্ববেদে শিক্ষা ও ছাত্র-জীবন—অথর্ববেদের যুগে ব্রহ্মচারীরা বড় বড় চুল রাখিত, মেখলা বন্ধন করিত, মৃগচর্ম পরিধান করিত এবং যজ্ঞকুণ্ডে অরণি-সংযোগে আহুতি দিত। তখন ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা ছিল। ছাত্রেরা যেভাবে জীবন অতিবাহিত করিত তাহার খুঁটিনাটির পরিচয় পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। উভয় যুগের পদ্ধতি প্রায় এক রকম ছিল। তৈ-স° (৬. ৩. ১০. ৫), শ-ব্রা° (১১. ৫. ৪) উপনয়নকালে সকল কর্তব্যের বিবরণ পাওয়া যায়। গোপথ-ব্রাহ্মণে (১. ২. ১-৮) ব্রহ্মচর্যের বিধিনিষেধের হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আছে। অথর্ববেদের ন্যায় সুপ্রাচীনকালে উপনয়নকে দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া গণ্য করা হইত।

'আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভিসংযন্তি দেবাঃ॥'
—অ° ১১. ৫. ৩।

মেখলা-বন্ধনের সময় যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত সেগুলি বলিয়া দিত যে, তাহার বন্ধনী শ্রদ্ধার কন্যা ও ঋষিদিগের ভগিনী। তাহার পবিত্রতা ও ব্রত-সংরক্ষণের শক্তি যথেষ্ট। বন্ধনী তাহাকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবে।

'শ্রদ্ধায়া দুহিতা তপসোঽধি জাতা স্বস ঋষীণাং ভূতকৃতাং বভূব।'
—অ° ৬. ১৩৩. ৪।

আচার্যকে তখনকার সময়েও অধ্যাত্ম-ব্যাপারে পূজা করা হইত।

তু°-'আচার্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং
কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।'—অ° ১১. ৫. ৩।

অথর্ববেদের সময়ে রমণীগণ মণিমুক্তাদি কি কি অলঙ্কার পরিধান করিতেন তাহার উল্লেখ অথর্ববেদে আছে।

অথর্ববেদের যে সকল মন্ত্র সমস্যাসূচক সেগুলি অনুসন্ধিৎসা-দ্যোতক। যজুর্বেদের 'প্রশ্নী' ও অথর্ববেদের 'প্রবাচিক' সম্ভবত এক ধরনেরই ছিল। একাধিক সূক্তে অথর্ববেদে ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক বলা হইয়াছে। যজুঃ ও অথর্ববেদের সূক্তগুলি শিশুগণের ভবিষ্যৎ-নির্দেশক উপদেশে পূর্ণ। অথর্ববেদের ষষ্ঠ কাণ্ড হইতে দীক্ষার নিয়মগুলি বেশ স্পষ্ট।

ছাত্রদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ হইত। যে ছাত্র অন্য ছাত্রদিগকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিত তাহাকে পুরস্কারস্বপে 'কবি' বা 'বিপ্র' উপাধি প্রদান করা হইত। অথর্ববেদে যে তর্ক আরম্ভ করিত তাহাকে 'প্রাশ' (opener) ও প্রতিপক্ষ যাহারা উত্তর দিত তাহাদের 'প্রতিপ্রাশ' (opponent) বলিত।—অ° ১১. ৩; ১৫. ১; ২. ২৭; ১. ৭।

অথর্ববেদের সময় ছাত্রদিগকে কাজ করিতে হইত, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হইত, ভিক্ষা করিতে হইত ও আচার্যের গরু চরাইতে হইত।—অ° ১১. ৫. ৪; ১১. ৬. ৯।

অথর্ববেদে উদ্ভিজ্জাদির ভৈষজ্যব্যাপার বিশিষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

ছাত্রেরা পড়াশুনা শেষ হইলে আচার্য গৃহ হইতে স্বগৃহে গমন করিত। এইরূপ ছাত্রদের নাম ছিল 'স্নাতক'। অথর্ববেদে ইহাদের জন্য নানাবিধ উপদেশ আছে। স্নাতকেরা মন সুস্থ ও দেহ নিরাপদ

রাখিবে। দন্ত ও চক্ষুর জন্য তাহাদের বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। অযথা উত্তাপ বা গোলমাল হইতে সতত বিরত থাকিবে। স্নাতকের মন সকল সময় আরাধনাপ্রবণ থাকিবে। বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য তাহাকে যথাসাধ্য চেষ্টা ও প্রযত্ন করিতে হইবে। বৈদিক আদর্শে সে তাহার চরিত্র গঠন করিবে। এইরূপ করিয়া সে সকলের শুভেচ্ছা ও প্রীতি অর্জন করিবে।

অথর্ববেদের চল্লিশের অধিক মন্ত্রে ছাত্রজীবন-সম্বন্ধে উপদেশাদি আছে।[১] ছাত্রদের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশের কথা লইয়া এই বেদের আরম্ভ এবং বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া বাহির হইবার কথা-প্রসঙ্গে এই বেদের পরিসমাপ্তি।—অ° ১. ১; ১৯. ৭১-২।

অথর্ববেদে ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যাপারের যথেষ্ট প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, আঙ্গিরস ও ভৃগুগণ প্রধানত আচার্যের কাজ করিতেন।

অথর্ববেদের যে সমস্ত মন্ত্রে শিক্ষা-ব্যাপার নিবদ্ধ সেগুলিকে বিশেষত চারি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। প্রথমত, বৈদিক ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিবার সময় নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতে হইত; তদনুরূপ অনুষ্ঠানপূর্ণ মন্ত্র। দ্বিতীয়, বৈদিক পাঠ সমাপন ও বিদ্যামন্দির পরিত্যাগ। তৃতীয়, ছাত্রজীবন। চতুর্থ, শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয়।

১৮শ কাণ্ডে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রাচীন পূর্বপুরুষদিগকে, নবগ্বগণকে, অথর্বন্ ও ভৃগুগণকে এবং বিবস্বান্‌কে ঋগ্বেদের (১০. ১৪. ৬) মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই স্মরণ করা হইত।

'অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো
ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।'

---

১ অ° ১. ১; ১. ৯; ১. ৩০, ১. ৩৪ই°। ১. ২৭; ২. ২৯ই°। ৩. ৮; ৩. ৩১ই°। ৪. ১; ৪. ৯; ৪. ১৩; ৪. ৩১ই°।

'বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্বর্হিষ্যা-
নিষদ্য ॥'—অ° ১৮. ১. ৫৮-৯।

এ ছাড়া আরও নূতন মন্ত্র উচ্চারিত হইত। সর্বাগ্রে পরলোকের ও যমের প্রশংসাসূচক মন্ত্র ঈরিত হইত। সাধারণত মৃতদেহ দাহ করা হইত। তবে 'অনগ্নিদগ্ধের'ও উল্লেখ আছে। সতীদাহের প্রাচীন প্রথানুসারে মৃত স্বামীর পার্শ্বে উপবিষ্টা নারীর উল্লেখও অথর্ববেদে আছে।

'ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নি পদ্যত
উপ ত্বা মর্ত্য প্রেতম্।
ধর্মং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং
চেহ ধেহি ॥'—অ° ১৮. ৩. ১।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যাবতীয় মন্ত্রোচ্চারণ করা হইত। সমস্ত পিতৃগণের প্রতি নমস্কার-মন্ত্রে শ্রাদ্ধের অবসান হইত।

অথর্ববেদে পতি বিদ্যমান থাকিতে পত্যন্তর গ্রহণের কথাও আছে। যথা—

'যা পূর্বং পতিং বিত্ত্বাথান্যং বিন্দতেঽপরম্।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ ॥'
—অ° ৯. ৫. ২৭।

পুনর্ভূর কথা ইহাতে আছে।—

'সমানলোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি।'
—অ° ৯. ৫. ২৮।

অথর্ববেদের সময় ব্রাহ্মণের প্রভাব ও প্রতিপত্তির উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

সুপণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনেল অনুমান করেন যে, অথর্ববেদ যে সুর অনুস্যূত তাহা প্রাগৈতিহাসিক সুর। অন্যান্য সংহিতা অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক ব্যাপার ইহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত

হয়। সভ্যতার ইতিহাসহিসাবে ইহা ঋগ্বেদ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্। ম্যাক্ডোনেলের স্বীয় উক্তি এইরূপ—'The spirit which breathes in it is that of a prehistoric age. A few of its actual charms probably date with little modification from the Indo-European period; for, as Adalbert Kuhn has shown some of its spells for curing bodily ailments agree in purpose and content, as well as to some extent in form, with certain old German, Lettic and Russian charms.' 'it contains more theosophic matter than any of the other Sanhitas. For the history of civilisation, it is on the whole more interesting and important than the Rigveda itself.' (p. 186)। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই অথর্ববেদে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সমগ্র বেদের একমাত্র প্রতিনিধি-স্বরূপ বেদশীর্ষে এই বেদ মহাভাষ্যে স্থান পাইয়াছে।

অথর্ববেদের অধিকাংশই বিষ ঝাড়াইবার, রোগ তাড়াইবার, পতিকে বশ করাইবার, শত্রুকে নাশ করিবার বা এই প্রকার ব্যাপারের মন্ত্রে পরিপূর্ণ। এগুলির মধ্যে ভাষার বা কবিত্বের বৈশিষ্ট্য নাই বলিলেই চলে। তবে এমন কতকগুলি মন্ত্র আছে, যেগুলির ভাষা গম্ভীর, শব্দচাতুর্য ও বাক্ছন্দে সেগুলি সুন্দর, মাধুর্যে গীতিকবিতার সমতুল্য। উদাহরণস্বরূপ একটি সূক্ত উদ্ধৃত হইল। এই সূক্তে শিরাগুলিকে রক্তাভরণা কুমারীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম তিনটি সূক্তের ভাষা এইরূপ—

'অমূর্যা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ।
অভ্রাতর ইব জাময়স্তিষ্ঠন্তু হতবর্চসঃ॥
তিষ্ঠাবরে তিষ্ঠ পর উত ত্বং তিষ্ঠ মধ্যমে।
কনিষ্ঠিকা চ তিষ্ঠতি তিষ্ঠাদিদ্ধমনির্মহী॥

শতস্য ধমনীনাং সহস্রস্য হিরাণাম্।
অস্থুরিন্মধ্যমা ইমাঃ সাকমন্তা অরংসত ॥'

—অ° ১. ১৭. ১-৩।

অথর্ববেদের ১ম কাণ্ড ২৩শ সূক্তের ১ম দুইটি ঋকে শ্বেতকুষ্ঠ ও পলিত রোগের শান্তির উপায় বর্ণিত আছে। প্রথমে সাদা দাগগুলি শুষ্ক গোময় দিয়া এরূপভাবে ঘষিতে হইবে যাহাতে সেই স্থানগুলি লাল হইয়া যায়। তারপর তদুপরি মন্ত্রদ্বারা চারিটি ঔষধ পিষিয়া প্রলেপ দিতে হইবে। ঔষধ চারিটির নাম—ভাঙ, হলুদ, নীবারধান্য ও নীলিকা। ইহাতে রোগ আরাম হইয়া যাইবে। প্রথম মন্ত্র, যথা—

'নক্তংজাতাস্যোষধে রামে কৃষ্ণে অসিক্নি চ।
ইদং রজনি রজয় কিলাসং পলিতং চ যৎ ॥'

হে হরিদ্রে, নীবারধান্য, ইন্দ্রবারুণি ও নীলিকে! তোমরা রাত্রিতে উৎপন্ন হইয়াছ। হে রঞ্জনকারিণীগণ! এই সেই শ্বেতকুষ্ঠ ও পলিত ইহাদিগকে তোমরা স্বীয় স্বীয় বর্ণে রঞ্জিত কর।

৩য় কাণ্ডের ১১শ সূক্তের প্রয়োগ দুইটি রোগে হইয়া থাকে। একটি বালগ্রহ রোগ এবং অপরটি নিরন্তর স্ত্রী-সঙ্গমে উৎপন্ন যক্ষ্মা রোগ। পচা মাছের সহিত মন্ত্রের দ্বারা ভাত খাওয়ানো এই রোগের বিধি। ইহার দ্বিতীয় মন্ত্রটি এই প্রকার—

'যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যো-
রন্তিকং নীত এব।
তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্ষমেনং
শতশারদায় ॥'

যদিই বা এই রোগীর আয়ু ক্ষীণ হইয়া গিয়া থাকে, যদি এ-রোগী মরণের নিকট নীত হইয়া থাকে, আমি ইহাকে মৃত্যুর নিকট হইতে এই লোকে আনিয়া দিতেছি এবং শতবর্ষ জীবিত থাকিবার শক্তি প্রদান করিতেছি। এই কাণ্ডের ২৫শ সূক্তের ২য় ঋক্ স্ত্রীকে

বশে আনিবার জন্য প্রযুক্ত। ইহার প্রয়োগ কয়েক প্রকারের, তন্মধ্যে দ্বিতীয় মন্ত্রটি এই—

'আধীপর্ণাং কামশল্যামিষুং সঙ্কল্পকুল্মলাম্।
তাং সুসন্নতাং কৃত্বা কামো বিধ্যতু ত্বা হৃদি॥'

হে কামিনি! কামদেব স্বীয় বাণে রতি-অভিলাষের শল্যকে বিষয়-সঙ্কল্পের কুল্মল[১] দ্বারা যুক্ত করিয়া এবং মানসী পীড়ারূপ পক্ষ লাগাইয়া উহাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করিয়া তোমার হৃদয়কে বিদ্ধ করুক।

৪র্থ কাণ্ড ১৬শ সূক্তের প্রথম দুইটি মন্ত্রের আরও কিছু প্রয়োগ আছে। তৃতীয় মন্ত্র হইতে শেষ মন্ত্র পর্যন্ত ধূমকেতুর উৎপাত-শান্তির জন্য স্তুতি। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র নিম্নে ক্রমানুসারে প্রদত্ত হইল—

'উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ
দ্যৌর্বৃহতী দূরেঅন্তা।
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প
উদকে নিলীনঃ।'

'উত যো দ্যামতিসর্পাৎপরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ
বরুণস্য রাজ্ঞঃ।'
দিব স্পশঃ প্র চরন্তীদমস্য সহস্রাক্ষা
অতি পশ্যন্তি ভূমিম্॥'

'সর্বং তদ্রাজা বরুণো বি চষ্টে যদন্তরা
রোদসী যৎপরস্তাৎ।
সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানামক্ষানিব
শ্বঘ্নী নি মিনোতি তানি॥'

এই পৃথিবী ও ঐ সীমাহীন আকাশও রাজা বরুণের বশতাপন্ন।

---

১ বাণে লৌহমুখ জুড়িবার পদার্থের নাম কুল্মল।

দুইটি সমুদ্র বরুণের দুই দিকের দুইটি উদর (কক্ষ)। তথাপি তিনি এই অত্যল্প জলে নিলীন হইয়া আছেন।

যে শত্রু আকাশ হইতেও পলায়ন করিয়া যায় সেও রাজা বরুণের নিকট হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। তাঁহার চর আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর উপর চারি দিকে ঘুরিতে থাকে এবং সহস্র নেত্রদ্বারা ভূমির প্রতি কোণ দেখিতে থাকে।

রাজা বরুণ সকল কিছুই দেখিয়া থাকেন—তাহা আকাশ ও ভূমির মধ্যে থাকুক, বা উহার উপরেও থাকুক না কেন (তাঁহার দৃষ্টি এড়াইবার যো নাই), মনুষ্যের প্রতি পলক তিনি গণনা করিতেছেন। জুয়াড়ী যেমন পাশা খেলিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও পাপীদিগকে পাপানুসারে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

৫ম কাণ্ডের ১৯শ সূক্তের ১৪শ মন্ত্রে যাহারা ব্রহ্মচারীদিগের গাভী চুরি করে অথবা যাহারা তাঁহাদিগকে দুঃখ দেয়, সেই দুষ্ট ব্যক্তিদিগের অভিচারের জন্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এইরূপ—

'যেন মৃতং স্নপয়ন্তি শ্মশ্রূণি যেনোন্দতে।
তং বৈ ব্রহ্মজ্য তে দেবা অপাং ভাগমধারয়ন্॥'

হে ব্রহ্মাপকারী! যে জল দিয়া মৃতককে স্নান করানো হয় এবং যে জল দিয়া তাহাদের শ্মশ্রু (দাড়ি) ভিজাইয়া দেওয়া হয়, দেবতারা তোমারই জন্য তোমারই ভাগে সেই জল রাখিয়া থাকে।

এই কাণ্ডের ২১শ সূক্তে শত্রুর সৈন্যকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য প্রয়োগ কথিত হইয়াছে। সমস্ত বাদ্য ধুইয়া বাদ্যগুলির উপর টগর ও উশীরের প্রলেপ লাগাইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক তিন বার বাদ্যগুলি বাজাইয়া বাদ্যকরগণকে সেগুলি প্রদান করিবার বিধি কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ মন্ত্র এইরূপ—

'যথা শ্যেনাৎপতত্রিণঃ সংবিজন্তে অহর্দিবি
সিংহস্য স্তনথোর্যথা।

এবা ত্বং দুন্দুভেঽমিত্রানভি ক্রন্দ প্র

ত্রাসয়াথো চিত্রানি মোহয় ॥'

যেমন বাজের ভয়ে পক্ষী উদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করে, যেমন লোক সিংহের গর্জনে কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ হে দুন্দুভি, তুমি গর্জন করিয়া শত্রুগণকে ভয় দেখাও এবং তাহাদের চিত্তকে উদ্বিগ্ন কর।

৬ষ্ঠ কাণ্ডের ১০৫ম সূক্ত কাশি, শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগের শান্তি তথা অগ্নি-দাহ প্রভৃতির নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সূক্তের মন্ত্র তিনটি এই—

'যথা মনো মনস্কেতৈঃ পরাপতত্যাশুমৎ।

এবা ত্বং কাসে প্র পত মনসোঽনু প্রবায্যম্ ॥'

'যথা বাণঃ সুসংশিতঃ পরাপতত্যাশুমৎ।

এবা ত্বং কাসে প্র পত পৃথিব্যা অনু সংবতম্ ॥'

'যথা সূর্যস্য রশ্ময়ঃ পরাপতন্ত্যাশুমৎ।

এবা ত্বং কাসে প্র পত সমুদ্রস্যানু বিক্ষরম্ ॥'

ওরে কাশি, যেমন মন নিজ বিষয়েতে শীঘ্র চলিয়া যায়, তেমনই তুইও এই পুরুষকে ছাড়িয়া ঐ দিকে চলিয়া যা। ওরে কাশি, যেমন তীক্ষ্ণ সুসজ্জিত তীর জ্যা হইতে বাহির হইয়া যায়, তেমনই তুইও এই পুরুষকে ছাড়িয়া পাতালের দিকে বাহির হইয়া যা। ওরে কাশি, যেমন সূর্যের কিরণ অতি শীঘ্র বাহির হইয়া যায়, তেমনই তুইও রোগীকে ছাড়িয়া সমুদ্রের তরঙ্গে চলিয়া যা।

৭ম কাণ্ডের ১২শ সূক্তের ২য় হইতে ৬ষ্ঠ পর্যন্ত পাঁচটি মন্ত্র সভায় জয়লাভ করিবার জন্য কোন প্রকারে বিনিযুক্ত করা হয়। ২য় মন্ত্র যথা—

'বিদ্ম তে সভে নাম নরিষ্টা নাম বা অসি

যে তে কে চ সভাসদস্তে মে সন্তু সবাচসঃ ॥'

হে সভা! আমি তোমার নাম জানি। তোমার নাম নরিষ্টা

অতএব যত তোমার সভাসদ্ হউক, সকলে আমার মতেই মত দিবে। (নরিষ্টা শব্দের অর্থ অহিংসিত বা অনভিভবনীয়, কেন না সভার কথা সকলকেই মানিতে হয়; এই জন্য ইহার এই নাম।)

৮ম কাণ্ডের ১ম অনুবাকে প্রথম দুই সূক্তের নাম 'অর্থসূক্ত'। উপনয়ন-কর্মাদিতে ইহাদের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। ৪র্থ মন্ত্র এই—

'উৎক্রামাতঃ পুরুষ মাব পথা মৃত্যোঃ পড়্‌বীশমবমুঞ্চমানঃ।
মা ছিত্থা অস্মাল্লোকাদগ্নেঃ সূর্যস্য সংদৃশঃ॥'

হে পুরুষ, এই মৃত্যুর পাশ হইতে বাহির হইয়া এস; পড়িও না যেন। মৃত্যুর শৃঙ্খল কাটিয়া ফেল। এই লোক হইতে পৃথক্ হইও না; চিরঞ্জীব হইয়া অগ্নি ও সূর্যকে দর্শন করিতে থাক।

১১শ কাণ্ডের ৫ম সূক্তে ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮শ, ১৯শ ও ২১শ মন্ত্র প্রদত্ত হইল—

'ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।
অনড্বান্ ব্রহ্মচর্যেনাশ্বো ঘাসং জিগীষতি॥'
'ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্যেণ দেবেভ্যঃ স্বরাভরৎ॥'
'পার্থিবা দিব্যাঃ পশব আরণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।
অপক্ষাঃ পক্ষিণশ্চ যে তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ॥'

ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই কন্যা পতি প্রাপ্ত হয়। বৃষ ও অশ্ব ব্রহ্মচর্য-দ্বারাই ঘাস খাইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্যেরই তপস্যা-দ্বারা দেবগণ মৃত্যুকে হনন করিয়া অমর হইয়াছে। আর ব্রহ্মচর্যেরই সাধনাদ্বারা দেবতাগণের জন্য ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আগমন করেন। পার্থিব, দিব্য, আরণ্য ও গ্রাম্য পশুগণ, পক্ষহীন প্রাণী ও পক্ষযুক্ত পক্ষী সমস্তই ব্রহ্মচারী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

১২শ কাণ্ডের প্রথমে অতিসুন্দর পৃথিবীসূক্ত আছে। ১ম সূক্তের ৪১শ ও ৪৪শ মন্ত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল—

'যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ
যুধ্যন্তে যস্যামাক্রন্দো যস্যাং বদতি দুন্দুভিঃ॥

সা নো ভূমিঃ প্র ণুদতাং সপত্নানসপত্নং মা পৃথিবী কৃণোতু।'
নিধিং বিভ্রতী বসুধা গুহা বসু মণিং হিরণ্যং পৃথিবী
দদাতু মে॥

বসূনি নো বসুদা রাসমানা দেবী দধাতু সুমনস্যমানা।'

যে ভূমির উপর বিনাশশীল মনুষ্য নৃত্য-গীত করে, যাহার উপর যুদ্ধ করে এবং দুন্দুভি-ধ্বনি করে, সেই পৃথিবী আমার শত্রুগণকে মারিয়া তাড়াইবে এবং আমাকে নিষ্কণ্টক করিবে।

গুপ্ত স্থানসমূহে বহু নিধি লুকাইয়া রাখিয়াছেন এই পৃথিবী। ইনি ধন, রত্ন ও স্বর্ণ দান করুন এবং ভূরি সম্পত্তি প্রদান করিয়া প্রসন্না ভূমি আমাদিগকে অনন্ত কল্যাণ অর্পণ করুন।

১৭শ কাণ্ডে একটি সূক্ত আছে, তাহা উপনয়নাদি অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত। এই সূক্তের ১৯শ মন্ত্র সাংখ্য-বেদান্ত-বৌদ্ধাদি দর্শনের মূলীভূত।—

'অসতি সংপ্রতিষ্ঠিতং সতি ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্। ভূতং হ ভব্য আহিতং ভব্যং ভূতে প্রতিষ্ঠিতম্। তবেদ্বিষ্ণো বহুধা বীর্যাণি। ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং মা ধেহি পরমে ব্যোমন্।'

অসৎ, অভাব শূন্যে—নিরস্ত সম-স্তোপাধিক নাম—রূপরহিত অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মে—সৎ, ভাব না প্রত্যক্ষ মায়ার প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত বা অধ্যস্ত।

অথর্ববেদমূর্তি-স্বরূপ—চরণব্যূহ কাত্যায়ন-প্রণীত পরিশিষ্ট-সূত্র। ইহাতে অথর্ববেদ পৈপ্পলাদ, শৌনক প্রভৃতি দশটি শাখায় বিভক্ত। ইহাদের বেদের পরিমাণ ১২,০০০। এগুলি নক্ষত্র, বিধান, অধিকার বিধি, অভিচার ও শান্তি এই ৮টি শাখায় বিভক্ত। চরণব্যূহের শেষে চারিখানি বেদের চারিটি পুরুষ-মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে অথর্বদের গোত্র—বৈখানস। চারি বেদের চারিটি উপবেদ। অথর্ববেদের উপবেদ—অর্থশাস্ত্র।

মুক্তিকোপনিষদে (১২) অথর্ববেদের শাখার সংখ্যা ৫০ দেওয়া

হইয়াছে। মহাভারতে অন্যান্য বেদের শাখার কথা আছে, কিন্তু অথর্ববেদের শাখার কথা নাই।

শ্রীতত্ত্বনিধি (পৃ° ৯৬৯-৯৭) অথর্ববেদের মূর্তি কল্পনা করিয়া তাহার স্বরূপ এইরূপ বলিয়াছে—

অথর্বণাভিধো বেদো ধবলো মর্কটাননঃ।
অক্ষমালান্বিতো বামে দক্ষে কুম্ভধরঃ [১] স্মৃতঃ ॥ ১।
শ্বেতবর্ণঃ ॥ ১।

অথর্ববেদপত্নী সমিৎ-স্বরূপ, যথা—

'সমিল্লক্ষণমুচ্যতে। শূকরাস্যা চকোরাক্ষী
চম্পকাভা সিতাংশুকা।
ভুজৈশ্চতুর্ভিঃ সন্ধত্তে স্রুক্স্রুবৌ কমলং ঘটম্ ॥ কনকবর্ণা।'

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে কালিকাদেবী অথর্ববেদের দেবতা। অথর্ববেদানুযায়ী কোন ক্রিয়াই কালী বা তারাদেবী ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। সৌরব্রাহ্মণগণ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে উৎকলের বিভিন্ন স্থানে যে সকল আঙ্গিরস-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করেন তাঁহারা অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ নামেও অভিহিত হন। ভবিষ্যপুরাণে কথিত আছে, অথর্বন ও অথর্বাঙ্গিরসগণ একমাত্র সূর্যের উপসনায় অন্যান্য বেদানুসরণকারিগণের অনুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন।—ভবিষ্যপু° ১০৬. ১০।

১৮৫৫ খ্রী° রোট ও ও হুইট্‌নী বহু পরিশ্রম করিয়া অথর্ববেদ-সংহিতা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ প্রাগ্ হইতে লুড্‌উইগ তাঁহার ঋগ্বেদের ৩য় খণ্ডে অনেকগুলি সূক্ত জর্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খ্রী° টুবিনগেন হইতে ১০০টি সূক্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮৪ খ্রী° ওয়েবার অথর্ববেদের কিয়দংশ Indische Studien-এ প্রকাশ করেন। Indische Studien-এর

[১] তু°—হেমাদ্রি কুম্ভের পরিবর্তে খট্বাঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। —ব্রতখণ্ড° ১০৫ পৃ°।

৪র্থ, ৫ম, ১৩শ, ১৭শ ও ১৮শ খণ্ডে অথর্ববেদের ১ম হইতে ৫ম এবং ১৪শ কাণ্ড তিনি জর্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রী° গটিনগেন হইতে ফ্লোরেন্স-কর্তৃক ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ১-৫০ সূক্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ খ্রী° স্টাট্‌গার্ট হইতে গ্রিল কয়েকটি নির্বাচিত সূক্তের জর্মান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পর পারী হইতে ১৮৯১-৬ খ্রী° ভি. হেনরী ৭ম হইতে ১৩শ কাণ্ড ফরাসী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খ্রী° শঙ্কর পাণ্ডুরঙ পণ্ডিত সায়ণাচার্যের টীকা-সংবলিত অথর্ববেদ সংহিতা সম্পাদন করিয়া বোম্বাই হইতে বাহির করেন। অথর্ববেদের একটি সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ ১৮৯৫-৬ খ্রী° গ্রিফিথ বারাণসী হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বর্ষেই (১৮৯৫-৬ খ্রী°) ওয়েবার Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaftenএ এই বেদের ১৮শ কাণ্ড অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। অতঃপর Indische Studien-এর ১ম খণ্ডে ঔফ্রেক্ট-কর্তৃক ১৫শ কাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৭ খ্রী° ব্লুমফীল্ড অথর্ববেদ সংহিতার নির্বাচিত সূক্তের ইংরেজী অনুবাদ SBE Series-এ বাহির করেন। হুইট্‌নী একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রায় শেষ করিয়াছিলেন। ল্যানম্যান তাহা টিপ্পনী সমেত সম্পাদন করেন। এই অনুবাদগ্রন্থ ১৯০৫ খ্রী° আমেরিকা (HOS) হইতে প্রকাশিত হয়। ব্লুমফীল্ড Grundrissএ (II. I. B.) অথর্ববেদের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছেন। ব্লুমফীল্ডের এই গ্রন্থ হইতে বর্তমান নিবন্ধে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

C. V. Vaidya : Hist. of Sans. Literature, Poona, 1930. 152-81 ; M. Bloomfield : The Atharvaveda, Strass., 1899 ; Weber : Hist. of Indian Literature, Lond., 1878 ; Folk-Medicine in Ancient India, Nature, lviii, 232f ; Roth : Dissertation on the Atharva Veda, 22f ; Colebrooke :

Misc. Essays, i. 9 ; Roth : Literature and Hist. of the Veda ; A. A. Macdonell : Vedic Mythology, Strass., 1897 ; Whitney : Oriental and Linguistic Studies, 22f ; R. Ghosh : Hist. of Hindu Civilisation, Cal. 1889 ; M. Winternitz : Hit. of Indian Literature, i. Cal. 1927 ; Madhusudansarasvati : Prasthanabheda, Indische Studien, i, 16 (Deussen, Allgemeine Geschichte der Philosophie, i. pt.-i, 50) ; Lassen : Indiseche Alterthumskude, i. 523 ; E. W. Hopkins : Religions of India, Boston, 1895 Lond., 1896 ; M. Bloomfield : Hymns of the Atharvaveda—SBE. xlii. Intro ; ঐ : Religion of the Veda, N. Y. & Lond. 1908 ; A. Barth : Religions of India (Eng. tr.) Lond. 1882 ; A. Hillebrandt : Vedische Mythologie, 3v, Breilau 1891-1902, সংক্ষিপ্ত সং—1910 : Max Muller : Hist. of Ancient Sans. Literature ; JRAS, ii, (n. s.), 33, 272, 301 ; xv (n. s.) 427 ; বারাণসীপ্রসাদ ত্রিবেদী : অথর্ববেদ (জানুয়ারী, ১৯৩২)।

একদিকে বেদ, উপনিষদ্, ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্র এবং অপর দিকে দর্শন, ইতিহাস ও পুরাণ—এই সমস্তগুলির সার-সংগ্রহ হইল মহাভারত। তাই বেদব্যাস বলিয়াছেন—"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ।" "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।" ইহা যুগপৎ অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র—"অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রমিদং মহৎ। কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসনামিতবুদ্ধি না।" —মহা° ১. ২. ৩৬৯। মহাভারত একখানি অপূর্ব বিশ্বকোষ —ইহার তুলনা হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণবিকাশ মধ্যযুগে —আর সেই মধ্যযুগের মধ্যমণি এই মহাকাব্য।

ইহার এক নাম কার্ষ্ণ (মহা° ১. ১. ২৬৫ ; ১. ৬২. ১৮) বা পঞ্চম বেদ। আর ইহা যেমন তেমন বেদ নয়; যিনি এই বেদ পড়িয়াছেন তাঁহাকে অন্য বেদ পড়িতে হয় না—

"বিজ্ঞেয়ঃ স চ বেদানাং পারগো ভারতং পঠন্।"—মহা° ১. ৬২. ৩১

এই মহাভারতের মধ্যেই মহাভারতের স্বরূপ কীর্তিত হইয়াছে। ইহা একদিকে 'শ্রেষ্ঠ ইতিহাস' (১. ১. ২৬৩), "ইতিহাস-মহাপুণ্যঃ" (১. ৬২. ১৬), অপর দিকে আবার 'উত্তমং পুরাণম্' (১. ৬২. ১৬)। দেখা যাইতেছে ইতিহাসের লক্ষণও ইহাতে আছে, পুরাণের লক্ষণও আছে। ইতিহাস ও পুরাণ বলিলে আমরা আজকাল যাহা বুঝি, খুব প্রাচীনকালে ঠিক তাহাই বুঝাইত না। পূর্বকল্পে ঘটিয়াছিল, এইরূপ আখ্যায়িকা বুঝাইতে অথর্ববেদে 'ইতিহাস' শব্দের প্রয়োগ আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে 'ইতিহাসে'র কয়েকবার উল্লেখ আছে। সুদূর অতীতে কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে, সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলা হইত—"ইতি হ

আস" অর্থাৎ ইতি=ইহা, হ=নিশ্চয়, আস=হইয়াছিল। ঘটনা সত্য না হইলে কখনই তাহাকে ইতিহাস বলা হইত না। দেড় হাজার বৎসর পূর্বে এই অর্থেরই ইঙ্গিত আমরা বুদ্ধঘোষ-প্রণীত "সুমঙ্গলবিলাসিনী'র "অম্বট্‌ঠ-সুত্ত-বণ্ণনায়" এইরূপ পত্র পাই— "ইতিহাস-পঞ্চমং—অথব্বণবেদং। চতুত্থং কত্বা ইতি হ আস, ইতি হ আসাতি ইদিস-বচন-পতিসংযুক্তো পুরাণকথাসংখাতো ইতিহাসো পঞ্চমো এতে সন্তি ইতিহাস-পঞ্চমা। তেসং ইতিহাস পঞ্চমানং বেদানং।" কোন প্রাচীন কথার শেষে "ইতি হ আস" এই কথাটি বলা হইত। ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, তাহা প্রধানত চারিটি প্রণালীতে ঘটনা বিবৃত হইত,—প্রথম ইতিহাস, দ্বিতীয় পুরাণ ; তারপর আর দুইটি হইতেছে "শ্লোকাঃ" ও "নারাশংসী।" কোন ঘটনা সমাবেশে বড় লোকের কথা বলিয়া বহু বচনান্ত "শ্লোকাঃ" এইরূপ বলা হইত। অন্য কোন এক প্রকারের আখ্যায়িকার নাম ছিল "পুরাণ"। "ইতিহাস-পুরাণ" একসঙ্গেও কোথাও কোথাও আছে।

একসঙ্গে ইতিহাস পুরাণের সকলের চেয়ে পুরাতন উল্লেখ আমরা পাই অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের শেষদিকে (১৫. ৬. ৪)। কোন কোন জায়গায় "পুরাতন ইতিহাসেরও" উল্লেখ আছে, তবে তাহা বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। মহাভারতে ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসের উক্তি উদ্ধৃত হইবার সময় প্রায়ই "অত্রাপ্যুদাহরন্তীমম্ ইতিহাসং পুরাতনম্।" এরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়। অনুগীতায় নারদ ও দেবমতের 'পুরাতন ইতিহাস' বিবৃত আছে। দেবমতের নাম বৈদিক সাহিত্যে কোথাও নাই। অনুগীতার সময় বৈদিক সাহিত্য পুরানো হইয়া যাওয়ায় সম্ভবত "পুরাতন ইতিহাস" নাম হইয়া থাকিবে।

এখনকার এই মহাভারতের কলেবর প্রকাণ্ড। বরাবর মহাভারত কিন্তু এত বড় ছিল না। আর এই মহাভারত একেবারে বর্তমান

আকারও প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাকে এই আকারে গড়িয়া উঠিতে হইয়াছিল। তাহাতে ইহার অনেক সময়ও লাগিয়াছিল। মহাভারতের আদি পর্বে একটি শ্লোকে পাই—

"আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥"—১. ২৬

পূর্বে এই ইতিহাস অনেক কবিই বলিয়াছেন, এখনও অনেকে বলিতেছেন এবং পরেও অনেকে বলিবেন। এটি মহাভারতের শ্লোক ; সকল পুথিতে আছে, সকল ছাপা বই-এ আছে। প্রক্ষিপ্তও বলা চলে না। সুতরাং ব্যাসদেবের সঙ্গে আমাদেরও স্বীকার করিতেই হইতেছে যে, মহাভারতের কথা শুধু ব্যাসদেবই লিখিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার পূর্বেও আরও অনেকে মহাভারতের কোন কোন প্রাচীন কথা লিখিয়া গিয়াছেন। খুব আগে একটা রীতি ছিল যাগযজ্ঞের বড় সুদীর্ঘ আখ্যান আবৃত্তি করা। অশ্বমেধের সময় সারা বছর ধরিয়া এই সমস্ত আখ্যানের আবৃত্তি চলিত। অনেক আখ্যান এক সঙ্গে করিয়া মিশাইয়া 'আখ্যান-চক্র'ও হইত। আর ঠিক এই রকমই মহাভারতে ঘটিয়াছে। এক একটি প্রাচীন বংশ-বিবরণ বা এক একটি প্রাচীন লোকের বংশ-বিবরণ বা তাহার গুণকীর্তির গাথা আবৃত্তি করা হইত—তাহার নাম 'নারাশংসী'। নারাশংসী বৈদিক যুগের আখ্যায়িকা—এটা অনেকটা 'history'র মত। রাজপুতনা ও গুর্জরের চারণদের গানে ইহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

এক একটি স্বতন্ত্র আখ্যানও আবৃত্তি করা হইত। যেমন যযাতিক-উপাখ্যান। যে যযাতির আখ্যান জানিত তাহাকে তখন 'যযাতিক' বলা হইত। পতঞ্জলি এই 'যযাতিক' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন (মহাভাষ্য, ৪. ২. ৬০)। উপনিষদ্-যুগের মাঝামাঝি আখ্যান-চক্রও ছিল। 'সুপর্ণাখ্যান' এই রকম একটি আখ্যান-চক্র।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে কুরুক্ষেত্রের নাম বহুবার আছে। পরীক্ষিৎ, জন্মেজয়াদির কথাও আছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের নামগন্ধ কোথাও নাই। অথর্ববেদে পরীক্ষিতের উল্লেখ আছে। শাংখায়ন-শ্রৌত-সূত্রে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কথা প্রথম শুনিতে পাওয়া যায়। সে যুদ্ধে কৌরবদের সর্বনাশ হয়। এই রকম করিয়া বোধ হয় মহাভারতের কথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। বর্তমান মহাভারতের আদি পর্বে অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এইরূপ একটা পুরানো আখ্যান স্থান পাইয়াছে। সেটি হইতেছে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ। ১৪৮ হইতে ২১৬ শ্লোক। সম্ভবত এটি একটি ballad—পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। মহাভারতের বর্ণিতব্য বিষয়ের মূল কোথায় তাহার নজির বলিয়া এই ballad টি অনুক্রমণিকার পৌর্বাপর্যের ব্যত্যয় করিয়া সহসা মাঝখানে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে কি থাকিবে, কি না থাকিবে বলিতে বলিতে হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের কথা আসিল কেন? আমার মনে হয় মহাভারত-কারের বক্তব্যের প্রমাণ ('authority')-স্বরূপ এই ৬৮টি শ্লোক বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক শ্লোকই মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয়ের এক একটি সূচী। এই শ্লোকগুলিতে যে বিষয় নাই তাহা মহাভারতে বলা হইবে না।

কেমন করিয়া এই গ্রন্থখানি ফাঁপিয়া ফুলিয়া বিপুলকায় হইল সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মহাভারতকার বলিয়াছেন, প্রথমে ইহাতে ৮,৮০০ শ্লোক ছিল—"অষ্টৌ শ্লোক-সহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ' (১.৮১)। তারপর ২৪,০০০ শ্লোকের ভারত-সংহিতা—'চতুর্বিংশতি-সাহস্রীং চক্রে ভারত-সংহিতাম্। উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ' (১.১০১)। ইহাতে উপাখ্যান ছিল না। শেষে গ্রন্থ আখ্যান-উপাখ্যানযুক্ত হইয়া লক্ষ শ্লোকে পরিণত হইল—"একং শতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্ (১.১০৫)।"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ব্যাসের এই গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল।

প্রত্যেক সংস্কৃত মহাভারতের আরম্ভে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ॥"

টীকাকারদের মতে এটি মঙ্গলাচরণের শ্লোক। নীলকণ্ঠ ইহার আর একটু পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, এটি 'মন্ত্র' শ্লোক। 'ততো জয় মুদীরয়েৎ' এই চরণের 'জয়' শব্দের বাংলা তর্জমায় মানে গোল হইয়া গিয়াছে। বর্ধমান-রাজের অনুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, বিদ্যাসাগরের অনুবাদ, কালীবর বেদান্তবাগীশের অনুবাদ, প্রতাপ রায়ের অনুবাদ, সকল অনুবাদেই 'নারায়ণ ও নরোত্তম, নর এবং দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।' এই রকমই মানে ধরা হইয়াছে। নীলকণ্ঠ ও অর্জুন মিশ্র 'জয়' শব্দে 'ইতিহাস' অর্থাৎ ধর্মার্থকামমোক্ষোপদেশক গ্রন্থ বুঝিয়াছেন। এ অর্থও এখানে ঠিক খাটে না। মহাভারতের কবি স্বয়ং এই 'জয়' শব্দের অর্থ বলিয়া দিয়াছেন। আদি পর্বের ৬২ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে 'জয়' শব্দের অর্থ এইরূপ পাওয়া যায়—

"জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে 'জয়' মহাভারতের প্রাচীন নাম। প্রথমে ইহার নাম 'জয়' ছিল। 'জয়' বলিলে ভারত-যুদ্ধে পাণ্ডবদেরই জয় বুঝায়। যে গ্রন্থে পাণ্ডবদের জয় গান ছিল, তাহাই 'জয়' নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। ইহা রাজবংশপ্রশংসা বা 'শ্লোক' রূপে আবৃত্তি করা হইত। পাণ্ডবদের জয়গান ইহাতে ছিল। ইহারই শ্লোক সংখ্যা ৮,৮০০ ছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কাজেই দেখা যাইতেছে 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি শ্লোক মহাভারতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকরূপে রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থ পাঠ করিবার

পূর্বে পাঠককে কি পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, এই শ্লোকে তাহারই উপদেশ আছে। ৮,৮০০ শ্লোকের গ্রন্থকে কেহ কেহ নিতান্ত 'ভুয়া' বলিয়াছেন। কিন্তু জয়-গ্রন্থের সন্ধান জানিলে একথা বলিতেন না। তবে "ব্যাসকুট" বা 'গণেশমহাভারতে"র কথা একেবারে ভুয়া। অধিকাংশ পুস্তক বা পুথিতেই পাওয়া যায় না। পুনার সংস্করণেও ইহা বাদ গিয়াছে।

এইবার ২৪,০০০ শ্লোকের গ্রন্থের কথা। ব্যাকরণ অনুসারে বলা চলে, রামের কথা আছে বলিয়া যেমন রামায়ণ নাম, ভগবানের কথা আছে বলিয়া যেমন, 'ভাগবত' নাম, তেমনই ভরত-বংশীয় রাজাদের বলবিক্রমের বর্ণনা আছে বলিয়া গ্রন্থের নাম হইয়াছিল "ভারত"। সূত্রসাহিত্যের শেষ গ্রন্থ আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে ঋষি-তর্পণে—

"সুমন্ত-জৈমিনি-বৈশম্পায়ণ-পৈল-সূত্র-ভায্য-ভারত-মহাভারত-ধর্মাচার্যাঃ"—৩. ৪. ৪.

ভারত ও মহাভারত বলিয়া দুইখানি পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে আছে ব্যাসদেব প্রথমে নিজ পুত্র শুককে, তারপর অন্য শিষ্যদের 'ভারত' পড়াইয়াছিলেন—

"ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্বং পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্।
ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ॥"
—১.১০৩

এই ভারতই সম্ভবত ২৪,০০০ শ্লোকের গ্রন্থ।

ইহার পর আখ্যান, উপাখ্যান দিয়া বিস্তার করিয়া যে গ্রন্থ তৈরি হয় তাহাই 'মহাভারত'। ইহার শ্লোক সংখ্যা ১০০,০০০।

সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন ব্যাসের এই পাঁচজন শিষ্যও পাঁচখানি ভিন্ন ভিন্ন ভারত-সংহিতা, অর্থাৎ মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতে ইহারও প্রমাণ আছে। ব্যাস এই পাঁচজনকে

প্রথম বেদ পড়াইয়া মহাভারত-পঞ্চম পড়াইয়াছিলেন। তারপর তাঁহারা গ্রন্থ রচনা করেন—

> "বেদাধ্যাপয়মাস মহাভারত-পঞ্চমান্।
> সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্॥ ৮৮
> প্রভুর্বরিষ্ঠা বরদো বৈশম্পায়নমেব চ।
> সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্‌ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ॥ ৮৯
> (১. ১. ৮৮-৮৯)।

বর্তমান মহাভারতের আরম্ভ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে। আরম্ভ কিন্তু পদ্যে নয়, গদ্যে। গদ্য হইলেও তবু ইহাতে শ্লোকের সংখ্যা দেওয়া আছে "১"। "১" সংখ্যক উক্তি ও দ্বিতীয় শ্লোক একত্র করিলে পাওয়া যায়—সৌতি উগ্রশ্রবা—লোমহর্ষণের পুত্র; পুরাণ পাঠ ও পুরাণ ব্যাখ্যা তাঁহার পেশা। তিনি নৈমিষ্যারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক মহাযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পুরাণসংশ্রিত ভারতেতিহাস বর্ণনা করিয়াছিলেন। ৫য় শ্লোক হইতে ১৩শ শ্লোক পর্যন্ত ঋষিদের প্রশ্নের উত্তরে সৌতি বলিলেন যে, তিনি পরীক্ষিৎ, জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে গিয়াছিলেন। সেখানে "বৈশম্পায়নের মুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রোক্ত মহাভারত-সংশ্রিত কথা" শুনিয়া তিনি বহু তীর্থ ও দেশ ঘুরিয়া সমন্তপঞ্চকে যান। এই স্থানে পুরাকালে কুরু-পাণ্ডবের ও অন্যান্য রাজাদের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেখান হইতে একেবারে শৌনকের যজ্ঞ-সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। সৌতি যে বিবরণ দিলেন তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, সৌতি বৈশম্পায়নের মুখে জন্মেজয়ের সর্পসত্রসভায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা খাঁটি মহাভারত নহে—তাহা মহাভারত-সংশ্রিত কথা মাত্র। এইটুকু আপাতত এক রকম যুক্তিযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারি, কেন না, মহাভারত হইল মন্ত্র শ্লোকাদি সোপক্রমণিক এই আলোচ্য গ্রন্থ। আর তাহা তাহার রচনার বহু পূর্বে সর্পসত্রে

কথিত ও শ্রুত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আর একটা দিকও বিবেচনা করিয়া দেখিবার আছে; ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করিতে বসিয়া এই তেরটি শ্লোক লিখিয়াই বলিয়াছেন যে, তাঁহার কাব্যের বক্তা অন্য এক স্থানে অন্য একজনের মুখে 'মহাভারত-সংশ্রিত' কথাই শুনিয়া আসিয়াছেন।—ইহা কিরূপ সঙ্গত হয়? মহাভারত রচিত হইবার পূর্বে মহাভারত-সংশ্রিত কথার আখ্যাপনও শ্রবণ সিদ্ধ হয় কি করিয়া? আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই মহাভারত-সংশ্রিত কথা কখনও আবার কৃষ্ণদ্বৈপায়নোক্ত। ইহাই বা কিরূপ ব্যাপার? কৃষ্ণদ্বৈপায়নই ত এই বর্তমান মহাভারত লিখিতে বসিয়া সৌতি-শৌনকসংবাদ উপক্রমণিকা রূপে বিবৃত করিতেছেন; তিনি আবার কবে কোথায় মহাভারত-সংশ্রিত কথার প্রচার করিয়াছিলেন? আর তাই বৈশম্পায়ন বলেন ও সৌতি শুনিয়া আসেন? বর্তমান মহাভারত-রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এবং সর্পসত্রে পঠিত মহাভারত-সংশ্রিত কথার মূল বক্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যদি একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে বলিতে হয় বর্তমান মহাভারতখানি ব্যাসদেবের স্বকৃত পূর্ব মহাভারতের উপক্রমণিকাস্থ বর্ধিত সংস্করণ। বেশ, কিন্তু নিজের পূর্বগ্রন্থের বিবরণ সৌতির মুখ দিয়া বলাইলেন কেন? এটি একটি প্রাচীন রীতি বলিয়াই মনে হয়। সংস্কৃত নাটকাদি গ্রন্থে এই নিয়ম অবলম্বন করা হইয়াছে। সেকালের কবিরা নটনটির মুখ দিয়া নিজের নাম ও রচনার প্রশংসা নিজেই লিখিয়া যাইতেন। অতঃপর সৌতি ঋষিদের জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কি বর্ণনা করিবেন? ঋষিগণ বলিলেন, জন্মেজয়ের সভায় ব্যাস কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৈশম্পায়ন যে ভারতেতিহাসের বিশিষ্ট উপাখ্যান বলিয়াছিলেন তাঁহারা তাহাই শুনিতে চান।

তখন তিনি রীতিমত মঙ্গলাচরণাদি করিয়া বলিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু নানা কথায় ভূমিকাটি একটু জাঁকাইয়া লইলেন। ২২-২৪ শ্লোকে ভগবানের নাম কীর্তন ও তাঁহাকে

নমস্কার করিলেন। ২৫ শ্লোকে ব্যাসদেব সৌতিকে নাটকের নটরূপ কার্য করাইয়া তাঁহার দ্বারা আত্মপ্রশংসা ও কাব্যপ্রশংসা করাইয়াছেন।

ইহার পর ৫০ শ্লোক পর্যন্ত সৌতির মুখে মহাভারত-প্রশংসা ও সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

৫১ শ্লোকে এক নূতন কথার অবতারণা হইয়াছে—

'বিস্তীর্যৈতন্মহজ্জ্ঞানমৃষিং সংক্ষিপ্য চাব্রবীৎ।
ইষ্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্॥'

এই মহা জ্ঞানাত্মক গ্রন্থকে বিদ্বান লোকে সংক্ষেপে ও বিস্তৃত-ভাবে ধারণ করিতে ইচ্ছা করায় ঋষি ইহা সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন।

বর্তমান মহাভারতের ২২ এবং ৫১ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, সৌতির পূর্বে সমসাময়িক কালে মহাভারত-পাঠ বিশেষ প্রচলিত ছিল। আর সেই মহাভারতের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত দুইটি রূপ ছিল। দুইটিই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রচিত। তারপর সেই মহাভারতের কোন একটা পাঠ বৈশম্পায়ন সর্পযজ্ঞসভায় পাঠ করেন; সৌতি আবার তাহা শুনিয়া আসিয়া শৌনকাদি ঋষির নিকট নৈমিষারণ্যে বৈশম্পায়ন-জন্মেজয়-সংবাদসহ মহাভারত বিবৃত করেন। ইহার পর সৌতি-শৌনক-সংবাদ সংবলিত বর্তমান মহাভারত তৈরি হয়। এই রকম করিয়া মহাভারতের কয়েকটি স্তর গড়িয়া উঠে। সেই স্তরযুক্ত মহাভারত যখন খুব জাহির হইয়া পড়িল, তখন ক্রমশ ব্যাসের খাঁটি মহাভারতের আরম্ভ কোন্ স্থান হইতে তাহা ক্রমশ লোকে ভুলিতে থাকে। তখন পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি যেখান হইতে আরম্ভ করা ভাল মনে করিতেন তিনি তাহাই করিতেন। আর সেই জায়গা হইতেই ব্যাসোক্ত মহাভারতের আদি গণ্য করা হইত। কালে যে কয়স্থান হইতে ঐরূপ আদি ধরা হইত একটি শ্লোকে কোন উত্তরকালবর্তী কবি তাহা লিপিবদ্ধ করেন এবং উহাতে লোকের

বিশ্বাস আনাইবার জন্য ইহাকে সৌতিবচনের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত রাখিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

"মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তিকাদি তথা পরে।
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে ॥"—১. ১. ৫২

অর্থাৎ বিপ্রগণের কেহ কেহ মন্ত্রশ্লোক হইতে, কেহ কেহ দিরেব পুত্র মনু হইতে, কেহ কেহ আস্তিক পর্ব হইতে এবং কেহ কেহ উপরিচরের উপাখ্যান হইতে মহাভারতের আদি ধরিয়া থাকেন।

সংস্কৃত মহাভারত সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলিয়া আমরা বাংলা মহাভারত সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। চারিশত বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে অনুবাদের একটা হিড়িক পড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীকর নন্দী বাংলায় সর্বপ্রথম মহাভারত রচনা করেন। আদি হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বমেধ পর্বে ইহার পরিসমাপ্তি। এখানি 'পরাগলী মহাভারত' নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ভুল করিয়া ইহাকে 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত'ও বলিয়াছেন। শ্রীকর নন্দীর উপাধি 'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' ছিল। অনেকে ভুল করিয়া শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে দুইজন কবি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা অমূলক। পরাগলী মহাভারতের সকল পর্বের পুষ্পিকায় (colophon) শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র তথা করীন্দ্র পরমেশ্বর ভণিতা পাওয়া যায়। সকল পুথিতেই এইরূপ ভণিতা আছে। গ্রন্থখানি সমস্ত পর্বগুলি যে একই কবির লেখা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সম্ভবত বঙ্গাধিপতি নসরৎ শাহ্‌র রাজত্বকালে (১৫১০-২৫ খ্রী°) এই মহাভারতখানি রচিত হয়। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর বিশেষ উৎসাহেই প্রথম হইতে সপ্তদশ পর্ব রচিত হয়। অশ্বমেধ-পর্ব আরম্ভ করিয়া পরীক্ষিতের জন্ম বিবরণ লিখিবার পর পরাগলের মৃত্যু হয়। এরূপ অনুমান করিবার কারণ অশ্বমেধপর্বে কবির নিজের পুষ্পিকায় পরাগলের নাম আছে। কতদূর পর্যন্ত লেখা হয় লিপিকরের পুষ্পিকা হইতে তাহা জানা যায়।

'লস্কর পরাগল ধর্ম অবতার। কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার।
শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল। বিজয় পাণ্ডব স্থনি মনে কুতুহল॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি। স্থনিলে অধর্ম
হরে পরলো [ে]ক তরি॥
ইতি মহাভারতে পাণ্ডব বিজয়ে পরিক্ষিত জন্ম সমাপ্তঃ।'...[১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২৫ সং পুথি, অশ্বমেধপর্ব ২৪০ পৃ° [২]

অশ্বমেধপর্বের বাকী অংশটুকু পরাগল পুত্র ছুটীখানের সভায় পঠিত হইয়াছিল। পরাগলী মহাভারতের পুথি চট্টগ্রাম হইতে পাওয়া যায়।

বিজয় পণ্ডিতের নামে প্রচারিত একখানি মহাভারত দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয় পণ্ডিত বলিয়া কেহ ছিলেন না। এই মহাভারতখানি পরাগলী মহাভারতেরই সংক্ষিপ্তসার। আর ইহার ভাষা পরাগলী মহাভারতের ভাষার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। 'বিজয়-পাণ্ডব' কয়েক স্থানে লিপিকর প্রমাদবশত বিজয় পণ্ডিতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত বলিয়া একখানি মহাভারত প্রচলিত আছে। এখানি ও পরাগলী মহাভারতে বড় বেশী তফাৎ নাই। ষষ্ঠীবরসুত গঙ্গাদাস সেন অশ্বমেধপর্ব রচনা করেন। কেবল এইটুকু ইহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সঞ্জয়ী মহাভারতের সহিত পরাগলীর ভাব ও ভাষা বেশ মিলিয়া যায়, জায়গায় জায়গায় যে অমিল নাই তাহা নয়। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুপাখ্যানটিতে বেজায় অমিল। অশ্বমেধ পর্বটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের সঙ্গে অশ্বমেধপর্বে আদৌ মিল নাই। তারপর সঞ্জয়ী মহাভারত

---

১ মুদ্রিত অশ্বমেধপর্বে 'পরীক্ষিতের জন্ম' উপাখ্যানটি নাই। অশ্বমেধপর্ব জৈমিনি ভারত হইতে গৃহীত।

২ বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের পুথিতেও (২৯১।১ পৃ°) এই পাঠ আছে। তবে লিপিকরের ভণিতা নাই।

পরাগলীর বিকাশ বলিয়া সঞ্জয়ী মহাভারতে অনেক কথা বেশী আছে। পরাগলী মহাভারত পড়িয়া 'বিজয় পাণ্ডবকথা' হয়। আর তাহাই ফাঁপিয়া ফুলিয়া 'সঞ্জয়ী মহাভারত' হইয়াছে। সঞ্জয়ী মহাভারতের পুথি ত্রিপুরা, কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে।

কবিচন্দ্র মহাভারতের উদ্যোগপর্ব, বনপর্ব, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য ও গদাপর্ব অনুবাদ করেন। সমগ্র মহাভারত তিনি অনুবাদ করেন নাই। অনুবাদ বলিলে লেখকের মতের অনুবর্তী হইয়া বর্ণনা বুঝায়। কবিচন্দ্র সংস্কৃত মহাভারতের ছায়া অবলম্বন করিয়া যথা-সম্ভব মহাভারতের ঘটনাবলী বর্ণনা করেন। তাঁহার অনুবাদ আক্ষরিক ভাষান্তর নয়। কবিচন্দ্র মহাভারতের কয়েকটি ঘটনা লইয়া দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতিও লিখিয়াছিলেন। কবিচন্দ্রের আসল নাম কি ছিল তাহাও জানা যায় না।

নিত্যানন্দ ঘোষও সমগ্র মহাভারত বাংলা ভাষার ছন্দে অনুবাদ করেন। সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নাই। তবে আদি, সভা, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, স্ত্রী ও শান্তিপর্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে। এখানিও পরাগলীর অনুকরণ। সমগ্র মহাভারতও বাংলায় আরও একজন অনুবাদ করিয়াছিলেন—তাঁহার নাম ষষ্ঠিবর সেন। কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণপর্ব ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। ষষ্ঠিবর স্বর্গারোহণপর্বের শেষে বলিয়াছেন যে, তিনি সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছেন। ষষ্ঠিবর ও তাঁহার পুত্র গঙ্গাদাস সেন অনেক স্থলে পরাগলীর অনুসরণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের কোন কোন পরাগলী মহাভারতের পুথিতে উত্তরকালে গঙ্গাদাসের হাত দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

"গঙ্গাদাস সেন রচিলেন সর্ব।
শ্লোক ভাঙ্গি রচিলেন অষ্টাদশ পর্ব॥"

কৃষ্ণানন্দ বসু, নিতাই দাস, বল্লভদেব ও ভৃগুরাম দাস ইঁহারাও কাশীরাম দাসের পূর্বে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে

হয়। কৃষ্ণচন্দ্র বসুর শান্তিপর্বের ১০৯৯ সালের পুথি ও দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'ভারত-কথার ১০৬৩ সালের পুথি পাওয়া গিয়াছে। এ ছাড়া ভাষায় একটু-আধটু অনুবাদ অনেকেই করিয়াছিলেন। সেগুলি কাশীরামের পূর্বে বা পরে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সকলগুলির আলোচনার স্থানও আমাদের নাই। তবে কয়েকজন রচয়িতার নামমাত্র উল্লেখ করিব। কয়জন কেবল অশ্বমেধপর্বই লিখিয়াছেন। ইঁহাদের নাম দ্বিজ অভিরাম (অশ্বমেধপর্ব), দ্বিজ রামচন্দ্র খান (অশ্বমেধপর্ব), দ্বিজ কৃষ্ণরাম (অশ্বমেধপর্ব) দ্বিজ রঘুনাথ, দ্বিজ রামকৃষ্ণ দাস, দ্বিজ ভরত পণ্ডিত। দ্রোণপর্ব লিখিয়াছিলেন গোপীনাথ দত্ত। রাজেন্দ্র দাস আদিপর্ব অনুবাদ করেন। এই মহাভারতগুলির মধ্যে পূর্ববঙ্গের সঞ্জয়ী মহাভারত ও পশ্চিমবঙ্গের নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত বিশেষভাবে আদৃত ছিল। একখানি প্রাচীন কাব্যের মুখবন্ধে পাওয়া যায়—

"অষ্টাদশ পর্বে ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ ॥"

এগুলির প্রায় দুই শত বৎসরের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। হস্তলিপি আবার নকলের। কাজেই অনুবাদের সময় নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব। কাশীরাম দাসের পরবর্তী কয়জন কবির পুথিও পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রামেশ্বর নন্দীর 'শকুন্তলা' মধুসূদন নাপিতের 'নল-দময়ন্তী' ও লোকনাথ দত্তের 'নৈষধ' উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত কবিদের সকলেই তাঁহাদের অনুবাদে মূল বহির্ভূত অনেক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু মূল সংস্কৃতের ধারাবাহিক কাব্যানুবাদ ধরিলে কাশীরাম দাসের অনুবাদই বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

কাশীরাম দাসও বাংলা ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করেন। অনুবাদ কার্যে তিনি পূর্ববর্তিগণের নিকট সাহায্যও লইয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলে সুন্দর কবিত্ব শক্তি ও কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষাও বেশ স্পষ্ট ঝরঝরে। কবির সরল বাংলায় প্রসাদ-

গুণও যেমন আছে, তেমনই সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের দক্ষতায় কবির ভাষাবৈচিত্র্য এবং সংস্কৃত জ্ঞানেরও পরিচয় আছে। এ পরিচয় ছদ্মবেশী অর্জুন ও দ্রৌপদীর রূপবর্ণনা প্রভৃতিতে বিশেষ করিয়া পাওয়া যায়। তাঁহার সমগ্র গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা অন্যূন ৩৬,০০০। সেগুলি প্রায়ই পয়ারে লেখা। ত্রিপদীর সংখ্যা ৪৬। অন্য ছন্দের সংখ্যা খুবই কম। মিত্রাক্ষরের বিশুদ্ধি অনেক স্থলেই রক্ষিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, কাশীদাস কয়েকখানি বাংলা মহাভারতের উপর নির্ভর করিয়াই আপনার মহাভারত লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহার প্রমাণ এই যে, কাশীদাস গোড়ায়ই লিখিয়াছেন,—

> "প্রণমোহ পুস্তক ভারথ নামধর।
> জার নাম করিলে নিষ্পাপ হয় নর॥
> পরাশর-সুত-মুখে হইল সম্ভব।
> অমল কমল দিব্য ত্রৈলোক্য দুর্লভ॥
> গীত-অর্থে কৈল তাহা সুগন্ধি নির্মাণ।
> কেশব রচিল তাহে বিবিধ আখ্যান।
> হরি সে উদ্ভব—সেই প্রচণ্ড তপনে।
> ভারথ-পঙ্কজ ফুটে জাহার বদনে॥
> সুবুদ্ধি সুজন লোক হৈয়া ষট্‌পদী।
> ভারথ-পঙ্কজ মধু পিয় নিরবধি॥"

শাস্ত্রী মহাশয় ৯৮৫ সালের একখানি পুথি পাইয়াছেন। সেখানি কাশীরামেরই আদিপর্বের পুথি। ৯৮৫ সালের কাশীরামের পুথি দেখিয়া বিশেষ সন্দেহ হইল। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালা হইতে পুথিখানি বাহির করিয়া দেখিলাম। পুষ্পিকার তারিখে কারচুপি হইয়াছে। পুথি-বিক্রেতারই কাজ বলিয়া মনে হইল। পূর্বে পুথিতে ১০৮৫ সাল ছিল। '১০' অঙ্কটিকে ছুরি দিয়া চাঁচিয়া '৯' করা

হইয়াছে। পরিবর্তিত অংশের কালির পার্থক্যও বেশ স্পষ্ট। এই '৯' টি আবার পুথির লিপিকারের অন্যান্য পত্রাঙ্কের কোন '৯'এর সহিত মিলে না। লিপিকরের '৯' সম্পূর্ণ অন্যরূপ। কয়েক বৎসর পূর্বে 'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতে'র মুখবন্ধে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বাবু মহাশয় লিখিয়াছেন—"মুদ্রিত কাশীদাসী অপেক্ষা আয়তনে প্রায় দ্বিগুণ। আদিপর্বের একখানি ৯৮৫ সনের (?) হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, কাশীরাম যে সময়ে আদিপর্ব রচনা করেন, এই পুথিখানি সেই সময়ের লেখা।" নগেন্দ্রবাবুরও তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ হইয়াছিল। নতুবা তিনি ৯৮৫ সনের পর "(?)" দিবেন কেন? লিপির আকার দেখিয়াও অত পুরানো বলিয়া মনে হয় না।

এই পুথির আরম্ভে যে কয়টি ছত্র আছে তাহার ব্যাপার শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "ইহার অর্থ এই যে, সুগন্ধি নামে একজন লোক 'গীত-অর্থে' অর্থাৎ বাঙ্গালা ছড়ায় মহাভারত নির্মাণ করিল। কেশব নামে আর একজন লোক তাহাতে বিবিধ আখ্যান জুটাইয়া দিল। তাহার পর হরি নামে আর একজন হইলেন, তিনি প্রচণ্ড সূর্যের ন্যায়; তাঁহার মুখে ভারত-পঙ্কজ ফুটিয়া উঠিল। অর্থাৎ তিনি মহাভারতের গল্প ও অন্যান্য গল্প একত্র লইয়া মহাভারত খানিকে ফুটাইয়া তুলিলেন। কাশীরাম দাস এই সকল বই ধরিয়া তাঁহার বই লিখিয়াছেন।" এই অর্থটি বিশেষ কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। কেন না, ইহার অর্থ সাধারণভাবে করিতে পারা যায়। আমাদের মনে হয় ইহার অর্থ নিম্নলিখিতরূপ হওয়াই স্বাভাবিক—

"ভারত নামক পুস্তককে প্রণাম করি। ইহার নাম করিলে মানুষ নিষ্পাপ হয়। [এই পুস্তককে পদ্মের সহিত তুলনা করা হইয়াছে] পরাশরসুতের মুখ হইতে [মহাভারত রূপ] ত্রৈলোক্য দুর্লভ একটি দিব্য অমল কমল উদ্ভূত হইল। [আমি কাশীরাম] গীত-অর্থে [পয়ার ছন্দের গান] তাহাতে (সেই পদ্মে) সুগন্ধি

নির্মাণ করিলাম। বিবিধ আখ্যান সেই পদ্মের কেশররূপে রচনা করিলাম। হরি বা কৃষ্ণ-রূপ সূর্য (তদুপরি) উদিত হইলেন; সেই প্রচণ্ড তপনোদয়ে ভারতরূপ পঙ্কজ যাঁহার (ব্যাসদেবের) বদনে প্রস্ফুটিত হইল। হে সুবুদ্ধি সুজন ব্যক্তি! ভ্রমর রূপে সর্বদা ভারত-পঙ্কজ মধু পান কর।"

কাশীদাসের এই কয়ছত্র কবিতা তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়—সংস্কৃত অনভিজ্ঞতার নয়। একটি সংস্কৃত শ্লোকের ভাবানুবাদ করিয়াই তিনি বাংলা কবিতায় ঐ কয়ছত্র লিখিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোকটি গীতা-ধ্যানের সপ্তম শ্লোক। শ্লোকটি এই—

"পারাশর্যবচঃ-সরোজমমলম্ গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক-কেশরং হরিকথা-সম্বোধনা-বোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈ রহরহঃ পেপিয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারত-পঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে॥"

এই কবিতাটির 'সরোজমমলম্', 'গীতার্থগন্ধোৎকটম্', 'নানাখ্যানক-কেশরম্', 'সজ্জনষট্পদৈঃ', 'ভারত-পঙ্কজম্' প্রভৃতি কাশীদাসের অনুবাদে সমুজ্জ্বলভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। সংস্কৃত মূল ও বাংলা পয়ার পড়িয়া সকলকেই বলিতে হইবে যে, কাশীদাস সংস্কৃত জানিতেন। মূল ও পয়ার তুলনা করিলেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

'সুগন্ধি', 'হরি' ও 'কেশব' এই তিনটি যে কোন লোকের নাম নয় তাহা 'গীতার্থগন্ধোৎকটম্', 'হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্', ও 'নানাখ্যানক-কেশরম্' হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কাশীদাস তাঁহার অনুবাদে এই তিনটিরই মাত্র 'রকম-ফের' করিয়াছেন। 'কেশব' পাঠ যে লিপিপ্রমাদ তাহা 'নানাখ্যানক-কেশরম্' সপ্রমাণ করিয়া দিবে।

কাশীরাম দাসের সমগ্র মহাভারতখানি ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া রচনা করা হইয়াছে। ইহাতে এই মহাকাব্যখানি সর্বাঙ্গ

সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ভাষা ও ভাব একদিকে যেমন সরল, স্বচ্ছ, অপরদিকে তেমনই মধুর, স্বাভাবিক। সমস্ত গ্রন্থখানি প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই পুস্তকের সমস্ত অংশ কাশীরামের স্ব-রচিত বলিয়া মনে হয় না। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কাশীরাম-সুত-রচিত স্বর্গারোহণ-পর্বের একখানি ১০৮২ সনের লিখিত পুথি পান, তাহাতে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"দ্বিজপদরজ লয়্যা কাশীর নন্দন।
জনকের আজ্ঞামত করিল রচন॥"

এই ভণিতা হইতে মনে হয় যে কাশীরাম তাঁহার পুত্র নন্দরামকে মহাভারত সম্পূর্ণ করিতে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবু একখানি পুথিতে দেখিয়াছেন, কাশীদাসের পূর্বে নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত প্রকাশ করেন। তারপর কাশীরাম মহাভারত আরম্ভ করেন। তিনি নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত ও নন্দরামের ভারত মিলাইয়া দেখিয়াছেন যে দুইখানি পুথির অনেকাংশে মিল নাই। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী হইতে সংগৃহীত ১০৮৩ সালের একখানি দামোদর পদাবলীর উপর লিখিত আছে যে, ঐ বর্ষে ১৮ই ফাল্গুন কৃষ্ণতৃতীয়ার দিন নন্দরাম দাসের মৃত্যু হয়। নগেন্দ্রবাবু এই কথা বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের মুখবন্ধে বলিয়াছেন। পূর্ববর্তী অনুবাদকগণের রচনার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, স্থানে স্থানে ইহাদের রচনা অবিকল এই গ্রন্থের সঙ্গে সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোথাও বা একটু-আধটু পরিবর্তন করা হইয়াছে। যুদ্ধপূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অবশিষ্ট অংশগুলিতে এই ব্যাপারের বেজায় বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতেই মনে হয় কাশীরাম সমগ্র মহাভারত রচনা করেন নাই।

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥"

সম্ভবত এই প্রবাদ বাক্য সত্য। কেন-না, প্রথম চারিটি

পর্বে যেখানে তিনি পূর্ববর্তীদিগের নিকট ঋণী সেখানে তিনি ভাষা পরিমার্জন ও পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু শেষের দিকের দু-একটি পর্বে পূর্ববর্তী রচনা হইতে অধিকাংশ অবিকল গৃহীত হইয়াছে। কাশীরাম দাসের পুত্র নন্দরাম ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণপর্ব রচনা করেন। ইহার প্রমাণ নন্দরামের পুথিতেই আছে। কাশীরামের প্রথম চারিটি পর্ব পড়িলে বেশ মনে হয় তিনি পূর্ববর্তীদিগের অনাড়ম্বর ভাব ও ভাষায় সুস্নাত হইয়া তাঁহার সমকালবর্তিগণের ভাব ও ভাষার ঔজ্জ্বল্য তাহাতে সংমিশ্রণ করিয়াছেন। প্রথম চারিটি পর্বের সুন্দর ও স্বাভাবিক বর্ণনার অলঙ্কার প্রায়শই সংস্কৃত হইতে গৃহীত। কিন্তু পরবর্তী পর্বে সেরূপ হয় নাই। প্রথম চারি পর্বে তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের বিশেষরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা কাশীদাস সংস্কৃত জানিতেন না, কথকদিগের নিকট পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন। এ কথার কোন মূল্য নাই। বেদ-ব্যাস রচিত মূল সংস্কৃত মহাভারতের তুলনা করিলে কাশীরামের কৃতিত্ব বুঝিতে পারা যায়।

কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদ করিতে প্রয়োজন মত স্বাধীন চিন্তারও পরিচয় দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পুরাণ বা অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যও লইয়াছেন। তবে প্রায়ই মূল সংস্কৃত মহাভারতের অনুবর্তন করিয়াছেন। মূল সংস্কৃত মহাভারত অবলম্বন করিয়া তাহাকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিয়াছেন। সংস্কৃত না জানিলে এরূপ করিতে পারিতেন না। তিনি যেভাবে সার সংকলন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সঞ্জয় প্রভৃতি পূর্ববর্তিগণের অনুবর্তী হইয়া তাঁহাদের কল্পনাকে স্বীয় অনুবাদে স্থান দেন নাই। আমাদের এই উক্তি আদি হইতে বিরাটপর্ব পর্যন্ত বেশ খাটে, পরে উহার যথেষ্ট ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানাভাববশত আমরা কাশীদাসী মহাভারত, মূল মহাভারত ও

সঞ্জয়ী মহাভারত হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদের মতের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

আদিপর্বে (অষ্টবসুর জন্মবিবরণে) কাশীরাম লিখিলেন—

"গঙ্গা বলে, সেই কথা শুন নরপতি।
বরুণের পুত্র যে বশিষ্ঠ-মহামতি॥
হিমালয় পর্বতে মুনির তপোবন।
* * *
দৈবে একদিন তথা বসু অষ্টজন।
ভার্যার সহিত সবে করিল গমন॥"—পৃঃ ৭০

(রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত কাশীদাসী মহাভারত)

মূল সংস্কৃতেও তাই আছে। কেবল বশিষ্ঠের আশ্রম হিমালয় না হইয়া সুমেরু পর্বতে। সুমেরুর অপর নাম 'হেমাদ্রি'। কাশীদাস 'হিমাদ্রি'র সহিত গোল করিয়া ফেলিয়া থাকিবেন।

সঞ্জয়ী মহাভারতে আছে—বশিষ্ঠাশ্রম সুমেরু পর্বতের নিকট। এই আশ্রম অষ্টবসু মন্ত্রিগণের সহিত দেখিতে পান।

কাশীদাসের উক্তি,—অষ্টবসুর অন্যতম দিব্যবসুর স্ত্রী বলেন—"নরলোকে সখী এক আছয়ে আমার। উশীনর কন্যা জিতবতী নাম তার।" "স্ত্রীবশ হইয়া বসু ধরিল গাভীরে।" "বশিষ্ঠের কামদুঘা ধেনু লইয়া নিজ-ঘরে গেল।"—পৃঃ ৭০। মূলের সঙ্গে কাশীদাসী মহাভারতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কেবল 'দিব্যবসু'র স্থানে 'দ্যুবসু'। উভয় শব্দই একার্থক। সঞ্জয়ী মহাভারতে বসুগণ নিজ নিজ পত্নীর জন্য কামধেনুর দুগ্ধপানে রূপ ও যৌবন বৃদ্ধি হইবে বলিয়া বশিষ্ঠের কামদুঘা গাভী হরণ করেন (৫৩।১ পত্র)। কিছু পরে আবার পাওয়া যায়, কামধেনু উর্বশীকে তাঁহারা দান করেন (৫৪।১ পত্র)।

কাশীদাসে আছে—শান্তনু হস্তিনাপুরে রাজা হইলেন। একদিন বনের ভিতর মৃগয়া করিতে গিয়া—

“জাহ্নবীর দুই তটে ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা॥” পৃঃ ৬৯

সঞ্জয় অনুরূপ ঘটনা দিয়াছেন। শান্তনুর পিতা রাজসভায় আসীন। গঙ্গাদেবী মাত্র একখানি কাপড় পরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সভাসদেরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাঁর নাম অমোঘা এবং তিনি শান্তনুকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন। রাজা ও সভাসদেরা সানন্দিত হইয়া শান্তনুর সহিত গঙ্গার বিবাহ দিলেন (৫৫ পত্র)। কাশীদাস লিখিয়াছেন—

“আশ্চর্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল সেই কন্যা নিকটেতে গিয়া॥
* * *
তোমারে করিব বিভা হও মম নারী।
কন্যা বলে, রাজা ভার্যা হইব তোমার।
এক নিবেদন আছে নিয়ম আমার॥”

সংস্কৃত মূল কাশীদাসের অনুরূপ।

কাশীদাস—“মুনিশাপে বসুগণ জন্ম নিল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র যেন পূর্ণশশী॥
পুত্র দেখি শান্তনুর আনন্দিত মন।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিছে রাজন॥
কদাচিৎ কভু যদি বল কুবচন।
সেই দিনে তুমি আমি নাহি দরশন॥
* * *
রাজার বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
গঙ্গারে লইয়া রাজা হস্তিনা আইল॥”—পৃঃ ৬৯

“হেথা পুত্র লয়ে গঙ্গা গেল গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিয়া মর পুত্র প্রতি বলে॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিরস বদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না বলে বচন॥”—পৃঃ ৬৯

সঞ্জয়—গঙ্গা পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গঙ্গা তাহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলেন। তারপর মরা ছেলেটিকে শান্তনুর কোলে দিয়া তাহাকে জলে ভাসাইয়া দিতে বলিলেন। রাজা রাত্রিযোগে তাহাই করিলেন (৫৫ পত্র)।

মূলের বর্ণনা কাশীদাসের অনুরূপ।

অতঃপর আমরা দিগ্‌দর্শন হিসাবে কাশীদাস ও বেদব্যাসের মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয়গুলির সহিত তুলনা করিয়া দেখাইব, উভয় গ্রন্থের মধ্যে তফাত কতটুকু, মিলই বা কতটুকু।

এইরূপ, অষ্টম পুত্রের জন্ম হইলে গঙ্গার সমুদয় কার্যের সহিত কাশীদাসের মহাভারতের অনৈক্য নাই। সঞ্জয়ী মহাভারতের সঙ্গে কিন্তু মিল নাই। শান্তনুর দাসরাজের নিকট কন্যা প্রার্থনা ব্যাপার মূল মহাভারত ও কাশীদাসে এক। পরিচর রাজার পুত্র-বৃত্তান্ত, বেদব্যাসের জন্ম, পরাশরী কন্যার সহিত বিদুরের বিবাহ, কুন্তীর প্রতি দুর্বাসার মন্ত্রদান। দুর্বাসার মন্ত্র-পরীক্ষার জন্য কুন্তী কর্তৃক সূর্যকে আহ্বান, কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত, কাশীদাসেও যেমন, মূল মহাভারতেও তেমনই। এ সমস্ত জায়গায় সঞ্জয়ী মহাভারতের বর্ণনা অন্যরূপ। সংস্কৃত মহাভারত ও কাশীদাসী মহাভারতের যে কোনও স্থান হইতে দেখানো যাইতে পারে উভয়ের সাদৃশ্য কত বেশী।

আদিপর্বে শকুন্তলা-উপাখ্যান

"কা ত্বং কল্যাণি সুশ্রোণি কিমর্থাঞ্চাগতা বনম্। ১. ৭১. ১২

*　　　*　　　*

ইচ্ছামি ত্বামহং জ্ঞাতুং তন্মমাচক্ষ্ব শোভনে॥ ১৩

*　　　*　　　*

কণ্বস্যাহং ভগবতো দুষ্মন্ত দুহিতা মতা ১৫
ঊর্ধ্বরেতা মহাভাগো ভগবাল্লোকপূজিতঃ। ১৬
কথং ত্বং তস্য দুহিতা সম্ভূতা বরবর্ণিনী॥" ১৭

"তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি।
*　　　　*　　　　*
মুনির নন্দিনী আমি শুন নরবর।
এত শুনি নরপতি করিল উত্তর ॥
*　　　　*　　　　*
পরম তপস্বী মুনি ফলমূলাহারী।
দারাত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহা ব্রহ্মচারী ॥
তাঁহার তনয়া তুমি হইলে কি মতে।"—ঐ, পৃ° ৪৮

সভাপর্ব

"কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য প্রবৃত্তং প্রথমেঽহনি।
অনাহার দিবারাত্রমবিশ্রান্তমবর্তত ॥
চতুর্দশ্যাং নিশায়াস্তু নিবৃত্তো মাগধঃ ক্লমাৎ।"

"কার্ত্তিক প্রথমে　　　প্রতিপদ ক্রমে
অহর্নিশি দোঁহে রণে।
হৈল চতুর্দশী　　　কহে দাস কাশী
বিশ্রাম না পায় ক্ষণে।" পৃ° ২৪৭

বনপর্ব

"দৃষ্ট্বা তং প্রহরিষ্যন্তং ফাল্গুনং দৃঢ়ধন্বিনং।
কিরাতরূপী সহসা বারয়ামাস শঙ্করঃ ॥
ময়ৈব প্রার্থিতঃ পূর্বমিন্দ্র নীলসমপ্রভঃ ॥
অনাদৃত্য চ তদ্বাক্যং প্রজহারাথ ফাল্গুনঃ।
কিরাতশ্চ সমং তস্মিন্ একলক্ষ্যে মহাদ্যুতিঃ।
প্রমুমোচাশনিপ্রখ্যং শরমগ্নিশিখোপমম্।" ইত্যাদি

"বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া।
সন্ধান পূরেন ধনুগুর্ণ টঙ্কারিয়া ॥
বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান্।
বরাহ তপস্বী তুমি না মারহ বাণ ॥

আনিলাম দূর হৈতে ডাকিয়া বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ॥
না শুনিয়া পার্থ তাহা করি অনাদর।
বরাহের উপরে মারিলা তীক্ষ্ণ শর॥
কিরাত যে দিব্য অস্ত্র মারিল শূকরে।" ইত্যাদি

—পৃ° ৩৬৬-৬৭

বিরাটপর্ব

"গজৈশ্চ সিংহৈশ্চ সমীয়িবানহং সদা করিষ্যামি তবানঘ প্রিয়ম্॥"

"সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ আর মহিষ বারণ।
যাহা সহ যুঝাইবে দিব আমি রণ॥" ইত্যাদি পৃ° ৫১১

কাশীদাসী মহাভারতে সংস্কৃত মূলের বিরোধী কথাও যে নাই তাহা নহে। একটা উদাহরণ ধরা যাউক। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের সময় কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিতে গেলেন। দ্রৌপদী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

"দৃষ্ট্বা তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্চৈ-
র্জগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্॥"—মহা° ১. ১৮৭. ২৩

কাশীদাসের বর্ণনা একেবারে অন্যরূপ। কাশীদাস দেখাইলেন শ্রীকৃষ্ণের চক্রাস্ত্রে কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিতে পারেন নাই।

"সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল।"

কাশীদাস যথাসাধ্য মূলের অনুবর্তী হইয়া মহাভারতের মুখ্য উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া মহাভারত লিখিয়াছেন। স্থানে স্থানে অবিকল তর্জমা থাকিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে মহাভারতীয় কথার অনুবাদ বা বর্ণনা, ঠিক translation নয়।

দর্শন, ধর্ম ও সম্প্রদায়

শঙ্কর-দর্শন ও অধ্যাস

জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের দর্শন আলোচনায় তাঁহার গীতা, উপনিষৎ ও বেদান্তভাষ্যই একমাত্র অবলম্বন। প্রধানত তাঁহার বেদান্তভাষ্য আলোচনা করিলেই তাঁহার দার্শনিক মত জানিতে পারা যায়।

বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের পরিশিষ্ট ভাগ। উপনিষদ্‌গুলিই বেদের পরিশিষ্ট ভাগ। বেদোক্ত ধর্ম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত। প্রবৃত্তি লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম বেদের কর্মকাণ্ডে ও নিবৃত্তি লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ উপনিষদ্‌ভাগে উক্ত হইয়াছে। এই দ্বিবিধলক্ষণাক্রান্ত ধর্মের উদ্দেশ্য মোক্ষ। প্রবৃত্তিমার্গ পরোক্ষভাবে ও নিবৃত্তিমার্গ প্রত্যক্ষভাবে মোক্ষসাধনের উপায়। নিবৃত্তিমার্গকে জ্ঞানমার্গ বলে। ব্রহ্ম বা মোক্ষপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষ উপায়স্বরূপ জ্ঞানমার্গ উপনিষদ্‌ভাগের সহিত সম্পর্কিত।

কয়েকটি প্রধান উপনিষদের প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই দর্শনশাস্ত্রটি বেদান্তদর্শন নামে অভিহিত। যে সকল অল্পাক্ষর অথচ সারগর্ভ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া বেদান্ত-দর্শনের অবতারণা, সেই সকল সূত্র ব্যাসসূত্র, ব্রহ্মসূত্র বা শারীরকসূত্র নামে অভিহিত। ব্যাসসূত্রসকল চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, এবং প্রত্যেক অধ্যায় চারি পাদে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক পাদ কতকগুলি অধিকরণে বিভক্ত। সূত্রসকলের সংখ্যা সর্বসমেত পাঁচশত পঞ্চান্ন ও অধিকরণের সংখ্যা একশত একানব্বই।

বেদান্তদর্শন বর্তমান সূত্রাকারে রচিত হইবার পূর্বে দার্শনিক-দিগের মধ্যে বেদান্তদর্শনের খুঁটিনাটি লইয়া বিরোধ ছিল। বাদরায়ণই তাঁহার সূত্রে সাতটি প্রাচীন মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সে সাতটি মতের নাম—আত্রেয়, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, কার্ষ্ণাজিনি, কাশকৃৎস্ন,

জৈমিনি ও বাদরি। এই মতগুলি সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

মূল সূত্রগুলি অত্যন্ত দুর্বোধ্য। টীকা বা ভাষ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে বোধগম্য হইবার নহে। ব্রহ্মসূত্রের একজন প্রাচীন বৃত্তিকারের নাম বোধায়ন। রামানুজাচার্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে ও বেদার্থ-সংগ্রহে এই বোধায়নের বচন প্রমাণ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেদার্থ-সংগ্রহে তিনি বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দী ও ভরুচি নামক ছয়জন পূর্বাচার্যের নামও করিয়াছেন, মতও দিয়াছেন। বৃত্তি নামক ব্রহ্মসূত্রের আর একটি প্রাচীন ব্যাখ্যাসূচক টিপ্পনী পাওয়া যায়। কিন্তু প্রণেতার নাম পাওয়া যায় না। উপবর্ষ নামে পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসার প্রাচীন টীকাকারের নামও পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের টীকাকার ও ভাষ্যকারদিগের মধ্যে শঙ্করাচার্যই সর্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত। শঙ্করাচার্যের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য 'শারীরক-মীমাংসা ভাষ্য" নামে পরিচিত।

শঙ্করাচার্যের শারীরক-মীমাংসাভাষ্যেরও আবার অনেক টীকা লিখিত হইয়াছে। শারীরক-মীমাংসাভাষ্যের টীকাকারদিগের মধ্যে মার্তণ্ডতিলকস্বামিশিষ্য বাচস্পতিমিশ্রই সর্বপ্রধান। তাঁহার টীকা 'ভামতী-নিবন্ধ' বা 'শারীরকভাষ্য-বিভাগ' নামে অভিহিত।

অমলানন্দ-(ব্যাসাশ্রম) রচিত বেদান্ত কল্পতরুতে বাচস্পতির ভামতীটীকার ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। অপ্যয়দীক্ষিত-প্রণীত বেদান্তকল্পতরুপরিমলে আবার তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। বৈদ্যনাথ ভট্ট-প্রণীত বেদান্তকল্পতরুমঞ্জরীতে তাহার আবার সংক্ষেপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

এ ছাড়া শঙ্করভাষ্যের উপর আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য টীকা লিখিত হইয়াছ, সে দুইটি গোবিন্দানন্দ-শিষ্য রামানন্দ সরস্বতী প্রণীত ভাষ্য 'রত্নপ্রভা' ও রামানন্দ তীর্থ-শিষ্য অদ্বৈতানন্দ-প্রণীত

'ব্রহ্মবিদ্যাভরণ'। দেবেশ্বর শিষ্য সর্বজ্ঞাত্মমুনিও 'সংক্ষেপ শারীরকে' সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বেদান্তের উপর আরও অনেক টীকা ও গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য—ভাস্করাচার্য-প্রণীত 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্য', ভবদেব মিশ্র-প্রণীত 'বেদান্তসূত্রভাষ্যচন্দ্রিকা', ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী-প্রণীত 'বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী', রঙ্গনাথ-প্রণীত-'ব্যাস-সূত্রবৃত্তি', রামানন্দ-প্রণীত 'সুবোধিনী' বা 'ব্রহ্মসূত্রবর্ষিণী' ধর্মরাজ দীক্ষিত-প্রণীত 'বেদান্ত-পরিভাষা' ও সদানন্দ-প্রণীত 'বেদান্তসার' নামক গ্রন্থও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১] শঙ্করাচার্যও স্বয়ং 'উপদেশ-সহস্রী' নাম দিয়া শ্লোকাবলিতে সংক্ষেপে বেদান্তদর্শন লিখিয়াছেন। রামানুজ, বল্লভাচার্য, ভট্টভাস্কর, মধ্বাচার্য, নীলকণ্ঠ-প্রভৃতি এক একজন একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইঁহারা বেদান্তের উপর সুন্দর সুন্দর ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়াছেন। ইঁহারা প্রধানত শঙ্কর-মতের বিরোধী।

শঙ্কর ব্যতীত বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ভাষ্যের মধ্যে প্রধানত নয়টি ভাষ্যই প্রসিদ্ধ। আচার্য রামানুজ (শ্রীবৈষ্ণব) একাদশ শতকের শেষ পাদে 'শ্রীভাষ্য' প্রণয়ন করেন। রামানুজ

---

১ এগুলি ছাড়া বিজ্ঞানভিক্ষু বা বিজ্ঞানযতির 'বিজ্ঞানামৃত' বা 'ব্রহ্মসূত্র-ঋজু ব্যাখ্যা' আছে। মুকুন্দগোবিন্দ-শিষ্য রামানন্দ 'ব্রহ্মামৃত-বর্ষিণী' লিখিয়াছিলেন। সদাশিবপুত্র গঙ্গাধর মহাডকর 'সুবোধিনী বা শারীরকসূত্র সারার্থচন্দ্রিকা'র রচয়িতা ছিলেন। তিরুমলপুত্র অন্নম্ ভট্ট 'মিতাক্ষরা' নামক ভাষ্য করেন। আনন্দতীর্থ (মধু বা মধ্ব) ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রণয়ন করেন। অদ্বৈতানন্দ সরস্বতীর শিষ্য স্বয়ম্ প্রকাশনন্দ সরস্বতী লিখিয়াছিলেন 'বেদান্তনয়নভূষণ', আর আনন্দপূর্ণ মুনি (অভয়ানন্দ-শিষ্য বিদ্যাসাগর) লিখিয়াছিলেন 'সমন্বয়সূত্রবৃত্তি'। ১৮২৪ বিক্রমাব্দে মরাঠী পণ্ডিত ভৈরব দীক্ষিততিলক 'ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি' রচনা করেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। মধ্বাচার্য (মাধ্ব) দ্বৈতবাদী। কেহ কেহ ইঁহার মতকে স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদও বলেন। ইনি ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে সূত্রভাষ্য রচনা করেন। বিষ্ণুস্বামীও দ্বৈতবাদী। ত্রয়োদশ শতকে ইনি বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের অনুকূল 'ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য' লেখেন। শ্রীনিবাস (নিম্বার্ক) ভেদাভেদবাদী। ইঁহার 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' ত্রয়োদশ শতকে রচিত হয়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ চতুর্দশ শতকে শৈবভাষ্য লিপিবদ্ধ করেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য ষোড়শ শতকে 'ব্রহ্মসূত্রানুভাষ্য' নামে বল্লভ-সম্প্রদায়-যোগ্য ভাষ্য করেন। শ্রীপতি (লিঙ্গায়ত) শক্তি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দিক্ দিয়া 'শ্রীকরভাষ্য' প্রকটিত করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শুক (ভাগবত) 'শুকভাষ্য' রচয়িতা। 'শ্রীকর' ও 'শুকভাষ্যে'র সময় এখনও নির্ণীত হয় নাই। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বলদেব শ্রীজীব গোস্বামী প্রতিপাদিত অচিন্ত্যভেদাভেদের দিক্ দিয়া "গোবিন্দভাষ্য" সংকলন করেন।

প্রধানত যে সকল উপনিষদ্‌গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বেদান্তদর্শনের অবতারণা করা হইয়াছে তন্মধ্যে ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, বাজসনেয়ী, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, তলবকার, মাণ্ডুক্য, কঠ, প্রশ্ন ও মুণ্ডক সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে—

(১) 'ঐতরেয়' ঋগ্বেদের 'ঐতরেয়' ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ। ইহা ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারিটি পাদে সম্পূর্ণ।

(২) বৃহদারণ্যক একখানি বৃহৎগ্রন্থ। মাধ্যন্দিন শাখামতে ইহা শতপথব্রাহ্মণের চতুর্দশকাণ্ড। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম চারিটিতে বৈদান্তিক আলোচনা আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে গ্রন্থের অর্থাৎ সমগ্র উপনিষদের সারাংশ সন্নিবেশিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি যে সমস্ত প্রশ্ন করা হইয়াছিল এই ছয় অধ্যায়ে তাহাদের উত্তরে তিনি ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইগুলিতে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য ব্রহ্মবেত্তাদিগের কথোপকথন সন্নিবেশিত আছে।

(৩) ছান্দোগ্য একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপনিষৎ, ইহা ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক কথোপকথন ও বিচার বিতর্কাদিতে পরিপূর্ণ।

(৪) তৈত্তিরীয়, কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ-বিভাগের অংশবিশেষ। ইহা শিক্ষা, ব্রহ্মানন্দ ও ভৃগু এই তিন বল্লীতে বিভক্ত। প্রথম বল্লীতে জিজ্ঞাসুর কর্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বল্লীতে নিছক উপদেশ করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জিজ্ঞাসু শিষ্য কি ভাবে ধীরে ধীরে জ্ঞানের সোপান হইতে সোপানান্তরে অধিরোহণ করিবেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) মুণ্ডক উপনিষদে শৌনকের বিশ্ববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গিরার উপদেশ সন্নিবেশিত আছে। এই গ্রন্থ তিন মুণ্ডকে বিভক্ত, এবং প্রতি মুণ্ডক তুই তুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহা পরম পুরুষের স্বরূপ ও তাঁহার গুণ বর্ণিত আছে। পরমাত্মার সহিত জগতের সম্বন্ধ কি, কি উপায়ে মানুষ পরমাত্মার সম্বন্ধে জ্ঞানী হইতে পারে, প্রভৃতি বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে।

(৬) কঠোপনিষৎ তুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে তিনটি করিয়া বল্লী। যম ও নচিকেতার পরস্পর কথোপকথন ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে।

(৭) শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে অনেক কথা এবং অন্যান্য বিষয়ও সন্নিবিষ্ট আছে। ইহাতেও ছয়টি অধ্যায়।

উপনিষৎ সকল প্রধানত জীব, জগৎ, আত্মা প্রভৃতি বিচার বিতর্কাদিতে পরিপূর্ণ। বেদান্তদর্শন এই সকল উপনিষদের মীমাংসা। বেদান্তের সারমর্ম এই যে, একমাত্র পরমাত্মাই সৎ, আর সমস্তই অসৎ। পরমাত্মা ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। একমাত্র পরমাত্মাই পূর্বে ছিলেন, আর কিছু ছিল না। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, এবং বহু হইলেন (ছান্দোগ্য)। সুতরাং তিনি চৈতন্যময় পুরুষ। তিনি সাংখ্যানির্দিষ্ট প্রকৃতির ন্যায় অচেতন নহেন।

সাংখ্যমতে জগতের সৃষ্টি অচেতন প্রকৃতি হইতে, কিন্তু বেদান্তমতে জগতের সৃষ্টি পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরমাত্মা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্; তিনি জগতের জ্ঞানময় কারণ ও আনন্দঘন। তাঁহার প্রশ্বাসে জগতের উৎপত্তি, ও নিঃশ্বাসে জগতের প্রলয়। তিনি প্রাণ; তিনি জ্ঞানময় পুরুষ, তিনি অমৃতস্বরূপ ও আনন্দঘন (ছান্দোগ্য ও কৌষীতকি)। "ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ ও সর্বজ্ঞ, তিনি সকল পদার্থে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি নিত্য শুদ্ধ চৈতন্যময় ও মুক্ত।" উপনিষদে বর্ণিত আছে, "ব্রহ্ম সমগ্র বিশ্বে পরিব্যপ্ত ও সকল পদার্থে অনুস্যূত রহিয়াছেন। তিনি সকল বস্তু ও ব্যাপারে গূঢ় সন্নিবিষ্ট ও বিশ্বের নিয়ন্তা।"

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এইটি ছান্দোগ্য-উপনিষদের একটি মন্ত্র। ইহার তাৎপর্য এই যে, এই জগৎ পূর্বে বিশুদ্ধ এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ ছিল। অর্থাৎ পূর্বে আর কিছুই ছিল না, কেবলমাত্র এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। এই জগৎ এখন আছে, কিন্তু পূর্বে ছিল না। সেই অখণ্ড এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ হইতে জগতের উৎপত্তি। ঐতরেয়-উপনিষৎ অন্য কথায় ঠিক একই তাৎপর্য প্রকাশ করিতেছে। ঐতরেয়-উপনিষদের মন্ত্র "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"। ইহার তাৎপর্য এই যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্বে একমাত্র আত্মা ছিল। পূর্বে একমাত্র আত্মা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মাণ্ডুক্য-উপনিষদের একটি মন্ত্র এই যে, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। এই আত্মা ব্রহ্ম। এই মন্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সূচিত হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তাৎপর্য ইহাই। ছান্দোগ্যের মন্ত্র "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" হে শ্বেতকেতু! তুমি তাই অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম। এই উপনিষদ্ই পুনরায় বলিতেছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। বস্তুত সকলই ব্রহ্ম! সুতরাং দেখা যাইতেছে, সকল উপনিষদ্ই জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। সকল উপনিষদ্ই একবাক্যে

একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই পারমার্থিক ভাবের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, এবং বেদান্তদর্শন তাহারই মীমাংসা করিতেছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইতেছে যে, ব্রহ্মসূত্রের বেদান্তভাষ্য অনেকেই করিয়াছেন। কিন্তু তন্মধ্যে শাঙ্করভাষ্যই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্যের অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতিপ্রতিপাদ্য এক এবং অদ্বিতীয় সত্তাই আছে ; সত্তামাত্রই বস্তু। সেই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা ব্রহ্ম, তিনি পরমাত্মা ও চৈতন্যস্বরূপ। তবে এই যে জগতের ও জীবের সত্তা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা অবিদ্যাবশতই হইতেছে। অবিদ্যাকে শঙ্কর ভ্রম বা অজ্ঞান অর্থেই বুঝিয়াছেন। বাস্তবিক অন্য কিছুই নাই ; তবে যে আত্মা ছাড়া অন্য কিছুর সত্তা প্রতীয়মান হইতেছে তাহা অবিদ্যাজনিত মিথ্যা অধ্যাসবশত হইতেছে। জগৎ নাই, জগৎ মিথ্যা। জগৎ নাই অর্থে জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই এবং সেজন্য মিথ্যা অর্থে অসৎ। আর মিথ্যার অধ্যাসই আত্মায় জগদ্‌ভ্রমের কারণ। শঙ্করাচার্য এই অধ্যাসটি সর্বপ্রথমে ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন। তাঁহার অধ্যাস ভাষ্যের আলোচনা না করিলে, তাঁহার মতটি ভাল করিয়া বুঝা যায় না।

অধ্যাস শব্দের অর্থ মিথ্যা আরোপ। যাহা যাহা নয়, তাহাতে তাহার গুণের আরোপকেই অধ্যাস বলে। শুক্তি ও রজত পৃথক্। উহাদের মধ্যে একের গুণ অন্যের গুণ হইতে পৃথক্। রজতের গুণ শুক্তির উপর আরোপিত হইলে, শুক্তিতে রজতভ্রম হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত শুক্তিতে রজতের গুণ আরোপিত হইতে পারে না। আমরা ভ্রমবশত, শুক্তির উপর রজতের গুণের মিথ্যা আরোপ করিতে পারি, এবং তাহার ফলে শুক্তিতে রজত ভ্রম হইতে পারে। ইহারই নামান্তর অধ্যাস। এইরূপ অধ্যাসবশতই ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ অধ্যাস হইতে পারে কি না, ইহাই প্রথমে বিবেচ্য, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা চৈতন্য-স্বরূপ, জগৎ জড়। চৈতন্যের উপর জড়ত্বের অধ্যাস হইতে পারে কি না ? শঙ্করাচার্য পূর্বপক্ষ অবলম্বন

করিয়া প্রথমে দেখাইতেছেন—হইতে পারে না। জড়ত্ব ও চৈতন্য অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ ধর্মাপন্ন। যেমন আলোকের অন্ধকারের উপর ও অন্ধকারের আলোকের উপর মিথ্যাধ্যাস অসম্ভব, সেইরূপ জড়ত্বের চৈতন্যের উপর ও চৈতন্যের জড়ত্বের উপর মিথ্যা-ধ্যাস সম্ভব হয় না।

শঙ্কর পূর্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া অধ্যাস অসম্ভব দেখাইয়া পরে দেখাইতেছেন যে, যুক্তিতে অসম্ভব হইলেও কার্যত অধ্যাস সম্ভব হইয়াছে। জড়ত্ব ও চৈতন্য এ উভয়ের পরস্পরের উপর পরস্পরের অধ্যাস অনাদিসিদ্ধ। যাহা অনাদিসিদ্ধ তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যাহা বিষয়, তাহাই জ্ঞানগোচর হইতে পারে; যাহা কখনই বিষয় নয়, তাহা কখনই জ্ঞান-গোচর হইতে পারে না। বিষয় ও বিষয়ী অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পরবিরোধী। ইহাদের মধ্যে একের অভাবেই অন্যের ভাব হইয়া থাকে। ইহাদের পরস্পরাধ্যাস কেমন করিয়া হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আত্মা যে একান্তই অবিষয় তাহা নহে। অহংজ্ঞানজ্ঞেয় হইয়া আত্মা বিষয়ীভূত হন। ইহার তাৎপর্য এই যে, পরমাত্মা অবিদ্যাকল্পিত হইয়া অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মায় পরিণত হন। জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ইহাতে স্বীকৃত হয় না। জীবভাব পরমাত্মায় অধ্যস্ত হয়, এই মাত্র। শঙ্করাচার্যের অধ্যাসভাষ্যের সংক্ষেপ-মর্ম এই। বিস্তৃতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার অধ্যাসভাষ্য আমরা পরে আলোচনা করিব। তৎপূর্বে দর্শনশাস্ত্রের বিষয় কি, বেদান্ত-দর্শনের অবতারণার উদ্দেশ্য কি, আত্মা বলিতে কাহাকে নির্দেশ করা হয়, অবিদ্যা কাহাকে বলে ও অবিদ্যা কয় প্রকার, অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করে, বৈদান্তিকদিগের এ বিষয়ে মতদ্বৈধ কি, ব্রহ্মের লক্ষণ কি এবং কয় প্রকার, লক্ষণ বলিতে কি বুঝা যায়, বস্তু কাহাকে বলে, জগৎব্রহ্মের বিবর্ত না বিকার, শাস্ত্রমতে বিবর্ত ও বিকারের অর্থ কি—এই সকল বিষয়ে দু-এক কথা বলিতে চেষ্টা

করিব। এ সমস্ত বিষয় দু-এক কথায় আলোচনা চলে না, তবে দিগ্‌দর্শন হিসাবে কিছু ইঙ্গিত করিতে চেষ্টা করিব।

অধ্যাসভাষ্য বুঝিতে হইলে এই সকলের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। শঙ্করাচার্যের অধ্যাসভাষ্যটি বড়ই উপাদেয় বিষয়। একদিকে যেমন উপাদেয় অপর দিকে সেইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ। এই অধ্যাসভাষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিবার জন্য আমাদিগকে প্রথমে পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। বেদান্তদর্শন গভীরতার সমুদ্র-সদৃশ, প্রধান প্রধান দার্শনিকবৃন্দ ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া গভীর গবেষণা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ মাত্র করিতে পারি। পৃথিবীতে যতপ্রকার দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া অসীম প্রতিভাশালী ভাষ্যকারগণ সেই সমস্ত চিন্তার পরাকাষ্ঠা সাধন করিয়াছেন। দর্শনসম্বন্ধে মনুষ্যচিন্তা যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, বেদান্তদর্শন প্রণয়নে ততদূরই অগ্রসর হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন না করা যায়, বোধ হয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্ণ সার্থকতা হয় না। মানবমনের যে কতদূর সূক্ষ্ম চিন্তা সম্ভব, তাহা বেদান্তালোচনায় প্রতিপন্ন হইবার যোগ্য। যে সকল মনীষিবৃন্দ বেদান্তালোচনা করিয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে। আমরা একটিও নূতন কথা বলিবার যোগ্য নই, এবং নূতন কথা বলিবার কিছু আছে বলিয়া আমরা বিবেচনাও করি না। এমন কি উপমাস্থলে তাঁহাদের প্রবর্তিত রজ্জু, সর্প, রজত, শুক্তি প্রভৃতির পরিবর্তন করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। এই সকল উপমার যে স্থলে তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাদিগের সে স্থলে সেরূপ ব্যবহারের ত্রুটি হইতে সৌন্দর্য-হানি দোষ সংঘটনের সম্ভাবনা। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, প্রাচীন ভাষ্যকারেরা আধুনিক বিজ্ঞানের বিরাট্ জ্ঞানে বঞ্চিত ছিলেন, এবং সেই কারণেই তাঁহাদের

তত্ত্বালোচনায় যতটুকু ত্রুটি হওয়া সম্ভব তাহাই হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোক, এখন আমাদের পথ যেরূপ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, যদি তাঁহাদের পথ সেরূপ পরিষ্কার করিয়া দিত, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা আমরা যে আশা করিতে পারিতাম, তাহা স্মরণ করিলে দুঃখার্ণবে পতিত হইতে হয়। তাঁহারা যেরূপ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, যদি তাঁহারা তত্ত্বালোচনার পথে বিচরণ-কালে আধুনিক বিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোক পাইতেন, তাহা হইলে, পাশ্চাত্য কোন দার্শনিকই যে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারিতেন তাহা সংশয়ের বিষয়। তাঁহারা তমসাচ্ছন্ন পথে, তত্ত্বপথের পথিক হইয়াছিলেন, এবং তাহাতেই তাঁহারা যেরূপ বিস্ময়জনক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভারতের পক্ষে সমধিক গৌরবজনক। এ সম্বন্ধে আমরা এখন কিছুই বলিব না। এ কথার উত্তর আমরা যথাস্থানে দিব। স্বীকার করি আজ বিজ্ঞান চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া জড়ের সাম্রাজ্য অতিক্রম করিয়া শক্তিতত্ত্ববাদে উপনীত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দার্শনিক শক্তির মূলে প্রবৃত্তির অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সৃষ্টির মূলে চৈতন্যসত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান বহুত্বের মূলে একত্বের সন্ধানে প্রবৃত্ত। তাই বলিয়া আজ গৌতম, কণাদ, কপিল পশ্চাতে পড়িয়াছেন, এ কথা বলিতে পারিব না। যাহা হউক আমরা প্রসঙ্গক্রমে বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রস্তাবিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সংশয় সম্বন্ধে নির্ণয়ের প্রবৃত্তি হয়। আত্মার সম্বন্ধে নির্ণয়ের প্রবৃত্তির জন্য আত্মার সম্বন্ধে সংশয়ের প্রয়োজন। দর্শনশাস্ত্র আত্মার সম্বন্ধে নির্ণয়। যদি আত্মার সম্বন্ধে সংশয় না থাকে, তাহা হইলে দর্শন শাস্ত্রে প্রয়োজনীয়তা থাকে না। প্রথমে দেখিতে হইবে আত্মার সম্বন্ধে সংশয় আছে কি না। বলা যাইতে পারে, প্রাণিমাত্রেই 'অসন্দিগ্ধ আত্মজ্ঞানী'। সকলেই 'আমি' 'আমি' করে,—সকলেই

'আমি' বলিয়া আপনাকে জানে, অন্তত মনুষ্যমাত্রেই আপনাকে জানে, 'আমি' বলিয়া আপনাকে অনুভব করে যদি এই সিদ্ধান্ত হয় যে, মনুষ্যমাত্রেই আত্মজ্ঞানী, তবে আর নির্ণয়ের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, মানুষ আপনার 'অব্যভিচরিত স্থিরতর রূপটি' জানে না। যদি তাহা না জানে তাহা হইলে তাহার আত্মা সম্বন্ধে সংশয় আছে বুঝিতে হইবে। মানুষ একবার বলে আমার দেহ, আবার বলে আমি অসুস্থ। এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, মানুষ একবার মনে করে আমি দেহ নহি, দেহ আমার; আর একবার মনে করে—দেহই আমি। আমি অসুস্থ বলিলে আমার দেহের অসুস্থতা বুঝায়। আমি খঞ্জ বলিলে আমার দেহের খঞ্জতা বুঝায়। কিন্তু মানুষ যখন বলে আমি অসুস্থ, আমি খঞ্জ, তখন সে দেহ ও আত্মাকে একই বস্তু মনে করে। আমি-জ্ঞানের স্থির অবলম্বন হইলে এইরূপ মনে হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের সংশয় আছে। এই সংশয় বিদূরিত করিবার জন্যই বেদান্তশাস্ত্রের অবতারণা। অনেকে বলিতে পারেন, মানুষ যখন 'আপনার দেহ' বলে, তখন তাহার দেহ ও আত্মার পার্থক্যজ্ঞান থাকে। ইহা তো বেশ বুঝিতে পারা যায়। আবার যখন সে বলে, আমি অসুস্থ বা আমি খঞ্জ, তখন ভাষাতেই সে কথা বলে, কিন্তু মনে মনে সে বেশ বুঝিয়া থাকে যে তাহার দেহই অসুস্থ বা তাহার দেহই খঞ্জ; সুতরাং মানুষ নিঃসংশয়িতভাবে আত্মজ্ঞানী। এরূপ স্থলে আত্মজ্ঞান উপদেশ-পক্ষে বেদান্তের অবতারণার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি অসুস্থ, এইরূপ ভাব প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞানের পরিচায়ক নহে। আত্মা প্রকৃতপক্ষে সুখ দুঃখের অতীত। প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইলে সুখ দুঃখ প্রভৃতির ভাব-বিবর্জিত অবস্থায় আত্মাকে দেখিতে হয়। অর্থাৎ সকল বিষয় হইতে পৃথক অবস্থায় আত্মাকে না দেখিলে প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয় না। আমরা সাধারণত আত্মাকে সেরূপ ভাবে

দেখি না। বেদান্ত সেইরূপভাবে আত্মাকে দেখিতে উপদেশ দেয়।

'আমি সুখী' বলিতে বুঝা যায় যে, আমার সুখ আছে। 'আমার সুখ আছে' বলিতে বুঝিতে হয় যে, সুখ এবং আমি পৃথক্। দুঃখ আসিলে আমার সুখ আসে না; অর্থাৎ তখন সুখ হইতে আমি পৃথক্ হইয়া পড়ি। সেইরূপ সুখ আসিলে আমার দুঃখ থাকে না, অর্থাৎ তখন দুঃখ হইতে আমি পৃথক্ হইয়া পড়ি। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, আমি সুখ-দুঃখের অতীত। এক বিষয়ের জ্ঞান উপস্থিত হইলে আমার অন্য বিষয়ের জ্ঞান তিরোহিত হয়। আমার জ্ঞান হইল বলিতে বুঝা যায়, আমার কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান হইল। আমার এক বিষয়ের জ্ঞান আসে, আর এক বিষয়ের জ্ঞান চলিয়া যায়। সকলই (সকল জ্ঞানই) যাতায়াত করে, কিছুই স্থির থাকে না। সুতরাং জ্ঞান হইতেও আমি পৃথক্, অর্থাৎ আমি জ্ঞানেরও অতীত। আমি কি আমাকে এই ভাবে জানি? যদি আমাকে আমি এই ভাবে না জানি, তাহা হইলে আমি আত্মজ্ঞানী হইলাম কেমন করিয়া?

আত্মা সকল বিষয়ের অতীত। কিন্তু অবিদ্যা প্রভাবে আত্মা বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। এক্ষণে অবিদ্যা জিনিষটা কি? বেদান্ত-মতে, অবিদ্যা অজ্ঞান বা ভ্রম। অজ্ঞান বলিলে তাহার মূলে জ্ঞান বুঝিতে হয়। পূর্বে জ্ঞান না থাকিলে অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অজ্ঞানের দ্বিবিধ অর্থ হইতে পারে। এক অর্থে অজ্ঞান বলিতে জ্ঞানের একান্ত অভাব বুঝায়। তাহা চৈতন্যের বিরোধী। যেমন প্রস্তর সর্বতোভাবে অজ্ঞান, অর্থাৎ প্রস্তর জড়। আর এক অর্থে অজ্ঞান বলিলে ভ্রমাত্মক জ্ঞান বুঝায়, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান এইরূপ অজ্ঞান ও ভ্রম একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবিদ্যা বলিতে, এইরূপ অজ্ঞান বা ভ্রম বুঝায়।

যাহাকে নির্দেশ করিয়া 'আমি' জ্ঞান হয়, তাহাই আত্মা। জ্ঞানের

অতীত বলিতে আত্মা জড় একথা বুঝায় না। আত্মা বস্তুর জ্ঞানস্বরূপ। আত্মা জ্ঞানের অতীত বলিতে আত্মা ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত। কিন্তু আত্মার সহিত পারমার্থিক জ্ঞানের নিত্য সম্বন্ধ। আত্মা সুখ ও দুঃখের অতীত একথাও বলা হইয়াছে। তাহাতে একথা বুঝায় না যে, আত্মার বা আত্মায় আনন্দ নাই। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা 'সচ্চিদানন্দ'। কিন্তু সৎ, চিৎ ও আনন্দ, তিনটি পৃথক্ পদার্থ নহে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ পরস্পর নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট। ইহাদের একের সহিত অপর দুইটির সম্বন্ধ নিত্য, অর্থাৎ একটিকে ছাড়িয়া অপর দুইটি থাকিতে পারে না। আমাদের ব্যবহারিক জগতের সুখ ও পারমার্থিক আনন্দে বিশেষ প্রভেদ আছে। ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান ও সুখ কল্পিত ও অনিত্য। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞান ও আনন্দ চৈতন্যের সহিত নিত্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট। অবিদ্যা বলিতে যে অজ্ঞান বুঝায়, তাহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক জ্ঞান। বস্তুত আমাদের যতকিছু জ্ঞান হয় তাহা পরমাত্মাকে অতিক্রম করিয়া হইতে পারে না। কারণ তিনি ছাড়া অপর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তাঁহার সাম্রাজ্যের বহির্ভাগ হইতে আমাদের কোন জ্ঞানই আসিতে পারে না। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহা তাঁহারই অংশবিশেষ। তিনি অখণ্ডস্বরূপ অনন্ত জ্ঞানাধার। আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে জানিতে গিয়া ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বশবর্তী হই। শ্রুতি ব্রহ্মকে অবিভক্ত অখণ্ডসত্তা বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে তিনি বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন। এই যে বিভক্তের ন্যায় প্রতীয়মান হন, তাহা মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে।

বৈদান্তিকদিগের মতে অবিদ্যা দ্বিবিধ। একটিকে মূলাবিদ্যা ও অপরটিকে তুলাবিদ্যা বলা হয়। মূলাবিদ্যা জগতের উপাদান কারণ ও তুলাবিদ্যা মিথ্যাজ্ঞান জন্য সংস্কার। অবিদ্যাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। ব্রহ্ম স্বভাবত শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপ; সুতরাং সৃষ্ট্যাদি ব্রহ্ম হইতে সম্ভবপর নহে।

আমরা আপাতত জীব ও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকি। সকল মনুষ্যই আপন আপন অস্তিত্বের সম্বন্ধে বিশ্বাসবান্। এখন প্রশ্ন হইতে পারে অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করে। বৈদান্তিকদিগের মধ্যে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। বিবরণাচার্য, সংক্ষেপ-শারীরককার প্রভৃতি বৈদান্তিকেরা জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

তাঁহাদের বিবেচনায় ব্রহ্ম যেমন অবিদ্যার আশ্রয়, তেমনই আবার অবিদ্যার বিষয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, জীব বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই। অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিলে ব্রহ্মই জীবভাবাপন্ন হন, এবং তিনি স্বয়ং সেই জীব-ভাবাপন্ন নিজের বিষয় রূপে পরিণত হন। রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ তাঁহার সেই অবস্থায় আপনাতেই জগদ্‌ভ্রম হয়। শ্রুতির মন্ত্রও আছে—'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। ইহার তাৎপর্য—জীবই ব্রহ্ম। আবার শ্রুতিতে ইহাও আছে যে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ইহার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। যদি জীব ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ না থাকে, আর যদি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই না থাকে, তাহা হইলে জীবভাবও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এই মিথ্যাভাব প্রতীয়মান হইবার কারণ যথার্থ জ্ঞানের অভাব। যথার্থ জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান, মায়া ও অবিদ্যা নামে অভিহিত। যখন অবিদ্যা চলিয়া যায়, তখন জীবত্ব ও জগদ্‌ভাব তিরোহিত হয়। তখন ব্রহ্ম একাকীই অবস্থান করেন।

বাচস্পতি-মতে জীবই অবিদ্যার আশ্রয়, এবং ব্রহ্ম অবিদ্যার বিষয়। অবিদ্যা জীবকে আশ্রয় করিলে, রজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ, জীবের ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হইয়া থাকে। বিবরণাচার্য প্রভৃতির মত, ব্রহ্মের জীবভাব যে অজ্ঞান নিবন্ধন ইহা শ্রুতিপ্রতিপাদ্য। সুতরাং জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা যাইতে পারে না। অজ্ঞান জীবের পূর্বে বিদ্যমান্ না থাকিলে অজ্ঞাননিবন্ধন জীবভাব হইতে পারে না।

তাঁহারা বলেন শ্রুতির মতে, অজ্ঞানই জীবত্বের প্রয়োজক। এরূপ স্থলে অজ্ঞানের সত্তা যে জীবের পূর্বে আবশ্যক ইহা মানিতেই হইবে।

কিন্তু বাচস্পতি মতাবলম্বীরা বলেন, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অনাদি। তাঁহারা এ সম্বন্ধে বৃদ্ধোক্তকারিকার বচনও উদ্ধৃত করেন, —'জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশয়োর্ভিদা। অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ'। অর্থাৎ জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধ চৈতন্য, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, অবিদ্যা এবং অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ, এই ছয়টি (বেদান্তিগণের মতে) অনাদি। উল্লিখিত বৃদ্ধোক্ত-কারিকা, বিবরণাচার্য প্রভৃতি স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং বলিতে হইবে, ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ যেমন অনাদি, জীবের সম্বন্ধও সেইরূপ অনাদি, এবং ইহা বিবরণাচার্য প্রভৃতির মত।

অজ্ঞান নিবন্ধনই যে জীবভাব, এমন কিছু নহে। জীবভাব অনাদি কালাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং অবিদ্যার যে ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিতে হইবে, এমন কথা নহে। সকলেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে একথা সত্য, কিন্তু ব্রহ্ম সকলেতেই অনাসক্ত। গীতা যে শ্রুতি-প্রতিপাদক শাস্ত্র, তাহা সকলেই জানেন। গীতা ব্রহ্মকে এইভাবে বুঝিয়াছে 'অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভক্তৃ চ'। ব্রহ্ম সকলেরই পোষণকর্তা, গুণেরও তিনি পোষক, কিন্তু তিনি স্বয়ং অনাসক্ত। এরূপ স্থলে জীবই যে অজ্ঞান বা অবিদ্যার আশ্রয়, একথা বলা অসঙ্গত নহে।

যদি বলা যায়, অজ্ঞানের আশ্রয় জীব, এবং ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয়রূপে জগদ্রূপে পরিণত, তাহা হইলে বলিতে হয়, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। শুক্তি স্বরূপত রজত নহে, কিন্তু রজত রূপে প্রতীত হইতে পারে। সেইরূপ স্থলে রজতকে যেমন শুক্তির বিবর্ত বলা যাইতে পারে, ব্রহ্ম জগদ্রূপে প্রতীত হয় বলিয়া জগৎকেও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মের স্বরূপ বোধ না হইয়া, বস্তুর সম্বন্ধে অন্য যাহা বোধ হয়, তাহাই

বস্তুর বিবর্ত। শাস্ত্রেও তাহাই বলে। যথা 'অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ'।

জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত বটে, কিন্তু জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে। বিকার ও বিবর্ত এক নহে। বস্তুর স্বরূপান্তর প্রাপ্তির নামই বিকার। শাস্ত্রও তাহাই বলে: 'সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ'। দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হইলে দধিকে দুগ্ধের বিকার বলা যাইতে পারে। জগৎকে ব্রহ্মের বিকার না বলিয়া যদি বিবর্ত বলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের কোনরূপ বিকার বা পরিবর্তন হয় না বুঝিতে হইবে। শুক্তি যেমন রজতরূপে প্রতীয়মান হইলে শুক্তির রূপান্তর ঘটে না, সেইরূপ অবিদ্যাপ্রভাবে ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপান্তর ঘটে না। ব্রহ্ম যেমন তেমনিই থাকেন, কেবল একটি মিথ্যা অধ্যাস হয় মাত্র। ব্রহ্ম স্বরূপত অপরিণামী। শাস্ত্রেও তাহা উক্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রে ব্রহ্মকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা নহেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তৃত্ব ব্রহ্মের একটি লক্ষণ বটে। কিন্তু তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ নহে। শাস্ত্রে ব্রহ্মের দুইটি লক্ষণ কথিত রহিয়াছে। একটি তাঁহার স্বরূপলক্ষণ, অপরটি তটস্থলক্ষণ। স্বরূপত ব্রহ্ম অপরিণামী, সুতরাং কোন কিছুর কারণ নহেন।

সৃষ্ট্যাদির কারণ ব্রহ্ম নহেন; সুতরাং সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ। বেদান্ত-পরিভাষায় তটস্থলক্ষণ এইরূপে কথিত হইয়াছে: "তটস্থলক্ষণং নাম যাবল্লক্ষ্যকালম্ অনবস্থিতত্বে সতি যদ্ ব্যাবর্তকং তদেব, যথা গন্ধবত্ত্বং পৃথিবীলক্ষণম্। মহাপ্রলয়ে পরমাণুষু উৎপত্তিকালে ঘটাদিষুচ গন্ধাভাবাৎ।" অর্থাৎ যাহাকে লক্ষণের দ্বারা বুঝা যায়, তাহাই লক্ষ্য। সুতরাং বস্তুই লক্ষ্য। বস্তুকে যাহা দ্বারা বুঝা যায়, তাহাই লক্ষণ। বস্তু মাত্রই কোন না কোন লক্ষণাক্রান্ত। বস্তুত লক্ষণ দেখিয়াই আমরা বস্তুকে

বুঝিয়া থাকি। যেখানে পৃথিবী লক্ষ্য সেখানে গন্ধই তাহার লক্ষণ। জলাদি হইতে পৃথিবী ভিন্ন, ইহা আমরা পৃথিবীর গন্ধবত্ব লক্ষণ দ্বারাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু যাবৎকাল পৃথিবী থাকে, পৃথিবীর গন্ধবত্ব তাবৎকাল থাকে না। উৎপত্তিকালে ঘটাদিতেও গন্ধ থাকে না, মহাপ্রলয়ে পরমাণুসমূহেও গন্ধ থাকে না। সুতরাং গন্ধবত্ব লক্ষণ পৃথিবীর স্বরূপলক্ষণ নহে, ইহা পৃথিবীর তটস্থলক্ষণ। যাবৎকাল স্থিতি, তাবৎকাল যে লক্ষণ থাকে না, সে লক্ষণকে স্বরূপলক্ষণ বলা যাইতে পারে না। তাহা বস্তুর তটস্থলক্ষণ। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তৃত্ব ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ নহে, কারণ তাঁহাতে সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব স্বরূপত নাই—যেহেতু তিনি কোন বস্তুর কারণ নহেন।

অধ্যাস-বিশ্লেষণ

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে তিনি কবে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন,তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক ; কারণ,কাহারও কোন মত বিষয়ে কিছু বুঝিতে হইলে তাঁহার পূর্বের ও তাঁহার সময়ের সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি ভাল করিয়া অবগত হওয়া চাই। কিন্তু তাহা আমি এ প্রস্তাবে আলোচনা করিব না তবে তিনি কিভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা জানিবার চেষ্টা করিব। এখানে শঙ্করের যাহা শঙ্করত্ব, তাঁহার ধর্মমত, তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাজ্ঞান কিছু আভাষদিবার প্রয়াস পাইব। পঞ্চদশী, উপদেশসহস্রী, অদ্বৈতসিদ্ধি স্বারাজ্যসিদ্ধি, বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা, চিৎসুখী এবং শঙ্করের ও তাঁহার মতাবলম্বী শিষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রধানত অবলম্বন করিয়াই শঙ্করদর্শনের আলোচনার সূচনা করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ শঙ্করের পরবর্তী কালের এতই ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দে পরিপূর্ণ যে, সেগুলি

দিয়া শঙ্করের মৌলিক ভাবের পরিচয় পাওয়া সাধারণের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থ এবং বেদান্ত-সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থাবলীর ভিত্তি ব্রহ্মসূত্রে, ভগবদ্গীতা ও উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কোন দার্শনিক বিশেষ ধর্মমতের প্রবর্তক হইবেন, তাঁহাকেই ভিত্তিস্থানীয় এই গ্রন্থগুলির উপর ভাষ্য লিখিতে হইবে। সেই গুলিকে দর্শনের সহিত এইরূপভাবে সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে যাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধমত আসিয়া না পড়ে। শঙ্কর, বল্লভ, রামানুজ, মধ্ব এবং প্রায় সকল ধর্মপ্রচারকই এইরূপ করিয়াছেন। যেমন সংস্কৃতের স্থান প্রাকৃত অধিকার করিলেও, সংস্কৃতের ভাব পরিবর্তিত হয় নাই, সেইরূপ কতকগুলি ধর্ম ব্যাখ্যাতা এই সমস্ত গুরু উপদেশকদিগের স্থান অধিকার করিয়া নূতন নামে পুরাতন ধর্মই উপদেশ করিয়াছিলেন।

এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, যদি শঙ্করকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে হয় তাহা হইলে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য সাহায্যেই বুঝিতে হইবে এবং একথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রধানত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যকেই অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান নামে অভিহিত। ইহাকে বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি, পুরাণাদির মীমাংসা পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ সাহিত্যভাণ্ডারের সহিত সূত্রগুলির কি সম্বন্ধ ইহা প্রথমে না বুঝিয়া আমাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। প্রকৃত ভারতীয় সমাজ বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহা যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বেদপদবাচ্য। বেদের প্রকৃতি পূজা, অনুসন্ধিৎসু-মানবমনের অভাবমোচন-বিষয়ে যথেষ্ট নয়। এমন কি বৈদিকযুগে পুরুষসূক্তের ন্যায় মন্ত্রগুলি সত্যরূপ প্রত্যূষের শুভাগমন ঘোষিত করিতেছে। সত্য যেন স্ফুটনোন্মুখ হয়ে কোলাহল করিতেছে এই সময়ে যে ভাব উদ্বুদ্ধ হইল তাহা বেদের অন্তে উপনিষদে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহা ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধভাবে ইহাতে সম্প্রবিষ্ট

হইয়াছে। বেদ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণসমূহ আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে জগৎসৃষ্টির বহির্ভূত জগদাত্মার জন্য ব্যাকুলতা নিয়মিত পূজা-পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে।

তারপর এমন একটি যুগ আসিল যখন আয়াস স্বীকার করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া কেহ কিছু করিতে চাহিত না। এই সহজ প্রণালীর যুগে আবশ্যক বস্তু যোগাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণসমূহে তখন আর চলিল না—লোকে হাতে তোলা নজিরের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া একেবারে তৈয়ারী "সূত্রের" সন্ধান পাইল। ঠিক এই সময়ে উপনিষৎসমূহও তুল্যরূপ সাহায্য পাইয়াছিল। এতদিনে জ্ঞানিগণ জীবনসমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত হইয়া ক্রমশ দর্শনসমূহ গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে মীমাংসাই শ্রেষ্ঠ। কর্মকাণ্ড যে মীমাংসার আলোচ্য তাহার নাম 'পূর্বমীমাংসা', সমস্ত জ্ঞানের চরম লক্ষ্য যে মীমাংসার আলোচ্য বিষয় তাহা 'উত্তর-মীমাংসা' নামে অভিহিত। এই উভয় মীমাংসায় জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে। স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, উপনিষৎসমূহই ভারতীয় চিন্তাক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। আমাদের দেশে ধর্ম বলিলে শুধু পরমার্থতত্ত্ব বুঝায় না—দর্শন এবং নীতিও তাহার আলোচনার বিষয়ীভূত। সাধারণ লোকের অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন মনের অন্তস্তম প্রদেশে আলোর জ্যোতিঃ সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়াই তাহাদের জন্য স্মৃতি ও পুরাণরূপ স্বচ্ছ নয়নমণির আবশ্যক হইয়াছিল।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের দার্শনিক মত কি ছিল তাহা স্থির করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাঁহার রচিত গ্রন্থনিচয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। ন্যূনাধিক ২৯০খানা গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও উপনিষদ্-ভাষ্যকার জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য-বিরচিত বলিয়া জনসাধারণের সংস্কার। সকল-গুলিই যে তাঁহার রচিত নয়, তাহা অনেক গ্রন্থের ভাষা, শব্দবিন্যাস ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিয়া অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকে।

সনাতন হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা শঙ্করের নাম দিয়া স্বরচিত গ্রন্থের বা কবিতার খ্যাতিবিস্তারের অভিপ্রায়ে কোন কোন দার্শনিক ও কবি শঙ্করাচার্যের নামে স্ব স্ব গ্রন্থ চালাইয়া যাইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? ইহা ব্যতীত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের মঠাধিকারী মহান্তগণও শঙ্করাচার্য উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলিও শঙ্করাচার্যের গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এতদ্ভিন্ন শঙ্করনামা কয়েক জন আচার্য, নৃপতি ও পণ্ডিত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আমরা একাধিক শঙ্করাচার্যের রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ পাইয়াছি। কয়েকখানি উপনিষদ্ভাষ্য, গীতা ও বেদান্তভাষ্য, সনৎসুজাতীয় ভাষ্য, সহস্রনামাধ্যায় ও কেবলাদ্বৈত-বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থই জগদ্‌গুরু রচনা করেন নাই বলিয়া মাধবাচার্য উল্লেখ করিয়াছেন। নৃসিংহতাপনী উপনিষদ্‌ভাষ্যও সম্ভবত তাঁহার রচিত নয়, কেন না, তাঁহার বহু পরের বার্ত্তিকগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনেক বাক্য ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করানন্দনামক এক ব্যক্তি কৌষিতকী প্রভৃতি কতকগুলি ছোট ছোট উপনিষদের উপর ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। ইহার ভাষ্যের রচনাপদ্ধতি প্রভৃতির সহিত নৃসিংহতাপনী উপনিষদ্‌ভাষ্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। শঙ্করানন্দ ইহার লেখক হইলেও হইতে পারেন। উপদেশসহস্রী ও দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক শঙ্করের রচিত বলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস; কিন্তু এগুলিও শঙ্করের মতের প্রতিকূল বলিয়া তাঁহার রচনা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। অপরোক্ষানুভূতি, আত্মানাত্মবিবেক, বিবেকচূড়ামণি এবং আত্মবোধ প্রভৃতি কখনও জগদ্‌গুরুর লিখিত নয়। কেন না গীতা, ব্রহ্মসূত্র, ও উপনিষদ্‌ভাষ্যনিবদ্ধ শঙ্করের দার্শনিক মতের সহিত এগুলির ঐক্য নাই, শঙ্করের নামে প্রচলিত উপনিষদ্ভাষ্য ও বেদান্তগ্রন্থের মধ্যে কতকগুলিকে তাঁহার রচিত বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়।

স্বরচিত ভাষ্যেই জগদ্‌গুরুর মত সম্পূর্ণ দ্যোতিত হইয়াছে। গীতা, উপনিষদ্ বা বেদান্তভাষ্যের মধ্যে কোন একখানির আলোচনা

করিলে তাঁহার মত প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। বেদান্তশাস্ত্র ৫৫৬টি সূত্রে গ্রথিত। পরমারাধ্য ভগবান্ বাদরায়ণাচার্য ঋষি ইহার কর্তা। জগদ্‌গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য তাঁহার ভাষ্যে মহাভারত-কারকে বুঝাইতে সর্বত্র ব্যাসের নাম করিয়াছেন; কিন্তু বেদান্ত-প্রসঙ্গে কেবল বাদরায়ণ নাম ভিন্ন কোথাও ব্যাসের উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবত ব্যাস ও বাদরায়ণ একই ব্যক্তি। "বৈয়াসকী ব্রহ্ম-মীমাংসা" এই প্রসিদ্ধ উক্তি হইতে ব্যাস বেদান্তকর্তা বলিয়া সূচিত হইতেছে। বেদান্তদর্শনের সূত্রগুলি অতি কূটার্থময়, ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীত বোধগম্য হয় না।

শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র রচয়িতার নাম লইয়া অনেক গোলমাল। ব্যাসের রচিত বলিয়া এতগুলি গ্রন্থ আছে যে, কোন্ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রকার তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। ভাগবতে বেদব্যাস নামে পরিচিত ব্যাসই যদি ব্রহ্মসূত্রকার হন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই পরাশরপুত্র বাদরায়ণ। ব্রহ্মসূত্রে অন্তত সাতবার বাদরায়ণের নাম উল্লিখিত আছে। ভাষ্যকার তাঁহার ভাষ্যে ব্যাস বা বেদব্যাসের নামে কয়েকটি মতের অবতারণা করিয়াছেন। 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন' নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভাষ্যকার সর্বদা আচার্য বলিয়াই দর্শনকারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত উল্লেখের দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, সূত্রকার ব্যাস ভাগবতের বাদরায়ণ ব্যতীত অন্য কেহ নন। সূত্রকার যে নিজেই নিজের নাম সূত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত বা সন্দিগ্ধ হইবার কোনও কারণ নাই। অনেকের মতের সহিত যেখানে ঋষিগণের মতের অনৈক্য সেইখানে অথবা যেখানে তাঁহাদের প্রিয় মত প্রচার করিবার দরকার সেইখানে তাঁহারা নিজ নাম দিয়া থাকেন। ইহাই প্রাচীন প্রথা। আপস্তম্ভগৃহ্যসূত্রে এইরূপ কতকগুলি ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্কর যে সূত্রকারকে আচার্য অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই, কেন না

তিনি অন্তত দুইটি স্থানে বলিয়াছেন যে আচার্য বাদরায়ণ ব্যতীত আর কেহই নন। সূত্রকার যে বাদরায়ণ ব্যতীত অন্য কেহ নন, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। কোন কোন পণ্ডিত ইহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা আছে বলিয়া বোধ হয় না। বর্তমানকালে শঙ্করাচার্যের ভাষ্যই এই দর্শনের প্রাচীনতম ভাষ্য বলিয়া প্রখ্যাত। ইহার ভাষ্য সর্বত্র সূত্রানুযায়ী।

শঙ্কর তাঁহার উক্তি দৃঢ়তর করিবার জন্য অনেক সময় নানা শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'ইতি শ্রূয়তে, বা স্মর্যতে'; শাস্ত্রের নাম বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার উক্তির প্রামাণ্যস্বরূপ তিনি কোন্ শাস্ত্রকে অবলম্বন করিতেন, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার উদ্ধৃত বচনাবলী একত্র করিলে বুঝা যাইবে, তিনি কোন্ শাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। অধিকন্তু, এই বচনগুলির সাহায্যে সহজেই তাঁহার লিখিত গ্রন্থ-নিচয়ও নির্বাচিত হইতে পারিবে। শঙ্করাচার্য এই ভাষ্যে পুনরুক্তি সমেত ২,৫২৩টি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; তন্মধ্যে ২,০৬০টি ঔপনিষদিক বচন, ১৫০টি বৈদিক এবং ৩১৩টি বেদেতর গ্রন্থোদ্ধৃত বচন। শঙ্করাচার্য মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রীয় বচনের অধুনা প্রচলিত বচন হইতে বিভিন্ন পাঠও দিয়াছেন। পাঠের একটু ইতরবিশেষ করিলে বচনগুলি একাধিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে ঐ শাস্ত্রীয় বচন যে কোন্ গ্রন্থের, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

শঙ্কর লিখিতেছেন—"যদ্বৈ কিঞ্চ মনুবরদৎ, তদ্‌ভেষজম্" (তৈত্তি-রীয়-সংহিতা ২.২.১০.২), অথচ কাঠকে আছে—"মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চ অবদৎ, তদ্‌ভিষজমাসীৎ।" মৈত্রেয়ানী-সংহিতায় আছে—"আপো বৈ শ্রদ্ধঃ।" অথচ শঙ্কর দিতেছেন—"শ্রদ্ধা বা আপঃ (তৈত্তিরীয়-সংহিতা ১.৬.৮.১)। শতপথ-ব্রাহ্মণ—"তরতি সর্বম্ পাপ্‌মানম্।" (১৩.৩.১.১)। শঙ্কর—"সর্বম্ পাপ্‌মানম্ তরতি।" (তৈ-স°

৫.৩.১২.১) ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ—"সপ্ত বৈ শীর্ষং প্রাণাঃ।" (৩.৩.১) বা পঞ্চব্রাহ্মণ—"সপ্ত শিরসি প্রাণাঃ।" (২২.৪.৩), শঙ্কর—"সপ্ত বৈ শির্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ দ্বাববাঞ্চান্।" (তৈ-সং ৫.৩.২.৫) ইত্যাদি।

এইরূপ বিভিন্ন পাঠের বচনগুলির আকরস্থান বিভিন্ন শাখা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। শঙ্কর মাঝে মাঝে অন্যান্য শাখা হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ স্থলেই তৈত্তিরীয় শাখা হইতেই বচন দিয়াছেন।

বেদান্তসূত্রভাষ্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই শ্রীশঙ্করাচার্য এক "অধ্যাসভাষ্য" লিখিয়া অদ্বৈতমতের মূল ভিত্তি কি তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ভাষ্যে তিনি বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয় গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্‌বিরূদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মাৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য তদ্ধর্মাণাং চাধ্যাসঃ।"

আমরা যখন 'আমার দেহ', 'আমার মন', 'আমার হস্ত', প্রভৃতি বাক্যের ব্যবহার করি, তখন আমাদের দেহ, মন ও হস্ত প্রভৃতির অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র 'আমি' পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কেন না, যদি 'আমি' এবং দেহ, মন এক পদার্থ হইত, তাহা হইলে মনদেহাদির সহিত সম্বন্ধসূচক 'আমার' পদ ব্যবহৃত হইতে পারিত না। এই 'আমি'ই দর্শনশাস্ত্রের 'চিদাত্মা' এবং দেহ, মন ইত্যাদি 'আমি' ভিন্ন অনাত্ম পদার্থ। শাস্ত্রকারকগণ ইহাদিগকে 'উপাধি' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই আমি বা আত্মা 'বিষয়ী' বা 'অস্মৎপ্রত্যয়বাচ্য' এবং তদতিরিক্ত যাহা কিছু সমস্তই 'বিষয়' বা 'যুষ্মৎপ্রত্যয়বাচ্য'। তম ও প্রকাশ যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, সেইরূপ অস্মৎপ্রত্যয়বাচ্য বিষয়ী ও যুষ্মৎপ্রত্যয়বাচ্য বিষয়ও পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যেমন যাহা অন্ধকার

তাহা আলোক নয়, সেইরূপ যাহা বিষয়ী তাহা বিষয় নয়। আর যদি স্বীকার করা যায়, বিষয়ীর ভাব বিষয়ের ভাবের বিরোধী, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিষয়ীর ধর্মও বিষয়ে বিদ্যমান নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চিদাত্মক অস্মদাখ্য বিষয়ীতে যুষ্মদাখ্য বিষয়ের অধ্যাস বা আরোপ করা অথবা বিষয়কে বিষয়ী বোধ করা রূপ ভ্রম হওয়া যুক্তিমত সম্ভব না হইলেও, লোকব্যবহারে "মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত" সচরাচর সত্য যে বিষয়ী তাহার সহিত মিথ্যা যে বিষয় তাহার মিথুনীকরণ হইয়া থাকে ; ইহা 'নৈসর্গিক'। কাজেই বিষয় ও বিষয়ী 'অত্যন্ত-বিবিক্ত' হইলেও বিষয় ও বিষয়ীকে পৃথক্ না করিয়া লোকব্যবহারে একের ভাব ও ধর্ম অন্যে সহজে আরোপিত হইয়াই থাকে। সেই জন্যই আমরা 'অহমিদং', 'মমেদং'—'এই আমি', 'ইহা আমার' এইরূপ বলিয়া থাকি। কখন কখন শুক্তিকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, কখন বা দৃষ্টিদোষে একমাত্র চন্দ্রকে দুইটি চন্দ্র দেখা যায়—এইরূপ একবস্তুতে অন্যবস্তুর আরোপ হইয়া থাকে। এই আরোপের নাম অধ্যাস। বস্তুনিচয়ের এই ভ্রান্তিমান আরোপ এবং চিদাত্মার সহিত বাহ্যজগতের সম্বন্ধ অসম্ভব নয় ; কেন না, আত্মাও এক হিসাবে বিষয় অর্থাৎ অস্মৎপদবাচ্য বিষয়। এইস্থানে শঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন যে, আত্মা অপরোক্ষ বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত বিষয় নয়। তিনি নিজ ভাষ্যে ইহা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশদ করিয়াছেন।

প্রশ্ন—অবিষয় যে প্রত্যগাত্মা তাহাতে বিষয়ধর্মের কিরূপে অধ্যাস হইতে পারে? সকলেই যখন পুরোঽবস্থিত বিষয়েই বিষয়ান্তর অধ্যসিত করিয়া থাকে, তখন আপনি যে প্রত্যগাত্মার কথা বলিতেছেন, তাহা যুষ্মৎ প্রত্যয়বাচ্য হইতে বিচ্ছিন্ন এবং তাহা অবিষয়।

উত্তর—ইহা নিতান্ত অবিষয়ও নয়। কেন না, ইহা অস্মৎপ্রত্যয় বিষয়। ভাল করিয়া বুঝিলে দেখিবে, ইহা 'সাক্ষী' নয়, ইহা কেবল 'কর্তা'; অর্থাৎ ব্যক্তিগত আত্মা বিষয়ধর্মাক্রান্ত হইয়া অহংপ্রত্যয়-

বিষয় হইয়াছে। প্রত্যগাত্মা যে অপরোক্ষ নয়, ইহা দ্বারাই প্রত্যগাত্মার সম্যক্ অর্থ প্রতিভাত হইতেছে। আর যে বিষয়ে বিষয়ান্তর আরোপিত হইবে,তাহা যে আমাদের পুরোভাগে থাকিবেই, এরূপও নয়; যেমন মূর্খলোকেরা আকাশে পৃথিবীর বর্ণ আরোপ করিয়া থাকে। এই প্রকারেই আত্মায় অনাত্মার এবং অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস হইয়া থাকে।

আমরা এই অধ্যাসবশত নানারূপ দুঃখভোগ করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা এই অধ্যাসকে অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। যতদিন অবিদ্যা-পাশ ছিন্ন না হয় ততদিন দুঃখের শেষ হয় না। মানুষ অবিদ্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে "মুক্তি" পাইয়া থাকে। অবিদ্যাই যত অনর্থের মূল। বিচার ও শাস্ত্র প্রদর্শিত উপায় দ্বারা অবিদ্যার বারণের জন্যই বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি। ইহাই শঙ্করদর্শনের মূলভিত্তি। ইহাই অবলম্বন করিয়া শঙ্কর নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন। এই অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে শঙ্করের মত স্থাপিত হইতে পারে না।

শঙ্করের অধ্যাসভাষ্য অতি কঠিন। কিন্তু অধ্যাস না বুঝিলে তাহার ভাষ্য বুঝা যায় না। আমরা দিগ্দর্শন হিসাবে অধ্যাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অধ্যাসের অর্থ মিথ্যা আরোপ, জড়ের ধর্ম চৈতন্যের উপর ও চৈতন্যের ধর্ম জড়ের উপর আরোপিত হইয়া ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হইয়া থাকে। জগৎ বলিয়া স্বতন্ত্র কিছুই নাই। ব্রহ্মই আছেন। ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হয়। এই ভ্রম জড়ের ধর্ম চৈতন্যের উপর ও চৈতন্যের ধর্ম জড়ের উপর অধ্যস্ত হইয়াই হয়। কিন্তু চৈতন্য ও জড় কোথা হইতে আসিল? চৈতন্য আত্মার ধর্ম। যাহা চেতনের বিপরীত, তাহাই জড়ত্ব। জড়ত্ব জড়ের ধর্ম। ধর্ম ও ধর্মী পৃথক্ পদার্থ নয়। আত্মাই ব্রহ্ম। ইহা শ্রুতিরই তাৎপর্য।

শ্রুতি বলেন, কেবলমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই, এবং আত্মাই ব্রহ্ম। শ্রুতি ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ, আনন্দের দ্বারা নির্দেশ

করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্ম সৎ, চৈতন্যময় ও ব্রহ্মে আনন্দ আছে। কিন্তু ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সৎ এবং চৈতন্য ও আনন্দময়। ব্রহ্মকে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে সৎ, চিৎ ও আনন্দের স্বরূপ বুঝিতে হইবে। সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাতেই জগদ্‌ভ্রম হইয়া থাকে। জগদ্‌ভ্রম অধ্যাসবশত হয়। অধ্যাসের কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা ও অজ্ঞান একার্থক। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইবার কারণ যেমন অজ্ঞান, তেমনই ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হইবার কারণও অজ্ঞান। অজ্ঞান কেমন করিয়া হয়, আমরা বলিতে পারি না, অজ্ঞানবশতই যে ভ্রম হয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

দর্শনশাস্ত্র সকলের মূলে কারণ অনুসন্ধান করে। কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে সর্বকারণের কারণটি অনুসন্ধান করিবার দিকেই দর্শনের প্রবৃত্তি। আমরা যতক্ষণ না সর্বকারণের কারণটি পাই, ততক্ষণ আমাদের সংশয় থাকে। আমাদের অনুভূতি বা জ্ঞানে যাহা আসে, দার্শনিক তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। দার্শনিক তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে যতক্ষণ না সর্বকারণের কারণ পর্যন্ত উপনীত হন, ততক্ষণ কিছুতেই সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। একমাত্র কারণই সৎ, কার্য অসৎ। আমরা যদি বলি, অজ্ঞানই জগতের কারণ, আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন হয়, অজ্ঞানের কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর না পাইলে অজ্ঞানের স্বরূপ আমাদের বোধগম্য হইতে পারে না। কোন্ ভিত্তির উপর অজ্ঞান দাঁড়াইয়া আছে, তাহা আমরা বুঝিতে না পারিলে, 'অজ্ঞান যে জগতের কারণ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। রজ্জুতে আমাদের সর্পভ্রম হয়, তাহা যে অজ্ঞানবশত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। সর্প আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, রজ্জু আকৃতিতে সর্পসদৃশ। সর্পে আমাদের আশঙ্কার কারণ আছে। অন্ধকারে রজ্জুর অপরাপর বিশেষত্ব প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কেবল ইহার সর্পসদৃশ ভাবটি

যখন আমাদের বোধগত হয়, তখন পূর্ব সংস্কারবশত মনোমধ্যে ভীতির উদয় হয়, ও সেই ভীতিজনিত মোহবশত আমাদের রজ্জুতেই সর্পভ্রম হইতে পারে। এই প্রকার যত ভ্রম, তন্মূলে এই ভাবের বিশিষ্ট কারণ থাকে। ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রমের মূলে এই ভাবের বিশিষ্ট কারণ আছে কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। যদি এই ভাবের কারণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে, জগদ্‌ভ্রম অজ্ঞান-বশত হইয়া থাকে। যদি স্বীকার করা যায় যে, ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রমের মূলে এই ভাবের বিশিষ্ট কারণ আছে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ব্রহ্ম ছাড়া এমন কোন কিছু আছে, যাহা জগৎসদৃশ ও যাহার ব্রহ্মের সহিতও সাদৃশ্য আছে। আত্মার ব্রহ্ম সম্বন্ধে ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞান আছে, আমরা ভ্রমবশত ব্রহ্মের উপর সেই বস্তুর ধর্মের অধ্যাস করিয়া থাকি। তাহা হইলে জগৎ ও ব্রহ্ম উভয়ই সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মও আছে, জগৎও আছে এবং ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়েরই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে ; ভ্রমবশত আমরা ব্রহ্মকেই জগৎ মনে করিতেছি। কিন্তু ব্রহ্ম ও জগৎ এক নহে, আমাদের ভ্রমবশত ব্রহ্মের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সুতরাং জগদাকারে আমরা ব্রহ্মকেই দেখিতেছি। ভ্রম বিদূরিত হইলে ও তৎফলে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ পাইলে, আমরা স্বরূপত ব্রহ্মকে দেখিব, এবং ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম আর সম্ভব হইবে না। কিন্তু শঙ্করের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের এইরূপ তাৎপর্য নহে, শঙ্করও স্বয়ং একথা স্বীকার করেন না, স্বয়ং শঙ্করাচার্যের অভিপ্রায় এই যে, জগৎ বা জগদাকারের কিছুই নাই। আছেন কেবল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া অপর কোন আত্মারও অস্তিত্ব নাই। শঙ্করাচার্যের মতটিই এখন আলোচ্য।

ব্রহ্মের সত্তা স্বীকার করা হইয়াছে, জগতের সত্তা স্বীকার করা হয় নাই। অহং-জ্ঞানজ্ঞেয় আত্মারও পারমার্থিক সত্তা অস্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এই শ্রুতিবাক্যের সহিত কাহারও বিরোধ নাই। ব্রহ্ম সৎ, কেন না, ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন। তিনি

চৈতন্যস্বরূপ, কারণ, একমাত্র চৈতন্যরই সত্তা আছে। আনন্দের সহিত চৈতন্যের নিত্য সম্বন্ধ। আনন্দ বাদ দিলে চেতন-সত্তার কিছুই থাকে না। ইহা সর্ববাদিসম্মত, অর্থাৎ সকল বৈদান্তিকই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা সর্ববাদিসম্মত, তৎসম্বন্ধে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু জগৎ বা অবিদ্যা আসিল কোথা হইতে? যাহার বিদ্যমানতা আছে, তাহা সৎ, যাহার বিদ্যমানতা নাই, তাহা অসৎ। সৎএর আর একটি বিশেষণ এই যে, তাহার কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। একমাত্র ব্রহ্মই অপরিণামী, সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মই সৎ। জগৎ পরিণামী, সুতরাং জগৎ সৎ নহে। জগতের অস্তিত্ব প্রতীয়মান, বস্তুত জগতের অস্তিত্ব নাই, সেই হিসাবে জগৎ অসৎ। কিন্তু জগৎ প্রতীয়মান হইবার পক্ষে কারণস্বরূপ অবিদ্যা, সুতরাং অবিদ্যা অসৎ নহে। কিন্তু অবিদ্যা নিত্যপরিণামী এবং বিদ্যার আবির্ভাবে, অবিদ্যা অদৃশ্য হয়, সুতরাং অবিদ্যা সৎ নহে। যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে, তাহা অনির্বাচ্য। অতএব অবিদ্যা অনির্বাচ্য। অবিদ্যাকে মায়াও বলা হয়। এই মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মেরই অংশবিশেষ। অবিদ্যার ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। বিদ্যা ও অবিদ্যা ব্রহ্মেরই অংশভূত। আলোকের সহিত অন্ধকারের যে সম্বন্ধ, বিদ্যার সহিত অবিদ্যারও সেই সম্বন্ধ। যেমন অন্ধকারের বিনাশে আলোকের উদয় ও আলোকের বিনাশে অন্ধকারের উদয় হয়, তদ্রূপ অবিদ্যার তিরোধানে বিদ্যার আবির্ভাব ও বিদ্যার তিরোধানে অবিদ্যার আবির্ভাব হয়। বিদ্যার আবির্ভাবে তত্ত্বের প্রকাশ হয় ও অবিদ্যার আবির্ভাবে মিথ্যাভূত জগতের প্রকাশ হয়। যখন তত্ত্বের প্রকাশ হয়, তখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই সত্তা উপলব্ধি হয় না। সুতরাং তখন কোনরূপ ভেদজ্ঞান থাকে না। কিন্তু যখন মিথ্যাভূত জগতের প্রকাশ হয় অর্থাৎ যখন বিদ্যার তিরোধানে অবিদ্যা আত্মাকে আশ্রয় করে, তখনই অভেদাত্মক জ্ঞান বিষয় ও বিষয়িভেদে দুই ভাগে

বিভক্ত হয়। অর্থাৎ তখন আত্মা বিষয়িরূপে পরিণত হইয়া, বিষয়রূপ জগৎকে সম্মুখে অনুভব করে।

শ্রুতি 'বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ' বাক্য দ্বারা দুই প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞানের দ্বারা চেতন ও অবিজ্ঞানের দ্বারা জড় পদার্থ বুঝায়। বাস্তবিক জড় ও চেতন-ভেদে স্বতন্ত্রভাবে দ্বিবিধ পদার্থ নাই। আত্মারই জড়বুদ্ধি ও চৈতন্যবুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই দ্বিবিধ বুদ্ধি পারমার্থিক নহে। অবিদ্যা-প্রভাবে আত্মার পারমার্থিক জ্ঞান দ্বিখণ্ডিত হইয়া, দ্বিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। অবিদ্যা তিরোহিত হইলে জ্ঞানের দ্বিবিধ ভাব বিলুপ্ত হয়, অর্থাৎ ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়। জ্ঞানের একটি ধর্ম এই যে, ইহা আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে সংযোগ সাধন করে। কিন্তু আত্মায় ও অনাত্মায় আলোক অন্ধকার প্রভেদ। এই পরস্পর বিভিন্নধর্মী আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধ সূচনা, আপাতত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। শঙ্করাচার্য প্রথমে এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়া, পরিশেষে বলেন যে, আত্মা ও ও অনাত্মার সম্বন্ধ সূচনা পারমার্থিক ভাবে অসম্ভব বটে, কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে সম্ভব হইয়াছে। আত্মার ও অনাত্মার পারমার্থিক সম্বন্ধ না থাকিলেও, ব্যবহারিক ভাবে ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অনাদিসিদ্ধ। যাহা অনাদিসিদ্ধ, তাহার অন্তত ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

যদি একটির পারমার্থিক সত্তা ও আর একটির ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে? পারমার্থিক সত্তাই যথার্থ সত্তা, ব্যবহারিক সত্তার কোন যাথার্থ্য নাই। যাহার পারমার্থিক সত্তা আছে, ব্যবহারিক সত্তা তাহারই প্রয়োজনার্থ বুঝিতে হইবে। এছাড়া আমরা ব্যবহারিক সত্তার অন্য কোনরূপ সার্থকতা দেখি না।

কিন্তু যদি অনুমান করা যায় যে, পারমার্থিক সত্তার অজ্ঞান বা ভ্রমবশত ব্যবহারিক সত্তার সৃষ্টি হইয়াছে অর্থাৎ আত্মাকে অবিদ্যা

আশ্রয় করিয়া অনাত্মার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে আত্মার উপর পরিণাম দোষ অর্শে। কিন্তু শ্রুতি আত্মাকে অপরিণামী বলিয়াছেন। আত্মা যদি অপরিণামী হয়, তাহা হইলে আত্মা কেমন করিয়া অজ্ঞানের বশবর্তী হইতে পারে? বিশেষত অজ্ঞানের অপূর্ণকে আশ্রয় করাই সম্ভব, পূর্ণকে অজ্ঞান আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মা যে অপূর্ণ নহে, তাহার কারণ এই যে, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। অপূর্ণ কাহাকে বলে? যাহা অংশ, তাহাই পুর্ণ, অথবা যাহাকে আত্মরক্ষার জন্য অপর কিছুর উপর নির্ভর করিতে হয়,তাহাই অপূর্ণ। আত্মা কোন কিছুর অংশও নহে এবং তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য অপর কিছুর উপর নির্ভর করিতেও হয় না। সুতরাং আত্মাকে অজ্ঞান আশ্রয় করিতে পারে না। বিবরণাচার্য প্রভৃতি যে ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যদি অজ্ঞান বা অবিদ্যাই জগতের কারণ হয়, তাহা হইলে ভামতীকার যে জীবকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু জীব যদি অজ্ঞানের আশ্রয় হয়, তাহা হইলে জীবেরও পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শঙ্করাচার্য জীবের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না। তিনি বিবরণাচার্য প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মকে ও অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন না, আবার ভামতীকারের ন্যায় জীবকেও অজ্ঞানের আশ্রয় বলেন না। তিনি এসম্বন্ধে এক সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম বিষয়ও হইতে পারেন না, বিষয়ীও হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার মতে অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মা বিষয়। 'আমি' জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে বুঝা যায়, তাহাই অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মা এবং তাহা 'আমি'-জ্ঞানের বিষয়। এইরূপ কৌশল দ্বারা, ব্রহ্মকে বিষয়-বিষয়ীর ধর্ম হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইল এবং জীবের পারমার্থিক সত্তাও স্বীকার করা হইল না।

অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মা বিষয়। কাহার বিষয়? আমি জ্ঞানের

বিষয়। 'আমি'—জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? অবিদ্যা হইতে। ইহার তাৎপর্য এই যে, অহংজ্ঞানজ্ঞেয় আত্মা ব্রহ্মের বিষয় নহে। অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিতে পারে না, সুতরাং অবিদ্যাসম্ভূত যাহা, তাহা ব্রহ্মের বিষয় হইতে পারে না। 'অহংজ্ঞান' ব্রহ্মও নহে, ব্রহ্মসম্ভূতও নহে। অহংজ্ঞান অবিদ্যাসম্ভূত। অবিদ্যা বা মায়া ব্রহ্মের অংশ বটে, কিন্তু ব্রহ্ম তাহাতে লিপ্ত নহেন, অর্থাৎ তিনি অবিদ্যাতে আসক্তিশূন্য। গীতায়ও এইরূপ ভাবের কথা আছে। গীতায় আছে,—'অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।'

সাংখ্যের মতে অহঙ্কারের উদ্ভব প্রকৃতি হইতে। সেইরূপ বেদান্তের মতে অহংজ্ঞানের উদ্ভব অবিদ্যা হইতে। যেমন প্রকৃতি একাকী অহঙ্কারের সৃষ্টি করিতে পারে না, পুরুষের সংসর্গে অহঙ্কারের সৃষ্টি করে, সেইরূপ অবিদ্যা ব্রহ্মের সান্নিধ্যে 'অহংজ্ঞানের' সৃষ্টি করে। ব্রহ্ম তাহাতে কোনরূপ লিপ্ত বা আসক্ত থাকে না বা ব্রহ্মের স্বরূপের কোন ব্যতিক্রমও হয় না।

শঙ্করাচার্য তাঁহার অধ্যাস ভাষ্যে অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সকল দিক্ বজায় রাখিয়া, অপূর্ব কৌশল অবলম্বনপূর্বক, পূর্ণভাবে কেমন তাঁহার অদ্বৈতবাদটি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার এই ভাষ্য উত্তমরূপে না বুঝিলে তাঁহার অদ্বৈতবাদটি অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট বলিয়া বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা।

শঙ্করাচার্যের মতটি এক শ্রেণীর বৌদ্ধমতের সদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে। এক শ্রেণীর বৌদ্ধেরা অনাত্মবাদী। শঙ্করাচার্যও প্রকারান্তরে অনাত্মবাদী ইহা মনে হইতে পারে। অনাত্মবাদী বৌদ্ধদিগের মতে নির্বাণ সাধিত হইলে কিছুই থাকে না। মনে হইতে পারে, শঙ্করাচার্যের মতে নির্বাণ বা মুক্তিতে তাহাই হয়। বিবরণাচার্য প্রভৃতির মতে জীব ও ব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মই অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জীবাকারিত হন। অবিদ্যা তিরোহিত হইলেই ব্রহ্মের জীবভাব বিদূরিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম অজ্ঞানমুক্ত হন। অজ্ঞান-

মুক্ত হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভামতীকারের মতে জীবই অবিদ্যার আশ্রয়। অবিদ্যা অন্তর্হিত হইলে সে স্থলে জীবের নিকট ব্রহ্ম স্বস্বরূপে প্রতীত হন। ভামতীকার শাঙ্কর ভাষ্যেরই টীকাকার, সুতরাং তিনিও অদ্বৈতবাদী। জীবভাব যে ব্রহ্মেরই অংশ-বিশেষ, তাহা তাঁহার অভিপ্রায়। তবে জীব ব্রহ্মের অংশরূপে অনাদিকালাবধি অবস্থিত। যাহা অনাদি কালাবধি অবস্থিত, তাহার স্থিতি সুতরাং অনন্ত-কালব্যাপী। রামানুজাচার্যের মতে ঈশ্বর জীব হইতে পারেন না। জীবের মোক্ষ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে। ঈশ্বরের প্রতি দাস্যভাবে জীবের চরিতার্থতা। কিন্তু এইরূপ মনে হইতে পারে যে, শঙ্করাচার্যের মতে জীব ব্রহ্মও নহে, এবং জীবের পারমার্থিক অস্তিত্বও নাই। জীব অবিদ্যাসম্ভূত; সুতরাং জীবত্ব মিথ্যা বা অলীক। যাহা অবিদ্যা বা অজ্ঞানসম্ভূত এবং সুতরাং অলীক, তাহার জ্ঞানের উপর নির্ভর করা চলে না। ব্রহ্ম নির্বিকার ও অনাসক্ত, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জীব ভাবের কোনই সম্পর্ক নাই, সুতরাং জীব ব্রহ্মকে জানিতেও পারে না, এবং ব্রহ্মে জীবের চরিতার্থতাও হইতে পারে না। ইহা একপ্রকার শূন্যবাদ। জীবন ও সংসার যদি দুঃখেরই মূল হয়, তাহা হইলে এই মতের সার্থকতা থাকে। এই মতে নির্বাণ বা মুক্তি সাধিত হইলে সবই শূন্য হইয়া যায়। আমি যদি না থাকিলাম, ব্রহ্ম থাকিলেন, কি না থাকিলেন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমি থাকিলে তবে জগৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা মঙ্গলে আমার সার্থকতা হইতে পারে, নচেৎ এ সকল থাকিলে বা গেলে, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। যদি স্বীকার করা যায় যে, আমি পারমার্থিক ভাবে জীব নহি, যাদ স্বীকার করা যায় যে, আমি অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা অধ্যাস, তাহা হইলে প্রকারান্তরে শূন্যবাদই স্বীকার করা হয়। যাঁহারা শাঙ্কর ভাষ্যের এইরূপ অভিপ্রায় বুঝেন, তাঁহারা শঙ্করাচার্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া

অভিহিত করেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শঙ্করাচার্য ব্রহ্মকে মধ্যে রাখিয়া তাঁহার বৌদ্ধত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন।

কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিতে পারেন যে, তিনি বাস্তবিক প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ নহেন, তবে তিনি পূর্ণাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে গিয়া বিশেষ গোলযোগে পড়িয়া উক্ত কৌশলের অবতারণা করেন ও তাহাতে তাঁহাকে একটু গোঁজ দিতে বাধ্য হইতে হয়। তিনি কৌশল অবলম্বন করিয়াও সকল দিক্ বজায় রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য শূন্যবাদ প্রচার করা নহে, পূর্ণাদ্বৈতবাদ প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

বাস্তবিক পূর্ণাদ্বৈতবাদই যে সম্পূর্ণরূপ সমীচীন ও সঙ্গত, তাহা বিশিষ্ট দার্শনিকদিগের মত। আমরা পূর্ণাদ্বৈতবাদ ছাড়া অন্য কোনও মতকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বুঝাইতে পারি না। জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের পারমার্থিক ভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে পারি না। যদি বলা যায়, জীবসকল পরস্পর স্বতন্ত্র, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরস্পর স্বতন্ত্র জীবসকলের পরস্পর সম্বন্ধ সূচনা কেমন করিয়া হইতে পারে? অর্থাৎ পরস্পর স্বতন্ত্র জীবসকল পরস্পরের সম্বন্ধে আসে কেমন করিয়া? একজন আর একজনের সহিত আলাপ করিতে পারে, তাহার কথা শুনিতে পায়, তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে পারে কেমন করিয়া? কি এমন সংযোগসূত্র আছে, যাহা আমাদের সকলের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে? কোন সংযোগসূত্র ব্যতীত যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ সূচনা হইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণাতীত। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে বাধ্য হই যে, এমন কোন বস্তু নিশ্চয়ই আছে, যাহা সাধারণ তত্ত্বরূপে আমাদের সকলেরই মধ্যে অনুস্যূত আছে। কেবল জীবসকলই যে পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে আসে, তাহা নহে; এই পরিদৃশ্যমান জগৎও আমাদের সম্বন্ধে আসে, এবং আমরাও এই পরিদৃশ্যমান জগতের সম্বন্ধে আসি। বৃক্ষ লতা, পাহাড় পর্বত,

নদী সমুদ্র, সকলেরই সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ব্যোমমার্গে বিচরণশীল নক্ষত্র-পুঞ্জও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, আমরা তাহাদের গতি নির্ধারণেও সমর্থ হই, সমুদ্রপথে অর্ণবযানে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের সাহায্যে দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারি। সুতরাং নক্ষত্রাবলীর সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধ সূচনাকার্যে আমরা কোন্ সূত্রের সাহায্য পাই। আমরা কি অনুমান করিতে বাধ্য হই না এমন কোন সাধারণ সূত্র সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অনুস্যূত আছে, যাহা এই বিশ্বের প্রত্যেক অংশের সহিত অপর অংশের সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে? যদি এমন কোন সাধারণ সূত্র থাকে, তবে তাহার বিশ্বের কোন অংশের সহিত পার্থক্য থাকিতে পারে না। কারণ, সকল অংশেরই সহিত আবার তাহার সম্বন্ধ আছে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা সকল অংশের মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়া, বিশ্বের সকল অংশের পরস্পর সম্বন্ধ সূচনা করিতে পারিত না। আমি যে তোমার কথা শুনিতে পাই, বায়ুমণ্ডল তোমার ও আমার মধ্যের ব্যবধানটিকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে তাই; সূর্য পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি যে ব্যোমমার্গে পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া আবর্তিত ও বিঘূর্ণিত হইতেছে, ঈথর নামক সূক্ষ্ম পদার্থ বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে তাই। মধ্যে সংযোগসূত্র না থাকিলে, এক সাধারণ সম্বন্ধসূত্র বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বের সকল অংশের মধ্য দিয়া অনুস্যূত না থাকিলে কখনই বিশ্বের অংশসকল নিয়মবদ্ধ থাকিয়া ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিত না। এই সংযোগ সূত্রটি গীতায় সুন্দরভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। গীতা শ্রুতিরই প্রতিধ্বনিস্বরূপ বলিতেছে।

"বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকেচ তৎ॥"

পুনশ্চ—

'যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥'

সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যে একেরই সত্তা সূচনা করিতেছে, এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তা যে সমস্ত বিশ্বমধ্যে অনুস্যূত তাহা প্রাচীন হিন্দু ঋষিগণ কত পূর্বে হৃদয়ঙ্গম করিয়া গিয়াছেন! মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব গ্রন্থে, তারকাসুর প্রপীড়িত দেবতাগণের ব্রহ্মার স্তুতি মধ্যে লিখিত আছে।

"নমস্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্‌ভেদমুপেয়ুসে॥"

ইহাপেক্ষা অদ্বৈতবাদের সুস্পষ্ট নিদর্শন আর কি হইতে পারে? শ্লোকটির 'প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে' শুধু এই কথাটির উপর যদি লক্ষ্য রাখা যায়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে কালিদাস শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

এই অধ্যাসতত্ত্বের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া শঙ্কর যে মতটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা যদি সংক্ষেপে বলিতে হয়, তাহা এই—

"শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ॥
ন নিরোধো নচোৎপত্তিঃ ন বদ্ধোর্ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

—বৈতথ্যপ্রকরণ ২.৩২

যাহা সত্য তাহা ব্রহ্মই, জগৎ সত্য নহে পরন্তু ইহা মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্মই, জীব ব্রহ্মাতিরিক্ত আদৌ নহে। সুতরাং বন্ধ, মোক্ষ যাহা কিছু সকলই ব্যবহারিক পদার্থ, সাধক সিদ্ধ যাহা কিছু সকলই মায়ার খেলা। কিন্তু তথাপি এই বন্ধের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে, মুক্তির সুখময় স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, যে উপায় আচার্যের অভিমত তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। কারণ, জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া আচার্য যেমন একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এই উপায় সম্বন্ধেও তিনি একটি

বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আচার্যের এই সকল সিদ্ধান্তই অপরাপর দার্শনিক সিদ্ধান্ত হইতে বিলক্ষণ, এই সকল বিষয়ে আচার্যমতের সহিত ভারতীয় অপর দার্শনিকগণ একমত নহেন। আর অপরাপর দার্শনিকগণ জীব বহু ও বিভু বলেন, আচার্য কিন্তু জীবকে এক ও অনন্ত বলেন। জগৎ অপরের মতে কূটস্থ নিত্য না হইলেও প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, আচার্যমতে জগৎ মিথ্যা—ইহার কোনরূপ নিত্যতা নাই। মুক্তির উপায় আচার্যমতে অদ্বৈতাত্মজ্ঞান, অপরের মতে পদার্থজ্ঞান অথবা জ্ঞান ও কর্ম, কিংবা কেবলই কর্ম, অথবা জ্ঞান ও ভক্তি বা উপাসনা উভয়ই। কর্ম এই জ্ঞানোৎপত্তিতে চিত্তশুদ্ধিকে দ্বার করিয়া উপায় হয় অর্থাৎ মুক্তির প্রতি পরম্পরায় কারণ হয়, সাক্ষাৎ কারণ হয় না। আর সেই জন্য কর্ম ও উপাসনা শঙ্করের মতে যেমন একমাত্র অবলম্বনীয় নহে, তদ্রূপ একেবারেও উপেক্ষণীয় নহে। কর্ম ও উপাসনা চিত্তের মল অপনয়ন করিয়া তাহাকে একাগ্র করিয়া তুলে মাত্র, মুক্তি দিতে পারে না। মুক্তির জন্য আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান আবশ্যক। ভক্তিপথ শঙ্করমতে উপাসনারই পথ। ভক্ত ও উপাসক একই কথা। অপরাপর দার্শনিকগণ জগতাদির মূলকারণ প্রকৃতি বা পরমাণু প্রভৃতি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করেন; আচার্য শঙ্কর সেই মূলকারণ উক্ত অধ্যাস বা অজ্ঞানকেই বলিয়া নির্দেশ করেন। সুতরাং মুক্ত হইলে অজ্ঞান নাশে মুক্তের নিকট ব্রহ্ম ভিন্ন জগতাদি কিছুই থাকে না, অপরাপর দার্শনিকের মতে কিছু না কিছু থাকে। শঙ্করের ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিরুপাধি, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, অক্ষয়, অনন্ত ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। অপরের মতে তাহা সবিশেষ সোপাধিক ত বটেই, তবে নিষ্ক্রিয় ও অক্ষয় অনন্ত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ কি না তদ্বিষয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। ইহাই শঙ্কর মতের এক কথায় সার সংক্ষেপ।

এইবার আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, ধর্মোপদেশকরূপে শঙ্করের

স্থান কোথায়। বৈদিক ধর্ম বস্তুত কর্মকাণ্ডের ধর্ম, শুভাশুভ কর্মানুসারে দণ্ড ও পুরস্কারের দর্শনই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এই বেদেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন দার্শনিক ঋষি চরমপন্থা ও অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দর্শনগুলির উৎপত্তি এই অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি হইতে সঞ্জাত। কোন দর্শনে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অসারতা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা বলা হয় নাই। তবে উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছেন যে, সমস্ত সুখ ও আনন্দ জ্ঞানে, কর্মে নয়। তবুও কিন্তু কর্মকাণ্ড একেবারে বিনষ্ট হইল না। বুদ্ধদেব যে ধর্ম প্রচার করিলেন তাহাতে তিনি নির্বাণ শিক্ষা দিলেন। এই নির্বাণমতই কর্মকাণ্ডকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। কুমারিল কর্মকাণ্ড পুনরুদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য এই ধর্মবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের যে সহায়, তাহাই প্রদর্শন করিলেন। তিনি উপনিষদ্‌কেই মূলমন্ত্র করিলেন, উপনিষদ্‌কে সর্বসমক্ষে ধরিলেন—এ দিকে আবার বৌদ্ধদর্শন আলোচনা করিয়া কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইলেন। ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশে সম্ভবত বুদ্ধবাণী অগ্রসর হইতে পারে নাই। শঙ্করের উপদেশ তথায় কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই, কাজেই সেখানে কর্মকাণ্ডের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে—সেখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ও শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া এখনও প্রচার করিয়া থাকে।

শঙ্করের দর্শন তাঁহার পূর্ববর্তী অন্যান্য দর্শনসমূহের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে, শঙ্কর-দর্শন বুঝিতে হইলে ভারতের সমগ্র দর্শন সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক।

ন্যায়মতাবলম্বিগণ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত প্রভৃতি নির্দেশ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ঐগুলির সাহায্যে প্রণিধানবলে পরম বস্তু লাভ করা যাইবে। মনুষ্যের মন ও আত্ম-

সংবলিত এই জড়জগৎকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা জীব হইতে ঈশ্বর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বৈশেষিকগণও এই মত গ্রহণ করিয়া পদার্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারাও ঈশ্বর স্বীকার করিলেন, কিন্তু পদার্থের স্বাধর্ম ও বৈধর্ম নির্ণয়ে ব্যস্ত হইলেন। তাঁহাদের মতে পদার্থ পরমাণু দিয়া সৃষ্ট—কিন্তু ঈশ্বরদ্বারা পরিচালিত। গৌতম এই প্রকারে আদি কারণতত্ত্ব এবং কণাদ বিজ্ঞানতত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন। এই শাস্ত্রদ্বয় ন্যায়শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক positive side of abstract generalisation (অস্তি) লইয়া ব্যস্ত। চার্বাক negative side (নাস্তি) লইলেন ; কিন্তু চার্বাকের মত কেহই গ্রহণ করিল না। চার্বাকের পর সাংখ্যদর্শনের আবির্ভাব হয়। সাংখ্য প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া আলোচনা করেন ; প্রকৃতিই সাংখ্যের মতে সৃষ্টির মূল কারণ, তবে এই প্রকৃতি পুরুষের সহিত সংশ্লিষ্ট। সাংখ্য পুরুষের প্রতি কোন কর্ম আরোপ করে নাই, পুরুষ নিষ্ক্রিয়। সাংখ্যবাদী বিশ্বাস করেন যে, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইলেই মোক্ষ লাভে সমর্থ হওয়া যায়—সাংখ্যবাদী প্রকৃতির উপর যাইতে পারে না। সাংখ্যমত-প্রচারক কপিলমুনি নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিলেন। পতঞ্জলি মুনি সাংখ্যমতের নিরীশ্বরতা মোচন করিয়া যোগদর্শন প্রচার করেন, তাহাতে ঈশ্বর প্রণিধানের কথা আছে। মনুষ্য কি করিয়া প্রকৃতির উপরেও উঠিতে পারে তাহারও উপায়সমূহ ইহাতে কথিত আছে। তাহার পর বাদরায়ণ ব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন—ইহাই বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ। শঙ্কর এই ব্রহ্মসূত্রগুলির ভাষ্য করিয়াছেন। শঙ্করের দর্শন তাঁহার যুগের ক্রমবিকাশ দ্যোতিত করিতেছে। শঙ্করের মতে জগতের ক্রমবিকাশও স্বীকার্য, কিন্তু তজ্জন্য আত্মার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মময়--কিন্তু ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। প্রকৃতির সহিত ব্রহ্ম জড়িত, কিন্তু ব্রহ্মের উপর প্রকৃতির প্রভাব নাই। সেই

অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মের চিন্তনেই বিমল আনন্দ লাভ করা যায়। ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়ই, অনাদি ও অচিন্তনীয়। প্রকৃতি ব্রহ্মের উপর নির্ভর করে এবং পরিবর্তনীয়—কিন্তু ব্রহ্ম ও প্রকৃতি এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাকে বিবর্তবাদ বলে। উপনিষদ্ বলেন যে, ব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রসূত। শঙ্কর রজ্জুতে সর্পভ্রমের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার ব্যাখ্যা করেন; যেহেতু রজ্জু সর্পের অনুরূপ। সেইরূপ প্রকৃতি ব্রহ্মের অনুরূপ। শঙ্কর বিবর্তবাদের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধ্যাস বলে। ব্রহ্মের উপর নামরূপ প্রকৃতি আরোপ করা মায়ার কার্য।

আমাদের এই কথাগুলি আলোচনা করিলে শঙ্করের নিজের অবস্থা এবং তাঁহার দর্শনের ভিত্তি কি তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। শঙ্করের যুগে দর্শনের যে বিকাশ হইয়াছিল, সেই বিকাশের যুগের তিনি যথার্থই অবতার ছিলেন। তিনি সমস্ত দার্শনিক সমস্যা নিজে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক দার্শনিকদিগের অসুবিধার কারণও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, এ পর্যন্ত জীবন ও দ্রব্যজ্ঞান সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উপনিষৎসম্মত নয় এমন কি ন্যায়সঙ্গতও নয়। অধ্যাপক Tyndall যখন British Associationএ সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "Two courses and only two are possible. Either let us open our doors to the conception of creative acts, or abandoning them, let us radically change our notions of matter," তখন তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার সহস্রাধিক বর্ষের পূর্ববর্তী একজন ভূয়োদর্শী ঋষি যে সমস্যা অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি তাহারই পুনরুক্তি করিতেছিলেন। মহাত্মা Tyndall-এর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'The origination of life is a

point lightly touched upon, if at all, by Mr. Darwin and Mr. Spencer.' বর্তমান অবস্থা যখন এইরূপ তখন অতি প্রাচীন কালে কিরূপ হওয়া সম্ভব? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মানবশক্তির নিকট যাহা অসাধ্য, তাহা তিনি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সৃষ্টি ও জীবনসমস্যা কার্যত পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। শঙ্কর সৃষ্টি ও জীবনসমস্যার বিশ্লেষণকল্পে কোন কার্যকরী পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে বরাবরই তর্ক চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ প্রস্তাবে আমাদের তাহা আলোচ্য নয়। আমরা ইহার আধ্যাত্মিক তত্ত্বই গ্রহণ করিব। শঙ্কর নিশ্চয়রূপে বুঝিয়াছিলেন যে, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচার করিলে জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের কিছুই বুঝাইতে পারা যাইবে না; বরং উহাতে ইহাই বলা হইবে যে, মনুষ্য ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে বা জানিতে সমর্থ নয়। বর্তমান যুগের Mill-এর ন্যায় তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পাপের সত্তার সহিত বিশ্বাতীত, সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ পূর্ণপবিত্র ভগবানের সত্তার মিলন করা যায় না। Hamilton বা Mansel-এর ন্যায় তিনি জ্ঞানকে ধর্মজগৎ হইতে বহিষ্কৃত করেন নাই এবং Spencer-এর এক Negative "Unknown"কে এই সৃষ্টির মূলকারণ বা কর্তা বলেন নাই। জড় হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি—জড়বাদীদিগের এই মত খণ্ডন ও প্রতিবাদ করা তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এমন কি Leibnitzএর monad বা নিরবয়ব জীবৎপদার্থকে তিনি যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। শঙ্করের মতে সম্বন্ধ বলিলে সম্বন্ধের অতীত বুঝায়, কেন্দ্র বলিলে পরিধি বুঝায়, বহিঃ বলিলে অন্তর বুঝায়, বহিঃস্তর বলিলে অন্তঃস্তর বুঝায়, অনন্তকে ভাবিতে গেলে তাঁহাকে সান্ত করিয়া ধারণা করিতে হয়। একমাত্র Hegel ব্যতীত ইউরোপীয়গণ অনন্তকে যে ভাবে ধারণা করিতে চান, তাহা অসম্ভব।

কেহ কেহ শঙ্করকে মায়াবাদী বলিয়া দোষারোপ করেন। শঙ্কর

'মায়া' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষ্যে মায়া শব্দের প্রয়োগ অতি বিরল। তিনি মায়াবাদ উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে বিবর্তবাদের একটি শাখা (corollary)। তিনি মায়াবাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিশেষভাবে ইহার সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, নাম ও রূপই মায়া, আমাদের ইহাদের উপর আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়। ভারতীতীর্থ 'বিবর্তবাদ' ব্যাখ্যায় এই একই কথা বলিয়াছেন। 'দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকে' (২০) তিনি বলিতেছেন—

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততোদ্বয়ম্॥"

অর্থাৎ, অস্তি, ভাতি (জ্ঞান), প্রিয় (সুখ) রূপ ও নাম এই পাঁচটি গুণ,—প্রথম তিনটি ব্রহ্ম, শেষ দুইটি জগৎ (মায়া)।

ছান্দোগ্যও এই একই উপদেশ দিয়াছেন—

"যথা হি সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"—ইত্যাদি।

অর্থাৎ হে সৌম্য, একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে মৃৎপিণ্ড হইতে নির্মিত সমস্তই জানিতে পারা যায়, নামগুলি শাব্দবিকৃতি মাত্র—সত্য হইতেছে একমাত্র মৃত্তিকা।

ভগবদ্গীতার উপদেশও এইরূপ—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৩.১৯
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥" ১৩.২৯

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—

"সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্মমে বিভুঃ॥" ৩.৫.২৫

শঙ্করাচার্যও "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" সূত্রের ভাষ্যে (২,১.১৪) বলিয়াছেন, "অভ্যুপগম্য চেমং ব্যাবহারিকং ভোক্তৃভোগ্য-লক্ষণং বিভাগং স্যাল্লোকবদিতি পরিহারোঽভিহিতো ন ত্বয়ং বিভাগঃ পরমার্থতোঽস্তি যতস্তয়োঃ কার্যকারণয়োরনন্যত্বমবগম্যতে। কার্য-মাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎকারণং পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেনাভাবঃ কার্যস্যাবগম্যতে॥" এখানে শঙ্কর অনেকটা বাহ্যমায়াবাদের সহিত নিজ মত প্রকাশ করিতেছেন; ইহা সর্পরজ্জু দৃষ্টান্ত, মরীচিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু 'ব্যতিরেকেনাভাবঃ" এই শব্দ দ্বারা 'অনন্যত্বম্' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে ইহার সহিত বাচস্পতি মিশ্রের অনন্যত্ব শব্দের ব্যাখ্যাও স্মরণ রাখা উচিত। বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে কোনও ঐক্য নাই। পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক্— চিন্তা ও সত্তা অভেদ্য। ইহাই বিবর্তবাদের প্রকৃত অর্থ। গোবিন্দা-নন্দের মতে ইহা শঙ্করের মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অনন্যত্বের এই প্রকৃত অর্থ জানিয়া বুঝিতে হইবে যে, মায়া কেবল নাম ও রূপের মধ্যেই আবদ্ধ। 'জগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ' এই বিপরীত মত গোবিন্দানন্দ স্পষ্টই প্রতিবাদ ও অস্বীকার করিয়াছেন। ইহাই পরিণামবাদ। মন হইতে দ্রব্যের পরিণতি হইয়াছে—ন্যায়ের এইরূপ প্রতিলোম রীতি ব্যতিরেকে পরিণামবাদ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। বল্লভাচার্য এই জড়বাদ ও মায়াবাদ-মত উপেক্ষা করিয়া ইহাদের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা একটি ক্রমবিকাশবাদের ফল। রামানুজ ও মধ্বাচার্যের ন্যায় অপরেও মায়া ও ব্রহ্মকে পৃথক্ করেন এবং জীবাত্মাকে পরমাত্মার এক অংশ বলিয়া মনে করেন। এক্ষণে আমাদের উক্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য শঙ্করের অপর একটি স্থলের উল্লেখ করিব। শঙ্কর অনন্যত্ব দ্বারা অভেদ ভিন্ন অপর কোন অর্থ যে করেন নাই তাহা সুস্পষ্ট, তবে তিনি জগতের কোন মূল উপাদান কারণে আস্থাবান্ ছিলেন কিনা

তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই বিষয়টি যদি আমরা স্থির করিয়া লই, তাহা হইলে আমরা দেখিব, মায়া অর্থে illusion-এর ব্যাখ্যা আদৌ সম্ভবপর হইবে না। এইরূপে প্রকারান্তরে বিবর্তবাদের মত আপনাকেই আপনি খণ্ডন করিবে। শঙ্করাচার্য 'ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ' মতের উত্তরে বলেন যে, বাহ্য বিষয়ের অস্থায়িত্ব সপ্রমাণ করা অসম্ভব। কারণ, কোন চিন্তা করিলেই, চিন্তার বিষয় কিছু থাকিবেই। তিনি বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে বলেন নাই। কেবল চিন্তা ও বস্তু যে অচ্ছেদ্য তাহাই বলিয়াছেন। কেহ যদি স্তম্ভের চিন্তা করে তাহা হইলে তাহার মনে ঐরূপ প্রকৃতই একটা কিছু দৃষ্ট হয় তাহা নয়, তবে যাহা প্রকৃত তাহার অনুরূপ মাত্র চিন্তিত হয়। চিন্তিত বস্তুকে একেবারে কিছুই নয়, শূন্য বলিলে চলিবে না, কেন না তাহা হইলে কোনরূপ সংস্কার থাকে না।

জ্ঞানের বিষয়স্বারূপ্য হেতু বিষয় নাশ হয় না। চিন্তা ও চিন্তিত বস্তু এতদুভয়ের মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের (subject ও object) সম্বন্ধ বিদ্যমান। শঙ্করের এই উক্তি দ্বারা অনন্যত্বের কিরূপ ব্যাখ্যা হয় তাহাই দেখা যাউক। শঙ্কর অনন্যত্ব বলিলে কোন চিন্তার বিষয় যে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা কখনও মায়া হইতে পারে না। ইহাকেই তিনি ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু ইহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নয়। এইরূপেই মায়াও পুনরায় নাম ও রূপে পরিণত হইয়াছে, এমন কি, মায়াকে স্বপ্নের সহিত তুলনা করিলে এবং স্বপ্নের আধারতত্ত্ব অবগত হইলে আমাদের ভ্রমে পতিত হওয়া উচিত নয়। যেমন সমস্ত স্বপ্ন (নাম ও রূপ) জাগরিত হইলেও ভ্রম বলিয়া জানা যায়, সেইরূপ জ্ঞানের অবস্থায় মায়াকে মিথ্যা বলিয়া জানা যায়। এইরূপে শঙ্করাচার্য মায়া বা অবিদ্যা বেশ করিয়া বুঝাইয়াছেন। ইহাই জগতের কারণ। এইবার বিদ্যারণ্যের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া

এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। মূলাধ্যাস বুঝাইতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মতস্মাৎ সমুত্থিতাঃ।
খং বায্বগ্নিজলোর্ব্যোবধ্যন্নদেহা ইতি শ্রুতিঃ॥
আপাতদৃষ্টিতস্তত্র ব্রহ্মণো ভাতি হেতুতা।
হেতোশ্চ সত্যতা তস্মাদন্যোন্যাধ্যাস উচ্যতে॥"

ব্রহ্ম হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবীর উদয়। এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম জগতের আদি এবং জগৎ প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। ইহাকেই পরস্পরের অধ্যাস বলে। এইখানেই ব্রহ্ম জড়-জগতের যে বিকাশ তাহার মূল কারণ হইতেছেন। ব্রহ্ম সমস্ত চিন্তার অতীত, কিন্তু জড় উহার ব্যতীত নয়। মায়া বা অজ্ঞানতা মধ্যস্থলে থাকিয়া কার্য করে এবং ইহাই জাগতিক বিকাশের অংশ। সুতরাং শঙ্করের দর্শন, চিন্তা ও সত্তার অচ্ছেদ্যসম্বন্ধের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহাই অদ্বৈতবাদের সারতত্ত্ব।

বর্তমান যুগের একজন প্রধান ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিত যে মহাপুরুষকে সর্বদেশের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, বিংশ-শতাব্দীর চিন্তাশীল জগৎ সেই জগদ্‌গুরু সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধহয় না। ইউরোপ ও আমেরিকায় কেহ কেহ তাঁহার উপদিষ্ট গ্রন্থাবলীর সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের ধারণা এই যে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য মাত্র একজন পরমার্থবিদ্ (theologian) অথবা বড় জোর একজন বিশিষ্ট নৈয়ায়িক (dialectician) ছিলেন। ইহার অধিক তাঁহারা কিছু বলিতে রাজি নন। কারণ, আজ পর্যন্ত ঐ সমস্ত দেশে যে সমস্ত প্রামাণিক দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Paul Deussen-এর গ্রন্থ ব্যতীত কোথাও শঙ্করদর্শন অথবা যে সমস্ত মতবাদের সহিত শঙ্করের

নাম সংযোজিত আছে তাহাদের ইঙ্গিত মাত্রও করা হয় নাই। এমন কি Encyclopædia Britanica-র ন্যায় প্রামাণিক কোষ-গ্রন্থেও শঙ্করের গ্রন্থসম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা দার্শনিক বিষয় (philosophy) বলিয়া উল্লিখিত না হইয়া পরমার্থতত্ত্ব (theology) বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে। Dr. Thibaut শঙ্করের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের ভাষান্তর করিয়াছেন। তিনি ইহার ভূমিকায় বেদান্তে নিহিত dogma বা তত্ত্বসমূহেরই আলোচনা করিয়াছেন। অধুনাতন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কয়েক বৎসর হইতে ভারত-বর্ষীয় দর্শনসমূহের আলোচনার নিমিত্ত বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়, কিন্তু আমাদিগকে প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানী হইয়া দার্শনিক ভাবে শঙ্করের বিষয় প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিতে হইবে। অধুনাতন বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে ভারতীয় দার্শনিকগণের মুখ্য উদ্দেশ্যের সন্ধান করিতে হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকায় 'অদ্বৈতবাদ'কে ভ্রমক্রমে 'একেশ্বরবাদ' বলিয়া প্রায়ই নির্দেশ করা হইয়া থাকে। প্রতীচ্য দার্শনিকগণ এখনও অদ্বৈত-বাদের প্রকৃত তথ্য ধারণা করিতে সমর্থ হয় নাই।

প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের এবং প্রতীচ্যমতানুবর্তীদিগের নিকট শঙ্কর পরমার্থবিদ্ বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্রাভিমান বা হেতুন্যায়বাদী ছিলেন অথবা পরমার্থবিদ্ বা দার্শনিক ছিলেন এক্ষণে তাহাই আমাদের বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে।

পরমার্থবিদ্যা, ঈশ্বরজ্ঞান হিসাবে ঈশ্বরের প্রকৃতি, তাঁহার অস্তিত্ব, তাঁহার জগৎ-সৃষ্টি, এবং সর্বাপেক্ষা তৎকর্তৃক জগতে শোক, দুঃখ ও পাপের উদ্ভাবন সম্বন্ধে প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। দর্শনের সহিত ঐক্য হয়, এরূপ খুব কমই ভাব ইহাতে আছে। একমাত্র সত্যনিরূপণই দর্শনের কার্য। দর্শন যুক্তি ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতে চায় না। কিন্তু পরমার্থবিদ্যা প্রতি পদেই স্বতন্ত্রানুযায়ী কিছু একটা ধরিয়া লইবে, আর তাহারই বশবর্তী হইয়া চলিবেই।

ইহার পক্ষ-সমর্থনকারী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সংখ্যাও অল্প নয়। ইহারা বলেন, বিচারের যখন সীমা আছে, তখন সকল চিন্তার চরম সীমায় উপনীত হইতে হইলে বিচারকে ফেলিয়া দিয়া কোন না কোন প্রকারের dogma বা ঋষিবাক্য ইত্যাদি শব্দ প্রমাণের আশ্রয় লইতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের যুক্তির অসারতার কথা ভুলিয়া যান। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে তাঁহারা প্রকারান্তরে একই কথায় আসিয়া পড়িতেছেন। তাঁহারাও যুক্তির উপরই নির্ভর করেন। যুক্তিই তাঁহাদের সর্বস্ব, এই যুক্তি দ্বারাই তাঁহারা সমস্ত জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পরমার্থতত্ত্ব যে পরিমাণে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকেই লাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই পরিমাণে সত্যের দিকে ধাবিত হওয়া ইহার অভিপ্রেত নয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচারকালে তাঁহারা তাহারই উপর নির্ভর করেন, যাহাকে তাঁহারা শ্রুতি, ঈশোন্মেষ প্রভৃতি অধ্যায়ে আখ্যাত করিয়া থাকেন। দার্শনিকগণ শাস্ত্রাদি তাদৃশ আলোচনা করুন আর নাই করুন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি অনুসারে বিচার করিতে হইবে; তাঁহারা "শাস্ত্র" বলিয়া শুধু তাহারই উপর নির্ভর করিবেন না। এই সমস্ত বিষয়ে পরমার্থতত্ত্ব ও দর্শন পরস্পর বিরোধী হইলেও উভয়ের মধ্যে একটি সাধারণ বিষয় আছে। উভয়েই সত্যের অনুশীলনে তৎপর এবং উভয়েই জগৎ ও জীবনের প্রহেলিকা নির্ণয় করিতে উৎসুক। পরমার্থতত্ত্ব কতকগুলি সত্য স্বীকার করিয়া লইয়া পরম সত্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু দর্শন যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় তাহা লইয়া আরম্ভ করে এবং তাহা হইতেই বিচারে প্রবৃত্ত হয়। বলিতে গেলে, পরমার্থতত্ত্ববিৎ শিশু—দার্শনিক বয়োবৃদ্ধ পুরুষ। প্রথমে শিশুকে শাস্ত্রবাক্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে, পরে তাহার বিচার করিবার শক্তি জন্মিবে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

এক্ষণে আলোচ্যবিষয়ে অগ্রসর হওয়া যাক।

'মাণ্ডুক্য-উপনিষৎ-কারিকা'র অদ্বৈতপ্রকরণে প্রথম শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন—

'অদ্বৈতং কিমাগমনমাত্রেণ প্রতিপ্রত্তব্যমাহো স্বিত্তর্কেণার্পত্যত আহ। শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্। তৎকথমিত্যদ্বৈতপ্রকরণমারভ্যতে।"

অর্থাৎ প্রশ্ন হইয়া থাকে যে, অদ্বৈতবাদ কেবল শ্রুতিবলেই প্রমাণিত হয় অথবা বিচারবুদ্ধি বা তর্ক দ্বারা অবগত হওয়া যায় এই অধ্যায়ে প্রমাণিত হইবে যে তর্কদ্বারা ইহা জানিতে পারা যায়।

পুনশ্চ—

'জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ইত্যুক্তম্। একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। আগমমাত্রিং তৎ। তত্রোপপত্ত্যাপি দ্বৈতস্য বেতথ্য শক্যতেঽবধারয়িতুমিতি দ্বিতীয়প্রকরণমারভ্যত্যে।'—বৈতথ্যপ্রকরণ, ১ম শ্লোক।

অর্থাৎ দ্বৈতের অলীকত্ব শ্রুতিদ্বারা প্রমাণিত। যাহা হউক, ইহা শ্রুতিবাক্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করা যায়। এই জন্যেই দ্বিতীয় অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ যে তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা পূর্বে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এখন এ সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।

প্রথমত বলা যাইতে পারে যে, ইহা শঙ্করের অভীপ্সিত মত নয়। যদি তাহা হইত তাহা হইলে অন্যত্র তিনি অন্য মত প্রকাশ করিতেন না। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, শঙ্কর বিশেষরূপে অবগত ছিলেন যে বৌদ্ধদিগের ন্যায় এমন একদল লোক সকল সময়েই জগতে থাকিবে যাহারা বেদের দোহাই মানিবে না। তাঁহাদের যুক্তি নিরসনের জন্যই শঙ্কর বেদের দোহাই না দিয়াই যুক্তির আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি ইচ্ছা করিয়াই বলিয়াছেন,

"যাহা হউক এক্ষণে আমরা বেদান্তবাক্য নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদিগের যুক্তি খণ্ডন করিব"—

"ইহতু বাক্যনিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্রস্তদ্‌যুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়তে।"

—সূত্রভাষ্য, ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ।

শঙ্কর জানিতেন যে, পৃথিবীতে সকল সময়েই বুদ্ধিহীন ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। তাহাদিগের জন্য তিনি শ্রুতিবাদ সম্বন্ধে এত লিখিয়াছেন। শঙ্করের দ্বৈধভাব দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছেন। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ তাঁহার যুক্তিবাদ বুঝিতে পারেন নাই। Deussen এই ভুল করিয়াছেন এবং তিনি এই বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ কোন বিশেষ শাস্ত্র বা ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। সমগ্র শ্রুতি বাদ দিলেও তাঁহার মত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। শঙ্করদর্শন কোন হিন্দু বা অহিন্দুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য লিখিত হয় নাই—ইহা সর্বসাধারণের উপযোগী। যেমন জলবায়ু সকলেরই সমান উপভোগ্য—সেইরূপ তাঁহার মত সকলেই সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যদি কিছু সার্বভৌমিক জগতে সম্ভবপর, তাহা হইলে এই শঙ্কর মতেই সম্ভব।

মায়াবাদ

শ্রীমদাচার্য শঙ্কর মায়াবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি মায়াবাদের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন তাহার নামান্তর বিবর্তবাদ বা অদ্বৈতবাদ। আচার্য শঙ্কর শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদায় জগৎই মিথ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। যেমন মৃন্ময় ঘটাদি বস্তুত মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়— "বাচারম্ভনং বিকারোনামধেয়ম্" (ছা-উ ৬. ১. ৪)। সেইরূপ সেইরূপ এই সমগ্র জগৎ বস্তুত ব্রহ্মমাত্র, ব্রহ্ম ব্যতিরেক ইহার স্বতন্ত্র

সত্তা নাই ; ব্রহ্ম ব্যাতিরিক্ত কিছুই নাই—"নহি নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃহ-উ ৪. ৪. ১৯)।

এইখানে ব্যাপার অনেকদূর গড়াইল। আমরা যাহাকে নামরূপ প্রপঞ্চ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, চতুর্দিকে যে সমস্ত রূপভেদ দেখিতে পাই, এইগুলি সমস্তই পরমার্থ অবস্থায় অবিদ্যা কল্পিত—অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত বা অবিদ্যা অধ্যারোপিত। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, এগুলি মিথ্যা অভিমান ভিন্ন আর কিছুই নয়—আমাদের জগতের যা কিছু সমস্তই 'মিথ্যা জ্ঞান বিজৃম্ভিত'। এই মিথ্যা অভিমান আবার সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা খচিত হইয়া যায়। আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে, কিন্তু যে মুহূর্তে প্রকৃত জ্ঞান হয় তখনই সমস্ত ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। বলিতে গেলে, সমগ্র জগৎ মায়া ভিন্ন আর কিছুই নয় ; ব্রহ্ম যিনি, তিনি স্বয়ং মায়াবীরূপে আপনা হইতে জগৎকে প্রসারণ করিতেছেন। অথবা "অবিদ্যয়া ব্রহ্ম বিভাব্যতে"। তিনি পুনরায় স্বীয় আত্মায় যাহা কিছু সমস্তই উপসংহার করিতেছেন। ব্রহ্ম উপসংহার কারণ-স্বরূপ—"স্বাত্মণি এবং উপসংহারকারণম্।"

ব্রহ্ম বুঝিতে আমরা সৎ, চিৎ, আনন্দ বুঝিয়া থাকি। সৎ কাহাকে বলি ? ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, তাই তাঁহাকে সৎ বলা হয়। যখন তাঁহাকে চিৎ বলি, তখন বুঝি, ব্রহ্ম চৈতন্য পদবাচ্য জ্ঞানের স্বরূপ। তাঁহাকে পরমান্দস্বরূপ বলিলে বুঝিতে হইবে, তিনি অখণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, অদ্বিতীয় এবং নির্ধর্মক ; ব্রহ্মে জ্ঞান বা সুখাদি কোন ধর্মই নাই—তিনি জ্ঞান ও সুখ স্বরূপ। আমরা যখন ঘট দেখি তখন আমাদের ঘট জ্ঞান হয়, আর আমরা যখন পট দেখি তখন আমাদের পটের জ্ঞান হয়। এই ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞানের প্রভেদ আছে। যাহা ঘটজ্ঞান তাহা পটজ্ঞান নয় ; আপনার যে জ্ঞান এবং আমার যে জ্ঞান তাহা সমান নয় ; আপনার জ্ঞান হইতে আমার জ্ঞান স্বতন্ত্র। আমাদের কাছে জ্ঞানের যে নানাত্ব

প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহা সেইরূপ ভেদ ব্যবহার দেখিয়াই হইয়া থাকে। জ্ঞান যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহা, কিংবা যাহা সমস্ত জ্ঞানের ঐক্য সাধন করে এরূপ কোন যুক্তি এখনও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। কিন্তু একটু গবেষণা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, নানা বিষয়রূপ উপাধি লইয়া জ্ঞানকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। বস্তুত জ্ঞান একমাত্র, বিষয়রূপ উপাধির ন্যায় কখনও ভিন্ন ভিন্ন নহে। যেমন একজনের মুখের প্রতিবিম্ব তৈলে যেরূপ প্রতিবিম্বিত হইবে, জলে সেরূপ হইবে না, পরন্তু অন্য আকার ধারণ করিবে। কিন্তু মুখ একই, কেবল জল ও তৈলের ভেদবশতঃই মুখের রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। এই তৈল প্রভৃতি উপাধির ভেদ লইয়াই ভেদ ব্যবহার হয়। সেইরূপ জ্ঞান যদিও এক, যদিও তাহার নানাত্ব নাই, তথাপি ঘটপটাদির বিষয়রূপ উপাধিতে যখন আমরা আমাদের জ্ঞান বিভিন্নভাবে সন্নিবেশ করি তখনই জ্ঞানের বিভিন্নতা বুঝা যায়।

যখন আমরা দেখি কোন লোক কোন দেশ জয় করিয়া হউক বা উত্তরাধিকার সূত্রেই হউক, কোন দেশের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন তখন আমরা কি বলিব? আমরা তাঁহাকে সেই দেশের রাজা বলিয়াই অভিহিত করিব। কিন্তু যদি কিছুদিন পরে ঘটনাচক্রের আবর্তনে পড়িয়া তাঁহাকে দেশান্তরের রাজাসন গ্রহণ করিতে হয়, তখন আমরা তাঁহাকে সেই দেশান্তরের রাজাই বলিব, পূর্বদেশের রাজা বলিয়া আর অভিহিত করিব না। তেমনই অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল যখন বিষয়ের আবরণরূপ অজ্ঞানতা বিনাশ করিয়া জ্ঞানের দ্বারা বিষয়সকল প্রকাশ করে, তখনই তাহার জ্ঞান এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। আর উহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ যদি এইরূপ না হয়, তাহা হইলে তখন জ্ঞান বলিয়াও প্রয়োগ হয় না। জ্ঞান যদিও এক 'তোমার জ্ঞান, আমার জ্ঞান' প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা কি? বরং জ্ঞান যে এক সেই সম্বন্ধেই বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হয়। একটা প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। বাস্তবিক

বিভিন্ন দুই বস্তুর উপাধি ত্যাগ করিলেও আপনা আপনি আমাদের মনে ভেদ জ্ঞান আসিয়া থাকে, যেমন ঘট ও পট এই দুই বস্তুর মধ্যে কোনরূপ ঐক্য নাই—দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্নপদার্থ ; কিন্তু যদি ইহাদের ঘট ও পটাদিরূপ উপাধি বর্জন করা যায়, তাহা হইলেই কি ইহাদের অভিন্নতা প্রতীত হয় ? সুতরাং ঘট বলিতে যে জ্ঞান বুঝায় এবং পট বলিতে যে জ্ঞান বুঝায়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বাস্তবিক যদি কোন ভেদ থাকিত, তাহা হইলে ঐ ঐ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ উপাধি উঠাইয়া দিলেও নিঃসন্দেহে ভেদ ব্যবহার হইত, কিন্তু যখন ঘট ও পটজ্ঞানের শুদ্ধ ঘট পটাদি উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন্ন" এরূপ স্বাতন্ত্র্য কেহই অস্বীকার করেন না, তখন ঐ ঐ জ্ঞানের প্রকৃত ভেদ কিরূপে প্রমাণিত হইতে পারে ? ঐ ঐ জ্ঞানের ঘট ও পটরূপ উপাধির দ্বারাই, "যেহেতু ঘটই ঘটজ্ঞানের বিষয়, আর পটই পটজ্ঞানের বিষয় ; অর্থাৎ ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন" এইরূপ ভেদ ব্যবহার হয় ; ইহাতে ঐ ঐ জ্ঞানের কেবল মাত্র ঔপাধিক ভেদ আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। ইহা ভিন্ন জ্ঞানসমূহের স্বাতন্ত্র্য সাধনসূচক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। বরং একদা প্রতিপাদন পক্ষে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বহু প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকন্তু যখন সহজভাবে জানা যাইতেছে যে ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান উভয়ই জ্ঞান, তখন এই দুই জ্ঞানের প্রভেদ স্বীকার কিরূপে করিতে পারা যায় ? অতএব এই সিদ্ধান্ত হইল যে, সকল লোকের সর্ব বিষয়ক জ্ঞান বিভিন্ন নয়, এক। এই জ্ঞানেরই অপর নাম চৈতন্য। চৈতন্য ও জ্ঞান পৃথক নয়। এই জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যই আত্মার, আবার আত্মাও চৈতন্য ছাড়া কিছুই নয়। অতএব উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে যখন জ্ঞানের একত্ব প্রমাণিত হইতেছে, তখন আত্মা সকল যে এক এবং পূর্ণচৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মারও যে ঐক্য আছে তাহা আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এই জীব ও ব্রহ্ম যে এক তাহা 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি

শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে; জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, অপায় ও তিন রূপ—ছয় প্রকার বিকারের মধ্যে—আত্মার কোন বিকারই নাই। আত্মা সকল সময় সকল স্থানে বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই আত্মাই পরম আনন্দস্বরূপ, কেন না আত্মাই সকলের একান্ত স্নেহের অদ্বিতীয় পাত্র। আমাদের যে স্ত্রীপুত্রাদিতে স্নেহাদি জন্মে তাহা এই আত্মার প্রীতির জন্যই হইয়া থাকে। অন্যের প্রীতির জন্য কেহ কখনও আত্মাতে স্নেহ করে না।

এখন একটা আপত্তি হইতে পারে—যদি আত্মার আনন্দরূপতা প্রতীত না হয়, তাহা হইলে আত্মার আনন্দরূপ ত অজ্ঞাত রহিল; সুতরাং তাহাতে স্নেহ হইবার সম্ভাবনা কি? এই দোষ পরিহারের জন্য যদি আনন্দরূপতার প্রতীতি স্বীকার করা যায়। তাহা হইলে আত্ম-স্বরূপ পূর্ণানন্দ থাকিতে তুচ্ছ বিষায়ানন্দ পাইবার ইচ্ছায় কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদি সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইত? সিদ্ধ বস্তুর নিমিত্ত কি কাহারও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে? অতএব আত্মার আনন্দ রূপতার প্রতীতি অপ্রতীতি উভয় পক্ষেই সদোষ হইতেছে।”

কিন্তু এই আপত্তি স্বীকার করা যাইত, যদি আত্মার আনন্দ-রূপতার সম্পূর্ণ প্রতীতি বা সম্পূর্ণ অপ্রতীতি স্বীকার করা যাইত। বাস্তবিক আত্মার আনন্দরূপতা অজ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যার প্রতিবন্ধকতা হেতু প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত হইতেছে; অর্থাৎ সামান্যত প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষত প্রতীতি হইতেছে না। ইহার অবিকল দৃষ্টান্ত হইতেছে অধ্যয়নশীল কতকগুলি ছাত্রের মধ্যস্থিত দেবদত্ত নামক ব্যক্তির অধ্যয়ন শব্দ। এখানে অন্যান্য বালকের অধ্যয়নের জন্য প্রতিবন্ধক হইতেছে। সুতরাং দেবদত্তের অধ্যয়ন শব্দ এইরূপ তাহা বিশেষ জানিতে পারা যায় না। তবে সামান্যত এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, ইহার মধ্যে দেবদত্তের অধ্যয়ন শব্দ আছে। পরব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণাত্মক এবং সৎ বা অসৎরূপে অনির্ণেয় পদার্থবিষয়কে অজ্ঞান বলে এই

অজ্ঞান জগতের কার্য বলিয়া ইহাকে প্রকৃতিও বলে। অজ্ঞানের আবরণ বিক্ষোভভেদে দুইটি শক্তি আছে। যেমন পরিমাণে অল্প হইয়াও দর্শকগণের নয়ন আচ্ছন্ন করিয়া বহু যোজন বিস্তৃত সূর্য-মণ্ডলকেই যেন আচ্ছাদিত করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অজ্ঞান পরিছিন্ন হইয়াও যে শক্তিদ্বারা দর্শকের বুদ্ধি-বৃত্তি আচ্ছাদিত করিয়া যেন অপরিছিন্ন আত্মাকেই তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐ শক্তিকে আবরণশক্তি বলে। আর যে শক্তির সহিত অজ্ঞান উপাদান কারণরূপে জগৎসৃষ্টি করে সেই শক্তিকেই বিক্ষেপশক্তি বলে। এই অজ্ঞান বাস্তবিক এক হইলেও অবস্থাভেদে দ্বিবিধ মায়া এবং অবিদ্যা। বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজোগুণ অথবা তমোগুণ দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানকে মায়া নামে অভিহিত করা হয়; আর মলিন অর্থাৎ রজোগুণ বা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান অজ্ঞানকে অবিদ্যা বলে। উল্লিখিত মায়াতে পর-ব্রহ্মের যে প্রতিবিম্ব হয় সেই প্রতিবিম্বই এ মায়াকে স্বায়ত্ত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন।

এই জন্য এই প্রতিবিম্বই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা ও অন্তর্যামিস্বরূপ ঈশ্বর পদবাচ্য। আর অবিদ্যাতে যে পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয় সেই প্রতিবিম্বই ঐ অবিদ্যার বশীভূত হইয়া মনুষ্যাদি যাবৎ জীবপদবাচ্য হয়। অবিদ্যা নানা, সুতরাং তৎ-প্রতিবিম্বও নানা; কাজেই জীবও নানা; মায়া ও অবিদ্যাকেই যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের সুষুপ্তি, আনন্দময় কোষ ও কারণ শরীর বলে; এইজন্য শরীরের অভিমানী ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে সর্বজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পদবাচ্য। জীবের উপভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বর জীবগণের পূর্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃত অনুসারে অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট মায়া সহকারে নামরূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমে বুদ্ধিতে কল্পনা করিয়া "এইরূপ করাই কর্তব্য" এই প্রকার সঙ্কল্প করেন, পরে সেই মায়াবিশিষ্ট আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে

তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচটি পদার্থকে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, অপঞ্চীকৃত ভূত ও পঞ্চতন্মাত্র বলে।

অনেকে শঙ্করকে মায়াবাদের উদ্ভাবনকর্তা মনে করেন, কিন্তু মায়াবাদ প্রকৃতপক্ষে আচার্য শঙ্করের বহুপূর্বে এ দেশে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে নারদীয়সূক্তে এই মায়াবাদের কয়েকটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নংভ কিমাসীদ্ গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তকেদং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস॥"

ইত্যাদি—১০.১২৯

এই সূক্তের সায়ণ যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহার অনুরূপ অর্থ অন্যান্য দার্শনিক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। রামতীর্থের পদযোজনিকা অথবা আচার্য শঙ্করের উপদেশসহস্রীর ভাষ্য এবং আত্মপুরাণে একইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সায়ণ প্রলয়াবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। জগতের প্রাগবস্থা মায়ার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, অন্যাবস্থায় সত্তা এখনও আসে নাই। মায়া সৎও নয় অসৎও নয়, ইহা অনির্বচনীয়।

উপনিষদে স্পষ্টতরভাবে মায়াবাদের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে মায়া নানা নামে অভিহিত হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্‌ভাষ্যে (১.৩) মায়ার নিম্নলিখিত কয়টি ঔপনিষদিক নামের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"অব্যাকৃতং, আকাশং, পরমাব্যোম, মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, তমঃ, অবিদ্যা, ছায়া, অজ্ঞানম্, অনৃতং, অব্যক্তম্।"

মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক ও কঠোপনিষদের কয়েক স্থানে মায়া ব্যাপারের উল্লেখ আছে। বৈদিক ও ঔপনিষধিক

যুগে মায়াবাদ ছিল। কিন্তু কর্মবহুল বৈদিক যুগে দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা কর্মশাস্ত্র বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। কাজেই বৈদিকযুগে মায়াবাদ আর্যদিগের মনোরাজ্যে তাদৃশ ভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে কর্মপ্রবণতা হ্রাস পায়, দার্শনিকতা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। বেদের কর্মকাণ্ড লোপ পাইতে আরম্ভ হয়। এই সময় মায়াবাদের আবার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। তারপর বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ও চৈনিক পর্যটকগণের কৃপায় ইহা দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। অতঃপর গৌড়পাদ আবার নূতন করিয়া ইহার প্রচার আরম্ভ করেন। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত বেদান্তদর্শনের উপর যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থ হইতেছে—গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকা। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় গৌড়পাদই এই যুগে সর্বপ্রথম মায়াবাদের অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্তই অলীক এই মতের প্রবর্তন করেন। তাঁহার পূর্বেও এই মতবাদ ছিল, তবে তিনিই প্রথমে ইহার বিহিত প্রচার করেন। আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় জ্ঞানের বৈতথ্য বা অসত্যত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বৌদ্ধগণ যে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন, ইনিও ঠিক সেই যুক্তিগুলি অবলম্বন করিয়াছেন।

ইহার পর আচার্য শঙ্কর নানা উপায়ে মায়াবাদ প্রচার করিয়া ছিলেন। মায়াবাদ ত প্রচারিত হইল। এই মায়া বলিলে কি বুঝায় দেখা যাউক। মায়াশব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে। মায়া শব্দে শিল্পচাতুর্য; সৃষ্টি-শক্তি, ইন্দ্রজাল, রচনা-কৌশল, অলীক-প্রপঞ্চ, ইত্যাদি কত অর্থ হয়। শাস্ত্রে ও সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে মায়া শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মায়াবাদ যে যে মত প্রসিদ্ধ সেই সেই মতই যে বস্তুত একই তাহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আবার মায়া শব্দের যথার্থ অর্থ কি তাহা নিরূপিত না হইলে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না। শঙ্কর কি অর্থে মায়া শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও তৎপূর্বে শাস্ত্র-

কারেরাই বা 'মায়া'কে কি অর্থে লইয়াছেন, ইহা লইয়া একটি বড় গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে।

যদি সর্বত্র মায়া শব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে মায়াবাদ অর্থে যাহা বুঝি তাহা শঙ্করের সৃষ্টি নয়, তাহা যে কোন্ অতীত যুগে সৃষ্ট হইয়াছে, বলা বড় কঠিন। দেখা যাক, গীতায় মায়া সম্বন্ধে কি আভাস পাওয়া যায়।

ভগবান্ বলিতেছেন,

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে॥"

মায়াকে গুণময়ী বলা হইতেছে। বুঝিতে হইবে যে, সত্ব, রজ ও তম এই তিনটি মায়ার গুণ। ভগবান্ বলিতেছেন 'মম মায়া' সুতরাং বুঝিতে হইবে 'মায়া' ভগবানের। এই ত্রিগুণময়ী মায়া আবার জগতের জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আর সেই জন্যই জীব ভগবান্‌কে ভুলিয়া রহিয়াছে। ভগবান্ অব্যয়, দৃশ্য জগৎ পরিবর্তনশীল। একথাও আমরা গীতাতে পাই। ভগবান্ বলিতেছেন,—

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।"

আবার একথাও বলিতেছেন,—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥"

আমরা 'মায়া' শব্দ ও 'প্রকৃতি' শব্দ উভয়ই গীতাতে পাইলাম। আর বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মায়া ও প্রকৃতি একই। প্রকৃতিও গুণময়ী। জীবের কর্তৃত্বও গীতা স্বীকার করিতেছেন না।

জীবের কর্মসকল প্রকৃতির গুণের দ্বারাই হয়, জীবের তাহাতে কর্তৃত্ব নাই। জীবের কর্তৃত্ব একটা আরোপ মাত্র, আর এই আরোপের মূলে 'অহঙ্কার' আছে। তবে কি ভগবান্ নিজ মায়া দ্বারা জীবের

কর্ম সৃষ্টি করিয়া জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির কারণ হইতেছেন। একথাই বা বলি কি প্রকারে? ভগবান্ ত একথাও বলিতেছেন,—

"না দত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥"

তিনি জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির জন্য দায়ী নন। জীবের জ্ঞান অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া; জীব মোহ প্রাপ্ত হয়। তবে কি মায়া তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ?

তিনি বলিতেছেন 'মায়া' আমার (মম মায়া)। আবার বলিতেছেন, এই মায়া জীবকে অভিভূত করে। জীবের কোন কর্তৃত্ব নাই, কর্তৃত্ব মায়ার। সুকৃতি ও দুষ্কৃতি যাহা জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া নিজের উপর আরোপ করে, ভগবান্ তাহার জন্য দায়ী নন। তাহা হইলে ভগবান্ও নিষ্ক্রিয়, জীবও নিষ্ক্রিয়। মাঝে হইতে মায়া আসিয়া সকল প্রকার গোল বাধায়। মায়া যদি ভগবানের হইল, তাহা হইলে অন্তত গৌণভাবে তাহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভগবানের একটি কথায় যেন সকল গোল মিটিয়া যাইতেছে। তিনি এক স্থানে বলিতেছেন—"তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।" তিনি কর্তাও নহেন অকর্তাও নহেন। গীতাতে মায়া অর্থে প্রকৃতি বুঝায়, এ প্রকৃতি কাহার? না, ভগবানের। ভগবান্ পুরুষ, মায়া প্রকৃতি। এই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি। একথা ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন। "প্রকৃতি পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি।" আবার একথাও বলিয়াছেন,—

"ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতি সূয়তে সচরাচরম্।"

আবার বলিতেছেন,—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥"

সকল কথার সামঞ্জস্য করিতে গেলে বলিতে হয়, গীতার মতে ভগবান্ সৃষ্টি ও প্রলয়কর্তা। কারণ তিনিই বলিতেছেন,—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥" কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিকার্যে তিনি

আছি' এই জ্ঞান। এই জ্ঞানই অন্য সকল জ্ঞানের কারণ। বিশেষত ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে প্রবঞ্চনাই করে। যাহাকে আমরা শ্বেতবর্ণ বলি, তাহা একটি মাত্র বর্ণ নহে। বিজ্ঞান বলে, ইহা সাতটি মূল বর্ণের সমষ্টি। আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ আমরা চক্ষে ইহাকে নীলবর্ণযুক্ত দেখি। সূর্য পৃথিবী হইতে অতীব বৃহত্তর অথচ সূর্যকে আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি। সুতরাং ইন্দ্রিয়-সাহায্যে আমরা এ জগৎ যেরূপ দেখি, জগৎ যে তদ্রূপই, একথা বলা যায় না। বিশেষত বস্তু (substance) সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই। বস্তুর আকার (phenomenon) সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়, কিন্তু বস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই হয় না।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই উভয়ের মধ্যে একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। জ্ঞাতা থাকিলেই যখন জ্ঞেয় থাকা চাই, তখন এ উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা অপরিহার্য। আত্মা চৈতন্যময়, সুতরাং আত্মা জ্ঞাতা। সুতরাং আত্মার জ্ঞানকার্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য বিষয় থাকা অপরিহার্য। আত্মার জ্ঞানের বিষয় কি আত্মার বাহিরের বস্তু, না আত্মার ভিতরের বস্তু? যাহার সহিত যাহার অপরিহার্য সম্বন্ধ তাহা তাহার বাহিরের বিষয় হইতে পারে না। কোন বিষয়ের সহিত তাহার বাহিরের বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধ অপরিহার্য হইতে পারে না। চুম্বকের সহিত লৌহের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধ অপরিহার্য নহে, কারণ লৌহ ব্যতীত চুম্বক থাকিতে পারে না। জ্ঞাতার সহিত তাহার জ্ঞেয় বিষয়ের সম্বন্ধ তদ্রূপ নহে, তাহা জ্ঞাতার সঙ্গে সঙ্গেই চিরকাল অবস্থিতি করে। আমার জ্ঞানের বিষয়সকল আমারই ভিতর বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি ছাড়া তাহারা থাকিতে পারে না। পুষ্পের গন্ধ, মধুর মিষ্টতা, আমার বাহিরের বিষয় নহে, আমারই ভিতরের বিষয়। গন্ধ পুষ্পে নাই, আমার মনেতেই আছে, পুষ্পের আকৃতি বাহিরে নাই, আমারই মনোমধ্যে আছে। আমি জানি বলিলেই, আমার

আত্মার একটা বিক্ষিপ্ত অবস্থা বুঝায়। আত্মা যখন বিক্ষেপশূন্য অবস্থায় থাকে, তখন বিষয়সকল (আত্মার জ্ঞানের বিষয়সকল) আত্মার মধ্যেই অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করে। আত্মা বিক্ষেপযুক্ত হইলেই বিষয়সকল ব্যক্তভাব ধারণ করে। "বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগদ্‌রূপে ভাসমান অচেতনশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বিজ্ঞানের সমষ্টিরূপ চক্রের অন্য একটি নাম প্রকৃতি। যখন আত্মা এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধ্যক্ষরূপে দৃষ্ট হন, তখন তাহাকে পরমাত্মা বা জগদ্ধাত্রী বা আদ্যাশক্তি বা ঈশ্বর বলা হয়, এবং যখন তিনি এই মায়াময়ী প্রকৃতির অধীনরূপে দৃষ্ট হন তখন তিনি জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। আর যখন প্রকৃতিকে মায়াময়ী বলিয়া পরিত্যাগ করা যায় তখন কেবল একমাত্র সৎ-চিৎ-আনন্দ আত্মা অথবা চিন্ময়ী শক্তি বিদ্যমান থাকেন, তখন আর ব্যাবহারিক দ্রষ্টা, দৃষ্টি, দৃশ্য, পূজ্য, পূজক এবং পূজা; জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এবং জ্ঞান, স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং সৃষ্ট, পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং মায়া প্রভৃতি ত্রিপুটীভাব থাকে না। কেবলমাত্র সেই অদ্বয় আত্মা মাত্র থাকেন।"[১]

শঙ্করাচার্য উপনিষদ্‌ভাষ্যে বৌদ্ধদিগের বাহ্যর্থবাদ, বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ এবং শূন্যবাদ খণ্ডন করিবার জন্য বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২. ২. ২৮-৩২) তিনি বৌদ্ধ দার্শনিকগণের এ সকল মতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শঙ্করের সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ দার্শনিক মতের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। শঙ্কর বৌদ্ধদিগের মতবাদের প্রভাবে বিব্রত হইয়া ২য় অঃ, ২য় পাদ, ২৬ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়া ফেলিয়াছেন, "বৈনাশিকৈঃ সর্বো লোক আকুলী ক্রিয়তে" —বৈনাশিক অর্থাৎ বৌদ্ধগণ সমস্ত লোককে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। শঙ্কর বিজ্ঞানবাদ (idealism) খণ্ডন করিয়া তাঁহার মায়াবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে,

১ মহাম° তর্কভূষণ কৃত ভামতীভাষ্য বিবৃতি।

যেগুলি বিজ্ঞানবাদের দোষ বলিয়া পরিচিত সেগুলি সমস্তই শঙ্করের মায়াবাদে সংক্রামিত হইয়াছে। এগুলি তাঁহার ত্রুটিতে প্রবিষ্ট যদি না হইয়া থাকে অন্তত তাঁহার সাম্প্রদায়িকগণের ত্রুটিতে শঙ্করের মায়াবাদকে দুষ্ট করিয়াছে।

শঙ্কর বলিতেছেন—"অনুপপন্নোয়মভাবভাবোৎপত্যভ্যুপগমঃ" (২. ২. ২৭) অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি—বৌদ্ধদিগের এই মত অযৌক্তিক। কিন্তু পঞ্চদশী উপদেশ করিলেন—প্রাগভাবযুতং দ্বৈতম্" (৬. ২৫৫)। দ্বৈত পূর্বে অভাবমাত্র ছিল। পঞ্চদশীর এই মায়াবাদে বৌদ্ধ শূন্যবাদেরই ছায়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। একদিকে বৌদ্ধদিগের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া শঙ্কর বলিতেছেন—"যাহা নিশ্চিত বলিয়া অনুভূত হয়, যথা এই বস্তুই 'এইরূপই', তাহা স্বীকার করা কর্তব্য। তাহার বিপরীত যাহা কিছু বলা হয়, তাহাতে বক্তার বহুপ্রলাপিত্ব মাত্রই প্রকাশ পায়" (২. ২. ২৫)—কিন্তু পঞ্চদশীকার এই সত্যের অপলাপ করিয়া বলিতেছেন—"কোথায় বা বীজ, কোথায় বা বৃক্ষ, এ সকল মায়া বলিয়া জানিবে"—এইরূপে যদি শঙ্করের উক্তি এবং পঞ্চদশীর বচনাবলী তুলনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যাইবে যে পঞ্চদশীয় মায়াবাদ বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদের বৈদান্তিক সংস্করণ মাত্র। আর পঞ্চদশীকার যে অর্থে মায়াবাদী—শঙ্কর কখনই সেই অর্থে মায়াবাদী নন।

আমাদের বোধ হয়, বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদ তৎকালীন জনগণের হৃদয়ে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, শঙ্কর তাহা বহু চেষ্টা করিয়াও নির্মূল করিতে পারেন নাই। আপনারা সকলেই শঙ্করের নির্দিষ্ট ব্যাবহারিক দ্বৈত ও পারমার্থিক অদ্বৈতমতের কথা অবগত আছেন। জর্মান দার্শনিকদিগের মধ্যে Kant ও Fichth এবং ইংরেজ দার্শনিকদিগের মধ্যে Hamilton ও Mill এই ব্যাবহারিক ও পারমার্থিকের ভেদ বিষয়ে শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী হইয়াছেন। শঙ্কর ব্যাবহারিক দ্বৈত কখনও অস্বীকার করেন না।

তবে শঙ্করের সঙ্গে Kant প্রভৃতির পার্থক্য এই যে তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময়ের প্রচলিত পৌরাণিক 'মহাপ্রলয় মত' অঙ্গীকার ও সমর্থন করিয়াছেন। মহাপ্রলয়ে নির্বিশেষ ব্রহ্ম মাত্র থাকেন। বিশ্বপ্রপঞ্চের লয় হয়। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মের নির্গুণ বা নির্বিশেষ স্বরূপের সহিত ব্রহ্মের সগুণ বা সবিশেষ স্বরূপের বা ঈশ্বরের এক মহাবিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। মহাপ্রলয়ে সবিশেষ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অপরাপর প্রাণিগণের ন্যায় থাকেন না, অথবা শক্তিরূপে মাত্র অবস্থান করেন। এই জন্যই শঙ্করের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য, বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং সেই সঙ্গে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরও আপেক্ষিক সত্য মাত্র। যাহা হউক ব্যাবহারিক জগৎ সম্বন্ধে ইহাই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ সকলেই সত্য। শঙ্করের মতে পারমার্থিক সত্যের তুলাদণ্ড করিয়া কথা বলিতে গেলে, ব্যাবহারিক মিথ্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে মিথ্যা আপেক্ষিক বা তুলনায় মিথ্যা মাত্র। তাহা বলিয়া ব্যাবহারিকের নিজের মধ্যে কখনও কোন মিথ্যাত্ব নাই।

বস্তুত শঙ্করের কথায় এই সূক্ষ্ম তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই শঙ্করের সাম্প্রদায়িকগণ অনেক স্থলে পারমার্থিক এবং ব্যাবহারিক মিশাইয়া, ইতরেতর অধ্যাস দ্বারা গোলমাল করিয়া, শঙ্করের মায়াবাদে বৌদ্ধ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের এবং শূন্যবাদের দোষ সংক্রামিত করিয়াছেন।[১]

১ পণ্ডিত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া উল্লিখিত তিনটি বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহারই মত গ্রহণ করিয়াছি।

বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন

ধর্ম লইয়াই দর্শন। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম। জীবনযাপনের স্থায়ী অনুশাসনই ধর্ম। ইহকালে ও পরকালে সুখশান্তি ও আনন্দ লাভ করিবার জন্য, শান্ত ও নির্ভীকচিত্তে দেহত্যাগ করিবার শক্তিলাভ করিবার জন্য মানুষ ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। এরূপ করিতে গিয়া মানুষ দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে জীবনে খাপ খাওয়াইয়া আনুষ্ঠানিক অভ্যাসে পরিণত করিতে চায়। জীবনে সেগুলিকে অনুষ্ঠানের মধ্যে চালাইবার এই যে প্রযত্ন বা প্রচেষ্টা তাহাই ধর্ম।

এত বড় পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা বড় কম নয়। কত জাতির সহিত কত ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার কালে লোপ পাইয়াছে। এক জাতি অন্য জাতির সংঘর্ষে আসিয়া যখনই সে আপনার হীনতা বা ভ্রম উপলব্ধি করিয়াছে, তখনই সে অপর জাতির মহত্ত্ব বরণ করিয়া লইয়াছে। মানুষের ন্যায় ধর্মেরও শত্রু আছে। সাধারণত আমরা ধর্মবিশেষের ও ধর্মমাত্রেরই দুইটি শত্রু দেখিতে পাই। একটি কোন প্রবল বিরোধী ধর্ম, আর একটি জ্ঞান-বৃদ্ধি এবং জ্ঞানবিস্তার। বিরোধী প্রবল ধর্মের নিকট হীনবল ধর্ম কতবার যে মাথা নত করিয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষী। আবার পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া এরূপও দেখা গিয়াছে যে, যখনই যেদেশে জ্ঞানের সঞ্চয় ও জ্ঞানের প্রচার বিস্তৃতভাবে হইয়াছে, তখনই সে দেশে কোন না কোন আকারে ধর্ম-বিপ্লব ঘটিয়াছে—ধর্মসম্বন্ধীয় প্রচলিত মত ও বিশ্বাস কোথাও অল্পাধিক পরিবর্তিত, কোথাও বা একেবারে ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানপ্রচার চিরকালই মিথ্যার শত্রু; যেখানে জ্ঞানের বিস্তৃতি, সেখানে মিথ্যা টিকিতে পারে না। ভ্রম জ্ঞানের দুটি চক্ষের বিষ। কাজেই জ্ঞানপ্রচার ভ্রমপূর্ণ অপধর্ম মাত্রেরই চক্ষুশূল। এইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা অপধর্ম

যাজন করেন, তাঁহারা চিরকাল জ্ঞানবৃদ্ধি ও জ্ঞানপ্রচারের প্রতিকূল। কিন্তু কেন এরকম হয়? একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, প্রতিকূল জ্ঞানপ্রচারে যাহাদের আতঙ্ক হয়, তাহাদের ধর্ম বিজ্ঞান-সম্মত নয়। সে ধর্ম উপধর্ম বা অপধর্ম। মানুষকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে কতদিন বঞ্চিত রাখা যায়? ভগবানের রাজ্যে একদিন তাঁহার কৃপায় তাহার ভুল ভাঙিয়া যাইবে। সে যে স্বাধীন চিন্তাকে ভয় করিত, ধীরে ধীরে তাহাই তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। সেদিন আর সে অপধর্মে বিশ্বাস রাখিতে পারিবে না; ফলে স্বাধীন চিন্তার ও তত্ত্বজ্ঞানের সে আর বিরোধী হইতে পারিবে না।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিন্তু এ সকল কথা খাটে না। বেদানুসারী এই ধর্মের দুই প্রকার শত্রুরই অভাব। এমন কোন ধর্ম পৃথিবীতে নাই, যাহা হিন্দুধর্মের যথাযোগ্য ও প্রবল শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বৈদিক ধারানুবর্তী এই ধর্ম শত সংস্করণে সংস্কৃত, শত সংঘর্ষে দৃঢ়ীকৃত, শত বিচারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং শত পরীক্ষায় পরীক্ষিত। জগতের কোন ধর্মই এমন ধ্যানপ্রসূত, শতধৌত ও মার্জিত নয়।

বৈদিক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের আর্যধর্ম নিবদ্ধ। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে, কালগত প্রয়োজনের সঙ্গে পর পর যুগে এই ধর্মে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য, সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে প্রাচীন বৈদিক ধারা অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে কেহ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু বেদসম্মত ক্রমের অনুকূল ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত থাকায় বৈদিক ধর্ম হইতে পরবর্তী ধর্মের বিচ্ছেদ ঘটিবার অবকাশ হয় নাই। সুতরাং বৈদিক ধারা সতত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং অনবরত তাহাতে সুস্নাত হইয়া পরবর্তী যুগের ধর্ম 'সনাতন ধর্ম' নামেই পরিচিত রহিয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণবধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম কোন্ সময় হইতে কি ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহার যথাযথ ক্রম জানিবার কোন বিশেষ উপায় নাই। বৈদিকযুগে বৈষ্ণবধর্ম থাকিতে পারে—ইহার পরযুগে বৈষ্ণবধর্ম ছিল একথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাৎকালীন বৈষ্ণবদিগের উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। প্রত্যুত বিশেষরূপ বিচার করিয়া দেখিলে রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগের পূর্বে বৈষ্ণবধর্মের কোনরূপ ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। এই যুগের পুর্বে বৈষ্ণবধর্ম-পদ্ধতি অথবা বৈষ্ণব-দর্শন-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারা যায় নাই। তবে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব সে সময়ের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশের একজন বড় দার্শনিক বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের দিক্ দিয়াই দেখ আর ভক্তির দিক্ দিয়াই দেখ, দেখিবে 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যে নিবদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান জ্ঞানেরও যেমন চরম, ভক্তিরও তেমনই চরম। কিন্তু সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মভেদে এই বাক্যের অনুভবের পার্থক্য আছে, আর সেই অনুভব লইয়া চিত্তবৃত্তির প্রবাহেরও পার্থক্য আছে। উপনিষদ্-বাক্যের সমন্বয়ে ঋষি বাদরায়ণ ব্রহ্মনিরূপণ করিতে গিয়া প্রথমেই সবিশেষ ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রুতির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে উক্ত দার্শনিক হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের মত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

'যে সকল শ্রুতি নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় বলিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সবিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিচার করিলে সবিশেষ ব্রহ্মপথেই শ্রুতিবাহুল্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

'সকল উপনিষৎ দোহন করিয়া, বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই সবিশেষ ব্রহ্মকেই ভক্তিমার্গের ভিত্তি করিয়াছেন। জীব ও জগৎ লইয়া ব্রহ্ম সবিশেষ। জীব ও জগৎ লইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। জীব ও জগৎ লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত সাধনা ও অনন্ত

লীলা। সেই সাধনা ও লীলার সাধারণ নাম বৈষ্ণবদর্শন বা ভক্তি।'

ভক্তিবাদ যে খুব প্রাচীন তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক সূক্তগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাবে পরিপূর্ণ। যাস্কের নিরুক্তের উপর দেবরাজযজ্বের নির্বচন টীকায় দেবতাদিগের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—'দাতারোঽভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ' অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন তাঁহারাই দেব।

আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনা-কাণ্ডের উপর ভক্তিমার্গ সংস্থাপিত। কাজেই রামানুজ, মধ্বাচার্য, বলদেব-প্রমুখ বেদান্ত-দর্শনের ভক্তিবাদিগণ উপনিষৎকেই তাঁহাদের মহাকাব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কঠোপনিষৎ ও চতুর্বেদশিক্ষায় ভক্তিবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। নীলকণ্ঠ মহাভারত-ভাষ্যে ভক্তির বৈদিক উৎপত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ভক্তিশব্দ যে খুব প্রাচীন তাহা নয়। বেদ বা প্রাচীনতম উপনিষদে ভক্তিশব্দের উল্লেখ নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভক্তিশব্দের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

অর্থাৎ "এই যে সমস্ত সত্যের কথা বলা হইল, এগুলি যদি এরূপ মহাত্মার নিকট কীর্তিত হয় যাঁহার ঈশ্বরে পরাভক্তি আছে এবং ঈশ্বরের প্রতি যেরূপ, গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, তাহা হইলে ইহারা নিশ্চয়ই তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইবে।" এই শ্লোকে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিতই বলা হইয়াছে। অধুনা আমরা যাঁহাকে ভগবদ্‌বিগ্রহ বলিয়া থাকি, শ্বেতাশ্বতরের 'দেব' বলিতে প্রায় তাহাই বুঝায়। এই উপনিষৎখানি অন্যান্য প্রাচীন উপনিষদের পরবর্তী কালের—কিন্তু ভগবদ্‌গীতার

কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী। আমার মনে হয়, এই শ্লোকের ভক্তিশব্দ হইতেই পারিভাষিক ভক্তিশব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। আর এইরূপ হওয়াও বিচিত্র নয়। নূতন ধর্মমত বুঝাইবার জন্য নূতন শব্দের প্রয়োজন হইয়া পড়িলে অনেক সময় তৎকাল প্রচলিত শব্দ হইতেই পরিভাষা প্রণয়নের রীতি দেখা যায়। তখন সেই পরিভাষার অর্থ পুরাতন অর্থকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলিয়া না দিলেও ইহার নূতনত্বের একটা প্রকৃষ্ট বিশেষত্বই বজায় রাখিয়া দেয়। এমন কি পাশ্চাত্য গ্রীক ধর্ম বা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম অথবা English Evangelical School-এ ও এরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষে ভক্তিশব্দ উৎপন্ন হইয়া পরে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় পারিভাষিক শব্দরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অধ্যায়ে, বিশেষত নারায়ণীর পর্বাধ্যায়ে মুমূর্ষু ভীষ্মের উক্তিতে, সংজ্ঞাত্মক ভক্তিশব্দের উল্লেখ আছে। গীতায় যে কেবল একমাত্র ভক্তিরই উপদেশ আছে তাহা নয়, তবে সংস্কৃত সাহিত্য হিসাবে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় গীতার পূর্বে স্পষ্টত ভক্তিতত্ত্ব কোথাও উপদেশ করা হয় নাই। ছান্দোগ্য, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে ভক্তিবাদের আভাস আছে বটে, কিন্তু স্পষ্ট ভক্তিশব্দ নাই। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের পূর্বে ভারতবর্ষে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে চিন্তাধারা যেরূপ বিকশিত হইয়াছিল এবং তাহা যেরূপ প্রচলিত ছিল ভগবদ্‌গীতাতেই তাহার সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হইয়াছে। ভক্তি গীতার একমাত্র আলোচ্য বিষয় না হইলেও ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। উপনিষদ্‌নিচয়ে মন, সূর্য, চন্দ্র বা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী পুরুষ, অন্ন প্রভৃতি পদার্থকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা দ্বারা উপাসিতব্য পদার্থকে এত বড় করিয়া এমনই গৌরবান্বিত করিয়া তোলে যে তাহাতে উপাসকের হৃদয়ে তদ্‌বস্তুর প্রতি একান্ত প্রশংসা—ভালবাসার উদ্রেক করিয়া দেয়। আবার বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ্

অন্তরতরং যদয়মাত্মা।”—১.৪.৮। এই অন্তরতম আত্মা পুত্র, ধন এবং অন্য সমস্ত যাহা কিছু তদপেক্ষা প্রিয়।

এই উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আছে—“স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তমসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি এতদ্ধস্ম বৈ তৎ পূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি।”—“ইনি সেই মহান্ অজ আত্মা, যিনি প্রাণাদির মধ্যে বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়ের অন্তরাকাশে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি সকলের বশী, সকলের শাসক, সকলের অধিপতি। সাধু বা অসাধু কর্ম করিয়া তিনি সাধু বা অসাধু হন না। তিনি সর্বেশ্বর, তিনি লোক সমুদয়ের পরস্পর সংযোজক-সেতু এবং তিনিই ইহাদের সম্ভেদ নিবারণ করিয়া ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবিধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ বেদ বচনদ্বারা যজ্ঞ, দান ও তপশ্চর্যাদ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাকে যিনি জানিতে পারেন তিনি মুনি হইয়া যান। প্রব্রাজিগণ তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এই নিমিত্তই পূর্বে জ্ঞানিগণ প্রজা কামনা করিতেন না; তাঁহারা বলিতেন—যখন আমরা এই আত্মাকে পাইয়াছি তখন প্রজা লইয়া আমরা কি করিব? এইজন্যই তাঁহারা পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন।” এখন বলুন দেখি যখন এই প্রাচীন জ্ঞানিগণ সেই ভূমা ব্রহ্মে অবস্থিতি করিবার জন্য, তাঁহাকে উপাসনা করিবার জন্য পৃথিবীর সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য

পরিবর্জন করিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা কিসের প্রেরণায় এই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন? ভগবানের প্রতি ভক্তি-প্রণোদিত না হইয়া কি ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? ভক্তিশব্দ স্পষ্ট না থাকিলেও ভক্তিভাব যে ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পৃথিবীতে ও মানব-হৃদয়ে পরমাত্মার দর্শনজনিত আনন্দ সম্বন্ধে এই সমস্ত ওজস্বিনী উক্তির মূলে কি এমন কোন ভাব নাই যাহা ভক্তিপদবাচ্য? আর ঋগ্বেদের ঋক্‌গুলি যখন উদাত্তস্বরে উদ্গীত হইয়াছিল, তখন ঋগ্-রচয়িতা ঋষিদের হৃদয়ে যে ঈশ্বর বা দেবতার প্রতি একটা ভক্তির ভাব, ভালবাসার ভাব সর্বদা জাগরূক ছিল ইহা কে অস্বীকার করিবে? 'দ্যৌ তুমি আমার অমঙ্গল ঘুচাইয়া দাও' —'পিতা যেমন পুত্রের সুলভ তুমি আমাদের নিকট সেইরূপ সুগম হও।' 'সেই অদিতি—অসীমই আমার দ্যৌ, অন্তরীক্ষ—অদিতি আমার পিতা, মাতা, পুত্র—অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরীক্ষমদিতির্মাতা পিতা পুত্রঃ'—ঋ° ১. ৮৯. ১০.। দ্যৌ আমার জনিতা পিতা—দ্যৌর্মে জনিতা পিতা—ঋ° ১. ১৬৪. ৩২।

এই যে প্রার্থনা এগুলি কি প্রতিপন্ন করিতেছে? যদিও পরবর্তী যুগের যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ড এই সমস্ত ঋষি-বচনের ভাবগুলি নষ্ট করিয়া দিয়া শুধু মুখস্থ সূত্রে পরিণত করিয়াছিল, তথাপি এই ঋগ্বচনগুলি প্রথমে ঈরিত হইবার সময় ঋষিদিগের হৃদয়ে যে ভাবের তরঙ্গ খেলিতেছিল তাহার ক্রম-ভঙ্গ হয় নাই—তাহা বরাবরই চলিয়াছিল, কিছুদিনের জন্য থমকাইয়া থাকিলেও সেই ভাব পুনরায় আশ্চর্যভাবের সহিত মিলিত হইয়া উপনিষদের সময় দেখা দিয়াছিল। তবে এই ভাবের অস্তিত্ব যে উপনিষদের পূর্বে ছিল না এ কথা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য, তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। মুণ্ডক-উপনিষদ্ ঋক্-সংহিতার ১. ১৬৪. ২০ ঋকের পুনরুক্তি করিয়া রূপকের ভাষায় বলিয়াছে—দুইটি সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে অধিষ্ঠিত আছে। তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তাহাদের মধ্যে

একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে; অপরে ভক্ষণ করে না, শুধুই দেখে। একই বৃক্ষে একজন (জীব) নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে; কিন্তু যখন সে অন্যকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায়, তখন সে তাহার মহিমা, অনুভব করিয়া শোকের অতীত হয়।

“দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥”

মুণ্ডক-উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় শ্লোকে এবং কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় বল্লীর ২৩ শ্লোকে উপদেশ করিতেছে—

“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।”

“এই আত্মাকে প্রবচন বা শাস্ত্রবাক্য দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারাও নহে এবং বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও লাভ করা যায় না। পরন্তু এই উপাসক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন অর্থাৎ পাইতে ইচ্ছা করেন, সেই বরণ বা পাইবার ইচ্ছা দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। তাঁহাকে পাইবার জন্য যে তীব্র বাসনা তাহা দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। এই আত্মা তাহার নিকটে আপনার স্বরূপ তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।”

বৃহদারণ্যক (৩. ৭) ও কৌষীতকী-ব্রাহ্মণ-উপনিষদেও (৩. ৮) এইরূপ ভক্তিভাবদ্যোতক শ্লোক আছে। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উপনিষদের সময় এইরূপ একটি মত প্রচলিত ছিল যে, জীবাত্মা পরমাত্মার অধীন এবং জীবাত্মা পরমাত্মাকে পাইবার জন্য লালায়িত। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে ভগবদ্গীতার ঐকান্তিকধর্মের সমস্ত উপকরণই পূর্ব পূর্ব দার্শনিক সাহিত্যে নিবদ্ধ ছিল। অবশ্য ভালবাসা

অর্থে ভক্তি শব্দ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। গীতা যে সর্বদর্শনসমন্বয়-গ্রন্থ এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। গীতাতে সাংখ্য ও যোগ-শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত হইয়া সপ্রমাণ করিতেছে যেন এই দুইটি মত পূর্বে সম্পূর্ণভাবে সম্বদ্ধ ছিল।—

'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগেত্বিমাং শৃণু।'

'তোমাকে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহা সাংখ্যের অন্তর্গত, এক্ষণে যোগশাস্ত্রে যাহা বলে তাহা শ্রবণ কর।' গীতা যে পদ্ধতিতে লিখিত তাহাতে ইহাকে দর্শনসমন্বয়-গ্রন্থ বলা অন্যায় নয়। তবে ইহাতে সর্বোপরি একটি নূতন তত্ত্বের বীজ উপ্ত আছে—তাহা মাত্র অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম করিতেছে। এই তত্ত্বটি ভগবদ্‌বিগ্রহে ভক্তি। এ ভক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি নয়—ইহা সবিশেষ ভগবানের প্রতি। গীতা ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবেরই কথা অন্যত্র বিবৃতি করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তি সম্পর্কে সগুন ব্রহ্মকেই বিশেষ করিয়াছেন। বাস্তবিক 'অনন্ত সাগরের যে নিবাত-নিষ্কম্প, প্রশান্ত নিথর অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব আর সমুদ্রের যে লহরী-সঙ্কুল বীচি-বিক্ষুব্ধ সফেন তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ। একই ব্রহ্ম কখনও নির্গুণ—কখন সগুণ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্তভাব ধারণ করিতেছে; পরব্রহ্ম মায়া-যবনিকার আবরণে সগুণ—সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নির্গুণ—নিস্তরঙ্গ হইতেছেন! পর্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের এই দুই অবস্থা, পর্যায়ক্রমে ব্রহ্মের এই দুই বিভাগ। তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্মজ্যোতি কখন সঙ্কীর্ণ সসীম হইতেছেন, আবার তিরস্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতি অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন।'—(ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ ১৪ পৃঃ)। পূর্বেই বলিয়াছি গীতায় ভক্তিবাদের অঙ্কুরমাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে পরযুগের বিস্তৃতি বা উচ্ছ্বাস আদৌ নাই সত্য, তথাপি ইহা যে ধর্ম

ও দর্শনের চিন্তাধারায় নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছে গীতাই তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়েই ভক্তি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আর এই অধ্যায়ই বিরাট্‌রূপ-দর্শনের অব্যবহিত পরবর্তী অধ্যায়। বিরাট্‌রূপ-দর্শনের পর ভক্তি ব্যতীত বোধ হয় আর কোন বিষয়ের অবতারণা যুক্তিযুক্তও হয় না। যাহা হউক এই অধ্যায়ে ভক্তিশব্দের মাত্র দুইবার উল্লেখ আছে; আর সমগ্র গীতায় এই শব্দের উল্লেখ মাত্র ১৪ বার হইয়াছে (৭ম অঃ ১৭ শ্লোঃ, ৮ম—১০, ২২; ৯ম—১৪, ২৬, ২৯; ১১শ—৫৪; ১২শ—১৭, ১৯; ১৩শ—১০; ১৪শ—২৬; ১৮শ—৫৪, ৫৫, ৬৮)। অবশ্য ভজ্ ধাতু নিষ্পন্ন 'ভক্ত' ও 'ভজামি' পদের উল্লেখ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সাগ্রহ পূজার্থেই ভজ্ ধাতু প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ভক্তি শব্দের দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি অর্থ (১) পূজনীয় বিষয়ে অনুরাগ, পূজা, সেবা। এটি সামান্য অর্থ। আর একটি অর্থ পারিভাষিক—(২) ভগবানে বিশেষরূপ অনুরক্তি। গীতায় উল্লিখিত ১৪টি উদাহরণে ভক্তি এই পারিভাষিক অর্থে সকল স্থানে ব্যবহৃত বলিয়া বোধ হয় না। যেমন, অষ্টম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে সম্ভবত পারিভাষিক অর্থে ভক্তি ব্যবহৃত হয় নাই। ৯ম অঃ২৬ ও ২৯ শ্লোকে ভক্তি বিশেষরূপ পূজানুরক্তি অপেক্ষা কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়। ২৬ হইতে ২৯ পর্যন্ত সমস্ত শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭
শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮
সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥'২৯

পত্র, পুষ্প, ফল বা জল, যিনি যাহা ভক্তিপূর্বক আমাকে দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিপ্রদত্ত পদার্থ প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর বা হোম কর, দান বা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে। এইরূপে সাধনা করিলে জীব শুভাশুভ কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। তুমি এইরূপ সন্ন্যাস-যোগযুক্তাত্মা হইয়া কর্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ পূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্বজীবের পক্ষেই একরূপ; আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থিতি করে। আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি।

উল্লিখিত শ্লোকের ভক্তির অর্থ অন্যরূপ। ইহার যদি পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে এখানে পুনরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে। গীতার এই শ্লোককয়টি পড়িলেই মে, ময়ি প্রভৃতি পদের প্রতিই প্রথম লক্ষ্য হয়। ভক্তিযোগাধ্যায়ে ভক্তির ব্যাখ্যা আমাদের উদ্ধৃত শ্লোক অপেক্ষা বড় বেশী অগ্রসর হয় নাই। এইখানে এবং অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই যে, অমুক ব্যক্তি ভগবানের প্রিয়; কিন্তু কোথাও এরূপ উক্তি নাই যে ভগবান্ মানুষের প্রিয়, আর মানুষ ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারে। আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি আত্মাকে ভগবানে অর্পণ এবং আত্মসম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তুর ভগবানে সমর্পণ—ইহাই গীতার ভক্তি। পরস্পরের প্রীতির আদান-প্রদানের ব্যাপারও গীতাতে অভিব্যক্ত হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে গীতাই ভক্তিশাস্ত্রের বেদ, আর গীতার ভক্তিই ভক্তির প্রথম তরঙ্গ। ইহার পর সহস্র বৎসরের মধ্যে ভক্তির অভিব্যক্তির আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। গীতার সময় বর্তমান কাল হইতে প্রায় ২৫০০ বৎসর। গীতা-রচনার কিঞ্চিৎ পূর্বে কৃষ্ণ যে অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গোপালকৃষ্ণের পূজা অবলম্বন করিয়াই ভক্তির দ্বিতীয় তরঙ্গের

অভিব্যক্তি হইয়াছে। এখন হইতে ১৫০০ বৎসরের পূর্বে কোন সময়ে দ্বিতীয় তরঙ্গের বিকাশ হয়। কিন্তু ১৫০০ বৎসর পরে সাহিত্যে সেই অভিব্যক্তির লক্ষণ সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতেই ভক্তির তৃতীয় তরঙ্গের প্রবৃত্তি। এই সময় হইতেই ভক্তির নানারূপ ব্যাখ্যা ও বিবৃতি ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় হইতেই ধর্মে আবেগ—উচ্ছ্বাসের প্রকৃষ্ট সূচনা। দক্ষিণ-ভারতে "শ্রীরামচন্দ্র" ভক্তদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন—উত্তর ও মধ্যভারতে এবং বঙ্গদেশে 'শ্রীকৃষ্ণ'—দাক্ষিণাত্যে ও কর্ণাটের পশ্চিমাঞ্চলে "বিট্‌ঠল" সাধক ও ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভক্তির তৃতীয় তরঙ্গের বিবৃতিব্যঞ্জক যে সমস্ত গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে নারদপঞ্চরাত্র ও স্বপ্নেশ্বর টীকা সমন্বিত শাণ্ডিল্য-কৃত ভক্তিসূত্র বিশেষভাবে উল্লেখ্য। নারদপঞ্চরাত্র মহাকাব্যের ধরনে একখানি সুদীর্ঘ গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত আছে যে, নারদকে সাধ্য-সাধনা করিয়া কৈলাসে পাঠানো হইল, উদ্দেশ্য, তিনি গিয়া শিবের সহিত কৃষ্ণপূজার প্রয়োজন সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আসিবেন, কৈলাসে একটি বেশ দৃশ্যের অবতারণা, পৌরাণিক সমস্ত দেবতাকে লইয়া কৃষ্ণের স্তুতি গান, এখানি ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অবশ্য পাঠ্য-পুস্তক—ইহাতে বহু কর্মকাণ্ডের মন্ত্র ও প্রার্থনার একটি প্রকাণ্ড বিবরণ আছে, এইগুলি পাঠ করিলে গ্রন্থখানিকে নিতান্ত কৃত্রিম বলিয়াই মনে হয়। বিশেষত এই গ্রন্থের রচনাভঙ্গী একেবারে হীন।

তারপর ভক্তিসূত্রের কথা, সূত্রকার বা টীকাকারের সময় জানিতে পারি নাই, এই সূত্রগ্রন্থ সম্ভবত বঙ্গদেশেই রচিত হইয়াছিল। সূত্রকার ভক্তির ভাব সম্পূর্ণভাবে কীর্তিত করিয়াছেন, সূত্রগুলি যদিও প্রাচীন সূত্রের আকারে রচিত তথাপি ইহা যে ১১শ খ্রীস্ট শতকের পূর্বের গ্রন্থ নয় তাহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে, আমার বিশ্বাস সূত্রকার বা টীকাকার একই ব্যক্তি। প্রথম সূত্রেই

এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে। 'অথাতো ভক্তি-জিজ্ঞাসা'—কোন কোন সংস্করণে আছে—'অথাতো ভক্তি-জিজ্ঞাসা বা পরাণুরক্তিরীশ্বরে', ইহার টীকা হইতেছে, "অথেত্যাধিকারার্থো নানন্তর্য্যার্থঃ। আনন্তর্য্যং হি ন স্বাধ্যায়নস্য আনিন্দযোগ্যধিকৃতের্বক্ষ্যমাণত্বাৎ" ভক্তিলাভের জন্য প্রারম্ভে বেদ পাঠ বা যোগভ্যাস প্রভৃতির আবশ্যক নাই। দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যে—'ঈশ্বর ইতি প্রকৃতাভিপ্রায়ং। আরাধ্যবিষয়করাগত্বমেবসা,"—আরাধ্য বিষয়ে যে অনুরাগ তাহাই ভক্তি। ঈশ্বরে পরাণুরক্তির নামই ভক্তি। পরা এই পদ দ্বারা পরা এবং গৌণী এই দুই প্রকার ভক্তি বুঝিতে হইবে। পরমেশ্বর বিষয়ে অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষই পরাণুরাগ নামে অভিহিত, তাহাই ভক্তি। উপাসনা, পরমেশ্বর বিষয়ে পরম প্রেম। "নহীষ্টদেবাৎ পরমস্তি কিঞ্চিৎ"—ইষ্টদেব হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, এইরূপ বুদ্ধিপূর্বিকা চিত্তবৃত্তির নাম, ভক্তি। ইহা প্রীতির অধীন। বিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে ২০শ অধ্যায়ে ১৯, ২০ ও ২৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "হে ভগবান্, আমি যে কোনও প্রকার জন্ম পরিগ্রহণ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে, অবিবেকীদের বিষয়ে যেমন প্রীতি থাকে, তোমাতে যেন আমার তাদৃশী প্রীতিই অবিচলিত হয়।"

এখানে যে প্রীতি পদের উল্লেখ আছে, ঐ প্রীতি-অর্থে বৈষ্ণবগণ "সুখনিরত রাগ" বুঝিয়া থাকেন।

ভারতে ভক্তিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ধারণ করিয়াছিল। মধ্যযুগের বৈষ্ণবধর্ম ভারতের দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়া রামানুজ ও মধ্বাচার্য কর্তৃক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, এই বৈষ্ণবধর্ম শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় নূতন আকারে নিরক্ষর ও নির্মম হৃদয় ব্যক্তিদিগের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল এই সময় সমস্তই বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। বৈষ্ণব সকলকেই আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দান করিলেন। বৈষ্ণব

এই সময় বৃন্দাবনের 'শ্রী' ভাল করিয়া উজ্জল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন তাঁহাদের নিকট তীর্থের সার এবং আশ্রমের শিরোমণি বলিয়া পরিগণিত হইল। বাঙলার বাহিরে ইতঃপূর্বেই বৈষ্ণবধর্ম নূতন শ্রেণীর স্থাপত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এক্ষণে বাঙলার সীমার মধ্যে এক বিরাট্ কীর্তি স্তম্ভ রচনা করিল।—বাঙলা ভাষার উপাদান দিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য রচিত হইল। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব এই শস্যশ্যামলা বাঙলার মাটিতেই হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা ধর্মের যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন—তাহা সমগ্র ভারতকে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

রাধা, কৃষ্ণ ও গোপী কথাকে কেন্দ্র করিয়া গৌর নিতাই প্রেম ও ভক্তির চক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ভক্তি তরঙ্গ ছুটিয়াছিল।

দশম ও একাদশ শতকে পালরাজারা বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্মের কোনরূপ ক্ষতি হয় এরূপ কোন কাজই তাঁহারা করিতেন না! হিন্দুমন্দির তাঁহাদের দান ছিল। তাঁহারা সাধারণত ব্রাহ্মণকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিতেন। আর এই মন্ত্রীর বৌদ্ধমন্দিরে হিন্দুমূর্তির স্থান করিয়াও দিতেন। এই সময়ে বঙ্গের বহুলিপিতে 'বিষ্ণুমন্দির'-নির্মাণের কথা পাওয়া যায়।

তারপর কর্ণাট-ক্ষত্রিয় সেন রাজারা বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিলেন। তাঁহারা ছিলেন বৈষ্ণব। সকল লিপিতেই তাঁহাদের কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। একটা খুব প্রবল মত আছে যে চেদি-রাজ কর্ণ যখন বাঙলায় আসেন তখন শ্রীমদ্ভাগবতের ধর্ম বঙ্গে প্রবর্তিত হয়! এ মত সত্য হওয়া সম্ভব। কেননা দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের সূত্রপাত। এই সেন রাজাদের সময়ে জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ' রচিত হয়। এই গ্রন্থের আরম্ভ এক নূতন প্রণালীতে—অভিনব উপকরণে। নন্দনিদেশ গ্রাম হইতে ভীরু

কৃষ্ণকে লইয়া রাধা মেঘমেত্বর রাত্রিতে শ্যামতমালক্রম বনভূমি দিয়া চলিয়াছেন।—"মেঘৈর্মেত্বরম্বরম্ বনভুবঃশ্যামাস্তমালক্রমৈর্নক্তম্।— ইত্থংনন্দনিদেশাস্তশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্ব কুঞ্জক্রমং রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি রহঃকেলয়ঃ।" পথিমধ্যে তাঁহাদের গোপনলীলা। এ দৃশ্যের আকর কোথায়? কোন শাস্ত্রে ইহার অনুরূপ কথা পাওয়া যায় না। তবে পদ্মপুরাণের কৃষ্ণজন্ম খণ্ডের ১৫শ অধ্যায়ে ইহার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু পদ্মপুরাণ তো জয়দেবের উপজীব্য নয়। যাহা হউক, জয়দেব রাধাকে যে ভাবে ফুটাইয়াছেন পূর্বে কেহ তাহা করেন নাই। রাধার জন্য তিনি কৃষ্ণকে পাগল করাইয়াছেন। রাধার চরণে ধরিয়া বলিয়াছেন—দেহি পদপল্লবমুদারম্। রাধার এরূপ চিত্র কেহ কখনও দেন নাই। জয়দেব রাধাতত্ত্বের যাহা এখন দেখাইলেন সেই দিক দিয়া পূর্বে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ভাগবতধর্ম

বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ধর্মকে ভাগবতধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। অনেকে বলিয়া থাকেন এই ভাগবতধর্ম বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে এই ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে। ভাগবত-সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি ও প্রসার কিরূপে সঙ্ঘটিত হইল শাস্ত্রে তাহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, ভাগবতধর্ম প্রাচীন সাত্বত-ধর্ম নামে অভিহিত হয়। ভাগবতধর্মের অপর নাম 'পরধর্ম'। কালে ভাগবতধর্ম পঞ্চরাত্র মত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অনন্তানন্দ-রচিত শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরণে কতকগুলি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু ইহাতে কতকগুলি

প্রাচীন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনন্তানন্দ বলেন,—

"ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ।
বৈখানসাঃ কর্মহীনাঃ ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ॥
ক্রিয়াজ্ঞানবিভেদেন ত এব দ্বাদশাভবন্‌।
তানাহ শঙ্করাচার্যঃ কিংবা লক্ষণমুচ্যতে॥"

ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস্‌ ও কর্মহীন—এই ছয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু ক্রিয়া ও জ্ঞানভেদে এই ছয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আরও ছয় প্রকার বৈষ্ণব ছিলেন। অনন্তানন্দ ইঁহাদের কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, পূর্বে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র দুইটি পৃথক্‌ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিল।

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২.২.৪৩-৪৫) পঞ্চরাত্র ও ভাগবত মতের অবৈদিকত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আচার্য রামানুজ শঙ্করের এই মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা মতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে।

মহাভারতযুগে যে পঞ্চরাত্রমত ছিল তাহার প্রমাণ মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়ে (৩৫০ অধ্যায়) পাওয়া যায়। উহাতে সাংখ্য, যোগ, পাশুপাত, বেদ প্রভৃতির সহিত পঞ্চরাত্রমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত পর্বের ৩৩৬ ও ৩৪৪ অধ্যায়ে পঞ্চরাত্রের উৎপত্তি ও নিষ্পাপ জীবের মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, যিনি সমগ্র জগৎকে আবৃত করিয়া আছেন এবং যিনি জীবের আশ্রয় তিনি বাসুদেব। মহাভারতকার শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি তাহা বলিতে গিয়া বাসুদেব-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, বাসুদেব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাই পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। বস্তুত বাসুদেবকে পরব্রহ্মরূপে স্বীকার করাই পঞ্চরাত্রের উদ্দেশ্য।

মহাভারতে যে আখ্যায়িকা আছে তাহার উদ্দেশ্য পঞ্চরাত্রের অতিপ্রাচীনত্ব সংস্থাপন। কিন্তু পুরাবিদ্‌গণ নানা কারণে তাহা স্বীকার করেন না। মহাভারতে চতুর্থ ব্রহ্মার বিবরণে পূর্ববিবৃত ধর্মকে দুইবার 'সাত্বত' বলা হইয়াছে। মহাভারতে পঞ্চরাত্রের অপর নাম সাত্বতধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। "ততোহি সাত্বতো ধর্মো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ"। বসু উপরিচর এই সাত্বতবিধি অনুসারে ধর্মানুষ্ঠান করিতেন, তাহাও মহাভারতে লিখিত আছে—

"সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্যমুখনিঃসৃতম।
পূজায়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্॥"

(১২.৩৩৫.১৯)

আবার মহাভারতেই কথিত হইয়াছে যে, রণস্থলে অর্জুনকে বিমনা দেখিয়া বাসুদেব এই ধর্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামানুজ 'সাত্বতসংহিতা' নামে একখানি পঞ্চরাত্র গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ 'সাত্বতর্ষভ' (১১.২১.১) ও 'সাত্বতপুঙ্গব' (১.৯.৩২) নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভাগবতে লিখিত আছে, সাত্বতগণ যাদবগণেরই এক শাখা (১.১৪.১৩), তাঁহারা বাসুদেবকে পরব্রহ্ম-বোধে অর্চনা করিতেন। তাহাতে সাত্বতগণ কর্তৃক যে হরির বিশেষ উপাসনা লিখিত আছে, তাহা পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের অনুমোদিত। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বোধ হয়, বাসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই পঞ্চরাত্র বা ভাগবত মত প্রচার করিয়া থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্ত সাত্বতগণই সর্বপ্রথম এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতাদিতে ইহা সাত্বতধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাসুদেবকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেন বলিয়া এই মতাবলম্বিগণ 'ভাগবত' নামে খ্যাত ছিলেন, পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। পাঞ্চরাত্রগণ বাসুদেবকে নারায়ণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, তদনুসারে পঞ্চরাত্রশাস্ত্র নারায়ণোক্ত শাস্ত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মহাভারতের আদিপর্বে বাসুদেব বৃষ্ণিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন,—পার্থ সাত্বতদিগকে আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ মনে করেন না। আদিপর্বে (২১৮.১২) বাসুদেবকে সাত্বত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। উদ্যোগপর্বে (৭০.৭) তিনি 'জনার্দন' নামেই আখ্যাত হইয়াছেন। দ্বাপরশেষে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ কর্তৃক সাত্বতবিধি অনুসারে গীত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয় খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে যাদব ও বৃষ্ণিদিগের তালিকায় উক্ত হইয়াছে যে, অংশের পুত্র সত্বত এবং তাঁহার বংশাবলি সাত্বত নামে পরিজ্ঞাত। ভগবান্ বলিতেছেন যে, সাত্বতেরা পরব্রহ্মকে ভগবান্ ও বাসুদেব বলিয়া থাকেন (৯.১.৪৯), এবং তাঁহারা কোন বিশেষভাবে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাতে সাত্বতেরা অন্ধক ও বৃষ্ণিদিগের সহিত উক্ত হইয়াছেন ; ইহারা যাদব নামেও অভিহিত ছিলেন (১.১৪ ২৫; ৩.১.২৯)। এইখানে বাসুদেবকে সাত্বতর্ষভ বলা হইয়াছে। পতঞ্জলি বাসুদেব ও বালদেবের ব্যুৎপত্তি দিবার সময় বলিয়াছেন তাঁহারা ক্রমান্বয়ে বসুদেব ও বলদেবের পুত্র। ঐ সূত্রের কাশিকায় বাসুদেব ও আনিরুদ্ধ এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে আনিরুদ্ধকে আনিরুদ্ধের পুত্র বুঝিতে হইবে কিন্তু বাসুদেবের অর্থ করা হইয়াছে বাসুদেবের পুত্র, বসুদেবের পুত্র নহে। কাশিকায় (৬.২.৩৪) বৃষ্ণিবংশীয়গণের দ্বন্দ্বসমাসে 'শিনিবাসুদেবা' পদ সিদ্ধ করা হইয়াছে, এস্থলে উভয় শব্দই বহুবচনে ব্যবহৃত। আবার 'সঙ্কর্ষণবাসুদেবৌ'-উক্ত বংশীয়গণের নামের এইরূপ দ্বন্দ্বও করা হইয়াছে। এই সমস্ত কথা ও পতঞ্জলির ছত্র সকল হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বৃষ্ণি বংশের অপর এক নাম সাত্বত এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ও অনিরুদ্ধ এই বংশভুক্ত ছিলেন। আর এই সাত্বতদিগের মধ্যে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল তাহাতে বাসুদেবকে পরাৎপর পরমপুরুষরূপে উপাসনা করা হইত।

Megasthenes চন্দ্রগুপ্তের সভায় একজন মাসিডনীয় রাজদূত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে রাজত্ব

করিয়াছিলেন। এই Megasthenes একটি বিবরণ দিয়াছেন যে, Sourasenaiগণ Herakles এর উপাসনা করেন ইহারা ভারতবর্ষের একটি জাতি, ইঁহাদের দেশে Methora ও Kleisobra নামে দুইটি প্রধান নগর আছে। পোতপরিচালনোপযোগী Jobares নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। Sourasenoiগণ সুরসেন নামক এক ক্ষত্রিয় বংশ। ইহারা মথুরা অবস্থিত প্রদেশে বাস করিতেন ; যমুনা নদীও তন্মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বলা বাহুল্য যে, Megasthenes-এর Methora মথুরা, Jobares যমুনা এবং Herakles হরির প্রকারভেদ। এখন দেখা যাইতেছে যে, বাসুদেব-কৃষ্ণের উপাসনা প্রথম মৌর্যের সময় প্রচলিত ছিল। কাহারও ধারণা যে, উপনিষদের সময় যে নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই পরিশেষে পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈনমতে এবং পশ্চিমাঞ্চলে বাসুদেব-কৃষ্ণ-উপাসনায় পরিণত হয়।

এই ত গেল এক দিক্ দিয়া বিচার। অপর দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখিতে হয় যে, খ্রীস্টপূর্বাব্দের প্রথম শতকের পরে কতদিন পর্যন্ত ভাগবতধর্মের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চরাত্র কখন কোন ভাবে ছিল তাহাও আলোচ্য।

পূর্বে আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি যে, নানাঘাট ও ঘোষুণ্ডির শিলালিপি খ্রীস্টপূর্ব ২য় শতক পর্যন্ত ভাগবতধর্মের অস্তিত্ব বিঘোষিত করিতেছে। [বিষ্ণু দ্র°] ইহার পর চারিশত বৎসর ভাগবতধর্মের অস্তিত্বের প্রমাণ-দ্যোতক কোন চিহ্ন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন গুপ্তরাজাদিগের প্রবল প্রতাপ, তখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত 'পরমভাগবত' ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহারা বাসুদেবের উপাসক ছিলেন। এই কয়জন রাজার সময় ৪০০ হইতে ৪৬০ খ্রীস্টাব্দ।

গাজিপুর জেলায় ডিটারি-স্তম্ভে একটি শিলালেখ আছে,

তাহাতে শার্ঙ্গী অর্থাৎ বাসুদেব কৃষ্ণের অভিষেকের কথা আছে। ইহাতে স্কন্দগুপ্তকর্তৃক এই দেবতার পূজার জন্য একটি গ্রামের দানপত্রও আছে।

মধ্যপ্রদেশে সাগর জেলায় এরাণে বুধগুপ্তের রাজ্যকালের একটি লিপি আছে। এই লিপিখানি ৪৮৩ খ্রীস্টাব্দের। ইহাতে জনার্দনের ধ্বজস্তম্ভনির্মাণের কথা আছে এবং মাতৃবিষ্ণুকে 'অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর বাঘেলখণ্ড ও দিল্লী-কুতবমিনারের সন্নিকটে লৌহস্তম্ভে ভাগবতধর্মের কিঞ্চিৎ চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় (৬০.১৯) পুরোহিত বিচার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভাগবতগণ বিষ্ণুপূজা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য করিবেন। বরাহমিহিরের সময় ভাগবতগণ বিশেষ উপাসক বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন। বরাহমিহির ৫৮৭ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হর্ষচরিতে বাণ দিবাকর মিত্র নামে একজন সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন। ইনি পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। ইঁহার বাসস্থান বিন্ধ্যপর্বতে ছিল। তাঁহার বাসভূমির চতুর্দিকে বহু উপাসক সম্প্রদায় ছিল—এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে দুইটি সম্প্রদায়ের নাম ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র।

ধর্মপরীক্ষা—অমিতগতি নামক ১০১৪ খ্রীস্টাব্দের একখানি জৈন গ্রন্থে ভাগবত সম্প্রদায়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভাগবতধর্মের ক্রম কোনদিন ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে এই ধর্ম ভারতে প্রচলিত ছিল। তবে এই ধর্মাবলম্বীরা কখনও বা প্রতাপান্বিত ছিল, কখনও বা ইহাদের শক্তি নিতান্ত হ্রস্ব ছিল।

দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি বৈষ্ণব-আগমের প্রচলন আছে। এই

আগমগুলির মধ্যে সম্ভবত বৈখানস আগমই প্রাচীনতম। ইহা গদ্যে লিখিত। পদ্যেও এইরূপ একখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহা প্রাচীন নয়। উৎসবের সময় শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্রবিড়বেদ নামক প্রবন্ধ গীত হইয়া থাকে। অনন্তানন্দের সময়ে বৈখানস সম্প্রদায় ছিল; তখনই ঐ পদ্যগ্রন্থ রচিত হয়। শ্রীবৈষ্ণবগণ খ্রীস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়। এই বৈখানস আগমে ভাগবত সম্প্রদায়ের একটি বিবরণ আছে। ইহাদের মধ্যে পঞ্চরাত্রাগমেরও প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি সংহিতা-সমাহার পঞ্চরাত্রাগম নামে পরিচিত। ইহাদের সংখ্যা ১০৮। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে অথবা অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই সংহিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি সংহিতাই একেবারে আধুনিক। আমি সকলগুলি পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই। তবে যে কয়খানি দেখিয়াছি তন্মধ্যে অধিকাংশই নগণ্য ও অর্বাচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, দু-একখানির নাম করা যাইতে পারে। ঈশ্বরসংহিতায় সঠকোপ যতির নাম ও আচার্য রামানুজের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সঠকোপের সময় ৮০০ খ্রীস্টাব্দ এবং রামানুজের সময় ১০০০ খ্রীস্টাব্দ। বৃহৎব্রহ্মসংহিতায়ও রামানুজের নাম আছে। সুতরাং এগুলি যে একাদশ খ্রীস্টশতকের পরে রচিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীসংহিতা, জ্ঞানামৃতসার, পরমসংহিতা, পৌষ্করসংহিতা, পদ্মসংহিতা ও ব্রহ্মসংহিতা—এই ছয়খানি সংহিতা নারদপঞ্চরাত্রের অন্তর্গত। পৌষ্কর ও পরমসংহিতা হইতে আচার্য রামানুজ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এগুলি তাঁহার সময়েও প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। জ্ঞানামৃতসার যে খ্রীস্টীয় চতুর্থশতকের পূর্ববর্তী নয় তাহা মান্দোরস্তম্ভমূর্তি সমুদয় হইতে সপ্রমাণ করিতে পারা যায়। মতের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে নারদপঞ্চরাত্র ও নারদসূত্রকে

ঔপনিষদ্‌মতবাদী বলিতে পারা যায়। ছান্দোগ্য (৭. ১. ১৩) উপদেশ করিতেছেন,—

"অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারাদস্তং হোবাচ ইতি।...তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়ত্বিতি।" এই সনৎকুমারকে চারিজন অধ্যাত্মতত্ত্ব-স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া সকল শাস্ত্রই স্বীকার করেন। ছান্দোগ্য (৭. ২৬. ২) বলিতেছেন,—

"তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে"। —শঙ্কর গীতাভাষ্যভূমিকায় প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ নামক দ্বিবিধ ধর্মের বিবৃতি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে নিবৃত্তিমার্গ— সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতন এই চতুঃ 'সন' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তবে পরবর্তী ভক্তিশাস্ত্রে ইঁহারা নারদের সহিত আবেশাবতার বলিয়া উক্ত। নারদপঞ্চরাত্র বলেন,—

"সনৎকুমারো ভগবান্ মুনীনাং প্রবরো যথা"

অন্যত্র—

"নারদায় চ যৎ প্রোক্তং ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা
সনৎকুমারেণ পুরা যোগীন্দ্রগুরুবর্ত্মণা।" (৪.৪.২)

নারদসূত্র স্বীয়পরিচয়ে বলিয়াছেন—"নারায়ণপ্রোক্তং শিবানুশাসনং" —এবং কুমার, ব্যাস, শুক, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিল্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান্, ও বিভীষণকে ভক্তি-শাস্তা বলিয়া স্বীকারপূর্বক 'ঈশ্বরে' ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন। কোথাও বিষ্ণু বা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির কথা বলেন নাই। এক স্থলে ভগবানের অবতারের কথায় কৃষ্ণের নাম করিয়াছেন মাত্র। যথা 'ব্রজগোপিকানাং' প্রভৃতি শ্লোকদ্বয়। এই গ্রন্থে কোথাও শ্বেতদ্বীপের নামগন্ধ নাই। ইহাতে ভক্তদিগের মধ্যে "ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ" বলিয়া একান্তি-গণকেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। ভক্তিকে জ্ঞান, কর্ম ও যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তিসূত্র অঙ্গীকার করিয়াছে। ইহার

মতে ঈশ্বরানুগ্রহ ও মহৎকৃপাই পাপীর উদ্ধারের প্রধান উপায়। ভক্তদিগের মধ্যে জাতি, কুল, ধনভেদ কিছুই নয়। নিরোধ অর্থাৎ লোকবেদব্যাপার—সন্ন্যাসই ভক্তের অন্তরায়। এই গ্রন্থে ব্যাস, গর্গ, শাণ্ডিল্য ও নারদের ভক্তি সংজ্ঞা উদ্ধৃত হইয়াছে। শাণ্ডিল্যসূত্রের বর্তমান সংস্করণ অপেক্ষা ইহা যে প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান আকারের নারদপঞ্চরাত্র অপেক্ষাও ইহা প্রাচীন।

নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে নারদ তাঁহার ধর্মমত শিবের নিকট হইতেই পাইয়াছেন।

"গুরুর্মে ভগবান্ সাক্ষাদ্ যোগীন্দ্রো নারদমুনিঃ।
গুরোর্গুরুর্মে শম্ভুশ্চ যোগীন্দ্রনাং গুরোর্গুরু ॥"

বিষ্ণু যে শিবের অপেক্ষা বড় ইহাই সিদ্ধ করিবার জন্য বৈষ্ণবগণ সম্ভবত শিবের উপর এই চালটা চালিয়াছেন। যাহা হউক, নারদ-পঞ্চরাত্র পূর্বতন পঞ্চরাত্র হইতেই সঙ্কলিত।

নারদপঞ্চরাত্রে নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ের কোন স্পষ্ট আভাস ইঙ্গিত নাই বটে, কিন্তু নারায়ণীয় ও পঞ্চরাত্র দুইখানি পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে ইহা যে মহাভারত আখ্যায়িকা হইতে রচিত তাহা বেশ বুঝা যায়। স্থানে স্থানে ভাষারও মিল দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চরাত্র ও নারায়ণীয়ের আখ্যানবস্তু বিভিন্ন হইলেও একথা অস্বীকার করা যায় না। নারায়ণীয় নারায়ণে একান্তিভাব উপদেশ করিয়াছে, পঞ্চরাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছে, শাণ্ডিল্যসূত্র পরাণুরক্তি এবং নারদসূত্র ঈশ্বর বা ভগবানে প্রেম শিক্ষা দিয়াছে। অতি প্রাচীন সময় হইতে যে বৈষ্ণবদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই সমস্ত ধর্মমত উপনিষদের বিভিন্ন বিদ্যা বা উপাসনার অন্তর্গত ছিল। শঙ্কর ও রামানুজের চতুর্ব্যূহপরায়ণ ভাগবত বা পঞ্চরাত্রের মত আলোচনা করিলে জানা যায় যে রামানুজ প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়নেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। চতুর্ব্যূহতত্ত্ব খ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতকেও বিদ্যমান ছিল। নারদপঞ্চরাত্র চতুর্ব্যূহের মধ্যে

কেবল সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নেরই কথা বলিয়াছেন। ন্যাসবিবরণে শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনামের মধ্যে সকলগুলির নাম করিয়াছেন।

মধ্যযুগের বৈষ্ণবগ্রন্থকারদিগের কথায় আমরা জানিতে পারি যে, পঞ্চরাত্র চতুর্ব্যূহতত্ত্বই বিবৃত করিয়াছে। তবে নারায়ণীয় মত পঞ্চরাত্র মত হইতে স্বতন্ত্র। ইহাই রূপগোস্বামী লঘুভাগবতামৃতে বলিয়াছেন,—

"সর্বেষাং পঞ্চরাত্রাণাং অপ্যেষা প্রক্রিয়ামতাঃ।"

নারদপঞ্চরাত্রের আর একটি বিশিষ্ট অংশ হইতেছে, রাধিকা-সমাবেশ। মহাভারতে মাত্র একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে গোপীদিগের কথা বহুধা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাধা নাম এ দুইগ্রন্থে কোথাও নাই। গোপালতাপনী উপনিষদ্ রাধার নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই উপনিষদ্ বর্তমান আকারে কতদূর বিশ্বাস্য তাহা বলিতে পারি না।

আমার বোধ হয়, পঞ্চরাত্রেই রাধাতত্ত্ব প্রথম বিধৃত হয়। নারদপঞ্চরাত্র বলিতেছে,—

"রাসেশ্বরী চ সর্বাদ্যা সর্বশক্তিস্বরূপিণী।
তত্রাসধারণাদ্রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্তিতা"।—২.২

নারদপঞ্চরাত্রি বলেন যে, কপিলপঞ্চরাত্রে রাধার পূর্ণ বিবরণ আছে—

"সংক্ষেপেনৈব কথিতং রাধাখ্যানং মনোহরং
কাপিলয়ে পঞ্চরাত্রে বিস্তীর্ণমতি সুন্দরম্
নারায়ণেন কথিতং মুনয়ে কপিলায় চ।"—২.৬

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানতত্ত্ব যে রাধাতত্ত্ব, যাহা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কীর্তন করিয়া অমর হইয়াছেন, যে রাধাতত্ত্ব এখানকার বর্তমান বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রাণ, যাহা কৃষ্ণতত্ত্ব অপেক্ষা কোন

অংশে ন্যূন নহে, তাহার আকরস্থানের অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কপিলপঞ্চরাত্রই এই তত্ত্বের জনক।

আমরা দেখিলাম যে, পঞ্চরাত্র ও ভাগবত অনেক স্থলেই এক পর্যায়বাচী। পূর্বে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত মত একমত।

এক্ষণে আমরা ভাগবততত্ত্ব কিরূপ তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকে ভাগবত-ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাগবত কাহাকে বলে, ধর্মই বা কি, ভাগবত-ধর্মের লক্ষণ কিরূপ ভাগবতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

যাহার সহিত সাক্ষাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধে আছে, যাহা ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানের দ্বারা বিবৃত, তাহাই ভাগবতবাচী। আর যাহা ধারণ করে, মানুষকে যাহা তাহার স্বরূপে এমন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে যে মানুষ স্বীয় স্বরূপ হইতে কিছুতেই বিচ্যুত বা পরিভ্রষ্ট হইতে পায় না, তাহাকে ধর্ম বলে। একমাত্র ধর্মের সাহায্যেই মানব আপনার স্বরূপে থাকিতে পায়, অন্যদিকে ধর্মই আবার তাহার স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি নিবারণ করিয়া দেয়। কাজেই ধর্মের সাহায্যেই মানব স্বরূপে অবিচলিত থাকিতে পারে। ভগবৎপ্রাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া যে ধর্ম আচারিত হয়—যাহার আচরণে, অনুষ্ঠানে ভগবানের প্রীতিই একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি ঐহিক বা পারত্রিক সুখ চাই না, স্বাচ্ছন্দ্য চাই না, আমি চাই ভগবৎপ্রীতি, তাহাতেই আমার আত্মতৃপ্তি—এই ভাবে যে ধর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই পরধর্ম বা ভাগবতধর্ম। তুমি ভগবানের প্রীতির জন্য অথবা তাঁহাকে পাইবার জন্য অনুষ্ঠান না করিয়া যদি অন্য উদ্দেশ্য লইয়া আচরণ কর তাহা হইলে বাধা বিঘ্ন তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে, তুমি স্বরূপে আর অবস্থিতি করিতে পারিবে না, স্বরূপ হইতে নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িবে। সকাম লৌকিক কর্ম

অথবা সকাম বৈদিক কর্ম প্রভৃতি নীতির আচরণ করিলে স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইবেই হইবে, এমন কোন শাসন নাই সত্য ; নীতি নিষিদ্ধ কর্ম বা অকর্ম নয়, তাহাও সত্য—যাগ, যজ্ঞ, তপস্যাদি নীতি গৌণ ধর্ম মধ্যে গণ্য—অপরধর্ম নামে অভিহিত, কিন্তু নীতি প্রভৃতির অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচ্যুতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে—নীতি সাক্ষাৎ ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নয় ; তদ্দ্বারা তোমার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে না। যে নীতির সহিত ভগবানের সম্বন্ধ নাই, তাহা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই নীতির যাহা কিছু প্রসার তাহা পার্থিবদেহ-দৈহিক-সম্বন্ধ লইয়াই। এই নীতি পার্থিব স্থূল দেহে আমিত্ব আরোপ করিয়া থাকে, কাজেই স্থূলদেহের বাহিরে ইহার অধিকার নাই। স্থূলদেহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই ইহার অধিকার—ইহার কর্তব্যও সঙ্কীর্ণ।

তুমি যত বড় নীতিজ্ঞ হও না কেন, যদি তুমি স্বার্থান্ধ হও, জন্মান্তরে ও কর্মফলে বিশ্বাস না কর, তবে দেহদৈহিক সঙ্কীর্ণ কর্তব্যের মধ্যে থাকিলে তোমার কার্যে পদে পদেই ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিবে। তুমি তোমার কর্তব্যের গণ্ডীকে ক্ষুদ্র পরিবার অতিক্রম করিয়া সমাজে প্রসারিত করিতে পার, আবার সমাজকে অতিক্রম করিয়া দেশে, এইরূপে দেশকে অতিক্রম করিয়া বহুদূরে প্রসারিত করিতে পারে, কিন্তু উহা কখনও আপনাকে ভুলাইতে পারে না, আপনার দৈহিক সুখ দুঃকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তুমি কখনও সকাম কর্ম দ্বারা বিষয়াকর্ষণকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না। তুমি যে কার্য করিতেছ তাহা দ্বারা কর্মের ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধিই পাইতেছে। যদি তুমি সকাম কর্মের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে চাও—তাহা হইলে তোমার একমাত্র উপায় ভগবদুদ্দেশ্য ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। ভগবদুদ্দেশ্যশূন্য জ্ঞানও তোমার কোনও কাজে আসিবে না। 'অহং ব্রহ্ম' ইত্যাকার জ্ঞানে অচিন্ত্যশক্তি ভগবানে অপরাধ হইবারই সম্ভাবনা। এইরূপ জ্ঞানকে পরধর্ম বলিতে পারা যায় না। একমাত্র

ভাগবতধর্ম ভিন্ন অন্য কিছুই পরধর্ম হইতে পারে না। এই ভাগবত-ধর্মের দুইটি দিক্—একটি 'সাধ্য' অপরটি 'সাধনা'। সাধ্য—জীবের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্য-রূপে সংস্থিত, সাধনা—অনুশীলনসাপেক্ষ। যাহা ধারণ করে তাহা 'সাধ্য'—ইহার নাম 'প্রেমভক্তি'; যাহা দ্বারা ধারণ সিদ্ধ হয় তাহা সাধনা—ইহা সাধনভক্তি নামে অভিহিত। প্রেমভক্তি জীবের স্বরূপে এরূপভাবে নিহিত যে তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। যদিও ইহা স্বরূপেই বৃত্তিবিশেষ তথাপি ইহা সাধনভক্তি দ্বারা প্রকাশ্য। সুতরাং ইহার নাম 'সাধ্য'।

যে ধর্ম হইতে অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে রুচি জন্মিয়া থাকে, তাহাই পরধর্ম। এই ধর্মের আশ্রয় লইলে সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারা যায়। মানবের চরম উদ্দেশ্য ভগবদ্দর্শন। ভাগবতধর্ম এই উদ্দেশ্যের সাধক। ইহা সকাম ও নিষ্কাম উভয় ধর্ম হইতে ব্যতিরিক্ত পরধর্ম।

ভাগবতধর্ম স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। ভক্তি নিজেই সম্পূর্ণ সুখস্বরূপ। যিনি ভক্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আর অন্য কিছুর অনুসন্ধান করিতে হয় না; কারণ, যাঁহার ভক্তি লাভ হইয়াছে তিনি পরিপূর্ণ সুখে ভরপুর—একেবারে মশগুল, তাঁহার আর অন্য সুখের অবসর নাই—প্রবৃত্তি বা পরিতৃপ্তি নাই। ভক্তি উদিত হইলে তার ত্রিসীমায় দুঃখ থাকিতে পারে না। ভক্তি স্বয়ংই সুখস্বরূপ—ইহা অপেক্ষা সুখদায়ী পদার্থ নাই; ইহার এমনই স্বভাব যে ইহার সম্মুখে কোন বাধাবিঘ্ন আসিতেই পারে না। আত্মাকে প্রসন্ন করিতে ভক্তি অদ্বিতীয়। আত্মপ্রসাদজননী এই ভক্তিকে কোন কিছুই অতিক্রম করিতে পারে না। এই ভক্তি দ্বারা শ্রবণাদি লক্ষণ সাধনভক্তিযোগ প্রবর্তিত হইয়া থাকে। পৃথক্ চেষ্টাপরিশূন্য হইয়াও মানুষ অনায়াসে বৈরাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। কর্ম, জ্ঞান বৈরাগ্য সকলেই ভক্তির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। ভক্তির উন্মেষ হইলে ইহারা আপনা হইতে উপস্থিত হইয়া ভক্তকে

প্রেমালিঙ্গন করিয়া থাকে। ভক্তি কিন্তু অন্যনিরপেক্ষ—জ্ঞান—কর্মাদির অপেক্ষা রাখে না। যে ধর্মদ্বারা এই ভক্তি সূচিত হয় তাহাই ভাগবতধর্ম। সুতরাং ভাগবতধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

তুমি আমি যে বাঁচিয়া আছি তা কিসের জন্য? সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বেশ উপলব্ধি হইবে যে আমি জীবিত আছি শুধু তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য। তত্ত্বজ্ঞান ভক্তিরই অবান্তর ফল। দর্শনে যাহাকে অদ্বয়জ্ঞান বলে তাহাই তত্ত্ব। শাস্ত্রে তত্ত্বের নামান্তর—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্। তত্ত্ব একই, কেবল প্রকাশাদির পার্থক্যবশত নামে ভেদমাত্র।

যাঁহারা বিবেকী ব্যক্তি তাঁহারা সতত ভগবানের অনুধ্যান করিয়া অহঙ্কারজন্য কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মননাভিনিবেশ সহকারে শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিতে ভগবৎকথায় রুচি জন্মে। ইহা হইতে প্রেমলক্ষণা ভক্তি জন্মিয়া থাকে। ভক্তি জন্মিলে ভগবান্ অন্য সমস্ত বাসনা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইহা হইতে ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি হয়। এইরূপে ভক্তিযোগ দ্বারা জীবের ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ ও অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। ভাগবতধর্ম উপদেশ করিতেছে যে এই সমস্ত কারণেই ভক্তগণ ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি করিয়া থাকে।

ভগবান্ সময়ে সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ মুখে ধর্মোপদেশ করিয়া থাকেন। ভগবান্ যে সকল নিজ মুখে উপদেশ করেন তাহার সকলগুলিই ধর্মপদবাচ্য। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে যেগুলির অনুষ্ঠান দ্বারা সর্বসাধারণ, এমন কি মূঢ় লোকসকলও অনায়াসে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে তাহাই ভাগবতধর্ম। ইহাতে অধিকার অনধিকারের কথা নাই। সকলেই অনুষ্ঠান করিতে পারে। তাই ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন,—

"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥"৩৪

এই ভাগবতধর্মে সকলেরই অধিকার। ইহা আশ্রয় করিয়া মানুষ কখনও প্রমাদগ্রস্ত হয় না। ইহা এমনি সুষ্ঠু ধর্ম যে নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া ধাবিত হইলেও পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই। তবে এ ধর্মে একটি জিনিসের সম্পূর্ণ আবশ্যক—তাহা পূর্ণ নির্ভরতা। বিধিতে হউক বা স্বভাবানুসারেই হউক, যাহা যাহা করিবে সমস্তই পরমেশ্বর নারায়ণে কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা সমর্পণ করিতে হইবে।

এই ভাগবতধর্ম কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই ধর্মের মূলমন্ত্র অতি উদার ও মহান্। ইহা সর্বধর্মের সারভূত। সর্বদেশে এই ধর্ম সাধারণের ধর্ম বলিয়া সমাদৃত হইবার সর্বথা উপযুক্ত।

এইবারে আমরা ভাগবত হইতে কয়েকটি উপদেশের উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

সর্বভূতে যাঁহার সাক্ষাৎ ভগবৎস্ফূর্তি হয় এবং যিনি পক্ষান্তরে আত্মস্বরূপ ভগবানে সর্বভূতসত্তা উপলব্ধি করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত।

"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

"যিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিষ্ণুর মায়া বুঝিয়া ইন্দ্রিয় সমুদয় দ্বারা সকল বিষয় গ্রহণ করিয়াও দ্বেষ করেন না বা হৃষ্ট হন না, তিনি ভাগবতশ্রেষ্ঠ।

"গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি না হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যান্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥"

"যিনি নিরন্তর শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ও কষ্ট প্রভৃতি সংসারধর্মে বিমুগ্ধ হন না, তিনি ভাগবতপ্রধান।

"যাঁহার চিত্তে বীজ অর্থাৎ ভোগবাসনা, ভোগ্য বিষয়ের কামনা

এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কর্ম উৎপন্ন হয় না, বাসুদেবনিলয় সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম।

"যাঁহার জন্ম কর্ম দ্বারা অথবা বর্ণ, আশ্রম ও জাতি দ্বারা এই দেহে অহংভাব জন্মে না তিনি হরির প্রিয়।

"যাঁহার বিত্তে বা আত্মাতে আপন ও পর এই ভেদ নাই, যিনি সর্বভূতে সমবুদ্ধি ও শান্ত, তিনি ভাগবতোত্তম।

"যিনি ত্রিভুবনে যত কিছু বিভূতি আছে, তাহার জন্যে স্মৃতিভ্রষ্ট হন না, যিনি বিষ্ণুপরায়ণ দেবগণ কর্তৃক অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণ হইতে লবার্ধও—মুহূর্তার্ধও বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান।"

যাঁহার প্রতি অঙ্গে শাশ্বত ভাগবতধর্মলক্ষণ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, যাঁহার কর্মে ও আচরণে ভাগবতধর্ম জ্বলন্ত জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া খেলিতেছে, যাঁহার পবিত্র দর্শনে ও সঙ্গগুণে জগৎ ভাগবতধর্মে উন্মুখ হইতেছে—তাঁহাকেই বৈষ্ণব-প্রধান বলিয়া জানিবে। মহানুভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে সেইজন্যই দেখিতে পাই, সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বসু রামানন্দকে বলিতেছেন,—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

পঞ্চরাত্র-তত্ত্ব

বৈদিকযুগের অব্যবহিত পরবর্তী কোন এক সময়ে বৈদিক-ধারা-সুস্নাত একটি ধর্মমত প্রবর্তিত হয় এবং তাহা বৈষ্ণবদিগের প্রাচীনতম মতবাদ · পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে এই মতবাদেরই উপদেশ আছে। শ্রীসম্প্রদায়-প্রবর্তক আচার্য শ্রীরামনুজস্বামী দৃঢ় উক্তি করিয়া বলিয়াছেন—"অপার করুণা বাৎসল্য ও সুশীলতার মহোদধিস্বরূপ···ভগবান্ বাসুদেব চারি বর্ণ ও আশ্রমে অবস্থিত নিজ ভক্তগণকে অনুগ্রহ

করিবার জন্য বেদের যথার্থ তত্ত্বাবোধক এই 'পঞ্চরাত্র' শাস্ত্র নিজেই নির্মাণ করিয়াছেন—২. ২. ৪২। তারপর সাত্বত, পৌষ্কর ও পরম-সংহিতা হইতে বচন উদ্ধার করিয়া পঞ্চরাত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(১) পঞ্চরাত্রমতের সার-সংগ্রহ মহাভারতের মোক্ষধর্মে নারায়ণীয় পর্বাধায়ে (৩৩৬. ৩৬ অধ্যায়) আলোচিত হইয়াছে।

(২) 'উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ' (২. ২. ৪০) প্রভৃতি বেদান্ত বা ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্কর ও রামানুজ যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে ভাগবতমত ও পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের উল্লেখ আছে।

(৩) যামুনাচার্যের 'আগাম-প্রামাণ্যে' পঞ্চরাত্রের উল্লেখ ও ঈশ্বরসংহিতা হইতে তিনবার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৪) বেদান্তাচার্যের 'পঞ্চরাত্র-রক্ষায়' ইহার উল্লেখাদিও আছে।

(৫) বিষ্ণু ও শ্রীভাগবতপুরাণে পঞ্চরাত্রের উল্লেখ আছে।

(৬) মধ্ব বা আনন্দতীর্থের 'তন্ত্রসারে' উল্লেখ আছে।

(৭) উৎপলদেবের 'ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন' শৈবগ্রন্থ। ইহাতে পঞ্চরাত্রের উল্লেখ, যথা—

"শ্রীপঞ্চরাত্রশ্রুতাবাপি···এবম্" ইত্যাদি।

রাজ্ঞী নায়নিকার নামঘাট লিপিতে (Arch. Surv. West India, vol. v. p. 74) "নমো সঙ্কর্ষণ বাসুদেবানং চন্দসুতানম্" পাঠ হইতে ভারতে কৃষ্ণপূজার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি রাজপুতনায় একটি আরও প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে। কবিরাজ শ্যামলদাস ও ডক্টর হোর্নলে এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের proceedings-এ (vol. vi. p. 77) তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ভগবান্ সংকংসন (সঙ্কর্ষণ) বাসুদেব ও একটি বৈষ্ণব মন্দিরের উল্লেখ আছে। বাসুদেব পূজার প্রাচীনত্বের ইহা আর একটি প্রমাণ।

সাত্বত সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায়—Tusam

Rock Inscription-এ (Corpus. Inscr. Indic. vol. iii. p. 270)। এখানে "আর্য-সাত্বত যোগাচার্য" এই কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বুদ্ধের সময়ে আজীবকগণ ছিলেন। সম্রাট্ অশোক ও তৎপুত্র দশরথ তাঁহাদিগকে গুহা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহারা তখনকার নারায়ণ উপাসক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী। (Kern : *Geschichte des Buddhismus*, vol. i. p. 17)।

১০৮ তন্ত্র বা সংহিতার মধ্যে 'পাদ্মতন্ত্র' একখানি। 'পাদ্মতন্ত্রে' (৪. ২. ৮৮) আমরা পাই—

"সূরিঃ সুহৃদ্ ভাগবতঃ সাত্বতঃ পঞ্চকালবিৎ।
একান্তিকস্তন্ময়াশ্চ পাঞ্চরাত্রিক ইত্যপি॥"

এই বচন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পঞ্চরাত্র = ভাগবত = সাত্বত = একান্তিক। এগুলি সমার্থবাচক।

ঈশ্বর-সংহিতায় (১. ১৮) নারদ মুনিদিগকে বলিতেছেন,—

"মোক্ষয়নায় বৈ পন্থা এতদন্যো ন বিদ্যতে।
তস্মাদেকায়নম্ নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

ইহা ছাড়া মোক্ষের অন্য পথ নাই বলিয়া মনীষিগণ ইহার নাম দিয়াছেন—'একায়ন'।

এই একায়ন শাস্ত্র 'মূলবেদ' নামেও পরিচিত। ইহার কারণ, বাসুদেব সকল জ্ঞানেরই মূলে আছেন। সুতরাং মূল জ্ঞান অর্থে ইহা মূল বেদ।

"মহতো বেদবৃক্ষস্য মূলভূতো মহানয়ম্।
স্কন্ধভূতো ঋগদ্যাস্তে শাখাভূতশ্চ যোগিনঃ॥
জগন্মূলস্য বেদস্য বাসুদেবস্য মুখ্যতঃ।
প্রতিপাদকতা সিদ্ধা মূলবেদাখ্যতা দ্বিজাঃ॥
আদ্যং ভাগবতং ধর্মমাদিভূতে কৃতে যুগে।
মানবা যোগ্যভূতাস্তে অনুতিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ॥"

—ঈশ্বরস° ১. ২৪-২৬

এই শাস্ত্র বেদবৃক্ষের মূল ; ঋগাদি ইহার স্কন্দ, যোগিগণ ইহার শাখা। জগন্মূল বাসুদেব কর্তৃক ইহা ব্যাখ্যাত বলিয়া ইহার নাম 'মূলবেদ'। ইহাই আদ্য ভাগবতধর্ম। কৃতযুগে যোগ্য মানবগণ ইহারই অনুষ্ঠান করিতেন।

এই শাস্ত্র প্রাচীন শাস্ত্র। বাসুদেবপুত্র (= কৃষ্ণ) বাসুদেব কর্তৃক ইহা যে প্রবর্তিত নয় তাহা 'সমন্তে-অনুস্যূত' বাসুদেব শব্দের এই ব্যুৎপত্ত্যর্থ হইতে বেশ বোঝা যায়। অবশ্য 'বাসুদেবপুত্র', অর্থেও ব্যাকরণে ইহা সাধিত হইতে পারে। তৈত্তিরীয়-উপনিষদের বিষ্ণু গায়ত্রীতে বাসুদেব শব্দ পাওয়া যায়। তারপর পাদ্মতন্ত্রেও (৩. ২৯. ২৮) আমরা পাই—

"বসুদেবসুতস্যাপি স্থাপনং বাসুদেব-বৎ।"

অর্থাৎ বসুদেবপুত্র কৃষ্ণের স্থাপন (প্রাচীন) বাসুদেবের ন্যায়।

তারপর, একায়ন শাস্ত্র যে নারদের লিখিত প্রাচীন শাস্ত্র তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ কর্তৃক সনৎকুমারের প্রতি উক্তি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়—

"ঋগ্বেদং ভগবো অধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদং আথর্বনং চতুর্থং ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং বিধিং বাকোবাক্যং একায়নম্।"—৭. ১. ২

শ্রীপ্রশ্নসংহিতা (২. ৩৮. ৩৯) বলেন একায়ন একখানি উপনিষৎ বা শ্রেষ্ঠ উপনিষৎ। পঞ্চরাত্র ইহার ভাষ্য—

"বেদং একায়নং নাম বেদানাং শিরসি স্থিতম্
তদর্থকং পঞ্চরাত্রং মোক্ষদং তৎক্রিয়াবতাম্,
যস্মিনেকো মোক্ষ-মার্গো বেদে প্রোক্তঃ সনাতনঃ
মদারাধনরূপেণ তস্মাদেকায়নং ভবেৎ।"

আবার শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবদ্গীতায় (৭. ১৯) বলিয়াছেন,—

"বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ"

'বাসুদেবই সর্ব', ইহা যিনি জানেন এইরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ।

এই শ্লোক হইতে নির্দেশ পাওয়া যায় যে, ভাগবত ও বাসুদেব ধর্ম শ্রীকৃষ্ণের সময়ে প্রবর্তিত নয়, পূর্বে ইহা ছিল। কৃষ্ণ এখানে আদি বাসুদেব-ধর্মকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। বাসুদেব সুতরূপে নিজেকে লক্ষ্য করেন নাই। গীতার ৫. ১০. ৩৭ শ্লোকে 'বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোহম্' নিজেকে বলিয়াছেন। এই ধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম, লোকে ভাগবতধর্ম ভুলিয়া গিয়াছে, তিনি তাহা পুনঃ-প্রকাশ করিতেছেন। অর্জুনকে এই কথা বলিয়া তাঁহার উক্তি আরও দৃঢ় করিয়াছেন,—

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ॥
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেঽব্রবীৎ।
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ ॥
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ॥"

নারদকে নারায়ণ এই শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর-সংহিতায় এ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ করিয়াছে।—নরনারায়ণাশ্রমে অর্থাৎ বদিরকাশ্রমে মুনিগণ নারায়ণের সেবা করিলেন। নারদ নারায়ণকে দেখিবার জন্য স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন; নারায়ণকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তাহার মুখে ও দেহে আনন্দ স্ফূর্তি পাইতেছিল। তিনি মুহুর্মুহুঃ তাঁহাকে প্রণাম ও পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে নারায়ণকে পূজা করিলে তিনি মুনিপুঙ্গবকে বলিলেন—মুনিগণ হরিচরণ প্রার্থনা করিয়া এখানে বসিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাদিগকে সাত্বত-শাস্ত্র (পঞ্চরাত্র) শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পাত্র। এই কথা বলিয়া নারায়ণ অদৃশ্য হইলেন।

"নারায়ণং তপস্যন্তং নরনারায়ণাশ্রমে।
সংসেবন্তঃ সদা ভক্ত্যা মোক্ষোপায়বিবিৎসবঃ ॥

সংস্থিতা মুনয়ঃ সর্বে নারায়ণপরায়ণাঃ।
কালেন্ কেনচিৎ স্বর্গাৎ নারায়ণদিদৃক্ষয়া ॥
তত্রাবতীর্য দেবর্ষিঃ নারদঃ স কুতূহলঃ।
দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥
পুলকাঞ্চিত সর্বাঙ্গঃ প্রহৃষ্টবদনো মুনিঃ।
স্তুত্বা নানাবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য চ মুহুর্মুহুঃ ॥
পূজয়ামাস তং দেবং নারায়ণং অনাময়ং।
অথ নারায়ণো দেবং তমাহ মুনিপুঙ্গবম্ ॥
মুনয়ো হ্যত্র তিষ্ঠন্তি প্রার্থয়ানা হরেঃ পদম্।
এতেষাং সাত্বতং শাস্ত্রং উপদেষ্টুং ত্বং অর্হসি ॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে শ্রীমন্নারায়ণ মুণিস্তদা।

—ঈশ্বরস° ১. ৪-১০

মহানারায়ণ, ব্রহ্মবিন্দু, মুক্তি, রামতাপনী এবং বাসুদেব উপনিষদে ভাগবতধর্মকে আত্মধর্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভাগবতধর্মের সমস্ত সাহিত্য-সাধারণত সাত্বতশাস্ত্র নামে পরিচিত। এদিকে আবার সাত্বত ১০৮ সংহিতার মধ্যে একটি। আবার দেখিতে পাওয়া যায় সাত্বতশাস্ত্র দুই শাখায় বিভক্ত—বৃহত্তম শাখার নাম পঞ্চরাত্র এবং ক্ষুদ্রতর শাখার নাম বৈহানস। ঈশ্বর-সংহিতা (১. ৬২) বলিয়াছেন—"তৎ স্যাৎ দ্বিধা পঞ্চরাত্রবৈহানস-বিভেদতঃ।" পঞ্চরাত্র যে বৈদিক এবং ইহার প্রমাণ যে কল্পসূত্রের প্রমাণের ন্যায় স্বীকার্য তাহা পাদ্মতন্ত্র মানিয়া লইয়াছেন—"শ্রুতিমূলং ইদং তন্ত্রং প্রমাণং কল্পসূত্রবৎ।"—১. ১. ৮৮

এখন এই পঞ্চরাত্র বলিলে কি বুঝি? পাদ্মতন্ত্র প্রশ্ন করিতেছেন,—

"মহোপনিষদাখ্যস্য শাস্ত্রস্যাস্য মহামতে।
পঞ্চতন্ত্র-সমাখ্যাসৌ কথং লোকে প্রবর্ততে ॥"—১.১. ৬৮-৬৯

সংবর্ত ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

"পঞ্চেতরাণি শাস্ত্রাণি রাত্রীয়ন্তে মহান্ত্যপি।
তৎসন্নিধৌ সমাখ্যানৌ তেন লোকে প্রবর্ততে॥"

অর্থাৎ এই পঞ্চরাত্রের নিকট অপর ৫খানি মহাশাস্ত্র রাত্রির অন্ধকার স্বরূপ; সুতরাং ইহার নাম পঞ্চরাত্র। আর ৫খানি মহাশাস্ত্র হইতেছে—

(১) যোগ (বিরিঞ্চি বা হিরণ্যগর্ভ প্রণীত)
(২) কপিল-প্রণীত-সাংখ্য
(৩) বুদ্ধিমূর্তি-প্রণীত বুদ্ধ
(৪) অর্হৎ বা জিন-প্রণীত আর্হত
(৫) শিব প্রণীত কাপাল শুদ্ধশৈব, পাশুপত [পাদ্মতন্ত্র, ১. ১. ৪৭-৫০]

পাদ্মতন্ত্রে পঞ্চরাত্রের আর একটি অর্থ এইরূপ—

"পঞ্চত্বং অথবা যদ্বৎ দীপ্যমানে দিবাকরে
ঋচ্ছন্তি রাত্রয়স্তদ্বৎ ইতরাণি তদন্তিকে।"—১. ১. ৭১.

যেমন সূর্যোদয়ে রাত্রিসকল মরিয়া যায়—পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইহার অন্তিকে অপর সকলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

নারদ-পঞ্চরাত্র ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—

"রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥—১. ১. ৪৪

রাত্র শব্দে জ্ঞান বুঝায়, যে হেতু এই জ্ঞান পঞ্চবিধ, মনীষিরা ইহাকে তাই পঞ্চরাত্র বলিয়াছেন।

এই পাঁচ রকম জ্ঞান হইতেছে (৪৫-৪৬)

(১) তত্ত্ব (অর্থাৎ সাত্ত্বিক)
(২) মুক্তিপ্রদ (ইহাও সাত্ত্বিক)
(৩) ভক্তিপ্রদ (ইহা নৈর্গুণ্য)
(৪) যৌগিক (ইহা রাজস)
(৫) বৈষয়িক (ইহা তামস)

"রাত্রিরজ্ঞানমিত্যুক্তম্
পঞ্চেত্যজ্ঞান-নাশকম্।"

অর্থাৎ রাত্রি শব্দের অর্থ অজ্ঞান; পচনার্থ পচ্ ধাতু হইতে পঞ্চশব্দ নিষ্পন্ন। সুতরাং যাহা রাত্রি বা অজ্ঞানকে পাক বা নাশ করে তাহা পঞ্চরাত্র। কাজেই পঞ্চরাত্র-শাস্ত্র অনুশীলন করিলে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়।

অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা (১১. ৬৪-৬৬) ও কপিঞ্জল-সংহিতাও পঞ্চরাত্রের ব্যাখ্যা দিয়াছে।

পঞ্চরাত্র-সংহিতায় আচার্য-পরম্পরা সম্বন্ধে ঈশ্বর-সংহিতা বলিতেছেন,—পুরাকালে তোতাদ্রিশিখরে বহু বর্ষ ধরিয়া শাণ্ডিল্যমুনি তপস্যায় সমাহিত ছিলেন, পরিশেষে তিনি দ্বাপরযুগের অন্তে ও কলিযুগের আদিতে একায়ন নামক বেদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা তিনি সুমন্ত, জৈমিনি, ভৃগু, অনুপগায়ন ও মৌঞ্জায়নকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"পুরা তোতাদ্রিশিখরে শাণ্ডিল্যোপি মহামুনিঃ
সমাহিতমনা ভূত্বা তপস্তপ্ত্বা মহত্তরম্
অনেকানি সহস্রাণি বর্ষাণাং তপসোঽন্ততঃ
দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে আদৌ কলিযুগস্য চ
সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণাৎ লব্ধ্বা বেদমেকায়নাভিধং
সুমন্তুং জৈমিনিঞ্চৈব ভৃগুঞ্চৈব ঞ্চৈবপগায়নং
মৌঞ্জায়নঞ্চ তং বেদং সম্যগ্ অধ্যাপয়ৎ পুরা।"—১. ৩৮-৪১

তারপর এই সংহিতায় (৮. ১৭৫-৭৭) নারদ বলিতেছেন,—

"একান্তিনো মহাভাগাঃ শঠকোপ-পুরঃসরাঃ
ক্ষোণ্যাং কৃতাবতারা যে লোকোজ্জীবন-হেতুনা
শাণ্ডিল্যাদ্যাশ্চ যে চান্যে পঞ্চরাত্র প্রবর্তকাঃ
প্রহ্লাদশ্চৈব সুগ্রীবো বায়ুসূনুর্বিভীষণঃ
যে চান্যে সনকাদ্যাশ্চ পঞ্চকালপরায়ণাঃ।"

অর্থাৎ শঠকোপ প্রভৃতি মহাভাগগণ জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সনকাদি, শাণ্ডিল্যাদি, প্রহ্লাদ, সুগ্রীব, বায়ুসুত হনুমান্, বিভীষণ প্রভৃতি পঞ্চকালপরায়ণগণ পঞ্চরাত্রের প্রবর্তক ছিলেন।

শঠকোপাদির পরে যে রামানুজ ভাগবত প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা ঈশ্বর-সংহিতার ২০ অধ্যায় (২৭৮-৮০) হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। নারায়ণ বলভদ্রকে বলিতেছেন,—হে যদুনন্দন, আমার প্রতি তোমার বিমলা ভক্তি। প্রথম তুমি শেষরূপে আমার কৈঙ্কর্য করিয়াছিলে; তারপর লক্ষ্মণরূপে এক্ষণে তুমি বলভদ্ররূপে আমার সেবা করিয়াছ; আর কলিযুগে কোন দ্বিজোত্তম হইয়া আমার নানাবিধ অর্চনা করিবে (২. ৭. ৬৬)।

এই দ্বিজোত্তম যে রামানুজ তাহা বৃহদ্‌ব্রহ্ম সংহিতায় স্পষ্ট বলিয়াছে,—

"দিজরূপেণ ভবিতা যাতু সঙ্কর্ষণাভিষা ॥
দ্বাপরান্তে কলেরাদৌ পাষণ্ডপ্রচুরে জলে।
রামানুজেতি ভবিতা বিষ্ণুধর্ম-প্রবর্তকঃ।
শ্রীরঙ্গেশদয়াপাত্রং বিদ্ধি রামানুজং মুনিম্।
যেন সন্দর্শিতঃ পন্থা বৈকুণ্ঠাখ্যস্য সদ্মনঃ ॥
পরমৈকান্তিকো ধর্মো ভবপাশবিমোচকঃ।
যত্রান্যতয়া প্রোক্তং আবয়োঃ পাদসেবনম্ ॥
কালেনাচ্ছাদিতো ধর্মো মদীয়োঽয়ং বরাননে।
তদা ময়া প্রবৃত্তোঽয়ং তৎকালোচিতমূর্তিনা ॥
বিষ্বক্‌সেনাদিভির্ভক্তৈঃ শঠারি-প্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।
রামানুজেন মুনিনা কলৌ সংস্থামুপেষ্যতি ॥"

বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা, ঈশ্বরসংহিতা ও শ্রীভাগবতে দ্রবিড়ে ভাগবত-ধর্মপ্রাচুর্যের কথা বলা হইয়াছে।

বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা (১. ৪. ৯৪)—

"দ্রাবিড়েষু জনিং লব্ধ্বা যদ্ধর্মো যত্র তিষ্ঠতি।
প্রায়ো ভক্তা ভবন্তীহ মমাপাদাম্বুসেবনাৎ ॥"

ঈশ্বরসংহিতা (১১. ৫)—

"গায়স্তিরগ্রে দেবস্য দ্রামিড়ীং শ্রুতিমুত্তমাম্।" ২৩৫ ॥
"পাঠয়েদ্ দ্রামিড়ীঞ্চাপি স্তুতিং বৈষ্ণব-সত্তমৈঃ।" ২৫২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৫. ৩৮-৪০)—

"কৃতাদিষু মহারাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ ॥
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাজ! দ্রাবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা ইত্যাদি।"

অর্থাৎ কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের লোকেরা কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে এই যুগে নারায়ণ-পরায়ণগণ জন্মগ্রহণ করিবেন। অন্যত্র ইঁহারা ক্বচিৎ থাকিবেন। দ্রবিড়ে তাম্রপর্ণা, কৃতমালা, পয়স্বিনী, কাবেরী প্রভৃতি নদীর তীরবর্তী স্থানে ইঁহারা ভূরিপরিমাণে জন্মগ্রহণ করিবেন।

ভক্তমাল গ্রন্থ উত্তরভারতের লোকদের লেখা। এই গ্রন্থ বলে যে ভাগবতধর্ম রামানুজ শিষ্য রামানন্দ দ্বারা দক্ষিণ হইতে উত্তরে সমানীত হইয়াছিল।

পঞ্চরাত্র

শ্রীরামানুজ 'পঞ্চরাত্রশাস্ত্র'কে 'পঞ্চরাত্রতন্ত্র' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। উদারভাবে দেখিতে গেলে অর্থ হিসাবে তন্ত্র, আগম ও সংহিতা একরকম সমান। তবে প্রয়োগে সাধারণত তন্ত্র শাক্ত-শাস্ত্র এবং সংহিতা বৈষ্ণবশাস্ত্র। ভাগবতপুরাণ (১. ৩. ৮) 'সাত্বততন্ত্র' নামে সাত্বতসংহিতাই বুঝিয়াছেন। 'পাদ্মতন্ত্র' ও

'পাদ্মসংহিতা' উভয় নামেরই প্রয়োগ দেখা যায়। যাহা হউক, তন্ত্র, আগম ও সংহিতার আলোচ্য বিষয় চারিটি—জ্ঞান, যোগ, চর্যা ও ক্রিয়া।

বেদের শাখার নাম 'সংহিতা'। মনু, অত্রি, হারীত প্রভৃতি উনবিংশ ঋষি প্রণীত ধর্মশাস্ত্রকেও সংহিতা বলে। পঞ্চরাত্র-সংহিতা প্রভৃতি সংহিতা ইহাদের অন্তর্গত নয়। প্রবাদ আছে, এইরূপ সংহিতার সংখ্যা ১০৮। কিন্তু কপিঞ্জল, পাদ্ম, বিষ্ণু ও হয়শীর্ষ সংহিতা এবং অগ্নিপুরাণে ২১০ খানি সংহিতার নাম পাওয়া যায়। এ ছাড়া সংহিতার আরও পাঁচখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

সে পাঁচখানি সংহিতার নাম—উপেন্দ্র-সংহিতা[১], কাশ্যপোত্তর সংহিতা[২], পরমতত্ত্বনির্ণয়-প্রকাশ সংহিতা[৩], পাদ্মসংহিতাতন্ত্র[৪] ও বৃহদ্‌ব্রহ্মসংহিতা[৫]।

কখনও কখনও উদ্ধৃত বচনেও কয়েকখানি সংহিতার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলির কোন বিবরণ জানিতে পারা যায় না। কোন সংহিতার একটি তালিকা বাহির হইয়াও পড়িতে পারে। যে কয়খানি সংহিতার নাম মাত্র উদ্ধৃতবচনে পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেল—

---

১ এখানি 'উপেন্দ্র-কণ্ব-সংবাদ'। আধুনিক গ্রন্থ। M. G. L. পুস্তক নং ৫২০৯

২ M. G. L.-এ এই গ্রন্থের চারিখানি পুস্তক আছে (৫২১২, ৫২১৬, ৫২১৭, ৫২১৮ নং পুস্তক)

৩ M. G. L. পুস্তক নং ৫৩০০। A. L.ও এই পুস্তকখানি আছে। ইহাতে প্রথম পরিচ্ছেদের ১৫টি অধ্যায় আছে। আলোচ্য বিষয়—সৃষ্টি-তত্ত্ব।

৪ M. G. L. পুস্তক নং ৫২৯৬। ইহা সনৎকুমার-সংহিতার অংশ-বিশেষ।

৫ আধুনিক গ্রন্থ—দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে।

চিত্রশিখণ্ডি-সংহিতা, মঙ্কনবৈশম্পায়ন-সংহিতা, শুকপ্রশ্ন-সংহিতা শ্রীকালপর-সংহিতা, সুদর্শন-সংহিতা, সৌমন্তব-সংহিতা, হংস-সংহিতা, হংসপরমেশ্বর-সংহিতা।

পাদ্মসংহিতা (৪. ৩৩. ১৯৭৫) ভাগবত সাহিত্যসাগর হইতে ৬টি রত্ন বাহির করিয়াছেন। ইহার মতে ৬টি রত্ন হইতেছে—

(১) পাদ্ম, (২) সনৎকুমার, (৩) পরম, (৪) পদ্মোদ্ভব, (৫) মাহেন্দ্র ও (৬) কাণ্ব।

ঈশ্বরসংহিতা (১. ৬৪) মতে প্রধান সংহিতা তিনখানি—

(১) সাত্বত, (২) পৌষ্কর, (৩) জয়।

২০৮ খানি সংহিতার মধ্যে নিম্নলিখিত ১৩খানি মুদ্রিত হইয়াছে —(১) পাদ্ম (তেলুগু অক্ষর), (২) ঈশ্বর (তে) (৩) লক্ষ্মীতন্ত্র, (তে), (৪) ভারদ্বাজ (তে), (৫) অহির্বুধ্ন্য (তে ও নাগরী), (৬) নারদ (না), (৭) সাত্বত (না), (৮) বিষ্ণুতিলক (তে), (৯) পারাশর (তে), (১০) কপিঞ্জল (তে), (১১) বৃহদ্‌ব্রহ্ম (তে), (১২) শ্রীপ্রশ্ন, (১৩) বিষ্ণুধর্ম (তে)।

সংহিতা-সাহিত্য এক বিরাট ব্যাপার। সংহিতাগুলি একত্র করিয়া গণনা করিলে দেখা যায়, পঞ্চরাত্র-সংহিতায় দেড় লক্ষেরও অধিক শ্লোক দাঁড়ায়। এই জন্যই বোধ হয় সংহিতায় পঞ্চরাত্রকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। শ্রীপ্রশ্ন-সংহিতা (২. ৪১) ও বিষ্ণুতিলক-সংহিতা (১. ১৪০ ও ১৪৫) বলেন, মূল পঞ্চরাত্র সংহিতায় দেড় কোটি শ্লোক ছিল।

পঞ্চরাত্র সম্বন্ধে সকলের চেয়ে পুরাতন খবর পাওয়া যায় মহাভারতে। মহাভারতের শান্তিপর্বের নারদীয় পর্বাধ্যায়ই পঞ্চরাত্রের প্রাচীনতম সংবাদের আকর। নারদীয় পর্বাধ্যায়ের সময় এবং তৎ-পূর্বেও যে পঞ্চরাত্র ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভীষ্মপর্বের ৬৬ অধ্যায়ের শেষে 'সাত্বতবিধি'রও উল্লেখ আছে। সাত্বত-সংহিতায় সাত্বতবিধির কথা আছে।

"সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ।
দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে আদৌ কলিযুগস্য চ॥"

সাত্বতসংহিতায় কিন্তু সঙ্কর্ষণ প্রশ্নকর্তা মাত্র—বক্তা নন।

পঞ্চরাত্রের উৎপত্তি উত্তর ভারতে। এখান হইতেই ইহা পরে দক্ষিণে বিস্তৃত হয়। মহাভারতের শ্বেতদ্বীপের আখ্যান হইতেও এ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

দক্ষিণ-ভারতীয় সংহিতাগুলির মধ্যে অধুনা যেগুলি পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরসংহিতাই প্রাচীনতম। ঈশ্বরসংহিতায় তমিড়-বেদ বা দ্রামিড়ীশ্রুতি অধ্যয়নের উপদেশ আছে। ইহাতে মহীশূরের অন্তর্গত মেলকোটমাহাত্ম্যও আছে। শ্রীরামানুজের গুরু যামুনাচার্য তাঁহার "আগমপ্রামাণ্য" গ্রন্থে ঈশ্বরসংহিতা হইতে তিনবার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শৈবাগমের ন্যায় আদর্শ পঞ্চরাত্রসংহিতা চারি পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদে জ্ঞান (knowledge) উপদিষ্ট হইয়াছে, দ্বিতীয় পাদে যোগ (concentration), তৃতীয় পাদে 'ক্রিয়া' (making) এবং চতুর্থ পাদে চর্যা (doing)।

ক্রিয়া অর্থে বুঝিতে হইবে মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যাহা কিছু সমস্ত। চর্যা অর্থে দৈনিক ধর্মকৃত্য, উৎসব, বর্ণাশ্রমধর্ম—এইগুলি বুঝিতে হইবে। খুব কম সংহিতাতেই এইগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত এই চারিটির একটি কিংবা দুইটির আলোচনাই দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যগুলি একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। একমাত্র পাদ্মতন্ত্রে এই চারিটি বিষয় উদাহরণ দিয়া বুঝানো হইয়াছে। জ্ঞানপাদে ৪৫ পৃষ্ঠা, যোগপাদে ১১ পৃষ্ঠা, ক্রিয়াপাদে ২১৫ পৃষ্ঠা ও চর্যাপাদে ৩৭৬ পৃষ্ঠা।

সংহিতাগুলি আলোচনা করিয়া দেখা যায়—ক্রিয়া ও চর্যাই ইহাদের প্রিয় বিষয়। বাকীগুলি ভূমিকাচ্ছলে লিখিত মাত্র।

সংহিতাগুলির পাদবিভাগ মাত্র দুইটি সংহিতায় আছে—একটি পাদ্মতন্ত্র, অপরটি "বিষ্ণুসংহিতা'। পাঁচটি রাত্রের বিভাগ শুধু যে নারদীয় পঞ্চরাত্রে আছে তাহা নয়, 'মহাসনৎকুমার-সংহিতা' নামক একখানি প্রাচীনতর খাঁটি গ্রন্থে আছে। এই সংহিতায় চারিটি রাত্র, নাম—ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও ঋষিরাত্র। পঞ্চম রাত্রের নাম কোন পুস্তকে পাই নাই। 'বিষ্বেন্দ্রসংহিতা' পরবর্তী রচনা হইলেও ইহার ১. ৩১-৩৪ শ্লোকে ঐ কথা দেখিতে পাওয়া যায়—কৃতযুগ যখন আসিল, তখন কেশবের অনুগ্রহে অনন্ত নাগ, গরুড়, বিষ্বক্সেন, শিব ও ব্রহ্মা এই শাস্ত্র এইরূপভাবে শ্রবণ করিয়াছিলেনঃ প্রথম রাত্রে অনন্তের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় রাত্রে গরুড়ের, তৃতীয় রাত্রে সেনেশের, চতুর্থ রাত্রে ব্রহ্মার উত্তর দেওয়া হয়। পঞ্চম রাত্রে রুদ্র প্রশ্নকর্তা। দেখা যাইতেছে যে, ইঁহারা প্রত্যেকেই চারিপাদবিভক্ত লক্ষ শ্লোকযুক্ত শ্রদ্ধাশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন। যেহেতু সমগ্র শাস্ত্রের শ্লোক সংখ্যা ৫ লক্ষ, ইহার নাম পঞ্চরাত্র।

হয়শীর্ষ-সংহিতা চারিটি কাণ্ডে। প্রতি কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় অনুসারে কাণ্ডগুলির নাম—প্রতিষ্ঠা, সংকর্ষ, লিঙ্গ ও সৌরকাণ্ড। ২য় কাণ্ডে পূজা থাকিবে এইরূপ উক্তি আছে, তবে প্রায় সমস্তটাই প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় কাণ্ডে একেবারেই শৈব ব্যাপার। পারমেশ্বর-সংহিতার নাম করা প্রয়োজন। কেননা এখানিতে জ্ঞানকাণ্ড (১-২ পাদ) ও ক্রিয়াকাণ্ড (৩-৪) আছে। ভারদ্বাজ-সংহিতায় শুধু চর্যা, বিশেষত প্রপত্তি। পঞ্চরাত্রে পাঁচটি প্রধান বিষয় আলোচিত হইয়াছে। নারদীয়তেও পাঁচটি রাত্রের কথায় বলা হইয়াছে, তত্ত্ব, মুক্তিপ্রদ, ভক্তিপ্রদ, যৌগিক ও বৈশষিক এই পাঁচটি রাত্র। এই পাঁচটি রাত্রের আলোচনার সময় কিন্তু বিষয়ের সামঞ্জস্য নাই। মহাসনৎকুমারের পঞ্চরাত্রে সবগুলি একেবারে গুলাইয়া গিয়াছে।

রাত্র শব্দের মানে তন্ত্র বা সংহিতা। কেমন করিয়া হইল ঠিক করা এখন শক্ত।

শতপথ-ব্রাহ্মণে (১৩. ৬. ১) সর্বপ্রথম পঞ্চরাত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহার পূর্বে আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইহাতে আছে—পুরুষ নারায়ণ পঞ্চদিবসব্যাপী পঞ্চরাত্রসত্রের অনুকল্পনা করেন। ইহা দ্বারা সকল জীবের চেয়ে বড় হওয়া যাইবে। এই ব্রাহ্মণের ১২. ৩. ৪ এ বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে নারায়ণ নিজেকে বলি দিয়া কেমন করিয়া জগৎ পূজ্য হইয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে যে নারায়ণের সঙ্গে পুরুষসূক্তের সম্বন্ধ আছে—তিনি পুরুষসূক্ত-কর্তা। পুরুষসূক্ত ও মহানারায়ণ-উপনিষদের সহস্র-শীর্ষ অধ্যায় পঞ্চরাত্রীদের সৃষ্টিতত্ব ও মন্ত্রব্যাপারে বিশেষ আবশ্যক। নারায়ণের পঞ্চরাত্রসত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা হইতে পঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের পঞ্চরাত্র নাম হইয়া থাকিবে। পঞ্চরাত্র সত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যায় হরির পঞ্চরূপের (self-manifestation) কথা আছে। পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চা।

পাঞ্চরাত্র-সাহিত্য দুই রকমের—অপৌরুষেয় ও পৌরুষেয়।

পৌরুষের সাহিত্যে দুইটি ভাগ—বিধি ও প্রয়োগ। ইহাতে শাস্ত্রবচনের উদ্ধার থাকে, টীকা, ভাষ, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনা থাকে।

অপৌরুষেয়গুলি সবগুলি সংহিতা—অধ্যায়ে, পটলে বিভক্ত। পঞ্চরাত্রের কোন কোন বিষয়ের আলোচনা এগুলিতে থাকে।

কিন্তু এসব সংহিতা তা নয়—ইহাদের তন্ত্রও বলা হয়। এগুলি কাণ্ডে বিভক্ত। দার্শনিক ও ধর্মমত এগুলিতে থাকে। যেমন অহির্বুধ্নসংহিতা ; ইহাতে ভগবৎসংহিতা, কর্মসংহিতা, বিদ্যাসংহিতা প্রভৃতি সাতখানি সংহিতার নাম আছে। আবার পতিতন্ত্র, পশুতন্ত্র, পাশতন্ত্র প্রভৃতির কথাও আছে। সাত্বত ও পাশুপত মতও আছে।

দুঃখের বিষয় জ্ঞানমৃতসার বা নারদীয় উত্তর ভারতে মিলে। আর তাই এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল নারদপঞ্চরাত্র নাম দিয়া মুদ্রিত করে। এখানি যে পরবর্তী নূতন পুস্তক রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন (Saivism and Vaishnavism, p. 40-41—Ency. of Indo-Aryan Research)। দক্ষিণ ভারতেও ইহা জেল বলিয়া পরিত্যক্ত।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে আরও অনেক সংহিতা আছে। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর 'The Pancharatra or Bhagavat System' (পৃঃ ৩৮-৪১) সাত্বতসংহিতায় অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। ১৯১১ সালে গোবিন্দাচার্য স্বামী 'The Pancharatra or Bhagavat System' (J. R. A. S.) নামে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহাতে অনেক সংহিতার কথা আছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব

পৌরুষী রাত্রির অষ্টম ও শেষ অংশে বিষ্ণুর মহাশক্তি যেন তাঁহার আদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। চক্ষুর এই উন্মেষকে অহির্বুধ্ন্যসংহিতা আকাশে বিদ্যুৎ-ক্রীড়ার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এ পর্যন্ত শক্তি ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ছিল, তাঁহাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিবার উপায় ছিল না, শক্তি অন্ধকার বা শূন্যাকারে যেন ছিলেন, তারপর হঠাৎ 'কস্মাচ্চিৎ স্বাতন্ত্র্যাৎ' স্ফুলিঙ্গের মত তাঁহার স্বসত্বার ক্ষুদ্রাদপি অংশে ক্রিয়া (acting force) এবং ভূতি (matter বা becoming) এই দুই ভাবে বিকশিত হইয়া উঠিলেন।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, যদিও লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর প্রকৃত অভিন্নত্ব পুনঃপুনঃ ধ্বনিত করা হইয়া থাকে তথাপি এই দুইটিকে প্রকৃত পৃথক বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। এমনকি প্রলয়েও

ইহারা সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া এক হইয়া যান না, কিন্তু তাঁহারা যেন এক পরমতত্ত্ব (principle) হন। তখন লক্ষ্মী মহারাত্রি হইতে বাহির হন—ইনি সেই পুরাতনী লক্ষ্মী—নূতন লক্ষ্মী নন। লক্ষ্মীতন্ত্রে (২. ১৭) এই উভয়ের সম্বন্ধকে অবিনাভাব বা সমন্বয় বলা হইয়াছে। ধর্মীর সহিত ধর্মের (attribute) যে সম্বন্ধ, ভাবের (existence) সহিত ভবতের (that which exists) যে সম্বন্ধ, অহন্তার সহিত অহমের যে সম্বন্ধ, চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার এবং সূর্যের সহিত সূর্যরশ্মির যে সম্বন্ধ, পুরাতনী লক্ষ্মীর সহিত মহারাত্রি হইতে প্রকটিত লক্ষ্মীর সেই সম্বন্ধ। বিষ্ণুর সর্বোত্তম (transcendent) ভাব স্থির রাখিবার জন্যই এই দ্বৈতের (dualism) অবতারণা। লক্ষ্মীকে স্বতন্ত্র করিবার প্রয়োজন কি? লক্ষ্মীই যা কিছু সব করেন, আর যা কিছু তিনি করেন তা সবই বিষ্ণুর ইচ্ছার প্রকাশমাত্র।

ক্রিয়াশক্তি হইল 'লক্ষ্ম্যাঃ সুদর্শনী কলা'; বিষ্ণুর সুদর্শন বা চক্র তার প্রতীক। এই সুদর্শন দেশ ও কালের অধীন নয়। "ন দেশকালাদিকা ব্যাপ্তিস্তস্য'। ইহাকে ভাগ করাও যায় না, তাই নিষ্ফল। কিন্তু ভূতিশক্তি 'নানা ভেদবতী'। মুক্তার সহিত শুক্তির যে সম্বন্ধ ভূতির সহিত ক্রিয়ার সেই সম্বন্ধ। ভূতি শক্তির 'কোটি-অংশ'। সুতরাং ক্রিয়ার সঙ্গে ভূতির তুলনাই হয় না। সুদর্শন যখন বিষ্ণুর প্রহরণ, আমরা বলিতে পারি বিষ্ণু নিমিত্ত কারণ (efficient cause), ক্রিয়াশক্তি (instrumental cause), এবং ভূতিশক্তি সমবায়ী বা উপাদান কারণ (material cause)। পরব্রহ্ম বিষ্ণুর অব্যক্তভাব পঞ্চরাত্রে এমনই পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে যে, কার্যত আমাদের এক শক্তি লক্ষ্মীর সহিতই দরকার হয়। এই লক্ষ্মী ভূতিরূপে ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতীত হন এবং ক্রিয়ারূপে তাহাতে জীবনী সঞ্চার ও তাহাকে চালিত করেন। এই জন্যই ক্রিয়াশক্তিকে বলা হইয়াছে—'প্রাণরূপো বিষ্ণোঃ সঙ্কল্পঃ'। এই

ক্রিয়াশক্তি 'ভূতিপরিবর্তকা'—ইহার বলে সব চলিতেছে,—ইনি 'ভূতিং সম্ভাবয়তি' সমস্ত সৃষ্টিকে সম্ভব করিতেছেন। সৃষ্টিকালে প্রাক্কালিক ভূতকে (primordial matterকে) বিবর্তনে সংযুক্ত করেন। কালকে গণনায় সংযুক্ত করেন; আত্মাকে আস্বাদন-প্রচেষ্টায় সংযুক্ত করেন; এইগুলি ব্রহ্মাণ্ড যতদিন থাকিবে ততদিন পোষণ করেন, আর প্রলয়কালে সমস্ত সংবরণ করেন।

"ভূতিশ্চেতি ক্রিয়া চেতি ভাব্যভাবকসংজ্ঞিতে।
ভূতিঃ সা ক্রিয়য়া জ্বালা মরুতেব প্রণর্ত্যতে॥"

অগ্নি যেমন মরুতের দ্বারা আন্দোলিত হয় সেই রকম শক্তির বিভূতিময়াংশও সুদর্শনের দ্বারা নর্তিত হয়।

লক্ষ্মীর প্রথম ব্যক্তভাবের নাম 'শুদ্ধদৃষ্টি' বা গুণোন্মেষদশা।

এই অবস্থায় পরব্রহ্মের গুণের আবির্ভাব হয়। এই গুণগুলি অপ্রাকৃত। অর্থাৎ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা প্রকৃতির এখনও অস্তিত্বই নাই। সুতরাং সত্ব, রজ, তম গুণের সঙ্গে এই গুণাবলীর কোন সম্বন্ধই নাই; সুতরাং 'ব্রহ্ম নির্গুণ' এই প্রাচীন উক্তির সঙ্গে ব্রহ্মের ষড়্‌গুণযুক্ত হওয়ায় কিছু আসিয়া যাইতেছে না। পক্ষান্তরে, ষড়্‌গুণ তাঁহার থাকা প্রয়োজন, নতুবা শুদ্ধসৃষ্টি অসম্ভব। আর শুদ্ধসৃষ্টি না হইলে অন্যান্য সৃষ্টিও হইবে না। যাহা হউক, গুণের বিকাশ ব্রহ্মসত্বার কিছু করে না, তাঁর ব্যক্তীভাব manifestation বা শক্তির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক।

"যত্তৎ ষাড়্‌গুণ্যমিত্যুক্তং জ্ঞানৈশ্বর্যবলাদিকম্।
যুগৈস্তস্য ত্রিভিঃ শুদ্ধা সৃষ্টিভূতেঃ প্রবর্ততে॥"—৫. ১৬

জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য, তেজ ইহাদের ষাড়্‌গুণ্য বলা হয়। ইহাদের তিনটি (অর্থাৎ তিন জোড়া) লইয়া শুদ্ধা সৃষ্টি যা প্রথম সৃষ্টি হয়।

প্রথম গুণ জ্ঞান। ইহা সর্বজ্ঞ, ইহা একদিকে যেমন ব্রহ্মের স্বরূপ (essence), অপরদিকে তেমনই তাঁহার গুণ (attri-

bute)। এইজন্য আর পাঁচটি গুণকে 'জ্ঞাতস্য স্বতয়াঃ' বলা হয়। রামানুজ-গুরু যমুনাচার্য পঞ্চরাত্রের জ্ঞানের এই উভয় ভাব স্বীকার করিয়াছেন—'আশ্রয়াদ্ অন্যতো বৃত্তে রাশ্রয়েণ সমন্বয়াৎ'। স্ফুলিঙ্গ (substance) ও তজ্জনিত আলোক (attribute) ইহার দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বুঝাইয়াছেন।

এই জ্ঞান আবার লক্ষ্মীর স্বরূপ (লক্ষ্মীতন্ত্র ২. ২৫)।

দ্বিতীয় গুণ ঐশ্বর্য ('activity based on independence of any other cause')। লক্ষ্মীতন্ত্র (২. ২৮) বলেন অন্যান্য তত্ত্বশাস্ত্রে যাহাকে ইচ্ছা বলে, ইহা তাহাই।

তৃতীয় গুণ শক্তি। ইহা 'জগৎপ্রকৃতিভাব'। ইহা জগতের material cause. তত্ত্বত্রয়ের টীকায় বরবর মুনি ইহাকে 'অঘটিত-ঘটন' বলিয়াছেন। আমাদের empirical উপায়ে যাহার কারণ স্থির করিতে পারা যায় না, ইহা তাহাই উৎপাদন করে।

চতুর্থ গুণ বল। ইহা 'শ্রমহানি' অর্থাৎ জগৎসৃষ্টিতে ক্লান্তি নাই, অথচ 'ধারণ-সামর্থ্য' আছে। সমস্ত বস্তু ধারণ করিবার শক্তি তাঁহার আছে।

পঞ্চম গুণ বীর্য। 'বিকার-বিরহ' উপাদান কারণ হইয়াও নির্লিপ্ত ; লক্ষ্মীতন্ত্র (২. ৩১) বলেন জগতে এ ভাব দেখা যায় না। এখানে 'দুধ তার স্বভাব হারাইয়া ফেলে যখন, তখন সে দধি হয়।

ষষ্ঠ গুণ তেজ। ইহাতে 'সহকারি-অনপেক্ষা' (self-sufficiency) ও 'পরাভিভবনসামর্থ্য' অপরকে পরাভূত করিবার শক্তি আছে।

এই যে ছুটি গুণ ইহারা শুদ্ধ সৃষ্টির উপাদান বা করণ। কখনও সমষ্টিরূপে, কখনও যুগ্মভাবে।

জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি—বিশ্রমভূময়ঃ (stages of rest)

বল, বীর্য, তেজ—শ্রমভূময়ঃ (stage of effort) (লক্ষ্মী ৪.২৪)।

১ জ্ঞান + ৪ বল—যুগ

২ ঐশ্বর্য + ৫ বীর্য—যুগ

৩ শক্তি + ৬ তেজ—যুগ

ইহাদের সমষ্টিতে বাসুদেব ও তাঁহার শক্তিবিগ্রহ (৬. ২৫—'ষাড়্গুণ্যবিগ্রহ দেবং')।

পঞ্চরাত্র সৃষ্টির একটি ধারার উপদেশ দিয়াছেন। প্রথম ব্যতীত প্রত্যেক সৃষ্টি (emanation) তৎপূর্ব হইতে সঞ্জাত। এক স্ফুলিঙ্গ হইতে অপর স্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব। অণ্ড জন্মের পূর্বে ইহাদের আবির্ভাব। সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই তিনটি ব্যূহ। অথবা বাসুদেবকে ধরিয়া চারিটি ব্যূহ। বি-উহ ধাতু হইতে ব্যূহ হইয়াছে। ছয়টি গুণের তিনটি যুগ্মে ব্যূহিত হওয়ার নাম ব্যূহ। [বিষ্ণু দ্রঃ]

নারায়ণতত্ত্ব

ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের (৮২. ৫-৬) বাণী উপদেশ করিতেছে—যখন আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, দেবগণও ছিলেন না, তখন যাহা জলে ভাসিয়াছিল এবং দেবগণ যাহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই যে অণ্ড তাহা কি ? দেবগণ যে অণ্ড মধ্যে অবস্থিত তাহা জলমধ্যে ছিল। জন্মরহিত যিনি, তাঁহার নাভির উপর এমন কিছু অবস্থিত ছিল যাহার মধ্যে সকল প্রাণীই ছিলেন।

জন্মরহিত যিনি তিনিই নারায়ণ পদবাচ্য হইলেন ; তাঁহার নাভির উপরিস্থিত যে অণ্ড তাহা ব্রহ্মা হইলেন। নারায়ণ জলমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। মনু ও পুরাণের বচনে বিষয়টি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনু বলেন, জলের নাম 'নারা' ; কারণ, ফুলই বস্তুত নরের পুত্র। জল ব্রহ্মের প্রথম আশ্রয় বা অয়ন ছিল বলিয়া পরম পুরুষের নাম নারায়ণ।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥—মনু° ১. ১০

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন যে, নর বলিলে পরমাত্মাকে বুঝায়। পরমাত্মা প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন, সুতরাং প্রথমে নর হইতে জাত বলিয়া জলের নাম হইয়াছে 'নারা'। Bibleএর Genesisএর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ঠিক এই ভাবের কথা আছে। সেখানে লেখা আছে—

1. "In the beginning God created the heaven and the earth.

2. And the earth was without form, and void and darkness was upon the face of the deed and

the spirit of God moved upon the face of the waters."

বিষ্ণুপুরাণ (৪র্থ অধ্যায়) বলেন যে, পাদ্মকল্পে ব্রহ্মা সুপ্তোত্থিত হইয়া সর্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিলেন ; অতঃপর তিনি জলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এখানে বিষ্ণুপুরাণ মনুর উল্লিখিত বচনই অবিকল তুলিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণেও প্রায় তাহাই করিয়াছে, কোথাও বা একটু-আধটু বদলাইয়াছে। কেবল মৎস্য, বায়ু ও লিঙ্গপুরাণে উক্ত বচনের ভিন্নরূপ পাঠই দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবতপুরাণে প্রাচীন পাঠের ব্যাখ্যা এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে—

"পুরুষোণ্ডং বিনিভিদ্য যদাদৌ স বিনির্গতঃ
আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছাপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচী।
তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রপরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ॥

সৃষ্টির আদিতে যখন সেই পুরুষ অণ্ড বিভেদপূর্বক বিনির্গত হইলেন, তখন তিনি আপনার অয়নের সমিচ্ছু হইয়া জল সৃষ্টি করিলেন—শুচি যিনি তিনি শুচিরই সৃষ্টি করিলেন। এই সলিল-সমষ্টির মধ্যে তিনি নিজ স্বরূপেরই সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে তিনি সহস্র বৎসর থাকিয়া পুরুষোদ্ভব জলরাশি হইতে নারায়ণ নাম লাভ করেন।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে (১৪.১৪) নারায়ণের ব্যাখ্যা অন্যরূপেও প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, তুমি যখন সমস্ত দেহীর আত্মা তখন কি তুমি নারায়ণ নও? নার শব্দের অর্থ জীবসমূহ এবং অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীবসমূহ যাহার আশ্রয় সেই পরমাত্মাই নারায়ণ শব্দের বাচ্য। তুমি অধীশ অর্থাৎ সর্বপ্রবর্তক বলিয়াও নারায়ণ। কারণ, নারের অর্থাৎ জীব-সমূহের বা তত্ত্বসমূহের প্রবর্তক ঈশ্বরকে নারায়ণ বলা যায়। তুমি

নারায়ণ—কেননা, তুমি যে নিখিল লোককে জানিতেছ—সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছ—তুমি যে নিখিল লোকের সাক্ষী। আবার তুমি নারায়ণ, যেহেতু নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত যে চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব এবং তাহা হইতে সঞ্জাত যে জল এই দুইটি তোমার আশ্রয়। সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণ তোমার অঙ্গ বা মূর্তিবিশেষ। তিনি তোমা হইতে ভিন্ন নন। তবে সেই নারায়ণের তাদৃশ পরিচ্ছন্নতা সত্য নহে—ইহা তোমার লীলা অর্থাৎ নারায়ণরূপে তোমার সেই মূর্তি সত্য, উহা মায়িক নহে।

"নারায়ণস্ত্বং নহিসর্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥"

ভাগবতের এই যে নির্দেশ, ইহা ভাগবতের নিজস্ব বা নূতন ব্যাখ্যা নয়। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে নর অর্থাৎ আত্মা হইতে তত্ত্বসকল জাত হয় এবং আত্মাতেই প্রলীন হয়, তাই তাঁহার নাম নারায়ণ।

"নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারানীতি বিদুর্বুধাঃ।
তান্যেবায়নং যস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥"

বোধায়ন শ্রৌতসূত্রে আছে—

"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥"

নারায়ণ সমস্ত দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তুর ভিতর বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। নারায়ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুতেই বিরাজিত আছেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে (১০৯ অধ্যায়) নারায়ণ শব্দের দুইটি অভিনব অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে।

প্রথমটি হইতেছে—

"নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যমরণং জ্ঞানমীপ্সিতম্।
ততোজ্ঞানং ভবেদ্ যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥"

নার বলিতে মোক্ষ বুঝিতে হইবে এবং অয়ন শব্দের অর্থ করিতে হইবে অভীপ্সিত জ্ঞান। যাহা হইতে এই উভয় বিষয়ক জ্ঞান হয় তিনিই নারায়ণ বলিয়া কথিত হন।

এই গেল এক ব্যাখ্যা। অপর ব্যাখ্যা হইতেছে—

"নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতম্।
যতো হি গমনং তেষাং সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

যাহারা কৃতপাপ—পাপী, তাহারা নারাশব্দ বাচ্য। অয়ন শব্দের অর্থ গতি। যাহা হইতে পাপীর গতি-মুক্তি হয়, তাহার নাম নারায়ণ।

পুরাণে এইরূপে নারায়ণ শব্দের নানা রকম ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসমুদয়ের আলোচনার প্রয়োজন নাই। পূর্বে বলিয়াছি, মনু জলকে নারায়ণের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে হরিবংশ মনুর সহিত একমত। মনুর ব্রহ্মা এবং হরিবংশের হরি প্রথমে জলে ভাসিতেছিলেন। ব্রহ্মা ও হরি উভয়েই এই হিসাবে নারায়ণ। বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণের বচনের সহিত মনুর বচনের ঐক্য আছে। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, নারায়ণ ক্ষীর-সমুদ্রে সর্পশয্যায় শায়িত। কোন কোন মতে এই নারায়ণের স্বর্গ হইতেছে শ্বেতদ্বীপ। কথাসরিৎসাগরে এক স্থানে লিখিত আছে যে, নরবাহনদত্ত দেবসিদ্ধি কর্তৃক শ্বেতদ্বীপে হরির নিকট নীত হইয়াছিলেন। হরি তখন শেষনাগের গাত্রোপরি বিশ্রাম করিতেছিলেন; নারদ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাঁহার পরিচর্যায় নিরত ছিলেন। এই গ্রন্থের অন্য স্থলে উল্লিখিত আছে যে, কতিপয় দেবতা শ্বেতদ্বীপে গিয়া দেখিলেন, হরি রত্নমণ্ডিত অট্টালিকায় সর্পশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন এবং লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

মহাভারতের বনপর্বে (১৮৮-৮৯ অধ্যায়) প্রলয় কালের অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে: সমস্তই জলে জলময়, আর কিছুই ছিল না; কেবল একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষের অস্তিত্বমাত্র ছিল। সেই বৃক্ষের এক শাখার উপরিভাগে এক খট্টার উপর এক

বালক শয়ন করিয়াছিল। মার্কণ্ডেয় সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, বালক মুখব্যাদানপূর্বক মার্কণ্ডেয়কে গিলিয়া ফেলিল। মার্কণ্ডেয় বালকের মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া এক নূতন বিশ্ব দেখিতে পাইলেন। তিনি বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তৎপরে বালক মার্কণ্ডেয়কে উদ্‌গার করিয়া ফেলিল। তখন মার্কণ্ডেয় আবার চতুর্দিক্ জলময় দেখিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় বালকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলিল, আমিই জলকে 'নারায়ণ' নামে অভিহিত করিয়াছি। জলই আমার আশ্রয়; সেই জন্য আমি নারায়ণ নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় অনেক কালের ঋষি, তিনি যুধিষ্ঠিরের সভায় আগমন করিয়া পুরাকালের এই কাহিনী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আর উপদেশ করিয়া ছিলেন, হে যুধিষ্ঠির, তোমার আত্মীয় জনার্দনই সেই নারায়ণ। এই আখ্যায়িকার মার্কণ্ডেয়ের সহসা আবির্ভাবের ব্যাপারটি ভাল বোঝা গেল না। যখন কিছুই ছিল না তখন মার্কণ্ডেয় কোথা হইতে আসিলেন? যাহা হউক, নারায়ণের সর্ব প্রথমে সলিলাশ্রয়ের কথাটা বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে। মেধাতিথি ও গোভিল উভয়েই বলিয়াছেন, 'আপো' 'নরাঃ'—জলসমূহের নামই 'নরা'। পরমপুরুষের অপর একটি নাম যে নর তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। মহাভারতের একস্থানে (.৩.১৪৯.৩৯) লিখিত আছে—"জহ্নুর্নারায়ণো নরঃ"—ভাষ্যকার ইহার ভাষ্য করিয়াছেন, "নর আত্মা ততো জাতানি আকাশাদীনি নরানি তানি কার্যাণি অয়তে কারণাত্মনা ব্যাপ্নুতে নারায়ণঃ।"—অর্থাৎ নর শব্দে আত্মা বুঝাইতেছে। "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতি দ্বারা আত্মা হইতে আকাশাদি উৎপন্ন হইয়াছে—ইহার নাম 'নারা'। এই নারা কারণস্বরূপে পরিব্যাপ্ত হয় বলিয়া নারায়ণসংজ্ঞা হইয়াছে।

যথাশক্তি অনুসন্ধান করিয়া নারায়ণের অর্ণবশায়িত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা পাইয়াছি তাহা নিবেদিত হইল। এইবার নারায়ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বেদ, উপনিষদ্, মহাকাব্য, পুরাণের যুগে হিন্দু যেমন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিত, এখনও সে তেমনই করিয়া থাকে। বেদের খুব প্রাচীনভাগেও নারায়ণের নাম পাওয়া যায়। বেদ ইহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (১২. ৩. ৪) সর্বপ্রথমে পুরুষ-নারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষ-নারায়ণ যজ্ঞ করিতেছেন। আর এক স্থানে (১৩.৬.১) দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ-নারায়ণ পঞ্চরাত্রসত্র করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। গর্ভোপনিষৎ ও মহোপনিষৎ নারায়ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। আত্মাপ্রবোধ উপনিষৎ ও সাকাল্যো-পনিষদে তিনি পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। মৈত্রেয়োপনিষৎ, বাসুদেবোপনিষৎ, স্কন্দোপনিষৎ, রামতাপনীয়োপণিষৎ এবং মুক্তিকোপনিষদে নারায়ণের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের ১০ম প্রপাঠক, ১১শ অনুবাকে নারায়ণ বিরাট্‌রূপ পরব্রহ্ম, বিশ্বাত্মা, পরোজ্যোতিরূপে কীর্তিত হইয়াছেন।

"সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসম্ভুবম্।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্॥
বিশ্বতঃ পরমং নিতং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্।
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি॥
পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।
নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মণং পরামণম্॥
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্মতত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরোজ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ নরঃ॥ ঋক্

মহানারায়ণ-উপনিষদে (১১.৪-৫) এই একই কথা দ্যোতিত হইয়াছে।

সুবালোপণিষৎ (৭) উপদেশ করিতেছেন,—

"যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরণ্"...."যস্য মৃত্যুঃ শরীরং যং মৃত্যুর্ণবেদ। এষ সর্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্‌মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।"—

"যিনি অভ্যন্তরে বিচরণপূর্বক পৃথিবীকে পরিচালিত করেন"—"মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ এবং দিব্য অলৌকিক অদ্বিতীয় দেবতা—নারায়ণ।"

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ তদনু প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চা-ভবৎ" (তৈত্তিরীয়, ৬.২)—"তিনি ভূতসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম অথবা কার্য ও কারণরূপে প্রকটিত হইলেন।" এই শ্রুতিতে নারায়ণকে আত্মা এবং চিদচিৎ বস্তুসমূহকে তাঁহার দেহরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মহানারায়ণোপনিষৎ (৩.১.১-১২) বলিতেছেন,—

"অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।"

'এই জগতে যে কিছু পদার্থ সৃষ্ট বা শ্রুত হয়, নারায়ণ সেই সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।' এই বচনের ভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য বলেন যে, 'জগৎকারণবাদী বাক্যটি সাংখ্যের প্রধানাদি প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং বলিতে হইবে যে স্থির হইল—সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বেশ্বর, সমস্ত দোষসংস্পর্শশূন্য, যাঁহার অবধি নাই, যিনি নিরতিশয় এবং অশেষ কল্যাণগুনবারিধিস্বরূপ, তিনিই সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত ব্রহ্ম। অবশ্য জিজ্ঞাসিতব্য ব্রহ্মে মুখ্য ঈক্ষণ প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীরামানুজাচার্য শ্রীবাদরায়ণের শ্রুতি সমুদয়ের সাহায্যে এখানে শ্রীশঙ্করাচার্যের নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সুবালোপনিষদে পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে—এমন কি, বৃহদারণ্যকে যে গুলি উল্লিখিত হয় নাই সেগুলিকেও এই উপনিষৎ ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় বলিয়া ব্রহ্মকে তাহার আত্মারূপে নির্দেশ করিয়াছে। সুবালোপনিষৎ উপদেশ করিতেছেন—'বুদ্ধি যাঁহার শরীর, অহঙ্কার যাঁহার শরীর,

চিত্ত যাঁহার শরীর, অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অক্ষয় যাঁহার শরীর এবং যিনি মৃত্যুর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক দেবতা—নারায়ণ।' এখানে মৃত্যু বলিতে তমঃশব্দবাচ্য অতি সূক্ষ্ম অচেতন পদার্থকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্রহ্মাত্মকে তত্ত্বসকল ব্রহ্মের শরীর বলিয়া ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে—যেমন পৃথিবী জলে লীন হয়, জল তেজে লীন হয়, তেজ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু আকাশে লীন হয়, আকাশ ইন্দ্রিয়সমূহে, ইন্দ্রিয়সমূহ তন্মাত্রে, তন্মাত্রসকল আবার ভূতাদি অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লীন হয়, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়, অক্ষরও তমতে লীন হয়, সেই তম আবার পরদেবতা পরমাত্মায় একীভূত হয়।' এই উপনিষদে এই পদার্থগুলি নারায়ণের শরীর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মহাভারতে শান্তিপর্বে (১৮২.১) ভীষ্মকে প্রশ্ন করা হয়—স্থাবর-জঙ্গম এই সমস্ত জগৎ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল ? এবং প্রলয়কালে কাহাকে আশ্রয় করে ? উত্তরে ভীষ্ম বলে,—

"নারায়ণো জগন্মূর্তিরণন্তাত্মা সনাতনঃ।"

অনন্তরূপী সনাতন নিত্য নারায়ণই জগন্মূর্তি অর্থাৎ এই জগৎ নারায়ণেরই শরীর।

মহোপনিষদে আছে—"একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নি র্ন সোমো ন সূর্যঃ, স একাকী ন রমেত. তস্যা ধ্যানান্তঃস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়ানি"—১.১

অগ্রে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা, ঈশান, এই দ্যাবাপৃথিবী, নক্ষত্র, জল, অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য ছিল না, তিনি একাকী তৃপ্তিলাভ করিলেন না ; তিনি ধ্যানস্থ হইলে পর তাঁহার একটি কন্যা ও দশটি ইন্দ্রিয়, উদ্ভূত হইল। বৃহদারণ্যকেও (৩.৪.১১) এই কথার একরূপ

পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম বা ইদমেকমেব্যগ্র আসীৎ" 'অগ্রে এই জগৎ এক ব্রহ্মই ছিলেন' ; তাহার পর তিনি তৃপ্তিলাভ না করিয়া সংকল্প করিলেন, "বহু স্যাং প্রজায়েরেতি" (ছান্দোগ্য ৬.২.১)—'আমি বহু হইব, জন্মিব'—অমনই 'ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রো পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশানঃ' (বৃহদারণ্যক, ৩.৪.১১) এই দেবক্ষত্রিয়গণ উত্তমরূপে তৎকর্তৃক সৃষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষৎ আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, নারায়ণ বেদের পরবর্তী ব্রাহ্মণ ভাগে পরমপুরুষ পরতত্ত্ব বলিয়া পূজিত হইতেন। প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য-উপনিষদে দেবকীপুত্র বাসুদেবের কথা আছে। অন্যত্রও কোথাও কোথাও বাসুদেব ও নারায়ণ একতত্ত্ব বলিয়া উক্ত আছে। তৎকালে বাসুদেবের অর্চনার কথা বিশেষ জানা যায় না। রামায়ণ ও মহাভারত যুগে বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়। ইহার পূর্বে সম্ভবত নারায়ণোপাসনা প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক যুগে যখন বাসুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়, তখন বাসুদেব নারায়ণের সহিত একত্বলাভ করেন।

তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের নারায়ণোপনিষদে নারায়ণ-উপাসনার একটি মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেটি এই—

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥"

মহাভারতের প্রতিপর্বের আদিতে নর, নারায়ণ, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কারপূর্বক উক্ত শাস্ত্রপাঠের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, মহাভারত রচনা-কালে নরনারায়ণ বিশেষভাবেই পূজিত হইতেন। বনপর্বে (১২.৪৬, ৪৭) জনার্দন অর্জুনকে বলিতেছেন—"হে অজেয়! তুমি নর ও আমি নারায়ণ। আমার সেই ঋষি নর-নারায়ণ। আমার উপযুক্ত সময়ে পৃথিবীতে আসিয়াছি। হে পার্থ! তোমাতে আমাতে কিছুই

প্রভেদ নাই। কেহই আমাদিগকে ভিন্ন বুঝিতে সমর্থ নয়।" ঐ পর্বেরই ত্রিংশ অধ্যায়ে (১ম শ্লোক) দেবাদিদেব শিব অর্জুনকে বলিতেছেন—"পূর্বজন্মে তুমি নর ছিলে ও নারায়ণের সহিত একত্র বিরাজ করিতে। তোমরা উভয়ে বদরিকাশ্রমে বহু সহস্র বৎসরব্যাপী তপস্যা করিয়াছিলে।" উদ্যোগপর্বে (৪৯. ১৯) কথিত আছে, বাসুদেব ও অর্জুন, এই মহাবীরদ্বয় সেই প্রাচীনদের নর-নারায়ণ।"

মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে নারায়ণ ও বাসুদেবের অভিন্নতা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এই পর্বাধ্যায়ের প্রারম্ভে নারায়ণ মূর্তিচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া ধর্মের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ তাঁহার চারি মূর্তি। তন্মধ্যে নর ও নারায়ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যানিরত হইয়াছিলেন। বনপর্বেও (৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) এই বিবরণ পাওয়া যায়। নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ ধর্মের পুত্র—অহিংসা তাঁহাদের মাতা। ধর্মের সহিত অহিংসার মিলন, ইহাকে ভারতীয় ধর্মের এক নূতন যুগ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। যাগযজ্ঞে পশুহিংসায় ক্রমে বিতৃষ্ণা হওয়ায় এক নবীনভাব মানবমনে অঙ্কুরিত হওয়া বিচিত্র নয়। অহিংসা পরমোধর্ম—এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্মমতেরই যে এক বিশেষত্ব তাহা নহে। এই ভাবটি বৌদ্ধধর্মে প্রণালীবদ্ধভাবে প্রচলিত হইবার বহুপূর্বে মানবমনকে আলোড়িত করিয়াছিল। এইভাবে পরিশেষে ভারতীয় মানব-সমাজের একাংশকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তিনটি শাখা ধর্মে পরিণত হইল।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারিটিতে চতুঃসনের ন্যায় একটি অবতার।

বাসনা মানুষকে পার্থিব বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এমনই শক্ত করিয়া বাঁধিয়াছে যে, সে বাঁধন ছেঁড়া তাহার পক্ষে একটা বিষম ব্যাপার। পার্থিব ধন, ঐশ্বর্য, সুখ, যশ, প্রতিপত্তি এ সকলের অন্বেষণে মানুষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান হইতেছে, স্বজনগণের মধ্যে যাহাতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে তাহারই চেষ্টায় সে ফিরিতেছে। পার্থিব সম্পদ যতই তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে, তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া নূতন সুখের মোহে মুগ্ধ হইয়া, নূতনতর সুখের আশায় সে ততই ছুটিতেছে। কিছুতেই তাহার আশা মিটিতেছে না। সুখের জন্য সে লালায়িত। সকল সময় তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা—'সুখং মে ভূয়াদ্ দুঃখং মে মাভূৎ'। সুখ সে চায় সত্য, কিন্তু জানে না সে তাহার সুখ কিসে হইবে। অথচ তাহার নিজের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহাকে পাইবার জন্য সে নিরবধি অসহ্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে চায়। তাহার অজ্ঞাতসারে নিশ্চয়ই সে এমন কিছুর আস্বাদ পাইতেছে যাহাকে ছাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহাকে সেই অজ্ঞাত বস্তুর জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া যেন বাঁচিয়া থাকিতেই হইবে। সে সংসারের আবর্তে ঘুরিয়া ঠেকিয়া বুঝিয়া ফেলে যে আনন্দই তাহার লক্ষ্য—আর এই আনন্দ লাভ করিবার জন্য তাহার এত ব্যগ্রতা। যখন সে কোন কিছুতে তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত আনন্দকে লাভ করিতে পারে না, তখনই আপনার শরীর ও মনের আশ্রয়ে সে যে-সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহারই নিগূঢ় মর্ম ও চূড়ান্ত অর্থ আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল হয়। মানুষ তখন এই বিশ্বসমস্যার নির্বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রস্তুত হইতে প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিতে পারে না;

ফলে জীবনের চরম লক্ষ্য কি তাহারই অনুসন্ধান করিতে থাকে। যখন এই অবস্থা লাভ করিবার মানুষের সৌভাগ্য হয় তখন সে আর কিছু চায় না, সে শুধু একটা পূর্ণতত্ত্বের অনুভূতির ভিখারী। আত্মাই সেই পূর্ণতত্ত্ব। আমরা যাহাকে 'আমি' 'আমি' বলি অস্মৎ-প্রত্যয়গোচর সেই বস্তুই আত্মবস্তুর ছায়া।[১] আর এই আত্মবস্তুই বিশ্বের পরম তত্ত্ব—পূর্ণতত্ত্ব। এই আত্মার অন্বেষণ, আর এই আত্মাকে জ্ঞানেতে পাওয়াই পরমানন্দ ও পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের একমাত্র সাধন।

এই আত্মার অন্বেষণ, এই অন্বেষণ, এই আত্মজিজ্ঞাসা ও যে আত্মজ্ঞানেতে এই জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয় সেই জ্ঞানই একমাত্র পরিপূর্ণ আনন্দবস্তু। ইহাই পরিপূর্ণ জ্ঞান। তখন মানুষের বুঝিবার অবকাশ হয়—"নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"—(ছা-উ° ৭.২৩)। এই আত্মাকে জানিলে আর অপর কোন কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না।[২] ঋষিগণ চিরদিনই এই আত্মা বা একত্বের অন্বেষণ করিয়াছেন। এই একত্বানুভূতিই আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির বিশিষ্ট ধর্ম। এই অন্বেষণকে শাস্ত্র 'তত্ত্বজিজ্ঞাসা' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানী যাঁহারা তাঁহারা এই পরিপূর্ণ আত্মাকে জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে সেই আত্মার দ্বিতীয় নাই—তিনি অদ্বিতীয়—অদ্বয়। তাত্ত্বিকগণ এই আত্মজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়াছেন 'তত্ত্ব'।[৩] উপনিষদ্‌বিদের নিকট যিনি 'ব্রহ্ম', হৈরণ্যগর্ভগণ যাঁহাকে 'পরমাত্মা' বলিয়াছেন এবং

---

১ ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥—কঠ-উ° ৩. ১।

২। আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।—বৃহ-উ° ২. ৪. ৫।

৩ তস্য নাম তদিতি—বৃহ-উ°।

সাত্বতগণ যাঁহাকে 'ভগবান্' বলিয়া দ্যোতিত করিয়াছেন—তিনিই তাত্ত্বিকদিগের 'তত্ত্ব'। ফলত তত্ত্ব, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ একার্থবাচক। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—তত্ত্বের তিনটি সংজ্ঞা। তাই ভাগবত বলিয়াছেন,—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে॥"—১. ২. ১১

যিনি ব্রহ্ম, তিনি নির্বিশেষ প্রকাশ।[১] শক্তিবর্গ এবং তাহাদের ধর্মাতিরিক্ত যে জ্ঞান তাহাই ব্রহ্ম।[২] যাহার সম্পূর্ণ শক্তি অনভিব্যক্ত তিনি 'আত্মা' বা 'পরমাত্মা'; ইনি সবিশেষ বা কিঞ্চিদ্‌বিশেষ অর্থাৎ কতিপয় শক্তিবিশিষ্ট প্রকাশের নাম পরমাত্মা। আর সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সম্পদ্ এবং পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য এই ছয়টি যাঁহার আছে, তিনিই পরিপূর্ণ সর্বশক্তিপ্রকাশ অর্থাৎ ভগবান্। যিনি সূর্যতাপের ন্যায় নির্বিশেষ সত্তা মাত্রে স্ফূর্তি পান জ্ঞানকাণ্ডে তিনি ব্রহ্ম; মায়াসাক্ষী সর্বান্তর্যামী রূপে যাঁহার প্রকাশ যোগমার্গে তাঁহাকে পরমাত্মা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, আর যিনি সর্বরসময়—ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন, দিব্যমঙ্গলবিগ্রহরূপে স্ফূর্ত, ভক্তিপথে তিনি ভগবান্ নামে অভিহিত। চরিতামৃতকারও এই কথা বলিয়াছেন,—

"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

এই তত্ত্বজিজ্ঞাসাই মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।[৩] ভোগ বা কর্ম চরম উদ্দেশ্য নয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে মূলসূত্র করিয়া মানবকে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

---

১ তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—কঠ-উ° ২. ১৫; শ্বেতাশ্ব-উ° ৬. ১৪; মুণ্ডক-উ° ২. ২. ১০।

২ ভাগবতের ১. ২. ১১ শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথকৃত ভাষ্য।

৩ ভাগপু° ১.২.১০।

এখন এই অদ্বয়জ্ঞান বা তত্ত্ব কাহাকে ইঙ্গিত করে?—অবশ্য যাঁহাতে ভগবত্তার পূর্ণ চরম বিকাশ হইয়াছে, যিনি স্বয়ং ভগবান্, যিনি সমস্ত অবতার হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু, যাঁহাতে পূর্ণানন্দ পূর্ণজ্ঞান ও পরম মহত্ত্ব বিদ্যমান তিনিই এই 'তত্ত্ব'। যিনি অনন্যাপেক্ষী হইয়া সকল অবতারের মূলস্বরূপ, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অন্যান্য অবতার হইয়াছেন তিনিই 'তত্ত্ববস্তু'। যাঁহার ভাব অচিন্ত্য, যিনি আনন্দ-স্বরূপ তিনি তত্ত্ব-বাচ্য। তত্ত্ববস্তু তিনি, যিনি এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির মূলকারণ যে প্রকৃতি তারও কারণ, যিনি নিজে অনাদি অথচ সকলের আদি; যিনি সর্বেশ্বর, সকলের প্রভু ও কর্তা, যিনি আনন্দ-ঘনরূপে অপ্রাকৃতমূর্তি।

এখন দেখা যাক্ এই পরমতত্ত্বের অভিধা কি? ব্রহ্মসংহিতা গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিতান্ত আদরের সামগ্রী। স্বয়ং মহাপ্রভু ইহার সিদ্ধান্তে বিমুগ্ধ হইয়া দক্ষিণদেশ হইতে এই গ্রন্থ নিজে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। শ্রীচরিতামৃতে আছে,—

> "সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাই ব্রহ্ম সংহিতার সম।
> গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ॥
> অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
> সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার॥"

এই সিদ্ধান্তগ্রন্থ নির্ণয় করিয়াছেন,—

> "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
> অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥—৫.১।

চরিতামৃতকার এরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

> "ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।"

এই কৃষ্ণপ্রাপ্তির ত্রিবিধ সাধন বলিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামী অবতারণা করিয়াছেন,—

> "সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তিহেতু ত্রিবিধ সাধন।
> জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ॥

তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ প্রকাশে ॥
ব্রহ্ম, আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।
রূঢ়ীবৃত্তে নির্বিশেষ অন্তর্যামী কয় ॥
জ্ঞানমার্গে নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে অন্তর্যামী স্বরূপেতে ভাসে ॥
রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
স্বয়ং ভগবত্ব প্রকাশে দুইত স্বরূপ ॥"

এই কৃষ্ণ যে অদ্বয়তত্ত্ব, তাহাও তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

"সেই অদ্বয়তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
যাঁহা বিনু কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন্ ॥"

সুতরাং "কালত্রয়াবাধ্যত্বং তত্ত্বত্বম্"[১] এই প্রাচীন উক্তির সার্থকতা সম্পাদিত হইল। শুধু তাহাই নয়—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥"

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্—একথার অর্থ কি বুঝিব?

"যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥
দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন।
তৈছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ ॥"

শ্রুতিতে[২] যাঁহাকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াছেন তিনি কৃষ্ণ।

যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম কৃষ্ণ বিনা আর কোন কিছুতে সম্ভব নয়। এক দিক তাঁহার চেয়ে ছোট যেমন কিছু নাই, তেমনই তাঁহার চেয়ে আবার বড়—বিরাট্ও কিছুর কল্পনা করা যায় না। অণোরণীয়ান্

---

১ "ত্রিকালাবাধ্যত্বং সত্যত্বম্"—মধুসূদন সরস্বতী (অদ্বৈতসিদ্ধি)

২ ছা-উ° ৬.২.১।

মহতো মহীয়ান্—একই সময়ে যিনি অণু হইতে অণু। অথচ মহৎ হইতে মহৎ, সেই পরম বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি এক, বশী, সর্বগ ও স্তবনীয়—'একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ'—গোপালতাপনী-শ্রুতি। আবার গুণকর্মানুসারে বিভিন্ন স্বরূপের বিভিন্ন নাম হইয়াছে ; অথবা মূলাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তিবলে বিভিন্ন স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন গুণ প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন নাম ধরিয়া আছেন। বৈষ্ণবেরা নানা তত্ত্ব আলোচনা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে সর্বেশ্বর পূর্ণানন্দ মায়াধীশ ব্রজেন্দ্রনন্দন করিয়া ও সর্বোপরি বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে সৃষ্টি স্থিতি সংহারাদি বিবিধ কার্য শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার বা অংশাবতার দ্বারা হইয়াছে। সুতরাং সংহারের কর্তা যিনি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার মাত্র, তিনি কদাপি পূর্ণ ব্রহ্ম নন।

"শিব মায়া শক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥"

ভগবান্ বহুবার বহুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; কিন্তু সকল সময় শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন না। কখনও বা অংশে কখনও বা অংশাংশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই জন্যই অবতারগণের মধ্যে অংশ ও অংশাংশ রূপ তারতম্য হয়। শাস্ত্র নির্দেশ করেন, অনন্তশক্তি আনন্দময়বপুঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাধারে ব্রহ্মত্ব, ভগবত্ত্ব, জ্ঞেয় ও আস্বাদ্য, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য প্রকাশ করিবার জন্য বহুকালের পর মথুরা মণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই জন্যই তিনি অন্যান্য অবতারের মধ্যে পরিগণিত নন—তিনি শাস্ত্রমতে সর্বাবতারের মূল-স্বরূপ অবতারী। সকল অবতারের ইনিই নির্দেশক—শ্রীকৃষ্ণই সকল অবতারের প্রতিষ্ঠা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত গ্রন্থ। ইহাতে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ"

ষট্‌সন্দর্ভভাষ্য সর্বসংবাদিনীতে গোস্বামিপাদ শ্রীজীব বলেন, কৃষ্ণের

সমান বা সদৃশ অপর বস্তুর সত্তা নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অদ্বয়তত্ত্ব। আর এই কৃষ্ণের স্বরূপই অবতারী। মহাপ্রভু রামানন্দকে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে।
তোমা বিনে ইহা কেহ নিরূপিতে নারে ॥
রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট ॥
প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি ॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥"

মহাপ্রভুর বচনভঙ্গীতে রায় রামানন্দ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন,—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব অবতারী সর্বকারণ প্রধান ॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ইহা সবার আধার ॥"

ইনিই বৈষ্ণবের কৃষ্ণ।

"সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥"

অপ্রাকৃত মদন হইতেছেন অপ্রাকৃত কাম। এ কাম স্ত্রী-

পুরুষের পরস্পরের অনুরাগ নয়—ইহা দ্বারা পার্থিব মনোবিকারও জন্মায় না।

"পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব-চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥"

এ মদন সাক্ষাৎ মদনকেও বিমুগ্ধ করে। স্ত্রী পুরুষ স্থাবর জঙ্গম সকলে ইহার অপ্রাকৃত ভাবে ইহাতে আকৃষ্ট হয়। এই অপ্রাকৃত ভাব অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণপ্রেম। যেখানে প্রাকৃত ভাবের গন্ধ মাত্র আছে সেখানে কৃষ্ণপ্রেম আদৌ নাই।

"নানাভক্তের নানামত রসামৃত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥"

যখন ভক্তের হৃদয়ে নানা রসময় প্রেমভাব হয়, তখন সেই ভাবের প্রতিদানের জন্য, প্রতিভজনার জন্য 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (৪.১১) এই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম এক অখিল রসামৃতমূর্তিতে অবতীর্ণ হন। সেই মূর্তি ভক্তের রসভাবনার বিষয় ও আশ্রয়।

"শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্তিধর।
অতএব আত্মপর্যন্ত সর্বচিত্তহর॥"

কৃষ্ণ শুধু সর্বচিত্তহর নন, তিনি শৃঙ্গাররসরাজ মূর্তিতে সকলের এমন কি আপনার পর্যন্ত চিত্ত হরণ করেন। তাঁহার শৃঙ্গারও অপ্রাকৃত, রসও অপ্রাকৃত।

কৃষ্ণ—

"লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥"

এমন কি—

"আপন মাধুর্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।"

সংক্ষেপে ইহাই কৃষ্ণের স্বরূপ।

মাধুর্য বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের তুলনা নাই। তাঁহার সকল স্বরূপের তুলনায় মাধুর্য সকলের অপেক্ষা বড়, তাই শাস্ত্র মাধুর্যকে পূর্ণতম বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ মাধুর্যসার অন্য সিদ্ধি নাই তার
তেঁহো মাধুর্যের গুণখনি।
আর সব প্রকাশে যার দত্ত গুণ ভাসে
যাহাঁ যত প্রকাশে কার্য জানি॥"

বৈষ্ণবের কৃষ্ণ এইরূপ ; শাস্ত্রে তাঁহার 'কৃষ্ণ' নামের অনেকগুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণ বলেন,—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যাভিধীয়তে॥"

কৃষ্ ধাতু ভূ অর্থাৎ সত্তাবাচক—সুতরাং সৎ। ণ এই বর্ণে বুঝিতে হইবে নির্বৃতি অর্থাৎ উপসর্গরাহিত্য—সুতরাং আনন্দ। যিনি সৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই পরমব্রহ্ম। 'সৎ' ও 'আনন্দে'র সঙ্গে সঙ্গে 'চিৎ' স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রও বলিয়াছেন,—"সত্তা সানন্দয়োর্যোগাৎ চিৎ পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে।"

কেহ কেহ কৃষ্ ধাতুর অন্য অর্থ 'আকর্ষণ, ধরিয়া কৃষ্ণ-শব্দে 'সর্বাকর্ষক' করিয়াছেন। পুরাণে কৃষ্ণ নামের আরও অনেক অর্থই আছে। কিন্তু কৃষ্ণ শব্দের রূঢ় অর্থই আছে, ইহার সহজ অর্থই আছে—অর্থ টানিয়া বুনিয়া বাহির করিতে হয় না। শ্রীজীব গোস্বামী কৃষ্ণসন্দর্ভে একটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় নামকৌমুদী হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, কৃষ্ণ-শব্দের অন্য কোন অর্থ নাই—এই শব্দের বৃত্তি রূঢ়ি ; সুতরাং একটি মাত্র অর্থ তমালশ্যামলবপু যশোদানন্দন—

"তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণোনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥"

চরিতামৃতে বল্লভভট্ট মহাপ্রভু-সংবাদে দেখিতে পাই—

"ভট্ট কহে, কৃষ্ণ নামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি তাহা করহ শ্রবণে॥
প্রভু কহে, কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ নাহি মানি।
শ্যামসুন্দর, যশোদানন্দন এই মাত্র জানি॥"

ইহাই কৃষ্ণ শব্দের রূঢ়ি বৃত্তি দ্বারা লব্ধ অর্থ,—ইহার যৌগিক অর্থ ব্যাকরণ অনুসারে বহু প্রকারে নিষ্পাদিত করা যাইতে পারে। যেমন পঙ্কজ শব্দের যৌগিক অর্থ হইতেছে যাহা পঙ্কে জন্মায়—সুতরাং যৌগিক হিসাবে শম্বুক প্রভৃতি এই শব্দের বহু অর্থ হইতে পারিত, কিন্তু এর রূঢ়ি বৃত্তি ইহার একমাত্র পদ্ম অর্থ দ্যোদিত করিতেছে; সুতরাং এই অর্থেরই প্রাধান্য—ইহা সর্বজনবিদিত। অতএব শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই অর্থেই কৃষ্ণকে বুঝিতে হইবে।

আবার অবতারের ব্যাপারও তাঁহাতে প্রকটিত হইতেছে। অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণের নাম অবতার।

"সৃষ্টি হেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতার।
সেই ঈশ্বর মূর্তি অবতার নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম॥"

শ্রীকৃষ্ণ নিখিল অবতারের মূল অবতারী। তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু—ভক্ত যখন ধর্মের গ্লানির মধ্যে পড়িয়া অনন্যোপায় হইয়া শরনৈকগতি হয় এবং সতত তাঁহার অনুধ্যান করিতে থাকে, ভক্তের ঐকান্তিক লৌল্য যখন তাঁহাকে অবতরণ করিবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তোলে, তখন তিনি ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। ইহাই তাঁহার অবতারের মুখ্য—প্রধান কারণ—কবিরাজ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—

"ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্মসেতু"

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণই অবতারের মুখ্য কারণ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে

গৌণত ধর্মের গ্লানি দূর হইয়া যায়—ধরার ভারও নষ্ট হইয়া যায়। আর যাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও তাহাতে কল্যাণ হইয়া থাকে। গীতা (৪. ৮) বলিয়াছেন,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

ইহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণী। আর্তভক্তের উদ্ধার, দুষ্কৃতের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভগবানের অবতার। গীতায় অবতরণ ব্যাপারটি আরও পরিস্ফুট হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং (৪. ৭) বলিয়াছেন,—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্ ॥"

যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই অবতার-লীলায় জন্ম কর্ম দিব্য, যিনি তাঁহার আবির্ভাব ও লীলাতত্ত্বকে অলৌকিক অপ্রাকৃত বলিয়া বুঝেন তিনিই তাঁহাকে পাইয়া থাকেন (গীতা, ৪. ৯)।

"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥"

ভক্তেচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, ধর্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য—সমাজে সমঞ্জসীকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যিনি আবির্ভূত হন, তিনিই অবতার। সংক্ষেপে জানিতে গেলে কার্যসিদ্ধির জন্যই অবতারের প্রয়োজন। কিন্তু যখনই যে কোন অবতার হন না কেন অবতার সর্বত্র সর্বথা নিত্য।

চণ্ডীর আবির্ভাবেও দেখিতে পাই—

"দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥"

যখনই বিরোধী-শক্তির দ্বারা শক্তি সামঞ্জস্য নষ্ট হইবার উপক্রম

হয় তখনই অবতারের প্রয়োজন হয়। অবতার তেজঃস্বরূপে পাপ-পুণ্যের বাহিরে অবস্থিতি করে বটে, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কার্যই পুণ্য—ক্রিয়ামাত্রই তাঁহার লীলা (বিষ্ণুপু° ৬. ৯. ৯০)। তোমার আমার পাপ পুণ্যের মাপকাঠি দিয়া অবতারের কার্যের বিচার হয় না। আশ্চর্যের বিষয়, "অবতার-তত্ত্বের মধ্যে অধর্মের উচ্ছেদ বা ধরার ভারহরণ ব্যাপারে, ব্যক্তিত্ব—মানবতা যেন অপরিহার্য ব্যাপার।" ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইলে যখন ধরার সকল ভার মুহূর্তমধ্যে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে তখন তাঁহাকে কেন যে মানুষ-রূপে অবতীর্ণ হইতে হয় এবং অবতীর্ণ হইয়া কি জন্যই বা মানবতার সকল দুঃখকষ্ট বহন করিতে হয়, তাহা বোধ হয় মানব-বুদ্ধির অতীত। হয়তো বা তিনি আদর্শ সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়া যুগে যুগে স্বয়ং দুঃখ উপভোগ করিয়া দুঃখের বোঝা বহিয়া মানবের মঙ্গল-বিধান করেন। ইহাই তাঁহার অবতার লীলার সনাতন রীতি। গ্লানি বলিলে দুঃখ বুঝায়—ধরার ভার বলিলে সমাজ-বিশেষের মধ্যে দুঃখের উৎপত্তি বুঝায়। তাই একজন মনীষী বলিয়াছেন,—"সে দুঃখের অনুভূতি যাহার নাই; সে তেমন দুঃখ দূর করিতে পারে না। ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া প্রথমে যেন দুঃখের স্বাদ গ্রহণ করেন। পরে সেই দুঃখের ক্রোড়ে মানুষ হইয়া, পূর্ণরূপে দুঃখের পরিচয় পাইয়া তবে তাঁহাতে যেন অতি-মানুষ মহত্ত্বের উন্মেষ হয়। সেই মহত্ত্বের প্রভাবে তিনি দুঃখ দূর করেন, ধরার ভার হরণ করেন। তাই তিনি যে সমাজধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, সেই সমাজেই জন্মগ্রহণ করেন, যে সংসার হইতে দুঃখের উৎস ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, সেই সংসারেই অধিকাংশ স্থলেই অবতীর্ণ হন (নারায়ণ, ১৩২১, ২. ৩২৪)।"

অবতারতত্ত্বের বৈচিত্র্য এই যে, শরীরের মধ্যে থাকিয়াও—অবতার স্বয়ং শরীর-ধর্ম-রহিত। তিনি যখন মনুষ্যলিঙ্গে অবতীর্ণ, তখন মানুষ-ভাবও যেমন সত্য, তেমনই চিন্ময়-ভাবও সত্য।

'কৃষ্ণের যতেক খেলা তার শ্রেষ্ঠ নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ—

শাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝা যায়—দেবাবতার ও মৎস্যকূর্ম-বরাহাদি ভিন্ন অবতারে এইরূপ মানবতা অপরিহার্য। সেই মনীষী আবার বলিয়াছেন (নারায়ণ, ১৩২১, পৃ° ২৩৪), মধ্যে মধ্যে, যুগে যুগে মনুষ্যলিঙ্গ ভগবানের "উদ্ভব না হইলে সমাজ ঠিক থাকে না, ধর্ম ঠিক থাকে না, মানুষের মতি কল্যাণপ্রদ পন্থায় পরিচালিত হয় না। অবতার মনুষ্যলিঙ্গ ধরিয়া কর্মের দ্বারা সমাজের আদর্শ স্থির করিয়া দিবেন। ব্যক্তিত্বের individualism-এর বিকাশের জন্যই অবতারের বিশিষ্টতা—মাহাত্ম্য। অবতার না হইলে এ অপূর্ব ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় না। আবার মানবতা না হইলে অবতারেরও স্ফূর্তি হয় না। ভাগবতও অবতারকে বলিয়াছেন,—"গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম-মনুষ্যলিঙ্গম্।" আরও বলিয়াছেন,—"যন্মর্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শিয়তা গৃহীতম্" (৩.২.১২)। অন্যত্র—"কৃতবান্ কিল বীর্যানি সহ রামেণ কেশবঃ। অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপট-মানুষঃ॥" (১.১-২০)।

অবতার যিনি তিনি যে মানুষ নন—নরাকারে থাকিয়াও মানবতার অতীত পুরুষ। তিনি কপটমানুষ বাহ্যত মনুষ্যলিঙ্গ হইয়াও গুপ্তভাবে ভগবান্।"

শাস্ত্র আলোচনা করিলে আরও বুঝা যায় যে, ভগবানের অবতার কোন কাল্পনিক ঘটনা নয়—উহা সত্য, কিন্তু আবার তাহা দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক অপ্রাকৃত এবং নিত্য। যদিও ভগবান্ অবতারে মানুষী তনুর আশ্রয় গ্রহণ করেন তথাপি সে তনু অপ্রাকৃত ও অপার্থিব। ভগবদবতার সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ জগৎকারণ ব্রহ্মের ঘনীভূতভাব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি এবং তিনি পুঞ্জীভূত পরমানন্দ—শাস্ত্র ইহাকে পরমানন্দসন্দোহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি জ্ঞানাত্মা, আনন্দাত্মা, সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন এবং তাঁহাতে মুক্তিদাতৃত্ব নিত্য

বিরাজমান। এই জন্য গীতাভাষ্যে বলদেব বলিয়াছেন,—তিনি "জ্ঞানানন্দাত্মাত্বসর্বেশত্ব মোক্ষদত্বস্বভাবঃ।"

কিন্তু এইরূপ স্বভাবাপন্ন হইয়াও 'মনুষ্যসন্নিবেশিত্ব' ও 'মনুষ্য-চেষ্টাপ্রাচুর্য' তাঁহার অবতারের বিশেষত্ব বলিয়াই মনুষ্যদেহ তিনি ধারণ করেন এবং মনুষ্য চেষ্টান্বিত হইয়া তাঁহাকে মানুষপ্রকৃতি অবলম্বন করিতে হয়। নচেৎ সদোষ মানবতা তাঁহাতে আদৌ নাই। জীবগোস্বামী বলেন,—তাঁহাতে মানবসাধারণের দোষ থাকিতে পারে না। কেন না তিনি পার্থিবত্ব ও অনৈশ্বর্যত্ববিহীন। অবতার নরাকৃতি হইয়াও নিত্য সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি যে জন্ম গ্রহণ করেন, জন্মিয়া যে লীলা করেন সেই সমস্তই সত্য—মায়িক বা ঐন্দ্রজালিক নয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি। বৈষ্ণবাচার্যগণ শ্রুতি মন্থন করিয়া বলিয়াছেন, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরব্রহ্মের ঘনাবস্থা। যদিও সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ সাধারণ জীবের ধারণার বিষয় নয়, তবুও তিনি প্রেমিক ভক্তের প্রত্যক্ষ অনুভূত। স্বয়ং ভগবান্ গীতায় তৈত্তিরীয়-উপনিষদের 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠার'র (২.৫.১) অনুবাদচ্ছলেই যেন বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥'—১৪.১৭।

আমি যে ব্রহ্মের অব্যয় অমৃতের, সনাতন ধর্মের আর ঐকান্তিক আনন্দের প্রতিষ্ঠা। টীকাকার শিরোমণি শ্রীধরস্বামী এই প্রতিষ্ঠার অর্থ করিয়াছেন,—"প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূত প্রকাশ এব সূর্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ।" সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রতিষ্ঠা বলিতে ঘনীভূত ব্রহ্মই বুঝায়। ব্রহ্মসংহিতাকারও গোবিন্দ-ভজনের ছলে একসঙ্গে ভগবদ্বাক্য ও শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য বুঝাইয়াছেন,—

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি—
কোটিষ্বশেষ বসুধাদিভূতিভিন্নম্।

তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অগণিত পৃথিবী প্রভৃতি দ্বারা যিনি ভিন্ন ভেদপ্রাপ্ত অর্থাৎ যিনি নিষ্কল অনন্ত ও অশেষ স্বরূপ, সেই ব্রহ্ম-প্রভাবশালী যে গোবিন্দের প্রভা (অঙ্গকান্তি) আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

এই গোবিন্দ পরমাত্মস্বরূপ পরমেশ্বর রূপবান। কিন্তু তিনি প্রাকৃত দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নন। দেখিব বলিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহার প্রতি তিনি কৃপা করেন তাহারই সম্মুখে আপনার অপ্রাকৃত তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সাধারণ মানুষ বাহিরের রূপ অবলম্বন না করিয়া আনন্দময়ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলেন, যে সাধক ভগবদ্ বিগ্রহের সাধনা করিতে করিতে আপনার ভিতরে আনন্দময়কে গ্রহণ করিতে, অন্তরের যিনি অন্তরে সেই 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্'কে ধরিতে পারেন সেই সাধক শ্রুতির 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—গীতার 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, আর তিনিই আনন্দঘন কৃষ্ণরূপ দর্শনের অধিকারী হন। প্রকৃত স্বচ্ছ নির্মল চক্ষু পাইয়া তিনি কৃষ্ণানন্দ সুখ ভোগ করিতে থাকেন। এই জন্যই বৈষ্ণব সাধক বলিয়াছেন,—

"সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝলমল।
সেই দেখে যার আঁখি হয় নিরমল॥"

প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ

বেদে কৃষ্ণ শব্দের উল্লেখ কয়েকবার আছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণ শব্দে বেদে কোন্ পদার্থকে কোথায় লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা বিচার করিতে হইবে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তের ৫ম ঋকে এক

কৃষ্ণের কথা আছে—কিন্তু সেখানে শিকারী পক্ষী অর্থে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

"সুপর্ণা বাচমক্রতোপ দ্যব্যাখরে কৃষ্ণা ইষিরা অনর্তিষুঃ।

ন্যঙ্ নি যংত্যুপরস্য নিষ্কৃতং পুরূ রেতো দধিরে সূর্যশ্বিতঃ॥"

অথর্ববেদের (১১.২.২) এবং শাঙ্খায়ন-আরণ্যকের (১২.২৭) দুই স্থানে এই অর্থেই কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এইরূপ তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৫.২.৬.৫), (৬.১.৩.১) ও শতপথব্রাহ্মণে (১.১.৪.১; ৩.২.১.২৮) মৃগ অর্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন কোন মহাত্মা তাঁহাদের উর্বর মস্তিষ্ক হইতে এই সমস্ত স্থানের কৃষ্ণকে ঋষি করিয়া তুলিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। ইনি ৩য় ও ৪র্থ ঋকে আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

"অয়ং বাং কৃষ্ণো অশ্বিনা হবতে বাজিনীবসূ।

মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।

শৃণুতাং জরিতুর্হবং কৃষ্ণস্য স্তুবতো নরাঃ।

মধ্বঃ সোমস্য পীতয়ে।"

অনুক্রমণী-কার বলেন, এই কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ অঙ্গিরার বংশ্য। ৮ম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের রচয়িতা কৃষ্ণের পুত্র 'কার্ষ্ণি' বা বিশ্বক। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে কৃষ্ণ শব্দ হইতে বৈদিক ব্যাকরণ অনুসারে 'কৃষ্ণিয়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে কৃষ্ণিয় আছে। ঋক্ দুইটি এই—

"অবস্যতে স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় ঋজুয়তে নাসত্যা শচীভিঃ।

পশুং ন নষ্টমিব দর্শনায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায়॥"২৩

"যুবং নরা স্তুবতে কৃষ্ণিয়ায় বিষ্ণাপ্বং দদথুর্বিশ্বকায়।

ঘোষায়ৈ চিৎপিতৃষদে দুরোণে পতিং জূর্যন্ত্যা

অশ্বিনাবদত্তং।"৭

এই দুই ঋকে অশ্বিদ্বয় বিষ্ণাপূকে বিশ্বক কৃষ্ণিয়ের নিকট অর্পণ

করিতেছেন। সুতরাং কৃষ্ণ বিষ্ণাপূর পিতামহ হইতেছেন। এই কৃষ্ণ এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণোক্ত কৃষ্ণ অভিন্ন। কৌষিতকী ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ আঙ্গিরস—তবে ইনি আঙ্গিরস ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ঋত্বিক্ সম্পর্কে ইনি সান্ধ্য হোম দর্শন করিয়াছিলেন। ইনি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য।

ছান্দোগ্য-উপনিষৎ উপদেশ করিয়াছেন,—

"তদ্ হ এতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ আপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেমায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।"

অতঃপর অঙ্গিরসবংশীয় ঘোর দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—আর তিনিও পিপাসা-শূন্য হইলেন। তুমি মরণকালে এই তিনটি মন্ত্রের আশ্রয় লইবে—এই তিনটি হইতেছে তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।" ভাষ্যকার অর্থ করিয়াছেন,—"স এবং যথোক্তযজ্ঞবিদ্ অন্তবেলায়াং মরণকালে এতন্মন্ত্রত্রয়ং প্রতিপদ্যেত জপেদিত্যর্থঃ। প্রাণসংশিতং প্রাণস্য সংশিতং সম্যক্ তনুকৃতঞ্চ সূক্ষ্মং তত্ত্বং অসি।"

কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়-আরণ্যকেও কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে কৃষ্ণকে পুরুষমন্ত্রের শাস্তা উপদেষ্টারূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা তিনি পুরুষযজ্ঞের যজ্ঞপুরুষ, এরূপ আভাস পাওয়া যায়।

পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলি আলোচনা করিয়া কৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, তাই এই—

বেদবর্ণিত কৃষ্ণ বলিলে, তাঁহার অধিক কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বেদে যে কয় বার কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহাতে কৃষ্ণ বলিতে ঋষি মাত্র বুঝায়। দুই তিন স্থান ছাড়া সর্বত্র কৃষ্ণ ঋষি বলিয়াই পরিচিত। ঋগ্বেদের খিলসূক্তে কৃষ্ণ পরমপুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন বলিয়া খিলসূক্তের ভাষ্যকারগণ মনে করিয়া

থাকেন। খিলসূক্ত (১০.১) বলিতেছেন,—"কৃষ্ণ বিষ্ণো বাসুদেব হৃষীকেশ নমস্তু তে"। ঋগ্বেদ, কৌষিতকীব্রাহ্মণ, ও ছান্দোগ্য-উপনিষদে কৃষ্ণকে আঙ্গিরস আখ্যা দিয়াছেন। পাণিনির ৪.১.৯৬ সূত্রে গণসম্পর্কে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ৪.১.৯৯ সূত্রে গণসম্পর্কে কার্ষ্ণায়ণ ও রাণায়ণ-গোত্র নিষ্পত্তিকালে কৃষ্ণ ও রণ পদ দেওয়া হইয়াছে। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার মহাশয় বিশেষ যুক্তি দ্বারা এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই—কার্ষ্ণায়ণ ও রাণায়ণ, এ দুইটি বশিষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ গোত্রমাত্র। এই গোত্রের কিংবদন্তী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিকালে বৌদ্ধদিগের মধ্যেও অপরিজ্ঞাত ছিল না। কেন না, বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের আখ্যায়িকার অনেক স্থলেই অদ্ভুত বিবৃতি প্রদান করিলেও কিংবদন্তী হিসাবে তাহাদিগের গ্রন্থ হইতেও কখনও কখনও দুই একটা তথ্যের কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থে 'কৃষ্ণ' এই নামটি 'কণ্‌হে' পরিণত হইয়াছে। শব্দশাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণ ও কণ্‌হ অভিন্ন। দীঘনিকায় নামক বৌদ্ধগ্রন্থে (৩.১.২৩) কণ্হায়ন গোত্র ও কণ্‌হ ঋষির নাম আছে। "উড়ারো সো কণ্‌হো ইসি অহোসি" দীঘনিকায়ের এই কণ্‌হ ঋগ্বেদের ঋষি হইতেও পারেন। তবে তিনি আমাদের কৃষ্ণ কি না, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। ঘটজাতকে কৃষ্ণের যে কাহিনী আছে, তাহা যে বিকৃত আকারে আমাদের কৃষ্ণেরই কাহিনী, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। জৈন প্রবাদেও দেখা যায়, এই গল্পগুলি সাধারণের খুব প্রিয় ছিল। ইহাদের প্রাচীন গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে বাসুদেব ও বলদেবের নাম আছে। কৃষ্ণ বাসুদেবের মধ্যে কৃষ্ণ নবম ছিলেন [হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণি, পৃঃ ১২৪, অন্তগদ্‌দসাও, পৃঃ ১৩১৫, ৬৭, ৮২] আর এই কৃষ্ণের দ্বারাবতী বা দ্বারকার সহিত সম্বন্ধও নিরূপিত হইয়াছে। পরবর্তী কল্পে তিনি দ্বাদশ তীর্থঙ্কর হইবেন এবং তাঁহার বংশের দেবকী, রোহিণী, বলদেব ও জবকুমার পূর্বের ন্যায়

অবস্থাপন্ন হইবেন। দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণধর্মের বাহিরেও কৃষ্ণকথা অতি প্রিয় ছিল।

এই গোত্রের কথাই জাতকের ভাষ্যকার নির্দেশ করিয়া কৃষ্ণকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কার্ষ্ণায়ণ গোত্র ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়াছে। তারপর ছান্দোগ্য-উপনিষদের দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ এই নাম। ইনি আঙ্গিরস যে ঘোর, তাঁহার শিষ্য। যদি কৃষ্ণও আঙ্গিরস হন, আর এইরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, কৃষ্ণ যে ঋষি ছিলেন, তৎসম্বন্ধীয় প্রবাদ বা কিংবদন্তী ঋগ্বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ছান্দোগ্য-উপনিষদের সময় পর্যন্ত চলিয়াছিল—সঙ্গে সঙ্গে কার্ষ্ণায়ণ নামে গোত্রও জনশ্রুতিমূলক ছিল। কৃষ্ণসমূহকে লইয়া কার্ষ্ণায়ণ—এই সমস্ত কৃষ্ণের মধ্যে যিনি আদিমা কৃষ্ণ, তিনিই কৃষ্ণ গোত্রের স্থাপয়িতা বা প্রবর্তক। যখন বাসুদেব পরমপুরুষ পদবাচ্য হইয়া উঠিলেন, তখন হইতেই এই কিংবদন্তী ঋষি কৃষ্ণের সহিত বাসুদেবের অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছে। কৃষ্ণ ও বাসুদেব যখন অভিন্নই হইয়া গেল, তখন শূর ও বাসুদেবের ভিতর দিয়া বৃষ্ণিবংশে তাঁহারাও স্থান হইয়া গেল। জাতকের কৃষ্ণগোত্র দ্বারাই কৃষ্ণ নামের কারণ কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন। কার্ষ্ণায়ণ গোত্র যে কেবল বশিষ্ঠশ্রেণীর অন্তর্গত ব্রাহ্মণ গোত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা নয়, মৎস্যপুরাণে ২০০ অধ্যায়ে ইহা পারাশর পর্যায়েও ধৃত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি কার্ষ্ণায়ণ গোত্র ব্রাহ্মণ গোত্রই হইল, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ে বর্তাইল কি করিয়া? আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রের (১২.১৫) মতে ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞ কারণ এইরূপ গোত্র ক্ষত্রিয় গ্রহণ করিতে পারে।

স্যর ভাণ্ডারকার আরও একটি নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ক্ষত্রিয়ের গোত্র এবং স্তুত পূর্বপুরুষ-দিগের গোত্রে তাঁহাদিগের সন্ধান পাওয়া যায়। ঘটজাতক (৪৫৪

সংখ্যক জাতক) ও মহাউম্মগ্‌গজাতক খ্রীস্টধর্মের বহু পূর্বের রচনা, ঐতিহাসিকগণ তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। ঘটজাতকে একটি উপাখ্যান আছে। উপাখ্যানটিতে পাওয়া যায় যে, কংসর একজন ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম দেবগভ্‌ভা। সম্ভবত কেন, নিশ্চয়ই দেবকীর নামের এই দুর্দশা ঘটিয়া থাকিবে। ইহার স্বামীর নাম ছিল উপসাগর। বসুদেব কিরূপে উপসাগরে পরিণত হইলেন, তাহা বুঝা গেল না। যাহাই হউক, ইঁহাদের দুই পুত্রের নাম বাসুদেব ও বলদেব। এই দুই পুত্রকে অন্ধকবেন্হু ও তদীয় পত্নী নন্দগোপার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। নন্দগোপা দেবগভ্‌ভার সখী ছিলেন। নন্দগোপা নিশ্চয়ই নন্দগেহিণী যশোদা। অন্ধকেবন্হু দুইটি শব্দের সংযোগে নিষ্পন্ন—অন্ধক ও বৃষ্ণি, বৃষ্ণি অপভ্রংশ বেন্‌হু। এ দুইটি শব্দ দুইটি পৃথক্ জাতিকে বুঝায়। বলিতে পারি না, নন্দ কেমন করিয়া এই নাম পাইলেন। যাহা হউক, এই জাতকের কাব্যাংশে বাসুদেবের আরও দুইটি নাম আছে—কণ্‌হ ও কেশব। এই জাতকের ভাষ্যকারও খ্রীস্টপূর্বাব্দের ব্যক্তি। তিনি বলেন,—প্রথম কবিতায় বাসুদেব তাঁহার গোত্রনামে অভিহিত হইয়াছেন। কারণ, বাসুদেব কণ্‌হায়ণ গোত্রগত ছিলেন। সুতরাং এ হিসাবে বাসুদেবই কৃষ্ণের প্রকৃত নাম—তাঁহার গোত্রনাম কার্ষ্ণয়ণ গোত্রের বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। মহাউম্মগ্‌গ জাতকের ভাষ্যেও এই কথার পুনরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বাসুদেব কণ্‌হের পত্নীর নাম জম্বাবতী বলিয়াছেন। স্বয়ং বাসুদেব কণ্‌হ কণ্‌হায়ণ গোত্রীয়। বাসুদেবস্‌স কণ্‌স্‌স অর্থে তিনি বাসুদেবই প্রকৃত নাম বলিয়া কণ্‌হকে গোত্রনাম বলিয়াছেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি পাণিনির উল্লিখিত কার্ষ্ণায়ণ গোত্রের ঋত্বিক্ বা পুরোহিতের গোত্রই হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের এইরূপ ঋষি পূর্বপুরুষগণ হয় মানব, না হয় ঐল বা পৌরুরবস হইবেন। ইহাদিগের নাম এক ক্ষত্রিয় বংশ হইতে অন্য ক্ষত্রিয় বংশের পার্থক্য সূচিত করিয়া দেয় না,

তবে ঋত্বিক্দিগের গোত্র ও পূর্বপুরুষগণের নামের দ্বারা এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। যদি কৃষ্ণকে গোত্র নাম বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, বাসুদেব কার্ষ্ণায়ণ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদিও এটি ব্রাহ্মণ ও পারাশর গোত্র। স্যর ভাণ্ডারকারের কৃষ্ণ নামের এই প্রমাণগুলি প্রণিধানযোগ্য বলিয়া সেইগুলির উল্লেখ করিলাম। এই কৃষ্ণ নামে বরাবর পরিচিত হইয়া আসিয়া প্রাচীন কৃষ্ণের বিদ্যাবত্তা ও অধ্যাত্ম-ধীষণাও তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে দেবকীপুত্র হওয়াতেও কিংবদন্তী সহায়তা করিয়াছে। কৃষ্ণের নামের কারণ যাহাই হউক, পরযুগে বাসুদেবই কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদির পর আমরা রামায়ণে কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। রামায়ণের সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন নাই। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ বাল্মীকি কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিতেছেন। বাল্মীকি যখন রাম না হইতে রামায়ণ লিখিতে পারিয়াছিলেন, তখন কৃষ্ণ না হইতেও কৃষ্ণনাম যে তিনি করিতে পারিবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ১১৯ অধ্যায়ে বেদবিদ্ ব্রহ্মা কাকুৎস্থ রামকে বলিতেছেন,—

"লোকনাং ত্বম্ পরো ধর্মো বিশ্বক্সেনশ্চতুর্ভুজঃ।
শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গাধৃগ্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ॥"

লোকসমূহের তুমি পরধর্ম। চতুর্ভুজ বিশ্বক্সেন; তুমিই শার্ঙ্গধন্বা, হৃষীকেশ, পুরুষ, পুরুষোত্তম, অজিত, খড়্গাধৃক্, বিষ্ণু—বৃহদ্বল কৃষ্ণ। রামায়ণের যিনি ভাষ্যকার, তিনি কৃষ্ণ শব্দে সর্বত্র "কৃষ্ণস্তদ্বর্ণ" বুঝিয়াছেন। সিদ্ধান্তীরা বলেন, ইহা ভবিষ্যদ্বাণী। ভগবান্ কৃষ্ণই জানেন ইহা কি? রামায়ণ আবার বলিতেছেন,—

"সীতা লক্ষ্মীর্ভবান্ বিষ্ণুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।
বধার্থং রাবণস্য ত্বং প্রবিষ্টো মানুষীং তনুম্॥"

সীতাদেবী লক্ষ্মী, তুমি বিষ্ণু, তুমিই প্রজাপতি, দেব কৃষ্ণ। রাবণের বধের জন্য তুমি মানুষী তনুতে প্রবিষ্ট হইয়াছ।

রামায়ণে সর্বত্র রামকে বিষ্ণুর সহিত এক, তাঁহা হইতে অভিন্ন করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে মহাভারতেও কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। বিষ্ণু ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং পরবর্তী বৈষ্ণবগ্রন্থেও কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এক বলা হইয়াছে। দুই এক স্থলে কৃষ্ণকে বিষ্ণু হইতে সামান্য তত্ত্বত পৃথক্ করা হইয়াছে। যদিও বিষ্ণু ও ভাগবতপুরাণে কৃষ্ণ দুই একবার বিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন, তথাপি তিনি সাধারণত বিষ্ণুর সম্পূর্ণ অবতার ও পরব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ভাগবতপুরাণ বলিতেছেন,—

"সংস্থাপনার্থায় ধর্মস্য প্রশমায়েতস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবান্ অংশেন জগদীশ্বরঃ॥"

মহাভারত বলেন,—

"যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেস্বাসীদ্‌বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥"

এইরূপ বিষ্ণুপুরাণও তাঁহাকে দুই এক স্থলে অংশাবতার বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। ভাগবতের শ্লোকে 'অংশেন' তৃতীয়ান্ত পাঠ পাইয়া টীকাকার অংশের সহিত অর্থাৎ অন্যান্য অংশাবতারের সহিত এরূপ অর্থও করিয়াছেন। যাহা হউক, মহাভারতের কৃষ্ণ কিন্তু বড়ই জটিল। মহাভারতের নানা স্থানে কৃষ্ণ নানাভাবে চিত্রিত হইয়াছেন। ভগবদ্গীতার দার্শনিক অংশে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার স্বরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতের অন্যান্য স্থানে কোথাও বা তাঁহার ভগবত্তাকে ন্যূনীকৃত করা হইয়াছে, কোথাও বা ভগবত্তা সন্দিগ্ধ বা একেবারে অস্বীকৃত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে কৃষ্ণকে যোদ্ধা প্রভৃতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—ভগবত্তা যেন তাঁহাতে আদৌ আরোপিত হয় নাই। এই জন্যই Wilson, Lassen, Schroeder প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন,

যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে তিনি সর্বত্র মানুষের ভূমিকাই অভিনয় করিয়াছেন—কোথাও দেবভাবের পরিচয় দেন নাই। তাঁহারা বলেন, বন্ধুর সাহায্যে বা শত্রুবিনাশে—তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় কোথাও নাই।

মহাভারতের বহু স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ মহাদেবকে পূজার্চনা করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতে বিবিধ বর লাভ করিতেছেন। মহাদেবের নিকট হইতে বহু অস্ত্রও প্রাপ্ত হইতেছেন।

অনেক স্থলেই কৃষ্ণ ও ঋষি নারায়ণ এক বলা হইয়াছে। কাহারও কাহারও অনুমান, বেদের ঋষি কৃষ্ণের ঋষিত্বের স্মৃতি—মহাভারত যুগেও লুপ্ত হয় নাই। কারণ, মহাভারতের কৃষ্ণ ঋষি নারায়ণরূপেও পূজিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সম্ভবত ঋগ্বেদের এই স্মৃতি হইতেই মহাভারতের এই কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাকে ঋষি নারায়ণ বলিলেও কোথাও তিনি মহাভারতে সাধারণ মানুষরূপে অঙ্কিত হন নাই। যখন তিনি ঋষি নারায়ণ, তখন তিনি যুগের পর যুগ ধরিয়া জীবিত থাকিয়া অতিমানবতার পরিচয় দিয়াছেন। যখন তিনি পাণ্ডবের সখা ছিলেন, তখন তিনি ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিশুপাল, দুর্যোধন, কর্ণ ও শল্য কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নাই। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য মহাভারত কোনরূপে ক্ষুণ্ন করে নাই।

মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বে বাসুদেব-কৃষ্ণের কথা আছে, কিন্তু গোপাল-কৃষ্ণের কথা কিছুই নাই। কেবল এই মাত্র লিখিত আছে যে, কংস-নিসূদনের জন্য কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোকুলে তাঁহার অন্য বাল্যলীলার কথা কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হরিবংশ (শ্লোক ৫৮৭৬—৫৮৭৮), বায়ুপুরাণ (৯৮.১০০-১০২), ও ভাগবতপুরাণে (২.৭) লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ গোকুলে

যে সমস্ত অসুর আসিয়াছিল, তাহাদের বধের জন্য এবং কংস ধ্বংসের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মহাভারতের সভাপর্বে (৪১ অঃ) শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতাপের কথা বলিতে বলিতে পূতনাদি বধের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম যখন কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন (৩৮ অঃ), তখন একবারও পূতনাদি বধের কথা বলেন নাই।

পূর্বে আমরা স্যর ভাণ্ডারকারের দুইটি নূতন আবিষ্কারের পরিচয় দিয়াছি। তিনি 'গোবিন্দ' নামের হেতু নির্দেশ করিয়া কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা সেইগুলির সার নিষ্কর্ষ করিয়া দিতেছি।

ভগবদ্গীতায় ও মহাভারতের অন্যান্য অংশে 'গোবিন্দ' নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এইটি খুব প্রাচীন নাম। পাণিনির ৩.১.১৩৮ সূত্রের বার্ত্তিক দ্বারা ইহা নিষ্পাদিত হয়। যদি কৃষ্ণের গোকুল-দিগের সহিত সম্পর্ক থাকার জন্য তাঁহার গোবিন্দ নাম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার গোবিন্দ নামের ব্যুৎপত্তিগত সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতের আদিপর্বে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ বরাহ আকারে জল আন্দোলন করিয়া জলে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ হইয়াছে (২১.১২)। আবার শান্তিপর্বে দেখা যায়। (৩৪২. ৭০)—বাসুদেব বলিতেছেন, —দেবগণ আমাকে গোবিন্দ বলে, যেহেতু আমি পূর্বে নষ্ট পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং গুহাবাসী ছিলাম। এই ব্যাপারও গোবিন্দ নামের কারণ হইতে পারে। কিন্তু সম্ভবত 'গোবিন্দ' যাহা ঋগ্বেদে গোসমূহের উদ্ধারকর্তারূপে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে, পরে বাসুদেব-কৃষ্ণ দেবাদিদেব বলিয়া পূজিত হইলে তিনি 'গোবিন্দ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। কেশিনিসূদন ইন্দ্রের অপর একটি নাম ছিল—ইহাও পরে বাসুদেব-কৃষ্ণের উপর আসিয়া পড়ে।

কবি ভাস চাণক্যের প্রায় সমকালবর্তী। কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল,

সারদারঞ্জন রায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার রচিত নাটকে শ্রীকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, নন্দ, যশোদা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ভাসও গোপালকৃষ্ণের বন্দনা করিয়াছেন। ভাসের কাব্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, গোপালকৃষ্ণ খ্রী-পূ° পঞ্চম শতাব্দীতেও পূজিত হইতেন। ইহার পর পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বাসুদেব কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই। পাণিনির ৩.১.২৬ সূত্রের কাত্যায়ন বার্ত্তিক করিয়াছেন, "আখ্যানাৎ কৃতস্তদাচষ্টে কল্লুক্প্রকৃতিপ্রত্যাপত্তিঃ প্রকৃতিবচ্চ কারকম্।" ইহারই মহাভাষ্য করিয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—

"ভবেদিহ বর্তমানকালতা যুক্তা স্যাতুজ্জয়িন্যাঃ প্রস্থিতো মাহিষ্মত্যাং সূর্যোদ্গমনং সংভাবয়তে সূর্যমুদ্গময়তীতি। তত্রস্থস্য হি তস্যাদিত্য উদেতি। ইহ তু কথম্ বর্তমানকালতা কংসং ঘাতয়তি বলিং বন্ধয়তীতি চিরহতে চ কংসে চিরবদ্ধে চ বলৌ। অত্রাপি যুক্তা কথম্। যে তাবদত্র শৌভিকা নামৈতে প্রত্যক্ষঃ কংসং ঘাতয়ন্তি প্রত্যক্ষং চ বলিং বন্ধয়ন্তীতি। চিত্রেষু কথম্। চিত্রেষু অপ্যুধগূর্ণা নিপতিতাশ্চ প্রহারা দৃশ্যন্তে কংসস্য চ কৃষ্ণস্য চ। গ্রন্থিকেষু কথং যত্র শব্দগ্রথনমাত্রং লক্ষ্যতে। তেপি হি তেষাম্ উৎপত্তি প্রভৃত্যাবিনাশাদ্বুদ্ধীর্যাচক্ষাণাঃ সতো বুদ্ধিবিষয়ান্ প্রকাশয়ন্তি। আতশ্চ সতঃ। ব্যামিশ্রা দৃশ্যন্তে। কেচিৎ কংসভক্তা ভবন্তি কেচিদ্ বাসুদেবভক্তাঃ। বর্ণান্যত্বং খল্বপি পুষ্যন্তি। কেচিৎকালমুখা ভবন্তি কেচিৎ রক্তমুখাঃ। ত্রৈকাল্যং খল্বপি লোকে লক্ষ্যতে। গচ্ছ হন্যতে কংসঃ। গচ্ছ ঘানিষ্যতে কংসঃ। কিং গতেন হতঃ কংস ইতি।

মহাভাষ্যের এই উক্তি হইতে চারিটি বিষয় প্রমাণিত হইতেছে।

১। কংসের মৃত্যুর কথা এবং বলির বদ্ধতার কথা পতঞ্জলির সময়ে জনসাধারণ সকলেই জানিত। ইহাদের কাহিনী পতঞ্জলির সময়ে প্রচলিত ছিল।

২। এই আখ্যায়িকায় কৃষ্ণ বা বাসুদেবকে কংসহত্যাকারী বলিয়া উক্ত আছে।

৩। পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে যেমন অভিনয় হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সমস্ত আখ্যায়িকা লইয়া নাট্যাভিনয় হইত।

৪। কৃষ্ণের হস্তে কংসের হত্যা পতঞ্জলির সময়ে বহুপ্রাচীন ঘটনা বলিয়া বিদিত ছিল।

৩.২.১১১ সূত্রের মহাভাষ্যে একটি প্রত্যুদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে—"জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ" পূর্বসূত্রের অনুবৃত্তি হইতে বুঝা যায় যে, এই ঘটনা পতঞ্জলির সময়ে সাধারণে জানিত, ইহা অতি প্রাচীন। বক্তার সময়ে কখনও এ ঘটনা ঘটে নাই।

২.৩.৩৬ সূত্রের ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাতুল কংসের সহিত কৃষ্ণের সদ্ভাব ছিল না। "অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণঃ।"

২.২.২৩ সূত্রভাষ্যে বলিতেছে, সঙ্কর্ষণের সাহায্যে কৃষ্ণের বল বৃদ্ধি পাইতে থাকুক।—"সঙ্কর্ষণদ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণায় বর্ধতাম্।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সঙ্কর্ষণ তাঁহার নিত্য সহচর ছিল

অক্রূর যে কৃষ্ণ আখ্যায়িকায় একজন বিশিষ্ট নায়ক ছিলেন, তাহাও—(৪.৩.৬৪) অক্রূরবর্গ্য, অক্রূরবর্গিনঃ, বাসুদেববর্গ্য, অক্রূরবর্গিনঃ, বাসুদেববর্গ্য, বাসুদেববর্গিনঃ—হইতে বেশ বোঝা যায়।

৪.৩.৯৮ সূত্রভাষ্যে পতঞ্জলি দেখাইয়াছেন যে, বাসুদেব যে শুধু ক্ষত্রিয় ছিলেন, তা নয়; তিনি দেবতারূপে পূজিত হইতেন। সূত্রপিটক বৌদ্ধদিগের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে কৃষ্ণের কথা আছে। সেই কৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ তথা বাসুদেবকৃষ্ণ। এই গ্রন্থখানি যে খ্রীস্ট জন্মিবার পূর্বের গ্রন্থ, তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ললিতবিস্তরের ১১ অঃ কৃষ্ণের কথা আছে। গাথাসপ্তশতী খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের গ্রন্থ। ইহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে।

রাধাতত্ত্ব

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥"

প্রাচীন বৈষ্ণবদের নিকট শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য ছিলেন—তাঁহারা তাঁহাকেই তাঁহাদের সর্বস্ব বলিয়া জানিতেন, তাঁহারা জানিতেন যে কৃষ্ণই পরমপুরুষ, আনন্দঘন। আনন্দই তাঁহার স্বরূপ—তিনিই মূর্তিমান আনন্দ। কৃষ্ণকে বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার ভিতর বাহিরে সর্বত্র আনন্দ বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এক অপূর্ব আবিষ্কার করিলেন। অদ্বৈত সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ বস্তুই পরমতত্ত্ব একথা প্রাচীন বৈষ্ণবগণের ন্যায় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও মাথায় করিয়া লইলেন। তাঁহারা কেবল এইটুকু বিশেষ করিয়া বুঝিলেন, জ্ঞানিগণ ঐ পরমতত্ত্বকেই সত্তা-প্রধান ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করেন, যোগিগণ চৈতন্যপ্রধান পরমাত্মা বলিয়া ধ্যান করেন এবং প্রেমিকগণ আনন্দপ্রধান বিগ্রহবান্ ভগবান বলিয়া সেবা করেন। সকলেই নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে যাহা করেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত, কিন্তু আনন্দঘন ভগবানের উপাসনা জীবমাত্রেরই সহজ, স্বাভাবিক ; জীব-মাত্রই জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মরণ পর্যন্ত অনুক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধানই করিতেছে। মূর্তিমান্ আনন্দই কৃষ্ণ, জীবও আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই চাহে না—আনন্দ ভিন্ন বাঁচে না ; কিন্তু আনন্দ কাহাকে বলে, আনন্দ কোথায় আছে এবং আনন্দ কিরূপে পাওয়া যায় তাহা তাহারা জানে না ; সেইজন্য স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পত্তি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের মধ্যে আনন্দের অন্বেষণ করে। যদি কেহ মূর্তিমান্ আনন্দ স্বরূপ কৃষ্ণকে ধরিতে পারে, তাহা হইলে সে স্ত্রীপুত্রাদি চাহিবে

না। জীবের এরূপ বলবতী আনন্দলিপ্সা কেন, তাহাই বুঝিবার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জীবের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া রাধা-স্বরূপের আবিষ্কার করিয়াছেন। (রাধার স্বরূপ এবং কৃষ্ণ ও রাধার সম্পর্ক সম্বন্ধে 'বৈষ্ণবের প্রেম' অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।)

ভগবানের শত শত শক্তিগণের মধ্যে মহাভাবরূপিনী রাধাই সর্বশ্রেষ্ঠা। কৃষ্ণই রাধার জীবন। কৃষ্ণ ভোক্তা, রাধা ভোগ্যা। বেদান্তও সিদ্ধান্ত করিয়াছে পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা। জগতেও ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পুরুষ সেব্য প্রকৃতি সেবিকা, পুরুষ রাধ্য—প্রকৃতি রাধিকা। অতএব প্রেম-স্বরূপিনী পরমা প্রকৃতি রাধিকা প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া পরম-পুরুষ কৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন। রাধিকা তত্ত্বত কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি, ইঁহাকে বৈষ্ণবশাস্ত্র স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম দিয়াছেন। চরিতামৃত উপদেশ করিয়াছেন,—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥"

সর্বাধিষ্ঠানভূত ভগবান্ কৃষ্ণে অব্যভিচারিণী স্বরূপভূত তিনটি সখ্য-শক্তির অস্তিত্ব বৈষ্ণবগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই তিন শক্তির নাম—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। চরিতামৃত বলেন,—

"হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তার হয় যাহাতে বিশ্রাম॥

কৃষ্ণেভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হ্লাদিনীর সার প্রেম—প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপ শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥"

যেমন মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা নিত্যই ভগবানের আরাধনা করেন, সেইরূপ ঐ হ্লাদিনী শক্তির শত সহস্র বৃত্তিও মূর্তিমতী হইয়া অনুক্ষণ রাধা ও কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের সহিত একত্র অবস্থান করেন, রাধাকৃষ্ণের প্রীতিসাধনই ইঁহাদের একমাত্র অভিপ্রেত এবং ইঁহারা সর্বদাই রাধাকৃষ্ণের সেবাকার্যে নিরত; এইজন্য ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের সখী ও সহচরীভাবে যে ক্রীড়া-বিশেষ প্রকটিত করেন তাহারই নাম রাস। রাস-পঞ্চাধ্যায়ের একটি শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন বলিয়াছেন,—

"রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।"

শিশুরা যেমন নিজের প্রতিবিম্বকে লইয়া খেলা করে, রমেশও ব্রজসুন্দরীগণকে লইয়া তাদৃশ রমণ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন: "অসৌ প্রেমবশতাস্বভাবেন তন্ময়ক্রীড়াসক্তঃ সন্ স্বরূপশক্তিত্বেন স্বপ্রতিমূর্তিত্বাৎ প্রতিবিম্বস্থানীয়াভিস্তাভিঃ সহ রেমে॥" লীলারসময় কৃষ্ণ স্বভাবতই প্রেমবশ, সুতরাং তিনি সততই প্রেম-ক্রীড়ানুরক্ত। তিনি প্রেমভাবে নিজের স্বরূপ-শক্তিদ্বারা তাঁহার নিজের প্রতিমূর্তি হইতে উদ্গত প্রতিবিম্বস্থানীয়া ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রমণ করেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, 'রাস' শব্দের গূঢ়মর্ম প্রাকৃত জগতে ব্যাখ্যাত হইবার নয়—ইহা এ জগতের ক্রীড়া নয়—এ জগতের ভাবও নয়। রাস আনন্দময় জগতেরই প্রেমানন্দময়

অতি চমৎকার ক্রীড়াবিশেষ। 'রাস' শব্দের আরও একটি নিগূঢ়-মর্ম আছে। সকলেই জানেন, রসশ্রুতি বলিয়া কতকগুলি শ্রুতি আছে। রসই যে পরব্রহ্ম ইহাই ঐ সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্য।

"আপো জ্যোতিঃ রসোঽমৃতং ব্রহ্ম"—"স এব রসরূপো বৃক্ষৌষধি তৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি।" গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—'রসোহমপ্সু কৌন্তেয়"। এ ছাড়া শ্রুতি আরও বলিয়াছেন,—"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রসস্বরূপ, এই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই অখিলরসামৃত-মূর্তি। এই রসরাজ রসিকশেখরের রস-পরমব্রহ্ম লাভের নিমিত্ত চিদানন্দরসময় যে ক্রীড়াবিশেষ, তাহাই রাস। এই জন্যই রাস নারায়ণের নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মারও দুর্লভ, এমন কি রসিকেন্দ্র শেখরের হৃদয়ে নিয়তবিহারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীও রাসের অধিকারিণী নয় বলিয়া বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং রাসলীলা যে কি উচ্চতমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত, ইহা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীবিজয়ধ্বজ বলিয়াছেন,—"আত্মনা সহ বিষয়সংযোগে যদ্-জ্ঞানং তেনৈব রাসো বিজ্ঞেয়ঃ"। রাস বুঝিতে হইলে অলৌকিক কোন শক্তির আবশ্যক নাই—স্বাভাবিক যে জ্ঞান তাহা দ্বারাই বুঝা যাইবে। আচার্যের উক্তিতে বোঝা যাইতেছে যে আত্মার সহিত বিষয়ের সংযোগে যে জ্ঞান তাহা দ্বারাই রাস বুঝিতে হইবে। কথাটির যথার্থ সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও দর্শন সমানভাবেই সাড়া দিয়া থাকে। যিনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার, পূর্ণের সহিত অংশের সম্বন্ধ বিশেষরূপে অবগত তিনি রাসলীলা বুঝিবার অধিকারী। কিন্তু এই সম্বন্ধ কি তৎসম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার।

জ্ঞানী, যোগী ও কর্মীদিগের দৃষ্টিতে আত্মানন্দ পরিতৃপ্ত পূর্ণ ব্রহ্মেরও রমণেচ্ছা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ভাবনাচতুর প্রেমিক উহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। প্রকৃত প্রেম জন্মিলে প্রেমাশ্রয় ও প্রেমবিষয় অন্তরে অন্তরে এক হইয়া যায়। তখন

প্রেমাশ্রয়ের ভাব প্রেমবিষয়ে ও প্রেমবিষয়ের ভাব প্রেমাশ্রয়ে অনুভূত হয়। গোপীরা প্রেমের আশ্রয় ও কৃষ্ণ প্রেমের বিষয়। গোপীদিগের অপ্রাকৃত আন্তরিক ব্যাকুলতা মূর্তিমান্ পূর্ণব্রহ্মকেও ব্যাকুল করিয়া তোলে।

প্রেমের অনুরোধে পূর্ণকামের কামনা, চৈতন্যময়ের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাহীনের তৃষ্ণা হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছা মনুষ্যোচিত ইন্দ্রিয় পরিচালিত ইচ্ছা নহে। গোপীগণেরও নরাকার পরব্রহ্মে আত্ম-নিবেদন করিয়া তাঁহার করিবারই অভিলাষ—তাঁহাদের আপন আপন ইন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছা আদৌ ছিল না। প্রেমময়ী গোপী ও আনন্দময় কৃষ্ণের রাসলীলা কামগন্ধহীন। গোপীগণের প্রেম, উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব—তাহা রূঢ় মহাভাব নামে বৈষ্ণবজগতে পরিচিত। নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি করিবার ইচ্ছার নাম কাম। এই কাম প্রেমের বৃত্তি নহে। ইহাতে ঘোর স্বার্থ বিদ্যমান—সুতরাং ইহা রজোগুণের বৃত্তি। গোপী বা হ্লাদিনীর যে প্রেম সে কেবল কৃতসুখৈকতাৎপর্যময়।

"গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কভু নহে কাম॥
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম॥
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য হয় প্রেম মহাবল॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কামপ্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্মলভাস্কর॥

অতএব গোপীগণ নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগিমাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥"

অভিহিত হইয়া থাকেন। রাধা ও সখীদের সেবায় ভগবানের যেরূপ প্রীতি হয়, ভগবানের সেবা করিয়া তাহাদের ততোধিক আনন্দ হইয়া থাকে। নিজানন্দেই নিত্যপ্রীত পরমেশ্বরের আবার সেবার জন্য প্রীতি কিরূপ তাহা প্রেমিক, রসিক ও ভাবুক ভক্তগণ ভিন্ন কেহ বুঝিবার অধিকারী নন। ইহাই বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত।

আনন্দ ভিন্ন কেহ ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না; বৈষ্ণবাচার্য বলেন, আনন্দময় ভগবান্ কৃষ্ণ নিজানন্দের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দ্বারা অখিল জগতের গোপ্তা অর্থাৎ রক্ষক। এই জন্য তিনি নিত্যই গোপ এবং তাঁহার রাধা প্রভৃতি সহচরীগণ নিত্যই গোপী। রাধাকৃষ্ণের স্বরূপাংশ বলিয়া তাঁহাদের নিত্যলীলার সহকারী মাত্রই গোপ বা গোপী। বৈষ্ণবগণ 'উপজীবন্তী মাত্রাং হি তস্যানন্দস্য সর্বদা ভূতানি সকলানি'' এই শ্রুতি-বচনে বলিয়া থাকেন--"নিখিল জীবগণ সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমানন্দের আভাসমাত্র আশ্রয় করিয়া জীবিত আছে।'' অতএব যখন ভগবদানন্দের আভাস ভিন্ন জীবন-রক্ষার উপায় নাই, তখন তিনিই যে রক্ষক, গোপ্তা বা নিত্য গোপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্ময়ধ্যানে আনন্দময় ভগবান্ প্রেমরূপ গোপীগণে মিলিত হইয়া নিত্যই পরম রসাস্বাদের আদান প্রদান করেন, তাহার নাম 'রাসলীলা' ইহাই প্রেমানন্দের আনন্দময় সম্মিলন।

লীলারসময় কৃষ্ণ ভক্তজনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য ভক্তচিত্ত বিনোদনের জন্য আত্মারাম ও আপ্তকাম হইয়াও বিবিধ লীলা করেন। কৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ" (পদ্মপু°)

গোস্বামিপাদ শ্রীরূপ কৃষ্ণামৃতে লিখিয়াছেন,—

"প্রকট্যপ্রকটী চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে।"

প্রকট ও অপ্রকট লীলা এই দুই প্রকার। কৃষ্ণ লীলাময় রূপে সর্বদা সর্বত্র ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া যে লীলা বিস্তার করেন, তাহারই নাম প্রকট লীলা। অপ্রকট লীলা প্রপঞ্চের প্রত্যক্ষ বহির্ভূত। কৃষ্ণের লীলা নিত্য ও অনন্ত। এই অনন্ত লীলাসমূহের মধ্যে ঋষিগণ ও প্রেমিকভক্তগণ সর্বরসমাধুর্যময়ী রাসলীলাকে সর্বলীলার সার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এমন কি রসিকেন্দ্রশিরোমণি স্বয়ং কৃষ্ণও রাসলীলার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন,—

"সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীনা স্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥"

যদিও আমার শত শত মনোহর লীলা আছে, কিন্তু রাসের কথা মনে পড়িলে আমার মনে কি জানি কি যে ভাবের উদয় হয় তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। রাসপঞ্চাধ্যায়ের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মহোদয় এই উক্তির অনুসরণ করিয়াছেন,—শ্লোকটি এই—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥"

তৎপরো ভবেৎ বলিলে কি বুঝিব? "তস্মাৎ তাদৃশী ক্রীড়া আদৌ ভজতে যা শ্রুত্বাপি স্বয়মপি তৎপরো ভবেৎ, যদা যদা শৃণোতি তদা তদাসক্তো ভবতি।" তিনি এমন লীলাসকল প্রকটিত করেন, যে সকল লীলার কথা শ্রবণমাত্র অন্যের কথা আর কি, তিনি নিজেও তৎপর হইয়া থাকেন।

হরিবংশে রাসলীলা নাই। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং মদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে রাসলীলার বর্ণনা আছে। ভাগবতের রাসলীলাই সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। এই মহাপুরাণে রাসলীলা পাঁচ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতে এই রাস পঞ্চাধ্যায়ের সমাদর পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রাস কাহাকে বলে? সাধারণত

বহু নর্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষের নামই রাস। শ্রীধরস্বামিপাদ ভাগবতের টীকাতে এই কথাই বলিয়াছে,—

"রাসো নাম বহুনর্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষঃ"

রাসের শাস্ত্রীয় লক্ষণ এই—

"নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনাং অন্যোন্যাত্তকরশ্রিয়াম্
নর্তকীনাং ভবেদ্ রাসো মণ্ডলীভূয়ো নর্তনম্ ॥"

নটেরা যাহাদের কণ্ঠগ্রহণ করিয়াছে এবং যাহারা একে অন্যের কর ধরিয়া করশোভা বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে, নর্তকীদের মণ্ডলাকার নৃত্যের নামই রাস। ভাগবতোক্ত গোপীদিগের রাসক্রীড়াই ইহার উদাহরণ।

ভাগবতের টীকাকার বিজয়ধ্বজ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাসের এইরূপ একটি ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন। আর কবি জয়দেব রাসের যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহাও এইরূপ—

"করতলতালতরলবলয়াবলিতকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতী প্রশংসে।"

গর্গসংহিতায় (গোলক খণ্ড, ৮.৬.৭) উল্লিখিত আছে যে, রাধা কৃষ্ণের অংশভূতা। কৃষ্ণ আপনার পরম তেজ বৃষভানুর পত্নীতে রাধারূপে আবেশিত করেন। সেই তেজ হইতে যমুনা কূলের নিকুঞ্জদেশের উত্তম মন্দিরে রাধা আবির্ভূত হন।

বৈষ্ণবের প্রেম

মানবমাত্রের হৃদয়ে জন্মগত একটা প্রেরণা আছে। এই প্রেরণা আছে বলিয়াই চিত্ত এতটা স্নেহপ্রবণ। এই প্রেরণা তীব্র হইয়া— ক্রমশ তীব্রতর, তীব্রতম হইয়া উঠিলে চিত্ত অতিশয় স্নিগ্ধ হয়। এ অবস্থায় তখন তাহা ভাবরূপে পরিণত হয়। আর সেই ভাব গাঢ়তাপন্ন হইয়া স্বত উচ্ছ্বসিত হইয়া যাহা সৃষ্টি করে তাহারই নাম প্রেম।

"সম্যঙ্‌ মসৃণিত সান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমানিগদ্যতে॥"

মনস্তত্ত্ববিদ্‌ ইহাকে তীব্র হৃদয়াবেগ বা passion, ভাবোচ্ছ্বাস বা sentiment অথবা সুনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ বা organised emotion যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। এই সুনিয়ন্ত্রিত অনুভূতির মূলে সহজাত তাড়না বা নোদনা অথবা ক্রিয়া (instructive impluse) বিদ্যমান থাকিলেও মানুষ নিজের ইচ্ছাশক্তিদ্বারা উহা দমন করিয়া এই আবেগকে যথার্থ পথে চালিত করিত সমর্থ। এই ভাবাবেগ ও বাসনার দ্বন্দ্ব মানবের মনে অহরহ চলিতেছে। মানবের ইচ্ছাশক্তি আবেগকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া স্থায়িভাবে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হয়। মানবের মনে প্রেম উপস্থিত হইলে সংশয়ের স্থলে কৌতূহল বা মনোবেগ, ভয়ের স্থলে সম্মান, রাগের স্থানে পক্ষাবলম্বন ঘটে। আবেগ দমিত হইয়া কার্যকরী শক্তিরূপে সহায়ক হয়। তাহাতে মানব আত্মসংযমী হয়। সুতরাং এটুকু স্থির, প্রেম শুধু হৃদয়ের তীব্র আবেগ নয়। ইহা ইচ্ছাশক্তি কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ। বুদ্ধিবলে (reason) সহজজ্ঞানকে (instinct) প্রকৃত পথে চালিত করিয়া মানবজীবনে স্থায়িভাবের

উদ্রেক করিতে পারে—জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে (regulate)—জীবনের মূল সূত্রগুলির (principles) একত্ব (unity) সম্পাদন করিতে পারে। প্রেমের কিন্তু একটা লক্ষ্য থাকা চাই। ভাবাবেগ শুদ্ধ বা মুক্ত হইলেই চলিবে না। এই নিয়ন্ত্রিত ভাবের একটা আধার চাই। প্রেমের বিস্তৃতি তখনই হইবে যখন কোন ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র মনে স্বতঃই আনন্দের স্ফুরণ হইবে। এই আনন্দের সহিত ইন্দ্রিয়জসুখের কোন সম্পর্ক নাই। কোন বস্তু, বিষয় বা ব্যক্তির নিকট হইতে ইন্দ্রিয়জ সুখ পাওয়া যায় তখনই, যখন উহার নিকট যাহা পাওয়া যায় তখনই, যখন উহার নিকট যাহা পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইতে পারে বা দৈহিক বা মানসিক অভাব পূরণ হয়। আনন্দ কিন্তু এ শ্রেণীর সুখের মতো নয়। অবশ্য আনন্দে এ শ্রেণীর সুখের মতো তীব্রতা আছে বা অধিকতর তীব্রতা আছে। কিন্তু ইহাতে আত্ম-বিস্মৃতি, তন্ময়তা—'ভালবাসা বলিয়া ভালবাসা।' স্বার্থের লেশমাত্র ইহাতে নাই। দেহের বা মনের কোন অভাবই ইহাদ্বারা পূর্ণ হয় না—পূর্ণ হয় আত্মার ক্ষুধা। চিত্তের চাঞ্চল্য বা ভাবাবেগের লেশমাত্র এ অবস্থায় থাকে না।—বিষয় বস্তু বা ব্যক্তিকে এ অবস্থায় মানব বিষয় বস্তু বা ব্যক্তির জন্য ভালবাসিয়া থাকে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে—delighting in it for its own sake. উহাকে দেখিতে নেত্রের আনন্দ, উহার কথা শুনিতে কর্ণের আনন্দ, এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়দ্বার উহাদ্বারা নন্দিত হইয়া থাকে। মনের ভিতর যেন পুলকের শিহরণ হইতে থাকে—এক কথায় বলিতে গেলে এই স্থায়িভাব মনে উদয় হইলে প্রেমিক মানব তাহার আপনার সত্তা প্রেমময়ের সত্তায় নিমজ্জিত করিয়া সৌন্দর্যের প্রকৃত রূপের সন্ধান পায়—ক্রমশ সে প্রেমের বস্তু, বিষয় বা ব্যক্তির ভিতর দিয়া প্রেমময় ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে। 'রসো বৈ সঃ'র মধ্যে রসের সন্ধান ও আস্বাদন পায়।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই আনন্দের ভিতর দিয়াই যে শুধু প্রেম জন্মিতে পারে তা নয়—দুঃখ, দৈন্য ও কষ্টের ভিতর দিয়াও এই প্রেম জন্মিতে পারে। সুখ ও দুঃখ এক বৃন্তের দুইটি ফুল। সুখ জন্মিলেই সঙ্গে সঙ্গে বিরহ বা দুঃখ উপস্থিত হয়, কারণ দর্শনজনিত আনন্দের পর অদর্শনজনিত বিরহ উপস্থিত হয়। এই বিরহ প্রেমকে গাঢ় করে। বিরহ মানবের মনকে আচ্ছন্ন বা অভিভূত করিয়া ফেলে—বিরহাবস্থায় শয়নে-স্বপনে প্রেমিক প্রেমাস্পদকে পাইতে চায়—পূর্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইতে চায়—এক কথায় চায় আনন্দ। আবার যখন প্রেমাস্পদের দেখা মেলে তখন বিরহ দূর হইয়া যায়—আনন্দ গভীরতর হয়। প্রেমকে সুদৃঢ় করিতে হইলে আনন্দ ও বিরহ চাই। কিন্তু এই দুই ভাবের মধ্যে আনন্দ স্থায়িভাব ও প্রবল শক্তিশালী। বিরহ স্থায়িভাব নয়—বিরহ হারানো আনন্দের পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা—প্রযত্ন—বিগত আনন্দের অন্বেষণ। আবার এই বিরহের ভিতর দিয়া আনন্দকে পুনরায় পাই বলিয়া বা পাইবার আশা রাখি বলিয়া আনন্দের মূল্য বাড়িয়া ওঠে—আনন্দকে পাইবার জন্য ব্যগ্রতা জাগিয়া ওঠে তাহা না হইলে বিরহের ব্যথা অসহ্য হইয়া উঠিত। বিরহের ভারে আমাদের মন-প্রাণ দমিয়া ভাঙিয়া যাইত।

তাহা হইলে বুঝা গেল প্রেম কেবল আনন্দও নয়—আনন্দ ও বিরহের মিলনফলে জাত ভাবও নয়—প্রেম স্থায়িভাব—শ্রেষ্ঠভাব master passion.

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রেমের আভাস দিলাম। আর একদিক দিয়া ইহার একটু আলোচনা করিব।

রস্যতে অনেন ইতি রসঃ। যাহা দ্বারা আস্বাদন করা যায় তাহা রস। রস স্বয়ংবেদ্য। ইহা কাহাকেও বোঝানো যায় না—রস আপনা আপনি বুঝিতে হয়। সকল ভূতের মধ্যে—সকল

ব্যাপারের মধ্যে—সকল বিষয়ের মধ্যে রসই প্রাণ। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—"এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ" "পৃথিব্যা আপো রসঃ।" এইরূপ সকল রসের মধ্যে যিনি অনুস্যূত "স এষ রসানাং রসতমঃ"। রসই সর্বধাতুর প্রাণ। রসানুভূতি আবার ভাবে অনুস্যূত। ভাব রসের আশ্রয়। এই পরস্পর রস ও ভাবে ব্যাপার ফুটিয়া ওঠে। অলঙ্কারশাস্ত্রে রসের যথেষ্ট আলোচনা আছে। যাহা হইতে সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি হয় তাহাকেই রস বলা যায়। এ জগতে যাহা কিছু সুন্দর তাহারই মূলে রস আছে। রস সৌন্দর্যোপলব্ধির মূলীভূত কারণ। আত্মাই সৌন্দর্যোপলব্ধির মূলীভূত কারণ-রস। উপনিষদের ভাষায় বলিতে পারা যায় "রসো বৈ সঃ"।

রসোপভোগের জন্যই আত্মার বহুত্ব। একত্বই বহুত্বসম্বলিত জগতের মূলীভূত কারণ। আত্মার মধ্যে উপভোগের ইচ্ছা থাকাতেই জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে। আত্মা জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার উপভোগেচ্ছা চরিতার্থ করবার জন্য।

আমরা দেখিতে পাই, জীবমাত্রই রসোপভোগের জন্য ব্যাকুল এবং সকলেই সর্বক্ষণ রসের সন্ধানে বিব্রত। সমস্ত জীবনটাই যেন রসানুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই নয়। রসানুসন্ধান ব্যতীত কোন প্রাণীই বাঁচিতে পারে না। কিন্তু এই রস কোথায় এবং কেন সকল জীব ইহার জন্য পাগল ?

যখন রসের জন্য সকলেই পাগল তখন রসের মর্ম যে জীবমাত্রেই জানে, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জীব যদি রসের মর্ম না জানিত তাহা হইলে সে কখনই রসের জন্য এত লোলুপ হইত না। কিন্তু কেন সকলে ইহার জন্য পাগল—ইহার সমীচীন উত্তর এই যে অপূর্ণতা এবং অভাবই আমাদিগকে রসানুসন্ধানের জন্য ব্যস্ত করে। আত্মায় প্রকৃতপক্ষে কোন অভাব নাই—আত্মা অভাবরহিত এবং পূর্ণ। অপূর্ণতা হইতেই উপভোগের কামনা হয়। উপভোগ কামনার তাৎপর্য এই যে, যাহার অভাব আছে এবং যাহা অপূর্ণ,

তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—অভাব দূর করিয়া পূর্ণত্ব-প্রাপ্তির দিকে। জগতের মধ্যে যাহাই অপূর্ণ তাহাই পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হয়; এইরূপে যাহা সসীম তাহার প্রবৃত্তি অসীমত্বের দিকে। সুতরাং পূর্ণ-সৌন্দর্য অনন্ত ও অসীমে। আত্মা স্বভাবত পূর্ণ এবং তাহার কিছুরই অভাব নাই, সুতরাং রসাস্বাদন (একদিকে) হইয়াই রহিয়াছে।

যে কখনও যাহার আস্বাদ পায় নাই, তাহার জন্য সে লালায়িত হইতে পারে না। মানুষমাত্রেই পূর্ণ সৌন্দর্যের জন্য লালায়িত; তাই প্রশ্ন হইতে পারে, কবে এবং কোথায় আমরা পূর্ণ-সৌন্দর্যের আনন্দ পাইলাম। পূর্ণ-সৌন্দর্যের স্বাদ আমাদের আছে। আমাদের অন্তরের অভ্যন্তরে পূর্ণ-সৌন্দর্যের স্বাদ আছে। কিন্তু আমরা বৃত্তিদ্বারা যে সৌন্দর্য উপভোগ করি তাহা অপূর্ণ, কারণ আমাদের সীমাবদ্ধ বৃত্তি পূর্ণ-সৌন্দর্যের ধারণা করিতে অক্ষম। তাই বৃত্তিদ্বারা আমাদের সৌন্দর্যোপভোগ চরিতার্থ হয় না। আমাদের অভাব থাকিয়াই যায়—অভাব মিটে না। আত্মা স্বরূপত পূর্ণ। যাহা পূর্ণ তাহাই সুন্দর। যাহা অপূর্ণ তাহাই অসুন্দর। আত্মাই সুন্দর। আমরা সকলেই জানি, অঙ্গহানিই সৌন্দর্যহীনতার কারণ। অঙ্গহানিত্ব ও অপূর্ণতা একই বস্তু।

জগতে যে সৌন্দর্য অনন্ত ও অপরিমিতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, প্রকৃত কলাবিদ্ তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাহার আস্বাদ পাইয়া তাঁহার কলাশিল্পে তাহা বৃত্তিগ্রাহ্য পরিমিত আকারে পরিব্যক্ত করিতে প্রয়াস পান। কাব্য, উপন্যাস ও চিত্রকলার উদ্ভবের কারণ এই যে কবি উপন্যাসিক চিত্রকর তাঁহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে যে সৌন্দর্যের আস্বাদ পাইয়াছেন, জগতে তাঁহারা বা অপরে তাহার সাক্ষাৎ পান না; তাই তাঁহারা বৃত্তিগ্রাহ্য পরিমিত আকারে তাহা তাঁহাদের কাব্য, উপন্যাস ও চিত্রে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন।

আমরা বাহিরে যে রূপটি দেখি তাহাই যে সুন্দর তাহা নয়।

বাহিরের রূপটি আমাদের ভিতরের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। যাহা সুন্দর তাহা আমাদের অন্তরের অভ্যন্তরেই বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে আকৃষ্ট বলিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ নাই। নানা-প্রকার সংস্কারের আবরণ আমাদের চিত্তকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং আমাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য মেঘাবৃত সূর্যবৎ অপরিপুষ্ট স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছে। বাহিরের বস্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাহায্যে কিয়ৎপরিমাণে সেই আবরণকে সরাইয়া আমাদের অপরিস্ফুট করিয়া দেয়। এইরূপে আমাদের সৌন্দর্যানুভূতি জাগ্রত হয়।

আমরা ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাহায্যে যে সৌন্দর্য উপলব্ধি করি তাহা খণ্ড সৌন্দর্য; কিন্তু সৌন্দর্য প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড। জীব-ভাবাপন্ন আত্মায় যুগপৎ অখণ্ড ও খণ্ড সৌন্দর্যের উপলব্ধি হয়; কারণ তাহার আন্তর্নিহিত অখণ্ড সৌন্দর্যই ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাহায্যে খণ্ডাকারে অভিব্যক্ত হয়। জীবের চিত্তবৃত্তি বহির্মুখী বলিয়া সে এ ব্যাপার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে না।

সৌন্দর্য যখন প্রকৃতপক্ষে অখণ্ড, তখন সৌন্দর্যের প্রকৃত উপভোগ-কর্তাও অখণ্ড। খণ্ডাকার সৌন্দর্যকে প্রকৃত সৌন্দর্য বলা যাইতে পারে না। খণ্ড-সৌন্দর্য যদি প্রকৃত সৌন্দর্য হইত তাহা হইলে জীব খণ্ড-সৌন্দর্যে পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু খণ্ড-সৌন্দর্যে জীবের সৌন্দর্য-পিপাসা মিটে না, তাহা তাহার পিপাসা আরও বাড়াইয়া দেয়; কিন্তু সীমাবদ্ধ জীব এই অতৃপ্ত পিপাসা বক্ষে করিয়া অনন্ত জীবন ঘুরিয়া বেড়াইলেও পূর্ণ সৌন্দর্যে তাহার পিপাসা মিটিবার আশা নাই। জীবের এই অনন্ত সৌন্দর্য পিপাসাই সূচনা করে যে, জীবের পূর্ণ ও অখণ্ড সৌন্দর্যের আস্বাদন করা আছে। অথচ পূর্ণ ও অখণ্ড সৌন্দর্যের আস্বাদনকর্তা অপূর্ণ ও খণ্ড হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে, জীবের যে অবস্থায় অখণ্ড ও পূর্ণ সৌন্দর্য আস্বাদিত হইয়াছে জীব সে অবস্থায় অখণ্ড

ও পূর্ণ। একমাত্র অখণ্ড ও পূর্ণসত্তা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ; সুতরাং অখণ্ড ও পূর্ণ অবস্থায় জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়।

শ্রুতিতে আছে, পূর্বে একমাত্র পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য বহু হইতে কামনা করিলেন এবং সেই কামনার ফলে বহু হইলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, পূর্ণ ও অখণ্ড আত্মার আনন্দানুভূতি হইতে পারে না। আমার আনন্দানুভব করিতে হইলে আমার সদৃশ আরও অনেক আত্মার প্রয়োজন হয়। ব্রহ্মেরও বহু হইবার ক্ষমতা আছে। নহিলে তিনি বহু হইলেন কেমন করিয়া? যিনি এক হইয়াও বহু হইতে পারেন তাঁহার সম্বন্ধে দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ প্রয়োজ্য হইতে পারে না। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের অতীত। তিনি বস্তুত একও নহেন, বহুও নহেন। তিনি যুগপৎ এক ও বহু। একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা আত্মা ব্যতীত আর কিছুকে এইরূপ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। আমি একদিকে যেমন অসীম, তেমনই আর একদিকে আমি সসীম। অসীমত্ব ও সসীমত্বের ভাব যুগপৎ আমার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে অবস্থায় আমি অসীম সে অবস্থায় আমি দেশ ও কালের অতীত ; সসীমাবস্থায় আমি দেশ ও কালের সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু দেশ ও কালের যে কোথায় আরম্ভ এবং কোথায় শেষ তাহাও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দেশ এবং কালেরও সীমা পাওয়া যায় না। যিনি ব্রহ্ম তিনি দেশ এবং কালের সীমায় আবদ্ধ থাকিতে পারেন না, অথচ দেশও অনন্ত, কালও অনন্ত। সুতরাং বুঝিতে হইবে, যাহাই একদিকে এক, তাহাই আর একদিকে বহু। আমি যদি নিতান্তই অসীম হইতাম তাহা হইলে আমার অসীমত্বের ধারণা হইতে পারিত না। আমি একদিকে যেমন অসীম অপরদিকে তেমনই সসীম। এই অসীমত্ব ও সসীমত্ব যুগপৎ আত্মার আছে বলিয়াই আত্মা আনন্দরস পান করিতে সমর্থ।

যাহা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড তাহাই রস। জীবভৃঙ্গ তাহাই পান করিবার জন্য ব্যগ্র। যিনি পরিপূর্ণ এবং অখণ্ড ব্রহ্মানন্দরস, তিনিই আবার রসপান-পিপাসু অপূর্ণ খণ্ডাকৃতি জীবভৃঙ্গ। এই রসানুসন্ধান রসাস্বাদন ব্যাপারই বৈষ্ণব-সাহিত্যের রহস্য। ভক্তিতত্ত্বে এই রহস্যের উদ্ভেদ হইয়াছে।

জীবমাত্রই জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মরণ পর্যন্ত রসানুসন্ধান করিতেছে। মূর্তিমান আনন্দই রস, জীবও আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই চাহে না—আনন্দ ভিন্ন বাঁচে না; কিন্তু আনন্দ কাহাকে বলে, আনন্দ কোথায় আছে এবং আনন্দ কিরূপে পাওয়া যায় তাহা তাহারা জানে না; সেই জন্য ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের মধ্যে আনন্দের অন্বেষণ করে। জীবের এরূপ বলবতী আনন্দ-লিপ্সা কেন তাহাই বুঝিবার জন্য প্রেমতত্ত্বের আবিষ্কার। সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ পরমতত্ত্ব যেমন সত্তাপ্রধান হইলে ব্রহ্ম, চৈতন্য-প্রধান হইলে পরমাত্মা এবং আনন্দ-প্রধান হইলে ভগবান্, সেইরূপই সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ বস্তু প্রেমপ্রধান হইলেই শুদ্ধজীব। সৎস্বরূপ বস্তু নির্বিশেষভাবে থাকিতে পারে এবং আছেও—চৈতন্যস্বরূপ বস্তু আপনি পরিস্ফুট;—কাজেই আনন্দের থাকা না থাকা সমান হইয়া পড়ে।

এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—পরব্রহ্ম আপনাকে অসৎ মনে করিলেন এবং বহু হইতে অভিলাষী হইলেন।—অভিলাষী হওয়া বাহুল্যমাত্র; কেননা লীলাই যে আনন্দের স্বভাব এবং আনন্দই যে লীলার আস্বাদ্য। মানুষ আনন্দপ্রণোদিত হইয়াই ক্রীড়া করে এবং ক্রীড়া করিয়াই আনন্দ আস্বাদন করিয়া থাকে। কোনও প্রকার অভাব বোধ হইলে, তাহার পূরণের জন্য স্বতঃই ইচ্ছা হইয়া থাকে; পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবানের কোনও প্রকার অভাব নাই; সুতরাং ইচ্ছাও নাই। তিনি নিজেই প্রতিনিয়ত নিজানন্দ আস্বাদন করিতেছেন এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত আছেন; কিন্তু

সে আনন্দ অপরিস্ফুট, লীলা ব্যতীত তাহা পরিস্ফুট হয় না; সেই জন্য বৈষ্ণব দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, তিনি যে অহেতুক আত্মপ্রেম আত্মানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন সেই স্বনিষ্ঠ প্রেমাংশ শত শত ভাগে বিভক্ত করিয়া নিজাংশ দ্বারা নিজানন্দ আস্বাদন করেন; ইহাই তাঁহার অপ্রাকৃত প্রেমপ্রধান ভগবদংশই শুদ্ধ জীব অথবা ভগবানের নিত্যলীলাপরিকর। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দঘন "উহাদের রূপও সেইরূপ সচ্চিদানন্দঘন"; কিন্তু তাহা প্রেমপ্রধান বলিয়া প্রেমময় এবং ভগবানের আনন্দাস্বাদনী শক্তি বলিয়া প্রেমময়ী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য প্রভৃতি যত প্রকার প্রেম বিমলানন্দ আস্বাদন করা যায়, ভগবান্ কৃত নিজানন্দ পরিস্ফুট করিবার জন্য বা বিচিত্রভাবে আস্বাদন করিবার জন্য, ঐ সমস্ত প্রকার প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ করিয়া আবার একাধারে সমুদয় প্রেমও প্রকাশ করিয়াছেন; ঐ সমুদয় প্রেমের একাধারে নামই 'রাধা'। প্রেমে ঈশ্বরাংশ জীবকে যেমন বশীভূত করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না। রাশির স্বভাব বুঝিতে হইলে অংশের স্বভাব দেখিতে হইবে। অগ্নিরাশির স্বভাব যদি বুঝিতে হয় তাহা হইলে অগ্নিকণার স্বভাব দেখিতে হইবে। ভগবদংশ জীব প্রেমেই বশীভূত হইয়া থাকে। অতএব সর্বজীবাধার আনন্দ-বিগ্রহ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণও প্রেমরূপিনী রাধার নিতান্ত বশীভূত ও একান্ত অনুগত—কৃষ্ণ রাধা ব্যতীত থাকিতেই পারেন না।

যেখানে আনন্দ সেইখানেই প্রেম এবং যেখানেই প্রেম সেইখানেই আনন্দ; আনন্দ ভিন্ন প্রেম হয় না এবং প্রেম ভিন্নও আনন্দ নাই; আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ কৃষ্ণ এবং প্রেমেরও ঘনীভূতমূর্তি রাধা। সুতরাং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানে রাধা, এবং যেখানে রাধা সেইখানেই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভিন্ন রাধা বা রাধা ভিন্ন কৃষ্ণ থাকিতেই পারে না।

প্রেমের ইহা হইতে উচ্চতর আদর্শ আছে বলিয়া জানি না। প্রীতির আধিক্যই প্রেম—এই প্রেমে মত্ত হইয়া মানুষ নৃত্যগীত

করিয়া থাকে। তাহার শরীরে পুলকাশ্রুর লক্ষণাদি দেখা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য, ২০) পাই—

"এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন।
পুলকাশ্রু নৃত্যগীত যাহার লক্ষণ॥"

ভাবই এই প্রেমের প্রথমাবস্থা—

"প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যু রত্রাশ্রু পুলকাদয়ঃ॥"
(ভক্তি-রসামৃত সিন্দু)

এই ভাব বলিলে আমরা বুঝি—

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যচিদসৌ ভাব উচ্যতে।
(ভক্তি-রসামৃত)

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তির সারই যাহার স্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্যের কিরণ যাহার সাদৃশ্য, রুচি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি, তাঁহার আনুকূল্য ও সৌহার্দের অভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক যে ভক্তিবিশেষ, তাহার নাম 'ভাব'। শুদ্ধভক্তি হইতে প্রেমের উৎপত্তি হইয়া থাকে—

"শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন॥"

ভাব মমত্বাতিশয়যুক্ত হইলে প্রেমভক্তি আখ্যা হয়। আবার সাধনভক্তি হইতে রতি হয়, রতি গাঢ় হইলে তবে তাহার নাম প্রেম হয়।

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়
রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম হয়॥"
"প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥"

এইরূপে বিশ্লেষণ করিয়া নানাভাবে প্রেমের অবস্থা-বিশেষের পরিচয় বৈষ্ণবশাস্ত্রকারগণ দিয়াছেন

মাধ্বদর্শন বা পূর্ণপ্রজ্ঞ-মত

অদ্বৈত ও বৈষ্ণব দর্শনের খ্যাতি বরাবরই আছে। অদ্বৈত দর্শনমতে কেবল ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা ; জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক, ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই ; প্রভেদ-ভাব, অবিদ্যা হইতেই হয়। জীব অবিদ্যামুক্ত হইলে, আপনার প্রকৃত স্বভাব জানিতে পারে এবং মুক্ত হয়। ব্রহ্মের নিগু'ণত্ব, জগতের মিথ্যাত্ব, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব, অবিদ্যার অনাদিত্ব এবং জগৎসৃষ্টি-কর্তৃত্ব অদ্বৈত-দর্শন দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে।

বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, জীব এবং ব্রহ্ম পরস্পর হইতে বিভিন্ন ; ব্রহ্ম একপ্রকৃতিক নহেন, বহুত্ব ব্রহ্মেরই ভিতর নিহিত ;—জড়জগতের উপাদান এবং বহুজীব ব্রহ্মেরই অংশরূপে ব্রহ্মেরই মধ্যে নিহিত ; ব্রহ্ম নিগু'ণ নহেন, তিনি গুণপূর্ণ। সৃষ্টি (বা জগৎ) সত্য, কিন্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল ; মায়া অচিন্তনীয় বা অপরিজ্ঞেয় নহে, মায়া ঈশ্বরেরই ইচ্ছা ; ব্রহ্ম সত্য, সুতরাং ব্রহ্মের সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহাও সত্য ; জগৎ ব্রহ্মের ইচ্ছার ফল, সুতরাং জগৎ সত্য।

অদ্বৈত ও বৈষ্ণব দর্শন উভয়ই বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় শ্রেণীর দার্শনিকেরাই বেদান্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তের যথার্থ তাৎপর্য কি ? উপনিষদে এমন অনেক মন্ত্র আছে, যাহা দ্বারা অদ্বৈতবাদ সমর্থন করা যাইতে পারে ; আবার এমন অনেক মন্ত্র আছে, যাহা দ্বারা বৈষ্ণব-মতও সমর্থন করা যায়। ব্রহ্মসূত্র বা ব্যাসসূত্রের ভিত্তি এই সকল উপনিষদ্-মন্ত্রের উপর। ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা ব্যাস উপনিষদ্-মন্ত্র-সকলের তাৎপর্য যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই সেই অনুসারে সূত্রগুলি রচনা করিয়াছিলেন। সূত্রগুলির যথার্থ অর্থ কি, তাহা

বুঝিতে পারিলে, বাদরায়ণ শ্রুতিমন্ত্রসকলের তাৎপর্য কি বুঝিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র শ্রুতিরই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতের বিরুদ্ধবাদী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাদরায়ণের সূত্রগুলি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নহে। ভাষ্যকারগণের ভাষ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সূত্রের অর্থ করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকারগণের মধ্যে এক শ্রেণীর ভাষ্যকারেরা অদ্বৈত-মতবালম্বী, এবং আর এক শ্রেণীর ভাষ্যকারেরা বৈষ্ণব দার্শনিক। সুতরাং শ্রুতির যে যথার্থ মত কি, তাহা সাধারণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন।

মাধ্বগণ বলেন, শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। অষ্টাদশ পুরাণ ও ভগবদ্গীতায় শ্রুতির বড় সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণ ও ভগদ্গীতা অদ্বৈতবাদ সমর্থন করে, কি বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মত স্বীকার করে, তাহা বিচারসাপেক্ষ।

মানুষের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য কি, তাহারই অনুসন্ধানের জন্য দর্শন-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি। সকল দর্শনকারই ধরিয়া লইয়াছেন, মানুষের অবস্থা দুঃখজনক অথবা পরিবর্তনশীল। দুঃখ ও নিয়ত পরিবর্তনের অবস্থা যাহাতে অতিক্রম করা যায়, সেই দিকে সকল চেষ্টা নিয়োজিত করা চাই। দুঃখ আত্মার অভিপ্রেত নয়, পরিবর্তনও নয়; অথচ আত্মাকে দুঃখ ও পরিবর্তনের অধীন হইতে হয়। আত্মা দুঃখ এবং পরিবর্তন চায় না; এই সকল হইতে মুক্ত হইতে চায়; কিন্তু দুঃখ এবং পরিবর্তন হইতে কি করিয়া মুক্ত হওয়া যায়? দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে হইলে, পরিবর্তনের হাত এড়াইতে হইলে, দুঃখ এবং পরিবর্তনের কারণ কি এবং ইহারা কোন্ নিয়মের বশবর্তী, তাহা জানিতে হয়।

আমাদের সম্মুখে যে জগৎ তাহা নিয়ত পরিবর্তনশীল, আমরা যখন যে অবস্থার অধীন হই, তাহাও নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু

আত্মার কোন সময়ে কোন পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন একদিকে যেমন সুখোৎপাদক, আর একদিকে তেমনি দুঃখোৎপাদক; পরিবর্তনের হাত এড়াইতে পারিলে সুখ-দুঃখের হাত এড়াইতে পারা যায়। এক শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মত, সুখ-দুঃখের হাত এড়ানোই কাজ। কিন্তু আবার বলিতে পারা যায়, দুঃখ মানুষের প্রিয় নয়, সকল মানুষই সুখান্বেষী; যে পরিবর্তন সুখপ্রদ, সেই পরিবর্তনের হাত এড়াইবার প্রয়োজন কি? অনেক দার্শনিকের মত এই যে, যাহাতে সুখ হয়, তাহার চেষ্টায় কোন দোষ নাই—তাহা মঙ্গলপ্রদ। তাঁহাদের মত এই যে, দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুঃখকে পরাস্ত করিয়া সুখ আনয়ন করাই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, পরিবর্তন-জনিত সুখ ও দুঃখ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সে স্থলে সে সুখকে আলিঙ্গন করিলেই দুঃখের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সুখকে আলিঙ্গন করা হয়। যাহার সহিত দুঃখের মোটেই সম্বন্ধ নাই এমন যদি কোন সুখ থাকে, সেই সুখকে আলিঙ্গন করাই কাজ। আমরা জীবনে যত সুখের পরিচয় পাই, সবই পরিবর্তন-জনিত সুখ। দুঃখের সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং তাহা পরমার্থ নহে। যদি সম্পূর্ণভাবে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে এরূপ সুখের হাতও এড়াইতে চেষ্টা করিতে হয়।

দুঃখের হাত এড়ানোই জীবনের উদ্দেশ্য। পরিবর্তন সুখ এবং দুঃখের জনক। আমাদের যখনই এক অবস্থার পরিবর্তে অন্য অবস্থা আসে, তখনই হয় সুখ, না হয় দুঃখের অনুভব হয়; এবং এই সুখ ও দুঃখ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং সুখই বা কি, দুঃখই বা কি,—উভয়ই পরিত্যাজ্য। অতএব সুখ-দুঃখের মূলীভূত পরিবর্তন আত্মার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ নহে। আত্মা যখন দুঃখ চায় না, তখন দুঃখের অতীত কোন অবস্থা আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। দুঃখের সহিত যখন সুখের সম্বন্ধ, তখন সুখের অবস্থাও আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা

নহে। আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা সুখ-দুঃখের অতীত এবং সকল পরিবর্তনের অতীত। আবার এমনও দেখা যায়, একজন যাহাকে দুঃখজনক মনে করে, আর একজনের পক্ষে তাহা দুঃখ নহে। যখনই মানুষ কোন অবস্থাকে দুঃখপ্রদ বলিয়া জানে, তখনই তাহা তাহার দুঃখজনক হয়। দুঃখকে দুঃখ বলিয়া না জানিলে, দুঃখও অনেক সময়ে সুখজনক হয়। সাধারণ লোকে যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, দার্শনিক তাহাকে দুঃখ বলিয়াই জানেন। দার্শনিক যাহা দুঃখ বলিয়া জানেন, "সাধারণ লোক তাহাকে দুঃখ বলিয়া জানিতে না পারিয়া সুখ বলিয়া মনে করে।" সুখ এবং দুঃখ সবই মন লইয়া। যদি মনে করা যায়, সবই দুঃখ—আবার যদি মনে করা যায়, সবই সুখ। আবার আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের মত এই যে, বন্ধনই দুঃখের কারণ। প্রকৃত সুখ এবং দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই। আমরা বিশেষ বিশেষ সংস্কারের অধীন হইয়া কোন অবস্থাকে দুঃখজনক মনে করি। সংস্কারের বন্ধন কাটিতে পারিলেই এ সকল জ্বালা আর থাকে না।

কোন কোন দার্শনিকের মত এই যে, দুঃখকর এবং সুখকর অবস্থা মনেরই কল্পনাসম্ভূত। সুতরাং সুখকর বা দুঃখকর বলিয়া কোন জগৎ নাই। কল্পনার মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে জানিতে পারিলেই দুঃখের অবসান হয়।

পূর্ণপ্রজ্ঞ (শ্রীমধ্ব) ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বলেন,—সুখদুঃখময় জগৎ মিথ্যা হইতে পারে এবং তাহাকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিতে পারিলে, সুখ-দুঃখের হাত এড়াইতে পারা যায় ; কিন্তু জগৎকে যদি মনের কল্পনা বলা যায়, তাহা হইলে জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ভাবাও আর একটা মনের কল্পনামাত্র। যাঁহারা জগৎকে মিথা বলিয়া ভাবিয়া দুঃখের হাত এড়াইতে চান, তাঁহারা কল্পনায়ই সুখী হইতে চান। বিশেষত জোর করিয়া জগতের অস্তিত্ব যদি আমরা অস্বীকার করিতে যাই, তাহা হইলে জগতের কল্পনা আরও জোর

করিয়া আমাদের মনে উদিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন চিকিৎসক রোগীকে বলেন,—"ঔষধ খাইবার সময়ে সর্পের চিন্তা করিও না" ; তাহা হইলে ঔষধ খাইবার সময়ে রোগীর মনে সর্পের চিন্তা আপনি আসিয়া উদিত হইবে। 'জগৎ নাই' ভাবিতে গিয়া 'জগৎই' মনে হইবে।

মায়াবাদীর উপর এইরূপ আক্রমণ সমীচীন নহে। মায়াবাদীর উদ্দেশ্য নহে যে, 'জগৎ নাই' ভাবিয়া জগতের হাত এড়াইতে হইবে। মায়াবাদী ঠিক চোখ বুজিয়া বিপদের হাত এড়াইতে বলেন না। জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কারকে তাঁহারা চূর্ণ করিতে বলেন। সর্পের চিন্তা মনে উদিত হইলে কিছুই যায় আসে না। প্রকৃত সর্প আছে—এই বিশ্বাসই মনে ভয়ের উদ্রেক করে। যদি কাহারও মনে সংস্কার থাকে, 'অমুক' বৃক্ষে ভূত আছে, তাহা হইলে তাহাকে যদি বলা যায়, তুমি ঐ বৃক্ষের তলা দিয়া যাইবার সময়ে ভূতের চিন্তা মনে আনিও না, তাহা হইলে তাহার প্রতি ঐ উপদেশ মঙ্গলপ্রদ হইবে না; কেননা, ঐ গাছের তলা দিয়া যাইবার সময়ে আপনা-আপনি ভূতের চিন্তা তাহার মনে উদিত হইবে এবং সে ভয়ও পাইবে। পক্ষান্তরে ঐরূপ সংস্কারাপন্ন মন হইতে যদি ঐ ভ্রান্ত সংস্কার বিদূরিত করা হয়, তাহা হইলে তাহার মনে ভূতের চিন্তা উদিত হইলেও তাহার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। শুধু 'জগৎ নাই' বলিয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। সেই চেষ্টা যত করা যায় ততই বিফলমনোরথ হইতে হয়, অর্থাৎ ততই সেই চিন্তা আরও জোর করিয়া মনে উদিত হয়। 'জগৎ আছে'—এই ভ্রান্ত সংস্কারকে বিচার বা যুক্তি দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিতে হইবে। তখন মনে যে অবস্থা হইবে, সেই অবস্থায় জগতের চিন্তা যতই মনে উদিত হউক না কেন, তাহাতে কিছুই ক্ষতি হয় না। জগতের অস্তিত্বের ধারণা আমরা কিছুতেই এড়াইতে পারি না। জগৎ আছে বলিয়া আমরা যে অনুভব করি, তাহা নিরর্থক নহে। নিশ্চয়ই তাহার

মূল কারণ আছে। জগৎ আছে বলিয়া অনুভব করিবার মূলে যে কারণ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সেই কারণে জগৎ যে একেবারেই মিথ্যা, তাহা বলা যাইতে পারে না। কোন যুক্তিই মায়াবাদীকে তাহার গৃহ, শরীর, ক্ষুধা, খাদ্য প্রভৃতি চিন্তা হইতে বিরত করিতে পারে না। কিন্তু ইহাতেই ঠিক মায়াবাদ খণ্ডিত হয় না। কারণ, মায়াবাদী আপনার গৃহ, শরীর, ক্ষুধা ও খাদ্য প্রভৃতি চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতে পারে; কিন্তু তিনি মনে মনে জানেন—ইহা মায়ারই ব্যাপার। কবেকার কি সংস্কার এখনও তাহার মনকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে; তাই একেবারে তিনি এসকল ভুলিতে পারিতেছে না। কিন্তু এখন যত তাহার তত্ত্বজ্ঞান হইতেছে, ততই তিনি এসকলে আসক্তিশূন্য হইতেছেন। পরে একেবারে জগদ্-ভ্রম বিদূরিত হইবে। দীর্ঘকাল গতিবিশিষ্ট রেলের গাড়ী চড়িয়া পরে যখন গাড়ী হইতে নামা হয় তখনও যেন রেলের গাড়ী চড়িয়া যাইতেছি এরূপ মনে হয়। সংস্কার একেবারে যায় না; অথচ তত্ত্বজ্ঞানী তাহাতে আসক্ত হন না। আমরা অভ্যাসের বশে অনেক কাজ করিতে পারি; কিন্তু আমাদের আত্মা তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিতে পারে। কি মায়াবাদী, কি অন্য কেহ জগতের চিরস্থায়িত্ব বিশ্বাস করিতে বাধ্য, এসকলই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। জগৎ যে এখনই আছে, পূর্বে ছিল না বা পরে থাকিবে না—এমন কেহ বিশ্বাস করে না। কোন না কোন আকারে জগৎ পূর্বেও ছিল ও পরেও থাকিবে—ইহাই সকলের বিশ্বাস। যদি তাহাই হয়, এবং 'আত্মা' বলিয়া যদি অন্য কিছু থাকে, তাহা হইলে এমন এক সূত্র আছে, যে সূত্রে জগতের সহিত আত্মার এমন এক সম্বন্ধ আছে, যাহাতে জগৎ আত্মার সুখ-দুঃখের মূলীভূত কারণ হয়। জগতের জীব যে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া জাগতিক সুখ-দুঃখের অধীন হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়ম এই সূত্রঘটিত। বস্তুতত্ত্ববাদীর এই কথার উত্তরে মায়াবাদী বলিবেন, এসকল আত্মার কল্পনা। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে

না, যদি থাকে আত্মার সহিত কোন সূত্রে তাহার কোন সম্বন্ধ চিন্তা করা যাইতে পারে না। যাহা আত্মার অতিরিক্ত তাহাই অনাত্মা; আলোকের সহিত অন্ধকারের যে সম্বন্ধ, আত্মার সহিত অনাত্মার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সম্বন্ধই নাই; তবে যে সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়, তাহা মিথ্যা। সুতরাং জগৎ সম্বন্ধে আত্মার যে ধারণা, মিথ্যা; তাহা কিন্তু মিথ্যা হইলেও এরূপ ধারণা হয়, তাহা হইলে ইহাকে মায়া ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। মায়াবাদী যুক্তিতে জগতের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পান না। তিনি যখন যুক্তি করিতে বসেন, তখন দেখেন জগৎ থাকিতে পারে না, কিন্তু জগৎ না থাকিলে, জগৎ সম্বন্ধে সংস্কার কেমন করিয়া হইতে পারে তাহারও কোন উত্তর তিনি যুক্তিতে পান না। 'জগৎ আছে' একথা তিনি বলিতে পারেন না। 'জগৎ নাই অথচ জগতের সংস্কার কেমন করিয়া হয়' একথাও তিনি বলিতে পারেন না; সুতরাং মায়াবাদের অবতারণা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। যখন 'জগৎ না থাকিলে জগতের সম্বন্ধে সংস্কার হইতে পারে না' একথার প্রতিবাদ তিনি করিতে পারেন না, তখন তাঁহাকে প্রমাণ-স্বরূপ শ্রুতিবাক্যের সাহায্য লইতে হয়।

ঈশ্বরকে নির্গুণ বলা হইয়া থাকে। বেদান্তেও ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে বর্ণনা করিতে না পারিয়া উপনিষদ্‌ও 'নেতি' 'নেতি' বলিয়াছেন। ঈশ্বরকে কি বলিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। যাহা কিছু বলিতে যাওয়া যায় তাহাই তিনি নহেন, তাই বলিয়া ঈশ্বর কি ব্রহ্ম কিছুই নহেন? পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন, ব্রহ্ম যে কিছুই নহেন, তাহা হইতে পারে না। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই গুণযুক্ত কিন্তু ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। নির্গুণ বলিয়া ব্রহ্ম যে একেবারে কিছুই নহেন, তাহা হইতে পারে না। আমরা এমন কিছুরই অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না, যাহা একেবারে গুণাতীত। যে কোন বস্তুরই কল্পনা করা যাউক না কেন,

তাহার কোন না কোন গুণ থাকিবেই। তবে ঈশ্বরকে কেমন করিয়া নির্গুণ বলা যাইতে পারে। নির্গুণ কিছুই থাকিতে পারে না। কাজেই ঈশ্বরকে যদি নির্গুণ বলা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর যে কিছুই নহেন—এই ধারণা হওয়া সম্ভব। পূর্ণপ্রজ্ঞ সেই কারণেই ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না; অথচ উপনিষদ্ ও বেদান্তের কথাও মিথ্যা নহে। শাস্ত্র যেখানে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছেন, 'নেতি' 'নেতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে শাস্ত্রের অন্য তাৎপর্য আছে। যদি তাহা না থাকিত, তাহা হইলে শাস্ত্র যেখানে তাঁহাকে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলিয়াছেন, সেখানে সে শাস্ত্রবাক্যে কি বুঝিতে হইবে? শাস্ত্রের এই সকল বাক্য আপাতত পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহার কি কোন তাৎপর্য নাই?

সরলবুদ্ধি মানবের ঈশ্বর ও জগৎ সম্বন্ধে যে স্বাভাবিক সংস্কার তাহারই উপর পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্যের মত প্রতিষ্ঠিত। তিনি সরল যুক্তি দ্বারা অতিজ্ঞানীদের দুরূহ মতের খণ্ডন করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বেদ মানিতেন এবং বেদ ও পুরাণের বহু-দেবতার মধ্যে বিষ্ণুকেই ঈশ্বরের পদে বসাইয়াছিলেন। এই বিষ্ণু জীব ও জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। জগৎ পরিণামী ও অনিত্য হইলেও তাহা মিথ্যা নহে; কারণ, যাহা মিথ্যা বা অবাস্তব, তাহা কোনদিনই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা জাগতিক বিষয় নিত্য প্রমাণিত হইতেছে এবং এই দ্বিবিধ প্রমাণ-বলে জড়বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বা বিষ্ণু শ্রী সম্বন্ধে অপৌরুষেয় বেদই প্রমাণ এবং ইহাকেই তিনি ত্রিবিধ প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মনে করিতেন।

ভেদই তাঁহার মতের মেরুদণ্ড। এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর ভেদই তৎসম্বন্ধে যাথার্থ্য আনিয়া দেয়। ভেদকে ঔপধিক বলিলেও তাহাকে কোনরূপে মিথ্যা বলা যায় না। ভেদের পারমার্থিক সত্তা

জ্ঞানেতেই নিহিত থাকে; সুতরাং ভেদ মাত্রই নিত্য। জীব বলিলেই তাহার পরাধীনতা, অল্পজ্ঞতা ও অক্ষমতার বা সামর্থ্যাল্পতার জ্ঞান স্বতঃই উদিত হয়। সেইরূপ ঈশ্বর বলিলে, তাহার সর্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্ত্বের জ্ঞান আপনি আসিয়া থাকে। মায়াবাদের দ্বারা এই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্পাদন কোনরূপেই হইতে পারে না। জীবকে ব্রহ্ম বলিলেই তাহাতে মায়া অবিদ্যা বা অজ্ঞানের লেশ কোন দিন ছিল না ও থাকিতে পারে না এইরূপ প্রতীতি হইবে। সুতরাং জীব চিরদিনই জীব। জীবের 'ব্রহ্মাস্মি' বলা ভয়ঙ্কর অপরাধ। বিষ্ণুকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেই তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, এবং সেই বিষ্ণুর সেবা করাই তাহার পরম-পুরুষার্থ।

ভগবদ্বিগ্রহে ভক্তি, স্বাধ্যায়, সংযম, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিত্যানিত্য বিবেক ও ভগবদ্ধ্যান দ্বারা শ্রীহরির দর্শন লাভ হয়। অঙ্গে অঙ্গে বিষ্ণুর নামাঙ্কন, স্ত্রীপুত্রাদির বিষ্ণুজ্ঞাপক নামকরণ করিয়া ভগবৎস্মৃতি জাগরূক রাখিতে তিনি আদেশ করেন এবং কায়মনোবাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চনা করিতে বলেন। সৎপাত্রে দান, বিপন্নের ত্রাণ ও শরণাগতের রক্ষার দ্বারা কায়িক ভজন করিতে হয়। দীনে দয়া, সর্ববাসনা-বিবর্জিত হইয়া ভগবৎ-কার্য করিবার স্পৃহা এবং গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার দ্বারা মানসিক ভজন সিদ্ধ হয়। স্বাধ্যায়, সত্য, হিত ও প্রিয়কথনের দ্বারা বাচিক ভজন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ ভজনের দ্বারা বিষ্ণু প্রীত হইয়া থাকেন। তিনি প্রীত হইলে, জীব অন্তে বিষ্ণুরূপ পরিগ্রহ করিয়া গোলোকপতি সহ বৈকুণ্ঠে নিত্য বিহার করিতে থাকে। এই সারূপ্য ও সালোক্যই প্রকৃত মুক্তি; নির্বাণ বা জীবন্মুক্তি কথার কথা মাত্র।

সংক্ষেপত আচার্য মধ্বের এই মত। এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের সহিত বহু বিচার করিয়াছিলেন, অনেক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন এবং শেষ ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও দশ

উপনিষদের শরণাগত হইয়া প্রত্যেকেরই এক একটি স্বমতানুযায়ী ভাষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

মধ্বাচার্যের মতপোষক কিছু কিছু যুক্তি তন্মতাবলম্বিগণ দিয়া থাকেন। আমরা সেই যুক্তি-পরম্পরার অনুসরণ করিয়া নিম্নে কিছু আলোচনা করিব।

গীতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাণী। তিনি সকল রকম সাধনোপায় বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" আবার "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"। যেহেতু 'বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্' অর্থাৎ আমি অপৌরুষেয় বেদের বেত্তা ও বেদান্তের রচয়িতা, তোমরা না বুঝিয়া বহু মত লইয়া কলহ করিও না। তোমরা আমার শরণাগত হও, আমি তোমাদের মুক্তি দিব। ইহাই আচার্য মধ্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি বেদোপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র লইয়া টানাটানি না করিলেই পারিতেন; কারণ বেদকে কোন জীবই স্পর্শ করিতে পারেন নাই, বিষ্ণু ইহার উদ্ধারকর্তা, পুরাণবিদ্ আচার্যের ইহা নিশ্চয়ই জানা ছিল। আর উপনিষদ্-বেদান্ত সনাতন ঠাকুরের ঝুলি, যে যাহা মনে করিয়া হাত দিবে, সে তাহাই পাইবে,—"দুগ্ধে অস্মৈ বাগ্‌দোহং যো বাচো দোহঃ" (ছা-উ° ১. ৩. ৭)। কামধেনুরূপিণী বাক্, তাঁহাতে যত দোহ বা ক্ষীর আছে, তিনি তাহা তাঁহার সুধী ভক্তগণকে দিয়া থাকেন। ভক্ত শৈবই হউন আর বৈষ্ণবই হউন, তিনি বাক্‌সমূহের মধ্যে প্রার্থিত ক্ষীর লাভ করিয়া কৃতার্থ হন, কিন্তু শেষে তর্জার লড়াই লাগিয়া যায় তাহাদের মধ্যে যাহারা কেবল ভক্তের গেরুয়া বা কম্বলকন্থা বহন করিতে ব্যস্ত।

পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে গোলকপতি ও কৈলাসপতির প্রাধান্য বহু প্রকারে ঘোষিত হইয়াছে। আশুতোষ শিবের অর্চনা করিয়া অসুরগণ অজেয় হইয়া স্বর্গের সিংহাসন কাড়িয়া লইত, আর দেবগণ ভীত ও পরাজিত হইয়া অসুর-নিধনের জন্য শ্রীহরির

শরণাগত হইতেন। বিষ্ণু অবতীর্ণ হইলেও ভোলানাথের ভুল ঘুচিত না। অসুর আর্ত হইয়া শূলপাণিকে ডাকিলেই তিনি নির্লজ্জের মত চক্রপাণির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আসিতেন, বোধ হয় হরির রঙ্গ দেখিবার জন্য। নিষ্পত্তি হইত আসুরিকতার মুক্তিতে, আর উভয়ের আলিঙ্গনে। সবিশেষ হরির সহিত নির্বিশেষ হরের মিলন দেখিয়া আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি; আর জগৎ এদিকে অসুরের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পায়। সেই বিষ্ণুর বিভূতির অন্ত নাই, কিন্তু সকল বিভূতির যে শেষ পরিণাম সেই ভস্মই শিবের বিভূতি কি জীবে ধারণ করিতে পারে? জীবের পক্ষে সগুণ শ্রীনিবাসের শরণাগত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবের শ্রীনিবাস-দর্শনের মূলই যে শিব, ইহা স্মরণ রাখা উচিত, কারণ শিবপ্রসাদে প্রমত্ত অসুরের নিধনের জন্য বিষ্ণু তাঁহার দর্শনীয় পদ দেখাইতে ধরায় অবতীর্ণ হন। তাই হরি শিবনিন্দা সহিতে পারেন না, আবার শিব হরির নিন্দা সহিতে পারেন না। আমরা পুরাণ পড়িয়া এই বুঝিয়াছি যে, শিবের গুরু রাম, আর রামের গুরু শিব। আবার দুইজনের বিবাদবার্তা শুনিয়া মনে হয় যেন স্বামিস্ত্রীর কলহ। শেষ দুইজনে মিলিয়া এক হন, তখন হর বড় কি হরি বড় কিছু বুঝিবার উপায় থাকে না। হরি বড় চতুর, তাঁহার হরের প্রতি টানটি কাহাকেও বুঝিতে দেন না, আর পাগল হরের পাগলামী দেখিতে ভালবাসেন। পাগলকে কতবার কত রকম করিয়া ক্ষেপাইয়াছেন, তাহা পুরাণে বিবৃত আছে। এসব হেঁয়ালী বুঝা ভার। আর্যগণের সবিশেষ ও নির্বিশেষ অথবা সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বরদ্বয়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের অনেক ঈশ্বর আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে দ্বন্দ্ব আরও বাড়িয়াছে, ভক্তিবিশেষও কমিয়াছে। যাহা হউক আচার্য মধ্বের বিষ্ণুর পরিবর্তে যদি ঈশ্বরের অন্য কোন সর্ববাদিসম্মত নামকরণ করা যায় এবং অঙ্গে নামের ছাপা, তিলকাদি দেওয়া রহিত করা যায়, তবে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে কোনও মানবেরই আপত্তি থাকিতে পারে না।

ভগবানের নামে নামকরণ করা খ্রীস্টান, মুসলমানের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে, পূর্বে ব্রাহ্মণ ও তৎসহ অবস্থানকারীদের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল, উহাতে বিশেষ বাধিবে না। কেবল ঈশ্বরের নামকরণ লইয়া একটু ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে।

এখন জল, স্থল ও আকাশে অবাধে গমনাগমনের যেরূপ সুব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে সমস্ত মতাবলম্বীদের একত্র মিলিত হইবার সুযোগ আছে। পূর্বে ইহার কিছুই ছিল না। কত দেশ ছিল, কত মত ছিল, তাহা ভারতের লোকেদের জানিবার কোন উপায় ছিল না। নাম লইয়া পরে যাহাতে কলহ না উঠে, সেই জন্য ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা ঈশ্বরের নাম রাখিয়াছিলেন আত্মা, যিনি সকল দেশের ও সকল জীবের পরিচিত ও অত্যন্ত প্রিয়। পরবর্তী আচার্যেরা সাধারণ মানবের অনুপযোগী ও অস্বাভাবিক ধর্মমত সৃষ্টি করিয়াছেন এই আত্মার তাৎপর্য না বুঝিয়া। বেদব্যাস ঈশ্বরের শব্দ-বাচ্যত্ব বুঝাইতে গিয়া জোর গলায় বলিলেন 'গৌণশ্চেন্না-ত্মশব্দৎ' (১.১.৬) সকল শব্দই গুণবাচক হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই—স্বরূপবাচক আত্মশব্দ হইতেই ইহা বুঝা যায়। আর্য ঋষিরা যুগযুগান্তর ধরিয়া সর্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বরকে খুঁজিয়াছিলেন। কোথাও তাঁহাকে পান নাই। যখন পাইলেন, তখন দেখিলেন তিনি অন্তরে বসিয়া হাসিতেছেন। চিন্তামণিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া যদি কেহ আকাশ-পাতাল, গিরি-গহন খুঁজিয়া বেড়ায়, তবে চিন্তামণি হাসিবেন না? ঋষিরা তাঁহার দর্শন পাইয়া বলিলেন,—"ও ঠাকুর, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের ভ্রমণ-চক্র দেখিতেছ, তোমাকে খুঁজিতে গিয়া তোমার কত অনাদর করিয়াছি, তুমি একটি কথাও কহ নাই। এইবার তোমাকে ধরিয়াছি, তোমার এই আচরণ সকলকে জানাইয়া দিব।" শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ (ঋগ্বেদ, ১০.১৩.১) বলিয়া জগদ্বাসীকে জানাইলেন—এই অমৃত-দেবতা তোমাদেরই মধ্যে বসিয়া আছেন।

জ্ঞানে অজ্ঞানে ইঁহার অনাদর করিলে ইনি কথা কহিবেন না। ইঁহার উপাসনা কর, ইনি তোমাদের আর্থিক ও পারমার্থিক সিদ্ধি দান করিবেন—সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্ম (ছা-উ°-৩.১৪.৪)। আর কি না—"ইতঃ প্রেত্য অভিসংভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসা অস্তি" (ঐ)। অর্থাৎ ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার না করিয়া মরণের পর চলিয়া গিয়া ব্রহ্মলাভ করিয়া অভিসম্পন্ন হইব—এইরূপ যাহাদের বিশ্বাস তাহাদের চিকিৎসা নাই। লোকে বলে এ রোগের আর ঔষধ নাই, সেই কথাই পরম ভক্ত শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছেন।

মধ্বপন্থীরা বলেন, আচার্য শঙ্কর স্বেচ্ছামত আত্মার কখন সংসারী জীব, কখন ব্রহ্ম অর্থ করিয়া জীবব্রহ্মৈকবাদ স্থাপন করিতে গিয়া উপনিষদের ভিন্নার্থ করিয়াছেন। উপনিষদের প্রত্যেক মন্ত্রের শেষে 'য এবং বেদ' বলিয়া যে ফলশ্রুতি আছে, তাহা কাহার জন্য? আত্মাকে হারাইয়া যাহারা মরে, আত্মাকে পাইয়া যাহারা বাঁচে, তাহারাই জীব, তাহাদের জন্যই এই ফলশ্রুতি। জীবাত্মা আর 'সোনার পাথর বাটি' এক কথা। আত্মা নিত্য, সত্য, সনাতন, আর জীব মর্ত্য। আত্মা শব্দের অর্থ লইয়া বোধ হয় পূর্বে-পূর্বে বহু মতভেদ ছিল এবং শঙ্করের সময়ে আত্মা 'সোনার পাথর বাটিতে' পরিণত হইয়াছিলেন। পরবর্তী যুগে এই গোল মিটাইবার জন্য পরমাত্মা কল্পিত হইয়াছিলেন এবং জীবের বহুকালের আত্মত্বের দাবি মানিয়া তাহাকে পরমাত্মার অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এই ব্রহ্মাংশবাদটুকু বাদ দিলে রামানুজ-প্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের সহিত মধ্বমতের আর কোন বিরোধ থাকে না। আত্মা কি জড়বদ্ বিস্তৃত পদার্থ যাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া অংশ বা অণুতে পরিণত করা যায়? আত্মার বহির্লিঙ্গ যে প্রাণ তাহার সমত্ব বুঝাইতে গিয়া উপনিষৎকার বলিয়াছেন,—একটি জীবাণুর, একটি পিপীলিকার,

আর একটি হস্তীর প্রাণ সমান। প্রাণী ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার প্রাণ ক্ষুদ্র নহে। সুতরাং আত্মার অংশত্বজ্ঞান জড়বুদ্ধির পরিচায়ক। আত্মার অকাৎর্স্ন্যও তদ্রূপ যুক্তিবিরুদ্ধ। আত্মার উপমার নিমিত্ত বলা হইয়াছে "অসকৃদ্বিদ্যুত্তং সকৃৎবিদ্যুৎ" (বৃহ-উ° ৩. ৩৬), "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।" (কঠ-উ ২. ১০)। পুনঃপুনঃ দীপ্তিশীল বিদ্যুৎ যেমন বহু নহে এক। একই অগ্নি যেমন পৃথিবীতে বহুরূপে প্রকাশিত হন, সেইরূপ একই আত্মা বহু জীবের মধ্যে বহুরূপে প্রতিভাত হন। এই আত্মাই বিষ্ণুর পরম পদ। কঠোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে,—'বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোর্পরমং পদম্ (৩.৯)।" বহু পুণ্য করিলে তবে—আত্মাকে লাভ করিয়া মানুষ হওয়া যায় এবং তদপেক্ষা বহু তপস্যা করিলে এই আত্মাকে বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া জানা যায়। তখন পাওয়া সার্থক হয়। কারণ, যে বস্তুকে না জানিল, তাহার বস্তু পাওয়া না-পাওয়া সমান। বানরে মুক্তামালার মহত্ত্ব কি বোঝে? সুতরাং সাধারণ লোকে ভগবদ্‌বিগ্রহ লইয়া মধ্বাচার্য-নির্দিষ্ট কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভজন করিলে ভগবৎ-কৃপালাভ করে এবং তাঁহার কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ হয়। তিনি আসিয়া অন্তরে বিষ্ণুতত্ত্বের উদ্বোধন করেন। তাই বলিয়া কেহ যেন ভগবদ্‌বিগ্রহকে কল্পিত মনে না করেন। আত্মনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে বিষ্ণুতত্ত্ব এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিগ্রহ সত্য, কল্পিত নহে। শব্দ যেমন অর্থকে জ্ঞাপন করে দেবমূর্তিও সেইরূপ দেবতত্ত্বকে জানাইয়া দেয়। জ্ঞানগম্য বিষয়কে বর্ণাক্ষর সমন্বয়ের দ্বারা যেমন জানানো যায়, মূর্তি দিয়াও সেইরূপ জানানো যায়। ভগবানের হস্তপদাদিকে মানুষের ন্যায় মনে করিলে তত্ত্বের উদ্ভব হয় না। সর্বেন্দ্রিয়-গুণাভাস সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত অচল সনাতন সাক্ষিস্বরূপ ভগবানের বড় বড় করতালের মতো চক্ষুবিশিষ্ট অন্য

ইন্দ্রিয়ের সামান্য চিহ্নযুক্ত পদবিহীন জগন্নাথের মূর্তিতে দেখানো হইয়াছে। রূপের সহিত তত্ত্বের পরিচয় গুরু করিয়া দেন। অঙ্গে অঙ্গে ধ্যান করিয়া তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিতে হয়, মনুষ্যবৎ অঙ্গের চিন্তার দ্বারা কোন তত্ত্বই উদ্বোধিত হয় না। সম্প্রদায়গুরুদের কৃপায় এসব পদ্ধতি বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। ভগবানের হস্তপদাদির ও আয়ুধাদির কল্পনা কি ভাবে হইয়াছে বেদে স্থানে স্থানে তাহা বিবৃত আছে।

আচার্য মধ্ব যদি বিষ্ণুকে আত্মা অতিরিক্ত কিছু বুঝিয়া থাকেন এবং তাঁহার বিগ্রহকে চিন্ময় না ভাবিয়া মনুষ্যশরীরবদ্ বুঝিয়া থাকেন তবে ঐ মতের প্রতিপক্ষে ব্রহ্মসূত্রে কি আছে তাহা মধ্বমতাবলম্বিগণের অনুবর্তন করিয়া এইরূপে দেখানো যাইতে পারে—

'করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ' (বেদান্তসূত্র ২.২.৪০) ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়াদি করণবিশিষ্ট মনে করিলে তাঁহাতে মনুষ্যবদ্ ভোগাদির সম্ভাবনা-জনিত দোষ আসে; এবং 'অন্তবত্ত্বমসর্বজ্ঞতা বা' (ঐ, ২.২.৪১) মূর্তির বিনাশ ও মূর্ত মানবের ন্যায় অসর্বজ্ঞতা দোষের আশঙ্কা হয়। আর কি? 'নচ কর্তুঃ করণম্' (ঐ, ২.২.৪৩) এইরূপ মনুষ্যবৎ কর্তা 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ' (মুণ্ডক উ°-১.১.৭) ঊর্ণনাভির ন্যায় নিজের সৃষ্টির করণ হইতে পারে না।

জীবব্রহ্মভেদ-পক্ষে ব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন,—

'পৃথগুপদেশাৎ' (২.৩.২৮)—স্বমহিমা উপদেশের নিমিত্ত জীবকে পৃথক্ করিয়া সৃষ্টি করা হয় আর—'তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ' (২.৩.২৯)। আত্মরূপী ভগবানের সারগুণ জ্ঞাতৃত্ব জীবকে প্রদান করায় তাহাকে প্রাজ্ঞবদ্ বিবেচনা করা হয়। জ্ঞাতৃত্ব আছে কিন্তু সৃষ্টি-কর্তৃত্ব নাই।

এইবার বিষ্ণুর সাধনা কিরূপে হয় তৎসম্বন্ধে ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

"স যদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষাঃ (৩.১৭.১)।" সেই পুরুষ (ভক্ত) যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াও তাহার ভোজনেচ্ছা ও পানেচ্ছা নিবারণ করেন না, কোন বস্তুতে তৃপ্তিবোধ করেন না, তখনই এই আত্ম-(বিষ্ণু) মন্ত্রের দীক্ষা হয়। "অথ যদশ্নতি যৎ পিবতি যদ্রমতে তদুপসদৈরেতি (৩.১৭.২)।"— দীক্ষা হইলে তিনি পানভোজন রমণ সকলই করেন, কিন্তু রাক্ষসের মতো নহে, ব্রত নিয়মসহ চলিতে থাকেন।

"অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি।" —(৩.১৭.৩)। আত্মধ্যান নিমগ্ন হইয়া যখন তিনি হাস্য করেন, ভোজন করেন, মিথুনীভূত হইয়া ক্রীড়া করেন, তখন যেন তিনি বেদমন্ত্রের দ্বারা স্তুত হইয়া চলিতে থাকেন।

"অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।"—(৩.১৭.৪) অনন্তর তিনি যে তপদান সরলতা অহিংসা সত্যকথনাদির আচরণ করেন, ইহাতে আত্মার (গুরুর) দক্ষিণা দেওয়া হয়। ভক্ত মহীদাসের জীবনকে ত্রিবিধ সবনে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সেইরূপ ভক্তের জীবনের আচরণ সংক্ষেপেত বলাও হইয়াছে এবং 'অস্য' পদের দ্বারা আত্মা মন্ত্র ও গুরুর অভিন্নতা প্রদর্শিত হইল। এই জন্যই বৈষ্ণবেরা বলেন 'গুরুকে মানুষ ভজে সে পাপী নরকে মজে'। ইহার পর মন্ত্রে ভক্ত দেহান্তে যজ্ঞান্তে অবভৃত স্নানকারী যাজ্ঞিকের ন্যায় বিষ্ণুরূপী হইয়া উত্থিত হন তাহা বলা হইয়াছে।

আদিত্যই বৈকুণ্ঠের দ্বার-স্বরূপ। যে লোকে সর্ববিধ কুণ্ঠা-বিবর্জিত হইয়া বিচরণ করা যায় ভক্ত দেহান্তে সেই লোক কিরূপে পাইয়া থাকেন তাহা আর্ষ ঈশোপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত হইল:— "অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাৎ অন্যদেবাহুরসম্ভবাৎ। ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নাস্তিক্ষিরে (ঈশা-১৩)।" জন্মালেই লোকে বলে ঐ একজন হয়েছে, মরিলে বলে ঐ একজন মরিল। এই দেখ আমি জন্মিয়াছি

কেহ বলে না, এই দেখ আমি মরিয়াছি ইহাও কেহ বলিতে পারে না। জন্মিয়া উৎপত্তির জ্ঞান ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু মরিয়া মরণের জ্ঞান কি কাহারও হয়? কাহারও যে কাহারও হয় বিচক্ষণ ধীরগণের নিকট তাহা আমরা শুনিয়াছি। কি শুনিয়াছি? "সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামমৃতমশ্নুতে (ঐ, ১৪)।" জন্ম ও মৃত্যু দুই যে এক সঙ্গে জানে সেই মরণের পর অমৃতকে ভোগ করে। সে আবার কি কথা? যে জানে সে কিরূপে পায় তাহাই শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছে —"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ তত্ত্বং পূষন্নপাবৃনু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে। পূষন্ একর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্যব্যূহরশ্মীন্ সমূহ, তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি। বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং। ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর কৃতং স্মর। অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্, যুযোধি অস্মদ্ জুহুরানমেনো ভূয়িষ্ঠা—তে নম-উক্তিং বিধেম॥"—(ঐ, ১৫.১৮)। হিরণ্ময় অর্থাৎ লোভনীয় পদার্থের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে, হে পোষণকারী—সত্যধর্ম প্রদর্শনের জন্য তাহা অপসৃত কর। হে পূষা, একগতি, সংযমনকারী, প্রসবকারী—প্রজাসৃষ্টির উপাদানভূত রশ্মিসকলকে সম্যক্ বহন কর। তোমার তেজেতে যে কল্যাণতম রূপ দেখিতেছি ঐ ঐ পুরুষ আমি হইতে চাই—প্রাণবায়ু আর চলিতেছে না, শরীর পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, এখনও ইহা মৃত হয় নাই। ওহে ক্রতু পুরুষ কামকৃত কার্য শরণ কর, ওহে কর্মা— স্মরণ কর, তুমি কি কি করিয়াছ একবার স্মরণ কর। পাপকারী আর স্মরণ করিবে কি? তাহার পাপিষ্ঠতর দেহ আজ ভস্মান্ত হইয়াছে। আছে পূত ভক্তের আত্মা অগ্নি জ্যোতিরূপে বর্তমান। তাঁহাকে ভক্ত বলেন,—হে অগ্নি, তুমি বিশ্ববিতানে অভিজ্ঞ, হে দেব আমাদের ভগবদ্বিভূতি বা ঐশর্যলাভের জন্য শোভন পথ

দিয়া লইয়া চল। ঐ কুটিল কুণ্ডলীকৃত রশ্মি আমাদের নিমিত্ত সংযোজনা কর, তোমার বহু নমস্কার বিধান বা ব্যবস্থা করিব।

যিনি প্রাণ মন দিয়া ভগবদর্চনা করিয়া থাকেন, তিনি এই ব্যাখ্যা সরল ও সমীচীন কি না বিচার করিয়া দেখিবেন। মাধ্বগণ যুক্তিপরম্পরায় এই সকল উক্তিই সমর্থন করিয়া থাকেন।

মধ্বাচার্য ভগবান্‌কে বিষ্ণু বলিয়াছেন এবং তিনি সবিশেষ অর্থাৎ অশেষ গুণের আকর এবং সর্বদা স্ব-শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর দ্বারা সেবিত। উপনিষদ্ আদিত্যমণ্ডলস্থ বিষ্ণু এবং মানবাধিষ্ঠিত বা পুরুষান্তর্গত আত্মাকে এক বলিয়াছেন, এবং এই আত্মাকে সকল বা সর্বকলাযুক্ত কখনও বা অকল বা কলারহিত বলিয়াছেন। শ্রীহরিকে সগুণ কি অগুণ বলা হইবে তাহা দেখা যাউক।

পরিদৃশ্যমান জগতের সকল পদার্থ বিবিধ গুণদ্বারা মণ্ডিত। গুণাগুণভেদের পরিচয় দ্বারা বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। যিনি এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, বিশ্ব যাহার অনুভূতি, তিনি সকল গুণের জ্ঞাতা, তাঁহাতে কোন গুণ থাকিতে পারে না। তিনি বিষয়ী, তিনি বিষয় নহেন। গুণমণ্ডিত বস্তুর গুণ তাঁহারই কল্পনা। যে শক্তিবলে পরমেশ্বর এই কল্পনা করেন তাহাকে কেহ মায়া, কেহ প্রকৃতি আখ্যা দেন, এই প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে। ঈশ্বর গুণকে সৃষ্টি করেন, এবং গুণের দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু জগৎ যেমন গুণের বাধ্য, তিনি গুণের বাধ্য নহেন। তবে সকল গুণের তিনি উৎস। যেখানে গুণ তাঁহার বাধ্য, অথচ গুণের তিনি বাধ্য নহেন, সেখানে তাঁহাকে গুণাতীত বলা যাইতে পারে। আমাদের আত্মা সকলই অনুভব করে, সেই জন্য আমরা সকলই জানিতে পারি। আমরা তাহা হইতে বিচ্যুত হইলে জড় হইয়া যাই। তাঁহার স্পর্শজন্য আমাদের জ্ঞাতৃত্ব। আমরা আত্মাকে জাগতিক পদার্থের ন্যায় গুণমণ্ডিত বলিতে পারি না। আত্মাই দেখে, আত্মা দৃষ্ট হয় না। আত্মাই করে, আত্মা

কৃত হয় না, আত্মাই চালায়, আত্মা চালিত হয় না। সুতরাং যাহা দেখা যায়, করা যায়, পরিচালিত হয়, আত্মা সেই সকলের অতীত, সুতরাং বিশ্বসংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা আত্মার সদৃশ বা তুলনার যোগ্য হইতে পারে, সুতরাং আত্মাকে বুঝিতে গিয়া "নেতি নেতি" করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। বাস্তবিক আত্মা ইহাও নহে, উহাও নহে, তাই বলিয়া, আত্মা যে কিছু নহে, তাহা নহে, আত্মা যাহা, আত্মা তাহাই, আর কিছু নহে ; নিত্য শুদ্ধ—অতি নির্মল, অথচ সকলেরই উদ্ভবকর্তা, সকলেরই পরিচালক ও দ্রষ্টা। সুতরাং এই আত্মাকে আমরা ঈশ্বর বলিতে বাধ্য।

সংসার দুঃখের মূল, সংসার হইতে অব্যাহতি পাইলে, দুঃখের হাত এড়ানো যায়। সংসারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, সংসার হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সংসারের সহিত সম্বন্ধের সূত্র মন। এই সূত্র বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে, সংসারের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না। আমার সংসারের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, সংসার থাকা আর না থাকা আমার কাছে সমান।

এখন কথা এই যে, সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন করা যায় কি না। যদি বিচ্ছিন্ন করা না যায়, যদি বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সংসার মিথ্যা এমন কথা বলা চলে না। সংসার স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে। আমি যদি মন লয় করিতে পারি তবে আমার পক্ষে সংসার রহিত হয়। যোগিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব সংসার মনের সংস্কারসম্ভূত। সংসার আছে, কিন্তু সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য এমনও হইতে পারে না। যদি সংসার স্বতন্ত্রভাবে থাকে, এবং সংসারের সহিত সম্বন্ধ কোন কারণে হয়, তাহা হইলে, দুঃখের কারণ হয়। সংসারের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে পারিলে দুঃখ ঘুচিয়া যায়। সংসার যদি মনের সংস্কার-সম্ভূত হয়, তাহা হইলে সে সংস্কারকে বদলাইতে পারিলে, দুঃখ আর থাকে না। কিন্তু সংসার যদি সত্য সত্যই

থাকে এবং সংসারের সহিত সম্বন্ধ এড়ানো অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সংসার মুক্তি হইতে পারে না, সে অবস্থায় সংসারকে সুখের করিবার চেষ্টা করাই পরমার্থ সিদ্ধির হেতু।

সংসার ও জীব আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আছে, এই মতকে দ্বৈতবাদ বলিতে হয়; জীব আত্মা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না, আত্মারই অংশরূপে আছে, এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়; আত্মাই আছে, সংসার বা জীব বস্তুত নাই। সংসার প্রতীয়মান এবং মায়া, জীব অবিদ্যা-উপহিত কল্পনা মাত্র এইরূপ মতই অদ্বৈতবাদ।

সংসার যদি আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইত তাহা হইলে সংসারের অস্তিত্ব বোধগম্য হইতে পারিত না। সংসার আত্মার কল্পনা, আমি আত্মায় অবস্থিত আছি, সেইজন্য সংসারের অস্তিত্ব আমার বোধগম্য হইতেছে। আমি সেই আত্মার প্রভায় আলোকিত অণুবিশেষ। সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈতমতই সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়।

মুক্তি সম্বন্ধে মাধ্বগণ বলিয়া থাকেন,—

ত্যাগ, ভক্তি, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানা মুক্তির একমাত্র উপায়। ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে জানিতে হয়। আমার ঈশ্বরকে অভিজ্ঞান কি হস্তপদাদিরূপে হইবে না আত্মরূপে হইবে?

স্থূল সূক্ষ্ম সকল বস্তুকে ঠিকভাবে জানিতে হইবে—অনুসন্ধান দ্বারা। অবহিতচিত্তে চিন্তা করিয়া বস্তুর বহিরন্তর অবগত হইবার চেষ্টাই ধ্যান।

চিন্তা, ধ্যান এবং ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকিলে শুধু সাধনার দ্বারা তাহা হয় না। অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

শ্রুতি বলেন, "যখন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়, তখন হৃদয়গ্রন্থি

ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, সকল সংশয় বিদূরিত হয়, এবং কর্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।" কুম্ভকার যেমন কুম্ভের চাক ঘুরাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিলেও চাকটি ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধের অবশেষ যতকাল থাকে ততকালই অপরোক্ষিত জীবকে শরীর ধারণ করিতে হয়। "প্রারব্ধের অবসান হইয়া গেলে জীব একেবারে বিমুক্ত হয়, আর তাহাকে সংসারে ফিরিতে হয় না।" এইটি ব্রহ্মসূত্রের শেষ সূত্র।

ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তী মুক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। মুক্তি বলিতে কি বুঝায়? ন্যায়-মতে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি-লাভই মুক্তি। অদ্বৈতমতে ব্রহ্ম নির্গুণ, জীব মায়োপাধিরহিত হইলে তাহার নির্গুণত্ব প্রকাশ পায়। সুতরাং সে অবস্থায় জীবের ইচ্ছা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বা সুখ-দুঃখ-ভোগ কিছুই থাকে না। বৈষ্ণব দার্শনিক-দিকের মত এই যে, জীবগণ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে সম্পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের সহিত একত্র আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। বৈষ্ণব দার্শনিকেরা জীবাত্মার একত্ব স্বীকার না করিয়া বহুত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে সকল জীব একরূপও নয়, এক এক জীবের এক এক প্রকৃতি। জীবের প্রকৃতিতে অজ্ঞানহেতু যে কলুষ আছে, তাহা নাশ হইলে জীব বিশুদ্ধ হয়; বিশুদ্ধ জীব পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার যোগ্য হয়। ঈশ্বর দর্শন দিলে জীবের আর দুঃখ থাকে না। তখন ঈশ্বরের সঙ্গলাভ করিয়া জীব অপার আনন্দে থাকে।

দ্বৈতবাদীর মতে ভক্ত জীবের বিনাশ হইতে পারে না। সকল জীবের বিনাশ হয়, এই মত, তাঁহাদের মতে ভ্রমাত্মক। মুক্ত জীবের যে সুখদুঃখের জ্ঞান থাকে না, তাঁহারা এই মতের বিরোধী। তাঁহারা বলেন সুখদুঃখের জ্ঞান না থাকিলে জীবের অবস্থা জড়ের অবস্থার ন্যায় হইয়া যায়। জীব ও জড়ে তাহা হইলে প্রভেদ কি? স্ফটিক যতই উজ্জ্বল হউক না কেন, তাহা খনিজ পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি মুক্ত জীব ব্রহ্মে মিশিয়া গিয়া ব্রহ্মের সহিত

এক হইয়া যায়, তাহা হইলে সমুজ্জ্বল স্ফটিকেরই সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে, দ্বৈতবাদী এইরূপ অবস্থা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতে মুক্তি দুঃখাদির অবসান নহে, তাঁহাদের মতে মুক্তি জ্ঞানপূর্বক উপভোগের উপযোগী আনন্দ। মুক্তাত্মার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি আনন্দময় ঈশ্বরের সঙ্গলাভ তাহার শাশ্বত আনন্দের উপভোগের সহায়তা করে।

জীব মুক্ত হইলে ঈশ্বরের সহিত এক বা সমান হয় না; অন্যান্য মুক্ত জীবের সহিত এক বা সমান হয় না। জীব ঈশ্বরের সহিত এক বা সমান পূর্বেও ছিল না, পরেও হইতে পারে না। ঈশ্বর হইতে জীব বিভিন্ন। সকল জীবই পরস্পর বিভিন্ন; এক জীব আর এক জীবের সহিত সমান বা এক হইতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রের মতে ব্রহ্মের সহিত জীবের যখন যোগ হয়, তখন যে ব্রহ্মের সহিত জীবের কিছুমাত্র ভেদ থাকে না, এমন নহে। ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সহিত জীবের যোগ হইলেও কতিপয় বিষয়ে ব্রহ্মের সহিত জীবের পার্থক্য আছে। মুক্তাত্মারা ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদের যোগ বুঝিতে পারেন কিন্তু ব্রহ্মের সকল শক্তি ও সকল ভাব প্রাপ্ত হন না, এবং ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া একও হইয়া যান না।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখ অতিক্রম করা। মানব-জীবন কি দুঃখময়, কি সুখময়, কি সুখদুঃখময়?

মানব সকল সময় এক অবস্থায় থাকে না। মানবের অবস্থার পরিবর্তন প্রতিনিয়তই হইতেছে। পরিবর্তনশীল অবস্থা-পরম্পরার দ্রষ্টা আত্মা। আত্মা নির্বিকার এবং নির্বিশেষ। আত্মা নিত্য চৈতন্যময় এবং জ্ঞাতা। অবস্থা-পরম্পরা দেহের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাতেই দেহাভিমানী জীবের সুখদুঃখ ভোগ হয়। অবস্থা-পরম্পরা প্রকৃতির গুণসম্ভূত এবং গুণময়; আত্মা গুণাতীত সুতরাং পরস্পরের আকাশ-পাতাল ভেদ। কিন্তু তথাপি যখন

আত্মাকে অবস্থার বশবর্তী মনে হয়, তখন এই দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধসূত্র মানিয়া লইতে হয়। শঙ্করাচার্যের মতে বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ঐরূপ প্রভেদ, সুতরাং বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, তথাপি যে সম্বন্ধ বোধ হয় তাহা ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। বিষয় ও বিষয়ী বলিয়া কিছুই নাই, আছে কেবল এক আত্মা। আত্মা বিষয় কল্পনা করিয়া বিষয়ী হন। যিনি বিষয়ী হইয়াও আত্মজ্ঞানবশত বিষয়াতীত তিনি ঈশ্বর। যিনি অজ্ঞান-বশত বিষয় ভোগ করেন তিনি জীব।

আত্মা চৈতন্যময় এবং জ্ঞানময়। যদি আত্মা জ্ঞানময় হয়, তাহা হইলে আত্মার জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই। যদি আত্মার জ্ঞানের বিষয় না থাকে তাহা হইলে আত্মা জ্ঞাতা বলিয়া কিরূপে পরিচয় দিবেন? আত্মা জ্ঞাতা না হইলে, তাহাকে জ্ঞানময় ও চৈতন্যময়ও বলিয়া জানা যায় না।

যাহা জ্ঞানময় বা চৈতন্যময় নহে, তাহা কি? আমরা যাহাকে জ্ঞান ও চৈতন্যবিরহিত মনে করি, তাহাকে জড় বলিয়া থাকি। এখন জিজ্ঞাসা, জড় বলিয়া বস্তুত কিছু আছে কিনা; আমরা বলিতে পারি, যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় তাহাকেই আমরা জড় বলিয়া থাকি।

আত্মা জ্ঞাতা, সুতরাং আত্মার জ্ঞানের বিষয় আছে। জ্ঞাতা হইলেই জানিতে হইবে। কি জানিতে হইবে? যাহা কিছু সব জানিতে হইবে। আত্মার স্বভাবই কিছু না কিছু জানা। যাহা জানা যায়, আমরা তাহার বস্তুগত পৃথক্ সত্তা অনুমান করি। আমাদের এই অনুমান যথার্থ হইতে পারে না। আত্মা যদি জ্ঞাতা হয়, তাহা হইলে আত্মার যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা আত্মার অংশ, কারণ আত্মা হইতে পৃথক্ কিছুই ছিল না, সুতরাং পৃথক্ নূতন কিছুই হইতে পারে না। আমরা জগৎকে পৃথক্ বলিয়া অনুমান ও অনুভব করি বটে, কিন্তু বস্তুত তাহা আত্মা হইতে পৃথক নহে,

তাহা আত্মারই অংশ। যদি তাহা অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ আত্মাকে জ্ঞাতা বলা যাইতে পারে না। তিনি যাহা যাহা জানিবার ইচ্ছা করিয়াছেন তাহার উপযোগী করণ নিজের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন ইহা উপনিষদে কথিত আছে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মার জ্ঞানের বিষয়, সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। আত্মারই জ্ঞানের বিষয়রূপে—সুতরাং আত্মারই অংশরূপে পরিদৃশ্যমান জগতের আত্মার সহিত নিত্য সম্বন্ধ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের কোন অংশ আত্মার জ্ঞানের বাহিরে থাকা সম্ভব নহে; তাহা হইলে আত্মারই জ্ঞানের অভ্যন্তরে সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ বিদ্যমান, এবং তিনি জগতের সকল অংশ যুগপৎ জানিতেছেন। আত্মা জগৎকে আংশিকভাবে কখনই জানিতে পারে না। আমরা জীবজগতের সকল অংশ যুগপৎ জানিতে পারি না, এবং যুগপৎ জানাও সম্ভব মনে করি না; সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, আমার আত্মার এমন এক অবস্থা আছে যাহা সমগ্র জগৎকে যুগপৎ জানিতেছে। তদবস্থ আত্মাকেই পরমাত্মা বলা হয়, এবং তিনিই বিষ্ণু। তিনি কল্পিত জাগতিক পদার্থের গুণবিশিষ্ট না হইলেও চিদ্‌ঘন ও পূর্ণানন্দস্বরূপ।

শক্তি-তত্ত্ব

আমাদের বঙ্গদেশে যে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে, তাহা প্রধানত বৃহন্নন্দীকেশ্বর, কালিকা ও দেবী এই তিনখানি উপপুরাণ-প্রোক্ত ক্রম, পদ্ধতি বা ধারা অনুসরণ করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'র ক্রমও অনুসৃত হয়। সকল পদ্ধতিতেই দেখা যায়, দেবী "কৈলাসবাসিনী শিব-শক্তি ভবানী বা মহেশ্বরী অথবা মেনকানন্দিনী উমা হৈমবতী"। সাধারণত এই সকল বা এইরূপ কথা আমরাও বলিয়া থাকি। বেশ ভাল করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, এই সকল পদ্ধতির মূলে যাহা তাহা 'শক্তি-তত্ত্ব'। শক্তি কি তাহাই আমাদের বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শক্তি বলিলে কোন দেবের প্রভাব বোঝায়—বিশেষত বিষ্ণু বা শিবের। এই শক্তি তাঁহার অর্ধাঙ্গ, এই শক্তিই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি। কয়েকখানি তন্ত্রে সাধারণের বিশেষ পরিচিত শক্তি—পার্বতী, ভবানী বা দুর্গার অনেক কথাই আলোচিত হইয়াছে। শাক্তেরা বেশীর ভাগ তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

শাক্ত-ধর্ম সনাতন হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ শাখা। আমরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলি, অতি প্রাচীনকালে এ দেশে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু নাম কেমন করিয়া আসিল, তাহা এক ঐতিহাসিক সমস্যা, সে সমস্যা পূরণের বরাত পণ্ডিতদের উপর রহিল। যে ভাষা হইতেই হিন্দু নাম আসুক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। বৈদিক ধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভারতবর্ষের আদি ধর্ম হউক বা অন্য স্থান হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া থাকুক, অতীব প্রাচীনকালে এই ধর্ম ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সনাতন হিন্দুধর্ম এই বৈদিক ধর্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে আদিম জাতিদিগের মধ্যে তাহাদের নিজস্ব ধর্ম প্রচলিত ছিল। অনেকের

অনুমান এই ধর্ম ভারতবর্ষের আদিম ধর্ম। অনেকের অনুমান বৈদিক-ধর্ম এবং আর্যজাতীয় মনুষ্যেরা এক সময় ভারতের বহির্ভাগ হইতে এ-দেশে উপনীত হইয়া এ-দেশের আদিম অধিবাসীদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম আর্য ও আদিম জাতির মিশ্রিত ধর্ম। সে কথা যাক। তবে খাঁটি বৈদিকধর্মের একটা বৈশিষ্ট্য ধরিয়া হিন্দুধর্ম হইতে খাঁটি বৈদিক ধর্মকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। আমরা এখন হিন্দুধর্মকে যে আকারে পাই, তাহা অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র ভারতে সুবিস্তৃত। শক্তি-উপাসনা ইহার একটি শাখা। হিন্দুধর্মের যতগুলি শাখা-প্রশাখা আছে, তাহাদিগের মূলানুসন্ধান করিলে প্রাচীন বেদে তাহাদিগের বীজের সন্ধান পাওয়া যায়। সকল হিন্দুর পক্ষেই বেদ অতি পবিত্র জিনিস। বেদের দোহাই না দিয়া হিন্দুর কোন শাস্ত্রকেই রক্ষা করা যায় না। কিন্তু প্রচলিত হিন্দুধর্মে এমন অনেক অংশ আছে,যাহা বেদবহির্ভূত। শক্তি-উপাসনার বীজ বেদে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রচলিত শাক্তমতে বেদ-বহির্ভূত অনেক ধর্মমত মিশাইয়া আছে। কোন কিছু উৎপন্ন হইতে গেলে, বহু স্থান হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া উৎপন্ন হয়। বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজভূত অবস্থা স্থূলদৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। বস্তু যখন বৃহদাকার ধারণ করে, তখনি তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রচলিত হিন্দুধর্ম অব্যক্তাকারে কি ছিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। এখন ইহা প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া বহু সংখ্যক শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই বৃক্ষের বীজ বেদরূপ বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাকে তৎকালে প্রচলিত আর্যধর্ম-বহির্ভূত আদিম-জাতির ধর্ম হইতেও যে না উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে হইয়াছে, তাহা নয়। পরে বৌদ্ধদিগের নিকট হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইহা বিপুলকায় ও বহু অবয়বসম্পন্ন হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিন্দুধর্মের পরিপুষ্টির জন্য যতকাল যে ধর্মভাবের অস্তিত্বের প্রয়োজন হইয়াছে, ততকাল সেই ধর্মভাব ভারত

হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই। দেখা যায়, যতকাল হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কলেবর পরিপুষ্টির জন্য বৌদ্ধধর্ম হইতে উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে, ততকাল বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

সকলেই অনুমান করেন, ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্বেদে স্ত্রীদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল না। শক্তি উপাসকেরা শিব-পত্নীরূপিণী দেবী, দুর্গা এবং কালী প্রভৃতির উপাসক ; সুতরাং শক্তি-উপাসনা স্ত্রীদেবতার উপাসনা। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, ঋগ্বেদে প্রচলিত শাস্ত্রমতের উদ্দেশ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিষ্ণুর ও রুদ্রের নাম ঋগ্বেদেও আছে। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রই ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা ছিলেন, বিষ্ণু ও রুদ্রের বিশেষ প্রাধান্য ছিল না। ঋগ্বেদের রুদ্র পরবর্তী কালে যখন শিবাকারে পূজিত হন, তখন তাঁহার বিশেষ প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। ইন্দ্র ও ব্রহ্মার সবিশেষ প্রাধান্য থাকিলেও পূজিতা দেবীরূপে ইন্দ্রাণী ও ব্রহ্মাণীর কখনও প্রাধান্য হয় নাই। ইহার কারণ কি ? পরবর্তী উত্তরকালে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার পূজাই শিথিল হইয়া পড়িল কেন ? ইহার এক কারণ এ-দেশের আদিম জাতিদের সংঘর্ষ। শিব ব্রাত্যদিগের দেবতা, তিনি ভূতপ্রেত নাচাইয়া শ্মশানে মশানে ফিরিতেন। আর্যজাতি যখন ব্রাত্যদিগের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে থাকিলেন, তখন তাঁহারা ব্রাত্যদিগের শিবের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের বৈদিক দেব রুদ্রের সহিত শিবের সাদৃশ্যবশত তাঁহারা তাঁহাদের রুদ্রকে শিবে পরিণত করিলেন। সুতরাং বৈদিক যুগের শেষাশেষি শিবমূর্তি বৈদিক রুদ্র, ইন্দ্র ও ব্রহ্মাকে অতিক্রম করিলেন। ব্রাত্যদিগের শিব আর্য সংস্পর্শে আসিয়া সভ্য হইলেন ও আর্যসুলভ গুণগ্রামে বিভূষিত হইলেন। ফলে ক্রমশ শৈব-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। মানব-মন জগৎ-সম্বন্ধে যত প্রকার ধারণায় উপনীত হইতে পারে, শৈব-মতে তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। যে অনির্বচনীয় ও অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা সমগ্র বিশ্ব নিয়মিত, তাহা শৈব-শক্তি। সেই শক্তিতে

এক দিকে যেমন সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়, তেমনিই আর এক দিকে সেই শক্তি বিনাশক্ষম। সৃষ্টি এবং বিনাশ দুই পৃথক ব্যাপার নহে। কার্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ, তেমনি সৃষ্টির সহিত বিনাশের ও বিনাশের সহিত সৃষ্টির সম্বন্ধ।

যে কারণ হইতে জীবের জন্ম হয়, তাহাই সৃষ্টির প্রবর্তক। তাহা জীব-জগতে চিরকাল আছে, তাহার আরম্ভও নাই, শেষও নাই। আসঙ্গলিপ্সার ফলে জীবের জন্ম হয়, কিন্তু জীবের পরিপোষণের জন্যও প্রকৃতিতে বিস্ময়জনক বিধানের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, অতি নিকৃষ্ট জীবকেও তাহার সন্তান পরিপালনের জন্য যত্ন করিতেও কৌশল অবলম্বন করিতে দেখা যায়। নিকৃষ্ট জীবকে স্নেহ-মমতা কে শিখাইল? কৌশল কে শিখাইল? স্নেহ-মমতা যেন প্রকৃতিরই কৌশল—জীবের পরিপালন ও রক্ষার জন্য অদ্ভুত কৌশল। যে শক্তি সৃষ্টি করেন, সেই শক্তিই বিনাশ করেন, সেই শক্তি স্নেহে সৃষ্টি করিয়া ক্রোধে বিনাশ করে না। তাহার স্নেহও নাই, ক্রোধও নাই। জ্ঞানী ব্যক্তি ধ্বংসের মূর্তি দেখিয়া শিহরিয়া ওঠেন না। ধ্বংস সৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা জগতে সৃষ্টিও দেখেন না, বিনাশও দেখেন না। সৃষ্টি ও বিনাশ গতিশীল জগতের গতির সহায়তা করে মাত্র। ইহারা জাগতিক গতিকে রক্ষা করে। ডিম্বের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ডিম্বের নাশে পক্ষীর জন্ম হয়। তেমনি ভ্রূণের বিনাশে শিশুর জন্ম হয়, আবার শৈশবের নাশে মানবত্ব। জগতে একটির নাশ আর একটির উদ্ভবের কারণ। তত্ত্বদর্শীরা বলেন, মৃত্যু একটি পরিবর্তনমাত্র। জগৎ পরিবর্তনশীল, জগৎ বিনাশশীল নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক চিন্ময়ী শক্তির লীলা। বিশ্বের গতি ও উন্নতিবিধানের জন্য জন্মের যে রূপ আবশ্যকতা, মৃত্যুরও সেইরূপ আবশ্যকতা।

যে শক্তি জগতের মূলে থাকিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কার্যে সহায়তা করিতেছে তাহা শৈবশক্তি। শক্তি-উপাসকেরা এই শিব-শক্তিকে

দুর্গা, কালী, মহাদেবী প্রভৃতি মূর্তিতে পূজা করিয়া থাকেন। সাধারণত দেবী ভীষণ মূর্তিতে পূজিতা হন। তিনি জীব-শোণিতে পরিতুষ্টা। শিবমন্দিরে শক্তি-পূজা শিব-পূজার অঙ্গ হইলেও শিবেরই সেখানে প্রাধান্য। কিন্তু শক্তি-পূজক শিব-শক্তিরই উপাসক। দেবী-উপাসনা ভারতীয় অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের অঙ্গ হইলেও সম্প্রদায়ের সহিত ইহা বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

শৈব-শক্তি-সম্বন্ধে সমুচ্চ ধারণা সুগভীর দার্শনিক আলোচনার ফল, কিন্তু শৈব ও শাক্তেরা একেবারেই এই সমুচ্চ ধারণায় উপনীত হইতে পারে নাই। শক্তি-সম্বন্ধে সমুচ্চ ধারণায় উপনীত হইতে বহুকাল লাগিয়াছে।

যজুর্বেদে অম্বিকাদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি রুদ্রের সহিত একত্র থাকিতেন। কিন্তু যজুর্বেদে অম্বিকা রুদ্রের পত্নী নহেন। ইনি রুদ্রের ভগিনী। সমধিক প্রাচীন যুগে এই অম্বিকার পর্বতের সহিত সংস্রব ছিল। এই অম্বিকাকে ক্রমশ আমরা পার্বতী নামে অভিহিতা হইতে দেখি, এবং ইনিই পরে উমা ও হৈমবতী নামে অভিহিতা হন। হিমালয়ের শিখর-বিশেষ কোন সময়ে দেবীরূপে পূজিতা হইত, এবং এই দেবীই হৈমবতী আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনিই হিমালয়ের শিখররূপে পর্বত-কন্যা, সুতরাং ইনি পার্বতী। পুরাণোল্লিখিত উমা হিমালয়কন্যা। তিনি এবং হৈমবতীও পার্বতী নামে অভিহিতা। দেখা যাইতেছে, অথর্ববেদে রুদ্র ঠিক শিবে পরিণত হন নাই। অম্বিকা তাঁহার সহচারিণী ভগিনী-মাত্র ছিলেন। কিন্তু অম্বিকাই পার্বতী, হৈমবতী, উমা আখ্যা প্রাপ্ত হন।

শক্তি-উপাসকেরা শিব-শক্তির উপাসক। শক্তি মূর্তিমতী হইয়া দেবীরূপে প্রকাশময়ী। শিব ও শক্তি স্বতন্ত্রভাবে চিন্তিত হইলেও স্বরূপত এক। যিনি পরমাত্মা—পরমপুরুষ, তিনি স্বয়ং নিশ্চেষ্ট। তাঁহার সকল চেষ্টা দেবীরূপিণী শক্তির সাহায্যে। শাক্তদিগের

শক্তিকে মায়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, জগতের উদ্ভব মায়া হইতে। কিন্তু বৈদান্তিকের মায়া ও শাক্তের শক্তিতে প্রভেদ আছে। বৈদান্তিক মায়া হইতে সরিয়া পড়িতে চায়, কিন্তু শাক্ত শক্তির উপাসক। সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতির সহিত শাক্তের শক্তির সাদৃশ্য আছে। সাংখ্য-মতে প্রকৃতি স্ত্রী, আত্মা পুরুষ। পুরুষ নিশ্চেষ্ট, কিন্তু প্রকৃতি চেষ্টাশীলা। প্রকৃতি পুরুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে এবং কর্মই পুরুষের দুঃখের সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রকৃতি এক দিকে যেমন পুরুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া পুরুষের দুঃখময় সংসার সৃষ্টি করে, আর এক দিকে তেমনি প্রকৃতিই পুরুষের মুক্তির কারণ হয়। সাংখ্য-দর্শন যে দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখিয়া থাকেন. শাক্তেরা ঠিক সেই দৃষ্টিতে শক্তিকে দেখেন না। শাক্তেরা শক্তির পূজা করিয়া থাকেন, শক্তির সাধনা করিয়া থাকেন। সাংখ্য-দর্শনে প্রকৃতি-সম্বন্ধে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং শক্তি, মায়া ও প্রকৃতি পরস্পরসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইলেও শক্তি, মায়া ও প্রকৃতি ঠিক এক জিনিস নয়।

কিন্তু শাক্ত, বৈদান্তিক ও সাংখ্যেরা বিভিন্ন পথাবলম্বী হইলেও সকলেরই লক্ষ্য এক। হিন্দুরা সংসার ও জীবনকে দুঃখময় জানিয়া সংসার ও জীবন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। তাহারা বস্তুতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতে চায় না, দুঃখ-নিবৃত্তই তাহাদিগের লক্ষ্য। বৈদান্তিক বলেন, ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই—জগৎ মায়া। শাক্ত বলেন, শক্তি ও শিবে প্রভেদ নাই, শক্তিই শিব, শক্তিই ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম, পরাৎপরা। শক্তি-সাধনার দ্বারা মানুষ শক্তিমান হইতে পারে এবং ইচ্ছা করিলে মুক্তও হইতে পারে।

সাংখ্যের সহিত শক্তি-তত্ত্বের সাদৃশ্য এই যে, সাংখ্যে পুরুষ ও শক্তির শিব, ক্রমান্বয়ে প্রকৃতি ও শক্তির সহকারিতা-ব্যতীত সকল কার্যে অপ্রবৃত্ত, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। অদ্বৈতবাদ ও শক্তিতত্ত্বে সাদৃশ্য এই যে, উভয় তত্ত্বেই ব্রহ্মসত্তায় বিমুক্তি। শাক্তের শিব,

অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম। অধিকন্তু শাক্ত দেখেন শক্তিই শিবের সর্বস্ব, শক্তিকে বাদ দিলে শিবের কিছুই থাকে না।

কাজেই শাক্ত শক্তিরই উপাসক হইয়া পড়েন। শাক্তের কাছে শক্তিরই প্রাধান্য, কিন্তু অদ্বৈতবাদীর কাছে ব্রহ্মেরই প্রাধান্য। অদ্বৈতবাদী মায়া হইতে অব্যাহতি পাইতে চান। অদ্বৈতবাদীর মতে মায়া হইতে অব্যাহতি পাইলে ব্রহ্মে নির্বাণ সিদ্ধ হয়। কিন্তু শাক্ত শক্তিকেই অবলম্বন করিয়া পরমপুরুষার্থসিদ্ধির প্রত্যাশী।

তন্ত্রই শাক্তদিগের প্রধান শাস্ত্র। শ্রুতির ভাগত্রয়ের মধ্যে তন্ত্র উপাসনাকাণ্ডের অংশবিশেষ। সাধন, ভজন ও যোগকেই তন্ত্র বলিতে পারা যায়। ইহার যাহা কিছু সমস্তই আনুষ্ঠানিক (practical)। তন্ত্র সংখ্যায় বহু। তন্মধ্যে মহানির্বাণ, সারদাতিলক, যোগিনী, কুলার্ণব ও রুদ্রযামলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্ত্র আগম ও নিগম-ভেদে দুই প্রকার। আগমে শক্তির প্রতি শিবের উক্তি ও নিগমে শিবের প্রতি শক্তির উক্তি নিবদ্ধ আছে। আর এক প্রকার তন্ত্র আছে, তাহাকে প্রপঞ্চসার-তন্ত্র বলে। প্রপঞ্চসার-তন্ত্র নারায়ণের প্রত্যাদেশ বলিয়া উক্ত হয়। এ-ছাড়া বৌদ্ধতন্ত্র ও অন্যান্য তন্ত্রও আছে।

শাক্ততন্ত্র-মতে শক্তি বিশ্বব্যাপিনী। বিশ্ব বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ড ও মানব-শরীর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। মানব-শরীরে শক্তি কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজিতা। সাধনার একটি অঙ্গ এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করা। শব্দমধ্যেও কুণ্ডলিনী অবস্থিতা। শব্দ মন্ত্ররূপে বিধিপূর্বক উচ্চারিত হইলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হন।

তন্ত্রে শরীরকে (এক বিশেষভাবে) কতকগুলি স্নায়বিক কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রসকল ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম প্রণালীসকল সঞ্চারিত হইয়াছে। এই সকল প্রণালীই শক্তির গতিপথ।

তন্ত্রমতে সিদ্ধি সাধন-সাপেক্ষ। কিন্তু তন্ত্র-সাধনায় গুরুর প্রয়োজন। উপযুক্ত গুরু-ব্যতীত তান্ত্রিক সাধনা অসম্ভব। তন্ত্রমতে সকল মানুষ সমান নয়। মানুষের প্রকৃতিবিশেষে অনুষ্ঠানবিশেষের উপযোগিতা তান্ত্রিকদিগের দ্বারা স্বীকৃত। তন্ত্রমতে মানুষের ভিতর প্রধানত পশু, বীর ও দৈব বা দিব্য এই তিনটি ভাব দৃষ্ট হয়। এই তিনটি ভাব ক্রমান্বয়ে যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্যে প্রতিফলিত হয়। তন্ত্রমতে অ-তান্ত্রিকেরা পশুভাবাপন্ন, সাধারণ তান্ত্রিকেরা বীরভাবাপন্ন ও প্রধান তান্ত্রিকেরা দিব্যভাবাপন্ন। মানুষের এই ত্রিভাব তম রজ ও সত্ত্ব—এই ত্রিগুণের সহিত সম্পর্কিত। সাধারণত তান্ত্রিকদিগকে দক্ষিণাচারী ও বামাচারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু শাক্তেরা এই বিভাগকে সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। কারণ দক্ষিণাচারীরা বামাচার-অবলম্বী না হইলেও, বামাচারী-দিগের আচারের বিরুদ্ধবাদী নহেন। শাক্তদিগের মতে, সাধনা সপ্তস্তরে বিভক্ত। বৈদিক, বৈষ্ণব ও শৈব এই তিনটি নিম্নস্তরের সাধনা। দক্ষিণাচারীর সাধনা এক অপূর্ব সাধনা। এই সাধনায় দেবীর প্রকৃতি-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়। এই চারি প্রকারের সাধনাকে প্রবৃত্তিদায়িকা সাধনা বলা হয়। আরও তিন প্রকার সাধনার প্রয়োজন হয়। সে তিন প্রকার সাধনা নিবৃত্তিদায়িকা। শেষোক্ত সাধনার জন্য বিশেষ দীক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু শাক্তমতে প্রবৃত্তির পথে নিবৃত্তির সাধনা করিতে হয়। বামাচার পঞ্চম সাধনা, ইহাকে পঞ্চমাচার সাধনা কহে। ষষ্ঠ সাধনা সিদ্ধান্তাচার, এই সাধনায় ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি-পথে আসিতে হয়। সপ্তম সাধনা কৌলাচার, এই সাধনায় উৎকর্ষ সাধিত হয়। কৌলসাধক সাম্প্রদায়িক ভাব অতিক্রম করেন, তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন।

সম্মোহনতন্ত্রের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ৬৪ তন্ত্র, ৩২৭ উপতন্ত্র, বহু যামল, ধামর, সংহিতা প্রভৃতি শাক্তমতের অন্তর্গত বলিয়া বিবৃত হইয়াছে ; ৩২ তন্ত্র, ১২৫ উপতন্ত্র, যামল প্রভৃতি শৈবমতের ; ৭৫ তন্ত্র,

২০৫ উপতন্ত্র, যামল প্রভৃতি বৈষ্ণবমতের। এ ছাড়া অনেক তন্ত্র উপতন্ত্র সৌরমতের, গাণপত্যমতের, বৌদ্ধমতের, চীনাগম, জৈন, পাশুপত, কাপালিক, ভৈরব ইত্যাদি অনেক তন্ত্রের উল্লেখ আছে। বেদবারিধির ন্যায় তন্ত্রও এক বিশাল বারিধি। বৈষ্ণব-তন্ত্রের পঞ্চরাত্রাগম প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। শতাধিক গ্রন্থের উল্লেখ পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী করিয়াছেন। Dr. Otto Schrader-সম্পাদিত অহির্বুধ্ন্যসংহিতার ভূমিকায় বহু বৈষ্ণবতন্ত্র ও সংহিতার উল্লেখ আছে। কাশ্মীরে শৈবতন্ত্রের উত্তরাম্নায় বিশেষ বিকাশলাভ করিয়াছিল। শাক্ততন্ত্রেরও অনেকগুলি আম্নায় ও সম্প্রদায়। অনেক তন্ত্রেই বেদ বা শ্রুতির প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের আর্যধর্ম নিবদ্ধ। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে, কালগত প্রয়োজনের সঙ্গে, পর পর যুগে এই ধর্মে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য, সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে প্রাচীন বৈদিক ধারা অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র-অনুসারে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে কেহ বাধা দিতে পারেন। কিন্তু বেদ-সম্মত ক্রমের অনুকূলে ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত থাকায় বৈদিক ধর্ম হইতে পরবর্তী ধর্মের বিচ্ছেদ ঘটিবার অবকাশ হয় নাই। সুতরাং বৈদিক ধারা সতত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং অনবরত তাহাতে সুস্নাত হইয়া পরবর্তী যুগের ধর্ম 'সনাতন ধর্ম' নামেই পরিচিত রহিয়াছে। কালক্রমে এই সনাতন ধর্মের ধারা অতীব ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি কেহ কেহ এই সনাতন অবিভক্ত ধারাটিকে আবার বহাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ঠিক আগেকার মতো সরলভাবে, গভীরভাবে, সতেজভাবে সে স্রোত আর বহে নাই। যতই অধিকারী-সম্বন্ধে বাচবিচার করিতে যান না কেন, গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ এবং রামানুজ, মাধ্ব, বল্লভ প্রভৃতি আচার্য-গণের প্রবর্তিত ভক্তিবাদ ভারতবর্ষের ধাতে অনৈহিকতার ঝোঁকটাকে

পূর্বের মতো সংযত ও সুসমঞ্জস করিয়া দেয় নাই। কুমারিল ভট্ট, আচার্য শঙ্কর, আরও অনেকে সংস্কারের জন্য চেষ্টিত থাকিলেও প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্মের পাকা ভিত্তিটার তেমন সংস্কারের সাধন হইয়া ওঠে নাই। হাজার বছরের উপেক্ষায় ও প্লাবনে বুনিয়াদ দমিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে আবার তেমন খাড়া ও দৃঢ় করিয়া কেহ উঠাইতে পারেন নাই। অনধিকারী সন্ন্যাসীর দল, বৈরাগীর দল উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়াছে বই কমে নাই। যে বিশাল জনসঙ্ঘ ব্যবহারিক জীবনটাকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহাদের মুষ্টিও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। প্রাণের উপাসনায় বিরত হইয়া তাহারা প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাদের জীবন সাংসারিক হিসাবেও ব্যর্থ, ত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিক্ দিয়াও ব্যর্থ। এক কথায় সে জীবনের লক্ষ্য, কার্পণ্য, দৈন্য, ক্লৈব্য।

বরং তন্ত্রের সমন্বয় (synthesis) নানা দিকে নানা ব্যভিচার সত্ত্বেও সেই পূর্বের সামঞ্জস্য ও স্বাস্থ্যটিকে আবার ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া আংশিকভাবে কৃতকার্য হইয়াছিল। এই সমন্বয়ের মূল কথা—জীবকে সকল অবস্থার ভিতরেই, ভোগে ও যোগে নিজের মধ্যে শিব-শক্তির মিলন করিতে হইবে। মহাশক্তি নিজের মধ্যেই রহিয়াছে—শক্তিস্বরূপই নিখিল বস্তু। এই শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে; তাহার ফলে সিদ্ধিই শুধু করতলগত হইবে এমন নয়, জীব নিজের শিব-শক্তির অভিন্নভাব উপলব্ধি করিয়া পরম কৈবল্য লাভ করিবে। মায়া বলিয়া কিছু উড়াইয়া দিবার প্রয়োজন নাই—সকল কর্ম ও সকল তন্ত্রের মধ্যেই ব্রহ্ম বা শিব-শক্তির অবিনাভাব দেখিতে হইবে। সমস্তই আনন্দময়ীর লীলাবিলাস। সাধককে তাই ধীরভাবে ভোগের মধ্যে দিয়াই যোগারূঢ় হইতে হইবে। পশুভাব পাশবদ্ধ অবস্থা; এভাবে জীব নিজেকে শৃঙ্খলিত, নিরুপায় মনে করে—নিজেকে আনন্দ-বিগ্রহ, লীলাসমর্থরূপে জানিতে বুঝিতে পারে না। বীরের সাধনে, কুলার্ণবতন্ত্রের ভাষায় 'ভোগো

যোগায়তে, মোক্ষয়তে সংসারঃ'। এমন কি, পঞ্চতত্ত্ব—যাহাতে পশুজীবের সচরাচর পতন—তাহাকেই তিনি মোক্ষ পাওয়ার সোপান করিয়া লইয়াছেন। মহানির্বাণতন্ত্র অবধূতকে যে মন্ত্রে সন্ন্যাস-গ্রহণের আবশ্যক হোম করিতে বলিতেছেন, সেই মন্ত্রই তন্ত্রোক্ত জীবনের মূলমন্ত্র—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা॥"

কথা এই যে, তন্ত্রের পথ বেদের নির্দিষ্ট পথ হইতে আপাতদৃষ্টিতে বাহ্যত কতকটা আলাদা হইলেও বেদোক্ত সেই সনাতন মার্গের ধরণ ঠিক বজায় রাখিয়াছে। এক-লক্ষ্যানুবর্তিতা তো আছেই। মহানির্বাণতন্ত্র প্রভৃতি কলিযুগের জন্য বৈদিক বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাটিকে কতকটা ঢালিয়া সাজিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই প্রাচীন ব্যবস্থার প্রাণ (spirit) অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন বলিয়াই, হিন্দুর ক্রোড়ে বেদ ও আগমের নিবিড় মিলন হইয়া গিয়াছে।

পদ্মপুরাণ বলিতেছে,—

"আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং শিবং যথাক্রমম্।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যং....ইত্যাদি॥"

অর্থাৎ—আদিত্য, গণনাথ, দেবী, শিব ও নারায়ণ, ইঁহারা পঞ্চদেবতা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের গণেশখণ্ডে এই পঞ্চদেবতা-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

"নারায়ণে গণে শিবেঽম্বিকায়াং ভাস্করে তথা।
ভেদাভেদো ন কর্তব্যঃ পঞ্চদেবসমুদ্ভবে॥"

তন্ত্রে পঞ্চদেবতাদের সকলেই স্বয়ংসিদ্ধ। দেবীও অনন্যাপেক্ষীভাবে স্বয়ংসিদ্ধা। দেবী স্বয়ং পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া উভয়ই। তাঁহাকে শুধু শিবশক্তি বলিলে, তাঁহাতে যেন সাংখ্যকথিত প্রকৃতিভাব; পক্ষান্তরে শিবে পুরুষের ভাব আরোপিত করা হয়।

দেবীমাহাত্ম্যে বিশেষভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি স্বয়ংসিদ্ধা, অর্থাৎ তিনি পুরুষও যেমন, প্রকৃতিও তেমনি। তাঁহার সম্বন্ধে কেবল হিমালয়-দুহিতা পার্বতী, উমা বা দাক্ষায়ণী বা ঈশানী বলিয়া ধারণা করিলে, তাঁহার একটি দিক্ মাত্র দেখা হয়। দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্দের সপ্তমাধ্যায়ে (২৩) মধুকৈটভবধের পূর্বে ব্রহ্মাকৃত স্তোত্রে আছে—

"অহং বিষ্ণুস্তথা শম্ভুঃ সাবিত্রি চ রমাপ্যুমা।
সর্বে বয়ং বশেঽপ্যস্যাঃ নাত্র কিঞ্চিদ্বিচারণা॥"

এখানে দেখি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু এবং তাঁহাদের শক্তিগণ ক্রমান্বয়ে সাবিত্রী, রমা এবং উমা—ইহারা সকলেই দেবীর বশ; সুতরাং হিমাচলসুতা ঐ উমা বা পার্বতী দেবী দুর্গা নহেন। কথিতা দুর্গা দেবী মাহেশ্বরীও ঠিক নহেন। 'চণ্ডী'তে রক্তবীজ-বধের বর্ণনায় আছে—

"ব্রহ্মেশগুহ-বিষ্ণুণাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈঃ চণ্ডিকাং যযুঃ॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণ-বাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ॥
হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূল-বর-ধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা॥

* *

তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-খড়্গাহস্তাভ্যুপাযযৌ॥"

অর্থাৎ—রণক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ সকল দেবতাশক্তি চণ্ডিকার নিকট আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ত্রিমূর্তিসকলের শক্তি, অর্থাৎ ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর শক্তি গরুড়স্থা বৈষ্ণবী এবং ত্রিশূল-সর্পার্ধচন্দ্র-

ধারিণী বৃষভারূঢ়া মাহেশ্বরীও আসিলেন। কিন্তু দেবী দুর্গা এই শ্লোকোক্তা মাহেশ্বরী নন। 'চণ্ডী'র প্রতিপাদ্য দেবতা ঐ মাহেশ্বরী হইতে অন্যা এবং বিশদভাবে তদপেক্ষা প্রধানা হইবেন। ঐ প্রধানা দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রসবিত্রী। কোন এক শিবের (শিব বহু আছেন) শক্তি হইতেছেন, উদ্ধৃত শ্লোকের কথিত মাহেশ্বরী। 'চণ্ডী'তে ব্রহ্মাকৃত স্তব আছে—

"বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহ-মীশান এব চ।
কারিতাস্তেযতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥"

ব্রহ্মা বলিলেন, 'বিষ্ণুকে, আমাকে এবং মহেশ্বরকে যে তুমি দেহ দান করিয়াছ, সেই তোমাকে কে স্তব করিতে পারে?' সুতরাং মহেশ্বরের শক্তি ঐ মাহেশ্বরী দুর্গার একটি মহতী বিভূতি। মাহেশ্বরীর নিজের তো কথাই নাই—জগতে স্থূল, সূক্ষ্ম, ছোট-বড় যাহা যেখানে আছে, সবই মা দুর্গার অভিব্যক্তি বলা যায়, তাই ব্রহ্মা ঐ স্তবকালে আরও বলিয়াছেন,—

"যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"

অর্থাৎ, হে অখিলাত্মিকে! যাহা কিছু সৎ এবং অসৎ বলিয়া আছে, তুমিই সে-সকলের শক্তিরূপিণী অর্থাৎ প্রাণময়ী; অতএব তোমার স্তব কি আমি করিতে পারি?

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দেবীর সহিত তুলনায় ব্রহ্মা, শিব সকলেই হইতেছেন ক্ষুদ্র প্রাণী। তবে তাঁহারা সকলে দেবীর প্রধান বিভূতি বলিয়া মানুষের অপেক্ষা এত বড় যে, আমরা তাহার ধারণা করিতে পারি না। তন্ত্র বলেন,—দেবীর শক্তিতেই ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাদি শক্তিমান্; অতএব ব্রহ্মা প্রভৃতি নগণ্য, যেহেতু শক্তিহীন হইলে তাঁহারা সকলেই শববৎ—

"ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মাপ্রেতো ন সংশয়ঃ॥"

ঠিক ঐরূপ কথাই বিষ্ণু-শিব-সম্বন্ধেও আছে। আবার—

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে সর্বে ক্ষুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকস্তু পরঃ শিবঃ॥"

অর্থাৎ, পঞ্চপ্রেত—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর ইহারা চারি কোণে চারিজন ও মধ্যস্থলে সদাশিব যেন দেবীর আসনের পাঁচটি খুঁটি ও তদুপরি দেবী স্বয়ং আসীনা।

এখানে রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরমশিব এই কয়টি শিবের নাম উক্ত হইয়াছে। উমা, ঈশ্বরী, মাহেশ্বরী প্রভৃতি ঐ সকল শিবের শক্তি; উঁহারা সকলেই দেবীরই অংশভূতা।

পুরাণে আছে (মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ৯০ অঃ ২ শ্লোক)—শুম্ভের সহিত দেবীর যুদ্ধকালে শুম্ভ দেবীকে বলিয়াছেন,—

"বলাবলেপদুষ্টে! ত্বং মা দুর্গে! গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥"

অর্থাৎ—দুর্গে, তোমার নিজস্ব তো নাই, তুমি অন্য দেবশক্তি-দিগের বল আশ্রয় করিয়া, তাহারই গর্বে যুদ্ধ করিতেছ। ইহা শুনিয়া দেবী উত্তর করিলেন,—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতাং দুষ্ট! ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥"—ঐ, ৩।

অর্থাৎ—এই জগতে একমাত্র আমিই আছি। আমার তুল্য দ্বিতীয় আর কে আছে? এই দেবশক্তিগণ, ইহারা আমার ব্যষ্টিভাবের বিভূতিমাত্র। ইহারা সকলেই আমার দেহে প্রবেশ করিতেছে। তাহাই ঘটিল; তখন যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী সর্বদেবশক্তির সমষ্টিভাবে একাকিনী রহিলেন।

সুতরাং যাহা কিছু সবই দেবীর ব্যষ্টিভাব, আর দেবী স্বয়ং সর্বসমষ্টি। এক কথায় বলা যায়, একাধারে দেবী ব্যষ্টিও যেমন, সমষ্টিও তেমনি। রক্তবীজের যুদ্ধে আগতা যে মাহেশ্বরীর বৃষারূঢ়া ত্রিশূলধারিণীর কথা বলা হইয়াছে, তিনি মার অসংখ্য বিভূতির—

বিশেষত প্রধানা অষ্টশক্তির অন্যতমা। এখন বেশ বুঝা যাইবে যে, মা ঠিক ঐ মাহেশ্বরী প্রভৃতি কেহ নহেন। আবার, যখন ঐ সকল বিভূতি তাঁহার নিজেরই, তখন স্থূলভাবে বলিতে গেলে আমাদের পূর্ব কথামতো তিনি মাহেশ্বরীও বটেন।

মহাপূজাকালে দেবীর স্তবে আছে—

"দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্।
সর্বলোক-প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদা উমাম্॥"

অর্থাৎ দেবী ব্রহ্মার শক্তি 'ব্রহ্মাণী' ও ত্রিমূর্তির অন্যতম শিবের শক্তি 'উমা'।

এই স্তবেরই অন্যত্র তাঁহাকে বিন্ধ্যনিবাসিনী বলা হইয়াছে। এই বিন্ধ্যস্থা দেবীও দুর্গা দেবীর অংশমাত্র—দুর্বাসা মুনির বিবাহিতা। বিন্ধ্যস্থা দেবী যেমন ভগবতী দুর্গার অংশ, দুর্বাসাও তেমনি শিবের অংশ (বিষ্ণুপুরাণ)। বিন্ধ্যস্থা দেবী দুর্গা দেবীর ভবিষ্যদবতারগণের অন্যতমা বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। যামলতন্ত্রে ঐ কথা আরও বিশদভাবে বুঝানো আছে। সুতরাং ইহা স্বীকার্য যে, অবতারসকল মৌলিক বস্তু নহেন, তাঁহার অংশ, অংশাংশ, এইরূপ কিছু। দেবী নিজেই বলিয়াছেন—'দ্বিতীয়া কা মমাপরা'। এই কারণেই কি 'চণ্ডী' দেবী দুর্গার পর পূর্ণভাবে আর কাহাকেও স্বীকার করেন নাই ; 'চণ্ডী'র মতে দেবী ব্রহ্মের ন্যায়, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তন্ত্রেরও সেই কথা।

আমরা জানি, প্রকৃতি জড়া, পুরুষ চিৎ। কিন্তু দুর্গা দেবী উভয়ই, আবার তিনি ব্রহ্মবস্তুও। সপ্তশতীপাঠের পূর্বে পাঠ্য বৈদিক দেবীসূক্তে ঐ সকল কথার উল্লেখ আছে। মূল 'চণ্ডী'তেও সে-সব কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন—ব্যক্তা ও অবক্তা, এই উভয় প্রকার প্রকৃতি—বিদ্যা ও অবিদ্যা একাধারে মহামায়া। দেবী সকল ভূতেরই চেতনাস্বরূপা। মা এক দিকে নির্বিকল্পা, অপর দিকে সবিকল্পাও। কিন্তু চেতনা বা চৈতন্য কি ঠিক

চিদ্বস্তু নহে, উহা কি চিত্তের ভাবমাত্র? ইহার উত্তর 'চণ্ডী'তে আছে—

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।"

অর্থাৎ দেবী স্বয়ং চিৎ। কারণ, ন্যায়দর্শনের মতে 'চিতি' অর্থে নিত্যজ্ঞানবান্ পরমাত্মা এবং এই পরমাত্মাই পরমব্রহ্ম—একমেবাদ্বিতীয় ভগবান্। সুতরাং দেবী পরমাত্মারই পর্যায়ভুক্তা। আবার—চণ্ডীর টীকাকার নাগোজীর মতে 'চিতিঃ চিচ্ছক্তিঃ'। এক্ষেত্রে, দেবী শক্তিরূপিণী পরমাপ্রকৃতি, এবং তিনিই ব্রহ্মের সহিত অভিন্না।

এই দেবী দুর্গাই অজা। দেবগণের ইচ্ছাশক্তির, প্রকারান্তরে তাঁহার নিজেরই ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণে দিগন্তব্যাপিনী জ্বালার মধ্যে তিনি রূপপরিগ্রহ করেন। কারণ—

"অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥"

দেবী পূর্ণভাবেই স্বয়ংসিদ্ধা। তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলিব। 'চণ্ডী'তে আছে, শুম্ভনিশুম্ভ-বধের জন্য দেবতারা হিমালয়ে তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় পার্বতী সেখানে আসেন। তখন পার্বতীর দেব-কোষ হইতে দেবী কৌষিকী বা শিবা নির্গতা হন। তাঁহারই সহিত শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধের সময়ে ঐ দেবীর ললাট-ফলক হইতে রক্তবীজ-বধকারিণী চামুণ্ডা কালিকার এবং দেহ হইতে শিবদূতীর আবির্ভাব হয়। কৌষিকী শুম্ভ-নিশুম্ভের বিনাশসাধন করেন।

এখানে হয়তো এইরূপ কথা উঠিতে পারে যে, এই দেবী দুর্গা যদি হিমালয়ের কন্যা না হইবেন, তবে দেবতাদের হিমালয়ে তপশ্চর্যার কারণ কি এবং পার্বতী যিনি দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন তিনিই বা কে? ইহার উত্তর এই যে, পার্বতী হইতেছেন হিমালয়ের কন্যা সেই উমা, এছাড়াও তিনি দেবী দুর্গার অবতার বা খুব বড় রকমের বিভূতি। মূল বস্তু হইতে যাঁহারা অবতরণ করেন, তাঁহাদের

মধ্যে মূল বস্তুর অংশ কাষ্ঠফলাদি-হিসাবে বিভিন্নতা থাকে। পার্বতী, শিবদূতী, কৌষিকী, চামুণ্ডাদির মধ্যেও ঐরূপ বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে। হিমালয় তপশ্চরণের উপযুক্ত স্থান বলিয়া দেবগণ তথায় দেবী দুর্গার আরাধনা করিলে, তাহারই ফলে দেবীর অবতাররূপা পার্বতী সেখানে যান। যেখানে অবতারীর প্রয়োজন, সেখানে স্বয়ং অবতারীরই আবির্ভাব হয়, নচেৎ তাঁহার দেহভূত অবতারবিশেষ কেহ আসেন।

'চণ্ডী'তে মধুকৈটভ-বধ, মহিষাসুর-বধ ও শুম্ভনিশুম্ভ-বধ, এই তিনটি অসুরবধের আখ্যান আছে। স্বয়ং দেবী দুর্গা হইয়া মহিষাসুর বধ করিয়াছিলেন; কারণ শিব জম্ভাসুরের পুত্র মহিষাসুররূপে জন্ম-পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অসুরদেহ ঘুচানো অবতারের কার্য নহে বলিয়া দেবী স্বয়ং উহা করিয়াছিলেন, মধুকৈটভ-বধের হেতুভূতা হইতেছেন দেবী দুর্গার অংশভূতা মহাকালী; শুম্ভ-নিশুম্ভবধকারিণী কৌষিকীও ঐরূপ অংশরূপা।

মহাকালী বা কৌষিকী যে স্বয়ং পরাদেবী ভগবতী দুর্গা নহেন, ইহার প্রমাণ যামলতন্ত্রান্তর্গত 'চণ্ডী'র রহস্যত্রয়ের অন্যতম প্রাধানিক ও 'বৈকৃতিক' রহস্যেও বিশেষ ও বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুই 'রহস্যে' দেবীপ্রসঙ্গের অবতারণায় এইরূপ বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণময়ী পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী হইতেছেন সকল অবতারের আদি; তিনি ব্যক্তভাবে ও অব্যক্তভাবে জগন্ময়ী; তিনি সৃষ্টির আদিতে জগৎ শূন্য দেখিয়া কেবল তমোগুণাবলম্বনে মূর্ত্যন্তর ধারণ করিলেন; সেই তামসী নারীশ্রেষ্ঠা মহালক্ষ্মীকে বলিলেন, 'মা, আমার নামকরণ কর এবং আমার কর্ম কি বল, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।' তখন মহালক্ষ্মী সেই নারীশ্রেষ্ঠা তমোময়ীকে বলিলেন, 'তোমার নাম মহামায়া, মহাকালী, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, একবীরা এবং দুরতিক্রমা কালরাত্রি; এই নামসকল তোমার কর্ম সূচিত করিতেছে।' তাঁহাকে এই বলিয়া মহালক্ষ্মী অতি শুদ্ধসত্ত্বগুণদ্বারা চন্দ্রদীপ্তিধারিণী

অন্য এক মূর্তি ধারণ করিলেন এবং তাঁহার নামাদি বলিলেন। ঐ তমোগুণাত্মিকা মহাকালী হইতেছেন হরির যোগনিদ্রা। মধুকৈটভ-নাশার্থ কমলাসন ব্রহ্মা ইঁহার স্তব করিয়াছিলেন। সর্বদেবতার শরীর হইতে যে অমিত-প্রভাবতী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন সেই ত্রিগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মী—সাক্ষাৎ মহিষমর্দিনী। এই ঈশ্বরীই সর্বদেবময়ী, সত্ত্বগুণশালিনী।

মহালক্ষ্মীর দেহ হইতে উৎপন্না মধুকৈটভহন্ত্রী মহাকালী এবং শুম্ভবিনাশিনী সরস্বতী উভয়েই অবতারমাত্র। নাগোজীও তাহাই বলেন। মহাকালী দেবী দুর্গাকে মাতৃ-সম্বোধন ও পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়াছেন। স্বয়ংসিদ্ধ অবতারী ও অবতারের এইরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। এখন কথা হইতে পারে, যদি শুম্ভাসুরঘাতিনী দেবী দুর্গার অবতারই হইবেন, তবে তিনি শুম্ভকে 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা' কিরূপে বলিতে পারেন, কারণ দুর্গা দেবীকেই তো আদি বা আদ্যা বলি। জগতে জীবগণের মধ্যে দেহধারী অবতারগণই শ্রেষ্ঠ, কাজেই ঐ প্রকার 'দ্বিতীয়া কা' কথা বলা অসঙ্গত বোধ হয় না। তদ্ভিন্ন অবতারগণ মূল বস্তুর এত নিকট যে, তাঁহারা সকলে ঐ মূল বস্তুর প্রেরণাবশে একরূপ তদ্ভাবেই ভাবিত। নচেৎ হয় তো তাঁহাদের কার্য করা অসম্ভব হয়।

তন্ত্রোল্লিখিত ভগবান্ বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহের প্রত্যেকেই এক এক জন বিষ্ণু। এই চারিজন বিষ্ণুর, অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মধ্যে অনিরুদ্ধ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু। তাঁহার যোগনিদ্রা—মহাকালী। এই মহাকালীই তাঁহার দেহ হইতে উদ্ভূতা এবং মধুকৈটভ-বধের কারণ-স্বরূপা। 'চণ্ডী'র মতে সর্পশয্যাশায়িনী নারায়ণের মূর্তি রজোগুণের আধার এবং তিনিই সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু নারায়ণের সহিত শিবশক্তি মহাকালীর সম্পর্ক আসিল কি করিয়া! মধুকৈটভনাশিনী মহাকালীকে তো আমরা জানি তিনি আদ্যা মহালক্ষ্মী মহিষমর্দিনী দুর্গার অংশরূপা, পক্ষান্তরে তিনিই পরাপ্রকৃতি

দুর্গা। সুতরাং এই পরাপ্রকৃতির সহিত পরমপুরুষের সম্পর্ক চিন্তা করিলে অন্যায় হইবে না। শিবতত্ত্বেও শিবের প্রতি এই সমবধারণা খাটে। অধিকন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহারা যে সকলেই ভগবান্, ইহারা তিনেই এক ও একেই তিন, একথা আমাদের শাস্ত্রেও খুঁজিয়া পাই। সুতরাং উক্ত মহাকালী যে ভগবানের পরাপ্রকৃতি শক্তি তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনিই বিষ্ণুমায়া, নারায়ণী—'বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা'—তিনিই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী, 'সম্মোহন'-তন্ত্রে শিববাক্যে যাঁহাকে বলা হইয়াছে—'ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা'। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখি, শ্রীকৃষ্ণের একই চিচ্ছক্তি তিন অংশে প্রকটিতা ; আনন্দাংশে হ্লাদিনী, চিদংশে সন্ধিনী এবং সদংশে সংবিৎ। তিনটি অংশ হইলেও ইহারা মূলত এক। কিন্তু এই চিচ্ছক্তিই তো মহালক্ষ্মী দুর্গা, কারণ বারাহীতন্ত্রে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'কৃষ্ণপ্রাণাধি দেবী ত্বং গোলোকে রাধিকা স্বয়ম্'। আবার রাসমঞ্চে শ্রীরাধার পূজায় দেখি—'ত্বং দেবী জগতাং মাতর্বিষ্ণুমায়া সনাতনী'। সুতরাং রাধা ও দুর্গা একই বস্তু—পৃথক্ বলিবার উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে 'যোগমায়ামুপাশ্রিত' হইয়া রাস করিয়াছিলেন এ কথা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (রাসপঞ্চাধ্যায়, ১) দেখিতে পাই। এই যোগমায়া কে? দেবী দুর্গা নন কি? সনাতন গোস্বামীও তো শ্রীরাধাকে যোগমায়া বলিয়াছেন। রাসেও তিনি 'যোগিনাকোটী-পরিবৃত'। তিনি যদি যোগমায়া দুর্গাই না হইবেন তো যোগিনীপরিবৃতা হইবেন কেন? আর রাসমঞ্চের পূজারী পূজারম্ভে 'ওঁ মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রৈ দুর্গায়ৈ নমঃ' বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন কেন? এখানে রাধা যে দুর্গা, তাহার সমবধারণা বেশ পরিষ্কার করিয়াই করা হইয়াছে। তিনিই রুদ্রযামলের—

"নারায়ণ শ্লোকরূপা চণ্ডিকাহ্লাদরূপিণী।
তৎকুক্ষিপ্রভাবা দেবী তদ্‌গুহ্যপরিবাদিনী ॥"

—তিনিই শক্তিরূপা নারায়ণী—নারায়ণের প্রকৃতি, হ্লাদিনী শ্রীরাধা, ব্রহ্মবিদ্যা। রুদ্রযামল তো তাঁহাকে একেবারে 'কৃষ্ণা কৃষ্ণস্বরূপা সা' বলিয়া ছাড়িয়াছেন, অর্থাৎ পরমা প্রকৃতি পরমব্রহ্মা-কৃষ্ণস্বরূপা। আবার ব্রহ্মযামলতন্ত্রে বলা হইয়াছে—'বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।' এই দুর্গাই ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আপনাকে বলিয়াছেন,—'অহঞ্চ হরিণা সার্ধং কল্পে কল্পে স্থিয়া সদা'।

তন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন,—ব্রহ্মা স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম হইলেও আপনিই নারায়ণমূর্তিপরিগ্রহে জননী সাজিয়া তাঁহারই নাভিব্যূহের কমলকোষে স্বয়ং লীলাজন্ম পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি আদি জীব সাজিয়াছেন ; নিজ আবির্ভাব-সময়ে তিনি যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছেন, সুরাসুর-কিন্নর-নর-প্রমুখ জীব-জগতের সৃষ্টিবিধানেও তাঁহার সেই প্রক্রিয়াই চির প্রবাহিত। নারায়ণ তাঁহার জননী-স্থানীয়, ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার গর্ভভূত, মায়া সেই গর্ভের উল্বন (জরায়ুকোষ), কারণ সমুদ্র সেই জরায়ুর মধ্যবর্তী জলরাশি। ভগবন্নাভি-নির্গত মৃণাল মাতার নাড়ীস্থানীয়, সহস্রদল রক্তকমল সেই মৃণালের অগ্রবর্তী কুসুমস্থানীয় এবং জগৎপিতামহ ব্রহ্মা ফলরূপে সন্তানস্বরূপে স্বয়ং সেই কমলে অধিষ্ঠিত। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী নারায়ণরূপা স্থিতিশক্তি পরে জগদ্ধাত্রী সাজিলেও প্রথমে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডগর্ভ নিজ কুক্ষিতে রক্ষা করিয়াই ব্রহ্মার জননী হইয়াছেন। গর্ভস্থ শিশু যেমন চেতনা লাভ করিয়া জন্মান্তরীণ ঘটনাসমূহের অনুস্মরণ করিতে থাকে, ব্রহ্মাণ্ড তদ্রূপ ব্রহ্মময়ীর গর্ভে এই ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে চৈতন্যময়ী শক্তির আপ্লাবনে অন্যান্য কল্প-কল্পান্তের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারময় ঘটনারাশির অনুস্মরণ করিতে লাগিলেন।

দেবী-উপনিষৎ জগদম্বাকে ব্রহ্মস্বরূপিণী বলিয়াছেন। তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী, পালয়িত্রী ও সংহর্ত্রী।

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥"

তন্ত্র বলেন, শিব নির্গুণ ব্রহ্ম—শক্তি সগুণ ব্রহ্ম।

আর শক্তিখচিত ব্রহ্মই দুর্গা।—'অনন্ত-শক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্বেশ্বরেশ্বরম্।'

শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য বলিয়াছেন—শক্তিস্বরূপিণী দেবী দুর্গা জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি (ইচ্ছাশক্তি) ও ক্রিয়াশক্তি ভেদে ত্রিবিধা।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ॥"

পঞ্চরাত্রে এই কথাই অন্যভাবে বলা হইয়াছে। [পঞ্চরাত্রতত্ত্ব দ্র°]

বৈষ্ণবগণ এই দিক্ দিয়া শক্তির বিচার করিয়াছেন। কিন্তু বেদান্ত মহাবিদ্যা দুর্গা দেবীকে পরমেশ্বরী, পরাবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়া সূত্র করিয়াছেন,—'সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ'—২. ১. ৩০।

জৈনধর্ম

সাধারণত, ব্রাহ্মণ্যধর্ম হইতে পৃথক্ ভাবাপন্ন এবং বৌদ্ধধর্মের সহিত কিয়দংশে সদৃশ বলিয়া জিনধর্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। জৈন প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বীদিগকে 'জৈন' বা 'অর্হৎ' বলে। যিনি রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, মান মায়া, কাম, অজ্ঞান, রতি, অরতি, শোক, হাস্য, জুগুপ্সা ইত্যাদি ভাবরূপ শত্রুদিগকে জয় করিয়াছেন, তাঁহাকেই 'জিনি' নামে আখ্যাত করা হয়। 'অর্হৎ' শব্দের অর্থ 'পবিত্র'। ভারতের প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত নগরে, বিশেষত যেখানে বণিক্‌সম্প্রদায় আছে, সেইখানেই জৈনদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের কোন কোন পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশে, গুজরাত, রাজপুতনা ও পঞ্জাবে—দক্ষিণে দ্রবিড়াঞ্চলে ইহাদিগকে সমধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনদিগের যে সর্বত্র এত নাম ধনবত্তাই বোধ হয় তাহার একমাত্র কারণ। জৈনেরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামক দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। দিগম্বরগণ 'উন্মাদ' নামে এবং শ্বেতাম্বরগণ 'তপ্পা' নামেও পরিচিত। এই দুইটি সম্প্রদায়ের আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা আছে। নিরাবরণই পবিত্রতার একমাত্র লক্ষণ এইরূপ ধারণার জন্য একটি সম্প্রদায়ের নাম দিগম্বর হইয়াছে। অবশ্য অধুনাতন সভ্যযুগে নগ্নাবস্থা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া তাহারা তাহাদের 'মত' কিঞ্চিৎ সংস্কৃত করিয়া লইয়াছে। এই শ্রেণীর ছোটদরের সাধুদিগকে এক্ষণে 'পণ্ডিত' নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা দেশীয় প্রথানুসারে বেশ পরিধান করিয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়দিগের নাম 'ভট্টারক'। ইহারা সচরাচর একখানি বড় চাদরে দেহ ঢাকিয়া থাকে। আহারের সময় তাহা খুলিয়া ফেলে। য়ুয়ান্-চোয়ঙ্ (Yuan Chwang) যে

প্রকারে ইহাদিগের বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপাঠে বেশ বুঝা যায় যে, ইহারা খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহাদিগের পূর্বপ্রথানুসারে চলিত। ইহাদিগকে ইনি 'লি-হি' (Li-hi) বলিয়াছেন। দিগম্বর সম্প্রদায়ের পূজনীয় প্রতিমূর্তি চক্ষু ও কটিবাসবিহীন। শ্বেতাম্বরদিগের মূর্তিগুলি স্বর্ণময় ও কাচনিবদ্ধ। মূর্তির নিতম্বদেশ বস্ত্রখণ্ডাবৃত। দিগম্বরদিগের পুরোহিতগণ নগ্ন; ইঁহারা আপনাদের মঠের বাহিরে যান না। কিন্তু শ্বেতাম্বরদিগের পুরোহিতগণ বস্ত্রশীল। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্বেতাম্বর মতাবলম্বীদের সংখ্যা গুজরাতে সর্বাপেক্ষা বেশী। শ্বেতাম্বরগণ (অর্থাৎ যাহারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে) দিগম্বরদিগের ন্যায় নগ্নাবস্থাকে পবিত্রতার লক্ষণ মনে করে না। বরং তাহারা বলে যাহারা বস্ত্র পরিধান করে তাহারাও চরম গতি পাইতে পারিবে। বস্ত্রাবস্ত্র লইয়া যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য, তা নয়। প্রত্যুত ইহারা ও দিগম্বরগণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ মানিয়া চলে। বিশেষত, উভয়ের ধর্মমতেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইহাদের এ দলাদলি বহুদিন হইতে সমাগত। উভয় সম্প্রদায়েই এ বিষয়ে কিছু কিছু প্রবাদ আছে। কিন্তু সেগুলির সামঞ্জস্য হয় না। শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব হইতেই এই বিবাদের সূত্রপাত হয়। উভয় সম্প্রদায় কখনও একত্র ভোজন করে না। ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদানও প্রচলিত নাই। কিন্তু উভয়ই জৈন মতাদিবিষয়ে এক এবং জৈন ধর্মের পক্ষপাতী। শ্বেতাম্বরগণ ৮৪ গচ্ছে বিভক্ত। কিন্তু এখন প্রায় ১৫ হইতে ২০ গচ্ছের অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। যে কয়টা গচ্ছ আছে তন্মধ্যে 'লোকগচ্ছই' অন্যান্য গচ্ছাপেক্ষা জীব মাত্রেরই অহিংসা-বিষয়ে সমধিক যত্নশীল। ইহারা 'অর্হতে' বিশ্বাস করে—কিন্তু মূর্তি-পূজার বিরোধী। ইহাদের মতে মূর্তি কখনই শুনিতে পারে না। এই গচ্ছের গুরুদেব (শ্রীপূজ্য) বরোদায়

অবস্থিতি করেন এবং ইহার থিবর বা প্রতিনিধিগণ দিল্লী, আজমীঢ় ও জালবে থাকেন। শ্রীপূজ্য প্রতি বর্ষে একবার করিয়া শিষ্য সন্দর্শনার্থ বাহির হন। প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্বে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। একজন পুরোহিত তাঁহার শ্রীপূজ্যের অধিকার সম্বন্ধে বিবাদ করেন। ফলে তিনি নিজেই বহিষ্কৃত হন। এই পুরোহিত বিশেষ ত্যাগ স্বীকারপূর্বক বহু সংখ্যক শিষ্য লাভ করিয়া 'ঢুণ্ঢুনিয়া' নামক নূতন গচ্ছ প্রতিষ্ঠিত করেন। 'লোক'গচ্ছের ন্যায় ইহারাও মূর্তিপূজা ও মন্দিরনির্মাণবিরোধী। ইহারা জৈনধর্মের ৩২টি মাত্র সূত্র মানিয়া চলে। ইহাদিগের পুরোহিতেরা ভিক্ষা করে না—সমাজস্থ লোকেরা যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি তাহাদিগেকে শ্রদ্ধাসহকারে দান করিয়া থাকে, তদ্দ্বারাই তাহারা আহার ও পরিধানকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহাদের নিজের সম্পত্তি বলিয়া কিছু নাই। ইহারা শ্বেতবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া থাকে এবং যাহাতে নিশ্বাস দ্বারা কীটাদি নষ্ট না হয়, তজ্জন্য বস্ত্রখণ্ডদ্বারা তাহারা মুখ ঢাকিয়া রাখে। পাছে কোন জীব মরিয়া যায়, তজ্জন্য বৃষ্টির সময় তাহারা বাহিরে যায় না। বসিবার পূর্বে তাহারা ভূমি ঝাড়িয়া লয়, এমন কি কেহ কেহ চলিবার সময়ও সম্মুখে ঝাড়িতে ঝাড়িতে যায়। ইহারা বস্ত্র বা অঙ্গ মার্জনা করে না। ঢুন্টিয়াদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কাটিয়াবাড়ে বাস করে। গুজরাতে মূর্তিপূজার বিরোধ-বশত ঢুন্টিয়াদের অনেক মতাবলম্বী এখানে বিদ্যমান।

শ্বেতাম্বরদিগের মধ্যে তিন প্রকারের সাধু দেখিতে পাওয়া যায় ; সাধু সাধ্বী ও গোরজী। ইহারা শ্রাবকদিগের পৌরোহিত্য করে না। সাধুর অপর একটি নাম সম্ভেলি, অর্থাৎ যাহারা কোন গচ্ছভুক্ত নয়। পবিত্র শ্রাবকদিগের মধ্য হইতে ইহারা গৃহীত হইয়া থাকে। সাধুরা শ্রীপূজ্য ও গোরজী অপেক্ষা কঠিনরূপে জৈনসূত্র মানিয়া চলে। যে কেহ সাধু হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে

পণ্ডিত সাধুর নিকট গমন করিতে হয় এবং তদীয় চরণে প্রণত হইয়া বিনয়পূর্বক তাঁহার নিকট তাঁহার শিষ্য বা চেলা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। সাধুর পক্ষেও একটা কর্তব্য আছে। সাধু প্রথমত দেখেন, এ বিষয়ে শিষ্যের পিতা মাতার মত আছে কি না। পিতা মাতা সম্মত না হইলে তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন না। অতঃপর তাহার অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সবল কি না তাহা তাঁহার বিবেচ্য। পরিশেষে জৈনধর্মশাস্ত্রের নিয়মাদিপালনে এবং উপবাসাদি কার্যে শিষ্যের দেহ-মন সম্পূর্ণ সক্ষম কি না তাহাও তিনি দেখিয়া লন। অবশেষে শুভদিন নির্ধারিত করিয়া এই দীক্ষাক্রিয়া সম্পন্ন করেন। যদি শিষ্য ধনীর সন্তান হন তাহা হইলে তাঁহারই ব্যয়ে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, নতুবা শ্রাবকসমাজ হইতে চাঁদা তুলিয়া ইহা সম্পাদিত হয়। বিবাহের ন্যায় আড়ম্বরে এই উৎসব সম্পন্ন হয়।

যাহা আত্মাকে দুর্গতিতে পড়িতে দেয় না, দুর্গতি লইতে আত্মাকে ধরিয়া রাখে, তাহাই জৈনমতে 'ধর্ম'।

"দুর্গতিপ্রপৎ প্রাণিধারাণাৎ ধর্ম উচ্যতে।"

ধর্ম সাধারণত তিন প্রকার—সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ চরিত্র।

মানুষমাত্রকে মুক্তির দিকে লইয়া যাওয়াই জৈনধর্মের উদ্দেশ্য; সুতরাং, জৈনগণ—সৎবংশীয় আর্য হউক, বা নীচবংশীয় শূদ্র হউক, অথবা ঘৃণিত ম্লেচ্ছ হউক—জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকে। স্থূল দৃষ্টিতে এইখানেই জৈনধর্মের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের মিল নাই। বৌদ্ধধর্মের ন্যায় ইহা সার্বজনীনতার দাবি করিয়া থাকে। এইটুকুই জৈনধর্মের বিশেষত্ব। জিনোপদেশে কথিত আছে "তেষিং সব্বেষিং আঋয় মানারিয়ানং অগিলায়ে ধর্মং ঐকথৈ" অথাৎ আর্য ও অনার্য সকলকেই তিনি অক্লান্তভাবে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। এই রূপে মালী প্রভৃতি নীচ জাতি

হইতে লোক জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। জৈনভদ্রিদ্বীপ, ভারত-মহাসাগর এবং আরবে দিগম্বরদিগের বিস্তৃত হওয়ার প্রমাণ হইতেছে যে, ভারতীয় ব্যতীত বহির্জাতিকেও তাহারা স্বধর্ম গ্রহণ করাইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন চোয়ঙ্ বলেন যে নিগ্রন্থ বা দিগম্বর-দিগের আগমনে প্রমাণিত হইতেছে যে ভারতের বাহিরেও ইহারা ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

জৈনধর্মের উৎপত্তি ও সম্প্রদায় গঠনের কাল-নির্ণয়

উৎপত্তি-কালসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিম্নলিখিত কয়টি মত প্রচলিত আছে—

(১) উইলসন সাহেবের মতে খ্রীস্টীয় ৮ম শতাব্দীতে, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খর্ব হইলে, জৈনধর্ম প্রচারিত হয়।

(২) তিনি অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন যে, খ্রীস্টীয় ২য় শতাব্দীতে জৈনধর্মের প্রভাব দাক্ষিণাত্যে দেখা গিয়াছিল।

(৩) উড সাহেব লিখিয়াছেন, খ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে, বলভী বংশের মহা সমৃদ্ধির সময়, জৈনধর্মের সম্পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

(৪) পুরাবিদ্ বেনফী সাহেবের মতে খ্রী° ১০ম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষণফলে জৈনধর্মের উৎপত্তি হয়।

(৫) প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলব্রুকের মতে মহাবীর বৌদ্ধধর্ম-প্রচারকের গুরু ছিলেন।

(৬) তৎপরে (স্টিভেনসন সাহেবের মতে) গৌতম বুদ্ধ ইঁহাকে জ্ঞানে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বুদ্ধের উপদেশে মহাবীরের মত হীন হইয়া আসে; অবশেষে বহুকাল পরে, জৈনধর্মের ক্ষীণালোক পশ্চিম ভারতে প্রকাশিত হয়।

(৭) প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাসেনের মতে, জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং খ্রী° ১ম বা ২য় শতাব্দীতে ইহার বিকাশ হয়।

(৮) ডাক্তার ওয়েবরের মতে জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্মেরই এক প্রাচীনতম শাখা।

(৯) বহু গবেষণা দ্বারা ক্লাট্ সাহেব স্থির করেন যে খ্রী-পূর্ব ২৫০ অব্দে জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১০) হর্ন্‌লি ও জেকবি ঐ মতের পোষকতা করেন।

এই সকল মতগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াও অন্যান্য-রূপে অনুসন্ধান করিয়া আমরা জৈনধর্মকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের অনুকূল যুক্তিগুলি এই—

(১) বিষ্ণু প্রভৃতি কোন কোন পুরাণে জৈনধর্মের উল্লেখ আছে।

(২) উভয় শ্রেণীর জৈনদিগের বহুতর গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্বে, অর্থাৎ খ্রী-পূর্বে ৫২৭ অব্দে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্ধমান নির্বাণলাভ করেন।

(৩) মথুরা হইতে জৈনদিগের যে প্রাচীন শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, উহা খ্রী° ১ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

(৪) কটক জেলার উদয়গিরি এবং জুনাগড়ের হইতে রুদ্রদামার পূর্ববর্তী যে প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, জৈন সম্প্রদায় বহু প্রাচীন।

(৫) প্রাচীনতম জৈনগ্রন্থে স্পষ্টত বৌদ্ধ বা বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধগ্রন্থে, নির্গ্রন্থ নামক বৌদ্ধগ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের বিবেচনায়, শাক্য-বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্বে জৈনধর্ম প্রচলিত ছিল।

(৬) জৈন ও বৌদ্ধধর্মপ্রচারকগণ সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্মে লালিত পালিত হইয়াছেন, এরূপ স্থলে বরং ব্রাহ্মণ্যধর্মকেই জৈন ও বৌদ্ধধর্মের জনক বলা যুক্তিসঙ্গত।

(৭) যখন কোন নূতন ধর্ম গঠিত হয়, তখন তাহার পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রভাব একেবারে পরিত্যক্ত হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব কালে জৈনধর্ম সৃষ্ট হইয়াছিল, এই জন্য জৈনধর্ম-

মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্পষ্ট সংস্রব পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্যই জৈনগণ, তাহাদের পূর্বপূজিত কোন কোন দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

(৮) জৈনশাস্ত্রকারগণ, ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আগম ও পুরাণাদি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পৌরাণিক ধর্মের পরিবর্তে, নূতন ধর্ম স্থাপনের কৌশল ইহাতে স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।

(৯) জৈনধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম পরবর্তী, কারণ, বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থে, এ সকল কিছুই নাই। শাক্য বুদ্ধ আপন প্রতিভা বলে জৈন মত খণ্ডন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে, "অহিংসা পরমোধর্মঃ" মূল মন্ত্র লইয়া সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া যাহারা অহিংসাবাদী বলিয়া বিখ্যাত ছিল, (অর্থাৎ জৈনেরা) তাহাদের মধ্যে অনেকেই আসিয়া, এই ধর্মে যোগদান করেন। এজন্য সে সময় জৈনধর্ম হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

(১০) বৌদ্ধ প্রভাবে জৈনধর্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল বলিয়া, পরবর্তী জৈনশাস্ত্রে মধ্যে মধ্যে জৈনসিদ্ধান্ত লুপ্ত হইবার কথা আছে; এবং বৌদ্ধধর্মের উপর তীব্র প্রতিবাদও লক্ষিত হয়।

অতএব, এই সকল যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, জৈনধর্ম, বহু প্রাচীন ও বৌদ্ধধর্ম ইহার বহু পরে উৎপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সকল যুক্তি-বলে, জৈনধর্মকে বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ যুক্তি সাহায্যে ইহাও প্রমাণ করা যায় যে, জৈনধর্মের পর বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছে।

জৈনধর্মের প্রাচীনতা

অধিকন্তু, আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বৈদিকধর্ম খ্রী-পূ° ৩০০০ হইতে ৭০০০ বর্ষের পুরাতন, বৌদ্ধধর্ম ৫০০ হইতে ১০০০ বৎসরের, ও জৈনধর্ম ২০০ হইতে ৪০০ বৎসরের।

ইউরোপীয়দিগের এই সিদ্ধান্ত আমরা শিরোধার্য করিতে বাধ্য নই।

জৈনধর্ম যে বহু প্রাচীন, তাহার প্রামাণিক অনেক গ্রন্থ আছে; জৈনধর্মবিষয়ে অর্বাচীন লোক কেবল বিরুদ্ধ মতের প্রচার করিয়াছে মাত্র। এই সকল অর্বাচীনদিগের মত যে ভ্রান্ত তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

মহাশ্রমণসঙ্ঘাধিপতি শ্রুতকেবলি দেশীয়াচার্য শাকটায়ণের 'শব্দানু-শাসন' নামে একখানি প্রাচীন ব্যাকরণ আছে। ঐ ব্যাকরণ যে জৈন সম্প্রদায়ের রচিত ও বহু প্রাচীন তাহা Prof. Gustov Oppert. Ph. মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

এই ব্যাকরণখানি যে কতকালের প্রাচীন ও জৈনমত যে কত পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঋগ্বেদ, শুক্ল যজুর্বেদ ও বাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে শাকটায়ণের নাম যখন স্পষ্টভাবে লিখিত আছে, তখন কিন্তু উক্ত গ্রন্থসকলের রচনাকালের বহু পূর্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

পাণিনি শাকটায়ণকে তৎপূর্ববর্তী বৈয়াকরণ স্থির করিয়াছেন, এবং এই কারণে শাকটায়ণের গ্রন্থে পাণিনির নাম পাওয়া যায় না। পাণিনি অনেক স্থলে শাকটায়ণের সূত্রগুলির আবৃত্তি করিয়াছেন। মাত্র। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, পাণিনির (৩.৪.৩ ও ৩.৩.১ সূত্রে) 'উণাদয়ো বহুলম্' সূত্রের টীকা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"নামচ ধাতুজমাহ ব্যাকরণে শাকটস্য চড়োবাম্। বৈয়াকরণানাং চ শাকটায়ণ আহ ধাতুজং নামেতি" ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে শাকটায়ণের উণাদি সূত্র বৈয়াকরণগণ গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং উজ্জ্বল দত্ত, মাধব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ ইহার বিস্তৃত টীকা করিয়া গিয়াছেন। কবি-কল্পদ্রুমে বোপদেব, অষ্ট প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকারদিগের এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—ইন্দ্রশ্চন্দ্র কাশকৃৎস্নোপি শলোঃ শাকটায়ণঃ। পাণিন্যমর জৈনেন্দ্রা।" প্রভৃতি নামের মধ্যে শাকটায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন।

'শব্দানুশাসনের' প্রত্যেক পদের নিম্নে শাকটায়ণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শব্দানুশাসনে স্বরবৈদিকের কোন উল্লেখ নাই; পরন্তু পাণিনি এই বিষয়ে বিশেষ-রূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বৈদিক কথা উহাতে লিপিবদ্ধ থাকায় এই গ্রন্থ পাণিনির ব্যাকরণ হইতে কোন অংশে হীন নয়। আর শাকটায়নের 'শব্দানুশাসনে' স্বরবৈদিকের কোন উল্লেখ না থাকার কারণ এই যে, ইনি জৈনধর্মমতে উহার ব্যাখ্যা করায় ব্রাহ্মণগণের হস্তে ইহাকে অনেক দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছিল। অতএব শাকটায়ণ ইচ্ছাপূর্বক ঐ অধ্যায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শাকটায়ণ তাঁহার ব্যাকরণের মঙ্গলাচরণে লিখিতেছেন,—"নমঃ শ্রীবর্ধমানায়" ইত্যাদি বন্দনা দ্বারা জৈন তীর্থঙ্করদিগের চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্ধমানের সম্বর্ধনা করা হইয়াছে। অতএব মহাবীর কত প্রাচীন ও জৈনধর্ম কত কালের তাহা একবার বিবেচনা করুন। আর উক্ত 'শব্দানুশাসন' গ্রন্থের প্রত্যেক পদান্তে লিখিতেছেন,—শ্রুতকেবলাধিপতি, শাকটায়ণ কেবল জৈনধর্মের সাঙ্কেতিক শব্দ লিখিতেছেন, ঐ সকল শব্দ অন্য কোন ধর্মপুস্তকে নাই।

শাকটায়ণাচার্য যে জৈন ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সংশয় নাই। টীকাকার যশোবর্মাও বলিয়া গিয়াছেন,—

> "স্বস্তি শ্রীসকলজ্ঞান-
> সাম্রাজ্য পদমাপ্তবান্
> মহাশ্রমণ সঙ্ঘাধিপতি-
> র্যশরশাকটায়ণঃ।"

জৈনগণ জৈনধর্মকে অনাদি বলিয়া থাকেন; ইহার সমর্থনকল্পে তাঁহারা বলিয়া থাকেন, আর্যদিগের বেদের যে ছত্রিশ উপনিষদ তাহা জৈন গ্রন্থমধ্যেই আছে। তাহার অন্যান্য অংশ রচিত হইয়া

আধুনিক বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আধুনিক বেদ প্রাচীন বেদ নয়। জৈন ইতিহাস অনুসারে আদি তীর্থঙ্কর শ্রীঋষভনাথের পুত্র ভরত চক্রবর্তী, পিতার আজ্ঞামতে শ্রাবক ব্রাহ্মণদিগের পাঠের জন্য, প্রথমে গৃহস্থ বা শ্রাবক ধর্মের নিরূপক চারিবেদ প্রণয়ন করেন। চারিবেদ যথা (১) সংসারদর্শন বেদ, (২) সংস্থাপন পরামর্শন বেদ, (৩) তত্ত্ববাবোধ বেদ, (৪) বিদ্যাপ্রবোধ বেদ। যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতেন, কেবল তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। দক্ষিণ দেশে এখনও এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন যাঁহারা আধুনিক বেদ হইতে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ বিভিন্ন রীতির বেদমন্ত্র পাঠ করেন। এই সকল মন্ত্র ঐ প্রাচীন বেদোক্ত হইলেও হইতে পারে। ঋষভনাথের পর নবম তীর্থঙ্কর শ্রীসুবিধিনাথ পর্যন্ত এই আর্য বেদ ও সম্যক্‌দর্শন ব্রাহ্মণগণ বিদ্যমান ছিলেন। সুবিধিনাথের পর এই আর্যবেদের বিচ্ছেদ হয় এবং এই সময় ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মতের পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন প্রকার শ্রুতি রচনা করেন। ঐ সকল শ্রুতিতে ইন্দ্র, বরুণ, পুষা, নক্ত, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি দেবতার উপাসনা, বিবিধ প্রকার যজন যাজন লিখিত আছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে এই সকল বিষয় বৃদ্ধ মুনিদিগের মুখে শ্রুত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের নাম 'শ্রুতি' হইল। ব্রাহ্মণগণ এই সকল আপনাদিগকে জগদ্‌গুরু ও গো ভূমি আদি দানের পাত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। এই হিংসক শ্রুতি, বেদ নামে প্রচারিত হইল। বেদব্যাসের সময় পর্যন্ত এই বেদ এক ছিল, তিনি ইহাকে বিভক্ত করিয়া চারিখণ্ড করেন। ইহাই এক্ষণে ঋক্‌, যজু, সাম ও অথর্ববেদ নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

এক্ষণে এই বেদব্যাস প্রচারিত গ্রন্থে জৈনধর্মের মতবাদ খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে, দ্বিতীয় পাদের তেত্রিশ সূত্রে, জৈনদিগের সপ্তভঙ্গী মতের খণ্ডন দেখা যায়। যে মত প্রবল বা যাহা দেশব্যাপী অধিকার লাভ করিয়াছে,

তাহার খণ্ডন না করিলে কোন নূতন মত প্রবর্তিত করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং বেদব্যাসকে জৈনমত খণ্ডন করিতে হইয়াছিল। অতএব বলা যাইতে পারে যে, জৈনধর্ম বেদব্যাসের বহুপূর্বে প্রচলিত ছিল। বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি মীমাংসা প্রণয়ন করেন; ইনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত বিতর্ক করিয়া শুক্ল যজুর্বেদে জৈনধর্ম যে বেদ প্রচারিত ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন তাহা সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

যজুর্বেদ-সংহিতা অধ্যায় ১, শ্রুতি ২৫।

"রাজস্য নু প্রসব আবভূবেমা চ
বিশ্বা ভুবনানি সর্বতঃ স
নেমিরাজা পরিয়াতি বিদ্বান্
প্রজাং পুষ্টিং বর্ধমানো অস্মে স্বাহা।"

জৈনগণ এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা স্বধর্মের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ইহাদের উদ্ধৃত শ্লোকগুলি যদি যথার্থ বৈদিক শ্লোক হয়, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাদের নিরূপিত মত সত্য বলিতে পারা যায়।

আর অধিক শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া, পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থে জৈন ধর্মের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, তাহার উল্লেখমাত্র করিতেছি। কত লোকে স্বকপোলকল্পিত মত জাহির করিয়া বলেন যে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের শাখামাত্র এবং উহা বহু পরে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু, তাহা ভুল। কেননা, জৈনদিগের বেদনিহিত প্রমাণের কথা ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ হইতে জৈনমতের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে পারা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে—

"নিত্যানুভূতনিলজা" ইত্যাদি শ্লোকে জৈনদিগের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে জীবদয়া ও লোক-শিক্ষার নায়ক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"নাভিস্তু জনয়েৎ পুত্রং" ইত্যাদি শ্লোকে ঋষভদেব তৎপুত্র ভরতকে লোকপালনের ভারার্পণ করিয়া তপস্যা আচরণ করিলেন।

নাগপুরাণে—

"দর্শয়ন্ বর্ত্ম বীরাণাং সুরাসুর নমস্কৃতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইতেছে যে, ভগবান্ জিনদেবের মত জৈনমত বলিয়া খ্যাত এবং আদিনাথ ঋষভনাথ জিনেশ্বর বলিয়া কীর্তিত।

শিবপুরাণে—

"অষ্ট ষষ্টিষু তীর্থেষু মাত্রায়ং যৎ ফলং ভবেৎ" ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইতেছে যে, বিবিধ তীর্থযাত্রায় যে ফল হয়, একমাত্র ঋষভনাথ স্মরণে ততোধিক ফল হয়।

ঋগ্বেদে—

"ওঁ ত্রৈলোক্য প্রতিষ্ঠিতানাং চতুর্বিংশতি তীর্থংকরাণাং।" ইত্যাদির অর্থ ঋষভদেব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাবীর পর্যন্ত চব্বিশ তীর্থঙ্কর, ত্রিলোকে খ্যাত, সিদ্ধগণ তাঁহাদের স্মরণ করেন, আবার ঋগ্বেদের আর একস্থানে লিখিত আছে—

"ওঁ পবিত্র লগ্নং সুধীরং দিগ্বাসনং ব্রহ্মাগর্ভ সনাতনং উপৈমি বীরং পুরুষমর্হৎ মাদিত্যবর্ণ তমসঃ পুরস্তাৎ স্বাহা।"

এখানে, নগ্ন দিগম্বর ব্রহ্মস্বরূপ সনাতন অর্হৎদিগকে স্মরণ করা হইতেছে।

যজুর্বেদে—

"ওঁ নমোহর্হপ্তো ঋষভো।" ইত্যাদি মন্ত্রে ঋষভদেবের অর্চনা করিয়া বলা হইতেছে যে, ঋষভদেব, অজিতনাথ, সুপার্শ্ব, অরিষ্টনেমি, এই সকল ভগবান্ জৈনদিগের তীর্থঙ্কর। ইঁহাদের মূর্তি জৈনগণ নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকে শাস্ত্রাদি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে পারা যায় যে, জৈনমত বহু প্রাচীন, জৈনধর্ম

বৌদ্ধধর্মের শাখা নয়, ইহা উৎকীর্ণ দুই একটি শিলালিপি দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইয়াছে।

বৌদ্ধমত হইতে জৈনমতের প্রাচীনতা ও বিভিন্নতা

(১) বিখ্যাত জর্মান পণ্ডিত Hermann Jacobi, যে সকল জৈন পুস্তকের উল্লেখ ও বিচার করিয়াছেন, সেগুলি পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে এই পুস্তকগুলি অতি প্রাচীন। এই সকল গ্রন্থ এত প্রাচীন যে, আমরা যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থকে আজ কাল প্রাচীন বলিয়া বিশ্বাস করি, সেগুলি ইহাদের অপেক্ষা আধুনিক, ইহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

(২) জৈন গ্রন্থগুলি অতিশয় প্রাচীন বলিয়া, পরবর্তী কালের বৌদ্ধগণ, আপনাদের গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাচীন জৈন গ্রন্থের কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই, বরং জৈনদিগের ইতিহাস লোপ করিয়া আপনাদিগের প্রাচীনত্ব বজায় রাখিতে সম্পূর্ণরূপে চেষ্টা করিয়াছেন। যেহেতু ঐ সকল প্রাচীন জৈনগ্রন্থ, হয় বৌদ্ধমতের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল, না হয় উহাতে যে সকল মতবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা পাঠে লোকের পরবর্তী বৌদ্ধমতের প্রতি আস্থা স্থাপন না করিবার যথেষ্ট আশঙ্কা বৌদ্ধগণ অনুভব করিয়াছিলেন।

(৩) অপর পক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে, মূল জৈনমত ও বৌদ্ধমতে বিশেষ প্রভেদ নাই, বরং জৈনগণ অহিংসা ব্রত আচরণে অধিকতর দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা দেখিয়া অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এক মত অন্য মত হইতে স্বতন্ত্র নয়,—বরং এক মত হইতে অন্য মতের উৎপতি হইয়াছে। এই মতের মূলে কোনরূপ সত্য নিহিত আছে কি না, তাহার বিচার করা আবশ্যক।

যেখানে জৈনদিগের শ্রাবক ছিল, বুদ্ধদেব সেই স্থান হইতে বৈশালীতে গমন করিয়াছিলেন, ইঁহাদিগকে বুদ্ধদেব প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে, এই সকল উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং জৈনদিগের প্রবর্তক ও বৌদ্ধদিগের শত্রু মহাবীরের নাম নাতপুত্র ও অগ্নিবৈশয়ান গোত্রসম্ভূত এই কথা সম্পূর্ণরূপে অসত্য। কারণ, মহাবীরের প্রধান গণধর ও শিষ্য সুধর্মস্বামীর সহিত ঐ গোত্রের সম্বন্ধ আছে; এই সুধর্মস্বামী মহাবীরের নির্বাণ লাভের পর, আচার্য বা অগ্রেশ্বর হইয়াছিলেন।

(৪) যদি বুদ্ধদেব ও মহাবীর সমসাময়িক হইতেন, তাহা হইলে তৎসমসাময়িক অপরাপর ব্যক্তি, যথা—বিম্বিসার, ও তৎপুত্র অভয়কুমার, অজাতশত্রু, সংখলী ও সংখলি-পুত্র গোশালক—ইহাদের নাম দুই সম্প্রদায়ের পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যাইত।

কিন্তু, বুদ্ধ মহাবীরের বহু পরে আসিয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধদিগের পীঠিকা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ, "বৈশালী নগরের নিকটে মহাবীরের জন্ম" ও "ঐ নগরের প্রধান অধিকারী মহাবীরের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ" প্রভৃতির কথা জৈনেরা কহিয়া থাকেন—পীঠিকাতে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত গ্রন্থে, ক্রিয়া-বাদ ও জলে জীব আছে, ইত্যাদি বৌদ্ধ-গ্রাহ্য যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে তাহা জৈনদিগের মতের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন, এবং সর্বশেষ নাতপুত্রের নির্বাণ (মহাবীরের) বৌদ্ধগণ মানিয়া থাকেন। ইহা হইতে এবং বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্র-পাঠে সিদ্ধান্ত হয় যে, বৌদ্ধ ও জৈন মতের প্রবর্তক দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি; বৌদ্ধ হইতে জৈনমত বহু পূর্বে রচিত হইয়াছিল; বৌদ্ধমত হইতে জৈনমত প্রকটিত হয় নাই বা ইহা উহার শাখা-বিশেষ নয়, কিন্তু উহা হইতে স্বতন্ত্র ও বহু প্রাচীন কালের রচিত।

(৫) যদি বুদ্ধদেবের সময়ে জৈনমত প্রচারিত হইত তাহা হইলে, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে এরূপ লিখিত হইত যে, জৈনমত বুদ্ধ বা

তৎ শিষ্যদিগের মতবিরোধী, অথবা জৈনমত হইতে অনেক লোক বুদ্ধমত গ্রহণ করিলেন, অথবা জৈনগণ এক নবীন পথ প্রদর্শন করিতেছে ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ উক্তি কোথাও নাই। বৌদ্ধগ্রন্থ, মজ্ঝিম নিকায়কের ৩৫ প্রকরণে লিখিত আছে—"বুদ্ধদেব নিগ্রন্থ পুত্র সচ্চককে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন।" কিন্তু সচ্চক নিগ্রন্থের পুত্র নয়, এবং যে তত্ত্ব লইয়া বিচার বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাও জৈনমত নয়। জৈনমত বৌদ্ধমতের পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল।

আবার উক্ত গ্রন্থের উত্তর অধ্যায়নের ১৩শ অধ্যায়ের ১৩শ পাথায় লিখিত আছে—পার্শ্বনাথের সহচর সাধুরা বহুমূল্য ও অল্পমূল্যের বস্ত্র পরিধান করিতেন। কিন্তু মহাবীরের সময়ে অল্পমূল্যের বস্ত্র পরিধান একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। যেহেতু জৈনশাস্ত্রে নগ্ন সাধুদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া অচেলক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বৌদ্ধদিগের ধর্মপদগ্রন্থে লিখিত আছে যে, অচেলক ও নিগ্রন্থগণ বিভিন্ন, কারণ অচেলকগণ নগ্ন ও নীতিমর্যাদার জন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন।

এইরূপ বহুতর উক্তি হইতে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে জৈনমত বৌদ্ধমত হইতে বিভিন্ন ও প্রাচীন।

জৈনধর্ম প্রচার

বৌদ্ধধর্ম যেমন বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিয়াছিল, জৈনধর্ম তেমন বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ জৈনধর্মের পরবর্তী বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে ও প্রবল প্রচারে ইহা লুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধ প্রভাব ক্রমশ হীন হইবার পর জৈনধর্মের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল; অশোকের পৌত্র ও কুণালের পুত্র সম্প্রতি রাজার সময়

জৈনধর্ম আবার বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মহাবীরের সময় অতি অল্প স্থানেই জৈনধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু এই সম্প্রতি রাজা প্রচারক পাঠাইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে, এমন কি পারস্য ও শক যবনদেশেও জৈনমত প্রচার করেন। নডোল, গিরনার, শত্রুঞ্জয় ও ও রটলাম্ প্রভৃতি স্থানে এই রাজা ছাব্বিশ হাজার জৈন-মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

জৈনধর্মে জাতিভেদ

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবকালে যে জৈনধর্ম গঠিত হইয়াছিল, তাহা জৈন সামাজিক আচার পর্যালোচনা করিলে বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। জৈনদিগের মতে আদিজিন হইতে বর্ণধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের বিধান জৈনদিগের মধ্যেও আছে। ক্ষত্রিয়গণ শাস্ত্রধারণপূর্বক রাজ্য শাসন ও রক্ষা এবং দুঃখিতের দুঃখ মোচন করিবে; এক মাত্র শাস্ত্রই ইহাদের উপজীবিকা। বৈশ্যদিগের কৃষিবাণিজ্য ও পশু-পালনই একমাত্র জীবনোপায়; শূদ্রগণ তিন বর্ণের সেবা করিবে। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা পঞ্চ মহাব্রতপরায়ণ, ভরত তাহাদিগের পরে ব্রাহ্মণ করিয়া সৃষ্টি করিলেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান প্রতিগ্রহ, যজন ও যাজন, এই ছয়টি ব্রাহ্মণের ধর্ম। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। শিখা ও যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ। শূদ্র দুই প্রকার—কারু ও অকারু। রজক, চর্মকার প্রভৃতি কারু, অপর সকলে অকারু। কারু আবার দুই প্রকার,—স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য; এই অস্পৃশ্যগণ সমাজ বহির্ভূত।

জৈনধর্মে শৌচাশৌচ

জন্ম বা মৃত্যু হইলে, জৈন জাতি মধ্যে অশৌচ হইয়া থাকে। মৃতাশৌচ— ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের পাঁচ দিন, বৈশ্যের বার দিন

এবং শূদ্রের ১৫ দিন। রাজা ও তপস্বী প্রভৃতির অশৌচ হয় না। আর্তি, দুর্ভিক্ষে মৃত, অগ্নি ও জলপাত দ্বারা মৃত ব্যক্তির জ্ঞাতিগণের কোনরূপ অশৌচ হয় না। শিশুগণ অস্পৃশ্য লোকের সংস্রবে থাকিলে ও চূড়াকরণ পর্যন্ত অশুচি হয় না। অস্নাতা ঋতুমতী স্ত্রী, প্রথম চতুর্থ দিবসাবধি অশুচি থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রাতরুত্থান, শৌচ, আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি হিন্দুদিগের সমান। জৈনেরা গোময়াদি দ্বারা পূজাদি স্থান পরিশুদ্ধ করিয়া থাকে।

জৈনধর্মে আহ্নিককৃত্য

হিন্দুদের ন্যায় জৈনগণ প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ, গাত্রোত্থান পূর্বক চতুর্দশ নিয়ম ধারণ, মলমূত্রাদিত্যাগ, জিহ্বোল্লেখন ও স্নান করিবেন। উচ্চ নিম্ন বা জীবযুক্তাদি স্থানে ইহারা স্নান করেন না। স্নান করিতে হইলে সর্বদা তৈল মর্দন চাই। স্নানান্তে পূজা। এই পূজা ত্রিবিধ—অঙ্গপূজা, অগ্রপূজা ও ভাবপূজা।

অঙ্গপূজা—নির্মাল্যদূরীকরণ, মার্জন, অঙ্গপ্রক্ষালন, কুসুমাঞ্জলি-মোচন, পঞ্চামৃতস্নান, চন্দনাদি বিলেপন, পুষ্পাদির আভরণ দ্বারা ভূষা, মালা মুকুটাদি রচনা, জিন-প্রতিমা গঠনাদি দ্বারা হইয়া থাকে।

অগ্রপূজা—দেবোদ্দেশে গীত, নৃত্য, বাদ্য, লবণ, জল নৈবেদ্য, আরতি প্রভৃতি দ্বারা হইয়া থাকে।

ভাবপূজা—শক্রস্তব, চৈত্যস্তব, নামস্তব, শ্রুতস্তব ও সিদ্ধস্তবাদি ও অগ্রপূজার গীত নৃত্যাদি দ্বারা এই পূজা হইয়া থাকে। সকল প্রকার পূজাই ঐ তিন প্রকার পূজার অন্তর্গত। পূজক পূর্ব বা উত্তরমুখী হইয়া শ্বেতবস্ত্র ধারণপূর্বক পূজা করিবে; প্রাতে জপ পূজা, মধ্যাহ্নে ফুল পূজা, এবং সন্ধ্যায় ধূপ দিয়া পূজা করিবে।

জৈনধর্মে উপাসনার অধিকার

অধিকারী ভেদে, উপাসনার ভেদ জৈনধর্মে পরিলক্ষিত হয়। সুন্দর, সম্যগ্‌দৃষ্টি, পঞ্চব্রতপরায়ণ, চতুর শৌচবান্ ও বিদ্বান্, এইরূপ তিন বর্ণ জিন দেবের পূজার অধিকারী। কিন্তু শূদ্র, মন্দ-প্রকৃতি, অন্তকপরিদূষিত, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, দীর্ঘপ্রবাসী, মূর্খ, তন্দ্রালু, দুষ্টাত্মা, দাম্ভিক, মায়িক, অশুচি বিরূপাঙ্গ, এবং যাহারা জৈন-সংহিতা অবগত নয়, তাহারা জিনদেব-পূজার অনধিকারী। জিনপূজক মাত্রেরই জিনসংহিতার মর্ম প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক।

জিন-প্রতিষ্ঠাবিধি

প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে বিশুদ্ধ জলে পূজিত পীঠ প্রক্ষালিত, ঐ পীঠ পুষ্পমালা দ্বারা পরিশোভিত এবং চতুর্দিকে দীপসকল প্রজ্বলিত করিতে হয়। দর্ভমালা পুষ্পমণ্ডপে প্রদান করিয়া পরে এই মণ্ডপে জিনমূর্তি স্থাপন করিতে হয়। প্রতিমা যদি অচলা হয়, তাহা হইলে তাহার উপর সরন্ধ্রক জলপূর্ণ একটি ঘট স্থাপন করিতে হয়। আর যদি সৌধী হয়, তাহা হইলে কুম্ভের অধোভাগে প্রতিবিম্বক দর্পণ রাখিতে হয় এবং চতুর্দিকে যথাবিধি অগ্নি প্রক্ষেপ অর্থাৎ হোম করিতে হয়।

এইরূপে জিনদেবের প্রতিষ্ঠা হয়। জিনদেবের প্রতিষ্ঠা হইলে প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন জিনসংহিতায়, সায়ং, মধ্যাহ্ন ও সন্ধিপূজা, হোম, আরতি, বলি, বিসর্জন, নিত্যপূজা, স্নান, কলস-স্থাপন, কার্ত্তিক মাসে দীপাবলী, ধ্বজারোহণ-বিধি, ধ্বজোৎসব, অঙ্কুরার্পণ, প্রায়শ্চিত্ত, জীর্ণোদ্ধার তর্পণ, পুণ্যাহ, রথযাত্রা, ভূমি-পরীক্ষা বাস্তুযাগ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড, অনেক অংশে ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের অনুরূপ।

জৈন ধর্ম-সাহিত্য

প্রাচীন জৈন ধর্মপুস্তকসমূহের মধ্যে অধিকাংশ প্রাকৃত ভাষায় লিখিত, আধুনিক জৈনশাস্ত্রের অনেকগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সাধারণের বোধের নিমিত্ত, প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থ-নিচয় প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং পণ্ডিতগণের বোধের নিমিত্ত কতিপয় গ্রন্থের টীকাও সংস্কৃত ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ জৈন কোষকার হেমচন্দ্র, প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাহার টীকা করিয়াছেন। শ্বেতাম্বর জৈনগণ আধুনিক জৈনগ্রন্থবিশেষ গ্রাহ্য করেন। প্রাচীন গ্রন্থের অনেকগুলি এখন লুপ্ত হইয়াছে।

এখন জৈনগণ ৪৫ খানি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে একাদশ বা দ্বাদশ অঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, দশ পয়ন্ন (প্রকীর্ণক), ছয় ছেদসূত্র, দুইখানি সূত্র এবং চারিখানি মূলসূত্র।

দ্বাদশ অঙ্গ, যথা—আচার, সূত্রকৃত, স্থান, সমবায়, ভগবতী, জ্ঞাতাধর্মকথা, উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা, অনুত্তরৌপ-পাতিকদশা, প্রশ্নব্যাকরণ, বিপাক ও দৃষ্টিবাদ।

দ্বাদশ উপাঙ্গ যথা :—ঔপপাতিক, রাজপ্রশ্নীয়, জীবাভিগম, প্রজ্ঞাপনা, জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি, সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, নিরয়াবলী, কল্পাবতংসিকা, পুষ্পিকা, পুষ্পচুলিকা, বৃষ্ণিদশা।

দশ পয়ন্ন যথা :—চতুঃশরণ, সংসার, আতুরপ্রত্যাখ্যান, ভক্ত-প্ররিজ্ঞা, তণ্ডুলবৈয়ালী, চন্দাবীজ, দেবেন্দ্রস্তব, গণিবীজ, মহা-প্রত্যাখ্যান ও বীরস্তব।

ছয় ছেদসূত্র যথা :—নিশীথ, মহানিশীথ, ব্যবহার, দশা-শ্রুতস্কন্ধ, বৃহৎকল্প ও পঞ্চকল্প।

চারিখানি মূলসূত্র যথা :—উত্তরাধ্যয়ন, আবশ্যক, দশবৈকালিক ও পিণ্ডানির্যুক্তি।

অপর দুইখানি সূত্র যথা :—নন্দী ও অনুযোগদ্বার। বিধি-প্রথা ও তাহার টীকায় এই রূপই জৈনশাস্ত্র গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে আগম নামে অভিহিত করা হয়। ইহা অর্ধমাগধী ভাষায় লিখিত রত্নসাগর নামক জৈনগ্রন্থে ঐরূপ ৪৫-খানি আগমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কেবল পয়ন্ন ও ছেদ-সূত্রের পরিবর্তে সূত্র ও মূলসূত্র নামক ব্যবহৃত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত ধর্মকার নামক গ্রন্থে ৫০খানি আগম ও কল্পসূত্র নির্ণীত হইয়াছে। আবার দশম প্রকার ও একাদশ অঙ্গের পরিবর্তে একাদশ ও দশম অঙ্গ এবং দ্বাদশ উপাঙ্গ বৃষ্টিদশার পরিবর্তে নব উপাঙ্গ কপ্পিয়াসূত্রের উল্লেখ আছে।

ইহার মতে চারিখানি মূলসূত্র যথা :—আবশ্যক, বিশেষ আবশ্যক, দেশ বৈকালিক ও পাক্ষিক।

পাঁচখানি কল্পসূত্র যথা :—উত্তরাধ্যয়ন, নিশীথ, কল্প, ব্যবহার ও জিতকল্প।

ছয়খানি সূত্র যথা :—মহানিশীথ বৃহদ্বাচনা, মহানিশীথ, লঘু-বাচনা, মধ্যমবাচনা, পিণ্ডনির্যুক্তি, ওঘনির্যুক্তি ও পর্যুষণাকল্প।

দশখানি পয়ন্ন যথা :—চতুঃশরণ, প্রত্যাখ্যান, ভক্তিপরিশেষ, মহাপ্রত্যাখ্যান, তণ্ডুল বৈতালিক, চন্দাবিজয়, গণিবিদ্যক, মরণ-সমাধি, দেবেন্দ্রস্তবন ও সংস্থার।

এই গ্রন্থে দৃষ্টিবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

জৈন শাস্ত্রবেত্তাদিগের মতে, অঙ্গগুলি সর্ব প্রথমে রচিত হইয়াছে। তৎপরে ঐ সকল সিদ্ধান্ত বা আগম প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ইহা সাধারণের উপলব্ধিগত করিবার নিমিত্ত, শ্বেতাম্বর জৈনগণ বিবিধ মূল সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া, বহুবিধ ভাষ্য, টীকা, চূর্ণী ও নির্যুক্তি প্রচার করিয়াছেন।

কোন কোন প্রাচীন জৈন আগম অনুসারে, চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর,

মহাবীর বা বর্ধমান, ৮৪ লক্ষ পদসমন্বিত দ্বাদশ অঙ্গ প্রচার করিয়াছিলেন এইরূপ উক্তি আছে। কিন্তু টীকাকারগণ মহাবীরের স্থানে ঋষভ স্বামীর নাম বসাইয়াছেন। এবিষয়ে নানাগ্রন্থে নানারূপ মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে এই বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রাকৃত ভাষায় রচিত, 'প্রবচন সরোদ্ধারে' লিখিত আছে, ঋষভ হইতে সুবিধিনাথ এই নয় তীর্থঙ্করের সময় একাদশখানি অঙ্গ প্রচারিত ছিল, দৃষ্টিবাদ ছিল না। পরে নবম হইতে ষোড়শ তীর্থঙ্করের সময় দ্বাদশ অঙ্গ বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ষোড়শ হইতে চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর পর্যন্ত সমস্ত নষ্ট হয় নাই। আবার স্থানান্তরে লিখিত আছে, পরে দৃষ্টিবাদও নষ্ট হইয়াছিল।

ওঘনির্যুক্তির অবচূরি প্রণেতা লিখিয়াছেন, মহাবীর আপন শিষ্যকে যে ধর্মমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই চতুর্দশ পূর্ববাদ—ঐ দ্বাদশ অঙ্গের অন্তর্গত। তাঁহার শিষ্য সুধর্ম, তৎশিষ্য জম্বু, তৎপরে প্রভব, তৎপরে শয্যম্ভব, তৎপরে যশোভদ্র, তৎপরে সম্ভূতিবিজয়, তৎপরে ভদ্রবাহু এবং অবশেষে স্থূলভদ্র, শিষ্যপরম্পরায় এই আটজন মাত্র চতুর্দশ পূর্ব জানিতেন এবং শ্রুতকেবলী ও চতুর্দশ পূর্বধারী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তৎপরে একাদশ হইতে চতুর্দশ পূর্বগুলি লুপ্ত হয়। এইরূপে উত্তরকালে সমস্ত পূর্বগুলি লুপ্ত হইয়া, মহাবীরের, ৯৮০ বৎসর পরে দেবর্ধিগণি কেবল একমাত্র পূর্বের উল্লেখ করিয়াছেন। অবশেষে মহাবীরের ১০০০ বৎসর পরে শান্তিচন্দ্র, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তির টীকায় লিখিয়াছেন যে,—দৃষ্টিবাদ সম্পূর্রূপে বিলুপ্ত হইল।

হেমচন্দ্রাচার্যের স্থিরাবলী-চরিতে লিখিত আছে যে, বীর-নির্বাণের ১৭০ বৎসর পূর্বে, পাটলিপুত্র নগরে শ্রীসঙ্ঘ হয়, ঐ সময়ে জৈনশাস্ত্র বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল বলিয়া শ্রীসঙ্ঘে ৫০০ ভিক্ষু মিলিয়া একাদশাঙ্গ সংগৃহীত করিয়াছিলেন এবং ভদ্রবাহুর নিকট হইতে স্থূলভদ্র কৌশলে অবশিষ্ট পূর্বগুলি জানিয়া লইয়া, প্রধান আচার্য হইলেন।

প্রসিদ্ধ দিগম্বরাচার্য জিনসূন সূরি, হরিবংশপুরাণে লিখিয়াছেন, মহাবীর স্বামীই একাদশাঙ্গ প্রচার করেন, দ্বাদশ অঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি তাঁহার শিষ্য গৌতমদ্বারা প্রচারিত হয়।

এই সকল বিভিন্ন উক্তি হইতে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যদিও মহাবীরের বহুপূর্ব হইতে জৈনধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু দুই একখানি ভিন্ন, অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রের মতে শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর হইতেই প্রাচীনতম জৈন সিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হয়।

জৈন সিদ্ধান্তগুলি, গুরু-পরম্পরায় মুখে মুখে বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিবার বহু পরে লিপিবদ্ধ হইলেও মূল অঙ্গগুলি যে অতি প্রাচীন সেবিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ যে খ্রী° প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে গ্রীকদিগের ফলিত জ্যোতিষ ও গণিত জ্যোতিষ ভারতে প্রচারিত ছিল বলিয়া থাকেন, তাহার বহুপূর্বে জৈনদিগের মূল অঙ্গগুলি বিরচিত হইয়াছে, ও উহাতে গ্রীক জ্যোতিষের ছায়া মাত্র নাই,—একথা জর্মান পণ্ডিত ওয়েবর মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অঙ্গের পর উপাঙ্গ রচিত হয়। এগুলি জ্যোতিষ গ্রন্থ। অঙ্গে যেমন কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ, উপাঙ্গে সেইরূপ ভরণী হইতে মহাবিষুব এবং অভিজিৎ হইতে নক্ষত্র গণনা আরম্ভ হইয়াছে। মহাবীরের প্রধান শিষ্য গৌতম কর্তৃক উপাঙ্গ রচিত হইয়াছে, এইরূপ উক্তি জৈন হরিবংশপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আবার প্রজ্ঞাপনা উপাঙ্গে লিখিত আছে যে, শ্যামার্য ইহার রচয়িতা। বীর নির্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্যামার্য বিদ্যমান ছিলেন। অতএব কোন কোন উপাঙ্গ খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রাচীন, আর কোন খানি বা অপ্রাচীন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জৈন সঙ্ঘ ও নিহ্নব

জৈনদিগের বহুগ্রন্থ অনেক দিন ধরিয়া মুখে মুখে চলিয়া আসায়, অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের উদ্ধার-সাধনমানসে সঙ্ঘ ও নিহ্নব নামক নবমত প্রবর্তকদিগের সভা হইত। লক্ষ্মীবল্লভগণি উত্তরাধ্যয়ন সূত্রার্থ দীপিকায় ভারতের প্রসিদ্ধ আটটি নিহ্নবের উল্লেখ করিয়াছেন।

১ম ও ২য়—মহাবীরের জীবদ্দশায় হইয়াছিল।

৩য়—তাঁহার নির্বাণের ২১৪ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩১৩ খ্রীস্টাব্দে।

৪র্থ—বীর নির্বাণের ২২০ বর্ষ গতে।

৫ম—বীর নির্বাণের ২২৮ বৎসর পরে।

৬ষ্ঠ—বীর নির্বাণের ৫৪৪ বৎসর গতে।

৭ম—বীর হইতে ৫৮৪ বৎসর গতে।

৮ম—বীর হইতে ৬০৯ বর্ষ গতে হইয়াছিল।

এই শেষ নিহ্নব মথুরায় হইয়াছিল। ঐ সময় মথুরায় জৈনগণ যে অতিশয় প্রবল ছিল তাহা কঙ্কালীতিলা হইতে আবিষ্কৃত সেই সময়ের শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে।

দিগম্বর জৈনদিগের মতে, বীর নির্বাণের পর ৬৩৩ হইতে ৬৮৩ অর্থাৎ ১০৭ হইতে ১৫৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পুষ্পদন্ত নামে একজন আচার্য সমস্ত অঙ্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তীর্থঙ্কর

ব্রাহ্মণগণের ভাগবতে যেমন ২৪ অবতারের কথা আছে, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে যেমন ২৪ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে, সেইরূপ জৈনদিগের প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত একাদশাঙ্গের মধ্যে সমবায়াঙ্গে আমরা ২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ প্রাপ্ত হই। জৈন যতিগণ

কহিয়া থাকেন যে, যিনি সর্বপ্রকারে নির্দোষ এইরূপ ব্যক্তি জিন পদবাচ্য। তাঁহাকেই জৈনেরা অর্হন, জিন্, তীর্থঙ্কর প্রভৃতি নাম দিয়া থাকেন।

জৈনাগমে বর্ত্তমান অবসর্পিণীর পূর্বে উৎসর্পিণীতে যে ২৪ তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম যথা—১ম কেবল জ্ঞানী, ২য় নির্বাণী, ৩য় সাগর, ৪র্থ মহাযশ, ৫ম বিমলনাথ, ৬ষ্ঠ সর্বানুভূতি, ৭ম শ্রীধর, ৮ম দত্ত, ৯ম দামোদর, ১০ম সুতেজ, ১১শ স্বামী, ১২শ মুনিব্রত, ১৩শ সুমতি, ১৪শ শিবগতি, ১৫শ অস্তাগ, ১৬শ নেমীশ্বর, ১৭শ অনিল, ১৮শ যশোধর, ১৯শ কৃতার্থ, ২০শ জিনেশ্বর, ২১শ শুদ্ধমতি, ২২শ শিবকর, ২৩শ স্যন্দন, ২৪শ সংপ্রতি।

ইঁহাদের আর এখন সেরূপ প্রতিপত্তি নাই। বর্তমান অবসর্পিণীতে যাঁহারা তীর্থঙ্কর বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল। জৈন এই ২৪ জন তীর্থঙ্করকেই যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রাচীন জৈন আগমে এই ২৪ জনের বিবরণ ও শিষ্যাদির কথা বর্ণিত হইয়াছে। দিগম্বরেরা এই ২৪ জনের চরিত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই চতুর্বিংশ জৈনপুরাণ নামে খ্যাত। পিতামাতার নামসহ এই তীর্থঙ্করগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

(১) ঋষভনাথ—পিতা 'নাভি কুলকর,' মাতা 'মরুদেবী'।

(২) অজিতনাথ—পিতা 'জিতশত্রু' মাতা 'বিজয়'।

(৩) সম্ভবনাথ—পিতা 'জিতারি,' মাতা 'সেনা'।

(৪) অভিনন্দননাথ—পিতা 'সম্বর,' মাতা 'সিদ্ধার্থা'।

(৫) সুমতিস্বামী (নাথ)—পিতা 'মেঘ,' মাতা 'মঙ্গলা'।

(৬) পদ্মপ্রভ—পিতা 'ধর,' মাতা 'সুসীমা'।

(৭) সুপার্শ্বনাথ—পিতা 'প্রতিষ্ট,' মাতা 'পৃথ্বী'।

(৮) চন্দ্রপ্রভ—পিতা 'মহসেন,' মাতা 'লক্ষ্মণা'।

(৯) সুবিধিনাথ (পুষ্পদন্ত)—পিতা 'সুগ্রীব,' মাতা 'রামা'।

(১০) শীতলনাথ—পিতা 'দৃঢ়রথ,' মাতা 'নন্দা'।
(১১) শ্রেয়াংশনাথ—পিতা 'বিষ্ণু,' মাতা 'বিষ্ণুশ্রী'।
(১২) বাসুপূজ্য—পিতা 'বসুপূজ্য,' মাতা 'জয়া'।
(১৩) বিমলনাথ—পিতা 'কৃতবর্মা,' মাতা 'শ্যামা'।
(১৪) অনন্তনাথ—পিতা 'সিংহসেন,' মাতা 'যশা'।
(১৫) ধর্মনাথ—পিতা 'ভানু,' মাতা 'সুব্রতা'।
(১৬) শান্তিনাথ—পিতা 'বিশ্বসেন,' মাতা 'অচিরা'।
(১৭) কুন্থুনাথ—পিতা 'সুর,' মাতা 'শ্রী'।
(১৮) অরনাথ—পিতা 'সুদর্শন,' মাতা 'দেবী'।
(১৯) মল্লিনাথ—পিতা 'কুম্ভ,' মাতা 'প্রভাবতী'।
(২০) মুনিসুব্রত স্বামী—পিতা 'সুমিত্রা,' মাতা 'পদ্মবতী'।
(২১) নমিনাথ—পিতা 'বিজয়সেন,' মাতা 'বপ্রা'।
(২২) অরিষ্টনেমিনাথ—পিতা 'সমুদ্রবিজয়', মাতা 'শিবা'।
(২৩) পার্শ্বনাথ—পিতা 'অশ্বসেন,' মাতা 'বামা'।
(২৪) বর্ধমান স্বামী মহাবীর—পিতা 'সিদ্ধার্থ,' মাতা 'ত্রিশলা'।

এই ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে বিংশ এবং দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নাম 'হরিবংশ' এবং তাঁহাদের গোত্র 'গৌতম'। অবশিষ্ট ২২ জন তীর্থঙ্কর 'ইক্ষ্বাকুবংশে' উৎপন্ন হন, এবং তাঁহারা সকলেই 'কাশ্যপগোত্রী' ছিলেন।

বর্তমান জৈনগণ এই ২৪ জনের পূজাদি করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে 'অন্তিম জিন' মহাবীরের পূজোৎসব বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। মহাবীর স্বামী 'ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম' নামক নগরে বিক্রমসংবতের ৫৪২ বর্ষ পূর্বে শুদি ১৩ই মঙ্গলবারের রাত্রিতে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের প্রথম পদে জন্মগ্রহণ করেন। এই ক্ষত্রিয় কুণ্ডগ্রাম 'বেহার' প্রদেশের নিকটস্থ কুণ্ডলপুরের সমীপবর্তী স্থান। এক্ষণে মহাবীর স্বামী সাতটি নামে সাধারণত পরিচিত। প্রথম নাম 'বীর', বহুসূত্রে এই নামের উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় নাম 'চরমতীর্থকৃত'। ইহা কল্পাদিসূত্রে কথিত। তৃতীয় ও চতুর্থ নাম 'বর্ধমান' ও 'মহাবীর' সর্বত্র প্রসিদ্ধ। বহু শাস্ত্রগ্রন্থে ইহার পঞ্চম নাম 'দেবার্য' প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ষষ্ঠ নাম 'জ্ঞাতনন্দন' 'জ্ঞাতপুত' আচারাঙ্গ দশাশ্রুতস্কন্ধে লিখিত, সপ্তম নাম 'অন্তিমজিন'—হেমচন্দ্র সূরি ইঁহাকে এই নামে খ্যাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাবীর রাজা সিদ্ধার্থের পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম 'নন্দিবর্ধন', ভগিনীর নাম 'সুদর্শনা'। ইঁহার পত্নীর নাম 'যশোদা'। ইনি সিদ্ধার্থ রাজার সামন্ত কৌডিন্যগোত্রীয় সমরবীরের কন্যা। যশোদার গর্ভে মহাবীরস্বামীর 'প্রিয়দর্শনা' নামে এক কন্যা হইয়াছিল। এই কন্যাকে তিনি ক্ষত্রিয়কুণ্ড-নিবাসী 'জমালি' নামক এক ক্ষত্রিয় কুমারের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। মহাবীর ৩০ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিক্রমাব্দের ৫১২ বর্ষ পূর্বে মার্গশীর্ষ বদী দশমীর দিন উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে বিজয় মুহূর্তে চণ্ডপ্রভা শিবিকায় উপবেশন করিয়া নন্দিবর্ধনপ্রমুখ সহস্র জন পরিবৃত হইয়া মহোৎসবের সহিত দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পর ১২ বর্ষ ৬ মাস ১৫ দিন গত হইলে তিনি কেবল জ্ঞান লাভ করেন।

তীর্থঙ্করগণ অশেষ গুণশালী। তাঁহাদিগের ১ অনন্ত কেবল জ্ঞান, ২ অনন্ত কেবল দর্শন, ৩ অনন্ত চারিত্র, ৪ অনন্ত তপ, ৫ ৫ অনন্ত বীর্য, ৬ অনন্ত পাঁচলব্ধি, ৭ ক্ষমা, ৮ নির্লোভতা, ৯ সরলতা, ১০ নিরভিমানতা, ১১ লাঘবতা, ১২ সত্য, ১৩ সংযম, ১৪ নিরির্যকতা, ১৫ ব্রহ্মচর্য, ১৬ দয়া, ১৭ পরোপকারতা, ১৮ রাগদ্বেষশূন্যতা, ১৯ শত্রুমিত্রভাবরহিততা, ২০ লোষ্ট্রকাঞ্চনসমভাব, ২১ স্ত্রী ও তৃণের প্রতি সমভাব, ২২ মাংসাহারহীনতা, ২৩ মদিরা পানশূন্যতা, ২৪ প্রভক্ষ্যভক্ষণশূন্যতা, ২৫ অগম্যগমনশূন্যতা, ২৬ করুণাসমুদ্র, ২৭ সূরত্ব, ২৮ বীরত্ব, ২৯ ধীরত্ব, ৩০ অক্ষোভ্যতা, ৩১ পরনিন্দাহীনতা, ৩২ আত্মস্তুতিহীনতা, ৩৩ বিরোধকারীর মুক্তিস্পৃহা-

শীলতা ইত্যাদি গুণ সতত বিদ্যমান বলিয়া জৈনগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

মহাবীরের, গৌতম বা ইন্দ্রভূতি ও সুধর্মাস্বামী নামে দুইজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। মহাবীর ও ইন্দ্রভূতির দেহত্যাগের পর, সুধর্মাস্বামী আবার জম্বুস্বামীকে উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে জম্বু, প্রভব, শয্যম্ভব, যশোভদ্র, সম্ভূতিবিজয় ও ভদ্রবাহু পরম্পরের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন ও সকলে শ্রুতকেবলী নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তৎপরে পাটলিপুত্রের সঙ্ঘে স্থূলভদ্র আচার্য বা পট্টধর বলিয়া বিখ্যাত হন। জৈনদিগের তপাগচ্ছ পট্টাবলী গ্রন্থে স্থূলভদ্রের পূর্ববর্তী কেবলী ও পরবর্তী পট্টধরগণের ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তবে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর, সম্প্রদায়ভেদে দুই প্রকার গ্রন্থে দুই প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

শ্বেতাম্বরদিগের গ্রন্থ ও খরতরগচ্ছের পট্টাবলী

শ্বেতাম্বর জৈনেরা বলিয়া থাকেন, আবশ্যকসূত্র, বীরচরিত্র ও বৃহৎকল্পাদি শাস্ত্রে মহাবীরের সময়ের আচার-ব্যবহার ও রাজগণের বিবরণ লিখিত আছে। তপাগচ্ছ পট্টাবলীর মতে ৬৯ জন পট্টাচার্য ছিলেন। সকলের বিবরণ প্রকাশ না করিয়া তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ পট্টাচার্যগণের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। মহাবীরের পর তৎশিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভূতির পট্টাচার্য কথা।

দিগম্বরদিগের গ্রন্থ ও সরস্বতী-গচ্ছের পট্টাবলী

দিগম্বর জৈনেরা গুরু-পরম্পরা সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। পূর্বে জৈন ধর্মসাহিত্যের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন গ্রন্থাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থ

শ্বেতাম্বরদিগের প্রিয়, কিন্তু আধুনিক দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈনগণ তাঁহাদের অন্যরূপ বিভাগ করিয়াছেন। দিগম্বরদিগের ধর্মগ্রন্থ প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—অঙ্গ, পূর্ব ও অঙ্গবাহ্য।

অঙ্গ দ্বাদশ প্রকার—(১) আচারাঙ্গ, সন্ন্যাসীদিগের কথা। (২) সুত্রকৃতাঙ্গ—প্রায়শ্চিত্ত বিধি। (৩) স্থানাঙ্গ। (৪) সমবায়াঙ্গ—গণনা দ্বারা বিভাগ। (৫) ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্ত্যঙ্গ—জীবের অস্তিত্ব বিচার। (৬) জ্ঞাতৃধর্মকথাঙ্গ—তীর্থঙ্কর এবং গণধরদিগের কথোপকথন। (৭) উপাসকদশাঙ্গ—ব্রতাদি আচরণের বিষয়। (৮) অন্তকৃদ্দশাঙ্গ—২৪ জন তীর্থঙ্করের প্রত্যেকের পদ্ধতি অনুসারে ১০ জন কেবলীর ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। (৯) অনুত্তরৌপপাতিকাঙ্গ—প্রতি তীর্থঙ্করের নিয়মানুসারে ৩০ জন যোগীর ইতিহাস আছে। (১০) প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ। (১১) বিপাকসূত্রাঙ্গ—কর্মফলের ব্যাখ্যা। (১২) দৃষ্টিবাদ—ক্রিয়াবাদী ও অন্যান্যদিগের ইতিবৃত্ত। ইহা পাঁচ অংশে বিভক্ত, পরিকর্ম, সূত্র, প্রথমানুযোগ, পূর্বগত ও চুলিকা—ইহাতে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, ভারত, নদ, নদী ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব চতুর্দশ প্রকার—ইহাতে বস্তুবিচার অঙ্গবাহ্য ১৪ খানি, অশিক্ষিত সাধারণ লোকের নিমিত্ত এগুলি রচিত হইয়াছে।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মত

শ্বেতাম্বরগণ বলেন যে, প্রকৃত জৈন হইতে হইলে নিম্নের কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক।

(১) তত্ত্বস্বরূপ—যে অষ্টাদশ গুণ থাকিলে জৈন পদবাচ্য হইতে পারে সেই গুণকেই তত্ত্বস্বরূপ বা দেবতাস্বরূপ বলা হইয়া থাকে।

(২) কুদেবস্বরূপ—কাম, ক্রোধ, ছল, ধূর্ততা, স্বস্ত্রীগমন,

পরস্ত্রীগমন, নৃত্য, গান, ভস্ম-ধারণ, মালাজপকরণ, ইত্যাদিকে কুদেব বলা হইয়া থাকে।

(৩) গুরুর স্বরূপ—যিনি অহিংসাদি পঞ্চমহাব্রত ধারণ ও পালন করেন, আপদে ও বিপদে যিনি বীর, ধর্ম ও শরীর রক্ষার্থ ভিক্ষা আহরণ করিয়া থাকেন, সদা ধর্মাচরণ করেন, রাগদ্বেষাদি রহিত হইয়া জৈনধর্মের উপদেশ প্রদান করেন, তিনি গুরুপদবাচ্য।

(৪) কুগুরুস্বরূপ—যে সকল বিষয়ের অভিলাষ করে, সর্বদ্রব্য ভোজন করে, পুত্রকলত্রাদির সহিত বাস করে, ব্রহ্মচর্য করে না, এবং মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকে, তাহাকে কুগুরু বলা যায়।

(৫) ধর্মতত্ত্বস্বরূপ—ধর্ম তিন প্রকার, যথা—সম্যক্-জ্ঞান, সম্যক্-দর্শন, সম্যক্-চরিত্র।

(ক) সম্যক্-জ্ঞান—ন্যায় প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে সপ্ত বা নবতত্ত্ব, তাহার যে সম্যক্ বোধ তাহার নাম সম্যক্ জ্ঞান।

নবতত্ত্বের মধ্যে জীব প্রথম। জৈনমতে আত্মা, জীব বা প্রাণী অভিন্ন। জীব আবার দুই প্রকার; মুক্ত ও সংসারী, এতদুভয়ই অনাদি অনন্ত, জ্ঞান দর্শন উভয়ের লক্ষণ। তন্মধ্যে মুক্তজীব এক-স্বভাব, নির্বিকার ও জ্যোতিঃস্বরূপ। আর সংসারী জীব দুই প্রকার, স্থাবর এবং ত্রস। ক্ষিত্যাদি পঞ্চকায় অনুসারে আবার স্থাবর পঞ্চবিধ, ইহারা প্রধানত একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট। ত্রস জীব, ইন্দ্রিয়ভেদে চারি প্রকার। এই উভয় জীবের ছয় পর্যাপ্তি—আহার, শরীর, ইন্দ্রিয়, শ্বাস, ভাষা ও মন। ইহারা জঘন্য মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন প্রকার। জীবলক্ষণের বিপরীত জড়স্বরূপকে অজীব বলে। জীবের সম্পূর্ণ জ্ঞানাবরণাদি কর্মক্ষয় হইলে যে স্বরূপাবস্থা আসে, তাহার নাম মোক্ষ।

(খ) সম্যক্-দর্শন—দুই প্রকার, ব্যবহার ও নিশ্চয়ভেদে উহার আবার তিনটি তত্ত্ব আছে, দেবতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব। ঐ সকল বিষয়ে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে তিনি সম্যক্ত্ববান্ হইতে পারেন।

(গ) সম্যক্-চরিত্র দুই প্রকার, সর্বচরিত্র ও দেশচরিত্র—ইহা গুরুতত্ত্বের অন্তর্গত।

(৬) শ্রাবকাচার। জৈন গৃহস্থের নিত্যকর্মের নাম শ্রাবকাচার। ইহার বিবরণ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

দিগম্বর মত

মহাবীর নির্বাণের ৬০৯ বৎসর পরে (৮৩ খ্রীস্টাব্দে) দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ কুন্দ কুলদাচার্যের গ্রন্থাবলী প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে।

জৈনধর্ম প্রচারের জন্য কমলপালের আদেশে হেমরাজ এই পুস্তকের একখানি হিন্দী ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। সটীক প্রবচনসার, প্রশ্নোত্তরোপাশবাচার, তত্ত্বার্থসার ও জৈনসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ দিগম্বরদিগের মত-প্রতিপাদ্য প্রধান গ্রন্থ।

ইঁহাদের মতে, তীর্থঙ্কর, সিদ্ধ ও শ্রমন্‌দিগকে অতিশয় মান্য করা উচিত ; পরমেষ্টিদিগকে অর্চনা করিয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জীব আত্মা চরিত্রদ্বারা মানব ও অসুরদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে ও নির্বাণ লাভ করিতে পারে। ইহাদের মতে আত্মা তিন প্রকার—বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। আত্মার তিন প্রকার উন্নতি। জীব, দান অর্চনা উপবাসাদির দ্বারা শুভ ও বিপরীত আচরণদ্বারা অশুভ প্রাপ্ত হয়। বাসনাশূন্য হইয়া উন্নত ও পরিবর্তিত হইলে পবিত্র সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জীব যখন অন্তরে পবিত্র ও শুদ্ধভাব ধারণ করে, তখন আত্মা ধর্মে পরিণত হইয়া নির্বাণপ্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানের প্রকারভেদ

জৈনমতে জ্ঞান পাঁচ প্রকার। যথা—(১) মতিজ্ঞান, (২) শ্রুতি জ্ঞান, (৩) অবধিজ্ঞান, (৪) মনপর্যজ্ঞান, (৫) কেবল-জ্ঞান।

জৈন 'গণধর'

যাঁহারা পূর্বজন্মে শুভকর্ম করিয়া গণধর হইবার উপযোগী পুণ্য উপার্জন করেন তাঁহারা মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া তীর্থঙ্করের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, অথবা তীর্থঙ্কর অর্থাৎ যখন কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তৎকালে গণধরগণ তাঁহার নিকট দীক্ষিত এবং প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হন। ইঁহারা তীর্থঙ্করের মুখ হইতে ত্রিপদী শুনিয়া চারি প্রকার জ্ঞানের ধারক হইয়া সাধুদিগের সমুদায় রূপগণের ধারণ করেন। এই নিমিত্ত তীর্থঙ্কর তাঁহাদিগকে 'গণধর' পদ দিয়া থাকেন। মহাবীর স্বামীর এইরূপ ১১ জন গণধর হইয়াছিল।

সঙ্ঘ

সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক, শ্রাবিকা—এই চারিটি জৈনমতে সঙ্ঘ নামে অভিহিত। মহাবীর স্বামীর সঙ্ঘে 'ইন্দ্রভূতি গৌতমস্বামী' প্রধান সাধু। চম্পা নগরীর দধিবাহন রাজার কন্যা 'চন্দনবালা' প্রসিদ্ধ সাধ্বী। শ্রাবস্তি নগরীবাসী 'সঙ্ঘ' ও শতক মুখ্যশ্রাবক এবং রাজগৃহের প্রসেনজিৎ রাজার 'নাগ' নামক সারথীর ভার্যা 'সুলসা' ও 'রেবতী' নাম্নী মেন্টিকা গ্রামবাসিনী কোন ধনাঢ্যপত্নী এই দুইজন প্রধান শ্রাবিকা ছিলেন।

সাধুধর্ম

"অহিংসা সত্য অস্তেয় মৈথুনবর্জনং পরিগ্রহ" "সর্বসাবদ্য যোগানাং ত্যাগশ্চারিত্রমিষ্যতে।"

কীর্তিতং তদাহিংসাদি
ব্রতভেদেন পঞ্চধা ॥
যোগশাস্ত্র ॥ ১৮

অহিংসা সত্যমস্তেয়
ব্রহ্মচর্য পরিগ্রহাঃ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চাভিযুক্তা
ভাবনাবিমুক্তয়ে॥ ১৯

ইত্যাদি শ্লোকে পঞ্চমহাব্রতের উল্লেখাদি দৃষ্ট হয়।

এইরূপ—"দুর্গতি প্রপতৎপ্রাণি
ধারণাৎ ধর্ম উচ্যতে।
সংযমাদি দশবিধঃ
সর্বজ্ঞোক্তোবিমুক্তয়ে॥"

"জ্ঞানদর্শন চরিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ" "জ্ঞানশ্রদ্ধান চরিত্ররূপং রত্নত্রয়ং" ইত্যাদি শ্লোকে সংযমাদি ধর্মের বিবৃতি আছে। সাধুগণ পঞ্চমহাব্রত, দশ প্রকার যতিধর্ম এবং ৭০ প্রকার সংযম পালন করিয়া থাকেন এবং আদৌ রাত্রি ভোজন করেন না। ইহারা ৪২ প্রকার দোষরহিত ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্রাবকধর্ম

পক্ষান্তরে শ্রাবকগণ এই কয়েকটি নিয়ম সর্বথা পালন করিয়া থাকেন। ১। ত্রাসযুক্ত জীবের হিংসা পরিত্যাগ। ২। বড় বড় মিথ্যা অর্থাৎ যে মিথ্যাদ্বারা রাজদণ্ড প্রাপ্তি এবং সংসারে মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হয় তাহা ত্যাগ। ৩। এইরূপ চৌর্যত্যাগ। ৪। পরস্ত্রীত্যাগ। ৫। পরিগ্রহ প্রমাণ। ভোগ পরিভোগের পরিমাণ করিয়া কার্য। ২২ অভেক্ষ্য বস্তু এবং ৩২ অনন্তকার ত্যাগ। ১৫ প্রকার অন্যায় বাণিজ্য ব্যাপার ত্যাগ। বিনা প্রয়োজনে পাপ না করা। দেশাবকাশিক ও সাময়িক করা। দান দেওয়া, ত্রিকাল-দেবের পূজা করা।

জন্ম মরণাদি সংসার ভ্রমণরূপ দুঃখ হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত সাধু ও শ্রাবকদিগের পূর্বোক্ত ধর্ম প্রতিপালন করা জৈন মতে নিতান্ত কর্তব্য।

রামানন্দী সম্প্রদায়

রামানন্দী সম্প্রদায় উত্তর ভারতের বিশিষ্ট বৈষ্ণবসম্প্রদায়। ইহারা সংখ্যায় ১৫ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ। এই সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা রামানন্দ। ইনি রামানুজ হইতে পঞ্চম গুরু। ভক্তমালে পরম্পরায় পাঁচজন গুরুর উল্লেখ আছে—(১) রামানুজ, (২) দেবাচার্য, (৩) হর্যানন্দ, (৪) রাঘবানন্দ, (৫) রামানন্দ। উত্তর ভারতের রামানন্দ সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকার মধ্যে রাঘবানন্দের নামই অধিক প্রসিদ্ধ। রামানুজের প্রবর্তিত শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে এই রাঘবানন্দই সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া বারাণসীতে বসবাস আরম্ভ করেন। কল্যব্দের ৪৪০০ বা ১২৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রয়াগে রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রয়াগ বর্তমান এলাহাবাদ। তাঁহার পিতার নাম পুণ্যসদন, ভূরিবর্মা বা দেবল ; তিনি কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম সুশীলা। বালকের নামকরণ হয় রামদত্ত। রামদত্তের বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাহার জ্ঞান-শক্তির বিশেষ বিকাশ হইতে লাগিল। বারো বছর বয়সেই রামদত্ত পণ্ডিত আখ্যা পাইলেন এবং বারাণসীতে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গমন করিলেন। বারাণসীতে একজন স্মার্ত পণ্ডিতের মতবাদে আসক্ত হইয়া তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন। একদিন রাঘবানন্দের সহিত ইঁহার দেখা হয়। এই রাঘবানন্দ ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। রাঘবানন্দ বলেন, তোমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে ; তুমি এখনও হরির (রামের) চরণে আত্মসমর্পণ কর নাই, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

রামদত্ত এই কথা তাঁহার স্মার্ত গুরুর নিকট প্রকাশ করিলেন। স্মার্ত গুরু একথা স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন—আমার দ্বারা ইহার প্রতিকার হইবে না। রামদত্ত তখন রাঘবানন্দেরই আশ্রয়

লইলেন। তিনি শ্রীবৈষ্ণবদের মন্ত্রে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন, এবং তাঁহার নাম রামানন্দ রাখিলেন। রাঘবানন্দ তাঁহাকে যোগ শিক্ষা দিলেন। মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে তিনি যোগনিদ্রা বা সমাধি অবস্থায় অবস্থান করেন। যমদূত তাঁহাকে মৃত দেখিয়া চলিয়া যায়, তাঁহার কোনও অনিষ্টই হয় না। রামানন্দ সমাধি অবস্থা হইতে উঠিয়া রাঘবানন্দের কাছে আলোচনার জন্য আপনাকে নিয়োজিত করেন। রাঘবানন্দ আশীর্বাদ করিয়া দীর্ঘজীবন দান করেন। কিছুদিনের জন্য গুরুসেবা করিয়া তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হন এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। তিনি গঙ্গাসাগরে ও কপিলমুনির আশ্রম অবধি আসিয়াছিলেন, এরূপ কথা ওদেশে প্রচলিত আছে। তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া তিনি বারাণসীতে ফিরিয়া আসেন ও পঞ্চ-গঙ্গাঘাটে অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। এখনও ভক্তেরা সেখানে তাঁহার পদচিহ্ন পান।

রাঘবানন্দ ও রামানন্দ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ঐ সম্প্রদায়ে গুরুর পদ ব্রাহ্মণদেরই ছিল। উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে নিয়ম খুব কড়াকড়ি ছিল। রামানন্দ তীর্থভ্রমণ করিয়া আসিয়াই এই সমস্ত কড়াকড়ি আর চাহিলেন না। কাজেই গুরু রাঘবানন্দের সহিত মতের অমিল হইতে লাগিল। ইহার ফলে মনোমালিন্যও আরম্ভ হইল। উত্তর ভারতের ধর্মের ইতিহাসে ইহা অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত এই হইল যে, রামানন্দ আলাদা সম্প্রদায় গঠন করিতে পারেন। রামানন্দ গুরুবাক্য মান্য করিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। এই সম্প্রদায়ই রামাৎ সম্প্রদায় বা রাঘবানন্দী সম্প্রদায় বলিয়া বিখ্যাত। রামানন্দের দার্শনিক মত রামানুজেরই মতন। কিন্তু রামানুজ তাহার দর্শন সংস্কৃতে ব্রাহ্মণদের জন্যই লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার আনুষ্ঠানিক বিশুদ্ধ পদ্ধতিও কঠোর ছিল। রামানন্দ এই সাম্প্রদায়িক অস্পৃশ্যতা না মানিয়া সকলকেই নিজের দলে টানিয়া লইলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক গর্ব

ছিল না, আধ্যাত্মিক দীনতা ছিল। রামানন্দের শিষ্যেরা তাঁহার মতবাদ বহু উর্ধ্বে প্রসারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতবাদের প্রধান দুটি কথা এই :—(১) ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাস ও প্রেম এবং ভগবদ্ভক্ত সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের সকলেই ভাই ভাই। রামানন্দ তাঁহার মতাবলম্বীদের অবধূত বলিতেন। কারণ, তাঁহাদের কাহারও মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তাঁহার অন্যতম শিষ্য 'কবীর'ও উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার এই উদার মত সম্পূর্ণভাবেই প্রসার লাভ করিয়াছিল। হিন্দুস্থানের জনসাধারণ তাঁহার এই উদার মত তুলসীদাসের মধ্য দিয়াও পরে গ্রহণ করিয়াছিল। রামানন্দের মতবাদের বা উপদেশের বিশেষত্ব এই যে, জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি তাঁহার উপদেশ দিতেন। শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায় শুধু ব্রাহ্মণদেরই গ্রহণ করিতেন। রামানন্দ বলিতেন,—

"পাতি জতি পুঁছাই নেহি কই
হরিকু ভজাই সো হরিকো হই।"

হরি বিষ্ণুরই নামান্তর। আবার শ্রীরামচন্দ্রও বিষ্ণুর অবতার। রামানন্দী সম্প্রদায়ের মন্ত্র শ্রীরাম। জয় রাম, জয় শ্রীরাম, সীতারাম প্রভৃতি বলিয়া তাহারা অভিবাদন করে। রামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন,—(১) অনন্তানন্দ, (২) সুখানন্দ, (৩) সুরাসুরানন্দ, (৪) নরহরি আনন্দ, (৫) পিপা, (৬) কবীর, (৭) ভবানন্দ, (৮) সেন, (৯). ধন, (১০) রাইদাস, (১১) পদ্মাবতী, (১২) সুরাসরী।

ইঁহাদের মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশ নারী। পদ্মাবতী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সুরাসরী সুরাসুরানন্দের স্ত্রী ছিলেন। ভক্তমালে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। তিনি বনের মধ্যে একাকিনী প্রার্থনায় নিমগ্না ছিলেন, এমন সময় মুসলমান দস্যুরা তাঁহাকে আক্রমণ করে। সেই সময় শ্রীরামচন্দ্র সিংহবেশ ধারণ করিয়া দস্যু কবল হইতে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সুরাসরীকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অনন্তানন্দই রামানন্দের সর্বপ্রথম শিষ্য। যোধপুরের রাজাকে তিনি এই ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি সত্বরে বন্ধ্যা ডুমুর বৃক্ষের অলৌকিকত্ব দেখিয়া ইঁহাদের মতাবলম্বী হন। এই অনন্তানন্দেরই পৌত্র ভক্তমালের নাভাদাস।

সুখানন্দ একজন কবি ছিলেন। তাঁহার স্তোত্রাদি প্রসিদ্ধ। 'সুখসাগর' বলিয়া তাহা সংগৃহীত হইয়াছে।

সুরাসুরানন্দ ধর্মবিশ্বাসের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ইনিই সুরাসরীর স্বামী। ভক্তমাল গ্রন্থে ইঁহার সম্বন্ধেও সুন্দর গল্প আছে। কোন মুসলমান গোপনে পিষ্টকের সঙ্গে মাংস দিয়া সুরাসুরানন্দকে খাইতে দেয়। দেবতার উদ্দেশ্যে দেওয়া বলিয়া তিনি ঐ পিষ্টক আহার করেন। শিষ্যেরাও তাঁহার প্রসাদ পাইয়াছিলেন। মুসলমানটি শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করিল যে, পিষ্টকের সঙ্গে মাংস ছিল, তাহা তাহারা খাইয়াছে। শিষ্যেরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া গুরু সন্নিধানে উপনীত হইলেন। গুরু বলিলেন, তোমরা শ্রদ্ধাসহকারে দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছ, তোমরা বমি করিয়া ঐ অপবিত্র আহার্য তুলিয়া ফেল। তাহারা বমি করিল, মাংস মুখ হইতে নির্গত হইল। তারপর তিনি নিজে বমি করিলেন। শিষ্যেরা দেখিল, সেই অপবিত্র মাংস তুলসীপত্রে পরিণত হইয়াছে।

নরহরি আনন্দ সম্বন্ধেও এইরূপ কৌতুকপ্রদ আখ্যায়িকা আছে। একদিন একদল সাধুর আহারের আয়োজনের জন্য জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব হয়। তখন তিনি একখানি কুঠার লইয়া কোনও দেবীর মন্দির হইতে যথেষ্ট কাঠ আহরণ করেন। দেবী তাঁহাকে কথা দেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত কাষ্ঠ যোগাইবেন। একজন প্রতিবেশী এই কথা শুনিতে পাইয়া সেও এইরূপে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে যায়। দেবী তাহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেন। লোকজন যখন আসিয়া দেখিল, তখন সে দেবীর মন্দিরের দ্বারদেশে পড়িয়া আছে; সে মৃত। আজীবন সে

নরহরির কাঠ যোগাইবে, এই বলিয়া তিনি তাহাকে পুনর্জীবিত করেন।

পিপা গগারাওন নামক স্থানের রাজপুত রাজা। তিনি দেবীর পূজক ছিলেন। দেবীই স্বপ্নে তাঁহাকে আদেশ দেন যে, তুমি রামানন্দের শিষ্য হও। রামানন্দ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। যোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁহার কোনও সংস্রব নাই, তিনি তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পিপা ছাড়িলেন না। রামানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি কূপে পতিত হও। পিপা তখনই আদেশ প্রতিপালন করিলেন। রামানন্দেরই বাড়ীর কূপে তিনি নিমজ্জিত হইবার চেষ্টা করিলেন। অতিকষ্টে তাঁহাকে রক্ষা করা হইল। রামানন্দ তখন দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বের শিক্ষানবীশরূপে গ্রহণ করিলেন। এক বছর এইভাবে রাখিয়া তাঁহাকে শিষ্যভাবে গ্রহণ করেন। পূর্বতন সকল সংস্রব তিনি ত্যাগ করেন। পারিবারিক বাধা সত্ত্বেও তিনি রামানন্দের সঙ্গে দ্বারকায় তীর্থযাত্রা করেন। পতিব্রতা অন্যতমা পত্নী সীতা সহচরীকে তিনি সঙ্গে লইতে বাধ্য হন।

ভক্তমালে পিপা ও তাঁহার স্ত্রী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সীতা সহচারী সম্বন্ধেও দুই তিনটি গল্প আছে। সতী সাধ্বী নারী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। সতীর রক্ষার জন্য অনেক অলৌকিক শক্তির আশ্রয় তিনি পাইয়াছিলেন।

কবীর মুসলমান তাঁতী ছিলেন। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানকসাহ কবীরের মধ্য দিয়া রামানন্দের মত প্রচার করেন।

ভক্তমালে ভবানন্দ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। অন্য কোথায়ও এখন পর্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। 'সেন' জাতিতে নাপিত ছিল।

'ধন' একজন সরলচিত্ত কৃষক ছিল। জাতিতে সে জাঠ ছিল। জাঠ কৃষকেরা অশিষ্টতার জন্য বিখ্যাত। ভক্তমালে লেখা আছে,

একদিন কয়েক জন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ধনের কাছে আহার্য প্রার্থনা করে। তাঁহার ঘরে বীজের জন্য যা কিছু সামান্য শস্য ছিল, তাহা দিয়াই তিনি সন্ন্যাসী সৎকার করেন। এইরূপ সদনুষ্ঠানে যে তাঁহার সঞ্চিত বীজ নিঃশেষ হইল, পাছে পিতামাতা ইহা জানিতে পারিলে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে তিনি মাঠে যাইয়া চাষ করিয়া বীজ বপন করিলেন, এইরূপ প্রচার করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রতিবেশীরা জানিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাহারা একসময় এই ব্যাপারের জন্য হাসিয়াছিল, তাহারা দেখিল, তাহাদের ক্ষেতের চেয়ে ধনের ক্ষেতের শস্য ভাল হইয়াছে। আর একবার এক ব্রাহ্মণ শালগ্রাম পূজা করিতেছিল, 'ধনা' সরলভাবে শালগ্রামটা পূজার জন্য চাহিল। অন্যান্যেরা বিরক্ত হইয়া একটা পাথরের নুড়ি দিয়া ধনাকে বলিল, নে তোর শালগ্রাম, পূজা করগে। ধনা এই পাথরের নুড়িকেই শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মনে করিয়া নিয়া বাড়ীতে লইয়া গেল এবং তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল। জাঠ বালকের এই সরলতায় ভগবান মুগ্ধ হইলেন এবং রামচন্দ্র জাঠমূর্তি ধরিয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে লাঙ্গল চাষ করিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি তাঁহাকে বারাণসী পাঠাইয়া দেন এবং রামানন্দের শিষ্য হইতে বলেন। ধনা বারাণসীতে যাইয়া তাঁহার উপদেশ লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হন। আবার সেই হলকর্ষককে দেখিতে পান। এবারে তাঁহার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইনিই স্বয়ং রামচন্দ্র। রামচন্দ্র তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় লইলেন। ধনা গৃহেতেই রহিল এবং ভগবানের আরাধনা করিতে অভিনিবিষ্ট রহিলেন। 'রামদাস' জাতিতে চামার ছিলেন।

যদিও রামানন্দী দ্বাদশ শিষ্যের এই গল্প-গুজবের মধ্যে বালকোচিত উপকথা আছে, তাহা হইলেও এই সম্প্রদায় যে স্ত্রী পুরুষ, উচ্চ নীচ সকলকে একচক্ষে দেখিত, তাহার বেশ সুস্পষ্ট

প্রমাণ পাওয়া যায় এই বার জন শিষ্যের মধ্যে অনন্তানন্দ ও সুখানন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন, একজন মুসলমান, একজন সৈনিক, একজন নাপিত, একজন অশিষ্ট জাঠ এবং নীচাদপি নীচ চামার রামদাস পর্যন্ত তাঁহার শিষ্য ছিল। দুইজন স্ত্রীলোককেও তিনি শিষ্যপদে বরণ করেন। রামানন্দই মাত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী শিষ্য গ্রহণ করেন।

রামানন্দীরা বিশ্বাস করে, রামানন্দ স্বয়ং রামচন্দ্রের অবতার, অনন্তানন্দ ব্রহ্মার অবতার, সুখানন্দ শিবের অবতার, সুরাসুরানন্দ নারদের অবতার, কবীর প্রহ্লাদের অবতার, সেন ভীষ্মের অবতার, রাইদাস যমের অবতার ইত্যাদি। রামনামের আনন্দে যেমন রামানন্দ, সেইরূপ হয়ত পিপানন্দ, সেনানন্দ, ধনানন্দ। রামানুজের ধর্মমত সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ, উহা এমনভাবে লিখিত যে, উহা পণ্ডিতেরাই বুঝিতে পারেন। রামানন্দের শিষ্যেরা কেহই সংস্কৃতে অভিজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহারা সমাজের নিরক্ষর বা সাধারণ লোক। উহার শিষ্যেরাও শ্রোত্রাদি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাও হিন্দীতে লিখিয়াছেন, রামানন্দ নিজে খুবই কমই লিখিয়াছেন। অন্তত এখন পর্যন্ত রামানন্দের লেখা যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশেষ কিছুই নহে। কবীর হিন্দী ভাষায় তাঁহার ধর্মমত যথেষ্ট লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রামানন্দ ও তাঁহার শিষ্যদের জন্যই হিন্দীভাষা সাহিত্যের ভাষা হইয়াছে। তুলসীদাস রামানন্দী সম্প্রদায়ের লোক। তিনি অমূল্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুস্থানী ভাষা সেজন্যও রামানন্দের কাছে ঋণী। রামানন্দ ১২৯৯ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু-তারিখ সম্বন্ধে একটু গোলমাল আছে। কিংবদন্তী এই যে, তিনি ১৪৬৭ সংবৎ বা ১৪১০ খ্রীস্টাব্দে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি ১১১ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। ভক্তমালে লেখা আছে, তিনি দীর্ঘজীবন পাইয়াছিলেন। তিনি

চতুর্দশ শতাব্দীর বেশীর ভাগ সময়ই বাঁচিয়াছিলেন। খিল্জী-বংশের শেষ রাজার তিনি সমসাময়িক এবং তোগলক-পরিবারেও প্রায় সকল রাজার তিনি সমসাময়িক। আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক দিল্লীর প্রসিদ্ধ লুঠ-তরাজের সময় তিনি যুবক মাত্র। তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থায় মহম্মদ-তোগলকের উন্মত্তবৎ স্বেচ্ছাচারিতায় দেশ সন্ত্রস্ত ছিল। যদি তিনি ৯৯ বৎসরও বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ ও দিল্লীর লুণ্ঠন ও হত্যা ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব ও অন্যায় নহে যে, ভারতের সেই বিপৎপাতের উপর বিপৎপাতে বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শ নৃপতি ধার্মিক রামচন্দ্রের নামে রামানন্দ ভয়ার্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে তাঁহার মতবাদে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন।

রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে কবীর, সেন ও রাইদাস তিনটি শাখা সম্প্রদায় গঠন করেন। অন্যান্যেরা রামানন্দের মতবাদের সঙ্গে একমত হইয়া চলিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে কবীরপন্থীরা সত্য সত্যই পৃথক সম্প্রদায়। রামানন্দ ও তাঁহার শিষ্যগণের এই প্রচারের দ্বারাই সমগ্র হিন্দুস্থানী ভাষাভাষীদের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র এত বেশী পূজা পাইতেছেন যে রাধাবল্লভীর বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রীরামচন্দ্রের প্রচার বেশী হইয়াছে।

নাথপন্থ

নাথপন্থ নামে একটি বড় ধর্মসম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষে [১] প্রথমে বঙ্গদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করে। তারপর ক্রমশ পূর্বভারতে, পশ্চিম-, মধ্য- ও দক্ষিণ-ভারতে নাথ সম্প্রদায় ধর্মপ্রচার করিয়া শিষ্য-শাখার পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। সাধারণত পণ্ডিতদিগের ধারণা যে, নাথপন্থীদের প্রাদুর্ভাব কবীর ও নানকের সময় হইয়াছিল।[২] ইহার পূর্বে যে নাথদের অস্তিত্ব ছিল, একথা পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই এতদিন মানিতে ছিলেন না। নাথদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। তিব্বতীয় গ্রন্থমালার প্রমাণে রুশদেশীয় পণ্ডিত ভাসিলীফ (Wasilief) স্থির করিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথ খ্রীস্ট জন্মের আটশত বৎসরের পরবর্তী ছিলেন। তিব্বতীদের মতে গোরক্ষনাথ প্রাচীন ধর্মগুরু হইলেও, বস্তুত এত প্রাচীন ছিলেন না। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, মৎস্যেন্দ্র বা মচ্ছেন্দ্রনাথের ২২ জন (কাহারও কাহারও মতে ১২ জন) শিষ্যের মধ্যে প্রধান ছিলেন গোরক্ষনাথ। মৎস্যেন্দ্রনাথ আদিনাথের শিষ্য ছিলেন। তারপর গুরুপরম্পরা লইয়া গোলমাল। মচ্ছেন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ। তারপর ধর্মনাথ। ধরমনাথ পেশওয়ার

১ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, অষ্টম শতকের শেষে নাথধর্ম বঙ্গে প্রবর্তিত হয় (বঙ্গীয় সাহিত্যে সম্মেলন, ৮ম অধিবেশন, কার্যবিবরণ ২১-২২ পৃষ্ঠা)। পূর্বে তিনি লুইপাদের সময় নিরূপণ অনুসারে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। লুইপাদ যে সে সময়ের লোক নন, পরবর্তিকালের —তাহা তিনি পরে স্থির করিয়াছেন।

২ Sir Charles Eliot (Hinduism and Buddhism, 1921, vol. ii. p. 117) বলেন যে চতুর্দশ শতকে নাথদের প্রাদুর্ভাব হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই তাঁহাদিগকে সম্মান করিত।

হইতে কাটিয়াবাড়ে আগমন করেন। অতঃপর তপ করিবার জন্য কচ্ছদেশে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে সরন্ননাথ নামে একজন সাধক ছিলেন। আরও একজন শিষ্য ছিলেন—নাম গরীবনাথ। কচ্ছপ্রদেশের অন্তর্গত ধিনোধরের নাথপন্থীদের নিকট মচ্ছেন্দ্রনাথের গুরুপরম্পরা পাওয়া যায়। তদনুসারে—

প্রথম গুরু	নিরঞ্জন নিরাকার
দ্বিতীয়	অধিক সোমনাথ
তৃতীয়	চেৎ সোমনাথ
চতুর্থ	ওঁকারনাথ
পঞ্চম	অচেৎনাথ
ষষ্ঠ	আদিনাথ
সপ্তম	মচ্ছেন্দ্রনাথ

এই মচ্ছেন্দ্র সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া, বহু তীর্থে বাস করিয়া অনেক শিষ্য করেন। নেপালীরা ইঁহাকে ও আর্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বকে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে (Hodgson's Essays, Trubner's reprint, vol. ii. p 40)।

পঞ্জাবে ও নেপালে সন্তনাথের মন্দির আছে। এই দুই স্থানে ইঁহার পূজা হয়। ধরমনাথ সন্তনাথ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইনি ১৪৩৮ খ্রীস্টাব্দে যে বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। রীঞা নামক গ্রামে রাও ভারমলজী নির্মিত মন্দিরগাত্রে একটি লিপি আছে, তাহাতে লেখা আছে—

সংবৎ ১৬৬৫ না বরষে কারতক সুদ
১৯ পীর শ্রী
ভীষারীনাথ পীয়া হুআ পীরপন্থ
নাথনা চেলা পীর ভী-
ষরীনা চেলা পীর পরভাতনাথ
সধ ধোরমনাথ না পীর আদ

নাথ আ পীর পরভাত রাজশ্রী
যেঙ্গারজী স্থত রাজশ্রী
ভারতমলজী বারে পীর আয়া গাম
রায় পরাঞ্জতে নুপত ধীনোধরজ
জীয়ে সাদাবৃত হিন্দুআণে গায়তরকাণে
সুঅর জে কোই এ গামনো
পচার করে তেহেনে গরীবনাথনা
ভবোভবনা পাপই রাজশ্রী
ভীমনো ধরম ছে, আয়ী দাবো
ধীনোধরনো ছে......

লেওনার্ড (Notes on the Kanphata Jogis—Ind. Ant., vii, H. 298-300) বলেন, যখন গোরক্ষনাথ ধরমনাথের সতীর্থ বলিয়া কচ্ছপ্রদেশের লোকের ধারণা, তখন গোরক্ষনাথকে এই সময়ের ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পশ্চিম-ভারতের মতে গোরক্ষনাথ খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকের ব্যক্তি। এইখানে একটা বিষয়ের বিচারের আবশ্যক। গরীবনাথ নামে ধরমনাথের এক শিষ্য তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই গরীবনাথ জাঠদিগকে বিতাড়িত করিয়া ববার-রাজ্যে রায়ধনকে ১১৭৫ খ্রী° হইতে ১২১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (Ind. Ant., vii, p. 49)। কচ্ছিভাষায়ও এ সম্বন্ধে প্রমাণ আছে।[১] দলপতরাম প্রাণজীবন খকর (ঐ, পৃ ৪৯) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এ হিসাবে আবার গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর হইয়া পড়েন।

রাইট সাহেব তাঁহার নেপালের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, (১৪০-১৫২ পৃ°) রাজা বলদেব বা বরদেবের সময় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতকে গোরক্ষনাথ নেপালে ছিলেন। Sylvain Levi (le Nepal,

১ "গরবো গরীব নাথ। আযো মুখ আবাজ।
কুডা জত কচি ডিন্নো রায়ধনকে রাজ।"

i. 347) লিখিয়াছেন যে, খ্রী° ৭ম শতকে রাজা নরেন্দ্রদেব নেপালে রাজা ছিলেন, সেই সময়ে গোরক্ষনাথ ছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

উত্তরভারতের প্রচলিত মত অনুসারে ইনি কবীরের সমসাময়িক, ও প্রতিদ্বন্দ্বী। কবীর যখন ১৫শ শতকে বর্তমান ছিলেন, ইনিও এই সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। উইলসন (H. H. Wilson) তাহার Religious Sects of the Hindus গ্রন্থে (i, p. 213) এই উক্তি প্রচার করিয়াছেন। গোরক্ষনাথের সময় সম্বন্ধে এইরূপ অনেক মত আছে। আর যেমন শঙ্কর একজন ছিলেন না, যিনি শঙ্করমঠের গদিতে বসিতেন সেই মহান্তই যেমন শঙ্কর হইতেন, সেইরূপ গোরক্ষনাথও একাধিক ছিলেন। সেই জন্যই এত গোল। তবে তিনি যে দ্বাদশ শতকের পরবর্তী হইতে পারেন না, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। মহারাষ্ট্রদেশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মরাঠী ভাষায় বিশদ ভাষ্য-সমন্বিত একখানি গ্রন্থ রচিত হয়—নাম 'জ্ঞানেশ্বরী'। ব্রাহ্মণ সাধু ও কবি জ্ঞানেশ্বর ইহার রচয়িতা। জ্ঞানেশ্বরের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার নাম নিবৃত্তিনাথ, অপর ভ্রাতার নাম সোপানদেব। মুক্তাবাঈ তাঁহার ভগিনী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সাধু ও কবি ছিলেন। জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানদেব নামেও পরিচিত। 'জ্ঞানেশ্বরী'র রচনা ১২৯০ খ্রীস্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। এই গ্রন্থে গোরক্ষনাথের নাম আছে এবং ইহাতে লিখিত আছে যে, জ্ঞানেশ্বর গোরক্ষনাথ হইতে শিষ্যপরম্পরায় ৪র্থ স্থান অধিকার করেন। দেখা যাইতেছে, গোরক্ষনাথ এ হিসাবে দ্বাদশ শতকে আসিয়া পড়িতেছেন। জ্ঞানেশ্বরীর রচনা কাল সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং গোরক্ষনাথের সময় যে দ্বাদশ শতকের পরবর্তী নয়, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ গোরক্ষ-নানক-সংবাদ, গোরক্ষ-কবীর-কথা পড়িয়া গোরক্ষনাথকে পঞ্চদশ শতকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এই সমস্ত গ্রন্থে সম্প্রদায়ের মতবাদ জানা যাইতে পারে, কিন্তু সময় জানা যায় না। কেন না, বহু ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে

একটা প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রবল সম্প্রদায়ের সাধুরা দেখাইতে চান যে, তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে পরাস্ত করিয়াছে। সম্প্রদায়-বিশেষকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ আখ্যায়িকা প্রধানত রচিত হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়াই নানকপন্থীরা দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের গুরু নানক, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি নাথগুরুকে পরাভূত করিয়াছেন; কবীর গোরক্ষনাথকে হারাইয়াছেন; মধ্বাচার্য শঙ্করাচার্যকে পরাজিত করিয়াছেন; শঙ্কর ও মধ্ব এক সময়ের ধর্মগুরু না হইলেও তাঁহাদের তর্কযুদ্ধের গ্রন্থ যেমন আছে, কবীর-গোরক্ষ, নানক-গোরক্ষের তর্ক-ব্যাপারগ্রন্থও সেইরূপ।

নাথপন্থীদের ধর্ম বুঝিবার দুইটি উপায় আছে। নাথ-, কবীর- ও নানক-পন্থীদের গ্রন্থে নাথদের মতের অনেক খবর আছে। সেই-গুলি হইতে তাঁহাদের ধর্মমত উদ্ধারের একটি পথ আছে। ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত পরম্পরাগত নাথমত সংগ্রহ, আর একটি পথ। এই উভয়বিধ উপায়ের তুলনা ও সামঞ্জস্যে নাথমতের বিবরণ ও ইতিহাসের উদ্ধার হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

নাথগুরু গোরক্ষনাথ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম,—

ভাষাগ্রন্থ

(১) গোরখবোধ, (২) দত্তগোরখসংবাদ, (৩) গোরখনাথ-জীরাপাদ, (৪) গোরখনাথজীকে স্ফুটগ্রন্থ, (৫) জ্ঞানসিদ্ধান্তযোগ, (৬) যোগেশ্বরী সাখী, (৭) বিরাট্ পুরাণ, (৮) গোরখসার।

সংস্কৃতগ্রন্থ

(৯) গোরক্ষশতক (জ্ঞানশতক), (১০) চতুরশীত্যাসন, (১১) জ্ঞানামৃত, (১২) যোগচিন্তামণি, (১৩) যোগমহিমা,

(১৪) যোগমার্তণ্ড, (১৫) যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতি, (১৬) বিবেকমার্তণ্ড, (১৭) সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি।

ইঁহার রচিত আরও ২৭ খানি ছোট ছোট গ্রন্থের নাম 'মিশ্রবন্ধু-বিনোদ' পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় আছে। ইঁহার একখানি গদ্যগ্রন্থ আছে। তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

"শ্রীগুরু পরমানন্দ তিনকে দণ্ডবত হৈ। হৈঁ কৈসে পরমানন্দ আনন্দস্বরূপ হৈ সরীর জিন্হী কো। জিন্হী কে নিত্য গায়ৈ তে সরীর চেতন্নি অরু আনন্দময় হোতু হৈঁ। মৈঁ জু হৈঁ গোরিষ সে। মছন্দর নাথকো দণ্ডবত করত হৌঁ। হৈঁ কৈ সে বৈ মছন্দর নাথ। সত্মা জোতি নিশ্চল হৈ অন্তহকরন জিনি কো দ্বার তৈদ গৃহ চক্র জিনি নীকী তরহ জানৈ।.......

পরাধীন উপরাতি বন্ধন নাহী, সুআধীন উপরাতি মুকতি নাহি, চাহি উপরাতি পাপ নাহী, অচাহী উপরাইতি পুনি নাহী, ক্রম উপরাতী মন নাহি, নিহক্রম উপরাইতি নিরমল নাহী, দুধ উপরাতি কুবধি নাহী, নিরদোষ উপরাতি সবধি নাহী, ঘোর উপরাঈতি মন্ত্র নাহী, নারায়ণ উপরাঈতি ঈসট নাহী, নিরজন উপরাঈতি ধ্যান নাহী।"

মরাঠী ভাষায় 'নবনাথ ভক্তিসার' নাথপন্থের একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ ১৩২১ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি সুপ্রাচীন নাথ-মত-পরম্পরা হইতে সংগৃহীত হইয়া ১৭৪১ শক জ্যৈষ্ঠ শুক্লা প্রতিপদে[১] সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে নবনাথের বিবরণ আছে। ইহাতে নাথপন্থের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। "প্রাণ-সংগলী' পঞ্জাবী ভাষায় লিখিত নানক-বিরচিত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ১৯১২ সালে এলাহাবাদ হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে নাথ-সম্প্রদায়ের মতবাদের অনেক কথা আছে। মহাম°

১ "তরী সত্রাশে" একে চালিস। প্রমাথী নাম জ্যেষ্ঠমাস। শুক্লপক্ষ প্রতিপদেস। গ্রন্থ সমস্ত জাইলা। ১৪।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'কৌলজ্ঞান-বিনিশ্চয়' নামে মৎস্যেন্দ্রনাথের একখানি তন্ত্রের পরিচয় দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়-সম্পাদিত 'বৌদ্ধগান ও দোহাকোষে' নাথপন্থী মীননাথের একটি কবিতা আছে। কবিতাটি বাংলায় লিখিত বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাঠ
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা ॥"—পৃ°৩৮।

সন্ধ্যাভাষায় লিখিত বৌদ্ধগান ও দোহাকোষে নাথপন্থেরও একটু আধটু ইঙ্গিত আছে। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি প্রাচীন নাথদিগের মত ছিল 'হঠযোগ'। প্রথম প্রথম নাথেরা শিবের পূজা করিত, শিবকে তাহাদের দেবতা বলিয়া মানিত। তারপর শৈবমত ভাঙিয়া তাহাতে সহজযান ও ব্রজযান মিশাইয়া নাথেরা একটি মতের প্রবর্তন করে। মৎস্যেন্দ্রনাথ কিছু বেশী শৈব-ভাবাপন্ন ছিলেন। গোরক্ষনাথ ছিলেন বেশী বৌদ্ধভাবাপন্ন। পরে তিনি পুরা বৌদ্ধ হন। শেষে নামে শৈব—কিন্তু কাজে নয়। নাথদের কোন্ সময় কি মত ছিল তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। নাথধর্ম জানিতে হইলে—নাথদিগের বর্তমান ও যতদূর সম্ভব অতীত কালের প্রথার আলোচনা আবশ্যক। আপতত দিগ্‌দর্শন হিসাবে নাথ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিব।

নাথ সন্ন্যাসী—বিশেষত গোরখপন্থীরা কর্ণবিদ্ধ করিয়া স্ফটিক, বেলওয়ার, গণ্ডারের সিং অথবা হাতির দাঁতের তৈয়ারী ভূষণ কর্ণে পরিয়া থাকে। এই কর্ণভূষণের নাম 'মুদ্রা'। সাধারণত বসন্ত পঞ্চমীতে ইহারা কর্ণবেধ করিয়া থাকে। মন্ত্র পড়িয়া কানে মুদ্রা পরে। স্ত্রীলোকের দর্শনে বা আহারের দোষে কান পাকিয়া যাইবে, এই ভয়ে কান ভাল না হওয়া পর্যন্ত ইহারা ফলাহার করে ও নির্জন

গৃহে থাকে। নাথদের মধ্যে এই মুদ্রার একটি বিশেষ তত্ত্ব আছে। তাহা এই—জপজী উপদেশ করেন—

"মুদ্রা সন্তোষ, সরম পত ঝোলি, ধিয়ান কী করে বিভূতি,
খিন্থা অকাল কুঁয়ারি কায়া, জগতি ডণ্ডা পরতীত।
আয়ী পন্থী সগল জমাতী, মনজীতে জগজীত।
আদেস তিসৈ আদেস,
আদি অনীল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একো বেস।"

"নাথ-যোগীদের সন্তোষই মুদ্রা বা কর্ণবেধ স্বরূপ, অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বিচারে স্থিতি হওয়াই যোগিগণের সন্তোষ-রূপী মুদ্রাস্বরূপ; লজ্জা অর্থাৎ জ্ঞানে নম্র হওয়াই, যোগিগণের ভিক্ষার ঝুলি স্বরূপ; পরমাত্মার ধ্যান তাহাদের ভস্মলেপনস্বরূপ; কালপরিচ্ছেদ-রহিত অর্থাৎ জন্ম-মরণাদি-রহিত কায়া, তাহার আবরণ কন্থাস্বরূপ এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই তাহার আশ্রয়দণ্ড-স্বরূপ। মনোজয়ের দ্বারা পঞ্চ-ভূতাদির জয়, সকল ধর্মপথের ভিতর শ্রেষ্ঠ পথ, অর্থাৎ ব্রহ্মাকার বৃত্তি দ্বারা বিষয়াকার বৃত্তির জয়ের নামই মনের জয়; সেই মনের জয় করিতে পারিলেই সকল পথ জয় করা যায়। পরমাত্মাকে আমি বার বার নমস্কার করিতেছি, এবং আদি, নিগুর্ণ, অনাদি, অক্ষয় এবং যুগ যুগান্তর ধরিয়া একভাবাপন্ন, সেই পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করিতেছি।"

গোরক্ষনাথ-প্রণীত 'সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি' নামক গ্রন্থে 'আদেশ' একটি সংজ্ঞাত্মক শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে। গোরক্ষনাথ আদেশের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারতঃ।
ত্রয়াণামেকসংভূতিরাদেশঃ পরীকীর্তিতঃ॥"

'ভূগতি গিয়ান্ দয়া ভণ্ডারণ, ঘট ঘট বাজে নাদ, আপি নাথ, নাথী সভ জাকি, রিদ্ধি সিদ্ধি ঐরা সদা। সংযোগ বিয়োগ দুই প্রকার চলাবে লেখে আরে ভাগ আদেশ তিসৈ ইত্যাদি।"

প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভূতি পরমাত্মার দয়ার ভাণ্ডারস্বরূপ ; এই অনুভূতি চরাচর প্রভৃতি সমুদয় বিশ্বে বিঘোষিত হইয়াছে। সেই পরমাত্মা স্বাক্ষিস্বরূপে, কখনও বা এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তারূপে, কখনও বা সিদ্ধিস্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। কিন্তু যোগীরা সংযোগ-বিয়োগরূপ দুই কর্মের নির্ণয় করিয়া উহাদের সত্য অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে নিরালম্ব হন। পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি।

"একা মাই জুগতি বিয়াই, তিন চেলে পরবান,
ইক সংসারী, ইক ভণ্ডারী, ইক লায়ে দিবান।
জিব তিস্ ভাবৈ, তিব চলাবৈ, জিব হোবৈ ফুরমাণ,
ওহু বেখে, ওনা নদরী ন আবৈ, বহুতা এহু বিড়াণ॥
আদেশ তিসৈ আদেস।"

এক মাতা স্বাক্ষিস্বরূপ হইয়া তিনজন অনুচরকে প্রমাণরূপে প্রকটীভূত করিয়াছেন ; তাঁহার এক চেলার নাম সংসারী, একের নাম ভাণ্ডারী এবং অপরের নাম বিচারকর্তা, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষকে স্বাক্ষী করিয়া তিন গুণ প্রকাশ করিয়াছেন ; তাঁহাদের মধ্যে একের নাম তম, অন্যের নাম রজ এবং তৃতীয়ের নাম সত্ত্ব। যে ব্যক্তি যে গুণসম্পন্ন, সে সেই গুণের কাজ করে অর্থাৎ সেই গুণের দ্বারা সে সেইরূপ কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। যে যে গুণপ্রধান, সে সেই গুণের সুখ্যাতি করিয়া থাকে। অন্য গুণের কার্য সে জানে না ; এই প্রকার সে খণ্ডন করিলেও তাহার কিছুই নিশ্চয় হয় না। আমি পরমাত্মাকে নরস্কার করি।

গোরক্ষনাথ বলিতেছেন,—

ভাব তাহা—যাহা জ্ঞানের অতীত, অজ্ঞানের স্বপ্নেরও অগোচর, জ্ঞানও নাই, অজ্ঞানও নাই। জ্ঞান অজ্ঞান দুই তিরোহিত কর।

চর্পটনাথ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন জল আর তরঙ্গ, প্রকৃত এক বস্তু, সেইরূপ সংসারে জ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই,

অজ্ঞান বলিয়াও কিছু নাই, শুধু তাহাই আছে—যাহা জ্ঞান ও অজ্ঞান পরিহার করিয়া এক অপূর্ব অবস্থায় অবস্থিত থাকে। যাহা আছে, তাহার প্রতিশব্দ নাই, চিহ্ন নাই, সঙ্কেত নাই, যাহা দিয়া লোককে বুঝানো যায়। যখন দ্বিত্ব কল্পনা তিরোহিত হয়, তখন জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই তিরোহিত হয়। আমাদের কঠোপনিষৎও সেইজন্য উপদেশ করিয়াছেন,—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদপি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥"

নাথ সন্ন্যাসীরা ঔর্ণনির্মিত সূত্র ধারণ করিয়া থাকে। ইহাকে ইহারা 'সেলী' বলিয়া থাকে। এবং অঙ্গুলিপরিমিত 'নাদ' নামক একপ্রকার কৃষ্ণ পদার্থ পরিয়া থাকে। যোগিসম্প্রদায় 'মেখলা' 'বিষ্টি' 'সেলী' ও 'বিংশতি' দেহে ধারণ করিয়া থাকে। তাহাদের দেহে যে মেখলা থাকে তাহা ধারণের গূঢ়ার্থ 'গগন'। 'বিষ্টি' শব্দের প্রকৃতার্থ নরক-দণ্ড হইতে রক্ষার উপায়। দুরাচারী ব্যক্তি নরকে দণ্ডিত হইয়া থাকে। কিঞ্চিন্মাত্র প্রলোভনবশত যে ইন্দ্রিয় জাগ্রত হয়, তাহাকে দান্ত বা জব্দ রাখিবার জন্য ইহাদের কৌপীন ধারণ। কোন কোন উলঙ্গ সাধু তাম্র বা পিতলের চক্র দ্বারা ইন্দ্রিয় বন্ধ করিয়া থাকে। ইহারই নাম 'বিষ্টি'। কোন কোন সাধু ফকীর বিশ্‌তি বা বেড়ীর আকারের কাষ্ঠপাত্র রাখিয়া থাকে। কেহ বা হাতে খপ্পর রাখিয়া থাকে। নাথপন্থীরা এই সব কারণে বলিয়া থাকে—

"গগন মেখলা ধরতি বিসটী।
দয়া সেলী হাথ কিসতী।"

নাথদের অনেক পরিভাষা আছে। ইহাদের সঙ্গে না মিশিলে সেগুলির অর্থ বোঝা যায় না। ইহারা মর্যাদাকে 'বেলা' বলিয়া থাকে। গুরু শব্দে 'শব্দ' বুঝিয়া থাকে। চেলা বলিতে ইহারা 'সুরতি' বুঝিয়া থাকে। ধ্যানকে ডিবী বলে। সন্তোষকে ভুক্তি বলে।

সন্ধ্যা ভাষাতেও ইহাদের অনেক উপদেশ আছে। একটি উদাহরণ হঠযোগ হইতে তুলিয়া দিলাম।

"মন থীরিতে পর থীর পবন থীরিতে বিন্দু থীর।
বিন্দু থীরিতে কন্দ থীর বলে গোরক্ষ সকল থীর ॥"

ইহারা বলে—

"জোগ জুগতি কৌ চীনতে, তিনকে লক্ষণ কৌন
তজি নিদ্রা খুধ্যা তজহি সুখ শোভা নিশি সৌণ ॥'

—প্রাণসংগলী

এই উক্তি অনুসারে ইহারা বলিয়া থাকে যে, সুখস্বরূপ শোভায়মানা রাত্রিতে যোগী শয়ান (মগ্ন) হইয়া থাকে। নাথপন্থী মতে ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, রাত্রিতে যেমন দিবসের সমস্ত কার্যের অভাব হয়, সেইরূপ অসৎপ্রপঞ্চের অভাব সম্পাদন করিয়া ভাবরূপী সত্তার উদয় হয়। আর শোভা প্রকাশের অর্থদ্যোতক, সেই প্রকাশ চেতন বস্তুর দ্যোতক এবং ইহাই সুখ বা আনন্দের অপর নাম। এইজন্য আনন্দস্বরূপী চিন্মাত্রসত্তায় ক্ষুধা ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয়ন করিয়া থাকে এবং সচ্চিদানন্দ পরমধামে যোগী-শয়ন করিয়া থাকে। এই অবস্থায় যোগী যোগমুক্তি চয়ন করিয়া থাকে।

হঠযোগপ্রদীপিকায়ও এইরূপ কথা আছে—

'গজ বাধিয়া রাজা পবন বাধিয়া যোগী।
ধান্য বাধিয়া গৃহস্থ বিন্দু বাধিয়া ভোগী।"

নাথযোগীদের অনেকে নারিকেলের ভিক্ষাপাত্র বা কাঁসার ভিক্ষাপাত্র লইয়া বেড়ায়। হোলির সময় ইহাদের গুরুরা মাটির ঘড়ায় আগুন রাখিয়া তাহা লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাকে তাহারা 'খপ্পর' বলে।

গোরখপন্থী ও নানকপন্থী সাধুরা মাথার পাগ্‌ড়ীতে লৌহের বৃত্তাকার চক্র রাখিয়া থাকে। ইহারা বলে, হাতের আঙলে ইহা ঘুরাইয়া শত্রুর গলায় ফেলিয়া দেওয়া হইত। চক্র গলা কাটিয়া

বাহির হইয়া চক্রের অধিকারীর নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিত। নাথ সন্ন্যাসীরা সাধারণত ধুনী জ্বালিয়া রাখে। গোকুলাষ্টমী ও নবরাত্রির সময়ে ইহারা খুব বেশী কাঠ দিয়া ধুনী জ্বালাইয়া রাখে। এই সময় চিনি মিশাইয়া গমের আটা কড়ায় করিয়া তাহারা রাঁধে ও খায়। ইহাকে তাহারা 'লাপ্‌সী' বলে। ইহাদের মঠে তুইবার করিয়া খাওয়া হয়। খিচুড়ি ভোগই ইহারা বেশী পছন্দ করে। ইহাদের যাহারা শিষ্য হইতে চায়, তাহাদিগকে শৃঙ্গীনাদ পরিতে হয়। ইহা দিয়া ওঁকার উপদেশ, আদেশের কার্য হইয়া থাকে। এখানে আদেশ শব্দের অর্থ নমস্কার, কোথাও কোথাও উপদেশ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইহাদের 'উপদেশ' তুইবার খাইবার সময় হইয়া থাকে। প্রত্যহ দেবতার নিকট ও গুরুর নিকটও আদেশের ব্যবস্থা আছে। যদি ইহাদের স্বভাব ভাল হয়—তাহা হইলে যথাকালে তাহাদের ভৈরবের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহাদের কর্ণবেধ হয়—এই ব্যাপারের নাম 'দর্শন'। গুরু তখন কর্ণে মন্ত্র দেন এবং বলেন—'জ্ঞানী হও, ধর্ম প্রতিপালন কর, গুরু সেবারত হও।' শিষ্য তখন যোগী হয়—নাম হয় 'নাথ'। শিষ্য গুরুর পুত্ররূপে বিবেচিত হয়। গুরু দেহ রাখিলে তাঁহাকে পুঁতিয়া ফেলা হয়। তারপর ১২ দিনের পর ভোজ দেওয়া হয়। শিষ্য অর্থাৎ পুত্র ভিক্ষা দিয়া থাকে, শিষ্য অশৌচ লইয়া থাকে, জুতা পরে না। তবে চাখ্‌দি বা কাঠের জুতা পরিতে পারে।

নাথদের মধ্যে কয়েকটি গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত নাথেরা আপনাদিগকে কশ্যপ, সত্য, মীন, গোরক্ষ, আই, আদি, ভৈরব, বীর গোত্রের বলিয়া থাকে। এ ছাড়া ইহাদের মধ্যে অন্য তুই একটি গোত্রের প্রচলন দেখা যায়। বটুক গোত্রেরও নাথ জুনাগড়ে আছে। বাঙলাদেশের নাথেরা অধিকাংশই কশ্যপ বা আই গোত্রের। সকল দেশের নাথদের মধ্যে নিজেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে। অনেকগুলি কিংবদন্তীর মূলে কোনরূপ

সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। যে প্রবাদগুলি প্রায় সকল দেশে একরূপ, আমরা কোন মন্তব্য না দিয়া সেইগুলির উল্লেখ নিম্নে করিতেছি,—

(১) ইহাদের বিশ্বাস, সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির ঔরসে ও কলার গর্ভে কশ্যপ মুনির জন্ম হয়। কশ্যপ দক্ষের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কৃষ্ণার জন্ম হয়। কশ্যপ-কন্যা কৃষ্ণা মহাযোগী বিন্দুনাথে সমর্পিত হন। ইঁহাদের প্রথম সন্তান যাঁহারা, তাঁহারাই 'নাথ' বা যোগী।

(২) এই নাথেদের মধ্যে যাঁহারা যোগাচার অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সমাধি হইয়া থাকে।

(৩) সিদ্ধযোগী অবধূতনাথ হইতে যোগধর্ম প্রথম প্রবর্তিত হয়। ইনি সাক্ষাৎ শিবাবতার। ইহা হইতে যোগীবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলি লক্ষণ আছে। ললাটে অর্ধচন্দ্র রেখা, ত্রিদণ্ড যোগপট্ট, অঙ্গে বিভূতি। রক্তবস্ত্র পরিধান, সর্বদা পরম গুরুর ধ্যান ইত্যাদি লক্ষণের ইঁহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

(৪) ঈশ্বর হইতে যোগিগণ এবং একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। মহাযোগী প্রধান পুত্র। ইহার পুত্র বিন্দুনাথ। বিন্দুনাথের পুত্র আইনাথ। আইনাথ রুদ্রকুল প্রকাশ করেন। গরুড়পুরাণের ৮৭ম অধ্যায়ে এবং রুদ্রযামলের উত্তরখণ্ডে যে রুদ্রকুলের বিবরণ আছে, নাথেরা রুদ্রকুল বুঝিতে তাহারই দাবি করিয়া থাকে। যাহা হউক এই আইনাথের পুত্র মীননাথ (ইহার অপর নাম মছন্দরনাথ); তাঁহার পুত্র গোরক্ষনাথ ও ছায়ানাথ, ছায়ানাথের পুত্র সত্যনাথ। সত্যনাথের এক শিষ্য অর্জুননাথ শঙ্করাচার্যের সহিত বিচার করেন।

ভারতবর্ষের নানা স্থানের নাথদের মধ্যে নানারূপ প্রথা প্রচলিত আছে। নাথসম্প্রদায়ের বিষয় জানিতে হইলে বিভিন্ন স্থানের নাথদের আচারাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

পঞ্জাবপ্রদেশে রোহ্তক জেলার মধ্যে দিল্লী হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে বোহর নামে একটি স্থান আছে। এখানে একটি প্রকাণ্ড মঠ আছে। মঠটি শ্রীমন্তনাথের সমাধি মন্দির। মঠাধিপতির নাম সন্তোষনাথজী। ইনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ অনেক রাজাদের কুলগুরু। ইহার সম্পত্তি যথেষ্ট। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার নাথ আছে। এখানকার মঠের নিয়ম এই যে, বার বৎসরের পর অধিপতি সমাধি লইয়া থাকেন। কাজে কিন্তু তাহা দেখা যায় না। এখানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথি হইতে নবমী তিথি পর্যন্ত একটি মেলা হয়। ১০০ বৎসর ধরিয়া এই অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। এই মেলায় দুই লক্ষ লোক আসিয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত হিন্দু স্ত্রীপুরুষ শ্রীমন্তনাথের সমাধির উপর পূজা মানসিক দিয়া থাকে। উড়িষ্যায়ও অনেক নাথ বাস করিয়া থাকে। ইহারা বাঙলাদেশের নাথেদের মতো নয়। ইহাদের উপনয়ন হইয়া থাকে। এখানকার নাথেরা কেহ চিকিৎসক, কেহ জ্যোতিষী, তবে অধিকাংশই চাকুরী করিয়া খায়।

কাটিয়াবাড়ের নাথেরা আপনাদের 'যোগী' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহারা ধর্মের ওজুহাতে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই। ভিক্ষা ছাড়াও বাঁচিয়া থাকিবার ইহাদের আর একটি উপায় আছে। দাঁতন, ঝাঁটা, নুন, ইন্ধনী, সুখিয়া ও স্ত্রীলোকদের চুলে লাগাইবার জন্য সেন্দোনী বেচিয়া যে দুই পয়সা পায়, তাহা দিয়াই নিজেদের খরচ চালায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভূত ঝাড়ে, সাপ ধরে। এই রকম উপায়ে জীবিকা অর্জন করে। দেব-দেবীর পূজা না করিলেও তাঁহাদের প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকে। কাহারও মৃত্যু হইলে ইহারা দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া পুঁতিয়া ফেলে। বহু বিবাহের প্রথা ইহাদের মধ্যে বেশ প্রচলিত। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার নিয়মও মানিয়া চলে। রত্নগিরি বোম্বাই প্রদেশে। এখানকার যোগীরা অনেক রকমের।

এখানকার যোগীরা লোকেদের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া থাকে। কেহ বা কৌতুকপ্রদ বিকৃত জন্তু দেখাইয়া বেড়ায়। অবশিষ্ট যাহারা, তাহারা কানফট্ যোগী। ইহারা কানে কাঠের বা হাতির দাঁতের বড় বড় গোলাকৃতি অলঙ্কার পরিয়া থাকে।

কঙ্কণপ্রদেশে যোগীর সংখ্যা খুব কম। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। পর্তুগীজগণ যখন সাল্‌সেট অধিকার করে, তখন তাহারা কানেড়ী (Kanheri) গুহাতে বহুসংখ্যা যোগী দেখিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে পর্তুগীজগণ আশ্চর্যজনক বিবরণ লিখিয়া গিয়াছে। তাহারা নাকি ৩০০০ গুহা দেখিয়াছিল। এই সমস্ত গুহায় যোগাচারী নাথেরা থাকিত। একজন যোগীর বয়স তাহারা ১৫০ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে নাসিকে যে সমস্ত নাথ যোগীরা আছে, তাহারা রত্নগিরির যোগীদের স্থায় অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তবে এখানে সকল জাতির লোকেরা নাথসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারে। ইহাদের কেহ বিবাহ করে, কেহ করে না। এখানকার কানফট্ যোগীরা বীণাযন্ত্র বাজাইয়া প্রধানত রাজা গোপীচাঁদের গান করিয়াই নিজেদের উদরের ব্যবস্থা করে। ভোজ নগরে শিব্‌রা মণ্ডপে, ভোজের উত্তর-পশ্চিমে ধিনোধরে এবং বাগদে মনফরা নামক স্থানে কানফট্ যোগীদের তিনটি আস্তানা আছে। এই তিনটির মধ্যে ধিনোধরের আড্ডাই বেশ বড় ও বিখ্যাত। জন পঞ্চাশ কানফট্ যোগী এখানে থাকে। ইহাদের আবার বালাধিয়া, আরাল ও মাখালে তিনটি শাখা আছে। ইহারা কর্ণবেধক্রিয়াকে 'দর্শন' বলে। দর্শনের পর ইহাদের পৃথক নাম হয়। অতঃপর তাহারা সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা ধরমনাথকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করে। কচ্ছদেশীয় ইতিকথায় পাওয়া যায় যে ধরমনাথ অনেক আশ্চর্য কার্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন মান্দবী বা রায়পুর ধ্বংস করিয়াছিলেন, রাণ নদী শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পূর্বে কানফট্ যোগীরা খুব

পরাক্রান্ত ছিল। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে পশ্চিমে কোটেশ্বর এবং পূর্বাঞ্চলে আজপালে তাহাদের প্রধান আখড়া ছিল। জুনাগড়ের একদল নাথ সন্ন্যাসী তিন শত বৎসর পূর্বে আসিয়া ইহাদের হাত হইতে আখড়া দুইটি কাড়িয়া লয়।

ধিনোধর যোগীদের বেশ দুই পয়সা আছে। ইহারা ধিনোধর পাহাড়ের নীচে বেশ সুরক্ষিত মঠে বাস করে। মঠের আশে পাশে ইহাদের থাকিবার জায়গা ও মঠধারীর সমাধি আছে। মঠধারীকে ইহারা 'পীর' বলে। ধরমনাথের মঠে ৭ বর্গফুট উচ্চ ধরমনাথের একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরে ধরমনাথের একটি মার্বেল পাথরের ৩ ফুট উচ্চ মূর্তি আছে, এই মূর্তির কানে সম্প্রদায়ের অনুরূপ কর্ণভূষা আছে। তাহার পার্শ্বে ছোট ছোট শিবলিঙ্গ এবং পিতলের ও পাথরের অন্যান্য মূর্তি আছে, এইখানে ধরমনাথের সময় হইতে একটি দীপ জ্বালাইয়া রাখা হইয়া থাকে। পূজা দিনে দুইবার হয়। নিকটেই একটি আবৃত স্থানে সকল সময় হোমকুণ্ড প্রজ্বলিত থাকে।

সাধারণত ইহাদের কণ্ঠভূষার ব্যাস সাত ইঞ্চি এবং ওজনে ৬ তোলা হইয়া থাকে। ইহারা কোট ও লাল রঙের বক্ষাবরণ করিয়া থাকে, যিনি গদিতে বসেন, তিনি জরির কাজ করা নীল রেশমের পাগড়ী পরিয়া থাকেন। ইহারা গলায় এক প্রকারের পশমী সূতা পরিয়া থাকে। ইহার নাম শেলি, এটি ইহাদের বড়ই পবিত্র জিনিস। ইহারা অনেক পুরানো ধরনের গহনা পরিয়া থাকে। ইহারা গলায় গণ্ডারের শিঙ ঝুলাইয়া রাখে। পূজার সময় তাহা বাজাইয়া থাকে।

বেরারে অনেক নাথ আছে। অধিকাংশই গৃহী—তাহাদের নাম সংযোগী, যাহারা সন্ন্যাসী তাহাদের নাম যোগী। সংযোগীদের সম্বন্ধ গোসাঁইদের সঙ্গে হয়। যোগীর সংখ্যা খুব কম।

নেপালে গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথের দুইটি মন্দির আছে।

মন্দির দুইটি বাগমাতী নদীর পূর্বতীরে পর্বতের উপর। ঐ পর্বতের অধিত্যকা হইতে উপত্যকা পর্যন্ত অর্থাৎ নদীতীর পর্যন্ত প্রস্তর দ্বারা ঘাট নির্মিত। ঐ ঘাট দৈর্ঘ্যে শঙ্খমূল থাপাতলি হইতে গোকর্ণ পর্যন্ত প্রায় তিন ক্রোশ বিস্তৃত। নদীর পশ্চিম তীরে পশুপতিনাথের মন্দির। মৎস্যেন্দ্রনাথ ভোগবিলাসে রত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথের আদেশে নেপালাধিপতিকে আজও এক একটি ব্রাহ্মণকন্যা মৎস্যেন্দ্রনাথের মঠের সহিত বিবাহ দিতে হয়। ঐ প্রথা মহারাজের কৌলিক নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ সমস্ত বিবাহিতা কন্যা মঠে সতীরূপে থাকিয়া সেবাকার্যে জীবনাতিপাত করে। ইহারা নাথিনী।

নেপালে ব্রহ্মনাথজী ও ভিনক্নাথজীর দুইটি আস্তানা আছে। জুনাগড়ে নাথদের খুব বড় মঠ আছে। আবুল ফজল্ পেশওয়ারে গোরক্ষক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বারকার নিকট আর একটি গোরক্ষক্ষেত্র আছে। হরিদ্বারে একটি সুড়ঙ্গ নাথদের কীর্তির নিদর্শন। কাশীতে ইহাদের একটি মঠ আছে, ৩০-৩২ বৎসর পূর্বে গয়ায় কপিল ধারার নিকট গম্ভীরনাথের আশ্রম ছিল। ইনি অল্প কথা কহিতেন। একটু মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে লোকদিগকে মুগ্ধ করিতেন। বাঁকীপুরে ইহার শিষ্যগণ আশ্রম রক্ষা করিতেছেন।

কলিকাতায় দমদমার নিকট নাথদের একটি আড্ডা আছে। ইহার নাম 'গোরখবাসলি', ইহাতে তিনটি মানুষের মূর্তি এবং শিব, কালী ও হনুমানের মূর্তি আছে।

ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে অনেক নাথের বাস। বগুড়ায় ৩,৩১৮ জন নাথ আছে, ইহারা শব পুঁতিয়া ফেলে। বগুড়া থানার অন্তর্গত ও বগুড়া শহর হইতে প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে এবং মহাস্থান গড় হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে 'যোগীর ভবন' নামে একটি বিখ্যাত গ্রাম আছে। এখানে গোরক্ষনাথের একটি মন্দির আছে, গোরক্ষনাথ-মন্দিরের পূর্বোত্তর কোণে তিনটি সমাধি

আছে। সর্বাপেক্ষা বড়টি গুরুর, দ্বিতীয়টি শিষ্যের এবং অপরটি গুরুর কুক্কুরের। মন্দিরের পূর্বদিকে একটি পুষ্করিণী আছে—নাম 'সিদ্ধপুকুর'।

নাথসম্প্রদায়ের যুগীরা রাজা গোপীচাঁদের গান, মানিকচাঁদের গান, গোরক্ষনাথ ও মীননাথের কীর্তি-কাহিনী দেশ-দেশান্তরে গিয়া গাইয়া বেড়াইত। সাধুদের মুখে মুখে প্রচারিত গীতের ফলে বাঙলায় ও বাঙলার বাহিরে নাথপন্থীদের ধর্মের কয়েকখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। রঙপুর হইতে সংগৃহীত গ্রীয়ার্সন সাহেবের সম্পাদিত 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' দুর্ল্ভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত,' বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য-সংগৃহীত 'ময়নামতীর গাথা' ভবানী দাস-লিখিত 'ময়নামতীর পুথি,' 'ময়নামতীর গান,' সহদেব চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল', শ্যামদাস সেনের 'মীনচেতন', সেখ ফয়জুল্লা প্রণীত 'গোরক্ষ-বিজয়' ও রমাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে' নাথদের কিছু কিছু কথা আছে, ময়নামতীর গানগুলিতে কতকগুলি সিদ্ধার নাম পাওয়া যায়, একখানি গান আছে,—

তবে সির্দ্ধা চলি গেলা যার যেই ঘরে।
প্রথমে হাড়িফা গেল মৈনামতির ঘরে ॥
ত্বরিত গমনে গেল মৈনামতির পুরি।
তথা গিয়া রহিলেক হাড়িরূপ ধরি ॥
কানফা চলিয়া গেল অবরির ঘরে।
গাবুর চলিয়া গেল আপনা বাসরে ॥
গোক্ষর্নাথ চলি গেল—বঙ্গ নিকেতন।
কদলিতে চলি গেল মিন মহাজন ॥
বাম হাতে যতি-নাথে মাদলে দিল ঘাত।
সর্বপুরী মোহিত করিল গোক্ষর্নাথ ॥
নন্দ মহানন্দ দুই চেলায় পুরে তাল।
ঝমকে ঝমকে ভাল উঠে শব্দ তাল ॥

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর Modern Buddhism নামক পুস্তকের এবং বৌদ্ধগণ ও দোহার ভূমিকায় নাথধর্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।

পদ্মাবতীর যোগীখণ্ডে আছে—

জউ ভল হোত রাজ অউ ভোগু।
গোপিচন্দ নহিঁ সাধত জোগু॥
উহ-উ সিসিটি জউ দেখা পরেবা।
তজা রাজ কজরী-বন সেবা॥

বাঙলার বাহিরে গোপীচন্দ্রের কথা এইরূপ—

গোপীচন্দ্র বাঙলার এক রাজা ছিলেন, ভর্তৃহরির ভগিনী মৈনাবতী ইঁহার মাতা। গোরখনাথ যখন ভর্তৃহরিকে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, তখন মৈনাবতীও গোরক্ষনাথের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। গোরক্ষনাথের কৃপায় তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সংসারের বিষয়বাসনাতে বদ্ধ হইলে জীবের আর নিস্তার নাই। বাঙলার রাজার সঙ্গে মৈনাবতীর বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার এক পুত্র গোপীচন্দ্র ও কন্যা চন্দ্রাবলী। সিংহলদ্বীপের রাজা উগ্রসেনের সঙ্গে চন্দ্রাবলীর বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পর গোপীচন্দ্র বাঙলার রাজা হন এবং বিলাসে মত্ত হন। একদিন পুত্রকে দেখিয়া মৈনাবতী ভাবিলেন, ছেলে এইভাবে বিষয়ে মাতিলে—সমস্তই নষ্ট হইবে। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, পুত্র, যদি অমর হইতে চাও, জীবনমুক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে জলন্ধরনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর, এবং দীক্ষান্তে কদলীবনে চলিয়া যাও। গোপীচন্দ্র নিজে সিদ্ধ হইলেন এবং ভগিনী চন্দ্রাবলীকেও সিদ্ধা করিলেন। গোরখ-পন্থীদের মধ্যে একটি প্রথা আছে যে, নূতন যোগী হইবার সময় গুরুর আজ্ঞা লইয়া নিজ ঘরে গিয়া যোগীকে আপনার স্ত্রীকে 'মাতা' বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে এবং স্ত্রী তাহাকে 'পুত্র ভিক্ষা লও' এই কথা

বলিয়া অন্ন ভিক্ষা দিলে যোগী তাহা লইয়া গুরুর নিকট গমন করে। গুরুর তখন বিশ্বাস হয় যে শিষ্য যোগ সাধনে সমর্থ হইবে।

তখন যোগী মেখলা, শৃঙ্গী (নাদ), সেলী, কন্দা, খপ্পর, কর্ণমুদ্রা, কৌপীন, কমণ্ডলু, ভস্ম, বাঘাম্বর, ঝোলা ইত্যাদি ধারণ করে। গোপীচন্দ্র পাটরাণী পাটম দেবীর নিকট ভিক্ষা লইতে গেলেন, এই সময় তাঁহার সহিত পাটরাণীর যে যে কথা হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া যোগীরা নানাপ্রকার গীত গাইয়া বেড়াইত, নানা স্থানে গীত হইয়া সেই গানগুলির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

গ্রীয়ার্সন ১৮৭৮ সালে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' ছাপেন। এই গানের সঙ্গে পূরণ-প্রসাদের ছাপা 'গোপীচন্দ্র কী কথা'র অনেক পার্থক্য, গ্রীয়ার্সন বলেন, রাজপুতানা ও মালবপ্রান্তে এই আখ্যায়িকার যথেষ্ট প্রচলন আছে। যাহা হউক, গোপীচন্দ্র যখন দেখিলেন যে এই সংসার পক্ষি-সদৃশ, তখন তিনি কদলীবনে চলিয়া গেলেন, গ্রীয়ার্সন দেখাইয়াছেন, ডেরাডুন হইতে আরম্ভ করিয়া হৃষীকেশ, বদরিকাশ্রম এবং ইহার উত্তরে হিমালয় প্রান্ত-পর্যন্ত সমস্তই কদলীবন, এই স্থানটিকে ঐ অঞ্চলের লোক কজরীবন বলিয়া থাকে ; এখানে কদলীবৃক্ষ যথেষ্ট আছে, হাতিও অনেক। ইহা সিদ্ধদিগের থাকিবার স্থান, সিদ্ধ না হইলে এই বনে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। আজ পর্যন্ত এই বনে শ্রীহনুমান সুখে বিরাজ করিতেছেন এইরূপ প্রবাদ আছে, গ্রীয়ার্সন মহাভারত হইতে নিম্নোক্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলেন যে, দ্রৌপদীকে লইয়া পাণ্ডবগণ বদরিকাশ্রমে যাইবার পথে ছয়দিন এইখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ভীমসেনের সঙ্গে এইখানে হনুমানের সাক্ষাৎ হয়। এইখানে মহাভারতে আছে,—

"স ভীমসেনস্তচ্ছ্রুত্বা সম্প্রহৃষ্ট-তনূরুহঃ।
শব্দপ্রভবমন্বিচ্ছংশ্চচার কদলী-বনম্॥

কদলীবন-মধ্যস্থমথ পীনে শিলাতলে।
দদর্শ স মহাবাহুর্বানরাধিপতিং তদা॥"

বনপর্ব, ১৪৫. ৭৫-৭৯।

হনুমান বলিলেন,—আগে এই বনে সিদ্ধ ব্যতীত অপর কেহ আসিতে পারিত না।

"অতঃপরমগম্যোহয়ং পর্বতঃ সত্বরারুহঃ।
বিনা সিদ্ধগতিং বীর গতিরত্র ন বিদ্যতে॥
দেবলোকস্য মার্গোহয়ং অগম্যো মানুষৈঃ সদা।
কারুণ্যাৎ ত্বামহং বীর বারিয়ামি নিবোধ মে॥"

—১৪৬. ৯২-৯৩

মালিক মুহম্মদ ৯৪৭ সালে হিন্দী ভাষায় 'পদুমাবত' নামক পুস্তক রচনা করেন। সম্ভবত ১৮৪৫ সালে বাঙালী কবি সৈয়দ আলাওল এই পুস্তকের ভাষান্তর করেন। ইহাতে মচ্ছন্দরনাথ, গোরখনাথ ও গোপীচন্দ্রের কথা আছে।

লক্ষ্মণদাস তাঁহার হিন্দী গাথাতে গোপীচাঁদের কথা লিখিয়াছেন, ইহাতে গোপীচাঁদের বাপের নাম তিলকচন্দ্র, মাতার নাম মৈনাবতী, ভগিনীর নাম চম্পা, গন্ধর্বসেন গোপীচন্দ্রের মাতামহ।

এছাড়া লাহোর হইতে গঙ্গারাম-কৃত 'সিহরফী গোপীচন্দ' কবি কাশীরামকৃত 'বারামাহ গোপীচন্দ' বোম্বাই হইতে 'সঙ্গীত গোপীচন্দ-কা,' প্রহ্লদপদীরাম পুরোহিত-কৃত 'গোপীচন্দ-রাজা-কা খ্যাল,' আগরা হইতে গোপীচন্দ ভরথরী [বোম্বাই হইতে খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাসও 'সংগীত গোপীচন্দ-ভরথরী' নামে এই একই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন], কটক হইতে 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' নামক কয়খানি গ্রন্থে নাথদিগের অনেক কথা আছে। প্রায়ই দেখা যায়, কোন পুস্তকের সহিত কোন পুস্তকের ঘটনা সম্বন্ধে ঐক্য নাই। তবে সেগুলি হইতে সত্য বাহির করিতে পারা যায়। ভর্তৃহরি ও গোপীচাঁদের কথা প্রায় সকল দেশেই আছে। রাজেন্দ্রচোড়

১০২৩ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গবিজয় করেন। গোবিন্দচন্দ্রও পরাভূত হন। কল্যাণীর চালুক্য বিক্রমাদিত্য এই সময়ের রাজা ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র ইহার কয়েক বৎসর পরে ভর্তৃহরি শতকের শ্লোক তুলিয়াছেন। কাজেই ভর্তৃহরি বিক্রমের সমসাময়িক, 'নবনাম ভক্তিসারে' দেখা যায়, ভর্তৃহরির সহিত বিক্রমের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভর্তৃহরি বিক্রমের ভ্রাতা বা পুত্র। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "ভর্তৃহরিকে যদি বিক্রমাদিত্যের ভাই ধরা যায় এবং তাঁহার সংসার ত্যাগের কথা সত্য হয়, তবে গোপীচাঁদ তাঁহার ভাগিনেয় হওয়া ও সন্ন্যাস গ্রহণ করা বিচিত্র নয়।"

মহারাষ্ট্রপ্রদেশে গোপীচাঁদ নামে এক সন্ন্যাসী-রাজার সম্বন্ধে অনেক রকমের প্রবাদ আছে। দু-একটি প্রবাদ অবলম্বন করিয়া কয়েক খানি গ্রন্থও রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'সন্তলীলামৃত' ও 'গোপীচাঁদ-নাটক' সমধিক প্রসিদ্ধ। সন্তলীলামৃত প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন পুস্তক। ইহার রচয়িতা মারাঠী কবি মহীপতি ১৭১৫ হইতে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। গোপীচাঁদ-নাটক বেশী দিনের গ্রন্থ নয়, সম্ভবত ১৮৬৯-৭০ সালে পূর্বে আপ্পাজী গোবিন্দ ইনামদার রচনা করিয়াছেন। মারাঠী প্রবাদ অনুসারে গোপীচাঁদের কথা এইরূপ—

ত্রৈলোক্যচাঁদ রাজার পুত্র রাজা গোপীচাঁদ গৌড়বঙ্গের রাজধানী কাঞ্চননগরে রাজত্ব করিতেন।

"গৌড় বংগাল দেশীঁ নিশ্চিত
কাঞ্চনগর অসে কীঁ।
তে থেঁ ত্রৈলোক্যচন্দাচা সুত।
গোপীচন্দ মী রাজা নিশ্চিত॥"

রাজমাতা-মৈনাবতী গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন—এক দিব্যমূর্তি সন্ন্যাসী বিক্রয়ের জন্য মাথায় করিয়া কাঠের বোঝা লইয়া যাইতেছেন। সন্ন্যাসীর নাম জলন্দর। তাঁহার মূর্তি দেখিয়া রাজমাতা তাঁহার শিষ্যা হইয়া পড়িলেন।

তারপর একদিন রাজা মহিষীগণের সহিত প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময় দেখেন যে, তাঁহার শরীরে উষ্ণ জলবিন্দু পতিত হইল। ইহা তাঁহার মাতার অশ্রুবিন্দু জানিতে পারিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন। মাতা পুত্রকে আত্মার উদ্ধারের জন্য জলন্দরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া গোপনে তাঁহাকে স্তূপীকৃত গোময়ের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা করিলেন।

এদিকে জলন্দরের এক প্রিয় শিষ্য ছিলেন—নাম কণিকা। গুরুর অন্বেষণে তিনি এই রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। মৈনাবতী তাঁহাকে গুরুর অদর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কণিকা রাগিয়া বলিলেন,—তোমার ছেলেই তাঁহাকে গোময়ে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। মৈনাবতী পুত্রকে সকল কথা জানাইলে, গোপীচাঁদ ভীত হইয়া সন্ন্যাসীর শরণ লইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

কিছুদিন পরে সেই নগরে মচ্ছেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ আসিলেন। কণিকা তাঁহাদের সঙ্গে রাজার পরিচয় করিয়া দিলেন, মচ্ছেন্দ্রনাথ রাজা ও রাজমাতার অনুনয়ে জলন্দরনাথের ক্রোধ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের তিনটি অবিকল রাজমূর্তি-নির্মাণ করাইয়া গোময়স্তূপের নিকট রাখিলেন। তারপর উহাদের পিছনে থাকিয়া জলন্দরকে ডাকিতে রাজাকে আদেশ করিলেন,—রাজার তিনবার আহ্বানে তিনটি মূর্তি ভস্মীভূত হইয়া গেল। চতুর্থবার ডাকিতে রাজার আর সাহস হইল না। অথচ মচ্ছেন্দ্রনাথের আদেশও অবহেলা করিতে পারেন না। শেষে সাহসে ভর করিয়া আহ্বান করিতেই জলন্দর বলিলেন,—এখনও বাঁচিয়া আছ? রাজা বলিলেন,—ইহা তাঁহারই আশীর্বাদে। সন্ন্যাসী তাঁহাকে চিরজীবী হইতে আশীর্বাদ করিলেন। রাজা সন্ন্যাসীকে উঠাইয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন।

পূর্ণ অনুতাপী ওলখোনি চিহ্ন।
বৈরাগ্য বিধলে ত্যাগ কারণ॥

সৈলী মদ্রা কন্থা লেবোণ।
বিভূতি চর্চন-সর্বাঙ্গী ॥

সন্ন্যাসী রাজা প্রথমে বড় রাণীর নিকট গিয়া মাতৃ সম্বোধন করিয়া ভিক্ষা-চাহিলেন, রাণী অবাক্ হইলেন। অনুরোধ উপরোধে কিছু হইল না, তিনি—

"ভিক্ষা মাগতাঁ নগরান্তরী, গেলা মৈনাবতীচ্যা ঘরীঁ।
ক্ষণেঁ খাতে দুধ ভাত নিধারী, ভোজন সত্বরী ঘালাবেঁ ॥

দুধ ভাত খাইয়া তারপর তীর্থ যাত্রা করিলেন, পথে ভগিনী-পতির রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভগিনী চম্পাবতী, ভদ্রাবতী নগরাধিপের মহিষী।

"বাচী ভগিনী চম্পাবতী, ভদ্রাবতী নগরীঁ হোতী।"

কিন্তু তিনি সেখান থেকে গিয়া ১২ বৎসর ভারতের ৫৩ প্রদেশ ঘুরিলেন। শেষে কাঞ্চন নগরে ফিরিলেন, সেখানে মাতা ও গুরুর সঙ্গে দেখা হইল, গুরু তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া রাজ্যশাসন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন, হাজার বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া তিনি দেহ-ত্যাগ করেন।

সন্তলীলামৃতে আছে যে, গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথকে স্ত্রীরাজ্যে দেখিতে পান। সেখানে মৎস্যেন্দ্রনাথ সর্বেসর্বা হইয়া রাণী প্রেমলাকে লইয়া মাতিয়াছিলেন। মহীপতি, গোরক্ষ ও মৎস্যেন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মছন্দরনাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্য গোরখনাথ, প্রবাদ গোরখনাথ শিষ্য হইয়া তপ করিবার জন্য বনগমন করেন এবং বহু বর্ষ পরে ফিরিয়া আসেন, ইতিমধ্যে মছন্দর বিষয়-বাসনায় লিপ্ত হইয়া যোগভ্রষ্ট হন। এই সময় গোরক্ষ গুরুদেবের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। গুরু তখন বেশ্যার নাচ দেখিতে ছিলেন। দেখিয়াই গোরক্ষনাথ নিজ সিদ্ধি বলে এমনই লীলা করিলেন যে, বাদ্যযন্ত্র ধ্বনি করিতে লাগিল—"মছন্দর জাগ, গোরখ আসিয়াছে।" শুনিতে

শুনিতে মছন্দরের জ্ঞান হইল—গোরখকে ডাকিয়া বলিলেন,—এখন তুমি আমার গুরু।

হঠযোগ প্রদীপিকায় লিখিত আছে যে, চৌদ্দজন নাথ ছিলেন, ইহার প্রথম উপদেশে পাঁচটি শ্লোকে ইহাদের নাম—এইরূপ,—

শ্রীআদিনাথ মৎস্যেন্দ্র-শাবরা নন্দ ভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গী-মীন-গোরক্ষ-বিরূপাক্ষ-বিলেশয়াঃ॥
মন্থানো ভৈরবো যোগী সিদ্ধির্বদ্ধশ্চ কন্থতিঃ।
কোরন্টকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধ পাদশ্চ চর্পটিঃ॥
কানেরী পূজ্য পাদশ্চ নিত্যনাথো নিরঞ্জনঃ।
কপালী বিন্দুনাথশ্চ কাক চণ্ডীশ্বরাহবয়ঃ॥
অল্লামঃ প্রভুদেবশ্চ ঘোড়া চোলী চ টিন্টিণিঃ।
ভানুকী নরদেবশ্চ খণ্ড কপালিকস্তথা॥
ইত্যাদয়ো মহাসিদ্ধা হঠযোগ-প্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কাল দণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি তে॥"

ইহাদের বিশ্বাস, গোরখ অনাদি-অনন্ত পুরুষ, ইঁহারই ইচ্ছায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের জন্ম, ইনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নবনাথরূপে অবতীর্ণ হন।

গোরখপন্থীরা নবনাথের নাম উল্লেখ করিয়া থাকে। তাহাদের মতে নবনাথের নাম—১। একনাথ, ২। আদিনাথ, ৩। মৎস্যেন্দ্রনাথ, ৪। উদয়নাথ, ৫। দণ্ডনাথ, ৬। সত্যনাথ, ৭। সন্তোষনাথ, ৮। কূর্মনাথ, ৯। জালন্দরনাথ।

কিন্তু 'নবনাথভক্তিসার' নামক মরাঠী গ্রন্থে নবনাথের একটি শ্লোক আছে। শ্লোকটি এই—

"নবনাথাঁচা শ্লোক"

গোরক্ষজালন্দর চর্পটশ্চ অড্‌বঙ্গকান্হীপে মচ্ছিন্দরাদ্যাঃ॥
চৌরঙ্গিরেবাণ কতর্ত্তি সংজ্ঞা ভূম্যাং বদ্ধবুর্ণবনাথ সিদ্ধাঃ॥

এ ছাড়া ৮৪ জন সিদ্ধ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। সুধাকর-চন্দ্রিকায় উল্লেখ আছে—

নবইনাথ চলি আবহীঁ, অউ চউরাশী সিদ্ধ।
অহুটি বজরজরধরতী, গগন—গরুর অউ সিদ্ধ॥

৮৪ জন সিদ্ধের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল, নাথপন্থীরা এই সিদ্ধগণকে স্বীকার করিয়া থাকেন।

১। সিদ্ধনাথ, ২। বদ্ধপদ্মনাথ, ৩। দৃঢ়নাথ, ৪। বীরনাথ, ৫। পবনমুক্তনাথ, ৬। ধীরনাথ, ৭। শ্বাসনাথ, ৮। পশ্চিমতান-নাথ, ৯। বাতায়ননাথ, ১০। ময়ূরনাথ, ১১। মৎস্যেন্দ্রনাথ, ১২। কুক্কুটনাথ, ১৩। ভদ্রনাথ, ১৪। অর্ধপাদনাথ, ১৫। পূর্ণ-পাদনাথ, ১৬। দক্ষিণনাথ, ১৭। শবনাথ, ১৮। অর্ধনাথ, ১৯। ধনুষনাথ, ২০। পাদশিরানাথ, ২১। দ্বিপাদশিরানাথ, ২২। স্থিরনাথ, ২৩। বৃক্ষনাথ, ২৪। অর্ধবৃক্ষনাথ, ২৫। চক্রনাথ, ২৬। তালনাথ, ২৭। উধ্ব'ধনুষনাথ, ২৮। বামসিদ্ধনাথ, ২৯। স্বস্তিকনাথ, ৩০। স্থিতবিবেকনাথ, ৩১। উত্থিতবিবেকনাথ, ৩২। দক্ষিণতর্কনাথ, ৩৪। পূর্বতর্কনাথ, ৩৪। নিশ্বাসনাথ, ৩৫। অর্ধকূর্মনাথ, ৩৬। গরুড়নাথ, ৩৭। ব্যাঘ্রনাথ, ৩৮। বাম-ত্রিকোণনাথ, ৩৯। প্রার্থনানাথ, ৪০। দক্ষিণসিদ্ধনাথ, ৪১। পূর্ণ-ত্রিকোণনাথ, ৪২। বামভুজনাথ, ৪৩। ভয়ঙ্করনাথ, ৪৪। অঙ্গুষ্ঠনাথ, ৪৫। উৎকটনাথ, ৪৬। বামাঙ্গুষ্ঠনাথ, ৪৭। জ্যেষ্ঠিকানাথ, ৪৮। বামার্ধপাদনাথ, ৪৯। বামভুজপাদনাথ, ৫০। ভুজপাদনাথ, ৫১। বামবক্রনাথ, ৫২। বামজানুনাথ, ৫৩। বামশাখনাথ, ৫৪। ত্রিস্তম্ভনাথ, ৫৫। বামপাদাপাননাথ, ৫৬। বামহস্তচতুষ্কোণ-নাথ, ৫৭। গোমুখনাথ, ৫৮। গর্ভনাথ, ৫৯। একপাদবৃক্ষনাথ, ৬০। মুক্তহস্ত-বৃক্ষনাথ, ৬১। হস্তবৃক্ষনাথ, ৬২। দ্বিপাদপার্শ্বনাথ, ৬৩। কন্দপীড়ননাথ, ৬৪। প্রৌঢ়নাথ, ৬৫। উপধাননাথ, ৬৬। উধ্ব'সংযুক্ত পাদনাথ, ৬৭। অর্ধশবনাথ, ৬৮। উত্তমকূর্মনাথ, ৬৯।

সর্বাঙ্গনাথ, ৭০। অপাননাথ, ৭১। যোনিনাথ, ৭২। মণ্ডুকনাথ, ৭৩। পর্বতনাথ, ৭৪। শলভনাথ, ৭৫। কোকিলনাথ ৭৬। লোলনাথ, ৭৭। উষ্ট্রনাথ, ৭৮। হংসনাথ, ৭৯। প্রাণনাথ ৮০। কার্মুকনাথ, ৮১। আনন্দমন্দিরনাথ, ৮২। খঞ্জননাথ, ৮৩। গ্রন্থিভেদনাথ, ৮৪। ভুজঙ্গনাথ।

নাথদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আসন নিরূপণ জন্য এই নামগুলির কল্পনা করা হইয়াছে।

নবনাথদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথই বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার সম্বন্ধে ভারতের সর্বত্রই অদ্ভুত অদ্ভুত প্রবাদ আছে। প্রবাদগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

গোরক্ষরাজ্যের তিনি মঙ্গল-দেবতা ছিলেন, পরে নেপাল রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নেপালরাজ্য মৎস্যেন্দ্রের অধিকার হইতে চ্যুত করেন।

তারনাথ বলেন (Geschichte des Buddhismus in Indian, 174, 255, 323), তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি খুব ভাল জাদু জানিতেন, ইঁহার কানফট্ শিষ্যরাও বৌদ্ধ ছিল। ইহারা দ্বাদশ শতকের শেষভাগে সেনবংশের পতনের পর বৌদ্ধ হয় (Sylvain Levi, Le Nepal, i, 355-56)।

গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে বহু-স্থানে নানা প্রবাদ আছে—

(১) রাইট সাহেব তাঁহার নেপাল-ইতিহাসে (পৃঃ ১৪০) লিখিয়াছেন, নেপালে প্রবাদ যে, গোরক্ষনাথ জলের সমস্ত উৎপত্তি-স্থান বন্ধ করিয়া দিয়া ১২ বৎসর অনাবৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রবাদ একই রকম, তবে জলের মুখ ছাড়িয়া দিবার পদ্ধতি অন্যরূপ (Sylvain Levi, Le Nepal, i, 348, 351)।

(২) রাজা রসালু পঞ্জাবের একজন বীর, সিয়ালকোটের রাজা শালবাহন দুইটি বিবাহ করেন, এক পত্নী রাণী লোনান সপত্নী পুত্র পুরণের প্রতি আসক্ত হন, কিন্তু পুরণ তাঁর অভিলাষ পূর্ণ না করায়

রাণী তাঁর শাস্তিবিধান করেন। তাহাতে পুরণের হাত-পা কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু গোরক্ষনাথের কৃপায় পুরণ সারিয়া গিয়া ফকীর হন, গোরক্ষের প্রসাদে রসালুর জন্ম হয়, রসালু ও শ্রীসিয়ালপতি একব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে (R. C. Temple, Punjab Legends, i, l. Stel., 247)।

(৩) গুঁগা পীর। গুঁগা পীরের বাপ তাঁহার পত্নীকে তাড়াইয়া দেন। পত্নী গোরক্ষনাথের নিকট কয়েকটি মরিচ পান। গোরক্ষনাথ তাহা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে বলেন, তাহা খাইয়া গুঁগার জন্ম হয়, ইহার পিতার ঘোটকীও দুধ ও মরিচের পাত্র লেহন করিয়া গর্ভবতী হয়।

(৪) গুঁগার মাসীও দুইটি যব পাইয়াছিলেন। তাহাতে দুইটি পুত্র প্রসব করেন, (North Indian Notes and Queries, iii, 95 Par, 205 ; Elliot, N. W. Provinces, i, 256 ; Crooke, F. L. N. I., i, 211.)

মৎস্যেন্দ্রের শিষ্য হইয়াও, গোরক্ষনাথ গুরুকে পুণ্যে অতিক্রম করিয়াছিলেন, ভারতের সর্বত্র গোরক্ষনাথ পূজিত, অনেক তীর্থস্থানে গোরক্ষনাথের মন্দির আছে, কাটিয়াবাড়ে "গোরখ-মড়ি" নামে একটি ছোট মন্দির আছে। এখানে ইহার পূজা হয়। তবে হরিদ্বারের নিকট গোরখপুরে, নেপালে ও পঞ্জাবে ইহার পূজা বেশী হইয়া থাকে। ইনি নেপালের গোরখালিদের দেবতা, ইনি কচ্ছেও আসিয়াছিলেন, এই প্রদেশে ধমকদার নিকট ইঁহার নামে একটি কূপ আছে, সেখানে ইনি চিরঞ্জীবী বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

(৫) নেপাল তরাইএ একটি প্রবাদ আছে। যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভ্রাতার সঙ্গে যখন মহাপ্রস্থান করিতে ছিলেন, তখন সকলেই মরিয়া যান, কেবল ভীম জীবিত থাকেন, ইঁহাকে গোরক্ষনাথ রক্ষা করেন ও নেপালের রাজা করেন (Grierson, 138)।

(৬) সিদ্ধ গোরখনাথ যখন কামাখ্যায় গিয়াছিলেন, তখন এক দুষ্টা স্ত্রী ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে গোরখনাথের এক গরীব চেলার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকে নিজের কাছে আট্‌কাইয়া রাখে। গোরখনাথ রাগিয়া সেই রাজ্যের সকলকে পাথর করিয়াছিলেন, পরে সেখানকার রাজা কাঁদিয়া তাহার চরণে পতিত হইলে কৃপা করিয়া সকলকে উদ্ধার করিলেন।

ক্রুকও অনেকগুলি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রবাদ অনুসারে তিনি সর্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এমন কি, তিনি ব্রহ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মানবের ভাগ্যও পরিবর্তন করিতে পারিতেন, গ্রিয়ার্সন বলিয়াছেন যে, কখনও কখনও তাহাকে শিবের চেয়েও বড় বলিয়া দেখানো হইয়াছে, (J. A. S. B. pt. 1, 1878, 139)। বুকানন হ্যামিলটন গোরখনাথের অলৌকিক শক্তির উদাহরণ দিয়াছেন, [Mont Martin's Eastern India, ii, 484]।

সত্য যুগে গোরখনাথ পঞ্জাবে বাস করিতেন, ত্রেতায় গোরখপুরে, দ্বাপরে হরমুদে এবং কলিতে কাটিয়াবাড়ে 'গোরখ-মড়িতে' অবস্থিতি করিতেছেন।

নেপালের অধিষ্ঠাতৃদের মচ্ছীন্দ্রনাথের একটি উৎসব নেপালে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, বোগমতী গ্রামে মচ্ছীন্দ্রনাথের একটি মন্দির আছে—সেই মন্দিরে তাঁহার বিগ্রহও আছে। বৈশাখের প্রথম দিবসে উৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ঐ দিন মচ্ছীন্দ্রনাথকে পবিত্র জলে স্নান করানো হয় এবং রাজার তরবারিও তাঁহাকে দেওয়া হয়। তারপর বিগ্রহটিকে প্রকাণ্ড রথে আরোহণ করাইয়া পাটনে লইয়া যাওয়া হয়। রথমধ্যে একটি সুন্দর আসন পত্রপুষ্পে সজ্জিত করা হয়। তাহার উপর বিগ্রহটিকে বসাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপে অলঙ্কৃত করিয়া রথটিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পথে নির্দিষ্ট স্থানে বিগ্রহটি একদিন করিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন, যে যে স্থানে

মচ্ছীন্দ্রনাথ বিশ্রাম করেন, সেইখানকার অধিবাসীদের ব্যয়ে সহযাত্রীদের ভোজনাদি নিষ্পন্ন হয়। সাধারণত সাতদিন রথযাত্রা হইয়া থাকে। মচ্ছীন্দ্রনাথ পাটনে একমাস থাকেন, পরে কোন শুভদিনে তাঁহাকে বোগমতীতে ফিরাইয়া আনা হয়। নেপালে এই শুভদিনের একটি বিশেষ নাম আছে—ইহাকে তাহারা 'গুদ্‌রিঝাড়' বলিয়া থাকে। গুদ্‌রি শব্দের অর্থ কম্বল। ঐ দিন সকলের সম্মুখে মচ্ছীন্দ্রনাথের কম্বল ঝাড়া হইয়া থাকে। কম্বল ঝাড়িয়া তাহারা দেখাইতে চায় যে, মচ্ছীন্দ্র কিছুই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন না। ইহার অর্থ এই যে, মচ্ছীন্দ্র সর্বশূন্য হইয়াও সন্তুষ্ট।

ঠাকুরীবংশের প্রথম রাজা অংশুবর্মা। ইহার রাজত্বকালে কলিযুগের ৩০০০ বৎসর অতীত হয়। ইহার বংশের ৫ম রাজা বীরদেবের সময় কলিযুগের ৩,৪০০ বৎসর অতীত হয়। অতঃপর চন্দ্রকেতু রাজা হন। ইঁহার পর তৎপুত্র নরেন্দ্রদেব ৭ বৎসর রাজত্ব করেন, তারপর নরেন্দ্রের পুত্র বরদেব রাজা হন। ইহার সময়ে গোরক্ষনাথ নেপালে শুভাগমন করেন, এখানে আসিয়া তিনি এইরূপে ধ্যান করিতে থাকেন,—"এই বিশ্বে সচ্চিদ্‌-রূপী নিরঞ্জন ও অন্যান্য বুদ্ধগণ লোকসৃষ্টি করিবার জন্য পঞ্চতত্ত্বের সৃষ্টি করেন এবং পঞ্চবুদ্ধের রূপ ও নাম গ্রহণ করেন। অমিতাভ-পুত্র চতুর্থ বুদ্ধ —ইঁহার নাম পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব। ইনি তাঁহার মন হইতে উৎপন্ন হইয়া 'লোকসংসর্জন' নামক সমাধিতে সমাসীন হন। আদি বুদ্ধ তাঁহাকে লোকেশ্বর নামে অভিহিত করিয়া তাঁহার উপর লোকসৃষ্টির ভার দিলেন। তারপর তিনি ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবের সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবের সংরক্ষণে নিরত হইয়া 'সুখাবতীভুবনে' উপবিষ্ট বলিয়া ইহার নাম হইল—'আর্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি-বোধিসত্ত্ব।' এই বুদ্ধ সুখাবতী হইতে 'বঙ্গ' নামক স্থানে আসেন, এইখানে শিব তাঁহার নিকট হইতে 'যোগজ্ঞান' শিক্ষা করেন, ইহার ফলে যোগী গভীর ধ্যানের দ্বারা পরম পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়।

শিব যোগজ্ঞান শিক্ষা করিয়া পার্বতীর সহিত গৃহে ফিরিতে ফিরিতে একরাত্রি সমুদ্রতীরে অবস্থান করেন। শিব যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিবার জন্য পার্বতী এই সময় শিবকে অনুরোধ করেন। শিব বলিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু পার্বতী শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়েন। আর আর্যাবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণিবোধিসত্ত্ব মীনাকৃতি ধারণ করিয়া পার্বতীর হইয়া 'হুঁ' দিয়া যাইতে ছিলেন। এদিকে পার্বতী জাগিয়া যেরূপ ভাব দেখাইলেন, তাহাতে শিব বুঝিলেন, পার্বতী সব শোনেন নাই। ইহাতে শিবের সন্দেহ হইল, নিশ্চয় অপর কেহ শুনিয়াছে। তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'যে শুনিয়াছ, বাহির হও, নতুবা আমি অভিশাপ দিব।' ইহা শুনিয়া লোকেশ্বর তাঁহার প্রকৃত আকার ধারণ করলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিব তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করায় লোকেশ্বর তাঁহার প্রতি কৃপা পরবশ হন। এইদিন হইতে মৎস্যাকৃতি গ্রহণের জন্য লোকেশ্বর মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে পরিজ্ঞাত হন।

তারপর গোরক্ষনাথ জানিতে পারিলেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রত্যহ 'কামণি' পর্বতে যাইতেন। কিন্তু এটুকুও বুঝিলেন যে, সেই স্থানে উপস্থিত হওয়াও বড় কষ্টকর। কিন্তু যিনি সমস্ত দেবতাদের গুরু এবং লোকের সৃষ্টিকর্তা, তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা এতই বলবতী হইল যে, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। ভাবিতে লাগিলেন যে, মৎস্যেন্দ্রনাথকে না দেখিতে পাইলে তাহার জীবন থাকা না থাকা সমান, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মৎস্যেন্দ্রনাথকে তাহার সম্মুখে আনিবার এক মতলব ঠিক করিলেন। তিনি নবনাথকে ধরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন কাজেই তাহারা আর বৃষ্টি দিতে পারিবে না। এইরূপ অনাবৃষ্টি হইলে লোকে হাহাকার করিবে—তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৎস্যেন্দ্রনাথকে তাহাদের দুঃখমোচনের জন্য আসিতেই হইবে।

এই অভিপ্রায়ে গোরক্ষনাথ নবনাথকে একটি পাহাড়ে আকৃষ্ট করিলেন এবং নিজে তাহার উপর বসিলেন। ফলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হইল। লোকেদের কষ্টের একশেষ হইল ; রাজা বরদেব উপায়ান্তর না দেখিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন। এই দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার আশায় তিনি দেশের বৃদ্ধদের কথা শুনিবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন রাত্রে তিনি ত্রিরত্ন-বিহারে যান। সেখানে আচার্য বন্ধুদত্ত থাকিতেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, বন্ধুদত্ত তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে নানা কথা কহিতেছেন। কথায় কথায় তাঁহার স্ত্রী অনাবৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করায় বন্ধুদত্ত বলিলেন, কাপোতল-পর্বতবাসী আর্যাবলোকিতেশ্বরের কৃপা ব্যতীত বৃষ্টি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু রাজার প্রার্থনা ভিন্ন তিনি আসিবেন না। রাজা এদিকে নির্বোধ, পিতা নরেন্দ্রদেবের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না বলিয়া তাঁহার পিতা বিহারে বাস করিতেছেন, এই কথা শুনিয়া রাজা ফিরিলেন এবং বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া আসিয়া বৃদ্ধ আচার্যকে অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য অনুরোধ করিলেন। বন্ধুদত্ত স্বীকৃত হইয়া রাজাকে লইয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি যোগাম্বর-জ্ঞান-ডাকিনীকে সম্বোধন করিয়া পুরশ্চরণ করিলেন। কোটি মন্ত্র জপের পর তিনি প্রীত হইলেন। আচার্য তখন গোরক্ষনাথের কবল হইতে কর্কট-নাগকে মুক্ত করিলেন এবং কাপোতল পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন।

নাথদিগের মধ্যে গোরক্ষনাথের নামই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি ভিন্ন অন্যান্য কয়জন নাথের মতবাদও নাথপন্থীদের মধ্যে বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইরূপ কয়জন নাথের নাম করা যাইতে পারে।

ঈশ্বরনাথ একজন বড় সংযমী নাথ ছিলেন। ইনি সকলকে সংযম-শিক্ষা দিতেন এবং পরমতত্ত্ব সৎস্বরূপ ঈশ্বরকে ভজনা করিতে উপদেশ দিতেন।

চরপটনাথ নাথগুরু ছিলেন। ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না, ইহাই তাঁহার প্রধান মত। ষড়্‌রিপু বশীভূত করিবার প্রণালী ইনি শিক্ষা দিতেন।

নাথযোগী ভর্তৃহরি বা ভরথরী কতকগুলি মুদ্রা সাধন করিতেন। তিনি সাধারণত বলিতেন ত্রিকুটির মণ্ডলের যে চৈতন্যপুঞ্জ বিরাজিত আছে তাহা উল্টাইয়া দিয়া লাভ কি? ঊর্ধ্বকে অচল স্থির করিয়া দেওয়াই পরম কার্য। পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের সন্ধিস্থানে (ইঁহাদের সাঙ্কেতিক শব্দ 'অর্ধ ঊর্ধ্ব') নিরঞ্জন বাস করে। ইড়া পিঙ্গলার একীকরণরূপ গ্রন্থি স্থির করিতে হইবে। এটি প্রধান সাধন। ইড়া পিঙ্গলাকে ইহারা 'চন্দ্র সূর্য' বলিয়া থাকে।

ঘুঘুনাথের প্রধান উপদেশ এক সমস্যার মধ্যে ছিল। তিনি বলিতেন,—

"ঘুঘুনাথ পায়বো, জতীন কহায়বো।
সিদ্ধোন নাথবো, বোলবো পকড়াইবো॥
জদ অনহদ ভরম সুনায়বো।
সম একংকার খেলবো, শিবশক্তিম মেলবো॥
ধ্যানন ধরায়বো। উচঁ নীচ কহায়বো।"

চম্বানাথ ঘুঘুনাথের বিপরীত উপদেশ দিয়া বলিতেন যে, যাহা বক্তব্য তাহা বলিবে, যাহা শ্রোতব্য তাহা শুনিবে, যাহা কর্তব্য তাহা করিবে। কোনরূপ বিচার করিবে না। সকল সময় কিন্তু হৃদয়ে ধ্যান লাগাইয়া থাকিবে।

খিস্থড়নাথ সাম্যবাদ প্রচার করিতেন। আর 'শব্দ বিচার' উপদেশ করিতেন।

ধর্মনাথ সিদ্ধোপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন। ইনি গুরুসেবা শিক্ষা দিতেন।

ধঙ্গরনাথ 'প্রণব' সাধন বিশেষ করিয়া প্রচলন করেন। ইঁহার অন্যান্য মত গোরক্ষপন্থীদের ন্যায়।

প্রাণনাথ একজন বড় সাধক—ইঁহার প্রধান উপদেশ ছিল—

"নাম ভগতা সত্ত জুগতা, দৃঢ়তা রহিতো অরোগঁ।
প্রীতি লচ্ছণ উপদেশ অচ্ছণ, প্রেম পাযবো জোগঁ॥"



কবীরপন্থী

কবীর ভারতীয় একজন ধর্মোপদেষ্টা ও প্রচারক। তিনি ১৪৪০ হইতে ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরভারতে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত শঙ্করাচার্যের মতো রহস্যময়। কেহ বলেন, তাঁহার মাতা বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন। রামানন্দ তাঁহাকে বিধবা না জানিয়াই সন্তান হউক বলিয়া আশীর্বাদ করেন। মা লোকাপবাদের ভয়ে সন্তান ফেলিয়া চলিয়া যান। কেহ বলেন, রামানন্দের আশীর্বাদে মায়ের হস্ত হইতেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, এইরূপ তিনি আশীর্বাদ করেন। এই সমস্ত গল্পেই স্বীকার করা হইয়াছে, নিরু তাঁতি ও মাতা নীমা কবীরকে পালন করিয়া মানুষ করেন। কবীরপন্থীরা বলেন, নীমা দেখিতে পান বারাণসীর একটা পুকুরে পদ্মের উপর শিশু ভাসিতেছে।

শিশু অবতার। কবীরের পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী সম্বন্ধেও এইরূপ অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত জনশ্রুতি আছে। কবীর বারাণসীর উপকণ্ঠে আজীবন তাঁতির জীবনই যাপন করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মোপদেশের জন্য হিন্দু মুসলমান, দুই সম্প্রদায়ই তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া উঠে। তিনি এই জন্য দিল্লীর বাদশাহ সেকেন্দার আলীর কাছে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। তিনি দুর্নামগ্রস্তা স্ত্রীকে সঙ্গিনী করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দুর্নামের ভাগী করিতেন। রয়দাসও নিম্নজাতি বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ঘৃণা করিত। গোরক্ষপুরের নিকটবর্তী 'মঘর' নামক স্থানে কবীরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরই তাঁহার দেহ লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিরোধ আরম্ভ করে। হিন্দুরা তাঁহার দেহের অর্ধাংশ পোড়াইয়া ফেলিতে চায়, মুসলমানেরা অর্ধেক কবর দিতে চায়। কিন্তু এই ভাবে কবীরের মৃত দেহের ব্যবস্থা করিলেও

তিনি স্বশরীরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার শবদেহের আবরণ উন্মোচন করিতে বলেন। উন্মোচন করিয়া তাহারা দেখিল, আবরণের নীচে মৃতদেহ নাই, পুষ্পরাশি পড়িয়া আছে মাত্র। এই পুষ্পরাশিরই অর্ধেক বারাণসীতে কবীর-চৌরায় হিন্দুরা দাহ করেন, বাকী অর্ধেক মুসলমানেরা 'মঘরে'ই কবর দেন। এই 'মঘর'ই কবীরপন্থী মুসলমানদের প্রধান স্থান। ঐখানে একটি কবর নির্মিত হয়। পরে ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে মোগলবাহিনীর একজন কর্মচারী কর্তৃক ইহার পুনঃসংস্কার হয়।

ভারতের ধর্মমতের ইতিহাসে কবীরের স্থান কোথায়, তাহার আলোচনা হওয়া উচিত। তিনি রামানন্দের শিষ্য ও বৈষ্ণব। উত্তরভারতে প্রথম তিনি তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু মুসলমানকে এক সঙ্গে ধর্মমতে উদ্বুদ্ধ করিতে তিনিই বোধ হয়, প্রথম বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছেন। যদিও তাঁহার মতানুবর্তীর সংখ্যা যথেষ্ট, তাহা হইলেও তাঁহার ধর্মমতের বিশিষ্ট ফল আমাদের চক্ষুতে সহজে পড়ে। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নানক ইঁহারই ধর্মমতের একটি প্রধান ফল। কেহ কেহ বলেন যে, কবীর স্থূফী সম্প্রদায়ের মুসলমান ছিলেন।

লক্ষ্ণৌ-এর G. H. Westcott এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, কবীর নিশ্চয়ই মুসলমান ছিলেন, অন্তত স্থূফী সম্প্রদায়ের ধর্মমত সম্বন্ধে তাঁহার কিছু জ্ঞান ছিল। কবীর হিন্দুদের বাহ্যিক চিহ্ন যাহা কিছু, সমস্তই পরিবর্জনের মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেই ধর্ম হয় তিনি তাহা মানিতেন না। তিনি অনশনব্রত, ভিক্ষাব্রত মানিতেন না, এমন কি ষড়্‌দর্শনের সিদ্ধান্তকেও মানিতেন না। তিনি নিরক্ষর নিম্নজাতীয় লোক ছিলেন, সম্ভবত সেই জন্যই সংস্কৃত দর্শনের সঙ্গে পরিচয়ের স্থযোগ তাঁহার ঘটে নাই। বিশ্বাসই কবীরের সিদ্ধান্তের মূল কথা। তিনি রামনামের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি রাম অর্থে

যে বিষ্ণু বুঝিতেন, তাহা বোঝা যায় না। কবীর বলেন, বিশ্বাস, ভক্তি, ও সৎকার্যেই মুক্তি পাওয়া যায়, শুধু জ্ঞান দিয়া মুক্তিলাভ অসম্ভব।

কবীর মুসলমানদের বলিতেন, তোমরা মালা জপে, মন্দির অভিবাদনে ও আচমনাদিতেই কি ভগবান্‌কে পাইবে? তা যদি পাও তো স্ত্রীলোকদের সেরূপ করিতে দাও না কেন? মক্কা মদিনায় গেলেই বা তোমার কি হইবে? অন্তরে যদি সরলতা না রহিল, তবে বাহ্যিক অনুষ্ঠানে লাভ কতটুকু? হিন্দুদের বলিতেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেই যদি ব্রাহ্মণ হওয়া যায় ত এ সুবিধা তোমরা স্ত্রীলোকদের দাও না কেন? সকল ধর্মেই ঈশ্বর ত এক, তবে এত বিভিন্নতা কেন? আমি আলিকেও জানি, রামকেও জানি।

রাম করিম সমান, রাম করিম এক, ইহা তোমরা মানিও। বহু দেবতার পূজা ভুল। মায়া বা ভ্রান্তি হইতে ইহাদের উৎপত্তি। ইহার উৎপত্তিই যখন পাপ হইতে, তখন ইহার উপাসনাতেও পাপ হয়। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে পথপ্রদর্শক বা গুরুর প্রয়োজন। যিনি ঈশ্বরকে জানেন, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য। কারণ অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইবে কি উপায়ে? অন্ধ অন্ধকে চালাইলে উভয়েই গর্তে পড়িয়া যাইবে। গুরুরই যখন সম্বল নাই। তখন শিষ্যের আর কি উপায় আছে। মূর্খকে লাঠি মারিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় না। অনুশাসনের মূল্য আছে, কিন্তু উহাকে অমূল্য মনে করিবার কোন কারণ নাই।

শব্দের উপর কবীরের অগাধ বিশ্বাস। হিন্দুদের বলেন, বোধ ও অনুমানের দ্বারাই জ্ঞান লভ্য। বৈষ্ণবেরা ইহার সঙ্গে আবার শব্দব্রহ্মকে সংযোগ করেন। যাহা ভগবানের বাণী, যাহা সত্য, তাহাই বোধ্য ও অনুমান দ্বারা প্রচারিত ও গৃহীত হইবে। যদি কেহ সত্যকে জানিতে চায়, তাহাকে শব্দব্রহ্মকে, শব্দ তত্ত্বকে জানিতে

দাও। আমি সেই শব্দই ভালবাসি, যে শব্দে ভগবানকে পাওয়া যায়। শব্দদ্বার রুদ্ধ থাকিলে মানুষ বিপদগামী হইবে। শব্দ ছাড়া কোন শাস্ত্রের অস্তিত্ব নাই। কবীর সুস্পষ্টভাবে স্বর্গ নরক নির্দেশ করেন নাই। তিনি বরং বলিয়াছেন, সুখের নামই স্বর্গ, দুঃখের নামই নরক। বর্তমান কবীরপন্থীরা বিশ্বাস করে, পুনর্জন্মের জন্য পাপ ও পুণ্যে স্বর্গ নরক ভোগ করে। কবীরের শিক্ষা যাহা কিছু তাহা বাচনিক। উত্তর ভারতে ছন্দোময়ী, শেষ পদে মিল আছে, এমন হাজার হাজার কবিতা কবীরের দোঁহা বলিয়া প্রচলিত। ইহা ছাড়াও কবীরপন্থী মোহান্তদের নামে প্রচুর স্তোত্রাদি আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উইলসন সাহেব খাস গ্রন্থসুদ্ধ ২০ খানি গ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেকগুলিই এখনও হস্তে লিখিত পুথি। কবীরের দোঁহা সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও তাঁহার মৃত্যুর ৫০ বছর পরে বিজক টীকা-সুদ্ধ ছাপা হইয়াছে। ভজদাস কবীরের শিষ্য ইহা সম্পাদন করিয়াছেন।

'মঘর' কবীরপন্থী মুসলমানদের প্রধান স্থান ছিল, পূর্বেই বলা হইয়াছে। হিন্দু কবীরপন্থীদেরও দুইটি বিভাগ আছে। কাশীধামে তার প্রধান বিভাগ। দ্বিতীয় বিভাগ মধ্যপ্রদেশে ছত্রগড়ে। ধর্মদাস ইহার স্থাপয়িতা। ইনি একজন বণিক ছিলেন। কবীর কর্তৃক পৌত্তলিকতার জন্য ভৎর্সিত হন। যদিও কবীর জাতিভেদ মানিতেন না, কিন্তু আধুনিক কবীরপন্থীরা নীচ জাতিকে অন্যান্য সম্প্রদায়ে যোগ দিতে বলে এবং তাহাদের ব্যবহৃত জপমালা ব্যবহার করিতে দেয় না। দ্বিজ জাতে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে। স্ত্রীলোকেও মালা ব্যবহার করিবে, কিন্তু বিবাহের পূর্বে নহে। সে তাহার স্বামীর গুরুর শিষ্য হইতে পারে না। কারণ গুরুর শিষ্যে স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই ভাইবোন।

দীক্ষা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্র দেওয়া হয়।

ধর্মদাসের সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীক্ষার প্রচলিত মন্ত্রাদির কিছু কিছু প্রভেদ আছে। প্রত্যেক রবিবারে চান্দ্রমাসের শেষ দিনে উপবাসের প্রথা আছে। সন্ধ্যাবেলায় নিমন্ত্রণাদির ব্যবস্থা হয়। তারপর কিছু কিছু পাঠ হয়, একজন মোহান্ত বক্তৃতা করেন, তারপর স্তোত্র গীত হয়। বিশুদ্ধ জল ও পান দীক্ষায় প্রয়োজন। সন্ন্যাসজীবনে উৎসাহ দেওয়া হয়। দুই বৎসর শিক্ষানিবীশ থাকিয়া স্ত্রীলোকদেরও সন্ন্যাসিনী হইতে উৎসাহ দেওয়া হয়। সাধারণত বিধবা বা বিবাহিতা স্ত্রীকেই এই সুবিধা দেওয়া হয়। বর্তমান মোহান্তদের পড়াশুনা খুব কম। কাহারও কাহারও বিদ্যা তুলসীদাসের রামায়ণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

বল্লভাচার্য

হিন্দুধর্মের শক্তি বিভিন্ন দিকে প্রসারিত। ইহার দ্বারা ভালমন্দ দুই-ই হইয়াছে। হিন্দুধর্ম হইতে যে কত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বৈষ্ণব-ধর্মও বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, শৈবধর্মেও এই সম্প্রদায় বিভাগ আছে। হিন্দুধর্মে অবতারবাদের কথা আছে। দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও শোক-দুঃখ-মুগ্ধ মানুষকে শান্তি দেওয়ার জন্য ভগবানের অপরিসীম অনুকম্পায় অবতার ধরাতলে আসেন। জনসাধারণ মনে করে ধর্মের এই উপাদানে শ্রদ্ধা ও প্রেমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। ধর্মগত জীবনে ব্যক্তিত্বের উপাদানে ক্রমশ সম্প্রদায় গঠিত হয়। এইরূপে বৈষ্ণবধর্মের চারিটি প্রধান সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে রামানুজ ও মধ্ব, পশ্চিম ভারতে বল্লভ ও বাঙলায় চৈতন্য চারিটি প্রধান সম্প্রদায় গঠন করেন। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম দুই সম্প্রদায়ের মত দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জড় জগতের সহিত ঈশ্বর ও আত্মার সম্বন্ধ বিশেষ-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। শেষোক্ত দুই সম্প্রদায় দার্শনিক প্রশ্নের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের উপাস্য। এই চারিটিই প্রধান বৈষ্ণবধর্ম। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও আছে। নারায়ণস্বামী বল্লভাচারীদের অনাচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কবীরপন্থী ও নানকের শিখ সম্প্রদায়ও ইহার অন্তর্গত।

বল্লভাচার্যকে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মনে করে। বল্লভাচার্যের মতপ্রাধান্যের জন্য ও ধর্মগুরু হিসাবে তাঁহার নামে অনেক গল্পাদি জড়িত আছে।

১৪৭৯ খ্রীস্টাব্দে বল্লভাচার্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ত্রৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ

লক্ষ্মণভট্টের ইনি দ্বিতীয় পুত্র। মুসলমান ও সন্ন্যাসীর একবার বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় পত্নীসহ তিনি বারাণসী হইতে পলায়ন করেন। চম্পারণ্য নামক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বল্লভাচার্য ভূমিষ্ঠ হন। জনশ্রুতি যে, যেখানে এই শিশুকে প্রসব করা হয়, অকস্মাৎ সেখানে স্বর্ণপ্রাসাদ ভূমি হইতে উত্থিত হয়। এই সময় দেবতারা পুষ্প-বৃষ্টি করিয়াছিলেন, দেবসংগীতে গগন মুখরিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, এই শিশু ভগবানের অবতার, এই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া তিনি শিশুকে ঐস্থানে পরিত্যাগ করিয়া যান। বারাণসীতে শান্তি স্থাপিত হইলে তাঁহারা ফিরিবার মুখে, শিশুকে যেখানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, শিশু জীবিত আছে, ভাল আছে। যজ্ঞাগ্নি-শিখার মধ্যে শিশু খেলা করিতেছে। শিশুকে তাঁহারা বারাণসীতে লইয়া আসিলেন এবং তাহার 'বল্লভ' নাম রাখিলেন। শিশুর বয়স পাঁচ-ছয় বৎসর। তখন নারায়ণভট্টের কাছে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। ব্রজভাষায় লিখিত আখ্যায়িকায় আছে, চারি বেদ ও ষড়্দর্শন এবং অষ্টাদশ পুরাণ পাঠ শিশু শেষ করে। এগার বৎসরে বল্লভ পিতৃহারা হন, এবং যমুনার বামপার্শ্বস্থ গোকুলের সঙ্গে চিরদিনের জন্য সম্পর্করহিত করিয়া তিনি ভারতের তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। দাক্ষিণাত্যের কোন শহরের এক বিখ্যাত ধনী দামোদর দাস ইহার ধর্মে দীক্ষিত হন। এই দুইজন বিজয়নগরে যান। বিজয়নগরে তাঁহার মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়েরা ছিলেন। ঐ স্থানের রাজা কৃষ্ণদেবের সভায় শৈবদেব সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধীয় তর্কবিতর্ক আরম্ভ হয়। এই তর্কযুদ্ধে বল্লভের উপর রাজা এতই খুশী হন যে, রাজা তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ রৌপ্য উপহার প্রদান করেন। এই উপহারের তিনি সদ্ব্যবহার করিলেন। এই উপহারের এক অংশ তিনি ঐ নগরস্থ মন্দিরের দেববিগ্রহের কোমরের স্বর্ণালঙ্কার প্রণেতাকে দান করেন। এক

অংশ নিজের জন্য রাখিয়া পৈতৃক ঋণের জন্য বাকীটা তিনি ব্যয় করেন। বৈষ্ণবেরা একবার তাঁহাকে আচার্যপদে অভিষিক্ত করিয়া প্রচারে পাঠান। সেই হইতেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেন। নয় বৎসর তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। বার হাজার মাইলেরও উপর তিনি ভ্রমণ করেন এবং বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। কথিত আছে, ইহার পরই স্বশরীরে কৃষ্ণ তাঁহাকে বৃন্দাবনে দেখা দিয়াছিলেন। ইনি বালক কৃষ্ণ বা শিশু কৃষ্ণের পূজা করিতে ইহাকে বলেন। সেই হইতেই এই সম্প্রদায় রুদ্র সম্প্রদায় বলিয়া বিখ্যাত হয়।

বল্লভাচার্য অবশেষে বারাণসীতে অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। ইনি অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ভাগবত পুরাণের টীকা করেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি ৮৪ জনে স্বমতে দীক্ষিত করেন। বল্লভাচার্য তাঁহার গদীতে বসেন, তিনিই প্রধান আচার্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিঠলনাথ গদীতে বসেন। এই সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় গুরুও খুবই যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পিতার মতো তিনিও বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। বল্লভাচার্য যে সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা ছাড়াও বিঠলনাথ কচ্ছের মধ্য দিয়া দ্বারকা, মল্ল ও মেবার পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। দক্ষিণ দিকে আসিয়া তিনি পাণ্টারপুরে আসেন। দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রদের বিশোবার পূজা এইখানে হয়। তিনি ২৫২ জন শিষ্য করেন। বিভিন্ন শ্রেণী হইতে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বর্ধিত হইয়াছিল। বেনিয়া, ভাটিয়া, কুম্বী, সূতার, লোহার, ব্রাহ্মণ ও মুসলমান এই ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। যদিও প্রথম ধর্মসমন্বয় হইয়াছিল, শেষ পর্যন্ত তাহা আর থাকে নাই।

গোসাঁইজী নামে বিঠলনাথ পরিচিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান গোকুলে তিনি বাসস্থান নির্দেশ করেন। পরে তিনি গোকুল গোসাঁইজী বলিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে

তাঁহার সাতপুত্র গদীতে বসেন। তাঁহারাও ভারত প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের মতবাদ প্রচার করেন। প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া নিজেকে প্রচার করিয়াছেন, এবং অসংখ্য শিষ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

চতুর্থ পুত্র গোকুলনাথ ইঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং নূতন ধর্মমতও তিনি প্রচার করেন। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে লেখা দ্বারা এবং উপদেশ দ্বারা জীবনীশক্তি প্রদান করেন। তাঁহার বংশধরেরাই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশী প্রাধান্য দাবি করেন। তাঁহারা তাঁহাদের অন্য সম্প্রদায় হইতে আলাদা রাখেন। অথচ তাঁহারা প্রচার করেন, সকলকেই সমান শ্রদ্ধা করিবে। সম্ভবত বিঠলনাথের পুত্রগণের তিরোধানের সময়ই, মহারাজারা গোসাঁইজী উপাধি, ধর্মগুরুর আচার্য যিনি, তিনি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। এই মহারাজার বংশ ১৩৩০ সালে সংখ্যায় ৭০, তাঁহাদের ১০ জনের আসন বোম্বেতে, বাকীগুলি সুরাট, আমেদাবাদ, নগর, কচ্ছ, পোরবন্দর, আমরেলী, যোধপুর, বন্দী, কোটি প্রভৃতি স্থানে আছে। তাঁহাদের মধ্যে দুতিন জন সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ। বাকী সকলেই বিলাসী, ইতর ভাবের জীবন যাপন করেন। তাঁহারা এই উপাধির সম্মানে, মহার্ঘ পোষাকে ও মুখরোচক খাদ্য গ্রহণেই ধর্মগুরুর আসন প্রাপ্ত হইতে চাহেন। তাঁহারা অর্থ-সম্পত্তির জন্যই ব্যস্ত। এইজন্য ধনী ও বিলাসী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বহু অর্থ তাঁহারা সংগ্রহ করেন। এই টাকা যদিও ধর্মের নামেই আদায় হয়, তবু মহারাজাদের ভোগবিলাসে ইহার বহু অর্থ ব্যয়িত হয়। দেবমন্দির তাঁহাদের গদীতে বর্তমান, বাসস্থানও উহার সংলগ্ন। তাঁহারা ঐ সকল স্থানে দৈনন্দিন পূজাপদ্ধতিও সমাধা করে, আবার ইন্দ্রিয়-লালসাও পরিতৃপ্ত করে। তাঁহাদিগকে ভারতের ইপিকিউরিয়ান বলা যাইতে পারে। ইপিকিউরিয়ানদের নীতির সঙ্গে তাঁহাদের বেশ সাদৃশ্য আছে। বল্লভাচার্যের এই ধর্মমতের সঙ্গে তৎকালীন অন্যান্য

ধর্মমতের সাদৃশ্য নাই। তিনি নিজে ধর্মগুরু ছিলেন, এবং বহু তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষার মধ্যে এমন জিনিস আছে, যাহা থেকে অনিষ্টের বীজও উৎপত্তি হইতে পারে। তাঁহার দার্শনিক যা কিছু কথা, তাহা বেদের ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বল্লভাচার্য জীবাত্মাকে পরমাত্মা বা ঈশ্বরের কণা বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

বল্লভাচার্য বলেন, উপবাস বা চৈতন্যনাশ দ্বারা ঈশ্বর উপাসনা হইবে না। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। ইনি পুষ্টিমার্গের প্রচার করিয়াছেন। পুষ্টিমার্গের অর্থ পানাহার কর, স্ফূর্তিযুক্ত হও।

বল্লভাচার্যের মতবাদ বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণতত্ত্বে পরিপূর্ণ। বালকৃষ্ণের গোপলীলার কথা, মথুরার রাখাল বালক কৃষ্ণের কথা, ভাগবতে পুরাণে আছে। ইহাই সংস্কৃত হইতে ব্রজভাষায় অনূদিত হইয়া প্রেমসাগর নামে প্রচারিত হইয়াছে।

গোড়ায় এই প্রণালী প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল, পার্থিবপ্রেম অধ্যাত্মপ্রেমে পরিণত করিবার প্রতীকস্বরূপ। কিন্তু পরবর্তিকালে সম্প্রদায়ের মহারাজারা ইহার পবিত্রতা নষ্ট করেন। পার্থিব-প্রেমকে শুধু যে তখন তাঁহারা অনুমোদন করিয়াছেন, তাহা নহে, ইন্দ্রিয়লালসায় তাঁহারা প্রেমকে সম্ভোগের বস্তুতে পরিণত করেন।

সিদ্ধান্তরহস্যে আছে, বল্লভাচার্য ভগবানের প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন। ইহাতে পাপের মূল ও তাহার প্রায়শ্চিত্তের কথা আছে। সংস্কৃতে প্রায় দ্বাদশ পংক্তি লেখা হইয়াছে এবং পাপীদের উদ্ধারের জন্য গুরুবাদের কথাও প্রচার করা হইয়াছে। ঈশ্বর ও পাপাত্মা জীবের মধ্যে গুরুই পথপ্রদর্শক।

পাপী ব্যক্তির নিবেদন ভগবানের কাছে পৌঁছায় না বলিয়া গুরুর সাহায্য লইতে হয়। আত্মিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ গুরুর সাহায্যে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। গুরুবাক্য অবহেলা করিলে অসিপত্র ও অন্যান্য ভীষণ ভীষণ নরকে পতিত হইতে হয়।

বিঠলনাথের চতুর্থপুত্র গোকুলনাথ। তাঁহার বচনামৃতে পুষ্টিমার্গের কথা আছে। গুরুবাক্য অবহেলা করিলে কি হয়, ইহাতে তাহার বিশদ আলোচনা আছে। যে গুরুর উপর ক্রুদ্ধ হয় অথবা গুরুর প্রতি রুক্ষবাক্য প্রয়োগ করে, তাহাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়। অবশেষে সে সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করে। সে বৃক্ষকীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, পরিশেষে প্রেতযোনিতে পরিণত হয়। সে তখন এই ইতরযোনির জন্য শ্রীগুরুর স্মরণ করে এবং ভগবানের নাম স্মরণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের অন্য আর একখানি গ্রন্থ আছে ; ইহাদের দ্বিতীয় গুরু বিঠলনাথ ; তিনি ভগবানের স্বরূপ। 'গুরুসেবায়' আছে, হরি (ভগবান্) কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইলে গুরুই ভগবানের অসন্তোষ হইতে পাপী শিষ্যকে মুক্ত করেন। সুতরাং বৈষ্ণবের উচিত, অর্থ ও শারীরিক পরিচর্যার দ্বারা গুরুর সন্তোষ বিধান করা। শ্রীআচার্য ও শ্রীগোসাঁইজী পরিবারের সকলকেই বল্লভ-পরিবার বলে। গুরুপূজা ও কৃষ্ণপূজা একই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

গুরুর প্রতি এই সম্মান হিন্দুরা সর্বত্রই করে। কিন্তু বল্লভ সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব এই যে, বংশপরম্পরায় তাঁহাদের এই গুরুর অধিকার বর্তমান থাকে। ইহাতে ক্রমশ নৈতিক ব্যভিচারের জন্য এই সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বৈষ্ণবেরা হয় কৃষ্ণ, না হয় রাম, এই দুজনের একজনের পূজা করেই। ইহার প্রাথমিক একটা অনুষ্ঠান আছে। তিন চার বৎসর বয়স হইলেই এই অনুষ্ঠান তাহাদের মধ্যে হয়। দীক্ষার সময় ১০৮টি তুলসীর মালাসহ কণ্ঠি গলায় পরে এবং 'শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম' এইরূপ প্রার্থনা করে। দ্বিতীয় বারের এই অনুষ্ঠানের নাম 'সমরপণ'। বালকদের এগার বার বৎসর বয়সে, এবং বালিকাদের বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে অথবা বিবাহের সময় অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'ব্রহ্মসম্বন্ধ'ও বলে। শ্রীকৃষ্ণের সেবক বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া নিজেকে মনে করে, এবং স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পরিবার যাহা

কিছু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে। তনু, মন, ধন অর্থাৎ সর্বস্ব ভগবানে অর্পণ হিন্দুর ত্যাগের বিশেষত্ব। বল্লভাচার্যের 'সিদ্ধান্তরহস্যে'র টীকায়ও এইরূপ ভাবের কথা আছে। এই টীকাকার গোকুলনাথ। গোকুলনাথ বল্লভাচার্যের পৌত্র, দ্বিতীয় গুরু প্রসিদ্ধ বিঠলনাথের চতুর্থ পুত্র। সর্ববস্তু দান করিতে হইবে। 'সর্ববস্তু' কথাটাই গ্রন্থে লেখা আছে।

রাসমণ্ডলীর ব্যাপার হইতেই মন্দিরের দেবপূজায় ক্রমশ ব্যভিচারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই রাসমণ্ডলীর ব্যাপার পৌরাণিক রাসলীলা হইতে উৎপন্ন। মথুরার কুঞ্জে বনবিহার ও জলকেলি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীবিহার করিয়াছেন, রাসলীলায় তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই রাসলীলার ব্যভিচারের বিরুদ্ধে বোম্বের অধিবাসী কর্ষণদাস মূলজী ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে 'সত্যপ্রকাশ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে লেখেন। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ে তখন অসন্তোষ লক্ষণ দেখা দেয়। মহারাজারা ব্রাহ্মণদের উপর ঝাল ঝাড়েন। কিন্তু মহারাজারা এই অভিযোগের জন্য আপনাদের ব্যবস্থা সংশোধনে প্রয়াসী হন। বিশেষত শীতকালে রাত চারিটার সময় মন্দিরে যে প্রার্থনাদি আছে, তাহার সংশোধন হয়। কারণ ঐ সময়েই অনেক যুবতীর উপর অত্যাচার হইত। অনেক সময় মহারাজদের অসন্তোষ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হইত, এ সময় সে কথাও উঠিল। মহারাজারা বিপাকে পড়িয়া সব কথাতে স্বীকারোক্তি দিলেও এক বৎসরের জন্যই আপাতত ইহা স্বীকার করিয়া লইলেন। বোম্বে হাইকোর্টে একবার হাজির হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁহারা আপত্তি করেন যে, ইউরোপীয়দের অপেক্ষা নিম্নাসনে বসিলে তাঁহাদের অপমান হইবে। বোম্বে হাইকোর্ট ইহাদের এ আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই। মহারাজারা হাজির না হইলে সোফিনা দিয়া তাঁহাদের হাজির করিবার চেষ্টা করা হয়। মহারাজারা মন্দির বন্ধ করিয়া দেন।

তাঁহাদের শিষ্যেরা মহারাজদের ও দেবতাদের পূজা না করিয়া জল খাইত না। তাহারা উপবাসী রহিল। বিগ্রহাদির ভোগ দেওয়া হইল না। ইহা হইতে এই সুফল ফলিল যে, শিষ্যেরা দণ্ড দিলে মহারাজদের আর হাজির হইতে হইল না। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে খবরের কাগজে ইহা লইয়া যথেষ্ট সমালোচনা হইল এবং মহারাজদের সম্মান ও প্রতিপত্তির অনেক হানি হইল।

তুকারাম

মহারাষ্ট্র ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ লোক ভক্ত তুকারামকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। মহারাষ্ট্র ভাষায় তুকারামের যত জীবনচরিত আছে, তাহা সবই সাধু, কবি মহীপতির 'তুকারামের জীবন-চরিত' হইতে সংগৃহীত। ১৭১৫ হইতে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মহীপতি আবির্ভূত হন। তিনি 'ভক্তি-ভয়' ও 'ভক্তি-লীলামৃত' ১৭৬২ ও ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রণয়ন করেন। তুকারামের মৃত্যু বোধ হয় ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে। তুকারামের মৃত্যুর বোধ হয় প্রায় একশ বৎসর পরে তাঁহার এই জীবনী লেখা হয়। বিশেষ প্রামাণ্য জীবনী তাঁহার পাওয়া যায় না। নানাবিধ গল্প ও আখ্যায়িকা তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। তাহা হইতেই তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিতে হইবে। এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার যতটুকু সামঞ্জস্য আছে, ততটুকু অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মহীপতি-সংগৃহীত জীবনী অপেক্ষাও পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক প্রমাণ ভি. এল. ভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন। তুকারামের আত্মজীবনী সম্বন্ধে কবিতাবলী ও তুকারামের প্রধান শিষ্য রামেশ্বর ভট্টের অভঙ্গ, তুকারামের পৌত্র গোপাল বুয়া, তুকারামের অপর শিষ্য বহিনাবাঈ লিখিত আত্মজীবনী হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

মহীপতির পূর্বে কৃষ্ণদাস বৈরাগী নামক এক ব্যক্তি 'কেশব-চৈতন্য সম্প্রদায়' বলিয়া একখানি গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থে তুকারামের গুরু হওয়া সম্বন্ধে আলোচনার ফলে তাঁহার জীবনের সময় নির্দেশ করা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। নিরঞ্জন বলিয়া এক ব্যক্তি এই সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখিত আছে। মহীপতির পূর্বে নরহরি মালু নামক আর এক ব্যক্তি 'ভক্তি-কথামৃত' বলিয়া

একখানি গ্রন্থ লেখেন। যদিও তিনি কয়েকজন মারহাট্টা গ্রন্থকারকে অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তবু ইহা প্রমাণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নহে। মহীপতি ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবে ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন, এবং যাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আজ পর্যন্ত তুকারামের যত লেখা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সকল লেখাই তাঁহার কিনা, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এক সময়ে ৪৬২১টি কবিতা, পরে আর জি ভাণ্ডারকর ৮৮৪১টি কবিতা হস্তলিখিত পুঁথি মিলাইয়া ঠিক করেন। উহার পঞ্চাশ বৎসর পরে ১৮১৯-২০ সালে ভাবে ছুই বারে ১৩০০ কবিতা প্রকাশ করেন, ইহাকেই তিনি তুকারামের মৌলিক গাথা বলিয়া প্রকাশ করেন। তুকারামের মৃত্যুর তিন বছর পরে তাহার চৌদ্দ জন শিষ্যের মধ্যে একজন শাস্তজী কলু ইহা লেখেন। তাঁহার নামে যত কবিতা আছে, সবই যে তাঁহার লেখা, তাহা নহে।

জন মিলটনের মতো তুকারামও ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী অনুসন্ধানে ঐ তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে।

অন্তত সাত পুরুষ ধরিয়া পাণ্ডারপুরের বিথোবা দেবতার সেবার অধিকার তুকারামের বংশ পাইয়া আসিতেছে। পুনার উত্তর পশ্চিম ১৮ মাইল দূরে ডাহু নামক স্থানে সে জন্মগ্রহণ করে। সে একজন শস্যব্যবসায়ী শূদ্র। তাহার পিতা আবাল্য উদাসী তুকারামের হাতেই ব্যবসায়ের ভার সমর্পণ করে। তুকারামের বয়স তখন মাত্র ১৩ বছর। প্রথম চার পাঁচ বছর তাহার ব্যবসায় উন্নতি লাভ করিতেছিল। কিন্তু পরে ক্রমশই তাহার ব্যবসায় মাটি হইয়া গেল। এমন কি মূলধন অবধি একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল। তুকারামের সাধুতা ও সরলতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বিথোবা দেবতা সর্বদা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন।

১৬২৯ খ্রীস্টাব্দে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষে তাহার

প্রথমা স্ত্রী অনাহারে চীৎকার করিয়া মারা যায়। এই ঘটনায় তুকারামের সঙ্গে ব্যবসায়, এমন কি, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়। নদীতীরে দাঁড়াইয়া সে তাহার ব্যবসায়ের অর্ধেক কাগজপত্র নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে, বাকী অর্ধেক তাহার কনিষ্ঠ ভাই কান্‌হোবাকে দান করে, এবং নিজেকে বিথোবার পূজায় নিয়োগ করে।

স্বপ্নে বাণীর আদেশ হয়। ভক্ত ও কবি নামদেবের অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবার ভার তাহার উপর পড়ে। অন্য আর একদিন স্বপ্নে তিনি রামকৃষ্ণহরি গুরুমন্ত্র পান। সম্ভবত বৈষ্ণবদের চৈতন্য সম্প্রদায়ের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক ছিল।

চিন্তামণিদেব বলিয়া এক ব্রাহ্মণ তুকারামকে একদিন ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করেন। তখন তুকারাম আরও দুইভাগ ভোজ্য দিতে বলেন। এক ভাগ তাঁহার দেবতার জন্য, অন্যভাগ গণপতির জন্য দিতে বলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ ভক্তির আরও নিদর্শন আছে। রামেশ্বর ভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণ, শূদ্র তুকারামের উন্নতিতে বড় ঈর্ষাপরায়ণ হন। তিনি জনসাধারণকেও ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন, নিজে উহার সম্বন্ধে নীরব থাকেন। তুকারাম তাহার কবিতা সম্বন্ধে একদিন ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলে ভট্ট উহা নদীজলে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। তুকারাম এই নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ-বাক্যই গ্রহণ করিলেন। নদীতে লেখাগুলি নিক্ষেপ করিবার কয়েকদিন পরে লেখাগুলি অক্ষতভাবে নদীর উপর ভাসিয়া উঠে। রামেশ্বর ভট্ট ইহাতে অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। কবি শান্তভাবে বলিলেন,—তোমার মন পবিত্র হইলে তোমার শত্রুও তোমার মিত্র হইবে। সত্য সত্যই তাহা ঘটিল। রামেশ্বর ভট্ট আজীবনের জন্য তুকারামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

একজন বৈদান্তিক একবার বেদান্ত সম্বন্ধে তুকারামের কাছে কিছু বলিতে চান। তুকারাম বলিলেন, কম্বলে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তিনি শুনিতে পারেন। যখন প্রায় এক ঘণ্টা পরে কম্বল গুটাইয়া

লওয়া হইল, দেখা গেল তুকারাম কানে আঙুল দিয়া বসিয়া আছেন। তিনি অদ্বৈতবাদ শুনিতে চান না। তিনি ও তাঁহার উপাস্য একই, ইহা তাঁহার মন মানে না।

তুকারামের জীবনীতে অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে। তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

তুকারাম অলৌকিক শক্তি প্রভাবে দরিদ্রকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, তিনি বিষ্ণুর রথে বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন। আর জি ভাণ্ডারকর বলেন, তিনি ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার নিজের গ্রামে জলে ডুবিয়া মরেন। এই ডুবিয়া মরাকে জল-সমাধি বলা হইয়াছে। মৃত্যুর পরও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে।

তুকারামের অভঙ্গ সম্বন্ধে যদিও এখন পর্যন্ত কোন ভাল সংস্করণ পাওয়া যায় নাই, তাহা হইলেও জে. এন. ফ্রেদার ও কে. বি. মরাঠী ৫ শতের উপর ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন। তুকারাম যদিও অশেষ দুঃখে দুর্দশায় জীবন কাটাইয়াছেন, তবু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই বলেন নাই। তাঁহার নিজের পাপের স্বীকারোক্তি তিনি অনেকবার করিয়াছেন।

পতিতাধম আমি, তিন তিনবার পতিত হইয়াছি। আমি ঘোর পাতকী, আমার মন ত জানে, আমি পতিত। তুকারামের এই সমস্ত স্বীকারোক্তিতে তাঁহার মানসিক দুরবস্থার কথা জানিতে পারা যায়।

আমারই ত দোষ, তোমারই ত দোষ, তুকারই ত দোষ। তাঁহার পিতামাতার মৃত্যুতে, প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুতে, জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে, এবং ব্যবসায়ের ক্ষতিতে তিনি সকল দিক্ হইতে আপনাকে অপসারিত করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছেন, আমি দেউলিয়া হইয়াছি, দুর্ভিক্ষে আমি নিষ্পেষিত হইয়াছি, তাই ত আমি তোমার দিকে ফিরিয়াছি, তাই

ত আমি আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছি। আমার প্রচেষ্টা নাই, জাতি নাই, বর্ণভেদ নাই, আমি বন্ধনমুক্ত হইয়াছি। তিনি যে আপনার ভিতরে আপনি কত যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে।

আমি অসীম প্রেমসাগরের অনন্ত প্রবাহ দেখিতেছি, আমি অলৌকিক জ্ঞানের খনি আবিষ্কার করিয়াছি।

আমি বিথোবা বিগ্রহের অযোগ্য সেবক। পানাহার লইয়া মত্ত থাকা মানবজীবনের কর্তব্য নয়। একনিষ্ঠ ও খাঁটি মানুষের বিশেষ প্রয়োজন। মনের যদি পবিত্রতা না থাকে, তাহা হইলে ভস্ম মাখিলে ও জটা রাখিলে কি হইবে? যাহারা পাপে নিমগ্ন, তাহারা মুক্তির সন্ধান পায় না। যথার্থ মধুর সুমিষ্ট ভগবদ্‌বাক্যে ও কার্যে অন্যকেও মুগ্ধ করে।

তুকারাম বিগ্রহপূজক ও ভক্তিতত্ত্বের সাধক। তিনি কৃষ্ণ ও শিবকে পূজা করিতেন, পাণ্ঢারপুরে অন্যান্য আরও দেববিগ্রহ পূজা করিতেন কি না, জানা যায় না। তুকারামের ভক্তি সম্বন্ধে জীবনের যাহা অভিজ্ঞতা, তাহার মূল 'নারদ-ভক্তি-সূত্রে' দেখিতে পাই। ভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করা ও জগতের যা কিছু দুঃখ দৈন্য বরণ করা।

পশ্চাতে অনন্ত কাল। আমার ও ভগবানের মাঝখানে বাসনা ও ক্রোধের অভ্রভেদী পাহাড়। আমি সে পর্বতে আরোহণও করিতে পারি না, আমি অবরোহণের পথও দেখিতে পাই না। আমি আমার অপরাধ জানি, কিন্তু আমি ত আমার প্রবল চিত্তবৃত্তিকে দমন করিতে পারি না। আমি যে ইন্দ্রিয়ের দাস। আমি জানি না কি করিয়া আমি পাপ পথ ত্যাগ করিব, আমি তাই তোমার পায়ে পড়িয়া আছি। তুমি ত অনেক পাপীকে উদ্ধার করিয়াছ। তুকা তোমার পায়ের দাস, তুমি তাহাকে রক্ষা কর। তুকারামের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, পিতা ইচ্ছা করিলে অবোধ বালকের ইচ্ছা পূরণ

করিতে পারে। বাহ্যিক পবিত্রতায় আন্তরিক পবিত্রতা আসিবে। পবিত্রতায় হৃদয়ে প্রেম পরিপূর্ণ হইবে। যুক্তি ও পাণ্ডিত্য ফেলিয়া দাও, ভক্তি ছাড়া মুক্তি হইবে না। ভক্তি ছাড়া ভব হইবে না।

ভব কি? এখন এই 'ভব' শব্দের অর্থ একটু পরিষ্কার হওয়া উচিত। ভাণ্ডারকর বলেন, ইহার অর্থ বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে আছে, যিনি অন্তরে অনুভব করেন যে, ভগবান্ আমাদের মধ্যে বাস করেন।

তুকারাম শান্তির জন্য সমস্ত জীবন, অতি দুর্গম জীবন পথ অতিক্রম করিয়াছেন। যোগমার্গ, মন্ত্রাদি, সন্ন্যাসজীবন ও পঞ্চাগ্নি যজ্ঞের চেয়ে ভক্তিকেই তিনি প্রশস্ততর পথ মনে করিয়াছেন। ভক্তিতে দয়া, ক্ষমা ও শান্তি পাওয়া যায়। যেখানে ক্ষমা আছে, দয়া আছে, শান্তি আছে, সেখানে ভগবান্ বাস করেন।

তুকারাম দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সহজ মীমাংসক। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভক্তই আরাধ্যকে বিশ্বাসে গড়িয়া তোলে। বিশ্বাসই আমরা মানুষকেও ভগবান্ করিয়া তুলি। মানুষ ভগবানের অবোধ শিশু সন্তান। শিশুকে যেমন সন্তর্পণে মাতা রক্ষা করেন, স্নেহ করেন, ভগবান্‌ও তাঁহার অবোধ শিশু সন্তান মানুষকে তেমন স্নেহ করেন, রক্ষা করেন। মানুষের তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়, ভগবানের পদপ্রান্তে পড়িয়া তার মুক্তি প্রার্থনা করা উচিত। বাসনার ইন্ধন দান, ভয়, বিদ্যা ও তর্কই মুক্তির পরিপন্থী। তুকারাম তাহাকেই সাধু বলেন, যিনি দয়াবান, সত্যবাদী, সদাসন্তুষ্ট, সরল ও শান্তিদাতা। যিনি দীনাতিদীন, নিরহঙ্কার, যিনি সংযমী, তিনিই সাধু। তাঁহার অহিংসাধর্ম সুস্পষ্ট নহে। তিনি অবতার মানেন। তিনি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ নন। ঈশ্বরের নামে কর্মত্যাগ করিতে হইবে। গার্হস্থ্যধর্মের পক্ষে তুকারাম জাতিভেদ মানেন, তিনি ভগবদ্‌ভক্তের সাম্প্রদায়িকতা বা জাতিভেদ মানেন না। ঈশ্বর জাতিভেদের স্রষ্টা, তাহাও মানেন। তিনি কোনও ক্রমেই

প্রচারক বা সংস্কারক নন। তিনি একজন যথার্থ একনিষ্ঠ সরল-বিশ্বাসী ভক্ত ও সাধু। তিনি নিজে জাতিভেদ মানেন না, সর্বধর্ম-সমন্বয় মানেন।

পাণ্ঢারপুরে তুই একাদশীতে খুব লোক সমাগম হয় দাক্ষিণাত্যেও লক্ষ লক্ষ লোক তুকারামের অভঙ্গ পাঠ করে। লক্ষ লক্ষ লোক এক এক পর্বাহ উপলক্ষে পাণ্ঢারপুরে বিথোবা বিগ্রহ দেখিতে আসে। ৪০ মাইলেরও বেশী দূর থেকে দৈনিক প্রায় ১০-১২ হাজার লোক বিথোবা মন্দিরে আসে। সাহেবেরা মনে করেন, তুকারাম খ্রীস্টধর্মের প্রভাবের মধ্যে পড়িয়াছিলেন।

প্রার্থনাসমাজে তাঁহার স্তোত্রাদির বিশেষ বিশেষ অংশ পঠিত হয়। হিন্দুরা দেবতার কাছে চুল মানত করে, পাণ্ঢারপুরে বিথোবা বিগ্রহের কাছেও এইরূপ চুল মানত করে। ইহাকে বেণীদান বলে। বিথোবার প্রতি এতই শ্রদ্ধা যে, বিথোবার চরণ স্পর্শ না করিলে তাহাদের দর্শনই সার্থক হয় না।

তুকারাম গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না। তাহার সকল বিষয়েই উদার মত ছিল। খ্রীস্টানদের New Testament-এর সঙ্গে তুকারামের সম্বন্ধ আছে বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। কিন্তু তুকারামের ধর্মমতের মধ্যে এমন কোনও মত নাই, যাহা হিন্দু ধর্মে পাওয়া যায় না।

দাদূপন্থী

১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণ-পরিবারে আমেদাবাদে দাদূ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লোদিরাম তাঁহার শাস্ত্র ও দেবসেবা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হন। ইউরোপেও এসময়ে ধর্মসংস্কার আরম্ভ হয়। দাদূর জন্মের অব্যবহিত পূর্বে উত্তরভারত, বাঙলা ও পঞ্জাব পর্যন্ত ও দক্ষিণে বোম্বে পর্যন্ত ভারতেও ধর্মসংস্কার আরম্ভ হয়। কবীরপন্থী প্রতিষ্ঠাতা কবীর বারাণসী কেন্দ্রে এই ধর্মসংস্কারের প্রভূত কাজ করেন। নানক পঞ্জাবে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রভূত শক্তি প্রয়োগ করেন। এই নানক হইতেই শিখধর্মের প্রতিষ্ঠা। নানক ও কবীর। এই দুজনের মত এতই প্রচারিত হইতে লাগিল যে, হিন্দুরা শতে শতে আসিয়া ইহাদের মতবাদের প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন।

দাদূ এই আন্দোলনে প্রথমেই বিচলিত হন। তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রচার করিবার জন্য তিনি প্রচারকার্যে নিযুক্ত হন। আমেদাবাদ হইতে দিল্লী তাঁহার প্রচারের স্থান হইল। অম্বরে তিনি কিছুদিন ছিলেন। এইখানে তাঁহার স্মৃতিমন্দির আছে ও তাঁহার বস্ত্রাদি রক্ষিত আছে। উহার নিকট পূজা অর্চনা হয়। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বরে দাদূর কিছুদিন কর্মস্থান ছিল। এখনও সেখানে দাদূর শিষ্যদের আখড়া আছে। দাদূ দিল্লীতে যান, এবং অকবরের সহিত দেখা করিয়া কথোপকথন করেন। ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও কেহ কেহ ছিলেন। তারপর তিনি দক্ষিণাভিমুখী হন এবং শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন। অম্বরে এক বছর থাকিয়া, অম্বর হইতে ৮ মাইল ও রাজধানী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ৪০ মাইল দূরে নরিনায় তিনি যান এবং সেইখানে ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

দাদু তাঁহার বহু শিষ্যদের মধ্যে ১৫২ জনকে তাঁহার কার্যাবলী প্রচারের জন্য রাখিয়া যান। তাঁহার উপদেশাবলীর নাম বাণী। ৫০০০ ছন্দোময়ী কবিতায় এই বাণী লিখিত। ৩৭ অধ্যায়ে বিবিধ ধর্মবিষয়ক কথা আছে। স্বর্গীয় গুরু, স্মরণ, বিরহ, সভা, মন, সত্য, সৎ, বিশ্বাস, প্রার্থনা। স্তোত্র প্রকাশ্য ও গোপনীয়, উপাসনায় গীত হয়।

দাদু হিন্দুধর্মের অনেক ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছেন, আবার প্রত্যাখ্যানও করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বর, মানুষ ও মুক্তি সম্বন্ধে নূতন তথ্য পুনরাবিষ্কার করিয়াছেন।

(১) বেদ ও কোরানের বাণী অভ্রান্ত সত্য বলিয়া তিনি মানেন নাই।

(২) উপনিষদের বাণীও অভ্রান্ত বলিয়া মানেন নাই।

(৩) বাহ্যানুষ্ঠান ও ক্রিয়াকাণ্ড তিনি মানেন নাই।

(৪) বিকৃত পৌরোহিত্য তিনি মানেন নাই।

(৫) জাতিভেদ ও জাতিভেদ-চিহ্ন তিনি মানেন নাই।

(৬) প্রতিমা পূজা তিনি মানেন নাই।

(৭) মালা জপ তিনি মানেন নাই।

(৮) তীর্থ ও পর্বাহের অবগাহন তিনি মানেন নাই।

(৯) একই জন্মে মানুষ সম্ভাবিত সকল জন্মের অধিকার লাভ করিতে পারে।

(১০) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব মানুষ। তাঁহাদের মূর্তি পূজা, তাঁহাদের ইতিহাস আলোচনা স্মরণ রাখিবার জন্য।

(১১) মায়া অবিদ্যা নহে। বিপথে চালিত মানুষ ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়া মায়াকে অবিদ্যা বলিয়া মনে করে। সংসার বা সাংসারিকত্ব অবিদ্যাপ্রসূত নহে।

(১২) আমি হিন্দুও না, মুসলমানও না। আমি ষড়্‌দর্শনের কোনও দর্শনের মতবাদী না। আমি শুধু ঈশ্বরভক্ত।

ঈশ্বর, মানব ও মুক্তি সম্বন্ধে তাঁহার মত এই—

এক ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিও না। যাহা কিছু মন্দ তাহা পরিত্যাগ কর। আমি দেখিয়াছি, ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর, ভয়শূন্য। তিনি আনন্দময়, সর্বোত্তম, সর্বশক্তিমান্, পরমসুন্দর, গৌরবময়, বিশুদ্ধ, মূর্তিহীন, আত্মমূর্ত, অদৃশ্য, অসীম, অজ্ঞেয়, করুণাময়। তিনি জ্যোতিষ্মান্, সম্পূর্ণ। তিনি সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বর স্রষ্টা,—

তিনি এত শক্তিশালী যে, তিনি এক কথায় সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কার্যাবলী অদ্ভুত এবং তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। তিনি একাকী এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্তা, তিনি একাই সকল কার্য সম্পাদন করেন, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শক্তি প্রদান করেন। তিনি তাঁহার সেবকমাত্রকেই যাহা কিছু আশীর্বাদ প্রদান করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অহঙ্কারের কিছু নাই। তাঁহার কার্যের, জ্ঞানের, কৌশলের সীমা কেহ নির্ধারণ করিতে পারে না। যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে তিনি সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন।

ঈশ্বর সকলের রক্ষাকর্তা,—

আমি তাঁহাকেই ধ্যান করি, যিনি সকলের রক্ষাকর্তা। আমি পরব্রহ্মকে আরাধনা করি। ঈশ্বর আমার পরম পবিত্র। আমি সেই নিত্য শুচি অমূর্ত ভগবান্‌কে উপাসনা করি। মানুষ সৃষ্ট জীব, ভগবদারাধনার জন্যই মানুষের জন্ম।

যে তোমার অন্য দেবতাকে পূজা করিতে উদ্বুদ্ধ করে, তার মতো দুর্ভাগ্য কে। মুহূর্তের জন্যও তুমি ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইও না। এখনও জানি না যে, ঈশ্বরের চেয়ে মঙ্গলময় আমার আর কিছুই নাই। আমি এতই মূর্খ যে আমি তাঁহাকে জানি না বলিয়া এখনও অনুতপ্ত হই না। এ সংসার দুঃখ সমুদ্র, ভগবান্ আনন্দার্ণব। এই অসার সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই আনন্দার্ণবে ডুবিয়া যাও

বিবেকের বাণী,—

আমি মন্দ অভিপ্রায়ে অনেক দুষ্কর্ম করিয়াছি। হে সর্বান্তর্যামী, তুমি সে জন্য আমার উপর ক্রুদ্ধ হইও না, তুমি ত অসীম ধৈর্যের আধার। সকল পাপই তোমার এই অধম সেবকের সম্ভব। তোমার সেবায় আমার মন নাই। আমি তোমার সেবক বটে, কিন্তু মহাপাপী। জগতে আমার মতো পাপী ত কেহই নাই। আমি প্রতি কার্যে পাপানুষ্ঠান করি, প্রতি কার্যে আমার বিচার বুদ্ধির ভুল হয়। আমি প্রতি মুহূর্তে তোমার বিরুদ্ধে পাপাচারণ করি। হে ভগবান্, আমার পাপ ক্ষমা কর। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমিই শ্রেষ্ঠ পাপী। আমার পাপের পরিমাণ অসীম ও অসংখ্য। জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত আমি ত কোন ভাল কাজই করি নাই। অজ্ঞতা, সংসারে আসক্তি, অযথা আনন্দ, বিস্মৃতি আমায় পাইয়া বসিয়াছে। আমি কামার্ত, ক্রোধার্ত, সন্দেহাত্মক, আমি কখনও তোমার নামও করি না। আমি ভণ্ড, আমি ইন্দ্রিয়ের পাপে পাপী। আমি আশাবদ্ধ। আত্মা আমার অবলম্বনশূন্য। আমি আমাকে প্রকাশ করিতে পারি না। তুমিই মাত্র আমাকে প্রকাশ করিতে পার। আমি বন্দী, তুমি আমার মুক্তিদাতা। হে ভগবান্, তুমি দয়া করিয়া আমায় রক্ষা কর। পাপ আমার আত্মায় বাস করিতেছে, আমার অন্তর ইন্দ্রিয়ের লালসায় পরিপূর্ণ। আমার শত্রুকে তুমি ধ্বংস কর; আত্মা আমার দুঃখ বেদনায় ভরা, আমি যে তোমায় ভুলিয়া গিয়াছি। আমি আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না, আমায় উদ্ধার কর।

দাদূ জানিতেন, একমাত্র পাপই ঈশ্বর হইতে মানুষকে পৃথক্ করিতে পারে। বাণীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কবিতার নাম 'বিরহ'। প্রেমার্ত নারীর বিরহের খেদোক্তিতে এই গাথাটি ভরা।

আমি প্রেমে পাগলিনী। আমি তোমাকে চাই। হে আমার দয়িত, তুমি এস এবং আমার সহিত সাক্ষাৎ কর। এই ত আমার

সময়। স্ত্রী স্বামীবিরহে কাতরা, দিন রাত্রি তোমার বিরহে কাতরা, দিন রাত্রি তোমার বিরহে ব্যাকুলা। হে আমার দেবতা, আমি তোমার জন্য তৃষ্ণার্ত। আমি চাতকিনীর মতো। হে আমার প্রিয়তম, আমি তোমার জন্য তৃষ্ণার্ত, আমি তোমাকে চাই। আমি দিন রাত্রি তোমায় ডাকি। নারী কার কাছে তার মনের দুঃখ প্রকাশ করে। কাকে দিয়াই বা সে তার দুঃখ জানায়।

তোমার স্বর কি মধুর! তোমার চিন্তা করিতে করিতে দুশ্চিন্তায় দেখ আমার চুল পাকিয়া গেল। আফিমের অভাবে যেমন আফিম-খোরের অবস্থা হয়, যুদ্ধের জন্য বীরের যেমন অবস্থা হয়, দরিদ্রের যেমন ধনের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়, তেমনই হে আমার পরম স্বামী ভগবান্, তোমার জন্য তেমনই আমি ব্যাকুল।

দাদূ বর্তমান ও অতীত লইয়া ব্যস্ত নহেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইব।

কখন তিনি আসিবেন? কখন তিনি আসিবেন? কখন তিনি আমায় করুণা করিবেন? আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিব। তাঁহাকে ছাড়া আমি বাঁচিব না। তিনি প্রকাশিত হইলে শরীর ও আত্মা আমার আনন্দে উদ্ভাসিত হইবে। দাদূ জানিতেন, কি তাঁহার অভাব। ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাতের তাঁহার কি প্রয়োজন, তাহা তিনি ভালই জানিতেন। তাই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে, হে ভগবান্, তুমি প্রকাশিত হও। গুরুর মতো, আমাকে উদ্ধার করিবার মতো হইয়া প্রকাশিত হও।

দাদূর শিষ্যদের দাদূপন্থী বলা হয়। দাদূপন্থীদের মধ্যে যাঁহারা গুরুস্থানীয়, তাঁহারা সন্ন্যাসী। প্রধানত তাঁহারা সাধারণ ও গুরুস্থানীয় দাদূর বাণী তাঁহারা শিক্ষা দেন। কিন্তু ইহার জন্য কৃষি, টাকা ধার দেওয়া, চিকিৎসা করা প্রভৃতিতে ইহাদের কিছু বাধা নাই। দাদূ-পন্থীর গুরুরাও হিন্দুর উচ্চবর্ণসম্ভূত। দাদূর প্রত্যক্ষ শিষ্য ৫২ জন

রাজপুতনায় ছিলেন। তাঁহার মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যায় ও ধন-সম্পদে শ্রেষ্ঠ।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দুধর্মের সম্পর্কে প্রেটেস্টান্টদের সাহিত্য-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। সম্ভবত ইহার মধ্যে অনেক জিনিস কখনও সংগৃহীত হইবে না, মুদ্রিত হইবে না, অনূদিত হইবে না।

বর্তমানে দাদূপন্থীদের যে ভেদাভেদ উপস্থিত হইয়াছে, সে ভেদ বিশ্বাসের ভেদ নহে, স্থানভেদে ও জীবন-যাত্রা-পদ্ধতিভেদে এই ভেদাভেদ উপস্থিত হইয়াছে।

(১) খালসা (বিশুদ্ধ বা শাসক)—জয়পুরের কাছে নারিনা। এই স্থানে দাদূর মৃত্যু হয়। দাদূর আসনে এখনও তাঁহার শিষ্য একজন উপবিষ্ট আছেন, ইনি সমস্ত দাদূপন্থীদের কর্তা। এই শ্রেষ্ঠ মোহান্তকে তাঁহারা নানারকমে তাহাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করে। এখানে বছরে একবার করিয়া বিরাট মেলার অনুষ্ঠান হয়।

(২) নাগা (সৈনিক সাধু)—নগ্ন হইতে ইহারা নাগা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যুদ্ধের পোষাকেও যে তাহাদের পারিপাট্য নাই, ইহাতে ইহাই সূচিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম সুন্দরদাস। বিকানীরের একজন রাজপুত। জয়পুর সীমান্তে নয়টি কেন্দ্রে ইহাদের লোকসংখ্যা প্রায় ২০,০০০। বর্তমান যুদ্ধবিদ্যার তাহারা জানে না। তাহাদের সম্বল এখনও তরবারী, ঢাল, বন্দুক। তাহারা মিউটিনীর সময় ইংলণ্ডের বিশ্বস্ত যোদ্ধা ছিল। তাহাদের চেহারা বেশ সুন্দর। দাদূর বাণী—কেহ ব্যভিচারী হইলে অস্ত্র তাহাদের রক্ষা করিত।

(৩) উত্রদী—ইহাদের স্থাপয়িতা বাবা বনয়ারীদাস। চিকিৎসকের কাজে ও কুসীদজীবীর কাজে ইহারা পটু। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই জন্য খুব ধনী।

(৪) বীরকট—ইহারা অর্থ স্পর্শ করে না, ভিক্ষায় জীবিকা-নির্বাহ করে। গেরুয়া পরিহিত, অধ্যয়নই ইহাদের জীবনের ব্রত। কখনও এক স্থানে থাকে না। একজন গুরুর সঙ্গে বহু চেলা থাকে।

তাহারা শুধু যে দাদূর বাণী শিক্ষা দেয় তাহা নহে, দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থ, দর্শন ও ধর্মসম্বন্ধীয় মতামতও ইহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৫) খাকী—ভস্মমাখা, সন্ন্যাসজীবন যাপন করে, সামান্য পরিচ্ছদাদি, কেশ কুণ্ডলীকৃত, সর্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে নানা স্থানে ভ্রমণ করে। মনে করে, ইহাতেই ইহারা পবিত্র থাকে।

দাদূদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে হিন্দুদের বিরোধ ক্রমশ কমিতেছে। ইহাদের মধ্যেও এখন বৈদান্তিক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে এখন মালাজপ করে, 'বাণী'কে বিগ্রহরূপে পূজা করে, দাদূর চন্দন বস্ত্রাদিকেও বন্দনা করে।

রাধাবল্লভী

রাধাবল্লভীরা উত্তর-ভারতের বৈষ্ণবসম্প্রদায়। ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। সাহারণপুর জেলার গৌড় ব্রাহ্মণের পুত্র হরিবংশ। শনকাদি সম্প্রদায় ভাগবত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় নিম্বার্ক কর্তৃক স্থাপিত। এই সম্প্রদায় পাঁচ শাখায় বিভক্ত। হরিবংশ নামক কোনও ধর্মোপদেষ্টা এই শাখা বিভাগ করেন। ৪র্থ শাখার তৃতীয় গুরু এই হরিবংশ। কোনও কোনও মতে ইনি মধ্বসম্প্রদায়ের লোক। ইহার মত সম্বন্ধে গ্রোজ (Grows) বলেন ইহা আংশিক একজনের এবং আংশিক ইহাদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের।

হরিবংশ ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তখন উচ্চতম রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তাঁহার কন্যার বিবাহ স্থির হইয়া গেলে তিনি সন্ন্যাসী হন। বৃন্দাবনের পথে তাঁহার সহিত এক ব্রাহ্মণের দেখা হয়। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলেন যে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাঁহার কৃষ্ণবিগ্রহ ও দুইটি কন্যা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই কৃষ্ণের নাম রাধাবল্লভ। রাধাবল্লভ অর্থ রাধার প্রণয়ী। হরিবংশ ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মণের কন্যা দুটিকে বিবাহ করেন।

যমুনার তীরস্থিত বৃন্দাবনে কৃষ্ণবিগ্রহ তিনি স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায় রাধাবল্লভ বলিয়া কৃষ্ণেরই পূজা করেন। রাধাই কৃষ্ণের শক্তি, তিনি যখন অবতীর্ণ হন, শক্তিও তাঁহার সঙ্গে অবতীর্ণ হন।

বহু ধর্মেই স্ত্রীশক্তির উপাসনা-পদ্ধতি আছে। পুরুষের শক্তি স্ত্রী। ইহা যে শুধু ভারতবর্ষেই আছে, তাহা নহে। ভারতে শক্তিপূজার প্রভাব শৈবধর্মের ফল। বৈষ্ণবদের মধ্যেও এই স্ত্রী-

শক্তির পূজা প্রচলিত। লক্ষ্মী বা সীতার পূজা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। রাধাবল্লভীদের মধ্যে রাধার উপাসনাই প্রচলিত। রাধাকে প্রধানা শক্তি হিসাবে ইহারা স্তুতি করে, রাধার প্রশংসাবাণী গীত হয়। রাধাকৃষ্ণপ্রেম বিদেশীর চক্ষে মোটেই প্রশংসনীয় হয় নাই, অনেক স্থলেই ইহার কদর্থ হইয়াছে। এ দেশেও যে ইহার কদর্থ হয় নাই, তাহা নহে। সকলেই যে ইহার আধ্যাত্মিকতার দিকেই গিয়াছেন, তাহা নহে। কেহ কেহ ইহা রূপক ব্যাখ্যাও মনে করেন।

গ্রোজ বলেন, গণিকালয়ের ভাষা পর্যন্ত এই মন্দিরের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে। বিবাহিত গোস্বামিগণ পর্যন্ত ইহা সমর্থন করেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে ইহারা বাহাদুরী প্রকাশ করেন।

হরিবংশ হিত কথাটি নামের পূর্বে যোগ করিয়াছেন। হিত হরিবংশ, হিত ধ্রুবদাস, হিত দামোদর প্রভৃতি শিষ্যদের নাম দেওয়া হইয়াছে। সংখ্যায় ইহারা পঁচিশ হাজার।

মৃত্যু সময়ে হরিবংশের বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। 'রাধাসুধানিধি' সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন। ইহার কিছু কিছু গ্রোজ অনুবাদ করেন। উইলসন 'সেবাসখিবানী' নামক আর একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের আরও অনেক স্তোত্র, সংগীত পাওয়া যায়; কিন্তু কাহার রচিত বা কাহার সম্পাদিত, তাহা জানিবার উপায় নাই।

হরিবংশের দ্বিতীয় পক্ষে দুই পুত্র। এক পুত্রের নাম ব্রজচন্দ্র। এই ব্রজচন্দ্রের বংশই বৃন্দাবনের রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রধান মন্দিরের গোস্বামিগণের পূর্বপুরুষ। ১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত মন্দির প্রস্তুতির সময় নির্ধারণ করা হয়।

বৈরাগী

সংস্কৃত বৈরাগিন্ শব্দ হইতে বৈরাগী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বৈরাগীর অর্থ, যে বৈষয়িক সমস্ত বাসনাই দমন করিয়াছে। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের মানুষ গণনার হিসাবে এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ৭৬৫,২৫৩। এই সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকই বাঙলায় ও রাজপুতনায় দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু ভক্ত বা বিষ্ণুর অবতার রাম ও কৃষ্ণ-ভক্তই বৈরাগী সম্প্রদায়ের লোক। উত্তর-ভারতে এই সম্প্রদায়ের খুবই প্রভাব। বৌদ্ধরাজত্ব শেষ ও রাজপুত প্রাধান্য সময়েই এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি হয়। রোজ প্রভৃতি অনেকে বলিয়াছেন যে, বৈষ্ণব সম্প্রদায় অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। ভারতীয় ধর্মমতে ইহাদের স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতেই আছে। ইহারা নরসিংহ অবতারের জন্য ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিত। প্রাচীন ধর্মে এই পশু উপাসনা পদ্ধতি কোনও না কোনও অবস্থায় সর্বত্রই ছিল। পরবর্তী যুগে অন্তত পশুর মুখোসের সমাদর ছিল, তিব্বতে এখনও আছে।

গঙ্গার উপত্যকা ও রাজপুতনায় ইহার প্রভাব খুবই ছিল। দক্ষিণ-ভারতে রামানুজাচার্যের সময়ে ইহা সেখানে বেশ প্রাধান্য লাভ করে। রামানুজাচার্য মাদ্রাজের নিকটে প্রায় ১০১৭ খ্রীস্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি পদার্থ ত্রিগুণ শিক্ষা দেন। পদার্থ ত্রিগুণের মধ্যে (১) পরব্রহ্ম বা ঈশ্বর, (২) মানুষের ভেদ আত্মা (চিৎ), (৩) অচিৎ।

বিষ্ণুকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদ বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। দৃশ্য জগৎকেই অচিৎ বলা হইয়াছে। এই ত্রিগুণের শাশ্বত অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। চিৎ ও অচিৎ যদিও আলাদা, কিন্তু চিৎ, অচিৎ দুইই ঈশ্বরের অধীন। রামানন্দ জন্মিবার পূর্বে পর্যন্ত এই সম্প্রদায় উত্তর-ভারতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই।

রামানন্দ ১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক। ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি তাঁহার মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। রামানন্দী সম্প্রদায়কেই লোকে বৈরাগী আখ্যা দিত। হিন্দুধর্মে রামানন্দের স্থান খুব উচ্চে। কারণ যে ধর্ম এতদিন শুধু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণের ধর্ম ছিল, রামানন্দই তাহা নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও ছড়াইয়া দেন। রামানন্দের পূর্ব পর্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষাতেই ছিল। রামানন্দই ইহা হিন্দী ভাষায় জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া লেখেন। ইহাতে এই লাভ হয় যে, জনসাধারণই এই ধর্মকে বরণ করিবার সুবিধা পায়।

বৈরাগীদের মধ্যে কোনও সম্প্রদায় কৃষ্ণকে, কোনও সম্প্রদায় রামচন্দ্রকে বেশী শ্রদ্ধা করে। পঞ্জাবী রামানন্দী সম্প্রদায় শ্রীরামচন্দ্রের ও নিমানন্দীরা শ্রীকৃষ্ণকে বেশী শ্রদ্ধা করে। ইহাদের প্রত্যেকেরই সাম্প্রদায়িক চিহ্ন আছে, প্রত্যেকেই ইহারা তীর্থভ্রমণ করে, এবং যার যার দেবতাসম্বন্ধীয় গ্রন্থকে শ্রদ্ধা করে। মধ্য প্রদেশে পূর্বের মতো এখন আর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈরাগী হয় না। অনেকে এখন বিবাহিত জীবনযাপন করে ও স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘর-সংসার করে।

যুক্তপ্রদেশে চারিটি বিভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে রামানুজ বা শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায় আর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ই শ্রেষ্ঠ। শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিষ্ণু বা ঈশ্বর অভিন্ন। মামুরীসম্প্রদায়ের মতো ইহারা রাধার ভজনা করে না। ইহাদের মধ্যে আবার কেহ তেঙ্গলাই বা দক্ষিণী, ভেদবালাই বা উত্তরীয় দুই ভাগ আছে। ইহাদের মতবাদের আবার প্রভেদ আছে। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মতবাদ খুব উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। গ্রোজ সাহেব লিখিয়াছেন, বিশ্বাসের উপরই ইহাদের মুক্তিবাদ।

বৈরাগীর শৈব বা পরমহংসের মতো সকলে অনুষ্ঠানাদি করে না। মহাভারত ভীষ্মপর্বে যেরূপ ভীষ্মের শরশয্যার কথা আছে। মনিয়র উইলিয়ম বলেন, ঠিক এইরূপ তিনি পুষ্করে দেখিয়াছেন। কিন্তু শালগ্রাম, বাণলিঙ্গ ও গণেশ সকলেই পূজা করে।

নিমাবৎ

নিমাবৎ উত্তর-ভারতের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। বাঙলাদেশেও এই সম্প্রদায় প্রচুর আছে। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম নিম্বার্ক। নিম্বার্ক মথুরায় বৃন্দাবনের কাছে ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ। মাদ্রাজের বেলারী নামক স্থানে তিনি জীবনের অধিককাল সময় কাটাইয়া দেন। নিম্বার্ক সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনীও লিপিবদ্ধ আছে। কোনও এক সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বৈরাগীর বেশে এক সাধু আসিয়া উপস্থিত হন। তখন সন্ধ্যাকাল, সাধু অভুক্ত। সাধু আসিয়া আহার প্রার্থনা করিলেন অথচ সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। সন্ধ্যার পর তিনি আহার গ্রহণ করেন না। নিম্বার্ক সাধুসেবায় বিমুখ হইলেন না, সাধুর ভোজন শেষ হওয়া পর্যন্ত নিম্ববৃক্ষে সূর্যদেবকে আবদ্ধ রাখিলেন। সম্প্রদায়ের লোক নিম্বার্ককে সূর্যদেবতার অবতার বলিয়া মনে করে। সূর্য বা সুদর্শন বিষ্ণু বা কৃষ্ণ সূর্যেরই প্রতিরূপ। নিম্ববৃক্ষও সর্বত্রই সূর্যপূজার অঙ্গীভূত। নিম্বার্কের আবির্ভাবের সময় নির্ধারণ সহজ নহে। সম্ভবত তিনি ১২শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হন ও নিজ ধর্মমত প্রচার করেন। কেহ কেহ এই নিম্বার্ককে ভাস্করাচার্য বলিয়াও অনুমান করিয়াছেন। এই ভাস্করাচার্যই অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখেন।

নিম্বার্কসম্প্রদায়কে শনকসম্প্রদায় বা শনকাদি সম্প্রদায়ও বলে। শনক নিম্বার্কের পরবর্তী মোহান্ত। ইহারা রাধাকৃষ্ণের উপাসক। তুলসীর মালা গলায় পরে ও তুলসীর মালা জপ করে। ইহাদের মতবাদ সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থে আছে। রামানুজের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ইহাদের সিদ্ধান্তের বড় প্রভেদ নাই।

জীব ও পৃথিবী ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। ইহারা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন। স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। প্রথমে

এই সমস্ত সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, পৃথিবীতে ইহা স্থূলভাবে প্রকাশিত হয়। ভক্তিবাদে মুক্তি মিলিবে, রামানুজের মতো তাহাও স্বীকার করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ এবং তাঁহার কৃপায় নির্ভরতাই মানুষের মুক্তির উপায়। পাপ ও অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে মুক্তি আরাধ্য দেবতাই দিতে পারেন। নিম্বার্কও বদ্ধ আত্মা ও মুক্ত আত্মা স্বীকার করেন। পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান ইহারা প্রয়োজন মনে করেন। (১) উপাস্যকে জানা, (২) উপাসককে জানা, (৩) আত্ম-সমর্পণ, ঈশ্বরানুগ্রহ ও দৈববল, (৪) যথার্থ ভক্তিমাহাত্ম্য, (৫) ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবার বিঘ্ন। জড়বস্তু এইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রকৃতি-সঞ্জাত, প্রকৃতি-বহির্ভূত ও সময়। ভগবদিচ্ছায় জীব যখন প্রকৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখনই তাহার স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায় জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায় কর্তৃক নিগৃহীতও হইয়াছে। এমন এক সময় হইয়াছিল, যখন এই সম্প্রদায় প্রায় নির্বাণোন্মুখ হইয়া যাইতেছিল। ইহাদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না।

রাধাস্বামী সম্প্রদায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীস্ট ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে ভারতের অসংখ্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাধাস্বামী সম্প্রদায়েরও অভ্যুত্থান হয়। এই হিন্দু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কবীরপন্থীর ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক আছে।

শিবদয়াল সাহেব একজন ব্যাঙ্কার। জাতিতে ক্ষত্রিয়, বাসস্থান আগ্রায়। মিউটিনীর পূর্বে তিনি একজন বৈষ্ণবধর্মের উপদেষ্টা ও সাধু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব পুরোহিতদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। কিন্তু তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় ক্রমশ বাড়িতেছিল, প্রভাবও ক্রমশ বাড়িতেছিল। কবীরের ধর্মমতের সহিত তাঁহার ধর্মমত প্রায় অভিন্ন। কিন্তু তিনি তাঁহার শিষ্যদের ধ্যানরহস্য দিয়াছিলেন। ইহ র ফলে তাঁহারা বশীকরণ-বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সাধু, সদ্‌গুরু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সতী সাধ্বী, গুণবতী ভার্যাও অনুরূপ ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার ধর্মমত শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিষ্যেরা স্বামী-স্ত্রীর ধ্যানী অবস্থার ফটোগ্রাফ লইয়াছিলেন। দেবদেবীর মতো তাঁহারা পূজিত হইতেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মতবাদ তিনি জনসাধারণের সমক্ষে প্রচার করেন। হিন্দী ভাষায় তিনি দু'খানি বই রাখিয়া যান। একখানির নাম 'সারবচন' অন্যখানির নাম 'সারবাণী'। এই গ্রন্থখানি ইহাদের ধর্মানুষ্ঠানের অংশরূপে গৃহীত হইয়াছে।

রাধাস্বামীর প্রসিদ্ধ শিষ্য শালিগ্রাম সাহেব একজন গভর্নমেণ্টের কর্মচারী ছিলেন। ইনি যুক্ত-রাজ্যের পোস্ট মাষ্টার জেনারেলের পদে

উন্নীত হন এবং গভর্নমেন্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি খুব স্থিরচিত্ত ও উদ্যমশীল সাহসী লোক ছিলেন। মিউটিনীর ভয়সঙ্কুল অবস্থার সময় সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন এবং সদ্‌গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাক্সমুলর Ramkrishna, his Life and Sayings নামক গ্রন্থে শালিগ্রাম সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাধাস্বামীর দিব্যলোক প্রাপ্তি হয়। রাধা-স্বামীর মৃত্যু হইলেই রায় শালিগ্রাম সাহেব বাহাদুরকে শিষ্যরা গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি সম্প্রদায় স্থাপন করেন এবং তাহার নামকরণ করেন। গুরুর মতবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখিয়া মতবাদ প্রচার করেন। রাধাস্বামী তাঁহার মত ইংরেজিতে প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ সালে ইহা বারাণসীতে প্রকাশিত হয় এবং আপনার লোকের মধ্যেই বিতরিত হয়।

এই জগৎ ত্রিজগতে বা তিন ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগ আবার ছয় রাজ্যে বিভক্ত। (ক) প্রথম ভাগ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। ইহাতে স্বয়ং ভগবান্ বাস করেন, ইনি অজ্ঞাত। রাধাস্বামী তাঁহাকে জানেন। যিনি যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন, যোগনিষ্ঠ তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। (খ) দ্বিতীয় ভাগ অধ্যাত্মজড়। বিষয় ও আত্মা লইয়া এই জগৎ। এই বিষয়ের উপর আত্মার অসাধারণ প্রভাব। আত্মার দ্বারাই এই জগৎ শাসিত। এই জগতে বাইবেলে, ঈশ্বর, উপনিষদে ব্রহ্ম, মুসলমান সাধুদের মতে 'লাহুত' কর্তা। (গ) তৃতীয় ভাগ জড়অধ্যাত্ম। এই জগতে বিষয়েরই প্রাধান্য। প্রবৃত্তি বা ভোগ ইহার মূল বলিয়া আত্মা জড়ধর্মে মোহপ্রাপ্ত। এখানে হিন্দুদের ব্রহ্মা ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দেবতারা শাসক।

স্বয়ং ভগবান্ হইতে শব্দ-ব্রহ্মের উৎপত্তি। শব্দ-স্রোত এই ব্রহ্মনাদ হইতে প্রবাহিত এবং তাহাতেই আবার লীন।

সেই ব্রহ্মসমুদ্রের ক্ষুদ্র জল-বিন্দু মানুষের আত্মা। প্রকৃতি-

ধর্মে এই জগৎ সৃষ্ট বলিয়া এই অবিনশ্বর আত্মাই প্রকৃতি-ধর্মে বন্দী। অধ্যাত্মশক্তির সহায়তা ছাড়া বিষয়মুগ্ধ এই আত্মা ক্রমশ অধোগামী হয়। ভগবানের প্রিয়-পুত্র কয়েকজন আছেন। ভগবান্ তাঁহাদের কখনও কখনও এই প্রকৃতি রাজ্যে প্রেরণ করেন। প্রেমে ও কারুণ্যে তাঁহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। জগতের বিষয়মুগ্ধ বন্দী আত্মার মুক্তির জন্য তাঁহারা এই ভূমণ্ডলে কখনও কখনও আসেন। এই সকল গুরুর সেই পুত্র।

সম্প্রদায়ের মতবাদের যে শিক্ষা ও অনুশাসন, তাহাই গুরু শিষ্যদের শিক্ষা দেন। সদ্‌গুরুর উপদেশ ছাড়া আধ্যাত্মিক জগতে উত্থান অসম্ভব। প্রত্যেক জীবেরই মুক্তির জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। ইঁহাদের গূঢ় অভিজ্ঞানকে সুরত-শব্দ-যোগ বলে। শব্দব্রহ্মের সঙ্গে মানবাত্মার সংযোগ অবস্থার নাম সুরত-শব্দ-যোগ। ধ্যানী ছাড়া এ অবস্থা অন্য কাহারও জানিবার উপায় নাই। গুরু তাঁহার ফটোগ্রাফ শিষ্যকে দেন এবং শিষ্যকেও ধ্যানস্থ হইতে উপদেশ দেন। প্রার্থনা, বিশ্বাস ও দানের জন্য শ্রদ্ধান্বিত ধর্মানুষ্ঠান। নিরামিষ আহার, মদ্যাদি পানত্যাগ, সম্প্রদায়ের পূজা-অর্চনায় ও সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়া, এই সমস্তই বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম-জীবন-যাপনে প্রয়োজন।

দ্বিতীয় গুরু ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে দিব্যগতি প্রাপ্ত হন। ইংরাজি পুস্তিকাখানি ছাড়া তিনি হিন্দীতে চারিভাগ 'প্রেমবাণী' প্রচার করিয়া যান। ছয় ভাগ 'প্রেমপত্র' প্রচার করেন।

তৃতীয় গুরুর নাম ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র। বারাণসীবাসী বাঙালী ব্রাহ্মণ। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইনি গুরুপদে অভিষিক্ত ছিলেন। তাহার পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। Discourses of Radhasvami Faith (বেনারস, ১৯০৯) পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে গুরুদের সংক্ষিপ্ত মতামত আছে।

তৃতীয় গুরুর মৃত্যুর পর হইতেই এই সম্প্রদায় আবার দুই ভাগে

বিভক্ত হয়। এক সম্প্রদায়ের গুরু আনন্দস্বরূপ, অন্য সম্প্রদায়ের গুরু মাধবপ্রসাদ। কিন্তু ইনি গুরুর নাম নিতে অস্বীকার করেন।

সাধু সদ্‌গুরুরা ভগবানের স্বরূপ। তাঁহারা পদমর্যাদা বুঝাইবার জন্য বড় বড় উপাধি প্রাপ্ত হন। সুতরাং সম্প্রদায়ের পূজা অর্চনা যাহা কিছু, তাঁহাকে লইয়াই। এই গুরুবাদে গুরুকে ভক্তি করা হয়, গুরুকে পূজা করা হয়। তাঁহার সামনে নানা প্রার্থনা করা হয়। শিষ্যেরা বিশ্বাস করেন, গুরু কোন জিনিস স্পর্শ করিলেই সে জিনিসের আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ে।

রয়দাসী

উত্তর-ভারতের রয়দাস বা রবিদাস, রাইদাস রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে একজন। ইনি জাতিতে চামার। এখন চামার মাত্রকেই রয়দাসী সম্প্রদায়ের লোক বলা হয়। তাহারা যুক্তপ্রদেশের আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশে বাস করে। ইহাদের সংখ্যা বেশী নহে। ওখানে উহাদের নামের উপাধি ও সম্প্রদায়ের উপাধি এক বলিয়া ইহাদের সংখ্যা নির্ধারণ সহজ নহে। (১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে ইহাদের লোকসংখ্যা ৪১৭,০০০২ ছিল। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ৪৭০০০ বোধ হয় শুধু রামায়েৎ বা রামানন্দী সম্প্রদায় গণনা করা হইয়াছে।)

রয়দাসের গুরু রামানন্দ। রয়দাসী সম্প্রদায়কে ধর্মসম্প্রদায়ও বলা যাইতে পারে, চামার-সঙ্ঘও বলা যাইতে পারে। ইহাদের বিশেষ কোনও ধর্মগ্রন্থ নাই। মুখে মুখে রয়দাসের উদ্দেশে ধর্ম-স্তোত্রাদি আছে। ইহার কতকগুলি শিখ গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'রয়দাসী কী বাণী আওর জীবন-চরিত' বলিয়া সম্প্রতি ইহার একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিশ্বাস ও ভক্তি। এই বিশ্বাস ও ভক্তির মূল বৈষ্ণবধর্মে। বেদের ও ব্রাহ্মণ্যবাদের ভক্তিকে ইহাদের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। রয়দাসী সম্প্রদায় শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত।

রয়দাস বারাণসীবাসী ছিলেন। রামানন্দের শিষ্যরূপে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কবীর ও রয়দাসের মত প্রায় একই প্রকারের। বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য যুগের মতবাদের চেয়ে বৈষ্ণব মতবাদই ইহাদের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। রামানন্দের শিক্ষায় রয়দাস ইহাই বুঝিয়াছিলেন, মুক্তি শুধু ব্রাহ্মণের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, স্ত্রীলোক, নিম্নজাতি

প্রভৃতি সকলেই সাধনবলে মুক্তিকামী হইতে পারে। 'কবীর' মুসলমান তাঁতী ছিলেন, 'সেন' নাপিত ছিলেন, রয়দাস চামার ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ছাড়াও জাতিধর্মনির্বিশেষে যে কোনও ভাষায় যে ভগবদ্ভাব প্রচার করা যাইতে পারে, এবং যে কোন মানুষ যে মুক্তিকামী হইতে পারে, ইহারা তাহাই প্রমাণ করেন। যদিও রয়দাস সাধু ও সদুপদেষ্টা ছিলেন, তবুও তিনি বিবাহিত জীবন যাপন করিতেন এবং ঐ অবস্থায় মুচির কাজ করিতেন।

ভক্তমালায় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আছে। নিম্নজাতির যে উচ্চাঙ্গের সাধন অসম্ভব, ইহা বুঝাইবার জন্য ঐ গ্রন্থে লেখা হইয়াছে যে, রয়দাস পূর্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এক মুচির কাছ থেকে তিনি ভিক্ষা লইয়াছিলেন বলিয়া রামানন্দ তাঁহাকে 'চামার হও' বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি পরজন্মে চামার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু চামার মায়ের গর্ভে জন্ম লইয়া চামারের অন্নই গ্রহণ করিতে হইত। রয়দাস অতি শিশুকাল হইতেই বৈষ্ণব ছিলেন। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিশু মাতৃস্তন্য ছাড়া আর কিছু পান করিত না। রামানন্দ স্বর্গ হইতে পূর্বজন্মের সকল কথা তাঁহার স্মৃতিপথে স্মরণ করিয়া দেন। তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং দিন রাত্রি রাম নাম লইয়া থাকিতে আরম্ভ করেন। এই জন্য তাঁহার বাবা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন ও অতি দারিদ্র্য দশায় কালযাপন করিতে আরম্ভ করেন। এ সময়েও তিনি মুচির কাজ করিতেন। সাধু মহাত্মার জন্য তিনি জুতা প্রস্তুত করিয়া দিতেন। অন্য আর একটি আখ্যায়িকা আছে যে, তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অনুগ্রহে যথেষ্ট অর্থ লাভ করেন এবং সেই অর্থ দিয়া মঠ স্থাপন করেন। এই মঠে তাঁহার অনেক শিষ্য হয়। ব্রাহ্মণেরা ইহাতে চটিয়া যান এবং রাজার কাছে ইহার জন্য বিচারপ্রার্থী হন। অলৌকিক ঘটনায় তিনি জয়লাভ করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করেন।

তাঁহার একজন প্রধানা শিষ্যা চিতোরের মহারাণী ঝালী। তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বৃহৎ এক ভোজের অনুষ্ঠান করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁহাদের জন্য ফলাহারের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা খাইতে বসিলে দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, তাঁহাদের প্রতি দুই জনের মধ্যে একজন রয়দাস বসিয়া আহার করিতেছেন। এই ঘটনা দেখিয়া ব্রাহ্মণদের চক্ষু উন্মীলিত হইল। তাঁহারা রয়দাসের কাছে আসিয়া তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রয়দাস একদিন তাঁহার চর্মভেদ করিয়া দেখাইলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ, স্বর্ণ-যজ্ঞোপবীত তাঁহার গলায় রহিয়াছে। এই ঘটনায় তাঁহার নশ্বর দেহ বিয়োগ হয় এবং তিনি দিব্যধামে প্রস্থান করেন, নভদাসের উপদেশ অনুসারে প্রিয়দাস এই আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি রয়দাসের তিন পুরুষ পরে জীবিত ছিলেন।

৪

উদাসী

উদাসীরা শিখ সম্প্রদায়। ইহাদের নানকপুত্র বলে। নানকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদ হইতে ইহাদের প্রতিষ্ঠা। সংস্কৃত উদাস শব্দ হইতে উদাসী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উদাসী অর্থ সংসারে আসক্তিহীন। শিখেদের এই সম্প্রদায় যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখে না। তৃতীয় গুরু অমরদাসের সময় হইতেই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চম গুরু অর্জুনের সময় হইতে এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

উদাসীরা প্রথমত চার ভাগে বিভক্ত ছিল—বাবা, হাসন, ফুল ও গোন্দা। ইহারা চারজনেই গুরুদত্তের শিষ্য। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ শ্রীচাঁদকে তাঁহার পুত্র গুরুদত্তকে মুখ্য শিষ্য করিবার অনুমতি দেন। উদাসীরা ঐ চারজন গুরুদত্তেরই শিষ্য। হাসন ও আলমাস্ত দুইই মুসলমানী নাম। হাসন আরবী উপাধি। আলমাস্ত অর্থে প্রেম-পিপাসু। আলমাস্ত সাহেব নৈনিতালে ও জগন্নাথে। গোন্দা সাহেব সিন্ধুর শিকারপুরে এবং পঞ্জাবের অমৃতসরের কাছে। ঐ চারভাগের আবার বড় আখ্ড়া ও ছোট আখ্ড়া আছে। ফেরু নামক একজন গুরু হইতে ইহাদের প্রতিষ্ঠা। ইনি হররায়ের শিষ্য, হররায় শিখ সপ্তম গুরু। উদাসীরা নগ্ন ও অবিবাহিত থাকে। স্যর এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান বলিয়াছেন, রক্তবর্ণ গৈরিক পরে এবং ইহারা বেশীর ভাগই উলঙ্গ সন্ন্যাসী, কেবলমাত্র কোমরে এক খণ্ড বস্ত্র পরিধান করে। গায়ে ভস্ম মাখে। এই চার ভাগ ছাড়া আর একটি বিভাগ আছে, তাহার নাম ভাগবত, ইহারা ভগবানে আত্মসমর্পিত। এ সম্বন্ধে এই উপাখ্যান প্রচলিত আছে যে, ভগবৎগীর নামে এক সন্ন্যাসী বাবা নানকের ডেরা দেখিতে গিয়াছিলেন। নানকের পৌত্র ধরমচাঁদ ভগবৎগীরকে পেট পুরিয়া

আহার করাইবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি উদর পূর্ণ করাইতে পারিলেন না। কিন্তু 'কড়া প্রসাদে' তাঁহার উদর পূর্ণ হইল। বৈষ্ণবের ভিক্ষাপাত্রের প্রসাদের নাম 'কড়া প্রসাদ'। এই ঘটনায় ভগবংগীর বশীভূত হইলেন। কথিত আছে, হিঙ্গল দেবীর তিনি সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ভগবৎগীর ও দলের লোকেরা ধরমচাঁদের শিষ্য হয়। ইহাদের প্রধান আখ্ড়া অমৃতসরের বিবিকসর পুকুরে, ইহাদের ছোট আখ্ড়া বেরেলী ও হিন্দুস্থানের অন্যান্য স্থানে আছে। হিন্দুস্থানে ইহাদের ৩৭০টি গদী আছে। ইহারা জটাধারী, গায়ে ভস্ম মাখে। নানকপন্থীর আর একটি বিভাগ আছে, সে বিভাগের নাম সঙ্গৎসাহেব। গুরু হররায়ের এক রাঁধুনী ছিল, তার নাম ফেরু। একবার ফেরুকে শিখদের কাছে 'বার্ষিক' আদায় করিতে পাঠান। গুরু গোবিন্দসিংহ এই প্রথা রহিত করেন। অনেকেই ইহাতে অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ফেরু ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ না করায় গুরু গোবিন্দ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পাগড়ীর অর্ধাংশ দান করেন, গুরুদের মধ্যে তাঁহারও স্থান নির্দেশ করেন এবং সঙ্গৎসাহেব উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে শিষ্যদের কাছে পাঠান। এই বারে তিনি শিষ্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে বা তাহার পূর্বে তিনি আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার একজন শিষ্য সন্‌তোখ্‌দাস অনেক অলৌকিক শক্তি দেখাইতেন। পশ্চিম ও দক্ষিণ পঞ্জাবে সঙ্গৎসাহেবের খুবই প্রভাব। কিন্তু তাহাদের গল্প গুজব হইতে জানা যায়, তাহারা রীতিমতো উদাসী ছিল না। অন্য আর একটি কিংবদন্তী এই যে, এই বিভাগ প্রসিদ্ধ সুলতান শাখী সরার হইতে হইয়াছে। তিনি গুরু গোবিন্দের শিষ্য। অমৃতসরে তাহাদের ব্রহ্মভূত আখ্ড়া আড্ডা আছে। লাহোরে তাহাদের বিদ্যালয় আছে। তাহারা গোঁড়া শিখ সম্প্রদায়। পাতিয়ালা স্টেট তাহার অন্তর্গত। এখানে সঙ্গৎসাহেবের খুব সম্মান, আদি গ্রন্থকে তাহারা খুবই সম্মানের চোখে দেখে। উদাসীদের মধ্যে রামদাসের নামও

খুব প্রসিদ্ধ, অমৃতসরের কিছু দূরে তাহাদের একটি মন্দির আছে। উদাসীদের প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই আলাদা আলাদা অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা আছে। সকল সম্প্রদায়ের মঠের একজন মোহান্ত আছেন। সাধারণত হিন্দুজাতি হইতেই উদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত হয় এবং তাহারা হিন্দুর অন্নই গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা অমৃতসরের পবিত্র তীর্থ স্থানে, কার্তারপুরে বেশী আছে, মনোয়া ও বারাণীতেও তাহারা অনেক আছে। রোটকে, মধ্যপঞ্জাবে তাহাদের প্রধান আড্ডা। তাহাদের মধ্যে কেহ শিখদের মতো লম্বা চুল রাখে, কেহ কেহ সন্ন্যাসীদের মতো জটাধারী হয়, কেহ কেহ চুল কাটিয়া ফেলে। কেহ তিলক কাটে, কেহ কাটে না। সাধারণ মৃতদেহ হিন্দুদের মতো সৎকার করা হয়, কখনও কখনও গোর দেওয়া হয়।

লুধিয়ানার উদাসীরা জাঠ। তাহারা গুরু গোবিন্দের ও নানকের গ্রন্থাদি পাঠ করে। গুরু গোবিন্দের চেয়েও নানকের গ্রন্থাদি তাহারা বেশী পাঠ করে। অনেকেই বিবাহ করে না। যাহারা বিবাহ করে, তাহারা গৃহস্থের মতো বাস করে। যাহারা বিবাহ করে না, তাহারা ধর্মশালা হইতে সাহায্য পায়। কোন কোন পরিবার যথেষ্ট ভিক্ষা প্রদান করে। মোহান্তেরা বিবাহ করিলে তাহাদের প্রতিষ্ঠা কমিয়া যায়। গুরুদাসপুর জেলায় দেরনানক স্থানে বেদীর অনুমতিক্রমে মোহান্ত স্থির করা হয়। ঐ স্থানে টালিসাহেব বলিয়া অন্য মন্দির আছে। শ্রীচাঁদ উহার প্রতিষ্ঠাতা। উদাসী সম্প্রদায়ের মোহান্ত তাহার পরিচালনা করে।

সেনপন্থী

সেনপন্থীরা ভারতীয় এক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। রামানন্দী সম্প্রদায় হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। সেন বা সেনানন্দ জাতিতে ক্ষৌরকার ছিলেন। অন্যান্য বৈষ্ণবদের সহিত ইহাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। ইহারা বুন্দেলখণ্ডে বান্ধোগড় ও রিওয়ার নামক স্থানে অনেক পুরুষ ধরিয়া ছিলেন। রাজার নাম বীরসিংহ। তিনি অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু রামানন্দী চতুর্দশ শতাব্দীর লোক ছিলেন। হয় রামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীর লোক ছিলেন না, অথবা ঐ রাজার নাম বীরসিংহ ছিল না। সেন অন্য কাহারও গুরু ছিলেন। কারণ, বৈষ্ণবদের আখ্যায়িকা হইতেই ঐ রাজাদের কাহিনী পাওয়া যায়।

আখ্যায়িকায় পাওয়া যায় সেন রাজার নাপিত ছিল। সেন একদিন সাধু দর্শনে যাইয়া আর রাজবাড়ি আসিতে পারিল না। কিন্তু স্বয়ং রামচন্দ্র আসিয়া রাজার ক্ষৌরকর্ম সমাধা করিয়া যান। পরদিন আসিয়া রাজার কাছে সেন ক্ষমা চাহিলে রাজা বিস্মিত হইয়া সেনের পায়ে পড়িলেন ও তাহাকে গুরু নির্দেশ করিলেন।

এই সম্প্রদায় এখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

গোসাঁই, গোস্বামী, গোসামী, স্বামী স্বামী সংস্কৃত গোস্বামিন্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন, অর্থ রাখাল বা গরুর মালিক। ইহার শেষোক্ত অর্থ যাঁহারা ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছেন। হিন্দু, সন্ন্যাসী, ভিখারী লইয়া ইহাদের সংখ্যা ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের মানুষ গণনায় ১৮২,৬৪৮ দাঁড়াইয়াছিল। বোম্বে, রাজপুতনা, বাঙলা, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ইহারা বর্তমান। ইহাদের মধ্যে শৈবও আছে, বৈষ্ণবও আছে।

শৈব গোস্বামী—শৈব গোস্বামীরা শঙ্করাচার্যের শিষ্যপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। শঙ্করাচার্য দাক্ষিণাত্যের একজন শ্রেষ্ঠ শৈবধর্ম প্রচারক। ইঁহাকে ব্রাহ্মণধর্মের অবতার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে শঙ্করাচার্য প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার শিষ্যদের দশটি অনুশাসন আছে। ইঁহাদের দশনামী বা দশনামী দণ্ডী বলে। এই দশটির নাম—(১) তীর্থ, (২) পীঠস্থান, (৩) আশ্রম, নিয়ম, (৪) বন, অরণ্য, (৫) সরস্বতী, (৬) ভারতী, (৭) পুরী, (৮) গিরি, (৯) সাগর, (১০) মরু। ইহাদের প্রত্যেক নামের সঙ্গে ইহারা যে সম্প্রদায়ে আছে, তাহা যোগ করিয়া লয়। যেমন আনন্দগিরি, বিদ্যারণ্য, রামাশ্রম ইত্যাদি।

৪র্থ তীর্থ ইন্দ্র, আশ্রম, সরস্বতী ও ভারতী, ইহারাই প্রকৃত শঙ্কর দণ্ডী। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যোগ্যতম, তাঁহারা সকলেই বেদান্তশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। অন্যান্য শাখা সংস্কৃত শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করেন। ভিখারী দণ্ডী যাহারা, তাহারা যোগমার্গ অবলম্বন করে ও অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করায়। ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ও ব্রাহ্মণের কাছেই দান গ্রহণ করে। বাকী দণ্ডীরা আতিথ্য গ্রহণ করে। দণ্ডী অর্থ দণ্ডধারী, ইহারা গেরুয়া পরিধান করে। গেরুয়া পরিধান-পদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক যুগ হইতে প্রচলিত।

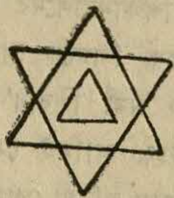
ইহারা ভস্ম মাখে, চুল দাড়ি কামায়, কোমরে মাত্র বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে। ভস্ম ইহারা যজ্ঞের আগুন হইতে সংগ্রহ করে। কপালে ইহারা ভস্মচিহ্ন পরে, ইহার দ্বারা বশীকরণ হয়। অতিথি ও দণ্ডীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, অতিথিরা দণ্ড গ্রহণ করে না। ইহারা ধনসম্পত্তির অধিকারী। নিজেরা নিজেদের অন্ন প্রস্তুত করে।

শৈব গোস্বামীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) সন্ন্যাসী, (২) মঠধারী। মনুর উপদেশ মতে প্রকৃত দণ্ডী একাকী বাস করে, শহরের মধ্যে বাস করিতে নাই, শহরের কাছাকাছি থাকিবে। ইহাদের মধ্যে অনেকে বারাণসী ও হরিদ্বারের মঠে বাস করে ও শৈবধর্মের আলোচনা করে। ইহাদের সাধারণ অশিক্ষিত লোকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য করে, বিবাহ করে, পুত্র পরিবার লইয়া বাস করে। খাঁটি দণ্ডী ব্রাহ্মণদের মধ্য হইতেই আসা নিয়ম। গোস্বামীরা সকল শ্রেণী হইতেই শিষ্য গ্রহণ করেন। নিতান্ত নিম্নজাতি ও অন্ত্যজ জাতি হইতেই শিষ্যগ্রহণ করেন না। দাক্ষিণাত্যে কৃষক ও মালী হইতে এই সম্প্রদায়ের লোক লওয়া হয়। M. A. Sherring বলেন, শিবরাত্রির দিন শিক্ষানবীশদের সাধারণত গ্রহণ করা হয়। পুকুর হইতে জল আনা হয়, লিঙ্গকে স্নান করানো হয়। তারপর মাথা কামানো হয়। গুরু 'নমঃ শিবায়' বা 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র কানে দেন। ওঁ সোহহং, আমিই সেই। স্মার্তমতে মানুষের আত্মাই ব্রহ্ম। তারপর হোম করিয়া গোসাঁই হয়। সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে, দারিদ্র্যকে বরণ করিবে, কৌমার ব্রত অবলম্বন করিবে ও পবিত্র তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে।

বৈষ্ণব গোসাঁই। আসামে ও পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণবদের গুরু পুরোহিতকে গোসাঁই বলে। গুরু-পূজা বঙ্গদেশে খুবই প্রচলিত। বোম্বেতে গোসাঁইদের মহারাজা বলে। ওয়াজ সাহেব বলেন, গোস্বামীরা বাঙালীর উচ্চবর্ণসম্ভূত। সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া তাহারা বেশ মোটাসোটা হইয়া পড়ে। অন্যদিকে কেহ বলেন, বৈষ্ণব

গোস্বামীরা অসংখ্য ভক্ত দ্বারা বেষ্টিত থাকেন, গোস্বামীদের ইহাদের উপর অসাধারণ অধিকার। ইহারা ভক্তদের সঙ্গে জ্ঞানীর মতও ব্যবহার করেন; ইহাদের ব্যবহার ও কার্যকলাপও সুষ্ঠু। ইহারা রাজভক্ত। ইহাদের গোঁড়ামী নাই, ইহাদের মতও উদার। ব্রহ্মপুত্র ও সুহিতের কাছে মাজুলি দ্বীপে বৈষ্ণবদের যে আখড়া মঠ আছে, তাহাতে যে বৈষ্ণবধর্মের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চেয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষত্বজ্ঞাপক ব্যবস্থা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা অনেকেই স্বীকার করেন যে, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণকারী গোস্বামীদের সঙ্গে কুলত্যাগিনী অনেক স্ত্রীলোক থাকে। পূর্বে সর্বত্র ইহাদের অত্যাচার ও ব্যভিচার ছিল। শেষে ইহাদের সকলে মধোজি সিন্ধিয়ার মহারাষ্ট্র সৈন্যদলে যোগ দিয়াছিল।



লিঙ্গায়ত

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের মানুষ-গণনার হিসাবে লিঙ্গায়তদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ। ইহাদের অর্ধেকের বেশীর ভাগ বোম্বে প্রেসিডেন্সীতেই বিদ্যমান। বীজাপুরের অর্ধেক প্রায় লিঙ্গায়ত। নিকটবর্তী ধারওয়ার প্রভৃতিতেও অর্ধেক প্রায় লিঙ্গায়ত। মহীশূর ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মধ্যে অসংখ্য লিঙ্গায়ত বাস করে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-পশ্চিম কোণেও অনেক লিঙ্গায়ত বাস করে।

লিঙ্গায়তেরা লিঙ্গবন্ত, লিঙ্গাঙ্গস্, বীরশৈব প্রভৃতি নামে খ্যাত। সংস্কৃত লিঙ্গ শব্দ হইতে লিঙ্গায়ত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। লিঙ্গায়তেরা একটি রৌপ্য বাক্স ধারণ করে। ইহা তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের চিহ্ন-স্বরূপ। ইহা কোনক্রমে অপহৃত হইলে ইহারা আধ্যাত্মিক মৃত্যু বলিয়া মনে করে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই এই রৌপ্য বাক্স ব্যবহার করে।

লিঙ্গায়তেরা দ্রবিড়। দ্রবিড়েরা আর্যদের পূর্বে আসিয়া ভারতে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ। দ্রবিড়, কানাড়ী ভাষায় ইহারা কথা বলে। ইহারা শান্তিপ্রিয় জাতি ছিল না। হিন্দুরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করে, কিন্তু ইহারা শুধু শিবকেই মানে। লিঙ্গোপাসনা শিবেরই উপাসনা। ইহারা বেদকে শ্রদ্ধা করে বটে কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্মণদের অনেক কথাই ইহারা মানে না। লিঙ্গায়তদের একজন ধর্মগুরু বাসব বলেন, মানুষ মাত্রই পবিত্র। কেননা দেহমন্দিরে আত্মারূপী ভগবান্ বাস করেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক মানুষই জন্মে সমান অধিকার পায়। ইহা দ্বারা মনে হয় যে, ব্রাহ্মণেরা সকলের সমান অধিকার স্বীকার করেন না। অধিকারী ভেদ নির্দেশ করেন। ইহা তাহারই প্রতিবাদ। হিন্দুধর্মে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ও বিধবা

বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ অনুমোদিত। হিন্দুরা মৃতদেহের সংকার করে, ইহারা মৃতদেহ কবর দেয়। অশৌচ মানে না।

লিঙ্গায়তেরা তিনটি দলে বিভক্ত। অষ্টবর্ণ বলিয়া ইহাদের অনুষ্ঠান আছে। লিঙ্গায়তের আটটি অধিনায়কের নাম—১ গুরু, ২ লিঙ্গ, ৩ বিভূতি, ৪ রুদ্রাক্ষ, ৫ মন্ত্র, ৬ জঙ্গম, ৭ তীর্থ, ৮ প্রসাদ। ছেলে হইলেই পিতামাতা গুরুর জন্য লোক পাঠায়। গুরু আসিয়া ছেলের সঙ্গে লিঙ্গ বাঁধিয়া দেয়। গায়ে ভস্ম মাখায়, তারপর গলায় রুদ্রাক্ষ মালা পরাইয়া দেয়। তারপর নমঃ শিবায় মন্ত্র কানে দান করে। তারপর শিশুকে লিঙ্গায়ত পুরোহিত জঙ্গমের হাতে শিবারাধনার জন্য দেওয়া হয়। পুরোহিত আসিলে পিতামাতা তাহার পা ধোয়াইয়া দেয়। এই জলকে তীর্থ বা চরণামৃত বলে।

জঙ্গমকে ভোজন করানো হয়, এবং তাহার পাত্র হইতে ছেলের মুখে ভাত দেওয়া হয়। ইহাকে প্রসাদ দেওয়া বলে। লিঙ্গায়তদের মধ্যে মাংস স্পর্শ করিবার অনুমতি নাই। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক কৃষিকার্যে ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত। ইহারা সাধারণত শান্তিপ্রিয়, আইন মানিয়া চলা ইহাদের স্বভাব। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে চায়। ইহারা অনেকে রাজকীয় কর্মে নিযুক্ত। মোটের উপর ইহারা অধ্যবসায়ী, শিল্পনিপুণ, সৎ।

জে. এফ. ফ্লীট যে দুইখানি তাম্রশাসন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে লিঙ্গায়তধর্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লিঙ্গায়ত সাধু বাসব হইতে শৈব উপাসনা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বাসব ও তাহার ভাগিনেয় চন্নবাসব এ সম্বন্ধে দু-খানি পুরাণ লিখিয়াছেন। বাসবপুরাণ ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে পুনা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। চন্ন-

বাসবপুরাণ ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে মঙ্গলোর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইহাদের গ্রন্থাদি লিখিত হয় নাই। বাসবপুরাণ বলিতেছে, বাসবের পিতামাতা ব্রাহ্মণ। মধীরাজা, মদলম্বিকা ইহাদের নাম। বোম্বে প্রেসিডেন্সীর বিজাপুর জেলায় ইহাদের বাস ছিল।

কানাড়ী ভাষায় বাসবের নাম ষাঁড়। এই ষাঁড় কিন্তু শিবের বাহন। আট বছর বয়সেই বাসব ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের বিরোধী হয় এবং সে বলে সে শিবভক্ত। সে জাতিভেদ ধ্বংস করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শৈবশাস্ত্রে তাহার জ্ঞান দেখিয়া তাহার মাতুল বলদেব তাহার উপর আসক্ত হন। বলদেব তখন কল্যাণ রাজ্যের বিজলরাজার প্রধান মন্ত্রী। বলদেব তাহার কন্যা গঙ্গাদেবীর সঙ্গে বাসবের বিবাহ দিলেন। এই বিজলরাজ জাতিতে কালাচার্য। ১২শ শতাব্দীতে চালুক্যদের কল্যাণরাজ্য অন্যায় করিয়া অধিকার করে, এবং বাসবকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া নিজের কনিষ্ঠ ভগিনী নীললোচনাকে বাসবের হাতে অর্পণ করে। পুরাণ হইতে আরও জানা যায় যে, বাসবের কুমারী ভগিনী নাগলম্বিকা হইতে চন্নবাসব জন্মগ্রহণ করেন। এই চন্নবাসবই 'চন্নবাসবপুরাণ' রচয়িতা। নাগলম্বিকা শিবের অংশে এই পুত্র প্রাপ্ত হন। একদিন বাসব উপাসনারত আছেন, এমন সময় কোথা হইতে একটি পিপীলিকা সামান্য মৃত্তিকাসহ বীজ লইয়া আসিয়া তাহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করে। তিনি ভগ্নিকে ঐ বীজ প্রদান করেন, এবং ভগ্নী গর্ভবতী হন। সেই গর্ভের ফলেই চন্নবাসবের জন্ম হয়।

ইহারা দুজনেই নূতন মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ইহার ফলে বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই ব্যাপার লইয়া যখন বিজলরাজ পর্যন্ত বিচলিত হন, তখন মামা ও ভাগিনেয় উভয়েই পলায়ন করেন। বাসব কুদালসঙ্গমেশ্বরে লিঙ্গমূর্তিতে পরিণত

হন এবং বোম্বে প্রেসিডেন্সী উত্তর কানাড়ায় উল্‌ভি নামক স্থানে প্রাণ হারান। আজ পর্যন্ত উল্‌ভি লিঙ্গায়তদের তীর্থস্থানে পরিণত হইয়া আছে।

দুখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে—প্রথমখানি মানাগলি গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মানাগলি গ্রাম বাগেবাডী নামক স্থানের কিয়দ্দূরে। কিংবদন্তী, এই স্থানেই বাসব জন্মগ্রহণ করেন। এই রেকর্ড হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১১৫৬ খ্রী° বিজলরাজা কল্যাণরাজ্য জয় করেন। ইহাও জানিতে পারা যায় যে, বাসব নামে কোন ব্যক্তি মন্দির নির্মাণ করিয়া সেখানে অনুশাসন রাখিয়া দেন। বাসব রেবদাসের পৌত্র ও চণ্ডী রাজের পুত্র। তিনি মহা-ধার্মিক ছিলেন। অন্য আর একখানি অনুশাসন ধারাওয়ার জেলায় আলব্বু নামক স্থানে পাওয়া যায়। ঐ অনুশাসন দ্বাদশ শতাব্দীর। এই অনুশাসন হইতে একদন্তরম্য বলিয়া কোন লোকের সৌভাগ্যের কথা জানিতে পারা যায়।

রম্য জৈনদের তর্কেও পরাভূত করেন, অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়াও পরাভূত করেন। তিনি নিজের মাথা নিজে কাটিয়া সাত দিন পরে শিবের কৃপায় জীবিত হন। এই সমস্ত ঘটনা বিজলরাজ শুনিতে পাইয়া রম্যকে ডাকেন। বিজলরাজ সব ঘটনা জানিতে পারিয়া ভূমি দান করেন। আলব্বুরে মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। ১১৬২ খ্রীস্টাব্দের কিছু পূর্বে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, বাসব ও রম্য দুজনেই দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে লিঙ্গায়ত মত প্রচার করেন। অবশ্য লিঙ্গায়ত পণ্ডিতেরা ইহার চেয়ে ঢের আগে এই মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে, ইহাই বলিতে চান। ফ্লীট প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলেন, বিজাপুরা জেলার আইহোলের ৫০০ স্বামীজীর বীরবাননজুধর্ম লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়কে বাড়াইয়া দিয়াছে। উহারা অল্পবিস্তর সকলই শৈব। কিন্তু তাহারা বৌদ্ধধর্মেরও সহায়তা করে। মোটামুটি ইহাই

জানিতে পারা যায়, বাসবই এই ধর্মসম্প্রদায়ের মূল, এবং রম্য এই ধর্ম আরও বিশেষভাবে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। বাসব সম্ভবত মানাগলি গ্রামের প্রায় সকল ব্যাপারে যাঁহারা হাত দিতেন, তাঁহাদেরই একজন ছিলেন। রম্য সম্বন্ধে বিশেষ আর কিছু জানা যায় না। চন্নবাসব বলিয়া সত্য সত্যই কোন ব্যক্তি ছিল কি না, তাহা বলা যায় না। যদিও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের দিক্ দিয়া এই সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবু ইহারা অতি প্রাচীন সম্প্রদায় বলিয়াই মনে করে। ইহার কারণ সম্ভবত এই যে, শিব দাক্ষিণাত্যের দ্রবিড়দের দেবতা। আর্যেরা এদেশে বসবাস করিয়া শিবকেও আপনাদের আরাধ্য করিয়া গড়িয়া লইয়াছে এবং ঐ শৈব উপাসনা হইতেই ইহাদের প্রাচীনত্ব ইহারা মনে করে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের শিব ও দ্রবিড়দের শিব মিলিয়া বর্তমান লিঙ্গায়ত ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে।

মহীশূরের স্টেট কলেজের সংস্কৃত ও কানাড়ী ভাষার অধ্যাপক কবিবাসব শাস্ত্রী বলেন, হিন্দু শৈবসম্প্রদায় বরাবরই দুই দলে বিভক্ত। একদল লিঙ্গ পরিগ্রহণ করে, আর একদল লিঙ্গ পরিগ্রহণ করে না। প্রথম দলকে বীরশৈব বলে। বীরশৈবের মধ্যে মনু-প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই জাতিই আছে। পরমেশ্বর আগমের ১৭শ অধ্যায় হইতে তিনি দেখাইয়াছেন, বীরশৈব ব্রাহ্মণদের শুদ্ধ-বীরশৈবও বলে। বীরশৈব রাজাদের মার্গ-বীর-শৈব বলে। বীরশৈব বৈশ্যদের মিশ্র-বীরশৈব বলে ও শূদ্রদের অন্তে-বীরশৈব বলে। ইহাদের অষ্টবর্ণ সাধন ও হিন্দুর আশ্রম চতুষ্টয়ের কথাও বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন। লিঙ্গায়ত ধর্ম প্রথমত জাতিভেদহীন ধর্ম ছিল, বাসব জাতিভেদহীন ধর্মের কথাই প্রথম হইতে প্রচার করিয়াছিলেন। এখন কিন্তু মনুর জাতিভেদ-ব্যবস্থা ক্রমশ ইহাদের মধ্যে ঢুকিয়াছে।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের

কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক মিলিয়া লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ে কত শ্রেণী আছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করে। প্রথম পঞ্চমশালী। পঞ্চমশালীরা অষ্টবর্ণ অধিকার লাভ করে। ইহারা পুরোহিত সম্প্রদায়। ইহাদের আম্ম বা জঙ্গম বলে। ইহারাই ব্যবসায়ী শ্রেণীর নেতা। পরস্পর সকল শ্রেণীরা এক সঙ্গে আহার করিতে পারে। এই শ্রেণী বোধ হয় প্রথম হইতে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া ছিল। এই সম্প্রদায়ের সপ্তম শ্রেণীও পরস্পর এক সঙ্গে খাইতে পারে।

উচ্চ শ্রেণীর বর নিম্ন শ্রেণী হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীর কনে নীচ শ্রেণীর বরের কাছে বিবাহিত হইতে পারে না।

পঞ্চমশালী যাহারা নহে, তাহাদেরও অষ্টবর্ণ অধিকার আছে। এই দলের ৭০টি উপবিভাগ আছে। তাঁতী, কলু, কৃষক, রাখাল ইত্যাদি নানা ব্যবসায়ে ইহারা লিপ্ত। সম্ভবত ইহারা অনেক পরে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছিল এবং নিজেদের পঞ্চমশালী বলিয়া পরিচয় যাহারা দেয়, তাহারা ইহাদের সঙ্গে আহার করিতেও পারে না, বিবাহাদি অনুষ্ঠানও হইতে পারে না।

লিঙ্গায়তের অনেকেরই গোড়ায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা পূর্বে মূল হিন্দু জাতিই ছিল। তারপর লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছে। শেষ পর্যন্ত লিঙ্গায়ত ও অলিঙ্গায়তের খাওয়া-দাওয়া এবং বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, বেলগাঁও জেলার জীয়ার লিঙ্গায়তগণ অলিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের মেয়ে আনে, কিন্তু মেয়ে দেয় না। আবার কোন কোন লিঙ্গায়ত এবং অলিঙ্গায়তগণ পাশাপাশি বাস করে, পরস্পর আহারাদি করে, কিন্তু বৈবাহিক ব্যাপারে সম্বন্ধ রাখে না। এই সকল ঘটনায় প্রথমোক্ত দল জঙ্গমে ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করে, শেষোক্ত দল ব্রাহ্মণ

নিযুক্ত করে। বিগত শতাব্দীতে উজ্জয়িনীর একজন পুরোহিত ধারওয়ার তুমিনকত্তি নামক গ্রামে কতকগুলি তাঁতীকে লিঙ্গায়ত ধর্মে দীক্ষিত করে। এই উপলক্ষে এই নবদীক্ষিত তাঁতীরা আর নিজের জাতভাইদের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাখে নাই। কুর্ভিনর নামে অপঞ্চমশালী ইহারা নূতন সম্প্রদায় হয়। অষ্টবর্ণ অধিকার ছাড়া অপঞ্চমশালী দলে ধোপা, মুচি, জেলে ইত্যাদি জাতি আছে। এই সমস্ত জাতি হিন্দুর মধ্যে অস্পৃশ্য জাতি। বর্তমান লিঙ্গায়তদের মধ্যে অনেকে ইহাদের লিঙ্গায়ত বলিয়াই স্বীকার করে না তাহারা বলে যে, অষ্টবর্ণ অধিকার যাহার নাই, তাহারা লিঙ্গায়ত নহে। নিম্ন শ্রেণীতে অষ্টবর্ণের তিন বা চারিটি নিয়ম ছাড়া মানে না। ইহারা যে লিঙ্গায়ত, প্রতিবেশীরা সকলেই কিন্তু তাহা বলে। কেহ কেহ বলেন, এমন কি, 'পরিআকে' পর্যন্ত লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারে। লিঙ্গ দেখিলেই তাহাকেই দেবতার আসন বলিয়া মান্য করা হয়। উচ্চস্তরে পাঁচজন লিঙ্গায়ত ঋষি হইতে ব্রাহ্মণের মতো গোত্র হইয়াছে। ইহাদের নাম নন্দী, ভৃঙ্গী, কীর, বৃষ, কন্দ। লিঙ্গায়তেরা স্বগোত্রে বিবাহ দেয় না, ভগ্নীর ছেলের সঙ্গেও মেয়ের বিবাহ দেয় না। মামার ছেলে-মেয়ের ও মাসীর ছেলে-মেয়ের সঙ্গেও বিবাহ নিষিদ্ধ। ভগ্নীর কন্যা বিবাহ করিতে পারা যায়, কিন্তু ভগ্নী যদি কনিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে সমাজ তাহা অনুমোদন করে না। বাল্য বিবাহও হয়, যৌবন বিবাহও হয়। ব্যভিচার সকল অবস্থায় দূষ্য, প্রয়োজন হইলে ব্যভিচারী সমাজ হইতে বিতাড়িত হয়। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুনর্বার বিবাহে সমাজ সম্মতি দেয়। ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে ঝগড়া উপস্থিত হইলে পঞ্চায়েত সে ঝগড়া মিটাইয়া দেয়। পাঁচজন প্রবীণ লোকে এই বিচার করে। পুনর্বিচার মঠে হইতে পারে। মঠের মধ্যে উজ্জয়িনী, শ্রী-শৈল, কোল্লেপক, বেলহল্লি ও বেনারস মঠ উল্লেখযোগ্য।

লিঙ্গায়ত মাত্রই শৈব। হিন্দুর শিবের ত্রিশক্তির ধ্বংসশক্তি, কিন্তু ইহাদের শিবের পালন ও ধ্বংসশক্তি দুইই বর্তমান। শিব বৃষবাহন, প্রত্যেক মন্দিরেই নন্দী ও বাসব আছে। ভারতে মুসলমানের পীরের উপাসনাও হিন্দুদের মধ্যে সাধারণ নিয়মে পরিণত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাসব, হনুমান্, গণপতি, মারুতি প্রভৃতি দেবতার পূজাও এই সঙ্গে হয়।

প্রধান পর্বাহ

(১) জন্মের পরে মা এবং শিশু, দুজনকেই স্ত্রীলোকেরা স্নান করায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে বিরালু পরব হয়। হলুদ ও গরম-জল মাখাইয়া এই বিরালু পরব হয়, তার পূজা হয়। পরে নিমপাতা, হলুদ, নারিকেল এই সব দেওয়া হয়। জঙ্গমের চরণামৃত মা ও সন্তানকে দেওয়া হয়।

(২) বাগ্‌দান—কনের বাড়িতে জঙ্গমসহ বরের বাড়ি থেকে কোন ভাল দিনে কনে দেখিতে লোক আসে। সাড়ী, জ্যাকেট, দুটো নারিকেল, পাবখণ্ড হলুদ, সুপারি, পান, চুন, ফুল, সোনা রূপার অলঙ্কার, চিনি প্রভৃতি তাহারা লইয়া আসে এবং অতিথিরা অভ্যর্থিত হইয়া পান ভোজনাদি করে। কনে নব বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হয়। বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা বর পক্ষের আনীত নারিকেল কনের কোলে দেয়। স্ত্রীলোকেরা মঙ্গল গান করে। ইহাদের মধ্যে পাঁচজন কম্বলের উপরের চাল, বাহু, স্কন্ধ ও মাথায় ঢালিয়া দেয়। দুই হাত দিয়া তিনবার এইরূপ করা হয়। পান ও চিনি সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তারপর বর পক্ষের একজন স্বীকার করেন যে, এই মেয়ের সঙ্গেই বিবাহ হইবে। সেই রাত্রেই কনের পক্ষ হইতে সমাগত লোকজনদের খাওয়ান দাওয়ান হয়। ঝাল বা গরম কোন জিনিস খাইতে দেওয়া হয় না।

(৩) বিবাহ—অবস্থানুসারে এক হইতে চারদিন বিবাহের

অনুষ্ঠান হয়। চারদিন যদি অনুষ্ঠান চলে, তাহা হইলে প্রথম দিন পিতৃপুরুষগণের উপাসনাদি হয়। দ্বিতীয় দিনে চাল, হলুদ মঠে পাঠানো হয়। আত্মীয়দের তেল বিতরণ করা হয়। আনন্দধ্বনি করিয়া নূতন কলসী আনিয়া দেবতার মন্দিরে রাখা হয়। সভামণ্ডপ নির্মিত হয়। বর বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে, এই পরবকে 'সুরিগ' বলে। চার কোণে চারিটি নূতন কলসী স্থাপন করা হয়। কলসীতে দশবার কাপাস সূতা জড়ানো হয়। পাঁচজন বিবাহিতা স্ত্রীলোক আসে। বর, কনে ও তাহাদের সঙ্গিনীদের তেল হলুদে রঞ্জিত করা হয়, এই পাঁচজন স্ত্রীলোক আসিয়া গরম জলে তাহাদের স্নান করাইয়া দেন। প্রথম দিনে পিতৃপুরুষদের যে বস্ত্রাদি দেওয়া হইয়াছিল, সেই বস্ত্রাদি উহাদের পরিধান করানো হয়। আরও কিছু অনুষ্ঠানের পর এই সূত্রাদি পরাইয়া দিয়া জঙ্গমকে দেওয়া হয়। 'সুরিগ' পরব শেষ হইলে বর কনে আত্মীয়-স্বজনসহ দেবতার ঘরে যায়। তারপর তাহারা আবার মণ্ডপে নীত হয়। তারপর কনে ঘরে যায় ও পুষ্প দ্বারা সে ঘর সজ্জিত হয়। বর তখনও দেবতার ঘরে। সে স্থানও পুষ্প দ্বারা সুসজ্জিত হয়, এবং বৃষস্কন্ধে আরোহণ করিয়া গ্রাম্য মন্দিরে যায় ও সেখানে নারিকেল উৎসর্গ করে। কপালে পুষ্পহার পরিয়া তারপর বাড়িতে আসে। দেবতার ঘরে কারুকার্য-খচিত ধাতুনির্মিত পাঁচটি কলস সজ্জিত রাখা হয়, সেই কলসে ছাই ও পান থাকে। চার কোণে চারিটি কলস ও মাঝখানে একটি কলস রাখে। কোনও কলসের উপর নারিকেল, কোনও কলসীতে তাল, কোনও কলসীতে পান, কোনও কলসীতে সুপারি রাখা হয়। একটা পয়সাও রুমালে বাঁধিয়া উহার উপর রাখা হয়। তখন একগাছি সূতা দিয়া সব স্থানটা বেড়া হয় এবং আর একগাছি সূতা মাঝের কলসীটি বেড়িয়া সেই সূতার একদিক পারিবারিক গুরুর হাতে, অন্য দিক বরের হাতে দেওয়া হয়। বর ও গুরু বিপরীত দিকে বসে। গুরু তাহার ডান

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কুশের আংটি পরে। বরের বাম দিকে কনে বসে এবং বর-কনের হাত গুরু কুশ দিয়া বাঁধে। বর ও কনের যুক্তহস্ত ধৌত করানো হয়। বিল্বপত্র ও ফুল অর্পণ করা হয়। গলার হাড়ে সূতা বাঁধে ও যুক্ত হাতের কব্জিতে এই সূতা বাঁধা হয়, এবং কনের গলার সূতা বর হাতে লয়, এবং কনের গলায় বাঁধে, পুরোহিত এই সময় মন্ত্র পাঠ করে। বর কনের কাপড়ে কাপড়ে গাঁট বাঁধা হয়। কনে বরের পা পূজা করে এবং কনের মাথার উপর দিয়া চাল ফেলে। পাঁচজন জঙ্গমকে পাঁচটি পয়সাসহ ফলমূলাদি দান করে। আত্মীয়-স্বজনেরা বর কনের পা ধোয়ায়, নানা যৌতুক দেয়। তৃতীয় নিমন্ত্রণ ব্যাপার। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা নিমন্ত্রিত হন। চতুর্থ দিনে কনে সম্মুখে, বর পেছনে এক বলদের উপর চড়িয়া মিছিলসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া সুবাসিত এক প্রকার চূর্ণ পরস্পর পরস্পরকে দেয়, আগন্তুকেরাও এই আমোদে যোগদান করে। তারপর বৌভাত। বৌভাতে নিতান্ত আপনার লোকেরা নিমন্ত্রিত হয়। দম্পতি জঙ্গম ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে এবং হাতে বাঁধা সূতা দরজায় বাঁধে। যে পাঁচজন লোক এই বিষয়ে সাহায্য করে, তাহাদের উপহার প্রদান করে। এক দিনের বিবাহে একই দিনের মধ্যে এই সমস্ত অনুষ্ঠানাদি নিষ্পন্ন হয়।

মৃতদেহ উত্তরমুখী করিয়া কবর দেওয়া হয়। কিন্তু অবিবাহিতদের উত্তরমুখী করিয়া কবর দেওয়া হয় না।

রোগী মরিবার পূর্বক্ষণে স্নান করানো হয়। জঙ্গমকে রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি (ভস্ম), তাম্বুল ও দক্ষিণা প্রদান করে। এই অনুষ্ঠানে রোগীর আত্মীয়-স্বজনসহ জঙ্গমকে খাওয়ানো হয়। মৃতদেহ উপবেশন করাইয়া যে জঙ্গমকে খাওয়ানো হইয়াছিল সেই জঙ্গম তাহার বাম হস্ত মৃতের জানুর উপর রাখে। মৃতদেহকে সম্মান দেখানো হয়। এবং তাম্বুল ও মুদ্রা বিতরণ করিয়া জঙ্গমসহ মৃতদেহ লইয়া সকলে অনুসরণ করে। বংশ নির্মিত খাটিয়ায় মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়। লিঙ্গ বাম

হস্তে রাখা হয়। বিল্বপত্র ও বিভূতি পাশে রাখা হয়। রঞ্জিত বস্ত্রে মৃতদেহ ঢাকিয়া কবর দেওয়া হয়। জঙ্গম কবর স্থানে দাঁড়াইয়া বলেন যে, মৃত ব্যক্তি কৈলাসে গেল। হিন্দুদের যাহা শ্রাদ্ধ, তাহা ইহাদের কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু হয়ত ব্রাহ্মণ সংসর্গবশত বার্ষিক শ্রাদ্ধ উৎসব হয়।

ইহারা ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে না। কিন্তু স্ত্রীলোকদের যে মন্দ যোনি প্রাপ্তি হয়, একথা বিশ্বাস করে। শ্রাদ্ধ না করিলেও ভাদ্র আশ্বিন মাসে পূর্ব পুরুষদের কাপড় ও খাদ্যাদি দান করে।

লিঙ্গায়তদের মধ্যে বিধবা বিবাহ আছে এবং বিবাহ ছেদনও আছে। পৈত্রিক অধিকারের সাধারণ আইন প্রায় হিন্দুদেরই মতন। লিঙ্গায়তেরা বিশ্বাস করে যে জঙ্গমেরা শিবের অবতার।

লিঙ্গায়তদের শুভাশুভ অনেক লক্ষণ আছে। দক্ষিণ হইতে বামে হরিণ, কি কুকুর গেলে তাহা শুভ। বাম হইতে দক্ষিণে গেলে অশুভ। অন্য সম্প্রদায় হইতে লিঙ্গায়ত হইতে হইলে তিন দিনের জন্য সংযমব্রত অবলম্বন করিতে হয়।

প্রথম দিনে চুল দাড়ি কামানো হয়, এবং পঞ্চগব্যে স্নান ও দুগ্ধ পান করিয়া সে দিন কাটাইতে হয়। দ্বিতীয় দিনে জঙ্গমের চরণামৃতে স্নান করে। তাহারা ঐ সময় চিনি ও দুধ খায়। তৃতীয় দিনে পঞ্চামৃত ভক্ষণ করে। পুনর্বার তাহারা চরণামৃত পান করে। তারপর লিঙ্গ ধারণ করে। তখন হইতে উহারা লিঙ্গায়তদের সঙ্গে পানভোজনের অধিকারী এবং লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের লোক। স্ত্রীলোকেরা মাথা কামানো ছাড়া সব অনুষ্ঠানই করে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে একদন্ত রাম্য ও বাসব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে জাতিগত ভেদ, অসাম্য ও পানভোজনাদির নিষেধ বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা তুলিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হন। শৈব উপাসনায় যাহাতে সকলে এইভাবে একমত হয়, তাহার চেষ্টা এই দুজনেই করেন। জৈন বৈশ্যেরাও বেশীর ভাগ ইহাতে প্রভাবান্বিত হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ইহারা নিম্নশ্রেণী বলিয়া ইহারা প্রবুদ্ধ হয়।

জৈনেরা শিবের সরল ভক্ত, কিন্তু দীক্ষিত নহে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও শৈবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহারাও যে জঙ্গম, ঐতিহাসিক প্রমাণে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ক্রমশ ইহারা কিন্তু শিবের অবতার বলিয়া লিঙ্গায়তদের কাছে গণ্য হইয়াছে। ইহাদের চরণামৃতে স্নান ও চরণামৃত পান লিঙ্গায়ত পর্বাহে প্রধান অনুষ্ঠান। এই জাতিভেদের আন্দোলনে এক সম্প্রদায় হিন্দু এই লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ে যোগ দিয়াছে। খুব সম্ভবত শুধু সাম্যবাদের দিক থেকেই এই সম্প্রদায় ইহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। যদিও কতকগুলি অধিকার ও অনুষ্ঠানে লিঙ্গায়ত জনসাধারণ এক, তবু এই সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে পান-ভোজনাদিও করে না, বৈবাহিক সম্বন্ধাদিও হয় না। লিঙ্গায়তদের বেশীর ভাগ শ্রেণীর লোকের বাড়িতেই জঙ্গমেরা ভোজন করে। পুরাতন লিঙ্গায়তেরা এখন সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িয়াছে, নব্যেরা বর্তমান হিন্দুদের হইতেই যে হইয়াছে, তাহাও ধরিতে পারা যায়। খ্রীস্টানধর্মের প্রভাবে জাতিভেদের মূল শিথিল হইয়াছে, কেহ কেহ ইহা মনে করিলেও ইহার মূলে কোন সত্য নাই।

অঘোরপন্থী

শৈবসম্প্রদায়ের এক সম্প্রদায়ের নাম অঘোরপন্থী, উগড় বা ঔঘড় নামেও কথিত। মহীশূরে ইক্কেরীতে ও অন্যান্য স্থানে ইহাদের অঘোরীশ্বরের সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে। ১৯০১ সালের লোকগণনার হিসাব হইতে জানা যায়, সংখ্যায় ইহারা ৫৫৮০। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ও বিহারে ৫১৮৫। বাকী আজমীর ও মারোয়াড় ও বেবারে আছে। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৬৩০। অঘোরী ও অগর ৩৪৭৭, বাঙলায় ৪৩৬, অপর পঞ্জাবে। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা তীর্থভ্রমণ ও তীর্থস্নানাদি উপলক্ষে সর্বদা ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া সংখ্যা নির্দেশ করা বড় অসুবিধাজনক। এই সম্প্রদায় জনসাধারণের প্রিয় নয়। আবু পাহাড়, গীরনর, বুদ্ধগয়া, বেনারস, হিঙ্গসড় বা হিংলাজ প্রভৃতি স্থানে ইহাদের মঠ আছে।

এই অঘোরপন্থীদের ইতিহাস আমরা পাই য়ুয়ন্ চোয়ঙ-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। তিনি বলিয়াছেন, ইহারা উলঙ্গ সন্ন্যাসী। সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখে। মাথায় হাড়ের মুকুট পরে। কেহ পত্র বা বৃক্ষত্বক্ পরিধান করে। গলায় কপাল-মালিকা, ব্যাঘ্রচর্মও কেহ পরিধান করে, মাথার খুলি পানপাত্র রূপে ব্যবহার করে। (Watters : Yuan Chwang's Travels in India, i. 123, 149)। আনন্দগিরি 'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে এই কাপালিকদের উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীতে 'মালতীমাধব' নাটকে এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। উইলসন সাহেবও তাঁহার গ্রন্থে ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকে কাপালিক ব্রতের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা তান্ত্রিকমতে ভীষণদর্শনা কালী বা চামুণ্ডার পূজা করিত ও নরবলি দিত। অঘোরপন্থীদের মধ্যে কেহ কেহ নরহত্যা করে ও নরমাংস

খায়। নিজেদের মলমূত্র বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া পান করে। ইহারা প্রমাণ করিতে চায় যে, এই উপায়ে ইহাদের অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে। গোরক্ষনাথ হইতে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব। ১৭শ শতকের 'দবীস্তান' নামক গ্রন্থে এইরূপ নৃশংস যোগীর উল্লেখ আছে। ডব্লিউ ক্রুক সাহেব বলিয়াছিলেন, তিনি নিজে দেখিয়াছেন, এই সম্প্রদায়ের একজন লোক মড়ার উপর বসিয়া সম্প্রদায়ের গান গায় যতক্ষণ তাহাদের কবর দেওয়া না হয়, যতক্ষণ শব পচিয়া গলিয়া যায় না, ততক্ষণ এই ভাবে তাহারা বসিয়া গান গায়। তারপর শবদেহ ভক্ষণ করে। M. Thernat-এর ভ্রমণ-কাহিনী ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। তিনি অঘোরী রাক্ষসদের কথা বলিয়াছেন। টড সাহেব আবু পাহাড়ে অঘোরপন্থীদের বসবাসের কথা পশ্চিম-ভারত-ভ্রমণে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ফতেপুরী নামে কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি গুহামধ্যে অনেক বৎসর ছিলেন। স্থানীয় কোন ভদ্রলোক টড সাহেবকে জানাইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুতে একজন অঘোরী তাহার মৃতদেহ চাট্নী করিয়া খাওয়ার জন্য জানাইয়াছিল। কালিকা মঠে যাহারা বাস করিত, তাহারাও ভীষণ ছিল। অঘোরপন্থী একজন কালিকা মূর্তি সাজিয়া অপরিচিত এবং অনভিজ্ঞ লোকদের ঠকাইত। বুকানন সাহেব বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রদেশে গোরক্ষপুরে তিনি এক অঘোরীর খবর রাখিতেন। পিপাসিত বলিয়া তিনি স্থানীয় এক রাজার গৃহে উপস্থিত হন। মহারাজা তাহাকে কদর্য ভাষায় তিরস্কার করেন। রাজা এ বিষয় ডিস্ট্রিক্ট জজকে জানাইলে জজ আমুটি (Mr. Ahmuty) তাহাকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু জজ সাহেব রোগাক্রান্ত হইলেন, এবং রাজার উত্তরাধিকারী মরিয়া গেল, তখন লোকে বলিতে আরম্ভ করিল যে সাধুর অপমানেই এই সর্বনাশ ঘটিল (Martin : E. India, ii, 492f.)। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বেনারসে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় (The Revelations of an Orderly, Beneras, 1849),

এই পুস্তকেও এই ভাবের কথা লিখিত আছে। গ্রন্থকার বারাণসীর গঙ্গার ঘাটের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, অঘোরপন্থীরা নিজেদের সিদ্ধযোগী বলিয়া মনে করে। ইহারা বলে, কল্পনায় লোকে ভেদাভেদ মনে করে। ইহারা গোমাংস ভক্ষণে দ্বিধা করে না। ইহারা বলে ইহাদের কাছে মদ্য, দুগ্ধ, মূত্র সবই সমান। অঘোরীর রক্তবর্ণ চক্ষু, সিন্দুর মাখা ব্যাঘ্রের মতো আকৃতি, দেখিতে অতি ভীষণ। কোনও সাহেব হিন্দুর ছদ্মনাম ধরিয়া এই কথা গভর্নমেণ্টের গোচর করে। এই ঘটনার পূর্বে এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ করিত। গভর্নমেণ্ট আইন করিয়া ইহাদের উলঙ্গবেশ বন্ধ করিয়া দেন। বৃটিশ রাজত্বে নরহত্যা ও নরমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলিয়া আইন প্রচলিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে একদল অঘোরী সন্ন্যাসী মধ্য-প্রদেশের গোয়ালিয়র স্টেটে উজ্জয়িনীতে হাটের দিনে আসিয়া কতকগুলি ছাগ চায়। কিন্তু তাহা না পাইয়া তাহারা মড়া পোড়াইবার ঘাটে গিয়া একটি মৃতদেহ লইয়া ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। তখন স্থানীয় লোক পুলিসে সংবাদ দেয়। পুলিসের কাছে ছাগ দাবি করে,পুলিস তাহাতে স্বীকৃত হইলে নরমাংস ভক্ষণে নিবৃত্ত হয়।

একজন অঘোরী সন্ন্যাসীর জীবন এইভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সে পাতিয়ালার লোহার বা কর্মকার ছিল। সে প্রথমে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। এবং অঘোরপন্থীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সে বদরীনারায়ণ ভ্রমণ করিয়া নেপালে যায়। তারপর নেপাল ভ্রমণ করিয়া জগন্নাথে যায়। তারপর মথুরা ও ভরতপুরে যায়। তাহারা সকল জাতের কাছ হইতে খাদ্য গ্রহণ করে। তাহারা জাতিভেদ মানে না। ওই সন্ন্যাসীটি নিজে নরমাংস খায় না। কিন্তু তাহাদের সম্প্রদায়ের এমন লোক আছে, সে বিশ্বাস করে যে মানুষকে ভক্ষণ করিয়া আবার তাহাকে জীবিত করিয়া দিতে পারে। সে এ সব শিখিয়া কৃতকার্য হইতে পারে নাই, কিন্তু অন্যে যে পারে তাহার সন্দেহ নাই। মানুষের মাথার খুলিতে সে পানাহার করে।

ঘোড়া ছাড়া সকল জীবজন্তুর মাংস খায়, কেন যে ইহারা সব জন্তুর মাংস খায়। অথচ ঘোড়া খায় না, তাহা নির্দেশ করার জন্য অনেক আলোচনা হইয়াছে। অনেকে মনে করেন হিন্দী নাম ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরী কথাটার সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ঘোড়ার মাংস খায় না। কিন্তু একথা খুব যুক্তিপূর্ণ নয়, একথাও সহজে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। অশ্ব এদেশে পবিত্র বলিয়াই চিরদিন মনে হইত। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বমাংসও আহার করা হইত না।

অঘোরীদের নিয়মপদ্ধতিই এমন যে, অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে তাহাদের সংস্রবই খুব কম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়ের কোনও শাখা বেনারসে সৃষ্টি হইয়াছিল। নীরায়ের কালুরাম নামে এক সন্ন্যাসী কীনারাম নামে এক ব্যক্তিকে প্রথম এই নামে দীক্ষিত করে। এই সম্প্রদায়কে 'কীনারামী' সম্প্রদায় বলে। তাহারা ব্রহ্ম মানে। আনন্দ, দুঃখ, উত্তাপ, ঠাণ্ডা, সবই তাহারা সমান মনে করিবে এইরূপ শিক্ষালাভই তাহাদের নিয়ম। সকল ঋতুতেই তাহারা উলঙ্গ সন্ন্যাসী, কখনও তাহারা কথা কয় না। তাহাদের দীক্ষা হয় কীনারামের সমাধিস্থলেই, মির্জাপুরের ৬ মাইল দূরে অষ্টভুজা মন্দিরের নিকট এই দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হয় (Sherring : Hindu Tribes and Castes, i. *269-70*)। কথিত আছে, একটি অগ্নিকুণ্ডে কীনারামের সময় হইতে অগ্নি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সেই অগ্নিকুণ্ডে ফলমূল উৎসর্গ করা হয়। এই সম্প্রদায় প্রাথমিক দীক্ষাগ্রহণের পর দ্বাদশবর্ষ শিক্ষানবীশ থাকিতে হয়। তারপর অঘোরপন্থীর পূর্ণ অধিকার পাওয়া যায়। স্বভাবজাত কোন অভাবকেই তাহারা প্রাধান্য দিতে চায় না। ঠিক এই শ্রেণীর আর এক সম্প্রদায় আছে, তাহাদের স্বরভঙ্গী বলে।

তান্ত্রিক যোগিগণ শক্তির উপাসক। কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা প্রভৃতি শক্তির তাহারা উপাসক। পূর্ববঙ্গে পঞ্চম শতাব্দীতেই এই সমস্ত শক্তির আভাস পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণে নরমেধের কথা

আছে। এখন তাহার বদলে কপোত, ছানা, মহিষ বলি দেওয়া হয়। হপকিন্স সাহেব মনে করেন অনেক অনার্য জাতির অনেক অনুষ্ঠান আর্যজাতির মধ্যে ঢুকিয়াছিল। হাডন বলেন, উপদেশ দেওয়ার সময় অথবা কোন তুকতাকের সময় শবের মাংস খায়। অনেক সময় খাদ্যের সঙ্গে মড়ার মাংসের রস ব্যবহার করে। এই খাদ্যসংগ্রহের সময় তাহারা স্ত্রীপুত্রের কথাও কিছু মনে করে না। তাহারা মানুষকে হত্যাও করিতে পারে।

ম্যালিনেসিয়ার কোনও কোনও অংশে ধর্ম সম্বন্ধে যখন কেহ একটু উন্নতিলাভ করে বলিয়া মনে করে সেখানেও তাহারা মানুষের মাংস খাইয়া উন্নতি লাভ করে মনে করে। এবং যে লোক খায়, সে রক্তশোষক পিশাচের শক্তিলাভ করে মনে করে, শবদেহের প্রেতাত্মা বন্ধুভাবে ভোক্তার মধ্যে করে।

ম্যাকডোনাল্ড বলেন, মধ্যএসিয়ার ওঝার দল মানুষের মাংস খায়। বণ্টু নিগ্রোদের মধ্যেও সম্ভবত এই প্রথা আছে। ইহা দ্বারা তাহাদের অলৌকিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহারা মনে করে, উগণ্ডা ও বণ্টু আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে বিশ্বাস করে যে, ডাকিনী যোগিনীরা গভীর রাত্রে মড়া খাওয়ার জন্য গুপ্ত সমিতিতে পরামর্শ করে। ভারতেও এইরূপ কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। মালাবারে এখনও জাদুকরদের মধ্যে এই প্রথা আছে।

মড়ার মাথার পাত্র ব্যবহারের শক্তিতে শুধু যে অঘোরীরাই বিশ্বাস করে তাহা নহে। এই পাত্রে পানাহার করিলে জাদুবিদ্যার শক্তি বাড়ে বলিয়া পূর্ব-আফ্রিকার লোকেরা বিশ্বাস করে। বাগান্দার রাজার নূতন পুরোহিতেরা পূর্বপুরুষের মড়ার খুলি পানপাত্ররূপে ব্যবহার করে। মনে করে, পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মা তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। জুলুরা শত্রুর মাথার খুলি এইরূপে পানপাত্ররূপে ব্যবহার করে, ইহা দ্বারা বশীকরণ হয়। যুদ্ধের ডাক্তারেরা সৈন্যদের এই ঔষধ দেয়। হিমালয় প্রদেশে তুষার ঝঞ্ঝায় স্ত্রীলোকদের হত্যা

করিয়া তাহাদের খুলি লইয়া ঢাক প্রস্তুত করে। সেই ঢাক বাজাইয়া ভূতপ্রেত প্রভৃতি তাড়ানো হয়।

ব্যালফুর সাহেব এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। ব্যালফুর চীন, অস্ট্রেলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি স্থান হইতে কতকগুলি চিত্রও সংগ্রহ করিয়াছেন। ওয়াডেল সাহেবও তিব্বতীদের ভূতোপাসনার চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই পদ্ধতি যে অঘোরীদের নিজস্ব পদ্ধতি নয়, তাহা অনুমিত হয়। লেভি বলেন, কেল্ট জাতির মধ্যেও এইরূপ পানপাত্র ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন জর্মানীতেও এই ব্যবস্থা ছিল। মৃগীরোগে আত্মহত্যাকারীর খুলির পানপাত্র ব্যবহারে সারিয়ে যায়। এইরূপ বিশ্বাসও ওদেশে আছে।

১৮৬২ সালে মধ্যপ্রদেশে গাজিপুরের সেসন কোর্টে ২৭০-২৯৭ ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা অনুসারে এক অঘোরী কবর হইতে মড়া তুলিবার অপরাধে একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে রোটকে ঠিক এইরূপ ঘটনা ঘটে। ১৮৮৪ খ্রী° দেরাদুনে এরূপ ঘটনা ঘটে। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে দুইজন ইউরোপীয় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, একজন অঘোরী গঙ্গার কোন দ্বীপে মানুষের মাংস খাইতেছে। এই অঘোরীর কুটিরে বংশদণ্ডের মধ্য হইতে মাথার খুলিও কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে।

অঘোরীদের দীক্ষা প্রণালীতে কানে চুপি চুপি মন্ত্র দেওয়া হয়, শাঁখ বাজানো হয়, বাদ্য বাজানো হয়। মাথার চুল কামানো হয়। মড়ার খুলিতে করিয়া দীক্ষিতের মস্তিষ্কে কারণ (মূত্র) ঢালা হয়। মদ্য পান করে, নিম্নজাতির কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে। বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে, দণ্ড হাতে লয়। বন্যশূকরের হাড়ের ও সাপের মালা পরে, কোথাও কোথাও বা মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা আছে। পাঁচ গ্রাস মদ খায়, মদ্যসহ মাংস খায়। অগ্নিতে ফল উৎসর্গ করা হয়। কোথাও কোথাও ছাগবলিও দেওয়া হয়। অঘোরীরা সাধারণত চিতাভস্ম মাখে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবের চিহ্ন (ত্রিপুণ্ড্রক

চিহ্ন) তাহারা কপালে পরিধান করে, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, গলায় হাড় পরে, মানুষের দাঁতের মালাও কেহ কেহ পরে, মাথায় জটাভার থাকে। কটিদেশে একটুকরা গৈরিক নেংটির আচ্ছাদন, হাতে নরকপাল ও একটি দণ্ড ধরিতে হয়, মাঝে মাঝে তাহারা উচ্চস্বরে "জয় শম্ভু, জয় ভৈরব, জয় কালিকাপতি" বলিয়া থাকে। স্বচ্ছন্দতন্ত্রে অঘোর উপাসনার কথা আছে। এই অঘোর শিবের রূপান্তর। অঘোর স্বচ্ছন্দ-ভৈরবের দক্ষিণ মুখ। স্বচ্ছন্দ-ভৈরবের পঞ্চমুখ। ঈশান, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর বা উর্ধ্ববক্ত্র, পূর্ববক্ত্র, পশ্চিম বক্ত্র, বাম বক্ত্র। চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রতিরূপ এই পঞ্চমুখ। ইহাদের আবার উর্ধ্বাম্নায়, পূর্বাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, বামনাম্নায় বলে।

নাটক ও নাট্যশালা

ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস যতদূর জানিতে পারা যায় তাহা হইতে বেশ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসীরা সংগীতের খুব অনুরাগী ছিল। বৈদিক যুগের প্রথম দিকেই দেখা যায়, নৃত্য, গীত, বাদ্য তখনকার আর্য স্ত্রীপুরুষদিগের নিত্যসহচর ছিল ; এ তিনটি না হইলে তাহাদের একেবারেই চলিত না। এ তিনটির অনুশীলন তাঁহারা এত বেশী রকম করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র-হিসাবে সংগীতের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটুকু তাঁহাদের নজর এড়াইত না। যজ্ঞে, উৎসবে, খেলায়, আমোদে নাচগানের খুব আদর ছিল। খুব ছোট বয়স হইতে ছেলেমেয়েদের নাচগান শেখানো হইত। তবে নাচটা মেয়েরাই একরকম একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৮৫ সূক্ত) পাই—

“সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ॥” ৪০

সোম প্রথমে কন্যাকে বিবাহ করেন ; তারপর গন্ধর্ব ; তারপর অগ্নি বিবাহ করেন ; শেষে সে মানুষের পত্নী হয়। এই বৈদিক উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, মেয়েদের প্রথমে সোমরস তৈরি করিতে শেখানো হইত ; তারপর তারা নাচ শিখিত ; তারপর যজ্ঞের অনুষ্ঠান কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহাই শিখিত ; শেষে তাহাদের বিবাহ হইত। মেয়েরা সোমরস তৈরি করিবার সময় যে গান করিত তাহার প্রমাণ বেদেই (ঋ° ৯. ৬৬. ৮) পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে নাচ এমনই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, দাসীকন্যারাও বেশ উচ্চ ধরনের নৃত্য শিক্ষা করিত। কৃষ্ণযজুর্বেদে (৭. ৫. ১০) এক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়—মার্জালীয় অগ্নি জ্বলিতেছে ; তাহার চারিদিকে দাসীকন্যারা জলের কলসী মাথায় লইয়া মাটিতে

পা তালে তালে ঠুকিয়া নাচিতেছে। এই নাচের সঙ্গে গানও চলিতেছে। দৃশ্যটি অতি চমৎকার। যে সব পুরুষ সংগীত জানিত না, মেয়েরা তাহাদের পছন্দ করিত না; তাহারা নিজেরা ভাল সংগীত জানিত বলিয়াই সংগীতজ্ঞ পতি প্রার্থনা করিত (কৃষ্ণযজু° ৬. ১. ৬)। তখনকার লোকেরা হাসিয়া নাচিয়া জীবন কাটাইতে চাহিত।

কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে (২৯.৫) স্পষ্ট লেখা আছে যে, কতকগুলি বৈদিক সূক্তের প্রধান অংশ ছিল নৃত্য গীত বাদ্য। সুপ্রাচীন বৈদিক প্রভাবকালে সামগান হইত। আর বৈদিক ঋষিদিগের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত ও প্রচ্ছায়সমীরিত সাম ঝঙ্কারে সরস্বতী নৃত্য করিত। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহা হইতে গীতের ছন্দোমঞ্জরী আবিষ্কার করিলেন—

"সামবেদাদিং গীতং সঞ্জগ্রাহ পিতামহঃ।"

এ সময় যজ্ঞকার্যে যাঁহারা অধ্যক্ষতা করিতেন আর যাঁহারা যজ্ঞ দর্শন করিতেন, তাঁহারা হোতাদিগের নীরস মন্ত্র, অধ্বর্যুদের সমস্বরবিশিষ্ট আবৃত্তি শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন না। জনমণ্ডলীকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের কল্পনাশক্তির উত্তেজনার কিছু দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের এই অভাব মোচন করিবার জন্য উদ্গাতা নামে এক শ্রেণীর পুরোহিত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিল। ইহাদের কাজ হইল যজ্ঞে সামগান করা। এই সাম ঋগ্বেদ হইতে লইয়া সংগীতের সুরে বাঁধা হইত। ইহা হইতেই বোঝা যাইতেছে সামবেদেই সংগীতের আদি বিজ্ঞান ও কলার অস্তিত্ব। বোধ হয় তাহার পর হইতেই সংগীতের ফোয়ারা ছুটিল। বৈদিক আচারে তখন সকলকেই যজ্ঞ করিতে হইত। কিন্তু সকল যজ্ঞেরই সংগীত একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞে দুইজন বীণাগাথী বীণা বাজাইত। একজন ব্রাহ্মণ, একজন রাজন্য। ব্রাহ্মণ দিনের বেলা বাজাইত, রাজন্যের বাজাইবার পালা ছিল

রাত্রিতে। পুরুষমেধ যজ্ঞে বীণা প্রভৃতি নানা বাদ্য বাজিত। গায়কগণ গান করিত। নৃত্যও হইত। মহাব্রতে নাচ গান বাজনার অবধি ছিল না। মহাব্রত যজ্ঞে তরুণীরা যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিকে নৃত্য করিত। এই নৃত্য শেষ হইবার পূর্বে পুত্রবতী সধবা পুরন্ধ্রীদিগের নৃত্য হইত। ঐ যজ্ঞে কৌতুকচ্ছলে ঝগড়া ও লড়াইয়ের ভান করিয়া দু-একটি পালার অভিনয় পর্যন্ত হইত। সোম বিক্রয় ব্যাপার লইয়া কলহের অভিনয়, আর শূদ্র ও আর্যের যুদ্ধানুকরণের অভিনয় মহাব্রতে লক্ষ্য করিবার মতো জিনিস। ঋগ্বেদে মন্দিরা বাজাইয়া নাচের কথা আছে; মন্দিরাকে তখন 'আঘাটি' বলিত। পুরুষমেধ যজ্ঞে ঢাকওয়ালাদের ধরিয়া আনিবার কথা আছে। ঢাকওয়ালাদের 'আড়ম্বরাঘাত' বলিত। তখন অনেক রকমের বীণা ছিল। এক রকম বীণার নাম কর্করি। নল খাগড়ার গাঁট হইতে এক রকম বীণা তৈরি হইত—তার নাম 'কাণ্ডবীণা' এগুলি মহাব্রত যজ্ঞে বাজানো হইত। মহাব্রতে শততন্তুর এক রকম বীণা বাজানো হইত তাহার নাম—'বাণ'। বৈদিকযুগে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা হইতেছে 'সভা' আর 'সমিতি'। সভাসমিতিতে একদিকে যেমন গ্রামের কথা পল্লীর কথা, সমাজের কথার আলোচনাদি হইত, অন্যদিকে সেখানে তেমনি আর একটি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত। লোকে সভা-সমিতিতে আসিয়া আমোদ-প্রমোদও করিত। তখনকার সভাসমিতি অনেকটা এখনকার ক্লাবের মতো ছিল। লোকে এখানে গল্প-গুজব করিত, নানা প্রকার খেলার আমোদে মাতিত, আবৃত্তি করিত, নৃত্য গীত বাদ্যের অনুশীলন করিত, বিষয়-বিশেষ লইয়া তর্ক করিত। এই সমস্ত এবং এইরূপ আমোদের ব্যাপার লইয়া বৈদিক আর্যদের অনেক সময় কাটিত। তখন কিন্তু নাটক ছিল না। নাট্যশালা বা নটের নামগন্ধও পাওয়া যায় না। নাটকের উৎপত্তি ঠিক কেমন করিয়া হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। আমরা

দেখিতে পাই কথোপকথনচ্ছলে উক্তি-প্রত্যুক্তির আকারের রচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বৈদিক, পৌরাণিক এমন কি পৌরাণিক যুগের পরবর্তী রচনাতেও এই রীতি অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে এই রকম রচনা খুব দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে প্রায়ই দেবতাদের সঙ্গে ঋষিদের কথোপকথন দেখা যায়। পুরুরবা ও উর্বশী-সংবাদ (ঋ° ১০. ৯৫), বরুণ ও ইন্দ্রের কথোপকথন (৪. ৪২), যম ও যমীর কথোপকথন (১০. ১০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুরাণগুলি পরস্পর কথোপকথন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উপনিষদেও অনেক কথোপকথন আছে। নাটকের অস্তিত্ব না থাকিলেও বৈদিকযুগে নৃত্য, গীত, অনুকরণাভিনয়, রঙ্গভঙ্গী, কথোপ-কথন—এগুলি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি ক্রমশ বদলাইয়া অন্য ছাঁচে আসিয়া নাটকাভিনয়ে পরিণত হইয়া থাকিতে পারে। আর নাচ-গান যখন অভিনয়ের একটি অঙ্গ, তখন এরূপ মনে করাও অসঙ্গত মনে হয় না। সুতরাং বৈদিক যুগেই এই কয় দিক্ দিয়া নাটক উপাদানের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়, এ কথা বলা যাইতে পারে। অন্য দিক্ দিয়া না হইলেও উক্তি-প্রত্যুক্তির দিক্ দিয়া ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০৮ সূক্ত) পণি ও সরমার কথায় নাটকের আভাস পাওয়া যায়। যথার্থই দুই ব্যক্তি এই সূক্ত আবৃত্তি করিয়াছিল। এই সূক্তে এগারটি ঋক্। উদাহরণস্বরূপ তিনটি ঋকের তর্জমা নীচে দেওয়া গেল—

পণিগণ ও সরমা

১। পণিগণ—তুমি কি ভেবে এখানে এসেছ ? এ খুব দূরের পথ। এ পথে আসতে হলে পিছন দিকে চাইলে আসা যায় না। আমাদের কাছে এমন কি জিনিস আছে যার জন্যে তুমি এসেছ। ক’রাত্রি ধরে এসেছ ? নদী পার হলে কেমন করে ?

২। সরমা—ইন্দ্রের দূতী হয়ে আমি এসেছি। পণিগণ! তোমরা অনেক গোধন সংগ্রহ করেছ। আমার সেগুলি নেবার ইচ্ছা। জল আমাকে রক্ষা করেছে। জলের ভয় হল, পাছে আমি উল্লঙ্ঘন করে চলে যাই। এই রকম করেই নদীর জল পার হয়েছি।

৩। পনিগণ—সরমা তুমি তো ইন্দ্রের দূতী হয়ে এসেছ? তোমার ইন্দ্র কেমন? তাঁকে দেখতে কেমন? আচ্ছা, তিনি আসুন না, আমরা তাঁকে বন্ধু বলে' স্বীকার করতে রাজী আছি। তিনি আমাদের গাভীগুলি নিয়ে অধিকার করুন।

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রথমে নৃত্যে কেবল তালের দিকে ঝোঁক ছিল, তারপর তালে তালে অঙ্গ-বিক্ষেপের দিকে ঝোঁক হয়। ক্রমশ নৃত্যের সঙ্গে গীত সংযুক্ত হইল। এই সময় লোকে হাব-ভাব দেখাইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। কালে হাব-ভাব বিলাস-বিভ্রম প্রকাশের অভ্যাস রীতিতে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্ভবত তাহা হইতেই ক্রমে অনুকরণাভিনয়, রঙ্গভঙ্গী ও কথোপকথন সহকারে এই সমস্ত কাজ চলিতে থাকে। এইরূপে ক্রমে নাট্যের উদ্ভব হয়। প্রথম প্রথম নাট্যের কাজ ছিল চিত্তরঞ্জক অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া নৃত্য করা। নর্তক-নির্ণয়ে নর্তনের সংজ্ঞা তাহাই দেওয়া হইয়াছে।

"অঙ্গবিক্ষেপবৈশিষ্ট্যং জনচিত্তানুরঞ্জনম্।
নটেন দর্শিতাং যত্র নর্তনং কথ্যতে তদা।"

সূত্র-সাহিত্যে নাটকের কোন আভাস পাওয়া যায় না। পরবর্তী সাহিত্যে দু-একটা কথা আছে। পাণিনি (৪. ৩. ১১০, ১১১) দুইটি সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন—একটি 'নটসূত্র' অপরটি 'ভিক্ষুসূত্র'। তিনি নটসূত্রকারের নাম দিয়াছেন—শিলালী; ভিক্ষুসূত্রকারের নাম দিয়াছেন—পারাশর্য। ভিক্ষুসূত্র নিশ্চয়ই ব্রহ্মসূত্র। নটসূত্র

পাওয়া যায় না। পাণিনি প্রথম সূত্রে (৪. ৩. ১১০) 'নটসূত্র' শিলালীর দ্বারা প্রোক্ত করিয়াছেন। কৃশাশ্ব নামে একজন ঋষিকে নটসূত্রের বক্তা বলিয়া পাণিনি পরসূত্রে (৪. ৩. ১১১) উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্বে 'নট' শব্দের প্রয়োগ কেহ করেন নাই। বৈদিক সাহিত্যে 'নট' শব্দের প্রয়োগ কোথাও নাই। পাণিনি 'নাট' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"নটানাং ধর্ম আম্নায়ো বা" নটদিগের ধর্ম বা শিক্ষারীতি। কিন্তু পাণিনির সময়ে 'নৃত্য' ও "নাট্যে" কোন পার্থক্য ছিল কি না কিছুই জানা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় 'নট্' ধাতুস্থানে 'নৃৎ' ধাতু পাওয়া যায়। 'নৃৎ' ধাতুর অর্থ নৃত্য করা। সংস্কৃত ভাষায় অভিনয় করার অর্থ বোঝায় এমন কোন ধাতু পাওয়া যায় না। অথচ প্রাকৃত ভাষায় 'নট্' ধাতু আছে, আর তার অর্থ অভিনয় করা। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে দুই শ্রেণীর লোক ছিল। উচ্চশ্রেণীর লোকেদের ভাষা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ভাষা হইতে পৃথক ছিল। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিত, আর নিম্নশ্রেণীর ভাষা ছিল প্রাকৃত। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যে সকলেই সংস্কৃতে কথা কহিত তাহা নয়, যাহারা শিক্ষিত তাহারাই সংস্কৃতে কথা কহিত। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই প্রাকৃতভাষা বলিত। প্রাকৃতই জনসাধারণের ভাষা ছিল। সুশিক্ষিতের সংখ্যা চিরকালই কম ; কাজেই অল্প লোকেই সংস্কৃতে কথোপকথন করিত। সুতরাং মনে হয় শিক্ষিত সমাজ হইতে নটের জন্ম হয় নাই। পরে নট-ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে নট শব্দটি শিক্ষিত-সমাজ আত্মসাৎ করিয়াছে। পাণিনির সময়ে এবং পাণিনির মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সময়ে শিক্ষিত-সমাজ সংস্কৃতে আর জনসাধারণ প্রাকৃতে বাক্যালাপ করিত। পাণিনি 'নট্' ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে নট্ ধাতুর উল্লেখ আছে। পাণিনি অন্তত খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকের বৈয়াকরণ। পতঞ্জলি খ্রীস্টপূর্ব ১৫০ অব্দে জীবিত ছিলেন। কাজেই বলিতে পারা যায় খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতকের পরে 'নট' বা

নাটকের জন্ম হয় নাই। ভরত পাণিনির পরবর্তী। ইনি বলেন, "রসভাবযুক্ত লোকবৃত্তান্ত যিনি অভিনয় করেন তিনি নট।"

"নট ইতি ধাত্বর্থভূতং নাটয়তি লোকবৃত্তান্তং
রসভাবসংযুক্তং যস্মাৎ তস্মাৎ নটো ভবেৎ।"

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র

নাট্যশাস্ত্র, সংগীত ও নাট্যশাস্ত্রের একখানি সর্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ। ভরত এই নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা। রামায়ণে আছে মহামুনি বাল্মীকি রামায়ণের খানিকটা অভিনয়ের উপযোগী করিয়া তৈয়ারী করিয়া তৌর্যত্রিকসূত্রকার ভরতের হাতে সমর্পণ করেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন ভরত বাল্মীকির সমসাময়িক।[১] কিন্তু ভরত ঠিক কোন্ সময়ের লোক তাহা জানা যায় না। আর জানিয়াও বিশেষ ফল নাই; কেন না আধুনিক সময়েও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এত লোকের হাত পড়িয়াছে যে, কোন্‌টি নকল কোন্‌টি আসল চেনা দায়। এখনকার মুদ্রিত ভরত নাট্যশাস্ত্রে পরবর্তী কালের লেখকদের রচনাও একটু-আধটু প্রবেশ করিয়াছে। একটা উদাহরণ দিতেছি। রাঘব ভট্ট শাকুন্তলের টীকা লিখিয়াছেন। এই টীকায় তিনি আচার্য[২] মাতৃগুপ্তের নাট্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থ[৩] 'নাট্যালোচন' হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু

---

১ রামদাস সেন রচিত 'সঙ্গীত রহস্য', ২য় ভাগ গ্রন্থাবলী পৃ° ১১৭

২ 'নাট্যপ্রদীপে' মাতৃগুপ্তকে আচার্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। নাট্যপ্রদীপের উক্তি এই:—"তত্র ভরত.......অস্য ব্যাখানে মাতৃগুপ্তাচার্যৈ রুক্তম ......" [Sylvain Levi: Theatra Indien, p. 15] রাঘব ভট্টও তাঁহাকে আচার্য বলিয়া' উল্লেখ করিতেছিলেন।

৩ মাতৃগুপ্তের কোন বই পাওয়া না। তবে উদ্ধৃত বচন হইতে বুঝা যায় তিনি শ্লোকে নাট্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; আর তাঁহার গ্রন্থ ভরতেরই ব্যাখ্যাপুস্তক। মাতৃগুপ্ত কালিদাসের সমসাময়িক।

সেগুলি আজকালকার মুদ্রিত ভরত নাট্যশাস্ত্রে স্থানলাভ করিতেছে। তারপর এই নাট্যশাস্ত্রের কতকগুলি রকমফের আছে বলিয়া মনে হয়। 'কাব্যমালা' গ্রন্থমালার অন্তর্গত নাট্যশাস্ত্রের সংস্করণে এই রকম একটি রকম ফেরের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানি 'নন্দি-ভরত' অর্থাৎ নন্দীমতের ভরত।

নাট্যশাস্ত্র (৩৪ অধ্যায়) বলে—

"ধুর্যবদেকো যস্মাদ্বহ্বারোহনের ভূমিকাযুক্তঃ।
ভান্তগ্রহোপকরণৈর্নাট্যং ভরতো ভবেত্তস্মাৎ॥"২৩

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, শ্লোকোল্লিখিত গুণবিশিষ্ট নাট্য 'ভরত' নামে আখ্যাত। আবার দেখা যায়, ক্রমশ 'ভরত' শব্দ সাধারণ নাট্যশাস্ত্রেরই নামান্তর হইয়া পড়িল। 'মতঙ্গভরতম্' ইহার দৃষ্টান্ত। 'মতঙ্গভরতম্' বলিলে লক্ষণভাস্করের গ্রন্থকেই বুঝায়। এইটি একখানি ভরত। তবে এইগুলি পরবর্তী ভরত। এই অর্জুন-রচিত নাট্যশাস্ত্রের নাম—"অর্জুনভরতম্"। শার্ঙ্গদেব ও রাঘবভট্ট আদি-ভরতের নাম করিতেন। পরে অন্য ভরত না থাকিলে 'আদিভরত' নামের সার্থকতা থাকে না। আদিভরতের একখানি পুঁথি Mysore Oriental Libraryতে আছে। ভব-ভরতকে "তৌর্যত্রিকসূত্রকার" নামে আখ্যাত করিতেছেন।[১] তৌর্যত্রিক বলিলে নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনটি বুঝায়। সুতরাং বলিতে হয় ভবভূতির মতে ভরত এই তিনের সূত্র করিয়াছিলেন। কালিদাস[২] ভরত নামে মুনির

---

১ উত্তররামচরিতের চতুর্থ অঙ্কে লবের উক্তি—'তং চ স্বহস্তলিখিত মুনির্ভগবান্ ব্যসৃজদ্ ভগবতো ভরতস্য মুনেস্তৌর্যত্রিকসূত্রকারস্য'। গবান্ মুনি (বাল্মীকি) [রামায়ণের খানিকটা অভিনয়ের উদ্দেশ্যে] তৈরী করিয়া অভিনয়ের জন্য তৌর্যত্রিকসূত্রকার ভরতের হাতে দিলেন।

২ উদাহরণ যথা—বিক্রমোর্বশীর তৃতীয় অঙ্কে দুজন ভরতশিষ্য আলাপ করিতেছে। একজন আর একজনকে বলিতেছে 'আমাদের গুরুর (ভরতের) অভিনয় কৌশলে স্বর্গের লোকেরা খুশী হইয়াছেন তো?—অপি গুরোঃ প্রয়োগে দিব্যাণ পরিষদারাধিতা।"

উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে—ইঁহারা ভরতের গ্রন্থ জানিতেন। সংস্কৃত নাটকের অভিনেতাদের একটি সাধারণ নাম 'ভরতপুত্র' বা 'ভরতশিষ্য'। ইহাতে শেষের দিকে যে আশীর্বাদবাক্য থাকে তাহার সাধারণ নাম—'ভরতবাক্য'।

অভিনবগুপ্ত ভরত নাট্যশাস্ত্রের একখানি টীকা লিখিয়াছেন—নাম 'নাট্যবেদবিবৃতি'। এই টীকার নাম হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভরত নাট্যশাস্ত্রের একটি নাম—'নাট্যবেদ'। 'সঙ্গীতরত্নাকরে'ও (২য় খণ্ড, ৬২৪ পৃ°) এই নামের উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গধর 'নর্ত্তনাধ্যায়ে' বলিতেছেন,—

"নাট্যবেদং দদৌ পূর্বং ভরতায় চতুর্মুখঃ।"

ভরত স্বয়ং নাট্যশাস্ত্রে (১ম অধ্যায়) উপদেশ করিয়াছেন,—

"সঙ্কল্প্য ভগবানেবং সর্ববেদানস্মরন্।
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্॥ ১৬
জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্‌বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানথর্বণাদপি॥ ১৭

ভগবান্ ভরতমুনি সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত বেদ অনুস্মরণ করিলেন; তারপর নাট্যবেদ রচনা করেন। ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য অর্থাৎ বাক্যাবলী, সামবেদ হইতে গীতভাগ, যজুর্বেদ হইতে অভিনয়, আর অথর্ববেদ হইতে রস গ্রহণ করিলেন।

শার্ঙ্গধর এই কথাই একটি শ্লোকে বলিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

ঋগ্‌যজুঃ সামবেদেভ্যো বেদাচ্চাথর্বণঃ ক্রমাৎ।
পাঠ্যং চাভিনয়ান্ গীতং রসান্ সংগৃহ্য পদ্মভূঃ॥

নাট্যশাস্ত্রকে 'নাট্যবেদ' নাম দেওয়ায় এই শাস্ত্রের বৈদিকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। বেদ হইতেই যখন ইহার উপকরণ সংগৃহীত তখন ইহাকে 'বেদ' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কল্লিনাথ সংগীত-রত্নাকরের টীকায় (২য় খণ্ড, ৬২৪ পৃঃ) এই কথাই বলিয়াছেন—"ঋগাদিমুখ্যবেদমূলতত্বেন চ চতুর্মুখেণ দত্তস্য বেদত্বে সিদ্ধে তদর্থভূত

নাট্যপ্রতিপাদক ভরতমুনিপ্রণীতস্য চতুর্বিধ পুরুষার্থফলস্য শাস্ত্রস্য বেদমূলত্বেন বৈদিকত্বং বেদিতব্যম্।" কিন্তু এই নাট্যবেদ উপবেদের মধ্যে পরিগণিত; কেন না, শাস্ত্র বলে—"সামবেদস্যোপবেদো গান্ধর্ববেদঃ।" আর কল্লিনাথ তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন,—"নাট্যবেদ এব গীতপ্রাধান্যবিবক্ষয়া গান্ধর্ববেদ উচ্যতে। অভিনয় প্রাধান্য-বিবক্ষয়া তু নাট্যবেদ ইত্যুচ্যতে॥"

শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' (পৃঃ ৫-৬) ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত অনেকগুলি সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থের নাম আছে। সংগীত-রত্নাকর ১২১০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১২৪৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে লেখা। শার্ঙ্গদেবের উল্লিখিত অধিকাংশ গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না। সংগীত-রত্নাকরের টীকাকাররাই শুধু মাঝে মাঝে এই সমস্ত গ্রন্থের কিছু কিছু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব যতগুলি নাট্যশাস্ত্রকারের নাম করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 'কোহল'ই ভরতের ঠিক পরবর্তী। ভরত-নাট্যশাস্ত্রের শেষে (৩৭ অধ্যায় ১৮ শ্লোক) লেখা আছে, নাট্যের অবশিষ্ট কথা 'কোহল' বলিবেন।

"আপ্তোপদেশ সিদ্ধং হি নাট্যং প্রোক্তং স্বয়ংভুবা।
শেষং প্রস্তারতন্ত্রেণ কোহলঃ[1] কথয়িষ্যতি॥"

ভরত নাট্যশাস্ত্রের এই উক্তি হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ভরতের পরবর্তী লেখক কোহল তাঁহার নিজের গ্রন্থ লিখিবার পর নাট্যশাস্ত্রের এই সংস্করণ তৈরি হইয়াছিল। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিকও নয়। মতঙ্গ শার্ঙ্গদেবের পরবর্তী একজন আধুনিক লেখক। শার্ঙ্গদেব ত্রয়োদশ শতকে যাহা

১ কাব্যমালা সংস্করণে পাঠ আছে—'কোলাহলঃ কথিষ্যতি।' Paul Regnaud and J. Grosset-এর পুথিতে আমাদের প্রদত্ত পাঠ আছে। কাব্যমালার নাট্যশাস্ত্রের ৪৪৬ পৃষ্ঠার ২৪ শ্লোকে 'কোহেলোদিভিরেবং তু' নিশ্চয়ই অশুদ্ধ; শুদ্ধপাঠ হবে—'কোহলাদিভিরেবং তু।'

করিয়াছিলেন মতঙ্গ পরবর্তিকালে তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন। এই মতঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রসঙ্গে ভরত কোহল, কাশ্যপ ও দুর্গাশক্তির নাম করিয়াছেন।

১৮৬১-৬৫ খ্রীস্টাব্দে Fitz Edward Hall ধনঞ্জয় কৃত দশ-রূপের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন।[১] এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে (১৯৯-২৪১ পৃঃ) তিনি নাট্যশাস্ত্রের ১৮শ, ১৯শ, ২০শ ও ৩৪শ অধ্যায় প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে সাধারণের ধারণা ছিল যে, এই গ্রন্থখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হল দুইখানি পুথি সংগ্রহ করেন। একখানি খণ্ডিত, তাহাতে প্রথম সাতটি অধ্যায় মাত্র ছিল। অপরখানি সম্পূর্ণ—ভূর্জপত্রে নাগরী অক্ষরে ছাপা। এইখানির উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই চারটি অধ্যায় ছাপেন। অতঃপর ১৮৭৪ সালে হেমান (W. Heymann) নামে একজন জর্মান পণ্ডিত একখানি জর্মান পত্রে[২] ভারতের নাট্যশাস্ত্রের কয়েকখানি পুথির উপর জর্মান ভাষায় একটি প্রবন্ধ বাহির করেন। তাঁহার প্রবন্ধের নাম 'Ueber Bharata's Natya-castram.' তারপর নাট্যশাস্ত্রের পুথি সংগ্রহের আয়োজন চলিতে লাগিল। কয়েকখানি পুথিও পাওয়া গেল। ১৮৮০ সালে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রেনো (Paul Regnaud) পারী নগরে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ১৭শ অধ্যায় ছাপেন।[৩] তারপর ঐ সালেই আবার ১৫শ অধ্যায়ের শেষাংশ

১ 'দশরূপ' Bibliothica Indica (New Series) গ্রন্থমালা ভুক্ত হইয়া বাহির হয়। ১২, ২৪ ও ৮২ সংখ্যায় এই চারটি অধ্যায় মুদ্রিত হয়। এই দশরূপে ধনিকের 'অবলোক' নামে টীকাও আছে।

২ Nachrichten Vonder Koenigl Gesellschaftder Wissen schaften und der G. A. Universitaet zu Goettingen (February 25, 1874) পৃ: ৮৬-১০৭।

৩ গ্রন্থের নাম—Le dix-Septieme chapitre du Bharatiyanatya Sastra intituk Vag-abhinaya. Paris, Leroux, 1880 পৃঃ ৮৫-৯৯।

ও ১৬শ অধ্যায় মুদ্রিত করেন।[১] এগুলি Annales du Muse'e Guimet (I ও II)-তে বাহির হয়। ইহার পর তিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত অলঙ্কার-গ্রন্থের[২] শেষে ১৮৮৪ সালে ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায় ছাপেন। এক বৎসর পরে ১৮৮৬ সালে পুনা আর্যভূষণ প্রেস হইতে 'সঙ্গীত মীমাংসক' নামে একখানি সাময়িক পত্র বাহির হয়। এই কাগজে অন্নাসাহেব ঘরপুরে একখানি পুথির সাহায্যে নাট্যশাস্ত্রের ১ম, ২য়, ৩য় অধ্যায় সম্পূর্ণ এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ৭৯টি শ্লোক বাহির করেন। ইনি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে পাঠোদ্ধার করেন। আর একজন ফরাসী সংস্কৃতনবীশ গ্রোসে (Joanny Grosse) ১৮৮৮ সালে লিয়োঁ (Lyon) নগরে নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায় ফরাসী তর্জমা ও টিপ্পনী সমেত প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ সম্পাদন কালে তিনি রেনোর সাহায্যে হলের পুথি ও রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়া ছিলেন।

১৮৯৪ সালে 'কাব্যমালা' গ্রন্থমালার ৪২ সংখ্যক পুস্তকরূপে সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্র প্রকাশিত হয়। শিবদত্ত ও পরব মাত্র দুইখানি পুথি হইতে এই গ্রন্থ সম্পাদন করেন। ইহাদের সম্পাদিত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলেও বড়ই অশুদ্ধ। তবে একেবারে কিছু না থাকার চেয়ে এটি মন্দের ভাল। ১৮৯৪ সালে রেনো ও গ্রোসে নাট্যশাস্ত্রের একটি

---

১ এই অতি মূল্যবান অলঙ্কার গ্রন্থের নাম—"Rhetorique Sanskrite. L'Academic des Inscriptions at Belles Lettres কর্তৃক প্রকাশিত। Paris, Leroux, 1884। রেনো রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত গ্রন্থ অক্ষরে লেখা পুথি অবলম্বন করিয়া তাঁহার তিনখানি বই সম্পাদন করেন।

২ গ্রন্থের নাম—La Metrique de Bharata. Paris, Leroux, 1880. পৃঃ ৬৫-১৩০

৩ গ্রন্থের নাম—'Contribution a I'etude de musique hindoue.' Lyon, 1888 পৃঃ ৯১। Bibliotheque de la Faculte des Lettres de Lyonতে ষষ্ঠখণ্ডে গ্রোসের গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিবার ভার লইয়া কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্পাদিত গ্রন্থ আর বাহির হইল না। তবে সুখের বিষয় ডক্টর শ্রীপদ কৃষ্ণ বেল্‌ভলকর ১৯১৪ সালে ১৬ই এপ্রিল আমেরিকান ওরিয়েন্ট্যাল সোসাইটির অধিবেশনে প্রচার করেছেন যে, তিনি হার্ভার্ড ওরিয়েন্ট্যাল সিরিস ভুক্ত করিয়া ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রকাশ করিবেন ইহার জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমও করিয়াছেন। অনেকগুলি পুথিও* তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। ভরত নাট্যশাস্ত্রের অনেক জায়গাই দুর্বোধ। টীকার সাহায্য না লইয়া ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে অভিনব গুপ্ত (১০০০ খৃঃ) এই গ্রন্থের একখানি অতি সুন্দর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। টীকাটা এখনও ছাপা হয় নাই। তাঁহার টীকার নাম— 'ভরত নাট্য বেদবিবৃতি'।

---

* নাট্যশাস্ত্রের পুথি—

(১) ১৮৭৪ সালে হেমান (Heymann) ভারতের নাট্যশাস্ত্রের উপর একটি প্রবন্ধ ('Ueber Bharat's Natya-castram'—Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissens chaften.) লেখেন। এই প্রবন্ধে নাট্যশাস্ত্রের পুথির একটি তালিকা আছে। (২) Fitz-Edward Hall-এর দুখানি পুথি এখন T. Grosset-এর কাছে। (৩) Annasaheb Gharpureর ব্যবহৃত পুথির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। (৪) Dr. Sylvain Leviর নিকট একখানি নকল করা পুথি আছে। এখানি তিনি কাটমাণ্ডুতে নেপালী পুথি হইতে নকল করিয়াছেন। (৫) নেপাল দরবার লাইব্রেরির পুথি। মধ্যে খণ্ডিত। নেওয়ারি অক্ষরে লেখা। (৬) Deccan College Libraryতে দুখানি নকল করা পুথি আছে। তালিকার নং ৬৮, ৬৯, (১৮৭৩-৭৪)। মহারাজ বিকানীর লাইব্রেরিতে দুখানি পুথি আছে সেই দুখানির নকল [Rajendralal Mitra's Bikaner Catalogue—o 1092 A & B]. (৭) Royal Asiatic Society of Great Britain & Inlandএর সংগৃহীত তালপত্রের পুথি। গ্রন্থ অক্ষরে লেখা।

ভরত নাট্যশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় আটত্রিশটি। নিম্নে বিষয়সূচী দেওয়া গেল ঃ—

(১)	নাট্যোৎপত্তি	৯৪
(২)	মণ্ডপ বিধান (ক)	৯৩
(৩)	রঙ্গদৈবতা পূজা বিধান (খ)	৯৩
(৪)	তাণ্ডব লক্ষণ	৩০২
(৫)	পূর্বরঙ্গ বিধি (গ)	১৬১
(৬)	রস বিকল্প (ঘ)	৮৩
(৭)	ভাব ব্যঞ্জক (ঘঁ)	১১৩
(৮)	উপাঙ্গ লক্ষণ (ঙ)	১৬১
(৯)	শরীরাভিনয় (চ)	২৪৭
(১০)	চারী বিধান [=R. A. S,) ৯]	৯৯
(১১)	মণ্ডল বিধান (চঁ) [=(ঐ) ১০]	৫৮
(১২)	গতি প্রচার [=(ঐ) ১১]	১৯২
(১৩)	কক্ষাযুতি ধর্ম-ব্যঞ্জক (চঁ) [=(ঐ) ১২]	৬৪

(৮) Mysore Oriental Libraryর একখানি পুথি। নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতার নাম—আদিভরত। (৯) Dr. H. H. Dhruvaর নিকট একখানি গুজরাটের পুথি ছিল। এ পুথির সন্ধান জানা নাই। (১০) The Govt. Oriental Mss. Library at Madras. ৯ খানি খণ্ডিত পুথি। ইহা ব্যতীত দুখানি কোহলাচার্যের পুথি। এ দুখানি খণ্ডিত। (১১) The Palace Library of H. H. the Maharaja of Trivandrum. তিনখানি পুথি। একখানি পুথি ২৯ অধ্যায় পর্যন্ত। একখানি অসম্পূর্ণ। একখানি আচার্য অভিনবগুপ্তের 'নাট্যবেদবিবৃত্তি' নামক টীকা সমেত। অভিনবগুপ্ত খ্রীস্টীয় নবমশতকে জীবিত ছিলেন। (১২) MM. Haraprasad Sastri—Report for the Search of Sanskrit Mss. (1895–1900) এই বিবরণে (পৃঃ ১০) একখানি পুথির কথা আছে। পুথিখানিতে ২২ অধ্যায় মাত্র আছে।

(১৪) বাচিকাভিনয় (চ´) [=(ঐ) ১৩] ১১

(১৫) ছন্দো বিধান (ছ) [=(ঐ) ১৪] ১৬৭

(১৬) কাব্য লক্ষণ (জ) [=(ঐ) ১৫] ১১৮

(১৭) বাগভিনয়ে কাকুস্বর ব্যঞ্জক (ঝ) ১৩৩

(১৮) দশরূপ লক্ষণ (ঞ) ১৮৪

(১৯) অঙ্গ বিকল্প (ট) ১১৮ [=(R. A. S.) ১৭=
(D. col.) ১৮]

(২০) বৃত্তি বিকল্প (ঠ) ৬৫ [=(ঐ) ১৮ ; =
(D. col.) ১৯]

(২১) আহার্যাভিনয় ১৯১ [=(ঐ) ১৯]

(২২) সামান্যাভিনয় ৩১৬ [=(ঐ) ২০ ;=(D. col.) ২১]

(২৩) বেশ্যোপচার (ঠ´) ৭৬ [=(ঐ) ২১ ;=(D. col.) ২২]

(২৪) স্ত্রীপুংযোপচার (ড) ১১৯ [=(ঐ) ২২ ;=(D. col.) ২৩]

(২৫) বাহ্যোপচার (ঢ) [=(ঐ) ২৩ ;=(D. col) ২৪]

(২৬) চিত্রাভিনয় ১৩১ [=(কাব্যমালা) ২৫]

(২৭) সিদ্ধি ব্যঞ্জক (ণ) ৯৩ [=(D. col.) ৩৪]

(২৮) জাতি লক্ষণ (ত) ১৬১ [=(D. col.) ২৭]

(২৯) ততাতোদ্য বিধান (থ) ১২৫

(৩০) সুষিরাতোদ্য বিধান (থ´) ১৩ [=(D. col.) ২৮]

(ক) হলের পুথিতে আর একটি নাম আছে, সেটি 'প্রেক্ষাগৃহ।' বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পুথিতে আছে—প্রেক্ষাঙ্ক গৃহ লক্ষণ। (খ) হলের পুথিতে—রঙ্গদৈবত্ত পূজা বিধান। (গ) Deccan College-এর পুথিতে ও কাব্যমালার পূর্বরঙ্গ বিধান। (ঘ) Deccan College পুথিতে ও কাব্যমালায়—রসাধ্যায়। (ঘ´) কাব্যমালায়—ভাবব্যঞ্জন। (ঙ) Deccan College পুথিতে—উপাঙ্গাভিনয়; কাব্যমালায় উপাঙ্গ অভিনয়। (চ) বিলাতের R. A. S. পুথিতে—হস্তাভিনয়; Deccan

(৩১) তাল ব্যঞ্জক (র্থ´) ৩৩৯ [=(D. col) ৩০]

(৩২) ধ্রুবা বিধান (´র্থ´) ৪৪৩ [=(D. col.) ৩১]

(৩৩) ভাণ্ডবাদ্য (দ) ২৬০ [=(D. col.) ৩২]

(৩৪) প্রকৃত্যধ্যায় (ধ) ২২ [=(কাব্যমালা) ২৬]

(৩৫) ভূমিকা বিকল্প (ন) ৩৯ [=(কাব্যমালা) ৩৬]

(৩৬) নাট্যাবতার ২৬ [=(D. col,) ৩৫]

(৩৭) নাটশাপ (প) ৪৯

(৩৮) গুহ্য বিকল্প (ফ) ৩৩

Col. ও কাব্যমালায় অঙ্গাভিনয়। (চ´) কাব্যমালার—মণ্ডল কল্পন। (চ´ কাব্যমালায়—করমুক্তি ধর্মীব্যঞ্জক। (´চ´) কাব্যমালায়—বাচিকাভিনয়ে ছন্দোবিধান। (ছ) D. Col.—ছন্দোবৃত্তিবিধি কাব্যমালায়—ছন্দোবৃত্ত-বিধি। (জ) R. A. S.—ছন্দোবিচিত্তি; কাব্যমালায়—বাগভিনয়ে কাকু-স্বর বিধান। (ঞ) R. A. S.—ভাষাবিধান। (ট) R. A. S.—বাগঙ্গাভিনয়। কাব্যমালায়—সন্ধি নিরূপণ। (ঠ) D. Col.—সন্ধি নিরূপণ। (ঠ´) কাব্য-মালায় বৈশিক নামাধ্যায়। (ড) D. Col. বৈশিক নামাধ্যায়; কাব্যমালায় —স্ত্রী পুংযোপচারাধ্যায়। (ঢ) হলের পুথিতে এই অধ্যায় নাই। (ণ) কাব্য-মালায়—প্রকৃতি বিকল্পনাধ্যায় D. Col.—প্রপ্রকৃতি বিকল্প=৩৪; (ত) R. A. S.—আতোদ্যবিধি। (থ) কাব্য—শুষিরাতোদ্যাধিকার। (থ´) কাব্য—তালাবিধান (´থ´´) কাব্যমালার—ধ্রুবাধ্যায়। (দ) R. A. S.—বাদ্যাধ্যায়। (ধ) R. A. S.—কাব্যমালায় গুণাধ্যায় প্রকৃত্যাবিচার; D. Col.—গুণাধ্যায়। (ন) R. A. S.—ভূমিকাপাত্র বিকল্প; ও কাব্যমালায় D. Col. —পুষ্কর বাদ্য। (প), (ফ)—হল ও R. A. S. পুথিতে এই দুই অধ্যায় নাই, D. Col. পুথিতে এই দুই অধ্যায় আছে।

নাট্যশাস্ত্রে নাটকের উৎপত্তি

মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ব্রহ্মাকে সকল বর্ণের জন্য পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করেন। তাই তিনি সংকল্প করিয়া সমস্ত বেদ অনুস্মরণ করিলেন। তারপর নাট্যবেদ রচনা করিলেন। ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য অর্থাৎ বাক্যাবলী, সামবেদ হইতে গীতভাগ, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হইতে রস গ্রহণ করিলেন। তারপর ভরত মুনিকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন,—এখন 'ইন্দ্রধ্বজ' উৎসব চলিতেছে, তুমি এই উৎসবে নাট্যবেদ প্রয়োগ কর। ভরতনাট্য প্রয়োগে দেবতাদের বিজয় ও দৈত্যদের পরাজয় দেখানো হইতেছিল; তাহাতে দৈত্যেরা ক্ষুব্ধ হইয়া বিঘ্ন করিতে লাগিল। তখন ইন্দ্র রাগিয়া ধ্বজ গ্রহণ করিলেন এবং তাহা দিয়া প্রহার করিয়া দৈত্যদিগকে জর্জর করিলেন। ইহা হইতে ইন্দ্রধ্বজোৎসবের নাম হইল জর্জরোৎসব।

ভারতের নাট্যশাস্ত্রে দুইখানি নাটকাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভরত ব্রহ্মাকে বলিলেন, স্বর্গে নাট্যমণ্ডপ তৈরি হইয়া গিয়াছে। রঙ্গদেবতারও পূজা শেষ হইয়াছে। এখন কোন্ নাটক অভিনীত হইবে আজ্ঞা করুন। ব্রহ্মার আদেশে আর সেই মণ্ডপে ব্রহ্মার রচিত নাটক 'অমৃত-মন্থন' অভিনীত হয়। অভিনয় দেখিয়া দেবতারা খুব খুশী হন। মহাদেব কিন্তু তখনও এই নাটকের অভিনয় দেখেন নাই। ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। আশুতোষ সম্মত হইলে ব্রহ্মা শিষ্যগণ লইয়া ভরতকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। হিমালয় পর্বতের পশ্চাদ্দিকে 'ত্রিপুরদাহ' নাটকের অভিনয় হইল। মহাদেব

অভিনয় দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু নাটকে নৃত্য ছিল না। তাই মহাদেব বলিলেন,—

"যশ্চায়ং পূর্বরঙ্গস্তু ত্বয়া শুদ্ধঃ প্রযোজিতঃ।
এতদ্বিমিশ্রিতশ্চায়ং 'চিত্রো' নাম ভবিষ্যতি॥"

—নাট্যশাস্ত্র ৪.১৪

তুমি যে 'পূর্বরঙ্গ' প্রয়োগ করিয়াছ তাহা ভালই হইয়াছে। ইহার সহিত নৃত্য জুড়িয়া দিলে অভিনয় সুন্দরই হইবে সন্দেহ নাই। মহেশ্বরের কথা শুনিয়া স্বয়ম্ভূ নৃত্যের অঙ্গ-হারাদি দেখাইতে বলিলেন। তখন মহাদেব তণ্ডু মুনিকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"প্রয়োগমঙ্গহারাণামাচক্ষ ভারতায় বৈ।" —ঐ, ৪.১৬

মহাদেবের আদেশে তণ্ডু ভরতকে সমস্ত দেখাইয়া দিলেন। তণ্ডুর নিকট পাওয়া বলিয়া নৃত্যের সাধারণ নাম হইল—তাণ্ডব।

ইহার পর ভরত দেবলোক স্বর্গে নাট্য প্রয়োগ করিতেন; আর দেব, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ নাটকের অভিনয় করিতেন। ক্রমশ তাঁহার অভিনেতারা বেশ কৃতী হইয়া উঠিলেন এবং নিজেরাই নাটক রচনা করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা একখানি নাটক রচনা করেন; সেই নাটকে ঋষিদের উপর যথেষ্ট কটাক্ষ থাকে। ঋষিরা সেই নাটকের অভিনয় দেখিয়া অপমানিত বোধ করেন এবং শতসংখ্যক অভিনেতাদিগকে অভিসম্পাত করেন,—

"যস্মাদজ্ঞানমদোন্মত্তা ন চেচ্ছাবিনয়ান্বিতাঃ।
তস্মাদেতদ্ধি ভবতাং কুজ্ঞানং নাশমেষ্যতি॥
ঋষীনাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সমবায়সমাগমে।
নির্ব্রাহ্মণো নিরাভূ (হু) তঃ শূদ্রাবারো ভবিষ্যতি॥

—ঐ, ৩৬ অঃ

তাহাতে তাঁহারা পতিত ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হ'ন। তখন ভরত ইন্দ্রাদি দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ঋষিদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঋষিগণ কৃপাপরবশ হইয়া অভিশাপের প্রথমাংশ প্রত্যাহার করেন।

অতঃপর কিছু কাল পরে নহুষ স্বর্গ জয় করেন। স্বর্গে তিনি নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া ভরতকে তাঁহার রাজধানিতে নাটকাভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ভরত শতসংখ্যক ভরতপুত্রকে পৃথিবীতে নহুষ-রাজ্যে আগমন করিতে আদেশ দেন। একশত ভরতপুত্র মর্ত্যরমণীদিগের সহিত তথায় নাটকাভিনয় করেন। এই মর্ত্যস্ত্রীগণের গর্ভে তাঁহাদের সন্তানাদিও হয়। এই সন্তানগণও নট নামে খ্যাত। পরে তাঁহারা শাপ-মুক্ত হইয়া স্বর্গে ফিরিয়া যান।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে নাট্য বা নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। নাট্যশাস্ত্র যখন লিখিত হয় তাহার পূর্বে যে নাটক ও নাট্যশালা ছিল তাহা বলিতে পারা যায়। আর সে সময় অভিনয়ে যে স্ত্রী পুরুষ সাজিত তাহাও ঠিক।

পুতুল-নাচের প্রথা ভারতবর্ষে খুব প্রাচীন। মহাভারতেও এ প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। পুতুল-নাচ সূত্রের সাহায্যেই হইত। যিনি সূত্রের সাহায্যে এই অভিনয়-কার্য সম্পন্ন করিতেন তাঁহাকে 'সূত্রধার' বলা হইত। পরে দেখা যায়, অভিনয়-কার্য জীবন্ত মানুষের দ্বারাই করা হইতে লাগিল। তখন যিনি অধিনায়কত্ব করিতেন, তাঁহাকে আর সূত্র ধরিয়া অভিনয় করাইতে হইত না। তবুও তাঁহার পূর্বের সেই 'সূত্রধার' নামটি রহিয়া গেল। এই সূত্রধার হইতে বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে পুতুল-নাচের রীতি নাটকীয় অভিনয় প্রথায় পূর্ববর্তী। নাটকীয় অভিনয়ের উৎপত্তি পুতুল-নাচ হইতে না হইলেও এই রীতি কিছু সহায়তা করিয়াছে। পূর্বে সাধারণ লোকে তাহাদের নিজেদের ভাষাতেই অভিনয় করিত। কিন্তু এ কথা সব সময় মনে রাখিতে হইবে যে, অভিনয় ধর্ম-সম্বন্ধীয় উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল। অভিনয় জনসাধারণের মধ্যে যাত্রার আকারে অভিনীত হইত। 'যাত্রা' এই নামটি দিয়াই বেশ বোঝা যায়—যাত্রা ধর্ম সম্বন্ধীয় উৎসবের অঙ্গ ছিল। "যাত্রা" বলিলে

কোন দেব-দেবীর উৎসব বোঝায়। জনসাধারণের মধ্যে আজও রামায়ণ-মহাভারতের দেবদেবী বা নায়ক-নায়িকার আখ্যায়িকা হইতে অভিনয়ের আখ্যান-বস্তু (plot) সংগৃহীত হইয়া থাকে। রাজাদের দৃষ্টি অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবার পর হইতে নাটকের যেমন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনি নাটকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষাও প্রবেশাধিকার লাভ করিতে লাগিল। বসন্তোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে রাজপ্রাসাদে অভিনয় হইতে লাগিল, আর রাজ-কবিরাও নাটক রচনা করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের অভিনয় কিন্তু খোলা মাঠে যাত্রার আকারেই হইত।

অশোকের প্রথম পর্বত লিপিতে[১] দেখা যায় 'সমাজ' শব্দের দুইটি অর্থ। গিরনারে এইরূপ পাঠ আছে—

১। প্রজুহিতব্যম্ ন চ সমাজো কটবো বহুকং
দোসং সমাজম্হি পসতি দেবনং পিয়ো পিয়দসি রাজা।
২। অস্তি পিতু এ কচা সমাজা সাধুমতা দেবানং পিয়স

অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকার[২] ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার 'সমাজ' শব্দ লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। ভাণ্ডারকার মহাশয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধসাহিত্য[৩] হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সমাজের দুইটি অর্থ। উদ্ধৃত অশোকের লিপির প্রথম ছত্রে যে 'সমাজ' শব্দ আছে—সেই সমাজে নৃত্য, গীত ও অন্যান্য আমোদ লোকেরা পাইত, আর অশোক এই সমাজকে সাধুসম্মত বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় এই দ্বিতীয় অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও[৪] নাট্যাভিনয় অর্থে

১ Rock Edict I
২ Indian Antiquary, 1913, pp. 255-58
৩ Ind. Ant. 1918, pp. 221-23.
৪ কামসূত্র, পৃঃ ৪৯-৫১ (Chowkhumba Sanskrit Series)

সমাজের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন ইহকালধর্মানুষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বাৎস্যায়ন বলেন, পক্ষান্ত বা মাসান্ত দিনে তখনকার প্রথানুসারে সরস্বতী-মন্দিরের পূজারীরা সমাজের ব্যবস্থা করিবেন। অন্যস্থান হইতে অভিনেতারা আসিয়া অভিনয় করিবে। এই অভিনয়ের নাম ছিল—'প্রেক্ষণম্'। অভিনয়ের পরদিন মন্দির-সেবকেরা অভিনেতাদের অভিনন্দিত করিতেন। তারপর দরকার হইলে পুনরায় অভিনয় হইত, দর্শকদের ইচ্ছানুসারে বন্ধও করিয়া দেওয়া হইত।

বাৎস্যায়নের উক্তি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সমাজই একরূপ নাট্যাভিনয়। এই অভিনয়ের সঙ্গে ধর্মের বিশেষ সম্পর্ক; কেননা, নাটক ও নাট্যশালার অধিষ্ঠাত্রী বাগীশ্বরী সরস্বতীর মন্দিরেই এই অভিনয় হইত।

বৌদ্ধদিগের জাতক হইতে জানিতে পারা যায়, সমাজ নাট্যাভিনয় অর্থেই ব্যবহৃত হইত। কণবের জাতক[১] পড়িয়া এটুকু বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময় নটদের এক একটা দল ছিল, আর তারা নানা গ্রামে, শহরে অভিনয় করিত। ইহারা রঙ্গমঞ্চকে 'সমাজ-মণ্ডল' বলিত।

রামায়ণে (২.৬৭.১৫) নট ও নাটকের উল্লেখ আছে। ২.৬৯.৩ শ্লোকে আছে 'নাটকানিস্মাহঃ'। ২.১.২৭ শ্লোকে 'ব্যামিশ্রকেষু' মিশ্রিত ভাষায় লেখা নাটক বোঝায়। কীথ (B. Keith) সাহেব বলেন, রামায়ণের সময়ে নাটকাভিনয়ের কোন ইঙ্গিত নাই। কথাটা ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। কেননা, রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে (৬৭.১৫) স্পষ্টই লেখা আছে—

> "নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্তকাঃ।
> উৎসবৈশ্চ সমাজৈশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ॥"

---

১ Fausboll, Jataka, vol. iii, pp. 6-12 (No. 318.)

উৎসবে ও সমাজে অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ে নটেরা আর নর্তকেরা প্রহৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু অরাজক জনপদে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। নাট্যাভিনয়কে রাষ্ট্রবর্ধন বলিয়া লোকে মনে করিত। রাজারাও বোধ হয় লোকশিক্ষার্থ নাট্যশালার পোষণ করিতেন।

বশিষ্টপুত্র পুলমায়ির উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে খোদিত নাসিক-গুহালিপিতে এবং সম্রাট্ খারবেলের হাথীগুম্ফালিপিতে নাট্যাভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পুলমায়ি উৎসব-সমাজের দ্বারা প্রজাবৃন্দের প্রীতিবর্ধন করিয়াছিলেন। 'গন্ধব-বেদবুধ' রাজা খারবেল[১] তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে রাজধানীর সকলকে উৎসব-সমাজ করিয়া আনন্দ দিয়াছিলেন।

সংস্কৃত নাটক কতকগুলি নিয়মে বাঁধা। তবে তাহাতে কলা-কৌশল বিশেষভাবে সম্পাদিত। নাটককারকে শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া নাটক রচনা করিতে হয়। নাটক-রচনা বিধির জন্য নাট্যশাস্ত্র নামে বিশেষ শাস্ত্র আছে। অভিনয়-কার্যে দক্ষ ব্যক্তির কিরূপ গুণ থাকা উচিত, নাটকের ভাষা এবং বাক্‌ছন্দ (style) কিরূপ হইবে এবং নাটকের আখ্যান-বস্তু (plot) কিরূপ হইবে নাট্যশাস্ত্রে তাহার বিশেষভাবে উপদেশ আছে। বাস্তব জীবনের যথাযথ চিত্র প্রদর্শন করা সংস্কৃত নাটকের উদ্দেশ্য নহে। সংস্কৃত নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য রসের অবতারণা করা। সুকৌশলপূর্ণ ভাষা এবং হাবভাবের দ্বারা রসের অবতারণা করিতে পারিলেই নাটের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সংস্কৃত নাটক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে রসজ্ঞ হইতে হয়।

সংস্কৃত নাটকের বয়স নির্ধারণ করা কঠিন। কোন্ সময়ে কি ভাবে নাটকের জন্ম হইল তাহা বলা সহজ নহে। সাহিত্যে নাটককে যে আকারে দেখা যায় তাহা নাটকের পূর্ণ যৌবনের অবস্থা।

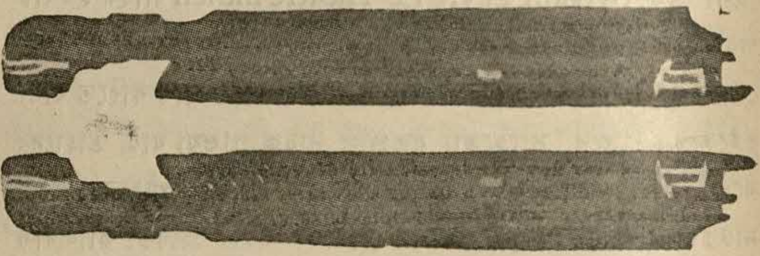
---

১ Journal of the Behar and Orissa Research Society, 1917, P. 455.

শৈশবে যে নাটকের কিরূপ আকার ছিল, সাহিত্য অনুসন্ধান করিয়া তাহা অবগত হইবার উপায় নাই।

পূর্বে মনে হইত মৃচ্ছকটিক নাটকই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নাটক। মৃচ্ছকটিক খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের রচনা বলিয়া অনেকের ধারণাও ছিল। কিন্তু Sylvain Levির Le Theatre Indien বাহির হইবার পর হইতে মৃচ্ছকটিকের বয়স সম্বন্ধে এ ভুল ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন লোকে মৃচ্ছকটিকের বয়স অপেক্ষাকৃত অল্প বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছে। তবে সাহিত্যে যতগুলি নাটক পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকখানিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই নাটকখানি খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের লেখা। ইহার প্রণেতা কালিদাস —বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ের কবি। বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কাল ৩৭৫ হইতে ৪১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পূর্বেও যে ভাল ভাল নাটকের উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহা ঐ নাটকে কালিদাসই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পূর্বে, ধাবক, সৌমিল্ল, কবিরত্ন প্রভৃতি নাটককারের যে অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রস্তাবনা পাঠেই জানিতে পারা যায়। এ পর্যন্ত এই নাটককারদিগের মধ্যে কাহারও একখানি সম্পূর্ণ নাটকও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে মে মাসে দাক্ষিণাত্যবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পুরাতন পুস্তকাগারে ভাস-প্রণীত নাটকের দশখানি হস্ত-লিখিত পুথি আবিষ্কার করেন। পরে আরও কয়খানি আবিষ্কৃত হয় কবি ভাসের রচনা-ভঙ্গী অপূর্ব। ভাসের কোন নাটকে নাট্যশাস্ত্রের পারিভাষিক বিধিনিষেধের সহিত তাঁহার পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাঁহার পরিভাষা তাঁহার নিজস্ব। ভাসের সময় এখনও স্থির হয় নাই। কেহ তাঁহাকে খ্রীস্টের পূর্বে কেহ বা পরে ফেলিতেছেন। কিন্তু তিনি খ্রীস্টের অন্তত তিন চারি শত

বৎসরের যে প্রাচীন অন্য প্রমাণ ছাড়িয়া দিলেও তাহা তাঁহার ভাষা প্রমাণ করিয়া দিবে। ভাস যদি খ্রী-পূর্ব তৃতীয় চতুর্থ শতকের পরবর্তী হইতেন তাহা হইলে তাঁহার লেখায় রাশি রাশি অপাণিনীয় পদ থাকিতে পারিত না।

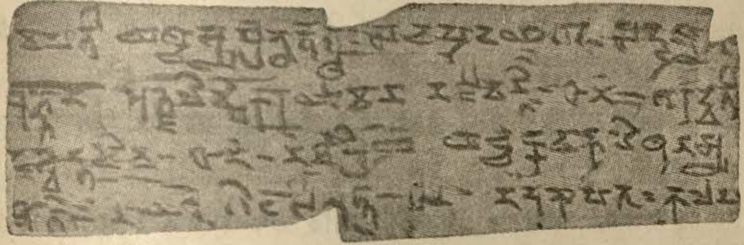


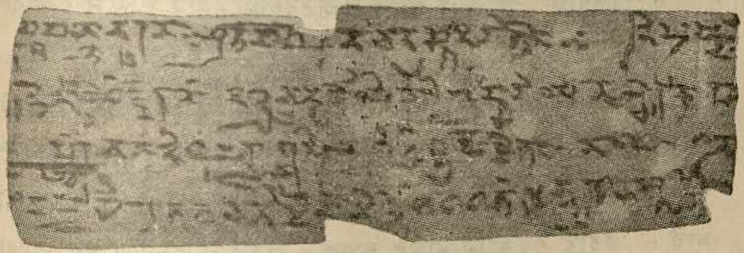
তুর্ফানে আবিষ্কৃত নাটকের দুইটি পৃষ্ঠা

প্রাচীন ভারতের প্রথম নাটক কি তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে কবি ভাসের পূর্বের কোন নাটক এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। মধ্যএসিয়ায় বৌদ্ধযুগের কয়েকখানি নাটকের আবিষ্কার হইয়াছে[১] এই নাটকগুলি সম্পূর্ণ নহে। তালপত্রের হস্তলিখিত পুথির বিক্ষিপ্ত অংশমাত্র। এগুলি প্রাচীন কুষাণযুগের। সে সময়ে মধ্যএসিয়া কুষাণরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই প্রাচীন নাটকগুলির মধ্যে কুষাণরাজ কণিষ্কের সভাকবি অশ্বঘোষ রচিত 'শারিপুত্রপ্রকরণ' বা 'শারদ্বতী পুত্রপ্রকরণ' নামে একখানি নবাঙ্ক বৌদ্ধ নাটকের তালপত্র লিপি কিছুকাল পূর্বে তুর্ফানে (Turfan) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ নাটকখানির অস্তিত্ব পূর্বে কেহ জানিতেন না। তরুণ বয়স্ক মৌদ্গল্যায়ন ও শারিপুত্র কেমন করিয়া বুদ্ধদেবের অনুগ্রহ লাভ করেন এই নাটকে তাহাই বিবৃত আছে। 'শারিপুত্রপ্রকরণে'

১ Koeniglich Preussische Turfan-Expeditionen : Kleinere Sanskrit-Texte, Heft I. 'Bruchstuecke buddhistischer Dramen herausgeben Von Heinrich Lueders, Berlin. 1911 ; Das Sariputra-prakarana, 1911.

নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম বেশ বজায় আছে। গ্রন্থখানি একটি প্রকরণ। প্রকরণের নায়ক ধীর প্রকৃতির সদ্‌ব্রাহ্মণ, মৌদ্‌গল্যায়নও ঐরূপ ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব, তাঁহার দুই শিষ্য, কৌণ্ডিল্য ও একজন শ্রমণ গদ্যে পদ্যে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন; বিদূষকের ভাষা প্রাকৃত। অশ্বঘোষ





শারদ্বতীপুত্র নাটকের দুইটি পৃষ্ঠা

এই প্রকরণে বিদূষকের অবতারণা করিয়া নাট্যশাস্ত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, অশ্বঘোষের পূর্বেই নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম তৈরি হইয়াছিল, আর নাট্যকার সেগুলির ব্যভিচারও করিতেন। অশ্বঘোষ কেবল "অতঃপরম্ প্রিয়মস্তি" প্রশ্নে উত্তর-ব্যঞ্জক ভরতবাক্য দেন নাই, কিন্তু এটুকুতেই তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই নাটকের দুইখানি তালপত্রের পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল--

ক

১—মহতী যশ্চাস্য প্রাথিতো[র]থঃ সচহৃদয়গতঃ সন্দ‍্শ্য (?)···

২—পুন্নান্ অঞ্জলিমপি করয়মানা ন জীবন্তি—ধানং—শারদ্বতী

৩—স্বস্তুমিব—ধানং—ন মে প্রিয়ং যচ্চক্রবাকমিথুনস্য…

৪—ভোতি—নায়—শি দাসীপুত্র—ধানং—নন্নু কো হেতুঃ কল [হ]

খ

১—প্ত, প, ধ্ন, স্ত, র্ [f] নঃ স্থতেন গ, র্, ণ চিত্রস্তনু-নাতপে। নিঘৃষ্ট

২—[রম] ণীয়ংণ্ কারণং ন খু বাকটেয়ী কলহস্য বিয় নিসিস্-রীকা উ (প.)…

৩—য, পারাবতমিথুনস্য ব্‌ক্রহি কথ বিগ্‌গ্রহো জাতঃ—নায়—শৃনু…

৪—তিবাহ্য প্র [ী] তি সঁহৃতবচনামেনান্ f [ন] দ্রাবশ-গতাং মন্যমানস্তুষ্ণীম্

তুর্ফানের আরও তুইখানি নাটকের বিষয় জানিতে পার ্গিয়াছে, কিন্তু নাটক তুইখানি নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং তাহাদের বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে নাটক তুইখানির নাম পর্যন্ত বাহির করিতে পারা যায় নাই। ইহার একখানি নাটক রূপক—কতকটা কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের ধরনের। এই রূপক নাটকের পাত্র-পাত্রী, বুদ্ধি ধৃতি, কীর্তি, ধর্ম প্রভৃতি প্রবোধচন্দ্রোদয়ের শান্তি, শ্রদ্ধা, বিষ্ণুভক্তি, সরস্বতী প্রভৃতির অনুরূপ। এই নাটকেরও কিয়দংশের পাঠ নিম্নে দেওয়া হইল :—

সম্মুখভাগ

১—য. ভবনিবর্ত্তকেষু ক্লেষেষু ন কিঞ্চিদস্তি প. প্রহাতব্যং যস্য নিত্যমনিত্য [ং] ব [া] ন [f] ক [f] ঞ্চদ [f] স্ত বোদ্ধব্য [ং]—ত. ম. য. ন. ক্ষ. প্ত. [১]… [ম] [য] ্খ. র. [২]… [র] জ[৩], [য] স্য [ধ্] ব [স] ত[৪]

১। তমো যেন ক্ষিপ্তম্। ২। ময়ূখৈঃ। ৩। রজো। ৪। যস্য ধ্বস্তম্।

২—যেনাবপ্তম্[৫] পরমমমৃতন্দুল্ল ভমৃতং মনোবুদ্ধিস্তস্মিংন্নহমভিরমে শান্তিপরমে—ধৃত্তি—অস্তি অস্তি তৎ মৎপ্রভাবপরিগৃহীতম্ পুরুষ [ং] জ্ঞাকন্থেজঃ প্রাতুর্ভু্ত [ং]—

৩—স [প] রায়ত্তমি [দ] ন্দ্বন্দ্বমিতি যত্র হি বুদ্ধিরবতিষ্ঠতে তত্র ধৃতিঃ স্থাঘং লভতে যত্র চ ধৃতিরাধীয়তে তত্র বুদ্ধিবিস্তীর্য্যতে —কীর্ত্তি—এবং গতে যুবাভ্যামায়[৮]

৪—[দ] নী—ক[৯]...বুদ্ধিঃ—তথা ততপি চ—নিত্যং স সুপ্ত [ই] ব যস্য ন বুদ্ধিরস্তি নিত্যং স মত্ত ইব যো ধৃতিবিপ্রহীন

পশ্চাদ্ভাগ

১—তিষ্ [ঠ] তি যস [ও] কীর্ত্তিঃ—কীর্ত্তি—ক পুনরিদানীং স পুরুষবিগ্রহো ধর্মঃ সম্প্রতি বিহরতি—বুদ্ধিঃ—স্বাধীনায়ামৃদ্ধৌ ক পুনর্ন বিহ...ব ব্যোম্নি যাতি ব্র—

২—স [ঙ্] গ (স্) ত [য] দ—গাম্প্রবিশতি বহুধা মূর্ত্তিং বিভ [জতি] খে বর্ষত্যম্বুধারাং জ্বলতি চ যুগপৎ সন্ধ্যাম্বুদ ইব স্বচ্ছন্দাৎ- —পর্ব্ব....[ব্] রজতি চ বি [ধিব], [দ]—ধ ..[ম্] ম, [এ্] চ চ।

৩—[ঙ্] গোচর :—ধৃতিঃ—তেন হি সর্ব্বা যেব তাবদেনং বাস- বৃক্ষীকুর্মঃ এষ হি স'মহর্ষি—মগধপুরস্যোপবনে সম্প্রতি—সোন্ন ববভ্র [ু] স্তম্বুমৃদুজালপাণিপা [দ]

অপর নাটকখানি গণিকা-ব্যাপার লইয়া লিখিত। ইহারও নাম জানিতে পারা যায় নাই।

সংস্কৃত নাটকের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কৃত নাটকে অভিনয় আরম্ভের পূর্বে শিব বা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা

৫। আবাপ্তম্। ৬। পরম্পরয়াত্তং। ৭। স্থানং। ৮। আয়তাভ্যাং। ৯। ইদানীং ক।

একটি সাধারণ নিয়ম। একখানি নাটকে বুদ্ধের উদ্দেশে প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই নাটকখানির নাম—'নাগানন্দ'। শ্রীহর্ষ ইহার রচয়িতা। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকের পর অবদানশতকে (সংখ্যা ৭৫) একটি বৌদ্ধ নাটকের কথা পাওয়া যায়। ইহাতে বুদ্ধ কুকুচ্ছন্দ ও শোভাবতীর কথা আছে, ভিক্ষুদেরও কথা আছে। তিব্বতী 'কা-গু্যরে'ও ইহার উল্লেখ আছে। উল্লিখিত অবদানে লিখিত যে, রাজার সম্মুখে বুদ্ধ নাটক অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে নাটকাচার্য (directors) বুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৮৯০ খ্রী° স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহামের কাগজপত্র ফ্লীট সাহেব কীলহর্নের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ঐ কাগজপত্রের সহিত দুইখানি শিলালিপির ছাপ তাঁহার নিকটে গিয়াছিল। কীলহর্ন ১৮৯১ সালে সেই দুইখানির বিবরণ ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়েরীতে প্রকাশ করেন। এই শিলালিপি দুইটি দুইখানি নাটকের। একখানির নাম 'ললিতবিগ্রহরাজ' নাটক, অপরখানির নাম 'হরকেলি' নাটক।

'ললিতবিগ্রহরাজ' নাটকখানি শাকম্ভরীর রাজা বিগ্রহরাজদেবের সম্মানের জন্য লিখিত। নাটকের রচয়িতা মহাকবি সোমদেব। শিলালিপিতে এই নাটকখানির সাঁইত্রিশটি ছত্র পাওয়া যায়। শিলালিপিটি খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকে নাগরীতে লিখিত। মহীপতিপুত্র ভাস্কর কর্তৃক ইহা খোদিত। নাটকের ভাষা সংস্কৃত ও কয়েকটি প্রাকৃত। শিলালিপিতে কোথায়ও সময়ের উল্লেখ নাই। 'হরকেলি' এই সময়ের অক্ষরের লেখা। ইহাও ভাস্করের দ্বারা খোদিত। ইহাতে ভাস্করের আরও একটু বেশী পরিচয় আছে। ভাস্করের পিতা মহীপতি গোবিন্দের পুত্র। এই গোবিন্দের জন্ম হূনরাজবংশে। ভোজরাজ ইহার গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই লিপিতে তারিখ আছে "সংবৎ ১২১০ মার্গশুদি ৫ আদিত্যদিনে

শ্রবণ নক্ষত্রে মকরস্থে চন্দ্রে হর্ষণযোগে বালককরণে॥ হরকেলি নাটকম্ সমাপ্তম্॥ মঙ্গলম্ মহাশ্রীঃ॥ কীৰ্ত্তিরিয়ং মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর—শ্রীবিগ্রহরাজ দেবস্য॥" নাটকের শেষে এইরূপ লিখিত আছে।

Annual Report Arch. Surv. of India 1921-22 (পৃঃ ১১৭) হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রাজকেশরী কুলতুঙ্গের একটি অনুশাসনে "নানাবিধ নাট্যশালার" ব্যয়নির্বাহের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। তিরুবরিয়ূর নামক স্থানে একটি অভিনয় হইয়াছিল, সেই অভিনয়ে তৃতীয় রাজরাজ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়কে এখানে 'অগমার্গম্' বলা হইয়াছে। প্রথম রাজরাজের নবম বর্ষের একটি অনুশাসনে একজন অভিনেতাকে ভূমিদানের কথা উল্লেখ আছে। এই অভিনেতার নাম কুমারণ সিকণ্টন (কুমার শ্রীকণ্ঠ)। ইনি 'আর্যকুট্টু' নামক সপ্তাঙ্ক নাটকের অভিনয়ের জন্য 'সট্টনূর' সমাজ হইতে ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বঙ্গীয় নাটকের গোড়ার কথা

বাঙলার প্রথম নাটক কি তাহা এখন নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দের 'নাটক গীতি' আস্বাদন করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। কিন্তু সে নাটকের নাম কি বা তাহা কি প্রকারের নাটক তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য কায়স্থ চন্দ্রশেখরের গৃহে স্বয়ং নাটকের অভিনয় করিতেন। কিন্তু কোন্ নাটক অভিনয় করিতেন তাহার কোন উল্লেখ কোথাও নাই। চন্দ্রশেখর শ্রীঅদ্বৈতের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি অভিনয়ের জন্য 'হরিবিলাস' প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাটকের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

নেপালে বাঙালীরা গিয়া বাঙলা ভাষায় নাটক রচনা করিয়াছিল। এইরূপ চারিখানি নেওয়ারী অক্ষরে লেখা অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রাপ্ত

নাটক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশ করেন। এই চারিখানি নাটকের নাম বিদ্যা-বিলাস (রচয়িতা—কাশীনাথ), মহাভারত (রচয়িতা— কৃষ্ণদেব), রামচরিত (রচয়িতা—গণেশ), মাধবানল-কামকন্দলা (রচয়িতা —ধনপতি)। এগুলি নেওয়ার রাজ ভূপতীন্দ্র এবং তাঁহার পুত্র রণজিৎ মল্লের সময়ে লেখা। এই চারিখানি গ্রন্থ 'নাটক' নামে আখ্যাত হইলেও এগুলিতে নাটকীয় রীতি অনুসৃত হয় নাই।

অতঃপর আমরা কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের একখানি অসম্পূর্ণ নাটকের সন্ধান পাই। এই নাটকের নাম 'চণ্ডীনাটক।' ইহার যতটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সংস্কৃত নাটকীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীনাটকের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

[সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ]

সংগায়ন্ যদশেষ কৌতুক কথাঃ পঞ্চাননো পঞ্চভি-
র্বক্ত্রৈর্বাদ্য বিশানকৈর্ডমরু কোথানৈশ্চ সংনৃত্যতি।
যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভুজা তালং বিধাতুংগতা
সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে॥

[নটীর উক্তি]

শুন শুন ঠাকুর নৃত্যবিশারদ সভাসদ সারি চতুরী।
নূতন নাটক নূতন কবিকৃত হাম তোঁহি নূতন নারী॥
ক্যায়সে বাওয়ব ভাব ভবানীকো ভীতি ভৈঁ মুঝে ভারি।
দানব-দলনে ধরণী মণ্ডলে তারিণী নে অব তারি॥
গুরুদম ধীর বীর সম শুনহ সম সগুণ মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ রাজ-শিরোমণি ভারতচন্দ্র বিচারি॥

তারপর সূত্রধারের উক্তি

* * *

অতঃপর [চণ্ডী ও মহিষাসুরের আগমন]

*   *   *

[মহিষাসুরের উক্তি]

ভাগেগা দেব দেবী   পাথর পাথর   ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋতকো বীত দেনা   যমঘর যমকো   আগকো অগলাগে ॥
বায়োকো রোধ করকে   করত বরণকো   সবতুসো অবমাগে।
ব্রহ্মাকোঁ বাঁযুকি কোঁ   কতি নেহি ঝগড়ো
জেঁাঠ কুবেরা না ভাগে ॥

[প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি]

*   *   *

[এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ, প্রথমে হাস্য করিলেন]

নাট্যশালায় নাটকাদির অভিনয় হয়। এখানে নৃত্য, গীত, বাদ্য, হাব, ভাব, বিলাস প্রভৃতি চৌষট্টি কলার কয়েকটি কলা-শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশালায় এগুলির অনুশীলন হয়—রসাস্বাদন হয়। এখানে অভিনয় দেখিয়া লোকে আমোদ উপভোগ করে। অভিনেতারাও অভিনয় করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

নাট্যশালা আজকালকার তৈরি একটা নূতন জিনিস নয়। ইহা অতি প্রাচীন কালের সৃষ্টি। ভারত, গ্রীস ও রোম—এই তিন দেশেরই নাট্যশালা খুব পুরানো। চীন ও এসিয়া-মাইনরের নাট্যশালাও কম দিনের নয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে নাট্যপদ্ধতির একটি গল্প আছে। ত্রেতাযুগে দেবতারা সকলে ব্রহ্মার নিকটে যান। তাঁহারা তাঁহার কাছে চক্ষু ও কর্ণের সমান প্রীতিপ্রদ কিছু প্রার্থনা করেন। এটি হল পঞ্চমবেদ। তবে এখানি চতুর্বেদের মতো দ্বিজগণের এক চেটিয়া হইতে পারিবে না; শূদ্রেরাও ইহার অধিকার পাইবে। ব্রহ্মা তখন কোমর বাঁধিলেন। আবৃত্তি করিবার মতো ধাতু লইলেন ঋগ্বেদ হইতে—সামবেদ হইতে গানের উপযোগী অংশ; যজুর্বেদ হইতে লইলেন কুশীলব-কলা, আর রসভাব গ্রহণ করিলেন অথর্ববেদ হইতে। তারপর তিনি বিশ্বকর্মাকে নাট্যশালা নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্ট কলাকে কাজে লাগাইবার জন্য ভরতকে[১] উপদেশ দিয়া দিলেন। ব্রহ্মার এই অভিনব সৃষ্টি

১ ভরতই নাট্যশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে প্রাচীনতম। 'সঙ্গীত রত্নাকর'ও একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা শার্ঙ্গদেব। ইনি দেবগিরির (বর্তমান দৌলতাবাদের) রাজা শিঙ্ঘনের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। শিঙ্ঘনের রাজ্যকাল ১২১০—১২৪৭ খ্রীস্টাব্দ। শার্ঙ্গদেব ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকা-

দেবতারা আনন্দে গ্রহণ করিলেন। এইবার নাট্যকলার রচনায় মহেশ্বর ও বিষ্ণুর পালা। শিব দিলেন তাঁর 'তাণ্ডব নৃত্য'। পার্বতীও চুপ করিয়া রহিলেন না—তিনি তাঁর মৃদু নৃত্য 'লাস্য' প্রদান করিলেন। বিষ্ণু চারিটি নাটকীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া



শকুন্তলা নাটকের দৃশ্য (ভিটা মেডালিয়ন)

নাট্যকলার প্রবর্তন করিলেন। তখন ভরতের উপর ভার হইল—তিনি নাট্যশাস্ত্ররূপ এই দৈব পঞ্চমবেদ পৃথিবীতে লইয়া যান।

কারদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পাঁচজন টীকাকারের নাম করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম—লোল্লট, উদ্ভট, শঙ্কুক, অভিনবগুপ্ত ও কীর্তিধর। শার্ঙ্গদেব তাঁহার গ্রন্থে ভরত, কশ্যপ, মতঙ্গ, যাষ্টিক, শার্দূল, কোহল, বিশখিল, দান্তল, কম্বল, অশ্বতর, বায়ু, বিশ্বাবসু, অর্জুন, নারদ, তুম্বুরু, আঞ্জনেয়, মাতৃগুপ্ত, স্বতি, গুণ, বিন্দুরাজ, ক্ষেত্র-

"সঙ্গীত দামোদরে" এই গল্পের একটু রকমফের আছে। এই গল্পে ব্রহ্মার নিকট দেবতারা যান নাই—ইন্দ্রই গিয়াছিলেন। গল্পাংশে অন্যান্য বিষয় বিশেষ পার্থক্য নাই।

প্রচলিত প্রবাদ এই যে, ব্রহ্মা নাট্যপদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক। ভরত ঋষি ব্রহ্মার প্রণালী অবলম্বন করিয়া বনে ঋষিদের শিক্ষা দেন, নাট্যশাস্ত্রও প্রণয়ন করেন। স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় অভিনয় দেখাইবার জন্য তিনি উর্বশী ও মেনকাকে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত শিক্ষা দেন। পৃথিবীতে ইনিই নাট্যের প্রথম সৃষ্টিকর্তা। তাই নাটকের নাম 'ভরত-সূত্র', নটের 'ভরত-পুত্র'। ভরতের নাট্যপ্রকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। এই গ্রন্থ অভিনয়ের জন্য তিন রকমের নাট্যমণ্ডপের ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব তু মণ্ডপঃ"—২.৯

(১) 'বিকৃষ্ট'—চতুষ্কোণ (rectangular)

(২) 'চতুরস্র'—সমচতুষ্কোণ (square)

(৩) 'ত্র্যস্র'—ত্রিকোণ (triangular)

আর নাট্যমণ্ডপের পরিমাণও তিন রকমের—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।

রাজ, রাহুল, রুদ্রট, নান্যভূপাল, ভোজরাজ ও পরমর্দী সোমেশ মহীপতির নাম সংগীতশাস্ত্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংগীত-রত্নাকরের টীকা লিখিয়াছেন 'চতুর কল্লিনাথ'। ইনি ষোড়শ শতকের (১৪০০—১৫০০ খ্রী°) লোক। ইহার টীকায়ও বেণা, মাতঙ্গ, কোহল, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু, হনুমান্ (আঞ্জনেয়), দাত্তিল, কম্বল, অশ্বতর, রুদ্রট, কাশ্যপ, উমাপতি, নেপাল-নায়ক প্রভৃতি সংগীত-শাস্ত্রকারের নাম আছে। 'সঙ্গীত-মেরু'তে কোহলাচার্য ভট্টতণ্ডু, সুমন্ত, পুরারি, ক্ষেমরাজ, আর লোহিত ভট্টের নাম করিয়াছেন। নারদ তাঁহার 'সঙ্গীত-মকরন্দে' অনেকগুলি সংগীত-শাস্ত্রকারের নাম করিয়াছেন। নামগুলি এই—

"সদাশিবো হরির্ব্রহ্মা ভরত কাশ্যপো মুনিঃ।
মতঙ্গো যশ্চ দুর্গা চ শক্তিশার্দূলকোহলাঃ॥
হনুমাংস্তুম্বুরুশ্চৈব অঙ্গদশ্চৈব নারদঃ।
এতে সাহিত্যসর্বজ্ঞা বুধাস্তালান্ প্রচক্রমুঃ॥

—নৃত্যাধ্যায়, ২য় পাদ, পৃঃ ৩১

'তেষাং ত্রীণি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠং মধ্যং তথাবরম্ ॥'—২.৯
বিকৃষ্ট প্রেক্ষাগৃহ 'জ্যেষ্ঠ' ('জৈ্যষ্ঠং বিকৃষ্টং বিজ্ঞেয়ম্'—২.১০)। এটি শুধু দেবতাদের জন্য নিরূপিত ('দেবানাং তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠম্' —২. ১২)। এই প্রেক্ষাগৃহ দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত[১] (অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠম্"—২.১১)। চতুষ্কোণ প্রেক্ষাগৃহ 'মধ্যম' ('চতুরস্রং তু মধ্যমম্'—২.১৪)। রাজারাজাদের জন্য এটি নির্ধারিত ('নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ'—২.১২)। ইহার দৈর্ঘ্য ৬৪ হাত (চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্—২.১১)।

ত্রিকোণ প্রেক্ষাগৃহ 'কনিষ্ঠ' ('কনীয়স্তু স্মৃতং ত্র্যস্রম্'—২.১৪)। ইহা সাধারণ লোকেদের জন্য নির্দিষ্ট ('শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে—২.১২)। এই প্রেক্ষাগৃহের প্রতিবাহুর পরিমাণ ৩২ হাত ('কনীয়স্তু তথা বেশ্ম হস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে'—২.১১)।

লোকে সচরাচর দৈর্ঘ্য ৬৪ হাত ও বিস্তারে ৩২ হাত নাট্যমণ্ডপ নির্মাণ করে। লম্বা চওড়ায় ইহার বেশী করা উচিত নয়; প্রেক্ষাগৃহের আয়তন ইহা অপেক্ষা বড় করিলে নাট্য অস্ফুট হইয়া পড়িবে। মণ্ডপ আরও বড় করিলে অভিনেতাদের আওয়াজ কিছুই শোনা যাইবে না, আর শোনা গেলেও শ্রোতাদের কাছে অভিনেতাদের স্বর বিস্বর বোধ হইবে। তা ছাড়া, অঙ্গভঙ্গী ও দৃষ্টি দ্বারা অভিনেতা যে সকল লাস্যগত ভাব দর্শকদের দেখাইতে চেষ্টা করিবে, আয়তন অত্যন্ত বড় হওয়ায় দূরস্থ দর্শকদের নিকট সে সমস্ত ভাব অস্পষ্ট, অব্যক্ত হইয়া পড়িবে; কাজেই প্রেক্ষাগৃহের আয়তন মধ্যম

---

১ আমরা সাধারণত হাত বলিলে যাহা বুঝি তাহা ধরিলে চলিবে না। এ মাপকাঠি অন্য রকম। অণু, রজ, বাল, লিখ্যা, যূকা, অঙ্গুলি, হস্ত ও দণ্ড—এই কয়টি দিয়া মাপ করিবার নিয়ম। ১ দণ্ড=৪ হস্ত, ১ যব=৮ যূকা, ১ বাল=৮ রজ, ১ হস্ত=২৪ অঙ্গুল, ১ যূকা=৮ লিখ্যা, ১ রজ=৮ অণু, ১ অঙ্গুল=৮ যব, ১ লিখ্যা=৮ বাল।

পরিমাণের হওয়া দরকার। আর তাহাতে 'পাঠ্য' ও গান ভালই শোনা যাইতে পারিবে।[১]

তারপর ভরত রঙ্গপীঠ (stage) তৈরি করিবার বিধি করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্বে বলিয়াছেন,—

"ভূমেবিভাগং পূর্বংতু পরীক্ষেত প্রয়োজকঃ।
"ততো বাস্তু-প্রমাণেন প্রারভেত শুভেচ্ছয়া"—২.২৭

প্রেক্ষাগৃহের ভূমিভাগ আগে পরীক্ষা করিয়া বাস্তুপ্রমাণ গৃহারম্ভ করা প্রয়োজন। নাট্যমণ্ডপ নির্মাণ করিবার উপযোগী ভূমি দেখিয়া তাহাতে নাট্যমণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। এইরূপ ভূমি পাঁচ রকমের—সম, স্থির, কঠিন, কৃষ্ণ ও শ্বেত।

"সমা স্থিরা তু কঠিনা কৃষ্ণা গৌরী চ যা ভবেৎ।
ভূমিস্তত্রৈব কর্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ॥"—২.২৮

তারপর ভূমিকে শোধন করিতে হইবে; লাঙ্গল দিয়া কর্ষণ করিয়া অস্থি, কীলক, কপাল, তৃণ ও গুল্মাদি উৎসারিত করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। তারপর

"শোধয়িত্বা বসুমতীং প্রমাণং নির্দিশেত্ততঃ।"—২.৩০

ছেদ নাই এমন রজ্জু দিয়া বিশেষ সাবধান হইয়া ভূমি মাপ করিবার ব্যবস্থা। মাপ করিবার নিয়ম এই—

১ ভরত ২য় অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"অত ঊর্ধ্বং ন কর্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।
যস্মাদব্যক্তভাবং হি তত্র নাট্যং ব্রজেদিতি॥ ২১
মণ্ডপে বিপ্রকৃষ্টে তু পাঠ্যমুখরিতস্বরম্।
অনিঃসরণধর্মত্বাদ্ বিস্বরত্বং ভৃশং ব্রজেৎ॥ ২২
যস্তু লাস্যগতো ভাবো নানাদৃষ্টিসমন্বিতঃ।
সর্বেভ্যো বিপ্রকৃষ্টত্বাদ্ ব্রজেদব্যক্ততাং পরাম্॥ ২৩
প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং তস্মান্ মধ্যমিষ্যতে।
যাবৎ পাঠ্যং চ গেয়ং চ তত্র শ্রব্যতরং ভবেৎ॥ ২৪

দড়ি দিয়া মাপিয়া ৬৪ হাত লম্বা জমি করিয়া লইতে হইবে। ইহাই হইবে মণ্ডপের দৈর্ঘ্য। তাহাকে আবার দুই ভাগ করিতে হইবে। এই দুই ভাগ করা ভাগের পিছনে যে ভাগ থাকিবে, তাহাকেও আধাআধি ভাগ করিতে হইবে। ইহারই একভাগে 'রঙ্গপীঠ' নির্মাণ করা হইবে।

এইবার মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, শঙ্খাদির ধ্বনি করিয়া গৃহ স্থাপন করা হয়। ইহার পর 'ভিত্তি-কর্ম'। ভিত্তিকর্ম শেষ হইলে 'স্তম্ভ-স্থাপন'।[১] শুভ সূর্যোদয়ে আচার্যের সাহায্যে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা উচিত।[২] সেই রাত্রে 'বলি'র ব্যবস্থা।

নাট্যশালা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ দর্শকদের বসিবার জন্য, অপর ভাগে রঙ্গ (stage)—এখানে অভিনয় হয়। দর্শকদের স্থান আবার স্তম্ভ দিয়া চিহ্নিত করা। সম্মুখে সাদা রঙের থাম। —নাম ব্রাহ্মণস্তম্ভ—এখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেহ বসিতে পারিবে না। তারপর ক্ষত্রিয়দের জন্য লাল রঙের থাম। উত্তর-পশ্চিমে হলদে রঙের স্তম্ভ এখানে বৈশ্যেরা বসিবে। উত্তর-পূর্বে নীলকৃষ্ণ স্তম্ভ। এটি শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট।[৩]

১ ভিত্তিকর্মাণি নির্বৃত্তে স্তম্ভানাং স্থাপনং ততঃ॥ ২.৪৬

২ আচার্যেন সুযুক্তেন কার্যং সূর্যোদয়ে শুভে॥ ২.৪৭

৩ এই স্তম্ভগুলি স্থাপন করিবার সময় কয়েকটি অনুষ্ঠান মানিয়া চলিবার কথা ভরত বলিয়াছেন। এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ভরতের উক্তি এই (২য় অধ্যায়)

প্রথমে ব্রাহ্মণস্তম্ভে সর্পিঃসর্ষপসংস্কৃতে।
সর্ব শুক্লো বিধিঃ কার্যো দত্তাৎ পায়সমেব চ॥ ৪৮
ততশ্চ ক্ষত্রিয়স্তম্ভে বস্ত্রমাল্যানুলেপনম্।
সর্বং রক্তং প্রদাতব্যং দ্বিজেভ্যশ্চ গুড়োদনম্॥ ৪৯
বৈশ্যস্তম্ভে বিধিঃ কার্যো দিগ্‌ভাগে পশ্চিমোত্তরে।
পীতং সর্বং প্রদাতব্যং দ্বিজেভ্যশ্চ ঘৃতাশনম্॥ ৫০
শূদ্রস্তম্ভবিধিঃ কার্যঃ সম্যক্‌পূর্বোত্তরাজয়ে
নীলপ্রায়ঃ প্রযত্নেন কৃশরা চ দ্বিজাশনম্॥ ৫১

ব্রাহ্মণস্তম্ভের নীচে সোনা, ক্ষত্রিয়-স্তম্ভের নীচে তামা, বৈশ্য-স্তম্ভের নীচে রূপা, আর শূদ্রস্তম্ভের নীচে লোহা দিতে হইবে।[১] কিন্তু সকল স্তম্ভের মূলে লোহা দেওয়া চাই-ই।[২] তারপর রঙ্গপীঠ করিবার নিয়ম। বসিবার আসনগুলি কাঠের ও ইটের। এগুলি থাক্ থাক্ করিয়া সারি দিয়া সাজানো থাকিত। সামনে রঙ্গের (stage) পাশে চারিটি স্তম্ভের উপর বারাণ্ডা—এটিও বোধ হয় সম্ভ্রান্ত দর্শকদের জন্য। দর্শকদের সম্মুখে রঙ্গ (stage) চিত্র ও মূর্তি দিয়া সাজানো। এটি একটি বর্গক্ষেত্র—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই-ই ৮ হাত করিয়া। রঙ্গের শেষ দিক্‌টার নাম—'রঙ্গশীর্ষ'। ইহাও নানা রকম মূর্তি দিয়া সাজানো। রঙ্গশীর্ষ ছয়টি কাঠের খুঁটি (স্থাণু) থাকা দরকার।[৩] এইখানে রঙ্গদেবতার পূজা হয়।[৪] রঙ্গশীর্ষের গর্ভ কালো রঙের মাটি দিয়া ভরাট করা।[৫] সেই মাটিতে কাঁকর বা ঢিল পাটকেল থাকিবার জো নাই।[৬]

রঙ্গপীঠ আদর্শতলবৎ করাই নিয়ম—কূর্মপৃষ্ঠের মতো অথবা মৎস্য-পৃষ্ঠাকার হইবে না।[৭] রঙ্গপীঠের উপর দিকে—মাথায় কতকগুলি

---

১ পূর্বোক্তব্রাহ্মণস্তম্ভে শুক্লমাল্যানুলেপনে।
নিক্ষিপেৎ কনকং মূলে কর্ণাভরণসংশ্রয়ম্॥ ৫২
তাম্রং চাধঃ প্রদাতব্যং স্তম্ভে ক্ষত্রিয়সঞ্জকে।
বৈশ্যস্য স্তম্ভমূলে তু রজতং সংপ্রদাপয়েৎ॥ ৫৩
শূদ্রস্য স্তম্ভমূলে তু দদ্যাদায়সমেব চ॥ ৫৪

২ আয়সং তত্র দাতব্যং স্তম্ভানাং কুশলৈরধঃ॥ ৫৫

৩ রঙ্গশীর্ষং তু কর্তব্যং ষড়্‌দারুকসমন্বিতম্॥ ৫৭

৪ ইত্যয়ং যো বিধিদৃষ্টো রঙ্গদৈবতপূজনে॥ ৩.৯৩

৫ কার্যং দ্বারদ্বয়ং চাত্র নেপথ্যগৃহকস্য চ। ২.৫৮

৬ পূরণে মৃত্তিকা চাত্র কৃষ্ণা দেয়া প্রযত্নতঃ॥ ৫৮

৭ কূর্মপৃষ্ঠং ন কর্তব্যং মৎস্যপৃষ্ঠং তথৈব চ॥ ৬১
শুদ্ধাদর্শতলপ্রখ্যং রঙ্গপীঠং প্রশস্যতে॥ ৬২

রত্ন বসাইতে হয়। যেখানে বসাইতে হয় সেই স্থানের নাম 'রঙ্গশির'। ইহার পূর্বদিকে হীরক, দক্ষিণে বৈদূর্য, পশ্চিমে স্ফটিক, উত্তরে প্রবাল, মধ্যে কনক দিতে হয়। এই রকম করিয়া রঙ্গশির তৈরি করিয়া তবে তাহাতে কাঠের কাজ করিতে হয়।[১] কাঠের কাজকে 'কারু-কর্ম' বলা হইত। কাঠে নানা রকম শিল্প-রচনা করিতে হইত। সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তু, অট্টালিকা, নানারকম পুতুল, বেদি, যন্ত্রজালগবাক্ষ, কুট্টিমের উপর স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া কাঠের কাজ শেষ করা হইত।[২]

রঙ্গের পিছনে 'যবনিকা'। এটি একটি রঙ্ করা পর্দা। ইহার নাম 'পটি' বা 'অপটি'। আরও দুইটি নাম আছে, 'তিরস্করণী'—'প্রতিশিরা'। যখন একজন তাড়াতাড়ি প্রবেশ করে, অপটি বেশ জোরে টানিয়া লওয়া হয়; ইহার নাম 'অপটিক্ষেপ'। যবনিকার রঙ সকল সময় লাল হইয়া থাকে। কোন কোন মতে যবনিকার রঙ প্রয়োজন অনুসারে নানা রকমের হইত। আদি রসে শুভ্র, বীররসে পীত, করুণ রসে ধূম্র, অদ্ভুত রসে হরিৎ, হাস্যরসে বিচিত্র, ভয়ানক রসে নীল, বীভৎস রসে ধূমল ও রৌদ্র রসে রক্তবর্ণের ব্যবস্থা কেহ কেহ করিতেন। কিন্তু কোন মতে আবার যবনিকা

---

১ বৈদূর্যং দক্ষিণে পার্শ্বে স্ফটিকং পশ্চিতে তথা।
প্রবালমুত্তরে চৈব মধ্যে তু কনকং ভবেৎ॥ ৬৩
এবং রঙ্গশীর্ষং কৃত্বা দারুকর্ম প্রয়োজয়েৎ।
উহপ্রত্যূহসংযুক্তং নানাশিল্পপ্রয়োজিতম্॥ ৬৪

২ নানাভঙ্গোবরোপেতঃ বহু ব্যালোপশোভিতম্।
অট্টালভঞ্জিকাভিশ্চ সমন্তাৎ সমলঙ্কৃতম্॥ ৬৫
নির্য্হকুহরোপেতং নানাগ্রথিতবেদিকম্।
নানাবিন্যাসসংযুক্তং যন্ত্রজালগবাক্ষকম্॥ ৬৬
সুপীঠধরণীযুক্তং কপোতালীসমাকুলম্।
নানাকুট্টিমবিন্যস্তৈঃ স্তম্ভৈশ্চাপ্যুপশোভিতম্॥ ৬৭

সকল ক্ষেত্রেই লাল। আজকাল অভিনয়ারম্ভের পূর্বে প্রতি অঙ্কের শেষে যবনিকা দিয়া রঙ্গের সম্মুখ ভাগ ঢাকিয়া রাখা হয়। পুরাকালে যবনিকা দুই ভাগে বিভক্ত থাকিত। কোন ভূমিকায় অভিনেতার প্রবেশের সময় যবনিকার দুইটি খণ্ড দুইটি সুন্দরী কুমারী দুই পাশ দিয়া গুটাইয়া লইত। এখনকার মতো কপিকলের সাহায্যে ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেওয়া হইত না। এই সুন্দরীদ্বয়ের কাজ ছিল যবনিকা ধরিয়া থাকা। পর্দার পিছনে 'নেপথ্যগৃহ'। ইহা সাজঘর— অভিনেতাদের অধিকৃত। নেপথ্যগৃহ হইতে দৈববাণীর ব্যবস্থা করা হয়। একসঙ্গে অনেকের উচ্চ-কণ্ঠধ্বনি প্রভৃতি এইখান হইতেই করা হইয়া থাকে। যে সকল অভিনেতার রঙ্গে উপস্থিতি অসম্ভব বা অনভিপ্রেত তাহাদের কণ্ঠস্বর এইখান হইতেই উচ্চারিত হইত। নেপথ্যগৃহের দুইটি পীঠদ্বার করিতে হয়। সাজঘর ও রঙ্গপীঠের মাঝখানে দুইটি দরজা দিয়া সাজঘর হইতে রঙ্গপীঠে প্রবেশ করিতে হয়। নেপথ্য বলিতে যদি রঙ্গের অপেক্ষা উন্নত কোন স্থান কেহ বোঝেন, তাহা হইলে তিনি ভুল করিবেন। কেননা, ব্যুৎপত্তি অনুসারে (নি-পথ) নেপথ্য বলিতে নিম্নগামী পথই বোঝায়। নেপথ্য রঙ্গাপেক্ষা নিম্নভূমিতে অবস্থিত।

সাধারণত নেপথ্য রঙ্গের কিছু উঁচু হয়। তাই অভিনেতাদের রঙ্গে প্রবেশ করার নাম 'রঙ্গাবতারণ। রঙ্গাবতারণ বলিতে সহসা মনে হইতে পারে, যেন কোন উচ্চ স্থান হইতে রঙ্গে নামিয়া আসা হইয়াছে। এটি ভুল।

রঙ্গ হইতে নেপথ্যে যাইবার দুইটি দ্বার থাকিত। অর্কেস্ট্রার স্থান এই দ্বারদ্বয়ের মধ্যেই ছিল।

"কার্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ।"—২.৬৯

নাট্যমণ্ডপের আকার পর্বতগুহার মতো হইত ; আর দোতলা (দ্বিভূমি) হইত। দোতলা হইবার সার্থকতা এই যে, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষের অভিনয় উপরের তলায়, আবার মর্ত্যভূমির যা কিছু

অভিনয় সমস্তই নীচের তলায় হইত। রঙ্গপীঠের বাতায়ন ছোট ছোট হইত। নহিলে বাদ্যযন্ত্র ও অভিনেতাদের 'গম্ভীরস্বরতা' নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।[১] নির্বাত ধীর শব্দস্থান হইতে স্বর গম্ভীরতর হইয়া বাহিরে শোনায়। কাজেই বাতাস বেশী চলা-ফেরা না করিতে পারে এইরূপ করিয়া জানালা তৈরির দরকার। প্রাচীর ভিত্তি শেষ হইলে 'ভিত্তিলেপ' (plastering) করা হইত। তারপর চুনকাম করাকে 'সুধাকর্ম' বলিত।[২] ভিত্তি বেশ সমানভাবে মাজাঘষা হইলে তাহাতে নানা রকমের চিত্র, লতাবন্ধ, স্ত্রীপুরুষ রচনা করা হইত।[৩]

নাট্যমণ্ডপ নির্মাণের এই গেল সাধারণ পদ্ধতি।

তারপর চতুরস্রমণ্ডপের বিশেষ লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। চতুরস্রমণ্ডপ চার কোণা, আর চারিদিকেই ৩২ হাত।[৪]

---

১ মন্দাবাতায়নোপেতো নির্বাতো ধীরশব্দবান্।
তস্মান্নিবাতঃ কর্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ॥ ৭০
গম্ভীরস্বরতা যেন কুতপস্য ভবিষ্যতি॥ ৭১

২ ভিত্তিকর্মবিধিং কৃত্বা ভিত্তিলেপং প্রদাপয়েৎ। ৭১
সুধাকর্মবিধিস্তস্য বিধাতব্যঃ প্রযত্নতঃ।
ভিত্তিষথ বিলিপ্ত্যাসু পরিমৃষ্টাসু সর্বতঃ॥ ৭২

৩ সমাসু জাতশোভাসু চিত্রকর্ম প্রযোজয়েৎ।
চিত্রকর্মাণি চালেখ্যাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীজনস্তথা॥ ৭৩
লতাবন্ধশ্চ কর্তব্যাশ্চরিতং চাত্মভোমজম্ (?)। ৭৪

৪ সমন্ততশ্চ কর্তব্যা হস্তা দ্বাত্রিংশদেব তু। ৭৫
বাহ্যতঃ সর্বতঃ কার্যা ভিত্তিঃ শ্লিষ্টেষ্টকাদয়ঃ।
তত্রাভ্যন্তরতঃ কার্যং (র্যা) রঙ্গপীঠং পরিস্থিতা॥ ৭৮
দশ প্রযোক্তৃভিঃ স্তম্ভা শস্তা মণ্ডপলক্ষণে।
স্তম্ভানাং বাহ্যতশ্চাপি সোপানাকৃতিপীঠকম॥ ৭৯
ইষ্টকাদারুভিঃ কার্যং প্রেক্ষকাণাং নিবেশনম্।

বাহিরের চারিদিকে ইটের দেওয়াল রচনা করিয়া, ঘিরিয়া ভিতরে রঙ্গপীঠ নির্মাণ করা হইত। রঙ্গপীঠের চারিদিকে দশটি স্তম্ভ থাকিত। এই স্তম্ভের বাহিরে দর্শকদিগের বসিবার জন্য আসন তৈরি করা হইত। আসনগুলির আকার হইত সিঁড়ির মতো। এগুলি হয় কাঠের নয় ইটের। এক এক পঙ্‌ক্তি বা সারি অপর পঙ্‌ক্তির চেয়ে এক হাত উঁচু করিয়া সাজানো হইত।

এই দশটি স্তম্ভ ছাড়া মণ্ডপের অন্যান্য দিকে আর দশটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হইত। স্তম্ভগুলির উপর আট হাত পরিমাণ পীঠ নির্মাণ করার রীতি ছিল। ঐ স্তম্ভগুলি শাল কাঠের তৈরি, আর সেগুলি স্ত্রীমূর্তি দিয়া অলঙ্কৃত থাকিত। এই ছয়টি স্তম্ভের নাম—'ধারণী-ধারণ'। ইহার পর নেপথ্যগৃহ। ইহাতে একটি মাত্র দ্বার। এ ছাড়া রঙ্গের দিকে আর একটা 'জনপ্রবেশন' দ্বার থাকিত। এই রঙ্গপীঠ সবসুদ্ধ ৮ হাত। ইহা চতুরস্র ও সমতল। ভিতরে একটি বেদিকা দিয়া সাজানো থাকিত। তার পাশ দিয়া 'মত্তবারণী' বাহির করা হইত। মত্তবারণী বেশ চিত্র করা বারাণ্ডা। বারাণ্ডা

হস্তপ্রমাণৈরুৎসেধৈর্ভূমিভাগ মুত্থিতৈঃ ॥ ৮০

অষ্টৌ স্তম্ভান্ পুনশ্চৈব তেষামুপরি কল্পয়েৎ ॥ ৮২

বিদ্ধাস্তমষ্টহস্তং চ পীঠং তেষু ততো ন্যসেৎ।

তত্র স্তম্ভাঃ প্রদাতব্যাস্তজ্জৈর্মণ্ডপধারণে ॥ ৮৩

ধারণীধারণাস্তে শালস্ত্রীভিরলংকৃতাঃ।

নেপথ্যগৃহকং চৈব ততঃ কার্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৮৪

দ্বারং বৈকং ভবেত্তত্র রঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ।

জনপ্রবেশনং চান্যদাভিমুখ্যেন কারয়েৎ ॥ ৮৫

রঙ্গস্যাভিমুখং কার্যং দ্বিতীয়ং দ্বারমেব তু।

অষ্টহস্তং তু কর্তব্যং রঙ্গপীঠং প্রমাণতঃ ॥ ৮৬

চতুরস্রে (শ্রং) সমতলং বেদিকাসমলংকৃতম্।

পূর্বপ্রমাণনির্দিষ্টা কর্তব্যা মত্তবারণী ॥ ৮৭

ধারণ করিবার জন্য চারিটি স্তম্ভের ব্যবস্থা থাকিত ; ইহার পর রঙ্গশীর্ষ। ত্র্যস্র-মণ্ডপ ত্রিকোণ। ইহার মাঝখানে ত্রিকোণ রঙ্গপীঠ। দরজাও ত্রিকোণ। রঙ্গপীঠের পিছনে আর একটি দরজা থাকিত। সম্মুখে ভিত্তির উপর স্তম্ভ।

স্ত্রীলোকেরা অভিনয় দেখিতে আসিত কি না ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে বুঝিবার উপায় নাই। দর্শকেরা কি ভাবে বসিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে তাহার একটা মোটামুটি খবর আছে। পরে প্রেক্ষক পরিষদের ব্যবস্থা কিছু বদলাইয়া যায়। 'অর্জুনভরতে' তাহার বর্ণনা আছে। এইখানি একখানি খুব প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের বই। কত প্রাচীন তাহা জানি না। ইহাতে আছে যে নাট্যমণ্ডপের পূর্বদিকে বসিবেন রাজা অথবা যাঁহারা সংগীতবিদ্যার সমঝদার। পূর্বভাগে আরও কয়েকজনের বসিবার আসন থাকিবে। তাঁহাদের নাম—ন্যূনাধিক্য বিবেচক, মার্গদেশী, বিভাগবিৎ, সানন্দচিত্ত রসালঙ্কারাভিজ্ঞ, কলা-নাট্যকুশল, অভিনয়-চেতা, গুণদোষজ্ঞ, অন্যাভিপ্রায়জ্ঞ, ক্ষমাঙ্কশীল সভাপতি। দক্ষিণে বসিবেন ব্রাহ্মণেরা, উত্তরে বসিবেন অমাত্যরা আর বালকগণ ; ভিত্তির পাশে রমণীদের স্থান, সভাপ্রান্তে বসিবেন বন্দী, স্তাবক, রাজা বা সভাপতির দেহরক্ষী। অন্যান্য দর্শকদেরও বসিবার জায়গা এই খানেই। যাহারা অভিনয় বোঝে না এমন লোকেদের মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। শুকমত একজন সংগীতরসজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, নাম 'সঙ্গীত দামোদর'। এই গ্রন্থে নাট্যমণ্ডপ তৈরি করিবার একটি পদ্ধতি মোটামুটিভাবে দেওয়া আছে। পদ্ধতিটি এই—

"হস্তবিংশতি-বিস্তারা রঙ্গভূমির্মনোহরা।
পূর্বাভিমুখ এবাত্র নায়কঃ শোভতে পরম্॥
পশ্চিমাভিমুখিনাং বা রম্যানাং ভূষণান্তরৈঃ।
নায়কাভিমুখীনাঞ্চ গয়ন্তীনাং পরস্পরম্॥

তালে কৃতাবধানানাং নটীনামুপবেশয়েৎ।
পশ্চিমে চোভয়েস্তালাং মৃদঙ্গানাং চতুষ্টয়ম্॥
দক্ষিণে মুরজস্থানং পৃষ্ঠে যবনিকা তথা।
তন্মধ্যে মণ্ডলস্থানং নেপথ্যং তচ্চ গীয়তে॥"

অর্থাৎ রঙ্গভূমি চওড়ায় কুড়ি হাত হইবে। অভিনয়ে নায়ককে পূর্বাভিমুখে থাকিতে হইবে। নায়ক যে দিকে মুখ করিয়া থাকিবেন, নায়িকারা সেই দিকেই মুখ করিয়া বসিবেন। তালজ্ঞা নটীদেরও বসানো হইবে। ইহাদের দুই পাশে বাদ্যস্থান। চারিটি মৃদঙ্গ থাকা চাই। দক্ষিণে তূর্যস্থান, পৃষ্ঠে যবনিকা। তাহার ভিতর নেপথ্য।

যোধপুর দরবার লাইব্রেরিতে একখানি হস্তলিখিত নাট্যশাস্ত্র আছে। গোড়াও নাই, শেষও নাই। নাম বুঝিবার উপায় নাই। এই গ্রন্থে নাট্যমণ্ডপ নির্মাণের একটি পদ্ধতি দেওয়া আছে। এই বই-এর মতে নাট্যমণ্ডপের মাপ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান হওয়া চাই। আর দুই দিকেই ২০ হাত করিয়া মাপিয়া লইতে হইবে। রঙ্গপীঠ শক্ত কাঠ দিয়া তৈরি করিতে হইবে। মণ্ডপের তোরণ-ধ্বজ কুম্ভ পতাকা দিয়া সাজানো। অধোভাগ চকচকে সাদা। কুট্টিম এমন করিয়া তৈরি করিতে হইবে যেন পা পিছলাইয়া না যায়। নেপথ্য একেবারে পিছনে।

'শিল্পরত্ন' পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক একখানি পুরাতন উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাতেও নাট্যমণ্ডপের পদ্ধতি আছে। ভরত ব্যতীত আর কোন বই-এ এত খুঁটিনাটি বর্ণনা নাই। ইহার পদ্ধতি ভরতেরই অনুরূপ। শিল্পরত্নে যে সব পরিভাষা দেওয়া আছে সেগুলির মানে ঠিক বোঝা যায় না। অনেক কষ্টকল্পনা করিতে হয়। মাঝে মাঝে অর্থবোধও হয় না। তাহা না হইলেও একটা ধারণা করিতে পারা যায়। যাহা তাহা একটা তর্জমা না দিয়া শ্লোকগুলি হুবহু নিম্নে তুলিয়া দেওয়া গেল—

"পর্যন্তে প্রতিযোনি ভাজি বহিরুখে বোত্তরস্থাথবা
সূত্রস্থে দলিতে ততো বিভজিতে সম্যক্ চতুবর্গ কৈঃ।
স্থাদংশাঃ পদকায়তিস্ত বিততির্দ্বাভ্যাং পদাভ্যাং যুতং
তচ্ছিষ্টা ততিরুত্তরং নটনধাম্নো দ্বিত্রি সংখ্যংমতম্॥
পদং তিস্রঃ স্তপ্যো বিততিদলস্যোত্তরতলা
হ্যপর্যুথাধঃ স্যাদ্দিপদমিতি মতস্তু চরণঃ
পদং চাধিষ্ঠানং পনগণয়ালিন্দ চরণা
স্তরাপ্যারূটাথায়াহুখিলমুচিতং মণ্ডপমপি (?)॥
একৈকাষ্টসু দিক্ষু পার্শ্বযুগগে দ্বে দ্বে চ ভাগদ্বয়ে
দ্ব্যষ্টৌ দীর্ঘলুপা বিদিগ্ গ্তলু পাস্বা বদ্ধমূলাঃ পুনঃ।
কল্প্যা শ্ছেদেলুপাদ্বয়ীষু সমলক্ষান্তাসু (?) কোণোন্মুখা
দ্বেধা সর্বলুপান্তরং তু পদমাত্রং চিত্রপট্ট্যজ্জ্বলম্
রঙ্গং স্বযোনিপরমার্ধ ইহার্ণবাশ্রং
বেদাঙ্ঘ্রিরুত্তরলুপাহ্যচিতাঙ্গশোভি।
পশ্চাণ্ম্ দঙ্গপদমস্য ততোঽপি পশ্চা
ন্নৈপথ্যধাম চ বিভাগবিদা নিধেয়ম্॥
রঙ্গস্য নীপ্রবিততিঃ সমসীম্নি মধ্য
স্তূপ্যা সমূলসদনস্য তু পশ্চিমায়াম্।
স্তুপী চ সঙ্গমবশাদ্ কুশলেন কল্প্যা
প্রায়েণ ভারবিততিঃ শ্রুতিহস্তদৈর্ঘ্যা।
অথবাষ্টাবিংশতিভিশ্চতারিংশতিভি পুনঃ
বিংশদ্ভির্বাথ বিভজেত্ পর্যন্তোঽর্ধ পদান্তয়ে॥
দেবস্যাগ্রে দক্ষিণতঃ রুচিরে নাট্যমণ্ডপে
নাহার্ধে চতুর্বিশাংশে বিস্তারং দশভাগতঃ॥
ষোড়শাংশে ষড়ংশং বা কুর্যাদ্বাঃ সুরমন্দিরে।
মানুষ্য রাজ ধাম্নদৌ যুক্ত্যা লক্ষণসংযুতম্।
সর্বং সমাচরেন্নাট্যমণ্ডপেষু যথোচিতম্॥—পৃঃ ২০১-২০২

রঙ্গপীঠ বা stage-এর সম্মুখ ভাগ দর্শকদের জন্য খোলা থাকিত। দুই দিক হইতে দুইখানি বেশ চিত্র করা পর্দা আনিয়া মাঝখানে মিলাইয়া দিয়া back ground করা হইত। নেপথ্য বা সাজঘর পর্দা ঠিক পিছনে থাকিত। অভিনেতাকে যখন দর্শকদের কাছে আসিতে হইত, ভৃত্য তখন পিছন হইতে দুইপাশে গুটাইয়া টানিয়া লইয়া পর্দা দুইটি ফাঁক করিয়া দিত। কোন কোন নাট্য-শাস্ত্রকার বলেন, দুইটি সুন্দরী যুবতীই এই কার্য করিত। এই পর্দার পারিভাষিক নাম—পটি, অপটি, তিরস্করণী, প্রতিশিরা। তখন কোন দৃশ্যপটের ব্যবহার ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। অভিনেতাকে ভঙ্গী দ্বারা দৃশ্যপটের কাজ সারিয়া হইতে হইত। নাট্যশাস্ত্রে, 'অপটিখোপেন' পদ আছে, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, যবনিকার ব্যবহার ছিল। যবনিকা শব্দের প্রয়োগও সংগীতশাস্ত্রে পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকেও যবনিকা শব্দ আছে। তাই দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, সংস্কৃত নাটক গ্রীক নাটকের অনুকরণে রচিত। কিন্তু একমাত্র 'যবনিকা' শব্দে এইরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। বিশেষত বৈয়াকরণেরা 'যবনিকা' শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—'যুমি ভ্রমণে'। অভিনেতারা ইহার পিছনে সমবেত হয় বলিয়া ইহার নাম 'যবনিকা' দেওয়া হইয়াছে। 'যবনিকা' শব্দের ব্যুৎপত্তি 'যবন' শব্দ হইতেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যবন বলিলে তো শুধু গ্রীকদেরই বুঝায় না। যবনিকা—যবন হইতে ব্যুৎপন্ন একথাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। কেবল এক 'যবনিকা' শব্দ ব্যতীত সারা নাট্য-সাহিত্যে আর এমন কোন শব্দ নাই যাহার উৎপত্তি বিদেশী ভাষা হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

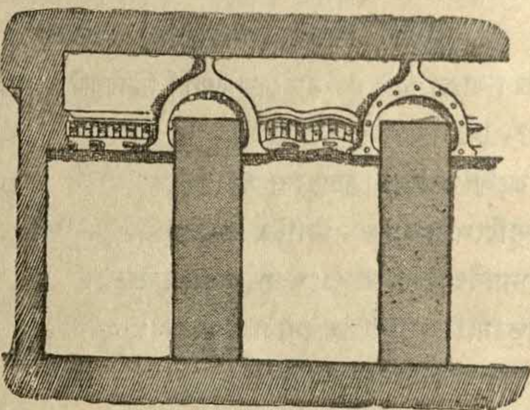
প্রাচীন ভারতে অভিনয়ের জন্য যে রকম রঙ্গমঞ্চ তৈরি হইত তাহার যথাসম্ভব চিত্র আমরা দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা ছাড়া রাজপ্রাসাদে একটি করিয়া সংগীতশালা থাকিবার প্রথা ছিল।

ইহার নাম ছিল 'নাট্যশালা'। সেইখানেই অভিনেতাদের নিজেদের কাজ চালাইতে হইত। এই নাট্যশালা কেমন করিয়া তৈরি করা হইত তাহার এক চিত্র নারদ তাঁহার 'সঙ্গীত মকরন্দে' দিয়াছেন। তিনি বলেন, নাট্যশালার আকার হইবে চতুরস্র। আর মাপ ৮৬ হাত। নাট্যশালায় নানা রকমে চিত্রিত করা ২৪টি স্তম্ভ থাকিবে, সুদৃশ্য ৮৪টি বন্ধ থাকিবে। নানা রত্ন, পট, বস্ত্র, চামর সেখানে থাকিবে। এই নাট্যশালার ৪টি দরজা। নাট্যশালার ভিতর ৪টি দরজা। নাট্যশালার ভিতর ২৪ হাত রমণীয় বেদিকা থাকা চাই। নারদের সম্পূর্ণ বিবরণটি আমরা নীচে তুলিয়া দিলাম।

"ষড়শীতি হস্তমাত্রচতুরস্র সমন্বিতা।
চতুর্বিংশতিকস্তম্ভ নানাচিত্র সমন্বিতা।২
নানাবিকারসম্পন্ন প্রাকারা চিত্রশোভিতা।
চতুরনীতিবন্ধাশ্চ লেখনীয়া মনোহরাঃ।৩
রত্নৈরনেকৈর্বিবিধৈঃ পট্টবস্ত্রৈশ্চ চামরৈঃ
পতাকতোরণৈর্যুক্তা চতুর্দ্বারাদিসংযুতা ॥৪
মধ্যেতু বেদিকারম্যা চতুর্বিংশতিহস্তকা।
কার্যা সর্বগুণোপেতা নানাপরিমলান্বিতা ॥৫
অনেন বিধিনা কার্যা নাট্যশালা মনোহরা।
তল্লক্ষণং নহি কৃতং রাজ্ঞাং দোষমবাপ্নুয়াৎ ॥৬
তস্মাং মনোহরং রম্যং সিংহাসনমনর্ঘকম্।
তদগ্রে ফলপুষ্পানি স্থাপয়িত্বা বিরাজিতম্ ॥৭

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পর্বতগুহাকারে নাট্যমণ্ডপ নির্মাণ করা হইত। প্রাচীনকালে গুহা যে নাট্যশালার জন্য ব্যবহৃত হইত তাহার প্রমাণ আছে। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের রামগড়ের গুহা-লিপিতে স্পষ্ট লেখা আছে যে, 'প্রেক্ষাগৃহ' নাট্যাভিনয়ের জন্য নির্মিত ছিল। কখনও কখনও নাট্যাভিনয়ের জন্যই পৃথক গৃহের

বন্দোবস্ত থাকিত। এরূপ ঘরের নাম ছিল 'প্রেক্ষাগৃহ'। পালি-সাহিত্যে ইহার নাম 'পেক্‌খ'। 'সমন্তপাসাদিকা' ও 'সুমঙ্গল-বিলাসিনী'তে প্রেক্ষাগৃহ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ১৭৯২ সালে সরকার বাহাদুরের সুরগুজার উপর প্রথম নজর পড়ে। তখন হইতে উসলী, ডালটন, বল, বেগলার, কানিংহাম প্রভৃতি অনেকেই সুরগুজায় রামগড় পাহাড় দেখিয়া বিবরণ প্রকাশ করেন। পরে



নাসিকের গুহা প্রাচীর (১৪নং গুহা)

ডক্টর ব্লথ সুরগুজায় রামগড় পাহাড়ে 'সীতাবেঙ্গরা' ও 'যোগীমারা' নামক দুইটি গুহার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই দুইটি যে প্রেক্ষাগৃহ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। নাট্যশালা যে পর্বতগুহার আকৃতিবিশিষ্ট হইবে ইহার উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রেও আছে। গুহাতে যে শুধু যোগীরা ধ্যানই করিতেন তাহা নয়; নাচ গান আমোদের জন্য প্রাচীন কালে এগুলির যে ব্যবহার ছিল কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার সাহিত্যিক প্রমাণও আছে। অধ্যাপক লুডের্স কতকগুলি এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন (Indian Antiquary, ৩৪ খণ্ড, পৃ° ১৯৯-২৮০)। অধ্যাপক লুডের্স কতকগুলি এইরূপ প্রমাণের উল্লেখ করিতেছেন।

হিমালয়-বর্ণনায় মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবে (১.১০) দরীগৃহের কথা বলিয়াছেন। এই সকল গুহাগৃহে রজনীযোগে বনচরগণ সংগীতে সুরতোৎসব করিত।

"বনেচরাণাং বনিতাসখাণাং দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ ॥"

তারপর তিনটি শ্লোকের পরে (১.১৪) কবি বলিয়াছেন,—

এই গিরিবরের গুহাগৃহের মধ্যে কিন্নর ও কিন্নরীরা বিহার করিয়া থাকে, কিন্নরগণ ক্রীড়াকালে কিন্নরীদের বসনবিহীন করিলে তাহারা লজ্জিত হয়। মেঘ তখন গৃহদ্বারের সম্মুখে সহসা যবনিকার ন্যায় লম্বমান হইয়া তাহাদের লজ্জা নিবারণ করে।

"যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্।
দরীগৃহোৎসঙ্গবিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি ॥"

কালিদাসের এই সমস্ত বর্ণনায় কল্পনার যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও সত্যের আভাস পাওয়া যায়। কালিদাস যদি গুহাগৃহে আমোদ-প্রমোদ হওয়ার কথা না জানিতেন তাহা হইলে কখনও তিনি গুহাগৃহের এরকম বর্ণনা দিতেন না। তারপর তিনি মেঘদূতে (১.২৬) বিদিশার নিকট একটি পাহাড়ের 'শিলাবেশ্মে' আমোদ-প্রমোদের কথা বলিয়াছেন।

মেঘের প্রতি উক্তি—

তুমি বিশ্রামের জন্য বিদিশার সমীপবর্তী রামগিরিতে অবস্থান কর, সেইখানে অসংখ্য কদম্বকুসুম বিকসিত হওয়াতে বোধ হইবে যেন তোমার সঙ্গে আসিতেই গিরিবরের রোমাঞ্চ সঞ্চার হইয়াছে। ঐ পাহাড়ের কন্দর সকল পণ্য-স্ত্রীদের রতিপরিমলগন্ধ বিস্তার দ্বারা নাগরিকদের যৌবন প্রকাশিত করিয়া দিবে।

"নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-
স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণা-
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥"

ঔরঙ্গাবাদে একটি বৌদ্ধ গুহাতে একেবারে মন্দিরেই নাচের যে ব্যবস্থা ছিল, নীচের ছবিটি দেখিলেই বেশ উপলব্ধি হইবে (Arch. Surv. Western India, vol. iii, pl. liv., fig. 5)।



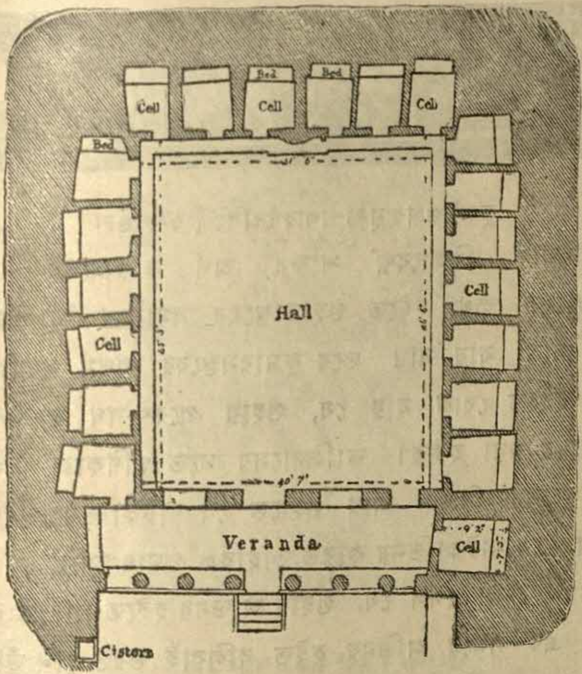
মন্দিরে নৃত্য

নাসিকেও এই রকম নাচ গানের জন্য ব্যবহৃত দুইটি গুহা আছে। আজও গুহা দুইটি দেখিলে দর্শকের চোখে নৃত্যগীতের দৃশ্য জীবন্ত ভাবে ফুটিয়া ওঠে। জুনাগড়ের উপর কোট গুহার দৃশ্য আমাদের



'কুদা'-গুহার একটি চিত্র (৬নং গুহা)

এই কথাই সপ্রমাণ করিয়া দেয়। কুদা ও মহাড়ের গুহাতেও নাচ-গানের ব্যবস্থা ছিল। শুধু তাহাই নয়, দেখা যায় এই গুহা দুইটির তিন ধারে বসিবার আসনের যেরূপ বন্দোবস্ত তাহাতে এই গুহা দুইটি সম্ভবত অভিনয়ের জন্য ব্যবহৃত হইত (ফার্গুসন ও বর্জেস



নাসিকের একটি গুহার নকশা

সংকলিত 'Cave Temples' pls. IV, V, I ; XIX, XXVI etc. এবং Arch. Surv. Western India, vol. iv, pls. VII-X)।

মথুরার একটি প্রাচীন শিলালিপিতে একজন গণিকার দানের ফিরিস্তি আছে। এই গণিকার নাম 'নাদা'। নাদা শিলা-লিপিতে আপনাকে 'লেনশোভিকা দন্দা'র কন্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'লেনশোভিকা' শব্দের অর্থ 'গুহাভিনেত্রী'। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কংশবধ' ও 'বলিবন্ধ' নাটকাভিনয়-প্রসঙ্গে "যে অভিনয় করে"

এই অর্থে 'শোভিকা' শব্দের উল্লেখ আছে, (পাণিনি, ৩. ১. ২৬; বার্ত্তিক ১৫)। গুহাতে শুধু মুনি ঋষিরা থাকিতেন না, গণিকারা লেনশোভিকারা—আর তাহাদের প্রণয়াস্পদেরাও থাকিত।



'কুদা'-গুহার নৃত্যশালার রেলিং (৬নং গুহা)

মল্লিনাথ 'শিলাবেশ্ম' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'কন্দর'। কালিদাসের লেখা হইতে গুহাভ্যন্তরের সমাবেশ কি রকম ছিল তাহা বোঝা যায় না। তবে কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গের চৌদ্দ শ্লোক হইতে বোঝা যায় যে, গুহায় প্রবেশ-পথ যবনিকা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইত। কালিদাসের মতে গণিকারা এই সমস্ত গুহায় বাস করিত। আর গুহাতে যে নাটকাভিনয় হইত, আর গণিকারা যে নাটকাভিনয় করিত তাহারও প্রমাণ আছে।

এখন দেখা গেল যে, গুহায় অভিনয় হইতে পারিত। আর গুহায় এক সময়ে অভিনয় হইত বলিয়াই ভরত মুনি তাঁর নাট্য শাস্ত্রে (২.৬৯) লিখিয়াছেন যে, নাট্যমণ্ডপ 'শৈলগুহাকার' হওয়া দরকার।

"কাক্ষ্যায়সং প্রতিদ্বারং দ্বারবিদ্ধং ন কারয়েৎ।
কার্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ॥

দশকুমার-চরিতেও (বম্বে সং—পৃ° ১০৮, ১৪, পিটার্সন-সং—পৃ° ১০, ২৩) এই একই কথা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

রামগড়ের গুহায় এইরূপ নাট্যশালার ব্যবস্থা আছে। একটা রীতি আছে যে, রঙ্গালয়ে যক্ষলিপি থাকিবে। এই স্থানে সীতা-বেঙ্গরা গুহাতেও একটি লিপি আছে। খুব সম্ভবত তাহা যক্ষলিপি।

সীতাবেঙ্গরা গুহার প্রবেশপথের উত্তর পার্শ্বে গুহার ছাদের ঠিক নীচেই একটি খোদিত লিপি আছে। লিপিটি মাত্র দুই ছত্র। প্রতি ছত্র তিন ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। এক একটি অক্ষর প্রায় ২॥ ইঞ্চি। দুইটি ছত্রেরই শেষের দিককার অক্ষরগুলি সিমেণ্টে বুজিয়া গিয়াছে।



'কুদা'-গুহার আর একটি চিত্র (৬নং গুহা)

ব্লখ সাহেবের ধৃত পাঠ এইরূপ ঃ

(১) অদিপয়ন্তি হৃদয়ং সভাব-গরু কবয়ো এরাতয়ং……

(২) দুলে বসংতিয়া হাসাবানূভূতে কুদস্ফতং এবং অলং গ [ত]

এই শ্লোকের তিনি তর্জমা করিয়াছেন তাহা এই—"Poets venerable by nature kindle the heart who..."

"At the swing festival of the vernal full moon, when frolics and music abound, people thus (?) tie (around their necks garlands) thick with jasmine flowers."

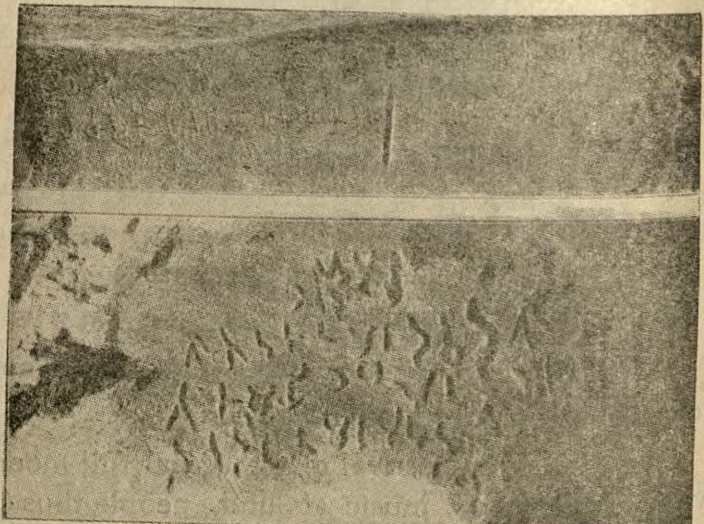
ইহার পর যোগীমারা গুহায় যে লিপি আছে ব্লথ তাহারও পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার ধৃত পাঠ এই :

(১) শুতনুক নম
(২) দেবদাশিক্যি
(৩) শুতনুক নম। দেবদাশিক্যি
(৪) তং কময়িথ বল ন শেয়ে
(৫) দেবদিনে নম। লুপদখে।

এই কথাগুলির ব্লথ সাহেবের অনুবাদ এইরূপ—

(1) "Sutanuka by name,"
(2) "A Devadasi
(3) "Sutanuka by name, a Devadasi
(4) "The excellent among young men loved her
(5) "Devadinna by name, skilled in sculpture."

উপরে ব্লথ সাহেবের গৃহীত এই সকল লিপির প্রতিলিপি দেওয়া হইল—



সীতাবেঙ্গরা ও যোগীমারা গুহার খোদিত লিপি

বোইয়ে (A. M. Boyer) কিন্তু উপরের দুইটি লিপির অন্যরূপ পাঠ করিয়াছেন। তাঁহার ধৃত পাঠ নিম্নে দেওয়া হইল :

১। অদিপয়ন্তি হৃদয়ং। স [ধা] ব গরক [ঃ] বয়ো
এতি তয়ং……দুলে বসং তিয়া
হি সাবানুভূতে কুদস ততং এব অলং গ [তা]

২। সুতনুকা নম। দেবদাশিক্যি
তং কময়িথ বলু ন শেয়ে
দেবদিনে নম। লুপ দখে।

[Journal Asiatique, Xieme Ser, tom. iii, p. 478]

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ-দুইটি লিপির পাঠ অন্যরূপ করিয়াছেন। যদিও তিনি তাঁহার পাঠ দেন নাই, কিন্তু যে অনুবাদ দিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার পাঠ যে ভিন্ন তাহা বেশ ধরা যায়। নিম্নে তাঁহার কৃত অনুবাদ দিলাম।

প্রথম লিপির শাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদ :

'I salute the beautifully formed one who shows us the gods. I salute the beautiful form that leads us to the gods. He is much in quest at Varanasi. I salute the god-given one for seeing his beautiful form."

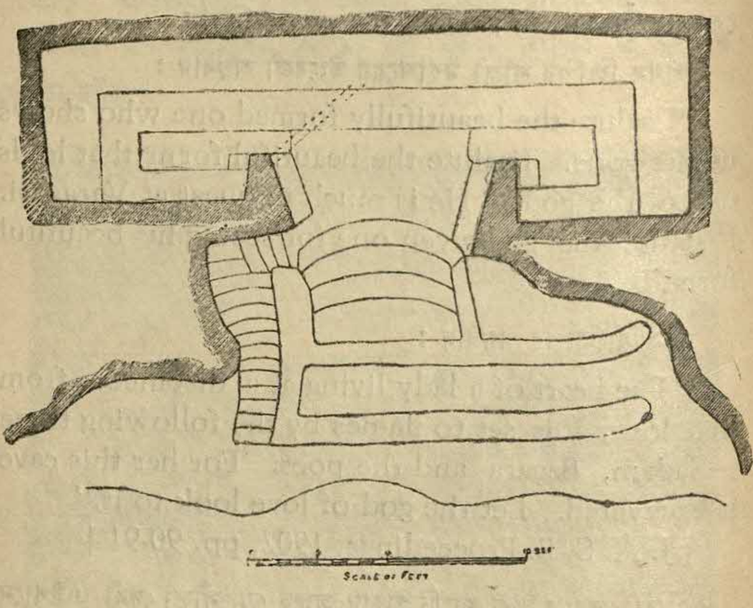
দ্বিতীয় লিপির অনুবাদ :

"The heart of a lady living at a distance (from her lover) is set to flames by the following three —Sadam, Bagara and the poet. For her this cave is excavated. Let the god of love look to it."

[J. A. S. B. Proceedings, 1902, pp. 90-91]

সীতাবেঙ্গরা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, সীতা দেবী এইখানে বাস করিতেন। সীতাবেঙ্গরা গুহা ভিতরের দিকে ছয় ফুট উঁচু। মাঝে মাঝে ছয় ফুটেরও কম। গুহার একেবারে ভিতরে দেওয়ালের

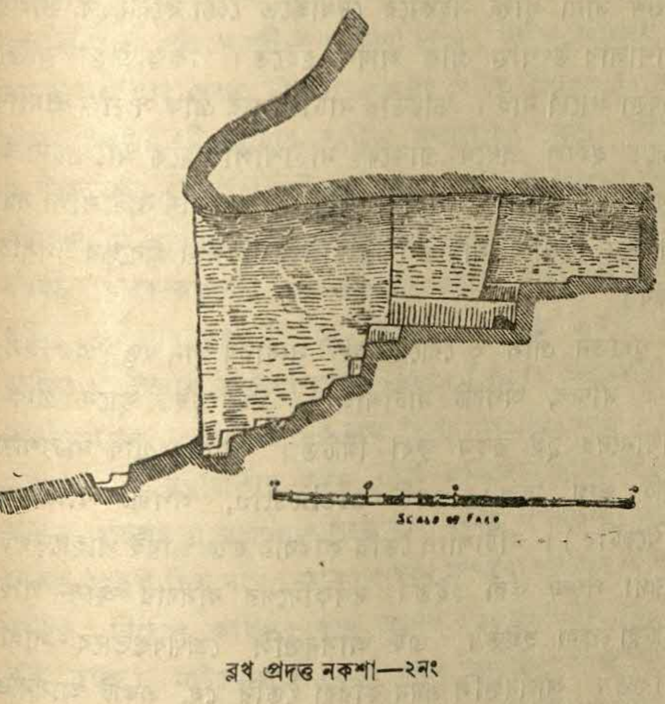
চারিপাশ উঁচু বেদি দিয়ে ঘেরা। একটি বড় নালী ঐ বেদির নিম্ন দিয়া দেওয়ালের দিকে চলিয়া গিয়াছে। মেঝের উপর কতকগুলি গর্ত বেশ যত্ন সহকারে কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। গুহার ভিতরে প্রবেশের পথ ১৭ ফুট চওড়া। গুহাটি সর্বসমেত ৪৪১ ফুট। মধ্য ভাগে ১২ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া, আর প্রায় ৬ ফুট উচ্চ। চারিদিকে দেওয়াল কাটিয়া প্রস্তুত। দেওয়ালের চারিদিকে পাথর কাটা উঁচু উঁচু মঞ্চাসন। তিনদিকে দুই সারি মঞ্চাসন। ভিতরের অংশ বাহিরের অংশের চেয়ে দুই ইঞ্চি উঁচু। যে দিক্‌টার সম্মুখ প্রবেশ-পথের দিকে দুই সারি মঞ্চের (double bench) সেই দিকটা ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া। প্রবেশ পথের পশ্চাদ্ভাগের মঞ্চাসনগুলি অপেক্ষাকৃত নীচু ; প্রাচীরের দিকে ছোট ছোট পাথর কাটা মঞ্চাসন আছে। এইখানে ব্লথ প্রদত্ত ২টি নকশা দেওয়া গেল।



ব্লথ প্রদত্ত নকশা—১নং

প্রথম নকশা হইতে ইহার অবিকল ধারণা না হইতে পারে। কিন্তু তিনি আর একটি যে চিত্র দিয়াছেন—তাহাতে চিত্র আরও সুস্পষ্ট।

প্রথম চিত্রের নীচের দিকের শেষ রেখা মালভূমির প্রান্তদেশ নয়, এখানে জমি কিছু নামিয়া গিয়াছে। ব্লথ বলেন, এই ক্ষুদ্র পাথর-কাটা ডিম্বাকার নাট্যশালার সম্মুখে রঙ্গপীট (stage) স্থাপনের জন্য প্রচুর স্থান আছে। আর মঞ্চাসন বলিতেও পঞ্চাশ ষাটজন দর্শকের বসিবার জায়গা হয়। অভ্যন্তর দেশ ৪৬ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া একটি আয়তচতুরস্রাকৃতি বিশিষ্ট (oblong) স্থান। তিনদিকেই পাথরকাটা সুপ্রশস্ত বসিবার জায়গা ; এগুলি ২॥ ফুট



ব্লথ প্রদত্ত নকশা—২নং

উচ্চ, ৭॥ ফুট প্রশস্ত ; সম্মুখভাগ কয়েক ইঞ্চি মাত্র নীচু করিয়া আসনগুলি চাতালের আকৃতিবিশিষ্ট করা হইয়াছে। প্রবেশ-পথের নিকটস্থ ভূমি আসনের কোণের ভূমির চেয়ে কিছু নীচু।

১৯০৩-৪ সালে Arch. Surveyর Annual Reportএ (পৃ° ১২৩-১৩১) ব্লথ সাহেব রামগড় নাট্যশালার সচিত্র বিস্তৃত

বিবরণ দিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিত্র ও নকশা ব্লখের এই বিবরণ হইতে গৃহীত। ব্লখ ১৯০৪ সালে ৩০এ এপ্রিল তারিখে রামগড়ের রঙ্গালয় সম্বন্ধে একখানি পত্র ভিণ্ডিশকে (E. Windisch) লেখেন। ইহাতে তিনি ভারত নাট্যশালার গ্রীক প্রভাব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। পত্রখানি Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft নামক প্রসিদ্ধ জর্মান পত্রে (১৯০৪, পৃ° ৪৫৫-৪৫৭) প্রকাশিত হয়। ডিণ্ডিশ নানা যুক্তি সহকারে দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, ভারতীয় নাট্যশালার উৎপত্তি গ্রীক আদর্শ হইতে। কিন্তু তাঁহার যুক্তিতে সারবত্তা আদৌ নাই। ভারতীয় নাট্যশালার গ্রীক সম্পর্ক প্রমাণিত করিতে হইলে প্রথমে গ্রীকদের নাট্যশালা সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা আপাতত গ্রীক ও রোমান নাট্যশালা সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন হিসাবে সামান্য কিছু বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

পুরাতন গ্রীস ও রোমের দুইটি সাধারণ স্থান বড় প্রিয় ছিল—একটি মন্দির, অপরটি নাট্যশালা। এই দুইটি স্থানে গ্রীক ও রোমানদের দুই রকম ক্ষুধা মিটিত। প্রাচীন গ্রীক নাট্যশালার দুইটি ভাগ ছিল। একটি orchestra, অপরটি theatron (থিয়েটার)। নাট্যশালা তৈরি করিবার জন্য প্রায়ই পাহাড়ের ঢালু জায়গা পছন্দ করা হইত। দর্শকদিগের বসিবার আসন পাহাড় কাটিয়া করা হইত। এই আসনগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট থাকিত। আসনগুলি এমন করিয়া তৈরি যে, একটি আসনশ্রেণী আর একটির চেয়ে উঁচু। ইহাতে দর্শকদিগের দেখিবার সুবিধা হইত। আসনশ্রেণীগুলি কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ চক্রাকারে বাহিয়া চলিয়াছে। প্রত্যেক চক্রাংশের পরিমাণ একটি সম্পূর্ণ বৃত্তের ⅔ অংশ। এইগুলির মধ্যে মধ্যে আবার যাতায়াতের জন্য খানিকটা করিয়া জায়গা ফাঁক রাখা হইত।

যাতাযাতের পথগুলির দুই পাশে বসিবার আসনগুলি (bench) পরস্পর সমান্তরাল রেখায় থাকিত। যখন রঙ্গালয়ে ভিড় হইত, দর্শকগণ অগত্যা যাতায়াতের পথগুলি অধিকার করিয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় দেখিতে বাধ্য হইত। সকলের নীচে বা সম্মুখের আসনশ্রেণী হইতে সকলের উঁচু বা একেবারে পিছনের আসন-শ্রেণীর মাঝে মাঝে সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকিত। দর্শকদিগের এই বসিবার জায়গার সম্মুখেই একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্র থাকিত। ইহারই নাম orchestra. এই জায়গাটি ঐকতান বাদন ও নৃত্য প্রভৃতির জন্য নির্দিষ্ট। এই ক্ষেত্রটি তক্তা দিয়া ঢাকা ; ইহার মধ্যস্থলে একটি উচ্চ মঞ্চের উপর দেবতা Dionysusএর বেদির (thymele) স্থান। কখনও কখনও এটি আবার সংগীত সম্প্রদায়ের নেতা, বংশীবাদক বা উত্তর সাধকের দ্বারা অধিকৃত হইত। Orchestraর পিছনেই নাট্যমঞ্চ বা stage. এটি কিঞ্চিৎ উচ্চতর ভূমির উপর অবস্থিত। সম্ভবত বাদক-সম্প্রদায় orchestra হইতে নাট্যমঞ্চে আরোহণ করিত। নাট্যমঞ্চের পিছনে কয়েকটি দ্বারযুক্ত একটি প্রাচীর থাকিত। ইহাকে তাহারা বলিত skene (Lat. Scæna) এবং orchestraর মধ্যবর্তী স্থানের নাম ছিল proskenion (pros-ceium)। কথাবার্তার সময় এইটি অভিনেতাদিগের দাঁড়াইবার স্থান। দৃশ্যপট বা scene বলিতে যাহা বুঝায়, তখনকার থিয়েটারে সেরূপ কিছুই ছিল না। তবে যে স্থান সম্পর্কে অভিনয় চলিতেছে এইটুকু নির্দেশ করিবার জন্য তখনকার scæna-কে চিত্র-বিচিত্র করা হইত। নাট্যশালার কোন অংশ ছাদ দিয়া আচ্ছাদিত ছিল না। কাজেই অভিনয়ের সময় বৃষ্টি হইলে দর্শকদিগকে বাধ্য হইয়া নাট্যশালার চারিপাশের বারান্দার নিম্নে আশ্রয় লইতে হইত। অভিনয় প্রায়ই দিনের বেলাই হইত। সুতরাং রৌদ্র-নিবারণের জন্য সময়ে সময়ে চাঁদোয়ার ব্যবস্থা থাকিত। গ্রীক থিয়েটারের নির্মাণপদ্ধতির একটি বিশেষ দোষ ছিল। দর্শকদিগের মধ্যে

যাহাদের সকলের পিছনে বসিতে হইত, তাহারা সম্মুখের কিছু দেখিতে পাইত না। তাহাদের নজর নাট্যমঞ্চের পাশের দিকে পড়িত। গ্রীক নাট্যশালাগুলি খুব বড় ছিল। এত বড় করিবার উদ্দেশ্য শহরের সমগ্র অধিবাসীকে একসঙ্গে অভিনয় দেখিবার সুযোগ দেওয়া। বিরাট্ নাট্যশালায় বহুলোকের স্থান সঙ্কুলান হইত বটে, কিন্তু অতি অল্প লোকেই অভিনেতাদের কথা শুনিতে বা তাহাদের মুখের ভাবভঙ্গী সুস্পষ্ট দেখিতে পাইত। অনেককেই এ সুখে বঞ্চিত থাকিতে হইত। তবে তাহাদের নাট্যশালার এই সমস্ত ত্রুটি আমাদের যতটা অসুবিধাজনক বলিয়া মনে হয় ততটা বোধ হইত না। ইহার কারণ এই যে, আমরা নাট্যকে যেভাবে বুঝিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহারা তখন সেভাবে বুঝিতে অভ্যস্ত ছিল না। প্রাচীনকালের অভিনেতৃবর্গ ধাতুনির্মিত এক রকম মুখোস পরিত ; এটি প্রকারান্তরে speaking trumpet-এর কাজ করিত। অত্যন্ত দূরের দর্শকগণ অত্যন্ত ছোট দেখিবে বলিয়া, একটু বড় দেখাইবার জন্য তাহারা খুব উঁচু গোড়ালীওয়ালা জুতা পায়ে দিয়া শরীরটাও padএর সাহায্যে বৃহৎ করিয়া নাট্যমঞ্চে নামিত।

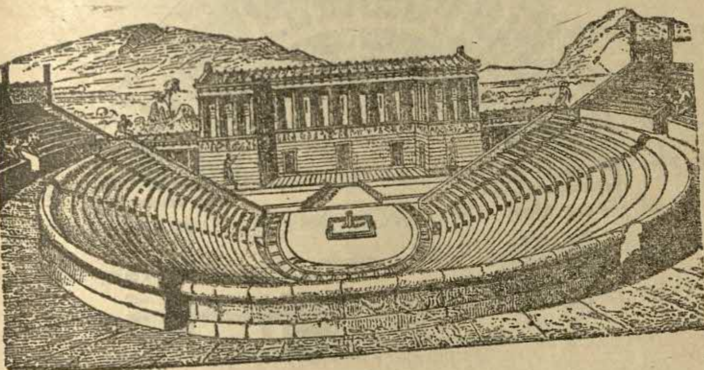
আধুনিক থিয়েটারের পূর্বাবস্থায় যেমন সকল অভিনেতাই পুরুষ ছিল। গ্রীক থিয়েটারেও সেইরূপ অভিনয় কেবল পুরুষেই করিত। স্ত্রীলোকেরা তখন থিয়েটার দর্শনে বঞ্চিত ছিল ; তবে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখিতে যাইবার বাধা ছিল না। খ্রী-পূর্ব পঞ্চাশ শতকে তাহারা পৃথক্ স্থানে বসিয়া অভিনয় দেখিত।

অভিনয় প্রাতঃকালেই আরম্ভ হইত। পর পর দুই তিনটি নাটকের অভিনয় হইত। শেষে একটা প্রহসন হইয়া অভিনয় শেষ হইয়া যাইত। পুরা অভিনয় শেষ হইতে দশ বার ঘণ্টা লাগিত।

সম্মুখের আসনশ্রেণীতে কেবল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, পুরোহিত ও রাজদূতেরাই বসিতে পাইত। যাহারা বেশী পয়সা খরচ করিতে

পারিত, তাহারাই অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে বসিবার অধিকারী হইত। কিন্তু পেরিক্লিসের সময় হইতে গরীবেরা বিনা খরচে থিয়েটার দেখিতে পাইত। সাধারণ কোষাগার হইতে তাহাদের খরচ যোগানো হইত। শেষে নগরবাসী সকলেই সেই সুবিধা ভোগ করিয়াছিল।

প্রায় ৪৯৬ খ্রী-পূর্বাব্দে এথেন্স নগরে প্রথম পাথরের থিয়েটার নির্মিত হয়। ইহার পর হইতে চারিদিকে থিয়েটারের ধুম লাগিয়া গেল। গ্রীস, এসিয়া-মাইনর এবং সিসিলির সকল নাট্যশালাই এথেন্সের নাট্যশালার অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। তবে এইগুলিতে কিছু কিছু পরিবর্তনও সাধিত হইয়াছিল।

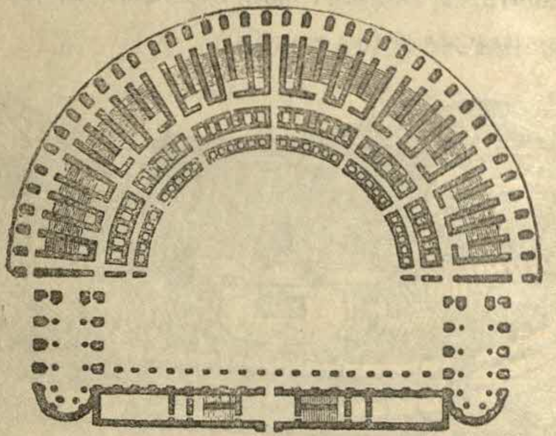


সেগেস্টার স্ট্রাক (Strack) সংরক্ষিত

রোমে ২৪০ খ্রী-পূর্বাব্দের পূর্বে ঠিক অভিনয় হয় নাই। এই সময় একটি কাঠের রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয়। প্রত্যেকবার অভিনয়ের পরে আবার সব ভাঙিয়া ফেলা হইত। ১৯৪ খ্রী-পূর্বাব্দের সেনেটররা নাট্যমঞ্চের পরেই বসিতে পাইত। কিন্তু তাহাদের নিরূপিত কোন আসন ছিল না। যাহাদের বসিবার দরকার হইত তাহারা নিজেদের আসন আনিত। কখনও কখনও সরকারের হুকুমে বসিয়া অভিনয় দেখা বন্ধ হইত। ১৫৪ খ্রী-পূর্বাব্দে নির্দিষ্ট আসনযুক্ত স্থায়ী থিয়েটার করিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু সেনেটের আদেশে থিয়েটার

ভাঙিয়া ফেলিতে হয়। ১৪৫ খ্রী-পূর্বাব্দে গ্রীস বিজয়ের পর গ্রীকদের অনুকরণে থিয়েটার নির্মিত হয়। এগুলিও কাঠের। একবারের বেশী তাহাতে অভিনয় হইত না। পাথরের তৈরি প্রথম রোমান থিয়েটার ৫৪ খ্রী-পূর্বাব্দে হয়। Pompay এই থিয়েটার করেন। ১৭৫০০ বসিবার আসন ইহাতে ছিল।

১৩ খ্রী-পূর্বাব্দে অগস্টস্ (Augustus) তাঁহার ভাইপো মারসেলাসের (Marcellus) নামে একটি থিয়েটার করেন। এই থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান।......



মারসেলাস থিয়েটারের নকশা

গ্রীক ও রোমান থিয়েটারের সাদৃশ্যও যেমন ছিল, পার্থক্যও তেমনি ছিল।

পার্থক্য ছিল দর্শকদিগের স্থান লইয়া। গ্রীকদের মতন এটিও সমান্তরাল পথ ও সিঁড়ি দিয়া বিভক্ত ছিল। তবে এই ভাগগুলি সমানভাবে গ্রীকদের মত ছিল না, ছিল অর্ধবৃত্তাকারে। আর ইহার ব্যাসের শেষে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখের প্রাচীর ছিল। গ্রীকরা অর্ধবৃত্তের অপেক্ষা বড় করিয়া এইটিকে তৈরি করিত। রোমানদের থিয়েটারের সর্বোচ্চতলের স্তম্ভগুলির আবরণের উচ্চতা সমান ছিল।

রামগড়ের নাট্যশালা

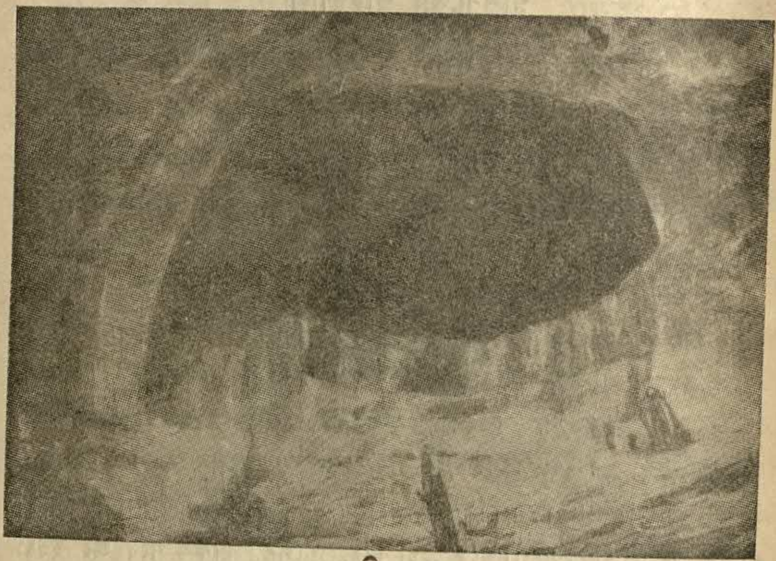
বাঙলার দক্ষিণ-পূর্বে সুরগুজা[১] স্টেট। রামপুর এই স্টেটেরই একটি পরগনা। এই পরগনায় লখনপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে চারি ক্রোশের মধ্যে একটি পাহাড় আছে। পাহাড়টি তাহার পাদদেশ হইতে ২৬০০ ফুট উঁচু। এই পাহাড়ের নাম রামগড়।

---

১ কেহ কেহ এই শব্দটির উচ্চারণ করেন 'সরগুজা' বা 'সিরগুজা', কথাটির প্রকৃত উচ্চারণ 'সুরগুজা'। পূর্বে সুরগুজা ছোট নাগপুরের এলাকাভুক্ত ছিল।

১৭৯২ সালে সরকার বাহাদুরের সুরগুজার উপর প্রথম নজর পড়ে। ১৮১৮ সালে অপ্পা সাহেবের সঙ্গে সন্ধি হইয়া সুরগুজা বৃটিশদের অধীনতা স্বীকার করে। ৭০-৭৫ বৎসর পূর্বে সংস্কৃতাধ্যাপক ক্যাপ্টেন ফেল (Captain Fell) রামগড় পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি এই পাহাড়ে উঠিয়া প্রসিদ্ধ রামগড় মন্দিরে পৌছিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পথে জ্বর হইয়া মারা যান। তারপর কর্নেল উস্লী (Col. J. R. Ousley) রামগড় পাহাড় দেখিয়া ১৮৪৭ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে ছোট-নাগপুর হইতে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারীদের একখানি পত্র লিখেন। এই পত্রে রামগড় সুরগুজার অন্যান্য স্থানের বিবরণ আছে। পত্রখানি ১৮৪৮ সালের ঐ সোসাইটির পত্রে (J. A. S. B, ৬৫-৬৮ পৃষ্ঠায়) মুদ্রিত হইয়াছে। ইনি রামগড়ের অদ্ভুত গুহাগুলির ও হাতিফোঁড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সামান্য একটু বর্ণনাও দিয়াছেন। রামগড়ের উপরের মন্দিরের একটি প্রতিকৃতিও দিয়াছেন। তারপর ১৮৬৩ ৬৪ সালে লেফ্‌টেনেন্ট কর্নেল ডালটন (Lt. Col. T. Dalton) ভ্রমণ করিতে আসিয়া এই পাহাড় দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা বিবরণ ১৮৬৫ সালে বাহির হয় (J.A.S.B. vol. xxxix, pt. II. pp. 33-27.)। ১৮৭৩ সালে ভ্যালেন্‌টাইন বল (Valentine Ball) রামগড় পাহাড়ে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা বিস্তৃত বিবরণ Indian Antiqury পত্রে (vol. II, 1873, pp. 243-246) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পর বেগলার (J. D. Beglar) দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশ ভ্রমণকালে ১৮৭৫

রামগড় পাহাড়ের উপর বার আনা উঠিলে একটি গুহায় পৌঁছিতে পারা যায়। গুহাটি মানুষের তৈরি, নাম 'মুনিগোফা'



রামগড়ের নাট্যশালা

গুহার মুখ পশ্চিম দিকে। আরও কতকটা উঠিলে একটি ক্ষুদ্র মহাদেবের মন্দির দেখা যায়। মহাদেবের বিগ্রহ মন্দিরের ভিতরে

সালের ডিসেম্বর মাসে রামগড় গিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা বর্ণনা ১৮৮২ সালে (Arch. Survey of India, vol. xiii, pp. 31-55) বাহির হয়। তিনি রামগড়ের দুইটি শিলালিপির ছাপ লইয়াছিলেন। Corpus Inscriptionum Indicarum (vol. I) গ্রন্থে ক্যানিংহাম (A. Cunningham) ১৮৭৭ সালে সামান্য একটু বিবরণ (পৃঃ ৩৩) দিয়া ছাপেন (plate XI)। তিনি একটি নকশাও লইয়াছিলেন। নকশাটি ১৮৮২ সালে ছাপা হয় (A.S.R. vol. xiii. pl. x)। এরপর ১৯০২ সালে ডিসেম্বর মাসে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কালিদাসের রামগিরি ও রামগড় যে অভিন্ন তাহা দেখাইতে চেষ্টা করেন (Proceedings A.S.B, 1902. p. 90) তাঁহার আলোচনায় রামগড়ের শিলালিপির তর্জমা আছে। ব্লখ (T. Bloch)

আছে। মন্দিরের কাছে দেওয়াল দিয়া ঘেরা খানিকটা পরিচ্ছন্ন জমি আছে। এই জায়গা হইতে ১০০০ ফুট নীচে বন—গাছে

রামগড়ে গিয়া তাহার উপর তিনটি প্রবন্ধ লেখেন। Arch. Sur. Annual Report-এ (for the year ending April 1904. pt. II, p. 12) একটি বিবরণ বাহির হয়। ১৯০৩-০৪ সালের Arch. Sur. Annual Report-এও (পৃ° ১২৩-১৩১) আর একটি সচিত্র বিস্তৃত বিবরণ বাহির হয়। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিত্র ও নকশা ব্লখের এই বিবরণ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। ব্লখ ১৯০৪ সালে ৩০ এপ্রিল তারিখে রামগড়ের রঙ্গালয় সম্বন্ধে ভিণ্ডিশকে (E. Windisch) লিখিত একটি পত্রে তিনি ভারত নাট্যশালায় গ্রীক প্রভাব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ঐ পত্রে (পৃ° ৮৬৭-৮৬৮) হাইন্‌রিখ লুডের্স (Heinrich Luders) রামগড়-নাট্যশালা প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীন গুহাতে যে নৃত্যাদি হইত তাহা দেখাইতে চেষ্টা করেন। ১৯০৫ সালে বার্জেস (James Burgess) Indian Antiquary-তে (vol xxxiv, pp. 197-199) রামগড়ের নাট্যশালা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। লুডের্সের জর্মান প্রবন্ধের একটি তর্জমাও প্রকাশ করেন। (৩৪ খণ্ড, পৃ° ১৯৯-২০০)। ইহার পর আট নয় বৎসর রামগড় রঙ্গালয় সম্বন্ধে আর কেহ উচ্চবাচ্য করেন নাই। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীঅসিতকুমার হালদার মহাশয় সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে রামগড়ে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের রামগড়ের বিবরণ ১৩২১ সালের কার্তিক মাসের প্রবাসী পত্রে (পৃ° ৫৫-৬৩) বাহির হয়। ঐ বৎসর নারায়ণ পত্রে (২০৪ পৃ°) শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় এবং প্রবাসী পত্রে (১২১ পৃ°) শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গত দুই কথা লেখেন। ১৯০৯ সালে রঙ্গমঞ্চের কয়েকটি সংখ্যা বাহির হয়। রঙ্গমঞ্চের একটি সংখ্যায় ব্লখ-লিখিত প্রবন্ধের সার সঙ্কলন আছে। র‍্যাপসন (E. J. Repson) একবার ১৯১১ সালে (E.R.E., vol. iv. p. 885) এবং পরে ১৯২২ সালে তাঁহার ইতিহাসে (The Cam. Hist. of India, vol. i. pp. 642-643) ও ১৯২৪ সালে কীথ (B. Keith) তাঁহার ভারতীয় নাটক সম্বন্ধীয় পুস্তকে প্রসঙ্গত কিছু আলোচনা করিয়াছেন। এই সালের জানুয়ারি মাসে Calcutta Review পত্রে (পৃ° ১০৯) শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও রামগড়ের নাট্যশালায় উল্লেখ করেন

ভরা। দেওয়ালে ঘেরা জায়গায় ৫০ ফুট উঁচুতে উঠিবার সিঁড়ি তৈরি করা আছে। এই সিঁড়ির ৪৮ ধাপ পিছাইয়া উঠিলে একটি মন্দিরের জীর্ণ কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে দুইটি দুর্গামূর্তি—একটি বিংশভুজা, একটি অষ্টভুজা, একটি হনুমানের মূর্তি, ও একটি অষ্টভুজ শিবমূর্তি আছে। এখান হইতে পাহাড়ের চূড়া আরও ১০০ ফুট উঁচুতে। খানিকটা চড়াই পাহাড়ে উঠিলে উঁচু উপত্যকায় আসিয়া পড়া যায়। উপত্যকা পার হইয়া একটি জীর্ণ প্রাচীন মন্দির—একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ভিতরকার দেওয়ালটি এখনও আছে। এখানে লক্ষ্মণ, জানকী, জনক রাজার মূর্তি আছে। এই পাহাড়ের শিখরের গায়ে ঠিক নীচেই ঐ উপত্যকার একটি ঝরণা ও কুণ্ড। প্রবাদ সীতা এইখানে রাম লক্ষণের সঙ্গে স্নান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর এইখানে মেলা হয়। যাত্রীরা এইখানের জলকে গঙ্গাজলের চাইতেও পবিত্র বলিয়া মনে করে।

১৭৫৮ সালে মরাঠারা সুরগুজা আক্রমণ করে। প্রবাদ আছে যে, যখন এই দুর্ঘটনা ঘটে, সুরগুজার রাজারা তখন এই কুণ্ডে তাঁহাদের রমণীদের আকণ্ঠ নিমজ্জিত রাখিয়াছিলেন। ধনরত্নও ইহারই ভিতর ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আরও কয়েকবার নাকি তাঁহাদের এই কার্য করিতে হইয়াছিল। এইখান দিয়া নামিয়া 'যোগীমারা' নামক গুহায় যাওয়া যায়। ১৮০ ফুট পাহাড়ের নীচে একটি গহ্বর-পথ—নাম 'হাতিফোঁড়'। হাতিফোঁড় নামের কারণ হইতেছে এই সুড়ঙ্গ পথটি এত চওড়া যে তাহার ভিতর দিয়া হাতি ফুঁড়িয়া পাহাড়ের এপার ওপার হইয়া যাইতে পারে। হাতিফোঁড় এই পাহাড়ের উদিপুর গ্রামের কাছে অবস্থিত। এই সুড়ঙ্গটির ভিতরে প্রবেশপথের সামনে একধারে পাহাড়ের ফাটল দিয়া জল বাহির হইয়া নীচের পাথরের উপর চুঁইয়া চুঁইয়া পড়ে। ক্রমাগত জল পড়িয়া জায়গাটি ক্ষইয়া ক্ষইয়া কালে গোল হইয়া পড়িয়াছে।

এই স্থানটির শোভাবর্ধন করিবার জন্য পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়া একটি রেখা অঙ্কিত করা হইয়াছে। প্রবেশপথে সুড়ঙ্গটি ৫৫ ফুট চওড়া, উঁচু ১০০ ফুট। ঢুকিয়া ৪০ ফুট যাইলে দেখা যায় এইটি সেখানে ৩২ ফুট চওড়া, ২০ ফুট উঁচু। তাহার পর ক্রমশ কমিয়া গিয়া প্রবেশস্থান হইতে ৪০০ ফুট দূরে ৩৫ ফুট চওড়া আর ১৬ ফুট উঁচু। যেখানে শেষ হইয়াছে সেখানটা ৯০ ফুট চওড়া। সুড়ঙ্গটি দক্ষিণ-পূর্বে গিয়াছে।

এই সুড়ঙ্গপথের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বাটালি দিয়া কাটা একটি প্রস্তর ফলক দেখিতে পাওয়া যায়। এইটি যে শিলালিপি খোদিত করিবার উদ্দেশ্যে কাটা হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক ইহার উপর শিলালিপি খোদিত হয় নাই। ইহার নিকটে একটি ক্ষুদ্র গুহা আছে। উঠিবার নামিবার একটি ধাপও আছে। এই গুহার কতকটা হাতের তৈরিও বটে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য নয়। তবে পুরাকালে যাহারা গুহায় বাস করিত তাহারা কেমন করিয়া তাহাদের ঘর তৈরি করিত তাহার কিছু নিদর্শন ইহাতে পাওয়া যাইতে পারে। হাতিফোঁড় অতিক্রম করিয়াই দক্ষিণে দুইটি গুহাদ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। গুহাদুটির নাম 'যোগীমারা' ও 'সীতাবেঙ্গরা'। সীতাবেঙ্গরার মধ্যবর্তী নাট্যশালা সম্পর্কে পূর্ব অধ্যায়ে কিছু বলা হইয়াছে।

ব্লথ সাহেব যাহাকে নাট্যশালা বলিয়াছেন সেটি ঠিক নাট্যশালা কি না তাহা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। প্রবেশপথের মেঝেতে কোণের দিকে ২টি বড় বড় ছিদ্র আছে। ব্লথ বলেন এই ছিদ্রগুলি কাঠের খুঁটি বসাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। দর্শকেরা যখন ভিতরে চলিয়া যাইত, এই খুঁটির উপর শীতকালের রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া আট্‌কাইবার জন্য পর্দা খাটানো হইত। এই সময়ে দর্শকেরা প্রশস্ত মঞ্চাসনের উপর বসিত, আর প্রবেশপথ-আবদ্ধকারী পর্দার সামনে নৃত্যাদি তামাশা চলিত।

গুহার সম্মুখভাগে ডিম্বাকৃতি নাট্যশালা। নাট্যশালায় চত্বরাকৃতি আসনাবলি অর্ধবৃত্তাকারে সংহিত, আসনচত্বরের শ্রেণীগুলি সমকেন্দ্র চক্রাংশাকৃতি—আর এই চক্রাংশগুলি পিছনের দিকে ক্রমোন্নত। ব্লথ সাহেব যে চিত্র দিয়াছেন তাহার সাহায্যে বর্ণনাটি বেশ বুঝা যাইবে।

এইটি নাট্যশালা হইতে পারে কিনা তাহা লইয়া বার্জেস বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, এত অল্প জায়গায় অভিনয়ের কাজ চালানো সম্ভবপর নয়। এটিকে নাট্যশালা বলিয়া মানিয়া লইবার পক্ষে আরও সন্তোষজনক প্রমাণের দরকার। শ্রীঅসিতকুমার হালদার মহাশয় রামগড় পাহাড়ে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "ডাঃ ব্লথ ও অপরাপর কয়েকটি প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে এই গুহাটি ভারতের প্রাচীন নাট্যমন্দিরের একমাত্র নিদর্শন এবং গ্রীক প্রধান নাট্যমন্দিরের অনুকরণে তৈরি। গুহাটির বাহিরে চারি কোণে চারিটি বড় বড় ছিদ্র আছে। ইহা হইতে তাঁহারা অনুমান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ঐ গর্তের মধ্যে কাঠের খুঁটি দিয়া যবনিকা টাঙানো হইত, আর বাইরের দিকে অর্ধ-বৃত্তাকার নীচে হইতে ক্রমশ উপরের দিকে গুহায় উঠিবার যে সিঁড়ি আছে সেই সিঁড়িগুলি দর্শকদের বসিবার মঞ্চাসনরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু দ্বারের বাইরের দিকে অর্ধ-বৃত্তাকারভাবে সিঁড়িগুলি থাকায়, নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তরে নটনটীদের অভিনয় দেখা সম্ভবপর নয়। দর্শকের পশ্চাতে নাট্যমন্দির এবং সম্মুখে দৃশ্যপটটি থাকার যে কি সার্থকতা আছে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। গুহাটির দ্বারের বাইরে এমন প্রচুর দাঁড়াবার স্থান নাই যে, সেখানে নৃত্যোৎসবাদি ঐ অর্ধবৃত্তাকার সিঁড়িতে বসিলে দর্শকেরা সামনে দেখিতে পায় এরূপভাবে সম্পাদিত হইতে পারিত মনে করা যাইতে পারে। সেখানটা আবার খাড়া পাহাড়। তবে অন্য কোন উপায়ে যদি বাহিরে কাঠে

স্থায়ী মঞ্চের উপর অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকিত তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাহারও কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় না।" অসিতবাবু এই গুহাকে ছোটখাট গানবাজনার স্থায়ী সভা এবং বাসস্থান বলিয়া মনে করেন। শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের মতে এইটি যে স্থায়ী রঙ্গালয়ের উদাহরণ তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রামগড়ের সীতাবেঙ্গরা গুহাকে কেহ কেহ যে নাট্যশালা বলিতে প্রস্তুত নন তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এখন এটি নাট্যশালা হইতে পারে কি না তাহাই প্রথমেই বিচার করিয়া দেখা যাক্। এই আলোচনায় আমাদের কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করিতে হইবে। সীতাবেঙ্গরা গুহাকে যদি নাট্যশালা সাব্যস্ত করিতে হয় তাহা হইলে প্রথম দেখিতে হইবে, গুহাতে নাট্যশালা হওয়া সম্ভব কিনা। বার্জেস সাহেব বলেন, এত জায়গা থাকিতে রামগড়ের নির্জন গুহায় নাট্যশালা করিবার সার্থকতা উপলব্ধি করা যায় না। বিশেষত দেখা যাইতেছে পশ্চিমাঞ্চলের আর কোন গুহায় নাট্যশালায় অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বার্জেসের (Burgess) নিজের উক্তি এই—

"Had this been so, we should naturally expect that such would be found not only in this solitary instance in remote Sarguja, but that other and better examples would certainly occur among the hundreds of rock excavations still fairly complete in Western India. Yet no trace of such has been found elsewhere." (Ind. Ant., Sep. 1905 p. 198)

ভারতের আর কোথাও নাট্যশালারূপে ব্যবহৃত গুহা পাওয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু না পাওয়া গেলেও সীতাবেঙ্গরা গুহাটিতে নাট্যশালায় উপযোগী নিদর্শন যদি থাকে তবে তাহাকে নাট্যশালা

বলিয়া অঙ্গীকার করিবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়ও থাকে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, কতকগুলি প্রাচীন গুহা আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবহৃত হওয়া খুব সম্ভব। এ বিষয়ে পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে অভিনয় হইত কোনখানে? প্রাচীনকালে রঙ্গপীঠেই অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গপীঠ হইল (stage)। এই রঙ্গপীঠের পরিমাণ ৮ হাত। "অষ্টহস্তং তু কর্তব্যং রঙ্গপীঠং প্রমাণতঃ" (নাট্যশা°—২.৮৬)। প্রথমে মাপ করিয়া রঙ্গমণ্ডপ তৈরি করিতে হইবে। আর সেই রঙ্গমণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত ও প্রস্থে ৩২ হাত চাই।

"চতুঃ ষষ্ঠিকরান্ কুর্যাদ্দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্।
দ্বাত্রিংশতং চ বিস্তারান্ মর্ত্যানাং যো ভবেদিহ ॥"

—নাট্যশা° ২.২০।

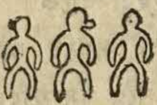
রঙ্গমণ্ডপের অর্ধেক 'প্রেক্ষক-পরিষৎ'। বাকী অর্ধ ভাগে রঙ্গপীঠ। রঙ্গপীঠের একেবারে পিছনে 'রঙ্গশীর্ষ'। এতে চারি হাত পরিমিত ছয়টি কাঠের স্থাণু থাকিবে। এইখানে দেবতাদের পূজা হয়। রামগড়ে নাচঘরে এইরূপ একটি ঘরে 'বেদি' আছে। সম্ভবত এইখানে পূজার ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গশীর্ষের পরেই নেপথ্য গৃহ। নেপথ্য ও রঙ্গশীর্ষের মাঝখানে দুই দরজা। নেপথ্যগৃহ হইতে রঙ্গপীঠে যাইতে হইলে একটি বা দুইটি দ্বার থাকার বিধি নাট্যশাস্ত্রে আছে। রামগড়ের গুহার 'প্রেক্ষক-পরিষদের' পাশে কাঠের মঞ্চ তৈরি করিয়া 'রঙ্গপীঠাদি' নির্মাণ করা অসম্ভব নয়। প্রেক্ষকদের বসিবার জায়গাও নাট্যশাস্ত্রের অনুমোদিত। নাট্যশাস্ত্র (২য়) উপদেশ করিয়াছে—

"স্তম্ভানাং বাহ্যতশ্চাপি সোপানাকৃতিপীঠকম্ ॥৭৯
ইষ্টকাদারুভিঃ কার্যং প্রেক্ষকানাং নিবেশনম্" ॥৮০

রামগড়ের নাচঘরেও এইরূপ ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত

দেখিয়া মনে হয় রামগড়ের গুহাটি রঙ্গালয়ের জন্যই তৈরি হইয়াছিল।

তারপর একটা রীতি আছে যে, রঙ্গালয়ে যক্ষলিপি থাকিবে। সীতাবেঙ্গরা গুহাতেও দেখা যায় একটি লিপি আছে। উক্ত বিষয়টির সম্বন্ধে ব্লখ সাহেব, বোইয়ে সাহেব প্রভৃতির ধৃত পাঠ, অনুবাদ ও মন্তব্য পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।



বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা

বর্তমান নাট্যশালাগুলির যেমন বন্দোবস্ত, কায়দাকানুন, হাবভাব-বিলাসবিভ্রম, বরাবর এ রকমটা কিন্তু ছিল না। খুব প্রাচীন-কালেও লোকে অভিনয় করিয়া আমোদ উপভোগ করিত। তবে তখন এ রকম রঙ্গমঞ্চ ছিল না। এখন সাধারণত সপ্তাহে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে অভিনয় হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতে কিন্তু তাহা হইত না। কোন উৎসবের সময়ই অভিনয়ের উদ্যোগ আয়োজন হইত। আর অভিনয়ের পক্ষে বসন্তোৎসবই প্রশস্ত ছিল। প্রাচীন ভারতে অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চ তৈরি হইত না। রাজপ্রাসাদে একটা করিয়া সংগীতশালা থাকিবার রীতি ছিল। সেইখানেই অভিনেতাদের নিজ নিজ কার্য চালাইতে হইত। কখনও কখনও আবার শুধু নাট্যাভিনয়ের জন্যই পৃথক গৃহের বন্দোবস্ত থাকিত। এরূপ ঘরের নাম ছিল 'প্রেক্ষাগৃহ'। নাট্যশাস্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে। রঙ্গমঞ্চে সিংহাসন, রথ প্রভৃতি রাখা হইত। কোন দর্শকদের নিকট আসিতে হইত, ভৃত্য তখন পিছন থেকে পর্দা দুটি ফাঁক করিয়া দিত। পট পরিবর্তনের যে ব্যবস্থা ছিল তাহা "অপটিক্ষেপেন' পদ হইতে বেশ বোঝা যায়। যবনিকার ব্যবহার ছিল। দৃশ্যপটের ব্যবহার ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। অভিনেতাকে ভঙ্গী দ্বারা দৃশ্যপটের কাজ সারিয়া লইতে হইত। একজন মনীষী বলিয়াছেন, "যে সকল সুকুমার কলার মধ্যে কোন একটি কলার সম্যক্ অনুশীলন করিলে, জাতি-বিশেষ জগতে গৌরব লাভ করিতে পারে, সেগুলির মধ্যে সংগীত, শিল্প ও সাহিত্য প্রধান। নাট্যকলার এই ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ কলারই যুগপৎ অনুশীলন হয়। নাট্য-শিল্পীকে অর্থাৎ অভিনেতৃবর্গকে ত্রিবিধ বলায় ব্যুৎপন্ন হইতে হয়।"

বাঙলার প্রথম নাটক কি তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়

না, ইংরেজী ১৮২১ সালে 'কলিরাজার যাত্রার'[১] অভিনয় হয়। এ অভিনয় সত্যই যাত্রার অভিনয়—থিয়েটারের নয়। বস্তুত যাত্রা হইতেই আমাদের দেশে থিয়েটারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া —আমার বিশ্বাস। যাত্রায় অস্তিত্ব অতি প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। [যাত্রা দ্র°]।

কলিকাতায় ইউরোপীয়দের থিয়েটার চোখে দেখিয়া এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের নাটকাদি পড়িয়া বাঙালীর মতপরিবর্তনের সূচনা হয়। পাঁচালী, কবিগান, যাত্রার খুব আদর ছিল। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের রুচি পরিবর্তনের জন্যই এগুলির পরিবর্তন আরম্ভ হইল, এবং পাশ্চাত্য ধরনে থিয়েটারের আরম্ভ হয়। পশ্চিমাঞ্চলের অনুষ্ঠিত রামলীলা অভিনয়ও থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছে। এই থিয়েটার হইতেই আবার যাত্রার পরিবর্তন সূচিত হয়। এখনকার যাত্রা অনেকটা আধুনিক থিয়েটারেরই সুস্পষ্ট অনুকরণ। যাত্রায় সংগীতবাহুল্য অনেকটা কমিয়াছে, কিন্তু থিয়েটারী ধরনের নৃত্যগীত এখন যাত্রার মধ্যে বেশ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। 'কলিরাজার যাত্রার' অভিনয়ের পর বাঙলায় দ্বিতীয় নাটক 'কৌতুকসর্বস্ব' বা বিদ্যাসুন্দর। এই নাটকাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলার নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। ১৮২৬ সালের অগস্ট মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রস্তাব করে যে,—সাধারণের আমোদের জন্য মাসে একদিন করিয়াও অন্তত সাধারণ নাট্যশালার অভিনয় হওয়ার দরকার। ইহাতে সমাজের সকলেই খুশী হইবে। ইংরেজদের Public Theatreএর অভিনয় দেখিয়া মাঝে মাঝে যাত্রার অভিনয় হইয়া থাকিলেও 'চন্দ্রিকা' Public Theatreএর জিদ্ ধরিলেন (Asiatic Journal, 1826, Aug. p. 214)। ১৮৩১ সালে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের প্রথম নাট্যাভিনয়ের সূচনা হয়।

---

১ সংবাদ-কৌমুদী, ১৮২১ খ্রী° ৮ম সংখ্যা, 'কলিরাজার' যাত্রা নাটকের অভিনয়ের সমালোচনা আছে।

ইহার পূর্বে কেহ কোথাও অভিনয় করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। ১৮৩৫ সালে অগস্ট মাসে Hindu Pioneer নামে এক পাক্ষিক পত্র বাহির হয়। অক্টোবর মাসে ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় The Native Theatre নামে এক প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রবন্ধে সন্ধান পাওয়া যায় যে, এই Native Theatre প্রকাশ্য নাট্যভূমি নয়।

শ্যামবাজার-নিবাসী নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া এই নাট্যাগারের সৃষ্টি হয়। শ্যামবাজারের বর্তমান ট্রাম কোম্পানির ডিপো ও তাহার সংলগ্ন জমিতে এই অভিনয়ের আয়োজন হয়। অভিনয়ে দৃশ্যাবলী আঁকিয়া তৈরি করা হয় নাই। বাড়ির নানা স্থান প্রকৃত সাজসজ্জা দিয়া সাজানো হইয়াছিল। দুইটি ঘরের নীচে দিয়া গর্ত খুঁড়িয়া সুড়ঙ্গের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বকুলতলায় পুষ্করিণীর দৃশ্য নবীনবাবুর বাড়ির বাগানের পুকুর পাড়ে সাজসজ্জা দিয়া সাজানো হয়। বাগানের এক পাশে মালিনীর কুটির ও মালঞ্চ সাজানো হয়। এক দৃশ্য দেখিয়া অন্য দৃশ্য দেখিবার জন্য দর্শককে উঠিয়া আবার অন্যত্র যাইতে হইত। রাত্রি ১২॥টা হইতে পরদিন ৬॥ পর্যন্ত অভিনয় হইত। এই অভিনয়ে স্ত্রীলোকের ভূমিকা স্ত্রীলোকেই অভিনয় করিয়াছিল; বরাহনগরনিবাসী তরুণ যুবক শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরের ভূমিকা; ষোড়শবর্ষ-দেশীয়া রাধামণি ওরফে মণি বিদ্যা, প্রৌঢ়া জয়দুর্গা রানী ও মালিনী এবং রাজকুমারী ওরফে রাজু বিদ্যার সহচরীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। এই অভিনয়ের পূর্বে কনসার্ট (concert) বাজিত। কনসার্টে সেতার, সারেঙ্, পাখোয়াজ, বেহালা প্রভৃতি বাজিত। বাদকেরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রজনাথ গোস্বামী বেহালা বাজাইতেন। পট উত্তোলনের পূর্বে ভগবানের স্তুতিগান হইত।

১৮৩১ সালে ২৮এ ডিসেম্বর Hindoo Theatre খোলা হয়।

১৮৩২ সালের মে মাসের এসিয়াটিক জার্নাল (পৃঃ ৩৪) হইতে এই সংবাদ ব্যতীত আরও জানিতে পারা যায় যে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক Horace Hayman Wilson কর্তৃক মূল সংস্কৃত হইতেও অনূদিত ইংরেজী উত্তর-রামচরিত ও জুলিয়স সীজারের কিয়দংশ এই থিয়েটারে অভিনীত হয়। Sir Edward Ryan এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পুরুষ ও মহিলা এই অভিনয়ের দর্শক ছিলেন। ঐ বৎসরের Calcutta Monthly Journal ও Hindoo Reformer (Jany.) সংবাদ দিয়াছে যে, অভিনয়টি রামচন্দ্র মিত্র, গঙ্গাচরণ সেন প্রভৃতি সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের বিদ্যার্থী দ্বারা অভিনীত হয়। বাবু গৌরদাস বসাকও ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

১৮৩২ সালের এপ্রিল মাসে East Indian লিখিয়াছে—

"On Sunday last, a meeting was called by Baboo Prosanna Coomar Thakoor, to take into consideration a proposal for establishing a native theatre. It was attended by a select few, who resolved, first, that theatres were useful; second that on association, to be called the Hindoo Theatrical Association, be established; third, that a managing committee be formed to take into consideration matters relative to such an undertaking. The following gentlemen were selected members of the Committee; Baboo Prosanna Coomar Thakoor, Sreekissen Singh, Kissen Chunder Dutt, Ganga Charan Sen, Madhab Chunder Mullick, Tarachand Chukerburttee, and Huru Chunder Ghosh."

East Indian এই সংবাদটি দিয়া বিদ্রূপ করিয়া লেখেন—

"A theatre among the Hindoos with the degree of

knowledge they at present possess, will be like building a palace in the waste" এপ্রিল মাসের Asiatic Journal ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

তারপর ১৮৪১ সালে ব্যারিস্টার হেরমান জেক্রোয়া রিশি নামক একজন নাট্যকুশল বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া Oriental Seminaryর ছাত্রগণকে লইয়া সেক্স্পিয়ারের Julius Cæsar অভিনয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া ১৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় ৫০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু আর টাকা যোগাড় না হওয়ায় অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়।

তারপর ১২ বৎসর ইংরেজী বা বাঙলা কোন অভিনয়ের কথা শোনা যায় নাই। ইহার পর ১২৫২ সালে বটতলার যেখানে পূর্বে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্থাপিত ছিল, সেইখানেই সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা জুলিয়স সীজার নাটক অভিনয় করেন। Magistrate Home, Englislimenএর সম্পাদক Stoqueler প্রভৃতি বড় বড় লোক এই অভিনয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই অভিনয়ে দর্শকদিগের নিকট হইতে অর্থ লওয়া হইয়াছিল।

এই সময়ে নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট-নিবাসী পিয়ারীমোহন বসুর পুত্রগণ একটি অভিনয় করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করেন। ইহার বাড়িতে থিয়েটার খুলিবার জন্য অনেক টাকা চাঁদা তোলা হয়। ইঁহাদের অনুষ্ঠিত থিয়েটারে

১৮৫৩ সালে ওথেলো তিন রাত্রি,

" " জুলিয়স সীজার এক রাত্রি,

১৮৫৪ সালে মার্চেন্ট অফ ভেনিস দুই রাত্রি

এবং ১৮৫৫ " Henry IV ও পার্কার প্রণীত প্রহসন Amateurs দুই রাত্রি অভিনীত হয়।

একদিকে যেমন পিয়ারীমোহন বসুর বাড়িতে থিয়েটার চলিতেছিল, অপরদিকে আবার ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ভূতপূর্ব ছাত্রেরা অভিনয়ের উদ্যোগ করিতেছিল। এই উদ্যোগের প্রধান অনুষ্ঠাতা ছিলেন—দীননাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ দত্ত, রাধাপ্রসাদ বসাক, সীতারাম দে, ব্রজনাথ বসু[১] কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মল্লিক ও রাজরাজেন্দ্র মিশ্র। Sans Souci থিয়েটারের অভিনেতা Clinger Roberts-এর এবং চৌরঙ্গী থিয়েটারের অভিনেতা Parkerএর শিক্ষাধীনে দুই বৎসর থাকিয়া ১৮৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে ইঁহারা Othelo, Julius Cæsar, Marchant of Venice, Henry IV ও the Amateurs অভিনয় করেন। পিয়ারী বসুর বাড়িতে ইঁহারাই অভিনয় করিয়াছিলেন।

বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (তখন মহারাজ হন নাই) বিশেষ চেষ্টায় ঐ ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে বাঙলা অভিনয় আরম্ভ হয়। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় উদ্যোগী হইয়া ১৮৫৪ হইতে ১৮৫৬ সালের মধ্যে কোন সময়ে এই নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে ভদ্রার্জুন নাটক (১৮৫২), ভানুমতী চিত্তবিলাস (১৮৫৩) প্রভৃতি নাটক ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের তেমন আদর হয় নাই।

১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাদের পূর্ব নিবাস গৌরীভা-গ্রামে Hamletএর অভিনয় করেন। কেশববাবু Hamlet, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার Laertes এবং নরেন্দ্রনাথ সেন Ophelia সাজিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ নাটক না হওয়া পর্যন্ত এই অভিনয়ই চলিয়াছিল। এই অভিনয়ে দোকান থেকে সাহেবী পোষাক আনা হইয়াছিল। অভিনেতারা মুখমণ্ডল চিত্রিত করিতেন। ১৮৫৭

১ ইনি প্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুর পিতা।

সালের মার্চ মাসে চড়কডাঙ্গার বাবু জয়রাম বসাকের বাগানে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় হয়। জয়রামবাবু ইহার উদ্যোক্তা—নিজেও অভিনেতা। পরবর্তিকালের Royal Bengal Theatre-এর অধ্যক্ষ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ১৭ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করেন। এ ছাড়া নারায়ণ বসাক, ওরিয়েন্টাল সেমিনারির শিক্ষক জগদ্দুর্লভ বসাক, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহচর বন্ধু রাধাপ্রসাদ বসাক, আরবুথনট কোম্পানির মহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এবং বাগবাজারের রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির দল নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনয় দেখিতে আসিতেন।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ও জয়রাম বসাক-বাড়ির থিয়েটার দেখিবার জন্য জয়রামবাবুর বাড়ির অভিনয়ের পরদিনই আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) বাড়িতে 'শকুন্তলার' একটি মাত্র অঙ্ক বাঙলায় অভিনীত হয়। শরচ্চন্দ্র ঘোষ, প্রিয়মাধব বসুমল্লিক, মণিমোহন সরকার প্রমুখ অভিনেতারা ইহাতে ভূমিকা লইয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র ঘোষ উত্তরকালে বেঙ্গল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রিয়বাবু হোগলকুড়িয়া নিবাসী ছিলেন—ইহার কাজ ছিল যাত্রার সাট তৈরি করা। এই অভিনয়ে অভিনেতারা খুব মূল্যবান্ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন।

প্রিয়নাথ দত্তের উদ্যোগে গোপালচন্দ্র শেঠের বাড়ি 'কুলীনকুলসর্বস্বের' পুনরাভিনয় হইয়াছিল।

এই সমস্ত অভিনয়ের অনুকরণ বহুবাজার, শুঁড়ীপাড়া, ঝামাপুকুর প্রভৃতি স্থানেও আয়োজন অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। অভিনয়ের স্রোত কলিকাতা ভাসাইয়া ভবানীপুর ও শিবপুরে

তরঙ্গাভিঘাত করিয়া চুঁচুড়া, নড়াইল, জনাই প্রভৃতি স্থানে গিয়া লাগিল। কিন্তু সকল স্থানেই কুলীনকুলসর্বস্ব ও শকুন্তলার অভিনয় হইত। অন্য অভিনয়ের কথা কাহারও মনে স্থান পাইত না। তখন বার বার এই নাটক দেখিয়া লোকেরা নূতনের জন্য ব্যাকুল হইল, তখন আর এক অভিনয়ের সূচনা হইল।[১]

এই বৎসর এপ্রিল মাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার নিজের বাড়িতে রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় করান। নিজে রাজা সাজিলেন। বিহারীবাবু স্ত্রী চরিত্র অভিনয় করিলেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Banerji) অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার সাতমাস পরে নভেম্বরে সিংহ বাড়িতে পুনরায় অভিনয় হয়। এবারকার পালা ছিল—'বিক্রমোর্বশী' নাটক। কালীপ্রসন্নবাবু পুরুরবার ভূমিকার অভিনয় করেন। বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারি Sir Cecil Beadon প্রমুখ বড় বড় সরকারী কার্যাধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হইয়া এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের অধ্যক্ষগণের সহিত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দত্ত প্রভৃতির মনের অমিল হওয়ায় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি বাঙলা নাটক অভিনয় করিবার প্রস্তাব করেন। কেশবচন্দ্রের প্রতি স্থান নির্ণয়ের প্রস্তাব হয়। পরে ১৮৫৮ সালের ৩১এ জুলাই, ১২৬৫ বঙ্গাব্দের ১৬ই শ্রাবণ, শনিবার বেলগেছিয়ায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগানে বঙ্গানুবাদ করিয়া 'রত্নাবলী' প্রথম অভিনীত হয়। বড় বড় লোকে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর শিক্ষকতার ভার ছিল। রামনারায়ণ তর্করত্ন 'রত্নাবলী' তরজমা করিলেন। তাহাতে গান বাঁধিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য গুরুদয়াল

১ কিন্তু পরে চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে 'লীলাবতীর' অভিনয় হইয়াছিল। এই অভিনয়, গিরিশ, অর্ধেন্দু প্রমুখ বাগবাজার সম্প্রদায়ের লীলাবতী অভিনয়ের পূর্বে হইয়াছিল।

চৌধুরী। ছয় বার অভিনয় হয়। প্রথম পাঁচ বারে ঐকতান বাদন দেওয়া হয় নাই। শেষবারে ১৯এ অক্টোবরে সংগীতশাস্ত্রবিশারদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পালের প্রধান উদ্যোগে ঐকতান বাদন প্রথম প্রবর্তিত হয়। যদুনাথ পালের নেতৃত্বে গোস্বামী মহাশয় 'বেলগেছিয়া অবৈতনিক সম্প্রদায়' নামে এক দল গঠন করেন। প্রথমে পুরা দেশী সুরে গান গাহিবার ব্যবস্থা হয়। শেষরক্ষা হয় নাই। যাহা হউক এই অভিনয়ে কলিকাতা সরগরম হইয়াছিল। ছোট লাট স্যর ফ্রেডারিক হ্যালিডে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি বড় লোকেরা অভিনয় দেখিতে আসিতেন। ইহার পর বেলগেছিয়ায় 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র অভিনয় হয়। ইহাতে স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কঞ্চুকীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ সালে মাইকেল 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনা করেন। বেলগেছিয়ায় সেপ্টেম্বর মাসে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাহা অভিনয় করেন। নয় মাসের মধ্যে ইহার আটবার অভিনয় হয়। শুধু স্ত্রীলোকদের দেখাইবার জন্য একবার অভিনয় হইয়াছিল। ইহাদের অভিনয়ে বহু অর্থ ব্যয় হইত।

এই সময়ে জনাইএর প্রসিদ্ধ জমিদার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আহিরীটোলার বাড়িতে 'শকুন্তলা'র দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শরৎচন্দ্র ঘোষ, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীরামপুরের ম্যাজিস্ট্রেট্ এই অভিনয় দেখিয়াছিলেন। অভিনয়ের সুখ্যাতি 'ভাস্কর' ও 'প্রভাকরে' বাহির হইয়াছিল।

এই সময় আহিরীটোলায় জয়রাম বসাকের অধ্যক্ষতায় ও অভয়চরণ গুপ্তের শিক্ষকতায় শকুন্তলার আখড়াই চলিতেছিল। ১২৬৭ বঙ্গাব্দে ১৮৫৯ সালে বড়বাজার সিন্দুরিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাড়িতে কেশবচন্দ্র সেনের শিক্ষকতায় 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনীত হয়। তারপর ১২৭০ বঙ্গাব্দে ১৮৬৪ সালে শোভাবাজার

রাজবাড়িতে রাজা দেবীকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে অভিনয়ের চেষ্টা এবং "The Sobhabazar Private Theatrical Society"র সৃষ্টি হয়। গোপালচন্দ্র রক্ষিত, চন্দ্রকালী ঘোষ, কালীকৃষ্ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এবং রাজবাটীর কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ, অমরেন্দ্রকৃষ্ণ ও রাজেন্দ্রকৃষ্ণের উদ্যোগে 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হয়। রাজা দেবীকৃষ্ণের বাড়িতে ইহার অভিনয় হইত। তিনটি প্রকাশ্য অভিনয় হইয়াছিল। সুকবি হেমচন্দ্র এই অভিনয় দেখিয়াছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়টে এই অভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। শোভাবাজার রাজবাটীর এই দলে পরে 'কৃষ্ণকুমারী'র আখড়াই আরম্ভ হয়। এই সময় 'কৃষ্ণকুমারী' খুলিবার উদ্যোগ হয়। অভিনেতা কালিদাস সান্ন্যালের সঙ্গে রাজাদের মনোমালিন্য হওয়ায় কালিদাস-বাবু ও বাগবাজারের গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী উভয়ের চেষ্টায় এক নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। কালিদাসবাবু নিজে 'নলদময়ন্তী' নাটক রচনা করেন। ১২৭১ বঙ্গাব্দের (১৮৬৪ খৃঃ) মাঝামাঝি কৃতকর্মা কালিদাসবাবুর শিক্ষকতায় নলদময়ন্তীর অভিনয় হয়। দুই বৎসরে ১৪-১৫ বার অভিনয় হইয়াছিল। ল্যাদাড়ু শিরিশ (শিরিশচন্দ্র ঘোষ) এই দলে ছিল। চারিবৎসর পরেদল ভাঙিয়া যায়। এই দল অনেক স্থানে অভিনয় করিত। বর্ধমান রাজবাটী, ভাটপাড়ার ভট্টাচার্যবাড়ি, শিবপুর চৌধুরীদের বাড়ি, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি, বসুপাড়ার গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে এই দল অভিনয় করিয়া আসিয়াছে। পূর্বে আঢ্যের ভবন ব্যতীত কেহ অভিনয় করিতে যাইত না। বিদেশে অভিনয় এই দল সেই প্রথার পরিবর্তন আনিয়া দেয়। যাহা হউক এই দল ভাঙিয়া আর একটি দল গড়িয়া উঠিতেছিল। শ্যামবাজার ও বাগবাজারের কয়েকজন যুবক এই দলে যোগ দেন। ইহাদের মধ্যে বাগবাজার বসুপাড়া নিবাসী গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়পুত্র নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার দুর্গাদাস করের পুত্র রাধাগোবিন্দ

এবং রমানাথ করও ছিলেন। ভবানীপুরে এই সময় "অবৈতনিক নাট্য মন্দির" নামে একটি থিয়েটারের দল গঠিত হয়। ১২৭২ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের পুরাতন বাড়িতে উমেশচন্দ্র মিত্র-রচিত 'সীতার বনবাস' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। এ সময় গিরিশচন্দ্র মিত্র নামক একজন অভিনেতার বাজনার দলের খুব সুখ্যাতি জাহির হয়। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই দলে ছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ি ছিল বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসুর স্ট্রীটে। এই জায়গাকে লোকে তখন বসুপাড়া বলিত। এই অঞ্চলে পূর্বে তিনি এক ব্যায়াম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে তাহা নাট্য সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে কন্‌সার্ট পার্টিরও সৃষ্টি হইল। ইহাদের অধিকাংশ খরচ যোগাইতেন—নগেন্দ্রনাথ। আর নিজে তিনি এই পার্টিতে ঢোল বাজাইতেন। ইঁহাদের নাট্য সম্প্রদায় প্রথম প্রথম যাত্রা করিয়া বেড়াইতেন।

নগেন্দ্রবাবু গিরিশ মিত্রের দল ছাড়িয়া নিজ বাড়িতে এই কন্‌সার্ট পার্টি বসান। রাধামাধববাবু ও হিঙ্গুল খাঁ ইহাতে যোগ দেন। শেষ গিরিশবাবুর দল ভাঙিয়া এই দল পরিপুষ্ট হয়। এই দলের তুই এক বৎসর পূর্বে শ্যামপুকুর-নিবাসী ব্রজনাথ দেব শ্যামপুকুর ঐকতানবাদন সম্প্রদায় নামে একটি দল প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইঁহারই এই দলে সর্বপ্রথম ক্লারিওনেট বাঁশী বাজানো শুরু হয়। মহাকবি গিরিশচন্দ্র এই ব্রজবাবুর ভগিনীপতি। এই ব্রজনাথ বাবুরই পুত্র সুবিখ্যাত যন্ত্রবাদ্যবিশারদ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ওরফে ননীবাবু। এই সময়ে চারিদিকে নাট্যাভিনয়ের একটা চেষ্টা লক্ষিত হইয়াছিল এবং লোকে 'পদ্মাবতী' নাটকের অনেকটা অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল। ১২৭০ সালে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে একটা নাট্য সম্প্রদায় স্থাপিত হয়; ইঁহার রঙ্গমঞ্চ বাগ-বাজার-নিবাসী ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে নির্মিত হয়। ১২৮১ সালে ২-১ খানি নাটক অভিনয়ের পর, নাটকের অভাব

অনুভব হওয়ায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় 'বিদ্যাসুন্দর' নামে নাটক রচনা করেন। 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' 'মালবিকাগ্নিমিত্র' 'বুঝলে কিনা' 'মালতীমাধব' 'উভয় সঙ্কট' 'চক্ষুদান' 'রুক্মিণীহরণ' প্রভৃতি তাঁহার অনেক নাটক উক্ত সম্প্রদায় দ্বারাই অভিনীত হয়। ঐ সম্প্রদায়ের অভিনয় কালে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর একতানবাদক দল ঐকতান বাদ্য বাজাইতেন—এই বাদ্যে বেহালা ব্যতীত আর সমস্ত বাদ্যই দেশীয় ছিল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের বিদ্যা-সুন্দরের অভিনয় হইতেই নাটক ও প্রহসন একসঙ্গে অভিনীত হইতেও আরম্ভ হয়। ঠাকুরবাড়িতে একদিন উক্ত সম্প্রদায়ের অভিনয় কেবলমাত্র সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দেখানো হইয়াছিল এবং লর্ড লরেন্স ইহাতে উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়ে শোভাবাজারে একটি থিয়েটার সম্প্রদায় হয়। ১২৭৩ সালের ১লা পৌষ তারিখে প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি প্রকাশ্য অভিনয় করেন। ইহার পরে পটলডাঙ্গার আরপুলি গলিতে "আরপুলি নাট্যসমাজ" সংস্থাপিত হয়। ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে ১৮৬৬খ্রী° এপ্রিল, ইহারা 'মহাশ্বেতা,' 'শকুন্তলা,' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অভিনয় করেন। বাগবাজারে যখন নগেন্দ্রবাবুর বাজনার দল খুব বিখ্যাত, তখন শুঁড়ীপাড়ায় শুঁড়ীদের বাড়িতে ১২৭৩ সালে 'পদ্মাবতী' নাটক অভিনীত হয়। এই সময়ে কলিকাতার বহুপল্লী এবং উপকণ্ঠে নাট্যাভিনয়ের একটা প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। তৎপরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে জোড়াসাঁকো নাট্যসমাজ নামে এক নাট্যসমাজ স্থাপিত হয়। ইহারা প্রথমে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটিকা অভিনয়ের যোগাড় করেন। কিন্তু শেষে সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়া, রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের লিখিত 'নবনাটক' ১২৭৩ সালের ২২ পৌষ ১৮৬৭ খ্রী° ২৩এ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয়। ১২৭৩ বঙ্গাব্দ ইংরেজী ১৮৬৭ সালে কলিকাতায় নাটকাভিনয়ের বিরাট আয়োজন

চলিতেছিল। এটি ইতিহাসে স্মরণীয়। ইহার পর বিখ্যাত জয়চাঁদ মিত্রের পুত্র পাঁচকড়ি মিত্রের বাড়িতে (৩০৯, অপার চিৎপুর রোড) বটতলায় ১২৭৪ সালের ৩০এ ভাদ্র তারিখে 'পদ্মাবতী' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয়। এই দলে অভিনয় শিখাইতেন জোয়ালাপ্রসাদ ও নিতাই চক্রবর্তী। ১২৭৪ বঙ্গাব্দ (১২ই ফেব্রুয়ারি) শোভাবাজার রাজবাড়িতে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের' অভিনয় হয়। উত্তরকালের নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৩। ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন বিহারীলাল চক্রবর্তী।

চোরবাগানে 'চোরবাগান অবৈতনিক থিয়েটার' এই সময়েই স্থাপিত হয়, এবং 'উষা-অনিরুদ্ধ নাটক' ইহারা প্রথম অভিনয় করেন। এই সমিতির পরামর্শানুসারে 'বুঝলে কিনা' প্রহসন ঠাকুর বাড়িতে অভিনীত হয়। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কিছু কিছু বুঝি' নামে আর একখানি প্রহসন ১২৭৪ সালের ১৭ই কার্তিক অভিনীত হয়। (২রা নভেম্বর ১৮৬৭) ইহাতেই প্রথম অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও ধর্মদাস শূর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। ধর্মদাস শূর মহাশয় এই দলে যোগদান করিয়া রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের ভার গ্রহণ করেন। অর্ধেন্দুবাবু 'দণ্ডবক্র' 'মুরাদ আলি' ও 'চন্দনবিলাসের' ভূমিকা অভিনয় করিতেন, ধর্মদাস 'চন্দনবিলাসী' সাজিতেন। এই সময় 'বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ' নামক বহুবাজারের একটি নাট্য সম্প্রদায় 'সতীনাটক' 'রামের রাজাভিষেক' অভিনয় করেন। আর জয়রাম বসাকের বাড়িতে 'ভ্যালা রে মোর বাপ' প্রহসনের অভিনয় হয়।

বাগবাজারের শর্মিষ্ঠা-যাত্রা-সম্প্রদায়ের নগেন্দ্রবাবু প্রমুখ সংগীতা-মোদিগণ তাঁহাদের অন্যতম গীত-রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের সাহচর্যে একটি থিয়েটারের দল প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন। গিরিশবাবু আমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসেন। নাট্যশালার সহিত

গিরিশবাবুর সম্পর্ক এই প্রথম। ইহাতে অর্ধেন্দুবাবু শিক্ষক ছিলেন। ইনি নিমে দত্তরূপে রঙ্গমঞ্চে প্রথমে অবতীর্ণ হন। রাজা প্রভৃতির পরিচ্ছদ বহুব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি যুবকগণ দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সঙ্কল্প করেন। গিরিশবাবু এ বিষয়ে তাঁহার 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গপত্রে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই দল শ্যামবাজারের রাজেন্দ্র পালের বাটীতে মঞ্চ স্থাপনা করিয়া দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' অভিনয় করেন। ইহাতেই অমৃতলাল বসু প্রথম অবতীর্ণ হন। এই অভিনয় পূর্বোক্ত চুঁচুড়ায় লীলাবতীর অভিনয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। দীনবন্ধু অভিনয়-রজনীতে উপস্থিত ছিলেন। এবং অভিনেতৃবৃন্দের উৎসাহ বর্ধনের জন্য বলিয়াছিলেন,—"এবার চিঠি লিখিব ছুয়ো বঙ্কিম।"

১৮৬৮ সালে বাগবাজারের রাজবল্লভ পাড়ায় যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'রত্নাবলীর' আর একটি অভিনয় হইয়াছিল। এখানে প্রিয়নাথ বসু মল্লিক লিখিত 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনও অভিনীত হয়।

১২৭৫ সালের আশ্বিন মাসে বাগবাজার এমেচার থিয়েটার নামক এক দল প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে অভিনয়ার্থ আমন্ত্রিত হন। ক্রমশ এই দল পরিবর্তিত হইয়া অপর একটি দলে পরিণত হয়। এই নূতন দলের সহিত গিরিশবাবুর কোন সম্পর্ক ছিল না; এবং শেষোক্ত দলই সুপ্রসিদ্ধ ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অবস্থা। অন্নপূর্ণার ঘাটে ভুবন নিয়োগীর বৈঠকখানায় ইঁহারা আখড়াই আরম্ভ করেন এবং ১২৭৯ সালের কার্তিক মাসে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন নগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে ইঁহাদের ড্রেস রিহার্সেল হয়। পাথুরিয়াঘাটায় মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে ১২৭৯ সালের ২৩এ অগ্রহায়ণ (১৮৭২ খ্রী° ৭ই ডিসেম্বর) শনিবার টিকিট বিক্রয় করিয়া নীলদর্পণ অভিনীত হয়। বেলা ৪টা হইতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হয় এবং

৭টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রয় শেষ হইয়া গিয়াছিল। প্রথম রাত্রিতেই ৭০০৲ টাকার টিকিট বিক্রয়ে ইহাদের উৎসাহ দ্বিগুণ পরিবর্ধিত হইল। ইহার পর ৩০এ অগ্রহায়ণ জামাইবারিক এবং ৭ই পৌষ পুনরায় নীলদর্পণ অভিনীত হয়। ক্রমশ জামাইবারিক, নবীন-তপস্বিনী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতির অভিনয়ও হইতে লাগিল। কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ের সময় গিরিশবাবু আসিয়া এই দলে যোগদান করেন এবং প্রথমদিন 'ভীম সিংহ' অভিনয় করেন। যাহা হউক ১২৮০সালে বর্ষার প্রথমে নানা কারণে এই থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়।

এই থিয়েটার ভাঙিয়া গেলে ক্রমশ দুইটি দল হয়। একদলে গিরিশবাবু, ধর্মদাসবাবু প্রভৃতি এবং অপর দলে অর্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবু প্রভৃতি নায়কত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় টাউন হলে স্টেজ বাঁধিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার নামে Mayo Hospital ও Albert Hallএর সাহায্যের জন্য নীলদর্পণ অভিনীত হয়।

এই অভিনয়ে বাগবাজারের খ্যাতনামা বাবু দীনদয়াল বসু এরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, স্বীয়স্থান হইতে লম্ফপ্রদানে, রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া ছোট সাহেবের কলার ধরিয়া ঘুষি মারিতে উদ্যত হন। পরে জিব কাটিয়া প্রত্যাবর্তন করেন।

* * *

অর্ধেন্দুবাবু-প্রমুখ অভিনেতারা ন্যাশনাল থিয়েটারের নামে লিণ্ডসে স্ট্রীটে Opera House ভাড়া করিয়া অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হন। ৫ই এপ্রিল অর্ধেন্দুবাবু নাটকের অভিনয় করেন। এরূপ কিছু কালের পর এই উভয়দল আবার মিলিয়াছিলেন। পরে গিরিশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া স্যর রাজা রাধাকান্ত দেবের নাট্যমন্দিরে অভিনয় করেন। উপন্যাসের নাটকাকারে পরিবর্তন এই প্রথম।

শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির আনুকূল্যে ১২৮০

সালের ১লা ভাদ্র বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম অভিনীত নাটক শর্মিষ্ঠা। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির পরামর্শে এই সময় হইতেই স্ত্রী চরিত্রের অভিনয়ে বারাঙ্গনাগণকে নিযুক্ত করা হয়। ইহার পূর্বে রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রার দলে স্ত্রী অভিনেত্রীতে অভিনয় করিত। কিন্তু থিয়েটারে বারাঙ্গনার অভিনয় প্রচলিত ছিল না। যাহা হউক মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক এই থিয়েটারে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

১৮৭৩ খ্রী° ২৯এ সেপ্টেম্বর ভুবনমোহন নিয়োগীর ব্যয়ে ও যোগেন্দ্রবাবুর তত্ত্বাবধানে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং ৩১এ ডিসেম্বর ইহাতে অভিনয় আরম্ভ হয়। ইহার কিছু পরে ১৮৭ খ্রী° বেঙ্গল থিয়েটারের আদর্শে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেও স্ত্রী অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়। ১৮৭৪ খ্রী° ১৯এ সেপ্টেম্বর এই রঙ্গালয়ে 'সতী কি কলঙ্কিনী'র প্রথম অভিনয় হয়।

এই সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। তাহাতে রঙ্গালয়ের স্বাধীনতার উপর প্রথম হস্তক্ষেপ হয়। ১৮৭৫ সালের শেষে Prince of Wales (Edward VII) কলিকাতায় আসেন। তিনি হিন্দুমহিলামহল দেখিতে ইচ্ছা করায় ভবানীপুর বকুলবাগানের জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় (ইনি হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল ছিলেন) যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করেন। কবি হেমচন্দ্রের 'বাজিমাত' কশাঘাতের জন্য ঘটনাটি লোকে ভুলিতে পারে নাই। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া 'গজদানন্দ' প্রহসন অভিনয় করেন। তাহার পরে সরকার বাহাদুর 'Dramatic Performance Act' আইন জারী করিয়া প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করেন। Proscribed করিবার প্রথার ইহাই সূত্রপাত। নীলদর্পণের অভিনয়ও বন্ধ হয়। কিন্তু পরে 'কোর্ট'-দৃশ্য বাদ দিয়া নীলদর্পণ অভিনয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। নীলদর্পণ এইরূপে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইলে

১৮৭৯ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটার নীলদর্পণের অভিনয় শুরু করেন এবং অনেকদিন ধরিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনয়ে অমৃতলাল বসু মহাশয় সৈরিন্ধ্রীর বদলে ছোটসাহেবের ছোট ভাই বিন্দুমাধব সাজিয়াছিলেন। এই বৎসর বর্ষাকালে রবিবার বেলা তিনটার সময় নীলদর্পণের অভিনয় হয়। ইহা হইতে রবিবার অভিনয় আরম্ভ হয়। পূর্বে বুধ ও শনিবারে থিয়েটার হইত।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হস্তান্তরিত হইলে ১৮৮৩ সালে স্টার থিয়েটার প্রথম স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর ২৩এ জুলাই বীডন স্ট্রীটে গিরিশবাবু ও অমৃতবাবু প্রভৃতি কয়েকজনের চেষ্টায় এই থিয়েটারের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। গিরিশবাবুর রচিত 'দক্ষযজ্ঞ' ইহার প্রথম অভিনয়ের পুস্তক। ধনকুবের বাবু গোপাললাল শীলের থিয়েটার করিতে ইচ্ছা হওয়ায় ১৮৮৮ সালে তিনি বীডন স্ট্রীটের Star Theatre বাটী ৩০,০০০ টাকায় কিনিয়া লন এবং অনেক ব্যয় করিয়া Emerald Theatre সৃষ্টি করেন ও অর্ধেন্দুবাবুকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দলগঠন করেন। 'পাণ্ডব-নির্বাসন' ইহার প্রথম অভিনীত নাটক। কেদারনাথ চৌধুরীর অধ্যক্ষতায় ইহার কিছুদিন বেশ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার পর গিরিশবাবু অধ্যক্ষ; তারপর মতিলাল সুর; পরে মহেন্দ্রলাল বসু; তৎপরে অর্ধেন্দু অধ্যক্ষরূপে ইহা পরিচালনা করেন। শেষে ইহা লুপ্ত হইয়া যায়। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই নাট্যশালা ভাড়া করিয়া ক্লাসিক থিয়েটার স্থাপন করেন।

বাবু গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পরে বীডন স্ট্রীট পরিত্যাগ করিয়া স্টার থিয়েটার বর্তমান স্থানে স্থাপিত হয়। এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক 'নসীরাম'। যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের তত্ত্বাবধানে স্টার রঙ্গমঞ্চ নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে (১৮৯২ খ্রী°) মিনার্ভা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা

হয়। ১৬ই মাঘ 'ম্যাকবেথ' লইয়া ইহার প্রথম অভিনয় আরম্ভ হয়। নগেন্দ্রভূষণ মুখোপধ্যোয় ইহার স্থাপয়িতা। ইতিমধ্যে মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে কবি রাজকৃষ্ণ রায় 'বীণা রঙ্গভূমি' নামে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন। এই নাট্যশালার বৈশিষ্ট্য এই যে, স্ত্রীলোকের ভূমিকায় পুরুষেই অভিনয় করেন। কিন্তু এই কার্যে তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। পরে এই রঙ্গমঞ্চে অক্ষয়কালী কুমার কিছুদিন এরিয়ান নাট্যসমাজ পরিচালনা করেন, পরে এইখানে নীলমাধব চক্রবর্তী সিটি থিয়েটার স্থাপিত করেন। ইহার পরিচালনায়ও নাট্যশালা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

শ্রীশচন্দ্র বসু ১৯১২সালে ফেব্রুয়ারি মাসে নিজে নাটক রচনা করিয়া ইংরেজীতে লণ্ডন নগরে 'বুদ্ধ' অভিনয় করেন। বিলাতে বাঙালীর অভিনয় একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। এইগুলি ব্যতীত মনোমোহন, গেইটী, অরোরা ইউনিক, থেসপিয়ান টেম্পল, প্রেসিডেন্সী, গ্রাণ্ড, সিটি, গ্রেট ন্যাশনাল, ন্যাশনাল, কোহিনূর, কর্নওয়ালিস থিয়েটার প্রভৃতি ও কলিকাতার বাহিরে বাঙলাদেশে বিশেষত ঢাকায় অনেক রঙ্গমঞ্চ ছিল।

আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চগুলি এখনও ঠিক পাশ্চাত্য জগতের প্রতিষ্ঠানগুলির মতো শিক্ষাদীক্ষার স্থান না হইলেও কালে যে তাহা হইয়া উঠিবে সে আশা কি সুদূরপরাহত? যেখানে দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ সুধী নাট্যকারগণের অমর লেখনীমুখে শতশত নরনারীর ভাবানুভূতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, যেখানে গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল, অমৃত মিত্র, অমরেন্দ্র, দানীবাবু, মহেন্দ্রবাবু, অপরেশ, শিশিরকুমার প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন অভিনেতা বাঙলার নাটকগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, যেখানে রসানুভূতি কলাসৌকুমার্যে প্রদর্শিত হইতেছে, যেখানে পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা ও পুণ্যের প্রতি আগ্রহ স্বতই মন হইতে উৎসারিত হয়, যেখানে আনন্দের ভিতর

দিয়া ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব, শঙ্কর ও রামানুজের অদ্বৈতবাদের ও শ্রীচৈতন্যে ভক্তির প্রস্রবণ ছুটে, সেখানে কি শিক্ষাদীক্ষার উপাদানের অভাব হইবে? আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব। জাতীয় সাহিত্য হইতে জাতীয় উদ্দীপনায় পুষ্টি হয়। ফরাসি-বিপ্লবের ইতিহাসে ইহার অমোঘ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাঙলার নীলদর্পণও ইহার দৃষ্টান্তস্থল। জাতীয় সাহিত্যও জাতীয় রঙ্গালয়ে প্রতিফলিত হয়। যেমন সংবাদ-পত্র রাজ্য-শাসনে একটি প্রভূত শক্তি, জাতীয় রঙ্গালয়ও সেইরূপ একটি প্রতাপশালী অধিষ্ঠান। ইহার যাথার্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য পূর্বোক্ত Dramatic Performance Act এবং অধুনাতন proscribed-এর কথা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কেবল রাজ্যশাসনেই রঙ্গালয়ের শক্তি লক্ষিত হয় না, সমাজশাসনেও ইহা একটি কঠোর অস্ত্র। দীনবন্ধু প্রভৃতির নাটকাভিনয়ে ইহার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। সরকার বাহাদুর রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হইতেই তাঁহাদের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং এখনও রাখিতেছেন। যখন নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' অভিনয়ে কলিকাতায় হুলুস্থুল পড়িয়াছিল, সেই সময়ে তিনি এবং অমৃতলাল বসু পুলিস কর্তৃক ধৃত হন, কিন্তু হাইকোর্টের জজ রঙ্গভূমির হিতাকাঙ্ক্ষী Sir John B Phear সাহেবের নিকট habeas corpus দরখাস্তে তাঁহারা মুক্ত হন। তৎপরে উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় কয়েক বৎসর বিলাতে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন; তাহাতে তাঁহার প্রণীত 'দাদা ও আমি' অভিনীত হয়। ঐ থিয়েটারে তিনি 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করেন। রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তাঁহার নাম উল্লেখ না করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হয়। আর একটি কথা বলিব। রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রবর্তক বলিয়া তিনি যে শুধু প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার তাহা নহে; একজন স্বদেশ-হিতৈষী নায়কও

বটে। পুলিসের নিকটে যাঁহারা দেশের জন্য ভুগিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও তিনি একজন অগ্রণী।

কন্নড নাটক

কন্নড নাট্য-জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দশম শতাব্দী হইতে ইহা বিস্তারলাভ করিতে আরম্ভ করে। প্রমাণ হিসাবে তখনকার লেখকদের লেখায় নাট্যসম্বন্ধীয় আলোচনা কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হইল। আদিপম্পা (৯৪১) তাঁহার 'আদি-পুরাণে' এই বিশ্বকে একটি সুদর্শন অভিনেতার সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'শান্তিপুরাণে' পোন্না-চন্দ্রোদয়কে মঞ্চাধ্যক্ষের (সূত্রধার) সহিত এবং তারকাবলীর সহিত মঞ্চের বিক্ষিপ্ত পুষ্প-রাশির তুলনা করিয়াছেন। তিনি রাত্রির চারিটি প্রহরের সহিত নাটকের চারিটি অঙ্কের এবং অপসৃয়মান অন্ধকারের সহিত যবনিকা-উত্তোলনের তুলনা করিয়াছেন। কন্নের গদাযুদ্ধে (৯৩২) মঞ্চ পরিচালনা এবং নাটকীয় কলাকৌশলের বিষয় লিখিত আছে। সোরাব-লিপিতে (২৮, ১২০৮) বীরবল্লভকে শিবের ন্যায় তাণ্ডব নৃত্যপরায়ণ একটি অভিনেতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্র তাহার রঙ্গভূমি, শত্রুর ছিন্ন মস্তকগুলি তাহার নিকট মন্দিরা বাদ্যের ন্যায়, যুদ্ধশেষে জয়সূচক বাদ্যধ্বনি তাহার অভিনয়কালীন গীতি-বাদ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং পরাজিত নৃপতিগণের মস্তকের খুলিসকল তাহার কণ্ঠে মাল্যের রূপ গ্রহণ করে। যদি ঐ সময়ে নাটক অভিনয়ের প্রচলন না থাকিত এবং লেখকগণ বা কবিগণ তাহা পরিদর্শন না করিতেন তাহা হইলে নাটক এবং অভিনেতা সম্বন্ধে এইরূপ সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা তাঁহারা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন না। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের উপস্থিতিতে বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদে যে নাটক অভিনীত হইয়াছিল তাহার

প্রমাণ তেন্নাল রামকৃষ্ণের ইতিহাসে পাওয়া যায়। বৈয়াকরণিক ভট্টকলঙ্কদেব তাঁহার 'শব্দানুশাসন' পুস্তকে বলিয়াছেন যে শব্দতত্ত্ব (philology), দর্শনশাস্ত্র, রাজনীতি, নাটক, অলঙ্কারশাস্ত্র, কলাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায় (১৬০৪)। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম নাট্যকার (১৬৬৫) হিসাবে আমরা মুম্মড়ি তম্ম-ভূপালের (Mummadi Tamma-bhupal) নাম পাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং এমন কি তাঁহার কোন গ্রন্থের নাম পর্যন্তও জানা যায় না। তাঁহার নাটক অর্ধ উন্নত যক্ষগানে লিখিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে রত্নাকরবর্ণির (১৫৫৭) ভরতেশবৈভবের পূর্ব-নাটক-সন্ধি এবং উত্তর-নাটক-সন্ধি নামক দুই নাট্য-সন্ধিতে এই যক্ষগানের উল্লেখ আছে।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত নাট্যকারেরা এই যক্ষগানেই তাঁহাদের নাটক লিখিতেন। যক্ষগানে লিখিত 'হনুমদবিলাস', 'প্রহ্লাদ', 'গয়াচরিতে', 'দ্রৌপদীবস্ত্রহরণ', 'বাণাসুর' এবং 'কৃষ্ণ পারিজাত' নামকগুলি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। মরাঠী রঙ্গজগতে এই সকল নাটক বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; তাহার উন্নতির মূলে এই সকল নাটক যে প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহা অপ্পাজী বিষ্ণু কুলকর্ণির 'মরাঠী রঙ্গভূমি' নামক গ্রন্থে জানা যায়। উত্তর কানাড়া হইতে ভাগবত নামে একটি থিয়েটারের দল ১৮৪২ খ্রী° সাংলিতে (Sangli) আসিয়াছিল এবং সাংলির নেতা অপ্পা সাহেবের সম্মুখে তাহারা তাহাদের দুই তিনখানি নাটক অভিনয় করিয়াছিল। সকল অভিনয়ে অপ্পা সাহেব অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনি বিষ্ণুপন্ত ভাবে নামক এক ব্যক্তিকে মরাঠীতে ঐরূপ নাটকের অভিনয় করিতে বলেন। বিষ্ণুপন্ত ভাবে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া ১৮৪৩ খ্রী° মরাঠীতে তাঁহার প্রথম নাটক 'সীতা-স্বয়ম্বরা' অভিনয় করেন। মরাঠী রঙ্গভূমিতে

সুচারুসঙ্গত অভিনয়ের এই প্রথম আরম্ভ। কিল্লিকেতঙ্গের পুতুল-নাচ দাসেদের অভিনয় হইতে আধুনিক কন্নড নাটক এবং রঙ্গভূমির উদ্ভব হয়। নীচ বংশজাত এবং যাযাবর প্রকৃতির লোক, এই কিল্লিকেতরা রামায়ণ এবং মহাভারত হইতে আখ্যানভাগ লইয়া একটি ছোট মঞ্চে পুতুল-নাচ দেখাইত।

ক্রমে দাসেদের অভিনয় আরম্ভ হইল। ইহারা অস্পৃশ্য জাতি, দিনের বেলায় ভিক্ষা করিত এবং প্রয়োজন হইলে রাত্রে মন্দির-প্রাঙ্গণে বা গ্রামের বাহিরে কোন মাঠে অভিনয় করিত। তাহাদের কোন মঞ্চ বা যবনিকার প্রয়োজন হইত না। ইহারা গীতি-প্রহসনই অভিনয় করিত।

কিন্তু জনসাধারণ এইরূপ অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইত না। তখন তাহারা মঞ্চের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং অদ্ভুতরস, বীররস এবং করুণরস সমন্বিত দুইটি মহাকাব্য হইতে আখ্যানভাগ লইয়া অভিনয় করিতে আরম্ভ করিল। মঞ্চাধ্যক্ষ নিজে হাস্যরসের প্রধান চরিত্র গ্রহণ করিতেন এবং করুণ রসাত্মক অংশগুলি নারী চরিত্রের জন্য নির্দেশিত হইত। বীর এবং অদ্ভুতরস প্রধান চরিত্রগুলি কেবলমাত্র পুরুষ অভিনেতাদের জন্য লিখিত হইত। নাটকের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত প্রায় সর্বক্ষণই মঞ্চাধ্যক্ষ এবং তাহার সহকারী নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের ইঙ্গিত-নির্দেশক গান গাহিত। চরিত্রগুলি বেশী কথাবার্তা কহিত না। এইরূপ অভিনয়কে-'দোড্ডাটস' (doddatas) বলা হয়।

ইহার পর কন্নড নাটকের ক্রম-উন্নতি আরম্ভ হয়। দোড্ডাটসের পরবর্তী উন্নত স্তর হইতেছে যক্ষগান। এইরূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কন্নড নাট্য-জগৎ আধুনিক উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নাট্য-সাহিত্য এবং নাট্যাভিনয় এই উভয়দিক দিয়াই এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ সালে বেঙ্কট বরদাচার্য লিখিত 'তপতী কল্যাণ' নাট্যসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন।

সিঙ্গরার্যের 'মিত্র গোবিন্দ' (১৬৮০) প্রাচীন কন্নড সাহিত্যের প্রথম নাটক। ইহা সংস্কৃত নাটক রত্নাবলীর অনুবাদ। এই সময় হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত কন্নড-সাহিত্যে প্রায় পনের শত নাটক লিখিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। তবে প্রায় পাঁচ শত নাটক মহীশূরের Government Oriental Libraryতে সংরক্ষিত আছে। এই সকল নাটক কোনটি বা পদ্যে কোনটি বা গদ্যে লিখিত, কোনটি বা প্রহসন। প্রথম দিকে এই নাট্যসাহিত্য তত উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই কিন্তু পরে যখন দেশের সর্বত্রই শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করিতে লাগিল তখন ইহার দ্রুত উন্নতি হয়। এই সময় শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী, মৃচ্ছকটিক, বেণীসংহার, উত্তর-রাম-চরিত, মালতী-মাধব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকই যে কেবলমাত্র কন্নড ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল তাহা নহে, মার্চেন্ট অফ ভেনিস, ওথেলো, হ্যাম্‌লেট, মিড্‌সামার নাইট্‌স ড্রিম, কমেডি অব এরর্‌স, টেমিং অব দি স্রু প্রভৃতি সেক্সপীয়রের বিখ্যাত ইংরেজী নাটক হইতেও কন্নড ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। অনেক প্রহসন এবং সামাজিক নাটকও রচিত হইয়াছিল। এই সময়ে পাঁচ শতেরও অধিক নাটক লিখিত হইয়াছিল।

দোড্ডাটস এবং যক্ষগান রীতিতে যে সকল নাটক লিখিত হইয়াছিল সেগুলির মূল ঘটনা মহাকাব্য হইতে সংগৃহীত, সেইজন্য এই নাটকগুলি একদিক দিয়া তেমন আনন্দ দিতে পারে নাই। মহাকাব্যের জগৎ বাস্তব জগতের সহিত সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যহীন; ইহার ঘটনাবলী, ইহার অধিবাসীরা এমন এক জগতের সংবাদ আনিয়া দেয় যাহার সহিত বাস্তব জগতের অধিবাসীরা একান্তভাবেই অপরিচিত। সেইজন্য জনসাধারণ এই সকল নাটককে আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিত না। ক্রমবর্ধমান জ্ঞানালোকের সাহায্যে তাহাদের মন উন্নত হইয়াছিল এবং সেইহেতু বাস্তব জগতের ইতিবৃত্ত

অধিবাসীদের দৈনন্দিন ইতিহাস জানিবার ইচ্ছায় তাহাদের মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। নাটকের মধ্যে মহাকাব্য সম্পর্কিত আখ্যানভাগে তাহারা মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনসাধারণের মনোমত এইরূপ নাটক প্রথম রচিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহার বিশেষ উন্নতি হয়। এই সময় হইতে কন্নড নাটকে সংগীত বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত, কেবল প্রহসনে (সংস্কৃত নাটকের) অনুবাদমূলক নাটকে তাহার স্থান থাকিত না।

নাটকের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাও বিশেষরূপ বর্ধিত হইয়াছিল। জনকতক উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের নাম এই স্থানে উল্লিখিত হইল। সংস্কৃত নাটকের বিখ্যাত অনুবাদক হিসাবে বসডপ্প-শাস্ত্রী, শ্রীকণ্ঠেশ গৌড়, শেষগিরিরাও তুরমরি (Sesagirirao Turamari) এবং ধন্দ নরসিংহ মুলবাগল (Dhonda Narasinha Mulabagala) কন্নড-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইহাদের পরে সেক্সপীয়রের নাটকের অনুবাদক হিসাবে গুণ্ড কৃষ্ণ চূরমরি (Gundo Krisna Curamari), বাসুদেবাচার্য কেরুরা (Vasudevacarga Kerera), এ আনন্দরাও, চন্নবসবপ্প বসভলিঙ্গপ্প (Canna-basavappa Basavalingappa) এবং হোন্নাপুরমঠ (Honna-puramatha) প্রভৃতির নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহারা অধিকাংশ অনুবাদ গদ্যেই করিয়াছিলেন। ইহার পরে বালাচার্য সক্করি এবং শান্তকবি তাহাদের গ্রন্থরাশির মধ্যদিয়া নাট্যসাহিত্যে এক নূতন ধারা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন; অভিনেতা এবং নাট্যকার কৃষ্ণরাও মুদভেদকর (Krisnarao Mudavedakar) নাটক রচনায় তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস কবি সুলিবিল ডি সামরায় (Sulibele D. Samaraya) এবং এরি শেষর (Eri Seser) নাটকগুলিও বেশ সুচারুরূপে অভিনীত হইয়াছিল। সংগীতের

দিক দিয়া মরাঠা মঞ্চের প্রভাব হিরেমঠর (Heramattra) নাটকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়।

কন্নড সাহিত্যকে নিম্ন লিখিত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

অনুবাদ মূলক নাটক—সংস্কৃত, শকুন্তলা, উত্তররাম, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়, মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব, রত্নাবলী, বেণীসংহার, প্রিয়দর্শিকা প্রভৃতি, এবং সীতা স্বয়ম্বরা এবং অন্যান্য বাঙলা নাটকও অনূদিত হইয়াছিল। সামাজিক রীতিনীতি সর্বত্রই সমান থাকায় এই সকল নাটকের অনুবাদে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। ইংরেজী রীতিনীতির সহিত ভারতীয়দের মিল না থাকিলেও মার্চেন্ট অফ ভেনিস্‌, মিডসামার নাইট্‌স, টেমিং অব দি স্রু, কমেডি অব এরর্‌স, ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, অ্যাজ ইউ লাইক ইট প্রভৃতি সেক্সপীয়রের নাটকগুলি যথাসম্ভব ভারতীয় আবহাওয়ায় উপযুক্ত করিয়া অনুবাদ করা হইয়াছিল।

কাব্য নাটক—সুভদ্রা, দ্রৌপদী, প্রহ্লাদ, কৃষ্ণলীলা, হরিশ্চন্দ্র, নল, কৃষ্ণার্জুন, কালগ (Kalaga) পাদুকা পট্টাভিষেক, পদ্মাবতী পরিণয় প্রভৃতি কাব্য নাটকগুলি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

ভাবপ্রধান (romantic) নাটক—গুলেবকাবলী, বিধবা-বিবাহ, কৌমুদী, মোহনাস্ত্র এবং এই ধরনের অন্যান্য কতকগুলি নাটক এই ভাবপ্রধান নাটকের অন্তর্ভুক্ত।

ঐতিহাসিক নাটক—স্থান কাল এবং বিষয়ের সত্যতা ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান বিশেষত্ব। যুবরাজ কণ্ঠিরব কল্যাণ, তালিকোটের কালচা, প্রতাপরুদ্রদেব, মার-নাটক, করিয়-ভণ্ট প্রভৃতি নাটক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক নাটক—বিষম-বিবাহ, সারদা, টোল্লু-গট্টি, সহকার প্রভৃতি নাটক সামাজিক নাটক বলিয়া অভিহিত হয়।

ধর্ম-নাটক—রণুকা, অনুসূয়া, গুরু-দত্তরায়, শনিমাহাত্ম্য, বসবেশ্বর

প্রভৃতি নাটক যদিও কাব্য সম্পর্কিত তথাপি ধর্ম এবং নীতি প্রচার উদ্দেশ্যে ইহারা লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের ধর্ম-নাটক বলা হয়।

প্রহসন—মহাবধির প্রহসন, কলহপ্রিয়া, মত্তুবেয় গলবিলি লক্কা-লক্কি ফার্স্ প্রভৃতি প্রহসনগুলি মঞ্চে সুনাম অর্জন করিয়াছিল।

কেরল নাটক চক্র

সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবত কেবলমাত্র কেরল নামক স্থানেই প্রাচীন রীতি অনুসারে সংস্কৃত নাটকগুলি অভিনীত হইত। যে রঙ্গালয়ে এই নাটকগুলি অভিনীত হইত তাহা উচ্চবংশজাত হিন্দুদিগের বেশ জনপ্রিয় প্রমোদস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এই স্থানীয় রঙ্গালয়ের পশ্চাতে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে; কেরলের রাজা দ্বিতীয় পেরুমালের রাজত্ব সময়ে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে শেষ দুই পেরুমালের সময়ে কেরলের নাট্যজগৎ উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এই দুই পেরুমাল যে কেবলমাত্র কবি ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা অভিনয় এবং রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কিত সমস্ত কলা-কৌশলের বিষয় বিশেষ রূপে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং মন্ত্রী থোলানের সহযোগিতায় রঙ্গজগতের উন্নতিসাধনকল্পে তাঁহারা ইহার যথেষ্ট পরিবর্তন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অভিনীত নাটকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১. সুভদ্রা-ধনঞ্জয়।

২. তপতী-সম্বরণ।

৩. নাগানন্দ।

৪. মহানাটক।

এই নাটকগুলির বিভিন্ন অঙ্কের কোন বিশিষ্ট নাম পাওয়া যায় নাই।

৫. ভগবদ-অজ্জুক।

৬. মত্তবিলাস

৭. কল্যাণ-সৌগন্ধিক।

৮. মধ্যম-ব্যাযোগ।

৯. শ্রীকৃষ্ণদূত বা দূতবাক্য।

১০. দূত-ঘটোৎকচ।

১১. কর্ণ-ভার বা কর্ণ-কবচ।

১২. উরুভঙ্গ।

৫-১২ নম্বর নাটকগুলি এক অঙ্কে সমাপ্ত; অঙ্কের নামগুলি উপরে উল্লিখিত হইল।

১৩. পঞ্চরাত্র।

এই নাটকটির দুইটি অঙ্কের নাম পাওয়া গিয়াছে; তাহাদের নাম—ভেট্টাঙ্ক এবং ভীষ্ম-দূতাঙ্ক।

১৪. অভিমারক। প্রথম পাঁচটি অঙ্কের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহারা, (১) আনেট্টাঙ্কম্, (২) দূতাঙ্কম্, (৩) অভিসরিয়াঙ্কম্, (৪) পর্ভাঙ্কম্, (৫) মাদমেট্টাঙ্কম্।

১৫. আশ্চর্য-চূড়ামণি। বিভিন্ন অঙ্কের নামগুলি ১। পর্ণ-শালাঙ্কম্, ২। শূর্পনখাঙ্কম্ ৩। মায়াঙ্কম্, ৪ জটায়ুবধাঙ্কম্, ৫। অশোকবণিকাঙ্কম্, ৬। অঙ্গুল্যাঙ্কম্।

১৬. অভিষেক-নাটক। অঙ্কগুলির নাম,—বালি-বধম্, মায়া-শিরসাঙ্কম্। অন্য অঙ্কগুলির নাম পাওয়া যায় নাই।

১৭. প্রতিমা-নাটক। অঙ্কগুলির নাম,—বিচ্ছিন্নাভিষেকাঙ্কম্, বিলাপাঙ্কম্, প্রতিমাঙ্কম্, অটব্যমাঙ্কম্, রাবণাঙ্কম্, ভরতাঙ্কম্, অভিষেকাঙ্কম্।

১৮. প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ। অঙ্কগুলির নাম,—মন্ত্রাঙ্কম্, মহাসেনাঙ্কম্, আরাট্টাঙ্কম্।

১৯. স্বপ্ন-বাসবদত্তা। অঙ্ক ছয়টির নাম,—ব্রহ্মচর্যাঙ্কম্, পত্তাট্টাঙ্কম্, পুত্তুদাঙ্কম্, সেফালিকাঙ্কম্, স্বপ্নাঙ্কম্, চিত্রফলাঙ্কম্।

২০. বালচরিত। একটি অঙ্কের নাম মল্লাঙ্কম্। অপরগুলির নাম পাওয়া যায় নাই।

২১. চারুদত্ত। একটি অঙ্কের নাম বসন্তসেনাঙ্কম্। চাক্যারের (cakyar) মতে।

২২. শ্রীকৃষ্ণ-চরিত।

২৩. উন্মাদ-বাসবদত্ত।

২৪. শাকুন্তলা।

উপরি উক্ত এই নাটকগুলি তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে; (ক) যেগুলি আজ পর্যন্ত জনগণের নিকট হইতে প্রশংসা আদায় করিয়াছে, (খ) যেগুলি একসময়ে তাহা করিয়াছিল, (গ) যেগুলি জনপ্রিয় বলিয়া বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। প্রথম চারিটি ৬, ৭, ৮, ৯, ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ নম্বরের যে নাটকগুলি, সেগুলি 'ক'এর শ্রেণীতে পড়ে। শেষ তিনটি নাটক (২২, ২৩, ২৪ নম্বরের) 'গ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বাকী নাটকগুলি 'খ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

কেরলের শেষ পেরুমালের পূর্ববর্তী কোন এক রাজকুমার কর্তৃক রঙ্গালয়ের জন্য ধনঞ্জয় এবং তপতীসম্বরণ নাটকদ্বয় লিখিত হয়। কেরলে তখনও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব থাকাতে নাগানন্দ নাটকটি বিশেষ-ভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল। মহানাটক নামক নাটকটির কোন মৌলিকতা নাই, ইহা বিভিন্ন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অংশ লইয়া রচিত। ইহার বিশেষত্ব এই যে কেবলমাত্র এই নাটকটিই দিবাভাগে অভিনীত হইত। ভগবদজ্জুক একটি অপ্রকাশিত ক্ষুদ্র প্রহসন, ইহা মঞ্চের খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এই ভগবদজ্জুক এবং মত্তবিলাস এই দুইটি জনপ্রিয় প্রহসনই তখন অভিনীত হইত। Bulletin of the school of oriental studies-এ প্রকাশিত কল্যাণ-সৌগন্ধিক নাটকখানি দুইটি কারণে জনগণ কর্তৃক আদৃত হইয়াছিল। প্রথমত ইহা কোন এক চাক্যারের (cakyar) রচনা বলিয়া মনে হয়, এবং দ্বিতীয়ত ইহাতে অভিনয় কৌশল প্রদর্শন করিবার

যথেষ্ট সুযোগ আছে। বিখ্যাত অজগরনৃত্যম এই নাটকের একটি বিশিষ্ট অংশ।

পাঁচখানি এক অঙ্কের নাটকের মধ্যে দূতবায় বা শ্রীকৃষ্ণদূত নামক নাটকখানি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যদিও পঞ্চরাত্র এবং অভিমাবক নামক দুইখানি বেশ সুনামের সহিত অভিনীত হইয়াছিল তথাপি ইহারা সাধারত বেশী অভিনীত না। নাট্য-সাহিত্যের দিক দিয়াও ইহারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। চাক্যারদের অভিনয় করিবার মত যথেষ্ট উপাদান 'কল্যাণ-সৌগন্ধিক' নামক নাটকে পাওয়া যায়।

শ্রীরামের স্বপ্ন লইয়া, চূড়ামণি, অভিষেক এবং প্রতিমা নামক তিনখানি নাটক রচিত হইয়াছিল তাহাদের সর্বসুদ্ধ একুশটি অঙ্ক আছে। অঙ্কগুলি সমস্তই বেশ সুন্দর কিন্তু পরবর্তিকালে অভিনেতারা কেবলমাত্র কতকগুলি নির্বাচিত দৃশ্য অভিনয় করিত। চাক্যারদের মধ্যে এই নাটক তিনটি চেরিয়া-অভিষেকম, ভালিয়া-অভিষেকম, এবং পহুকা-অভিষেকম নামে অভিহিত ছিল। ইহার পরের তিনটি নাটকের একটি করিয়া অঙ্ক আজ পর্যন্ত প্রশংসিত হইয়া আছে। চারুদত্ত নাটকের মঞ্চে জনপ্রিয়তা বিষয়ে কিছুই জানা যায় নাই। চূড়ামণির লেখক শক্তিভদ্র রচিত উন্মাদ বাসবদত্ত বেশ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইতে পারিত। কিন্তু নাটকখানি পাওয়া যায় না। শাকুন্তলা কেবলমাত্র একবার মঞ্চস্থ হইয়াছিল, কিন্তু যখন চাক্যার প্রথমদৃশ্য অভিনয় করিতে নামিয়াছিল তখন তাকাইতে গিয়া চক্ষুদুটি কাটিয়া গিয়াছিল। ইহার পরে স্থানীয় মঞ্চে ইহা আর অভিনীত হয় নাই। মঞ্চোপযোগী সর্বসুদ্ধ বাহাত্তরখানি নাটকের সন্ধান আমরা পাই। এমন আরও অনেক নাটক আছে যেগুলি এখন লোক চক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। আশা করা যায় সময়ে সেগুলিকে লোকচক্ষুর সমক্ষে বাহির করিতে পারা যাইবে।

তালের দিকে ঝোঁক, আর তালে তালে অঙ্গবিক্ষেপের দিকে ঝোঁক মানুষের প্রকৃতিতে দৃঢ়সম্বদ্ধ। অসভ্য অবস্থায়ও মানুষ যখনই উচ্চভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে—সে ইচ্ছার কারণ আনন্দই হউক, ভক্তিই হউক, দেশাত্মবুদ্ধিই হউক—তখনই সে তালের, নির্দিষ্ট তালমানযুক্ত ভাষার প্রয়োগ করে, আর পরিমিত তালে অঙ্গবিক্ষেপ বা নৃত্য করে। আদিম নৃত্যের উৎপত্তি এই রকম করিয়াই হইয়াছে। সভ্যতার প্রথম স্তরে নৃত্য সকল জাতির মধ্যেই উত্তেজিত ভাবদ্যোতক ছিল। যে অনুকরণ-পদ্ধতির প্রয়োগে নাটকের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাই আবার অনুকরণশীল নৃত্যের (pantomima) জনক। খুব প্রাচীন কালে দেশাত্মবোধের ভাব বা ধর্মভাব প্রকাশ করা নৃত্যের রীতি ছিল। সভ্যতার আওতায় পড়িয়া সেই ভাব আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়াছে। আমরা দেখি মানুষ স্বভাবত দুইটি জিনিসের প্রিয়—সে ভালবাসে খেলা, আর চায় উত্তেজনা। নৃত্যে দুয়েরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নৃত্যও একরূপ ক্রীড়া—কিন্তু এ ক্রীড়া শিষ্ট ও সম্ভ্রমাত্মক।

নৃত্য মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। তালমান রসাশ্রয়ে বিলাসসমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপকে নৃত্য বলে। অঙ্গবিক্ষেপ হইতে তালমানকে বাদ দিলে আর নৃত্য হয় না। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, মানুষ সভ্য অসভ্য সকল অবস্থাতেই নৃত্য করিয়াছে। দেখা যায়, মধ্য-যুগের সভ্যতার স্তরে নৃত্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তখন নৃত্য ক্রমে কলার (art) প্রকৃতি ধারণ করে।

প্রাচীন যুগে নৃত্য কি রকম ছিল বুঝিতে হইলে সকলের আগে নৃত্যের পরিভাষাগুলি জানা দরকার। নৃত্য অনেক রকম ছিল। নৃত্য যেমন আছে, তেমনই তাহার 'করণ' আছে, 'নৃত্যমাতৃকা' আছে,

'অঙ্গহার' আছে। নৃত্যে নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে হয়। হস্তপদাদির ক্রিয়ার ভিতর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশ হইয়া পড়ে। আর তাহাতে যিনি নৃত্য করেন তাঁহার বিলাসের দ্বারা—অঙ্গশোভা দ্বারা প্রেক্ষকগণ প্রীতিলাভ করেন—রস উপভোগ করেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবপ্রকাশক এইরূপ হস্ত, পদ, মস্তক, চক্ষু, পার্শ্ব, কটি, জঙ্ঘা প্রভৃতি সংযোগে যে ক্রিয়া তাহার নাম 'করণ' বা 'নৃত্যকরণ'। এই ক্রিয়ায় কিন্তু প্রেক্ষকের প্রীতি উৎপাদিত হওয়া চাই। নৃত্য শাস্ত্রে তাহাই করণের সাধারণ লক্ষণ হইতেছে—

স্যাৎ ক্রিয়া করপাদাদের্বিলাসেনাক্রটদ্রসা ॥ ৫৫৪
করণং নৃত্তকরণং ভীমবদ্‌ভীমসেনবৎ ॥ ৫৫৫

দুইটি করণ লইয়া একটি 'নৃত্যমাতৃকা' হয়। আর দুই তিন বা চার নৃত্যমাতৃকা লইয়া একটি 'অঙ্গহার'। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ৩২টি অঙ্গহারের পরিচয় পাওয়া যায়। ভরত চতুর্থ অধ্যায়ে 'বৃশ্চিকরেচিত', 'বৃশ্চিক' প্রভৃতি ১০৮টি নৃত্যের করণের পরিচয় দিয়াছেন। আপাতত আমরা এই করণগুলির কয়েকটির কথা বলিব।

বৃশ্চিকরেচিত



ভরত বৃশ্চিকরেচিতের লক্ষণ করিয়াছেন—

বৃশ্চিকং চরণং কৃত্বা স্বস্তিকৌ চ করাবুভৌ।
রেচিতৌ বিপ্রকীর্ণৌ চ কার্যৌ বৃশ্চিকরেচিতে ॥ ৯৯

সঙ্গীতরত্নাকরও বলিয়াছেন,—

> যত্রাঙঘ্রী বৃশ্চিকীভূতৌ স্বস্তিকৌ[1] রেচিতৌ করৌ।
> বিচ্যুতৌ চেত্তদাকাশযানে বৃশ্চিকরেচিতম্ ॥ ৬৬৩

এখন দেখা যাইতেছে, একটি চরণকে 'বৃশ্চিক' করিতে হইবে, আর দুইটি হাতকে 'স্বস্তিক' করিতে হইবে ; তারপর হাত দুইটিকে 'রেচিত' ও বেশ ভাল করিয়া ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই রকম করিলে যে নৃত্য হইবে তাহার নাম 'বৃশ্চিকরেচিত'। ভরতের শ্লোকের তিনটি জিনিস না বুঝিলে 'বৃশ্চিকরেচিত' কি রকম তা বুঝা যাইবে না।

'বৃশ্চিক', 'স্বস্তিক' ও 'রেচিত'—এই তিনটি পারিভাষিক শব্দ।

> প্রসারিতোত্তানতলাবুচ্যেত রেচিতৌ করৌ।
> অথবা রেচিতৌ প্রোক্তৌ হংসপক্ষৌ দ্রুতভ্রমৌ ॥ ২৩৬
> যদ্বা রেচিতয়োর্লক্ষ্ম লক্ষণে মিলিতে ইমে।
> প্রযোজ্যৌ তৌ নৃসিংহস্য দৈত্যবক্ষোবিদারণে ॥ ২৩৭

বেশ সুন্দরভাবে নৃত্যের বিরাম দেখানোর নাম—'রেচিত'। রেচিত চার রকম—কররেচিত, পাদরেচিত, কটিরেচিত ও গ্রীবা-রেচিত। শার্ঙ্গদেব একটি চরণের পরিবর্তে দুইটি চরণকে বৃশ্চিকের মতো করিতে উপদেশ করিয়াছেন। হাত বেশ প্রসারিত হইবে, হাতের চেটোকে উপরের দিকে উঁচু করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে যে রকম হাত হইবে তাহার নাম 'রেচিতকর'। হাঁসের পাখাকে যেমন হাঁস দ্রুত সঞ্চালন করে সেই রকম দ্রুত ভ্রাম্যমাণ হাতের নামও 'রেচিতহস্ত'। হিরণ্যকশিপুর বুক চিরিয়া ফেলিবার সময়ও নৃসিংহের উপরের করদ্বয় 'রেচিত' ছিল। রেচিত অবস্থায় হাত এলাইয়া থাকা রীতি।

---

১ আশ্লিষ্টহংসপক্ষাভ্যাং স্বস্তিকৌ করৌ।—সঙ্গীতরত্নাকর, ২২৪

'স্বস্তিক' বলিলে বুঝিতে হইবে—সর্পশীর্ষাকৃতি হস্ত।[১]

করিহস্তের[২] মতো কর, আর একটি চরণ বৃশ্চিকপুচ্ছের মতো, চরণসংলগ্ন আর পৃষ্ঠ সন্নত হইবে।

ঐরাবণ প্রভৃতি ব্যোমযানে শূন্যমার্গে গমন করিবার সময় এই রকম হইয়াই চড়িতেন।

বৃশ্চিক



ভরত বৃশ্চিকের সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

বাহুশীর্ষাঞ্চিতৌ হস্তৌ পাদঃ পৃষ্ঠাঞ্চিতস্তদা।

দূরসন্নতপৃষ্ঠঞ্চ [বৃশ্চিকং] তৎপ্রকীর্তিতম্॥" ১৮০

১ শার্ঙ্গদেব বলেন,—

স্বস্তিকো লগ্নয়োর্বাহ্বোঃ পার্থব্যত্যাসতঃ স্থিতৌ।

স স্যাত্তানোরুপস্থানে পরিরম্ভেঽভিবাদনে॥ ৩৪৪

২ করিহস্ত একটি পারিভাষিক শব্দ। শার্ঙ্গদেব ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

সমুন্নতো লতাহস্তঃ পশ্চাৎপার্শ্ব বিলোলিতঃ।

ত্রিপতাকোঽপরঃ কর্ণে করিহস্তঃ প্রকীর্তিতঃ॥ ২৫৪

একস্য মণিবন্ধেঽন্যমণিবন্ধস্থিতৌ করৌ।

দেহস্য বামপার্শ্বেস্থাবুত্তানৌ স্বস্তিকৌ মতঃ॥ ১৯৪

অত্রারালৌ পতাকৌ বাঽভিনয়ে বশগৌ করৌ।

বিচ্যুতঃ স্বস্তিকঃ স্ত্রীভিরেবমস্তীতি ভাষণে॥

গগনে সাগরাদৌ চ বিস্তীর্ণে সংপ্রযুজ্যতে॥ ১৯৫

—সঙ্গীতরত্নাকর

সঙ্গীতরত্নাকর—

করিহস্তৌ করৌ পাদঃ পৃষ্ঠে বৃশ্চিকপুচ্ছবৎ ॥
দূরসন্নত পৃষ্ঠঞ্চ যত্র তদ্বৃশ্চিকং বিদুঃ।
এতদৈরাবণাদীণাং ব্যোমযানে নিযুজ্যতে ॥ ৬৬১

বৃশ্চিকরেচিত-করণে ইহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ব্যংসিত



ভরত—

আলীঢ়ং স্থানকং যত্র করৌ বক্ষসি রেচিতৌ।
উর্ধ্বাধো বিপ্রকীর্ণৌ চ ব্যংসিতং করণঞ্চ তৎ ॥

শার্ঙ্গদেব—

উত্তানো রেচিতশ্চৈকোঽপরোঽধোমুখরেচিতঃ ॥
আলীঢ়ং স্থানকং যত্র তদ্ব্যংসিতমুদাহৃতম্।
প্রযোজ্যমাঞ্জনেয়াদি মহাকপিপরিক্রমে ॥ ৬৫৭

দক্ষিণে জানু আগাইয়া দিয়া (advanced) বামপদ হঠাইয়া লইলে (retracted) যে রকম ভাব হয় তাহাকে 'আলীঢ়' বলে। শার্ঙ্গদেব 'বিপ্রকীর্ণ' শব্দে বুঝাইয়াছেন, প্রথমে স্বস্তিক হস্ত থাকে, তারপর হঠাৎ স্বস্তিকের চ্যুতি ঘটে, আর শরীরের সামনের দিকের উর্ধ্বভাগ ও অধোভাগ—

বিপ্রোকীর্ণৌ তু তাবেব সহসা স্বস্তিকচ্যুতে।

নীচাগ্রবুন্নতাগ্রৌ বা কুচাভ্যাং পুরতো স্থিতৌ।
পরাঙ্মুখৌ হংসপক্ষৌ বিপ্রকীর্ণৌ জগুঃ পরে ॥ ২২৫

'ব্যংসিত' করণে শরীর আলীঢ় থাকিবে। হাত দুইটি বক্ষে রেচিত ও বিপ্রকীর্ণ থাকিবে।

ক্রান্তিক



ভরত—

পৃষ্ঠতঃ কুঞ্চিতং কৃত্বা ব্যতিক্রান্তক্রমস্ততঃ।
আক্ষিপ্তৌ চ করৌ কার্যৌ ক্রান্তিকং করণে দ্বিজাঃ ॥১০৪

শার্ঙ্গদেব—

চার্যাতিক্রান্তয়া পাদং পাত্যমানস্তু কুঞ্চয়েৎ।
ব্যাবর্তিতেন তৎকালং করং নিক্রাময়েত্ততঃ ॥৬৫৮
আক্ষিপ্য পরিবর্তেন তং কুর্যাৎ খটকামুখম্।
বক্ষস্যেবং দ্বিতীয়াঙ্গং যত্র তৎ ক্রান্তমুচ্যতে।
প্রয়োগমাহুরাচার্যস্তস্যোদ্ধতপরিক্রমে ॥৬৫৯

'ক্রান্তিক' করণে পিঠের দিক আকুঞ্চিত করিয়া ক্রমশ তাহার ব্যতিক্রম করিতে হয়। হাত দুইটি আক্ষিপ্তভাবে রাখিতে হয়। একটি হাত কুঞ্চিত করিয়া আক্ষিপ্ত করিতে হইবে। আর অপর হাত স্তনের উপর রাখিতে হইবে।

কুঞ্চিত



ভরত—

আন্ত্যঃ পাদো নতঃ কার্যঃ সব্যহস্তশ্চ কুঞ্চিতঃ।
উত্তানো বামপার্শ্বস্থস্তৎ কুঞ্চিতমুদাহৃতম্ ॥১০৫

শার্ঙ্গদেব—

উত্তানো বামপার্শ্বস্থোঽলপদ্মো দক্ষিণঃ করঃ। ৬৭৮
যত্র তৎকুঞ্চিতং পাদে সব্যেঽগ্রতলসঞ্চয়ে।
তেন দেবানভিনয়েদানন্দভয়নির্ভরান্ ॥ ৬৭৯

'কুঞ্চিত' করণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আন্ত্য পদ নতভাবে রাখিতে হইবে। সব্য হস্ত কুঞ্চিত করা দরকার। বাম পাশের পা উঁচু করা চাই।

চক্রমণ্ডল



ভরত—

প্রলম্বিতাভ্যাং বাহুভ্যাস্ যৎগাত্রেণ নতেন চ।
অভ্যন্তরাপবিদ্ধং স্যাত্তদ্জ্ঞেয়ংশ্চক্রমণ্ডলম্ ॥১০৬

শার্ঙ্গদেব—

যত্রকুম্বোড্ডিতাং চারীং দোলাভ্যাং চক্রবদ্ধমেৎ। ৬৭৪

অন্তর্নতেণ গাত্রেণ তদুচুশ্চক্রমণ্ডলম্।

সুরাণাং বরিবস্যায়াং তদুদ্ধতপরিক্রমে ॥৬৭৫

'চক্রমণ্ডলে' হাত দুটি কুনিয়া মাটিতে ঠেকাইয়া রাখিতে হয় আর বেশ করিয়া নীচের দিকে নত করিতে হয়। হাত দুইটি বক্ষঃ-ক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া থাকিবে আর অঙ্গের মধ্যভাগ যেন ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে এমন বোধ হওয়া চাই।

ভুজঙ্গাঞ্চিতক



ভরত—

ভুজঙ্গত্রাসিতঃ পাদো রেচিত দক্ষিণঃ করঃ।

লতাখ্যাশ্চ করো বামো ভুজঙ্গাঞ্চিতকং ভবেৎ ॥৯৩

শার্ঙ্গদেব—

চারীং চেদ্দক্ষিণাঙ্ঘ্রেঃ স্যাৎ পূর্বোক্তা দক্ষিণঃ করঃ।

রেচিতোঽন্যো লতাহস্তো ভুজঙ্গাঞ্চিতকস্তদা ॥৬৫০

একটি পদকে চিত্রে প্রদত্ত আকারে বাঁকাইয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। ইহাকে শাস্ত্রে 'ভুজঙ্গত্রাসিত' বলে। ডান হাতকে রেচিত করিতে হইবে। আর বাম হাত হইবে বক্রভাবে লতার মতো বাড়ানো। এই রকম হইলে তবে তাহাকে 'ভুজঙ্গাঞ্চিতক' বলা হয়।

দণ্ডকরেচিত



ভরত—

বিক্ষিপ্তং হস্তপাদঞ্চ সমন্তাদ্যত্র দণ্ডবৎ।

রেচ্যতে তদ্ধি করণং জ্ঞেয়ং দণ্ডকরেচিতম্ ॥৯৫

শার্ঙ্গদেব—

চারী[১] চেদ্দণ্ডপাদা[২] স্যাদ্দপক্ষৌ চ হস্তকৌ।

প্রমোদনৃত্তবিষয়ং তদাস্যাদ্দণ্ডরেচিতম্।

প্রয়োগমপরে ত্বাহুরস্যোদ্ধতপরিক্রমে ॥৬৫১

হাত পা ছড়াইয়া পুরাপুরি দণ্ডবৎ করিলে তাহাকে 'দণ্ডক-রেচিত' বলা হয়। এই কারণে হাত পা বেশ আল্‌গা আল্‌গা থাকিবে।

---

১ চারীনাম্নাঽত্র চরণং বক্ষ্যে চারীবিবক্ষয়া।
চারীণাং ন্যূনতাধিক্যং ন দূষয়তি মণ্ডলম্ ॥—শার্ঙ্গদেব, ১১৫৮

২ দক্ষিণো জনিতো ভূত্বা দণ্ডপাদো ভবেদথ।
সূচী চ ভ্রমরো বাম উদ্বৃত্তো দক্ষিণস্ততঃ ॥
অলাতো বামচরণঃ পার্শ্বক্রান্তস্তু দক্ষিণঃ।
ভুজঙ্গত্রাসিতশ্চাদৌ বামোঽতিক্রান্ততাং গতঃ ॥
দক্ষিণো দণ্ডপাদোঽথ সূচী চ ভ্রমরোঽপরঃ।
যত্র তদ্দণ্ডপদাখ্যং মণ্ডলং বভণে (?) বুধৈঃ ॥—ঐ, ১১৮৬-৮৮

বৃশ্চিককুট্টিত



ভরত—

বৃশ্চিকঞ্চরণং কৃত্বা দ্বারপ্যথ নিকুট্টিতৌ।
বিধাতব্যৌ করৌ তত্তু জ্ঞেয়ং বৃশ্চিককুট্টিতম্ ॥৯৫

শার্ঙ্গদেব—

বৃশ্চিকং চরণং কৃত্বা বাহুশীর্ষে যদা ক্রমাৎ।
অলপদ্মো নিকুট্যেত তদা বৃশ্চিককুট্টিতম্।
সবিস্ময়ে ব্যোমযানবাঞ্ছাদৌ বিনিযুজ্যতে ॥৬৬১

একটি চরণকে 'বৃশ্চিক' আর দুইটি হাত নিকুট্টিত করিতে অর্থাৎ কান পর্যন্ত মুড়িয়া কুণ্ডলের আকার করিতে হইবে। এই রকম করিলে যে করণ হইবে তাহার নাম 'বৃশ্চিককুট্টিত'।

অনুকরণ করিবার স্পৃহা হইতেই এই করণগুলির সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। শারীরবিজ্ঞানবিদ্‌রা বলেন, মনে আনন্দ হইলে শরীরের উপর যে সব ক্রিয়া হয়, নৃত্যেও সেই সমস্ত শারীরিক ক্রিয়ার স্ফূর্তি হইয়া থাকে। নৃত্যে শরীরের ভিতর যে তেজের সঞ্চার হয় তাহা সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। এই হিসাবে নৃত্যে দেহের অপকার সাধন না করিয়া পুষ্টিসাধনই করিয়া থাকে। শারীরিক ব্যায়ামে দেহের যেরূপ বিকাশ ও পরিণতি হয় সেইরূপ নৃত্যেও হইয়া থাকে।

শাস্ত্রকাররা বলিয়া থাকেন, নানাবিধ অবস্থার অনুকরণ করাই হইতেছে অভিনয়—

"ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকার স চতুর্বিধঃ।"

কেহ কেহ বলেন, যে সমস্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে দর্শকদের সামনে নানা অবস্থার ভঙ্গী প্রকাশ ('প্রয়োগ') সত্যকারের মতো দেখায় তাহাকেই অভিনয় বলে। অভিনয়ের ব্যুৎপত্তি হইতেও এই অর্থ পাওয়া যায়। দর্শকদিগের অভিমুখে যে প্রয়োগকে লইয়া যাওয়া হয় তাহার নাম অভিনয়—

"অভিপূর্বস্তু নীঞ্‌ধাতুরাভিমুখ্যার্থনির্ণয়ে।
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥"

অভিনয় আবার চার প্রকার। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক।

"আঙ্গিকো বাচিকস্তদ্বদাহার্যঃ সাত্ত্বিকোপরঃ।
চতুর্ধাঽভিনয়স্তত্রাঙ্গিকোঽঙ্গৈঃ দর্শিতো মতঃ॥"

অঙ্গের দ্বারা যাহা দেখানো হয় তাহা আঙ্গিক। অঙ্গ বলিলে বুঝায়—মস্তক, হস্ত, বক্ষ, দুই পার্শ্ব কটিতট, পাদদ্বয়, এই ছয়টি। কাহারও কাহারও মতে স্কন্ধদ্বয়কেও অঙ্গ মধ্যে ধরা হয়।[১] আর প্রত্যঙ্গ হইল—গ্রীবা, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় এই ছয়টি। কেহ কেহ মণিবন্ধদ্বয়, জানুদ্বয় ও ভূষণকেও প্রত্যঙ্গের ভিতর ধরেন।

উপাঙ্গ বারটি। তাহাদের নাম—দৃষ্টি, ভ্রূপুট, তারা, কপোলদ্বয়, নাসিকাবায়ু, অধর, দন্ত, জিহ্বা, চিবুক ও মুখ।

পার্ষ্ণি, গুল্‌ফ, অঙ্গুলি, উভয় করতল ও পদতল, মুখরাগ, করদ্বয়ের বিস্তার এইগুলি করণ।

---

১ অঙ্গান্যত্র শিরো হস্তৌ বক্ষঃ পার্শ্বে কটিতম্।
প্রত্যঙ্গানি ত্বিহ গ্রীবা বাহূ পৃষ্ঠং তথোদরম্॥
পাদাবিতি ষড়ুক্তানি স্কন্ধাবপ্যপরে জগুঃ।
উরূ জঙ্ঘে ষড়িত্যাহুরপরে মণিবন্ধকৌ॥

আমরা যাহাকে 'নাচ' বলি শাস্ত্রে তাহার অনেকগুলি নাম। শব্দাবলীতে নাচ বুঝাইতে যে কয়টি শব্দ আছে তাহা এই—

তাণ্ডব, নটন, নাট্য, লাস্য, নর্তন, নৃত্ত, নাট, লাস, লাস্যক, নৃতি।

অমরকোষ স্বর্গবর্গে (১৮৫) দিয়াছে—

"তাণ্ডবং নটনং নাট্যং লাস্যং নৃত্যঞ্চ নর্তনে।

তৌর্যত্রিকং নৃত্যগীতবাদ্যং নাট্যমিদং ত্রয়ম্॥"

সংগীতশাস্ত্রকারগণ নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত—নৃত্যের এই তিন রকম ভেদ দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন 'নাট্যং নৃত্যং তথা নৃত্তং ত্রেধা তদিতি কীর্তিতম্।'

নাট্য বলিলে অভিনয় বুঝায় আর তাহা রসেই মুখ্য। নাট্য রসের অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই নৃত্য প্রচলিত আছে। মহাদেব সকল সময় নৃত্য করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'নটরাজ'। এ পর্যন্ত যত নটরাজ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, সবই নৃত্যশীল। গণেশও কতকটা পিতার ধাত পাইয়া সময়ে সময়ে নাচিয়া থাকেন। তাঁহার এই নৃত্যশীল মূর্তির নাম 'নৃত্যগণেশ'। কৃষ্ণও নাচিতে ছাড়েন নাই। কবি জয়দেব 'নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে' প্রভৃতি পদে তাঁহার এই মূর্তি ভক্তের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নৃত্যগোপাল মূর্তি রসজ্ঞদিগের আনন্দবর্ধন করিয়াই থাকে। স্বর্গের দেবতারাও নৃত্য খুব ভালবাসেন। উর্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরা তাঁহাদের আমোদ দেন। গন্ধর্বকন্যারা নাচকে তো পেশাই করিয়া রাখিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইতেন, গান করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেও ছাড়িতেন না।

প্রাচীন ভারতে নৃত্য গৃহস্থাশ্রমে খুব প্রচলিত ছিল। ঋষিরা গীতবাদ্যের সঙ্গে নৃত্যেরও অনুমোদন করিয়াছেন। ভীষ্ম মৃত্যুশয্যায়

যুধিষ্ঠিরকে নৃত্যগীত বাদ্য শিখিতে উপদেশ দিয়াছেন। আগেকার সভাসমিতি ছিল কতকটা এখনকার ক্লাবের মতো। সভাসমিতিতে নিয়মিত সকলকে যাইতে হইত। আর সেখানে নানা বিষয় অনুশীলনও করিতে হইত। নৃত্য-গীত সভাসমিতির আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল। সেকালে পুরুষেরা নৃত্য করিত; স্ত্রীলোকের তো নৃত্যশিক্ষা অবশ্যকর্তব্যই ছিল। স্ত্রীপুরুষের একসঙ্গে নৃত্য করাও অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। অর্জুন যে নাচগানের ওস্তাদ ছিলেন তাহা সবাই জানেন। কৃষ্ণ বলরাম নৃত্যগীতে খুব পটু ছিলেন। সুন্দরী রমণীরা রামচন্দ্রের সম্মুখে নাচিতেন। শান্তনু-পত্নী গঙ্গা স্বামীর সম্মুখে নৃত্য করিতেন। যাদব-রমণীরা যে নৃত্য করিতেন তাহার প্রমাণ মহাভারতে আছে।

কচ ও দেবযানী তপোবনে থাকিতেন। তাঁহারা সেখানে নাচিতেন, গাহিতেন, বাজাইতেন। বলরাম রেবতীকে লইয়া নাচিতেন, কৃষ্ণ সত্যভামার সঙ্গে, অর্জুন সুভদ্রার সঙ্গে নাচিতেন। যাদবেরা নিজের নিজের বধূর সঙ্গে নাচিতেন। যাদবেরা সকলে একসঙ্গেই মিলিত হইয়া আপনার আপনার বধূর হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতেন। ইহাদের বহুপূর্বে বৈদিক যুগেও স্ত্রীপুরুষে এক সঙ্গে নৃত্য করিয়াছে। ধর্মের জন্য লোকে নৃত্য করিত। বৈদিক অনুষ্ঠান 'মহাব্রত'যজ্ঞের স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলাকারে নাচিত তাহার প্রমাণ আছে। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে লিখিয়াছেন, রমণীরা ডুমুরের রঙের সুরাপাত্র হাতে করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতেছে।—"যদ্ উদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাম্ মণ্ডলং মহৎ।" তখন সুরাপাত্রের একটি নাম ছিল 'ঘটী'।

শিবজায়া পার্বতী বাণকন্যা উষাকে নাট্য শেখান। উষার নিকট হইতে দ্বারকায় গোপীরা শেখে। আর তাহাদের নিকট সৌরাষ্ট্রদেশের মেয়েরা শিক্ষা লাভ করে। সৌরাষ্ট্ররমণীদিগের নিকট হইতে নানা জনপদের নারীগণ শিক্ষা করে।

পার্বতী ত্বনুশাস্তি স্ম লাস্যং বাণাত্মজামুষাম্
তয়া দ্বারবতীগোপাস্তাভিঃ সৌরাষ্ট্রযোষিতঃ। ৭
তাভিস্তু শিক্ষিতা নার্যো নানাজনপদাস্পদাঃ।
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমেতল্লোকে প্রতিষ্ঠিতম্। ৮

—সঙ্গীতরত্নাকর, পৃ° ৬২৪

নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রাচীন প্রবাদ, স্বর্গে নাট্যমণ্ডপ সৃষ্টি হইলে নাটকের অভিনয়ে নৃত্য না থাকায় মহাদেব কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া তণ্ডু মুনি ভরতকে নৃত্যের সমস্ত অঙ্গহারাদি দেখান, যাহা প্রাচীন লেখকেরা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 'নাট্যশাস্ত্রে নাটকের উৎপত্তি' অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

যাত্রা

বাঙলাদেশে অনেকদিন হইতে অভিনয় হিসাবে যাত্রা চলিয়া আসিয়াছে। বস্তুত যাত্রা হইতেই আমাদের দেশে থিয়েটারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। যাত্রা নূতন জিনিস নয়। ইহার অস্তিত্ব প্রাচীনকাল হইতেই আছে। প্রাচীনকালে যাত্রার অর্থ দেবতাবিশেষের লীলা বা চরিত্রের অংশবিশেষ সাধারণের হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য কোনও উৎসব। গ্রীক মেগাস্থেনেসের বিবরণে আছে, আজকালকার যাত্রাভিনয়ের মতো যাত্রার গান পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের সভায় হইত। ভরত-নাট্যশাস্ত্রেও যাত্রার উল্লেখ আছে। ভবভূতির মালতী-মাধবে 'ভগবান্ কালপ্রিয়নাথের যাত্রা'ভিনয়ের কথা আছে। এই যাত্রা উৎসবার্থে এবং পারিভাষিক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উৎসব হিসাবে মহাভারতে ঘোষ-যাত্রার কথা আছে। হরিবংশে বন-যাত্রার কথা আছে। বন-যাত্রা বন-ভোজন। ইহাতে নৃত্য-গীতের ব্যবস্থার কথা আছে। তাহার সঙ্গে এক রকম অভিনয়ের কথা আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থেও অভিনেতা ও অভিনেত্রীর উল্লেখ আছে। ধর্ম-সম্বন্ধীয় ও পৌরাণিক বিষয় লইয়াই যাত্রা অভিনয় হইত। শিবযাত্রা সকলের চেয়ে পুরাতন। তারপর রামযাত্রার প্রবর্তন হয়। হিন্দুরাজত্বের সময় হইতেই রামযাত্রার প্রচলন দেখা যায়। রামযাত্রার অনেক পরেই কৃষ্ণযাত্রার উদ্ভব। ভাগবতে লীলাভিনয়ের কথা আছে। ধর্মোৎসব বা সামাজিক উৎসবে এই সকল অভিনয় হইত। যাত্রায় দৃশ্যপটাদির ব্যবস্থা ছিল না। সংগীত ও উক্তি প্রত্যুক্তি দ্বারা বক্তব্য বিষয় প্রকাশ হইত। আমাদের যাত্রায় তখন সংগীতের প্রভাব বড় বেশী ছিল। আর ভারতের সকল জায়গাতেই দেবলীলা কীর্তনে গীতবাদ্য দেখিতে পাওয়া যাইত

এখনও যায়। বেশ প্রকাশ্য স্থানে স্ত্রী-পুরুষ বেশভূষা করিয়া এই ব্যাপার করিত।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সময় হইতেই বোধ হয় বর্তমান যাত্রার আবির্ভাব। বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠে বেশ বোঝা যায়, শ্রীচৈতন্যই সংকীর্তন ও কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রাভিনয় বিশেষভাবে প্রচার করেন। ইহার পূর্বেও বাঙলায় যাত্রাভিনয় ছিল, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে যাত্রার আসরে নামিয়া অভিনয় ব্যাপারের প্রবর্তক মহাপ্রভু। আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের[১] আঙ্গিনায় আসর করিয়া শ্রীচৈতন্য নিজে স্ত্রীবেশে, শাড়ী, হার, বলয় নূপুরাদি অলঙ্কার ও কৃত্রিমবেণীতে সুসজ্জিত হইয়া সখীভাবে নাচিয়া গাহিয়া কীর্তন করিয়াছিলেন। রাত্রিতেই এই যাত্রাভিনয় হইয়াছিল, চারিদিকে দর্শকের স্থান হইয়াছিল। তাঁহার এই কীর্তনের একটু পরিচয় দিই—

"একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে।
আজি নৃত্য করি অঙ্কের বিধানে॥
সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু "কাচ সজ্জ কর গিয়া॥
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার॥
গদাধর কাচিবেন—রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ি—সখী সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার॥

---

১ আচার্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবী ভাবে নাচেন ঈশ্বর॥ —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাহিয়া।
ঘরেতে আইলা প্রভু আনন্দিত হইয়া॥ —শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
শ্রীচন্দ্রশেখর ভাগ্য তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিল এ মহিমা॥ —শ্রীচৈতন্যভাগবত

শ্রীবাস নারদ-কাচ স্নাতক শ্রীরাম।
'দিয়ড়িয়া হাড়ি মুঞি' বোলয়ে শ্রীমান ॥
অদ্বৈত বোলয়ে 'কে করিব পাত্র কাচ ?'
প্রভু বোলে 'পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ ॥
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান। তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া, নাচিবাঙ আমি।"
—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ৮ম অঃ

কাচ বলিলে 'ছদ্মবেশ', 'অভিনয়ের বেশ', 'সাজ' বোঝায়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও 'রাসযাত্রা, 'উত্থান-দ্বাদশীযাত্রা', 'দীপাবলীযাত্রা'র কথা আছে :—

"বিজয়া দশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানর সৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥
হনুমান্ বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া ॥
"কাঁহা রে রাবণা" প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে ॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্বলোক জয় জয় বলে বার বার ॥
এই মত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি ॥"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীচৈতন্যের সময়ে রায় রামানন্দও যাত্রাভিনয় করিতেন। তিনি ছিলেন নাট্যাচার্য। তাঁহার যাত্রায় আবার স্ত্রী অভিনেত্রী ছিল। চরিতামৃতে আছে, তিনি নির্বিকার চিত্তে যুবতী অভিনেত্রীদিগের পাঠ মুখস্থ করাইয়া অভিনয় করাইতেন। শ্রীবাস, গদাধর, অদ্বৈতাদি অভিনয়ে যোগদান করিতেন। সময়ে সময়ে মহাপ্রভু স্বয়ং যোগদান করিতেন।[১]

---

১ সকল বৈষ্ণব মেলি প্রেমের পসার ডালি
পসারিল অপরূপ হাট
* * *

শ্রীচৈতন্যের অনুগত প্রতাপরুদ্রও যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যাদি যে-সমস্ত যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কোন পালার বই পাওয়া যায় না। তবে সে-সময়ে 'শেখরীযাত্রা' বলিয়া কায়স্থ চন্দ্রশেখর দাসের যাত্রার পালা ছিল বলিয়া বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন। এই চন্দ্রশেখর শ্রীঅদ্বৈতের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কায়স্থ চন্দ্রশেখর 'হরিবিলাস' প্রভৃতি যাত্রার পালা লিখিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, আর ইহার পূর্বে কেহ যাত্রার পালা রচনা করেন নাই। কিন্তু ইহার কোন নজির পাওয়া যায় না। একমাত্র প্রমাণ 'শেখরী যাত্রা'র একটি নমুনা—

দশদিক নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বোলয়ে মধুর॥
দ্রাক্ষা ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সনে লুকয়ল তারাপতি॥
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলয় সত্বর॥

এখনে কহিব শুন সাবধানে সব জন
গোপিকা-আবেশ-বশ প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচলি ধরে শঙ্খ কঙ্কণ করে
দু'টি আঁখি রসে ডুবু ডুবু॥
পট্ট সে বসন পরে নূপুর চরণে ধরে
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি।
রূপে ত্রিজগৎ মোহে উপমা দিবাঙ কাঁহে
গোপী বেশে ঠাকুর আপনি॥
—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (লোচনদাস)

শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
জাগল সকল লোক নাহি মান ডর ॥
শেখরে শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হৈয়া সাধু জায়া রহিলা শুতিয়া ॥

পূর্বে যাত্রাকে দেবলীলা বলিত। বৈষ্ণবদের সময় হইতে কৃষ্ণ-বিষয়ক যাত্রার নাম দেওয়া হয় কৃষ্ণলীলা। এইসব যাত্রায় ছিল কীর্তনাঙ্গ সুরেরই বেশী প্রভাব। প্রথমে মহড়া দেওয়া হইত, তারপর 'গৌড়চন্দ্র' পাঠ, অতঃপর কৃষ্ণের নৃত্য হইত, তারপর 'মণি গোসাঞি' আসিত। পরবর্তিকালে শুধু কৃষ্ণ বিষয় লইয়া নহে, পুরাণ ও কাব্যের বহু ব্যাপার যাত্রার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা তো ছিলই, তাহাদের সঙ্গে জুটিল মনসার ভাসান যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রভৃতি।

প্রাচীন যাত্রার পালায় ছিল কালিয়দমন অভিনয়। সকলেই জানে যে, কালিয়দমন বলিলে কৃষ্ণকর্তৃক যমুনায় কালিয় নাগের দমন বুঝায়। কিন্তু সেকালে তাহা বুঝাইত না। কৃষ্ণলীলার যাহা কিছু সব কালিয়দমনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালিয়দমন বলিলে বুঝাইত গোষ্ঠ, রাস, দোল, নৌকাবিহার, মান, মানভঙ্গ, কংসবধ, প্রভাস ইত্যাদি। ঐ সমস্ত যাত্রা অভিনয়ে মহড়া দিবার পর 'গৌরচন্দ্র' পাঠ হইত। লোকে বলিত 'গৌরচন্দ্রী পাঠ'। তারপর কালে এই যাত্রার প্রভাব কমিতে থাকে, তখন পাঁচালী, কীর্তন প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইল। পাঁচালী ও কীর্তনে লোক এত মাতিয়া উঠিল যে, যাত্রা লোপ পাইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'চণ্ডী-নাটক' রচনা করেন। চণ্ডীনাটক সম্পূর্ণ হয় নাই! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় পরিণত হইল। লোকে যাত্রার আনন্দ পুনরায় পাইতে লাগিল।

রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের সময়ে কেঁদেলীগ্রাম-নিবাসী শিশুরাম অধিকারী কৃষ্ণযাত্রায় খুব নাম করিয়াছিলেন। ইহার কিছু

পূর্বে যাত্রার উপর লোকের রুচি কমিয়া আসিতেছিল। শিশুরাম ইহার নানারূপ উন্নতিসাধন করিয়া যাত্রার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। লোকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বীরনৃসিংহ মল্লিক বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল খোলেন। সিঙ্গুরের ভৈরবচন্দ্র হালদারকে দিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনা করিয়া লন। দুই বৎসর ধরিয়া যাত্রার পালা সাধা হয়। কিন্তু যাত্রার অভিনয় হইয়াছিল মাত্র তিন রাত্রি। এই যাত্রার আয়োজন-ব্যাপারে মল্লিক মহাশয়ের লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। গোপাল উড়ে[১] এই দলে মালিনী সাজিয়াছিল। তার হাবভাব-বিলাসে ও সুমধুর কণ্ঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। গোপাল উড়ে ছিলেন মল্লিক মহাশয়ের যুগপৎ ভৃত্যকে ভৃত্য, বয়স্যকে বয়স্য। তিনি এই পালাটি মল্লিক মহাশয়ের নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়া দশ বৎসর স্বাধীনভাবে 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করেন।[৩] স্ত্রী সাজিলে

১ গোপাল দাস উৎকলের জাজপুর গ্রামবাসী। জাতিতে করণ। গোপাল কৃষিজীবী মুকুন্দের মধ্যম পুত্র। ৪০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

২ কাহারও কাহারও মতে কলিকাতা বহুবাজারের ধনাঢ্য রাধামোহন সরকার বিদ্যাসুন্দরের এক পালা সংগঠন করিতেছিলেন। গোপাল উড়ে নামক এক সুন্দর যুবক ফেরিওয়ালা তাঁহার নূতন যাত্রার দলভুক্ত হয়। ইহা অমূলক।

৩ গোপাল উড়ের সময়ে গুরুচরণ সোম কলিকাতার একজন বড় ধনী ছিলেন। তাঁহার ভাইপো শ্রীনাথ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এই সখের দল গঠন করেন। ঐ দলে মোহনচাঁদ বসু ও গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত গান বাঁধিতেন। বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অনেকগুলি হইয়াছিল। এই সময়ে ধনেখালির নিকটে বোসো গ্রামে এক সখের দল হয়। এক বাগ্দী বিদ্যাসুন্দর সাটের গান বাঁধিয়া দিত। কালিয়দমন যাত্রা যখন চলিতেছিল সেই সময়ে কলিকাতা ও তাহার উত্তর-দক্ষিণে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা চলিতেছিল। ১৮২২ সালে বরাহনগরের রামজয় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসুন্দরের এক দল প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, নিমাই মিত্র,

কেহ তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না। ইহার দলের নামডাক খুব রটিয়াছিল। গোপাল উড়ের দলে উমেশ ও ভুলো (ভোলানাথ দাস) গান করিত। প্রথমে রূপো, তারপর কাশী মালিনী সাজিত, ভুলো সাজিত বিদ্যা এবং উমেশ সাজিত সুন্দর।[১] গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালার গান একটিও গোপালের রচিত নয়। নানা জায়গার কবি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। ওস্তাদেরা সুর সংযোগ করিয়া দেন, আর যাত্রার অধিকারী[২] গোপালের নামে সেগুলি বিকায়। টপ্পা-জাতীয় বলিয়া লোকে উড়ের টপ্পা বলিত। টপ্পাগুলি লোকে বড়ই পছন্দ করিত। গোপালের মৃত্যুর পর উমেশ ও ভুলো দুইজনে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দুইটি দল পরিচালনা করে। উমেশের দল উঠিয়া যায়। ভুলোর দলের বেশ পসার হয়। ভুলোর মৃত্যুর পর তার দুই ছেলে গগন ও পূর্ণচন্দ্র দুটি দল চালায়।

ঢাকায় কৃষ্ণকমল গোস্বামী[৩] কৃষ্ণযাত্রায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। স্বপ্নবিলাস তাঁহার প্রথম যাত্রা পুস্তক। ১৮৩৫ বা

রামমোহন চট্টোপাধ্যায়—ইঁহারা সাজিতেন, দলও চালাইতেন। রামধন মিস্ত্রি ঢোল বাজাইত। অমন ঢুলী আর ছিল না। এই সময় জনাই-এও যাত্রা হয়। বরাহনগর ঠাকুরদাসের দলের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হয়। এই দলে ঠাকুরো যুগী, শিবে যুগী দাঁড়াইয়া খুব প্রতিষ্ঠালাভ করে। তারপর ইহাদের দল উঠিয়া গেলে কৈলাস বারুই সেই সব লোক লইয়া যাত্রার দল গড়ে। কৈলাস ছিল চুটকী রাগিণীর ওস্তাদ। কৈলাস ও গোপাল উড়েতে পাল্লাপাল্লি চলিত। ভবানীপুরে বেলতলায় শিবুঠাকুরের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হয়। পরে বেলতলায় প্যারী-মোহনের যাত্রার দল ছিল। বৌবাজারের ধনী সম্প্রদায় আট দশ বছর পরে সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করেন।

১ এই কেশে (কাশী) মালিনী হইতে খেমটা দলের উৎপত্তি। গোপাল উড়ের সময় সুরও ছিল মিশ্র।

২ যিনি যাত্রার দলের সর্বেসর্বা তাহাকে অধিকারী বলা হইত।

৩ কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের ভজনঘাটে বৈদ্যগোস্বামি-বংশে ১৮১০ সালে (১২১৭ বঙ্গাব্দে) রথযাত্রার দিন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুরলীধর, মাতার নাম

ইহার কাছাকাছি এখানি ছাপা হয়। অল্পদিনেই ২০,০০০ হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়া যায়। সে সময়ে লোকে অনুপ্রাসবহুল স্বপ্নবিলাস যাত্রা শুনিতে পাগল হইত। তাঁহার বিচিত্রবিলাস, রাই উন্মাদিনী, নন্দ-হরণ, নিমাই-সন্ন্যাস, সুরথসংবাদ, গোষ্ঠ ও ভরতমিলন তৎকালীন বঙ্গবাসীর বিশেষ প্রিয় ছিল।

শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল অধিকারী। ইহার সমসাময়িক লোচন অধিকারী 'অক্রুর-সংবাদ' ও 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করিতেন। কুমারটুলির বনমালী সরকার ও মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ি তাহার কয়েকবার যাত্রা হইয়াছিল। লোচন অনেক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

তারপর বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রায় খুব নাম করেন। পরমানন্দ শ্রীদাম সুবলের শিষ্য। তিনি দূতী সাজিয়া 'তুক্কোয়' আসর জমাইতেন।

হুগলী জেলার কৃষ্ণনগর জাঙ্গীপাড়া-নিবাসী গোবিন্দ অধিকারী পরমানন্দের শিষ্য। তিনি জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। জন্ম ১২০৫, মৃত্যু ১২৭৭। ইনি যাত্রা, কীর্তন ও কথকতায় বিশেষ নাম করিয়াছিলেন। প্রথমে গোলকদাস অধিকারীর নিকট কীর্তন শিক্ষা করেন, কীর্তনেরও একটা দল খোলেন। পূর্ববঙ্গে জগদীশ গাঙ্গুলীর যাত্রার দল ছিল। নিজেই তিনি পালা রচনা করিতেন। গোবিন্দ বাল্যকালে ইহার দলে কিছুদিন গান করেন। তারপর বদনের দলে

যমুনাদেবী। কৃষ্ণকমলের প্রথম গ্রন্থ 'নিমাই-সন্ন্যাস' নবদ্বীপে যাত্রার অভিনয় হয়। সুনাম অর্জন করিয়া তিনি ঢাকায় গমন করেন। সেখানে তাঁহার যাত্রার আসর বেশ জমিল। ভাগবতও পাঠ করেন। লোকে বিপিন বসাকের যাত্রা শুনিতে ভালবাসিত। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণকমল ইহাকেও হারাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের মৃত্যু হয় চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে ১২৯৪ সালে ১২ই মাঘ (১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে)।

গান করিতেন। শেষে 'কালিয়-দমন' যাত্রার দল গঠন করেন। গোবিন্দ নিজে দূতী সাজিতেন। নিজে অনেক গান রচনা করেন। ইহার দূতীগিরি দেখিবার জন্য, ইহার গান ও 'ঘটকালী'[১] শুনিবার জন্য বহু দূর দেশ হইতে লোক আসিত। ইহার 'শুক-শারীর পালা' 'চূড়ানূপুরের দ্বন্দ্ব' তখনকার আমলে বিশেষ 'দ্রষ্টব্যে'র মধ্যে ছিল।

নাথানিয়েল জন হ্যালহেড (Nathaniel John Halhed) বৈয়াকরণ হ্যালহেডের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি কতিপয় প্রাচ্য-ভাষায় বিশেষত বাংলাভাষায় এরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে, কখনও কখনও তিনি ছদ্মবেশে আমাদের দেশী কাপড় পরিয়া আপনাকে দেশী লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাঁহাকে তাহারা সহসা কেহ বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারিত না। যখন তিনি পাঁচজনের সঙ্গে তামাক খাইতেন তখন তাঁহাকে ইউরোপীয় বলিয়া চেনা দায় হইত। বর্ধমান রাজবাড়িতে তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার অভিনয়ে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।[২]

১২২৯ সালের (১৮২২ খ্রী°) কাছাকাছি ভবানীপুরে 'নল-দময়ন্তী' যাত্রার দল ছিল। এই যাত্রার দল করিতে বিপুল অর্থব্যয় হয়। রাম বসু যাত্রার গান রচনা করিয়া দেন। ১০-১৫ আসর গানের পর যাত্রাটি বন্ধ হইয়া যায়।

গোবিন্দের শিষ্য নীলকণ্ঠ (মুখোপাধ্যায়) ও নারাণ দাস। নীলকণ্ঠের জন্ম ১২৬৮ সালে বর্ধমান জেলায় ধরণী গ্রামে। মৃত্যু ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে। ইনি স্বগ্রামের নিকট গোবিন্দ

১ যাত্রার বক্তৃতার যে অংশ অভিনীত হইবার পরে তাহার মর্ম গান গাহিয়া ব্যক্ত করা হয় তাহার নাম 'ঘটকালী'। মনে করুন বৃন্দা আসিয়া রাধাকে বুঝাইলেন। বুঝানো শেষ হইলেই গান করিয়া আবার সেই মর্মে বুঝানো হয়। বৃন্দার বক্তৃতা 'ঘটকালী'। এ বক্তৃতারও কিছু সুর থাকিত।

২ Friend of India, Aug, 9. 1838.

অধিকারীর গান শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হন ও বহু মহাজন পদ শিক্ষা করেন। গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়। নীলকণ্ঠ ও নারায়ণ দুই দলের অধিকারী হন। অল্পকাল পরে নারায়ণের মৃত্যু হইলে নীলকণ্ঠ দলের কর্তা হন। বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি।

নীলকণ্ঠের পালা যখন বেশ চলিতেছিল সেই সময় বোধ হয় ১২৯৪।৯৫ সালে রসিকলাল চক্রবর্তী 'বালক সঙ্গীত' যাত্রা খোলেন। এই রসিক অধিকারীর বাড়ি যশোহরে কালীগঞ্জ থানার এলাকায় রায় গ্রামে। ইনি প্রসিদ্ধ বালক-সঙ্গীতের স্রষ্টা। ইহার 'প্রভাস-মিলন', 'কংসবধ' পালা জনসাধারণ আগ্রহের সহিত উপভোগ করিত। 'চণ্ডে পাগল' প্রহসনে সমাজের উপর কশাঘাত করা হইয়াছিল। সংগীত-রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি নিজে একজন সাধক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভাগিনেয় সুরেন্দ্র দল চালাইয়াছিলেন।

মীরাপাড়া গ্রামের যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক সময় রসিক-লাল চক্রবর্তীর ভাঙা দল চালাইয়া বেশ নাম করেন। রাধাকৃষ্ণ, নবীন গুহ, ফরাসডাঙ্গার মহেশ চক্রবর্তীও যাত্রার দল খুলিয়া-ছিলেন। পাঁচালীকার রসিকলাল ইহার গান বাঁধিয়া দিতেন।

পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী পরমানন্দের সমসাময়িক—'মহীরাবণ বধ' পালায় ও রামযাত্রায় খুব পটু। থরকাটায়ও একজন প্রেমচাঁদ ছিলেন।

বাঁকুড়ার আনন্দ অধিকারী, জয়চাঁদ অধিকারীও রামযাত্রায় খুব নাম করেন।

প্রেমচাঁদের শিষ্য বদন অধিকারী তুক্কোয় খুব উন্নতি করেন। বদনের 'দান', 'মান', 'মাথুরে'র খুব নাম। বদন থাকিতেন শালিখায়। গোড়ায় গোড়ায় গোবিন্দ অধিকারী বদনের দলে গান করিতেন।

বিশ্বনাথ মাল বলিয়া দুইজন যাত্রাওয়ালা ছিল। বাঁকুড়া

জেলায় ওন্দা থানায় একজনের বাড়ি। আর একজন বহু পরবর্তী, ১২৯৭ সালে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি গোবিন্দ অধিকারীর গ্রামবাসী ও সমসাময়িক। ইঁহার কালিয়দমন যাত্রার দল ছিল।

প্রাচীন যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে রামময় দাস, রাজনারায়ণ দাস, মহেশ ঠাকুর, কান্ত তেলী, রঘু তামেলী খুব নাম করিয়াছিলেন। পটলডাঙ্গার নীলকমল সিংহের দলও বেশ পুষ্ট ছিল। পালা ছিল প্রহ্লাদচরিত্র। এই দল ভাঙিয়া নারায়ণ দাসের দল হয়। পরবর্তিকালে কাটোয়ানিবাসী পীতাম্বর অধিকারী ও বিক্রমপুরের কালাচাঁদ পাল কৃষ্ণযাত্রায় সুনাম অর্জন করেন। 'কালিয়দমন' পালা ইঁহার রচনা।

চন্দননগরের মদন মাস্টারের সখের দল ছিল, পরে পেশাদারী হয়। যাত্রার পালা ছিল—দক্ষদজ্ঞ, মদনভস্ম, ধ্রুবচরিত্র। বালকদের গান ছিল কীর্তনাঙ্গ। মদন মাস্টার যাত্রার দলে জুড়ীর গানের প্রবর্তক। জুড়ীর সুর ছিল কবিগান-ভাঙা। মদনের সহিত ছোকরারাই গাহিত। যার গান সেই গাহিত। রাগরাগিণী গাহিবার জন্য ছিল জুড়ী। বিখ্যাত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহার দলে ঢোল বাজাইতেন। পরে নিজে দল করেন। মদনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নবীন দল পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী নিজেই দল চালান—দলের নাম দেন বৌ-মাস্টারের দল। কালী ও কৃষ্ণ নামে দুই ভাই এই দল পরিচালন করিত। বৌ-মাস্টারের অনুকরণে নবদ্বীপের যাত্রার দলের অধিকারী নিলমণি কুণ্ডুর স্ত্রী যাত্রার দল চালান। নাম হয় বৌ-কুণ্ডুর দল। যাত্রা হইত কলিকাতায়। রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের দলে 'নন্দবিদায়' যাত্রা হয়। এই 'নন্দ বিদায়' যাত্রার একটি সংবাদ ৬ই বৈশাখ ১২৫৬ সালের ভাস্করে এইরূপ বাহির হয় ঃ—"নন্দবিদায় যাত্রা—৩রা বৈশাখ শনিবার ১২৫৬ সাল (১৮৪৯—April)—শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে নন্দবিদায় যাত্রা হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যাত্রার মূল ছিলেন।" 'নন্দবিদায় যাত্রা'র প্রথম অভিনয় হয় ১২৫৫ সালের চৈত্র মাসে। ইহার যাত্রায় স্ত্রী-চরিত্রে মেয়েরা অভিনয় করিত।

কেদার ঘোষ, ধুলো উমেশ, ভদ্রকালীর বনমালী ঘোষ, শিবু যুগী, ব্রজ (মোহন) রায়, খোঁড়া নন্দ (আসল নাম—শিবরাম চট্টোপাধ্যায়—ইনি পাঁচালীকার খোঁড়ানন্দের পরবর্তী) প্রভৃতি অনেক নামজাদা যাত্রাওয়ালা ছিল। ইহাদের মধ্যে ব্রজ রায় ১২৭৯ সালে পাঁচালীর দল উঠাইয়া দিয়া যাত্রার দল গড়েন। চারি বৎসর ভালরূপে পরিচালনা করিবার পর ইঁহার মৃত্যু হয়। তারপর সহোদর গোপীমোহন আট বছর এই দল চালাইয়াছিলেন।

ব্রজ অধিকারীরও একটি দল ছিল। তিনি নিজেই পালা রচনা করিতেন।

বেণীমাধব ডাফিৎ জাতিতে ময়রা ছিলেন—তিনি কিন্তু রাবণ-বধ ও মান-ভঞ্জনের পালা রচনা করিয়া বেশ নাম করিয়াছিলেন।

গজার ভট্টাচার্য জমিদারদের সখের যাত্রার দল ছিল। টাকীর রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীদের, হাওড়ায় কোনার জমিদার দীননাথ চৌধুরীর, উলুবেড়িয়ার নিকট ফুলেশ্বরের আশুতোষ চক্রবর্তীর সখের দল ছিল। আশুতোষ চক্রবর্তী শেষে সর্বস্বান্ত হইয়া পেশাদারী দল চালান।

হাড়কাটা গলি-নিবাসী দত্তবংশীয় কায়স্থ দুগো ঘড়েলের (দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল) যাত্রার দল নামজাদা। ইনি বয়োবৃদ্ধ দোয়ারের স্থানে বালক দোয়ার আটজন রাখেন। সকল বড় লোকের বাড়িতেই তাঁর যাত্রা হইয়াছে। বেনেপুকুরের লোকা ধোপা (লোকনাথ দাস—চাষীধোপা) ও কালীনাথ হালদার ইঁহার দলে গান গাহিতেন। ইঁহারা তখন দুগোর দলের ছোকরা, শেষে তাঁহারা নিজের নিজের দল করেন। লোকা ধোপা যাত্রা করিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা রাখিয়া যান।

গোপাল উড়ের চেলা ঋষড়া কৈলাস বারুই-এর দল, মাকড়দহের বেণীমাধব পাত্রের পেশাদারী দল, সাধু ও বকো মুসলমানের দল খুব নাম করিয়াছিল। পরে ইহাদের দল ভাঙিয়া দুই দল হয়। বহু-বাজারের ঝড়ুদাস অধিকারী, কোনার গোপীনাথ দাস, যাত্রার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

শিবপুর-নিবাসী উমাচরণ বসুর সখের দলেরও নাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই দল ১৮৭২ সালে গঠিত হয়।

অনেকগুলি দলের জন্য পালা রচনা করিয়া দিতেন উত্তর-ব্যাঁটরার ঠাকুরদাস দত্ত। পালা রচনায় তাঁহার শক্তি ছিল অসাধারণ। একই পালা তিন চার পাঁচ রকমে রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজেরও যাত্রার দল ছিল। তিনি বিদ্যাসুন্দরের পাঁচ রকম পালা রচনা করেন। একটি নিজের দলে (১২৩৭।৩৮) [ব্যাঁটরার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় এই দলে মালিনী সাজিয়াছিলেন], একটি গজার দলে, একটি টাকীর মুনসীদের দলে, একটি কালী হালদারের দলে এবং একটি কৈলাস বারুই-এর দলে অভিনীত হয়। পাঁচখানি বিদ্যাসুন্দরের পালার কোনখানির সঙ্গে কোনখানির মিল নাই। এরূপ অদ্ভুত রচনাশক্তি বিরল। ইহার রচিত অন্যান্য পালাও বিভিন্ন দলে অভিনীত হইয়াছিল। আমরা নীচে একটি তালিকা দিলাম :—

পালার নাম	যে দলের জন্য রচিত
১। হরিশ্চন্দ্র[১]	দীননাথ চৌধুরীর দলের জন্য
২। লক্ষ্মণবর্জন	আশুতোষ চৌধুরীর " "
[নিজের দলে একটি স্বতন্ত্র পালা ছিল]	
৩। নলদময়ন্তী, শ্রীবৎসচিন্তা	উমাচরণ বসুর " "

১ এই পালার ৩১ খানি গান ছিল। দুই খানি গানের নমুনা সাহিত্যে (১৩১৫ চৈত্র, পৃ : ৬৬৩-৬৬৪ প্রকাশিত)।

পালার নাম	যে দলের জন্য রচিত
৪। নলদময়ন্তী, কলঙ্কভঞ্জন, শ্রীমন্তের মশান	দুগো ঘোড়েলের „ „
৫। রাবণবধ	কালী হালদারের „ „
৬। অক্রূরসংবাদ, দুর্গামঙ্গল,	বেণীমাধব পাত্রের „ „
৭। ধ্রুবচরিত্র	সাধু ও বকোর[১] „ „
৮। শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন	গোপীনাথ দাসের „ „
৯। অক্রূর আগমন, রাবণবধ	ঝড়ু দাসের „ „
১০। শ্রীমন্তের মশান[২]	লোকা ধোপার „ „

ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ নলদময়ন্তী; কলঙ্কভঞ্জন ও চণ্ডী যাত্রা গাহিতেন। তারপর, তাঁর ছেলে ব্রজবল্লভ অধিকারী গাহিতেন। আর মনসার ভাসানের পালা গাহিতেন—বর্ধমানের লাউসেন বড়াল। তিনি হরিশ্চন্দ্রের পালাও গাহিতেন। কিন্তু সেটা জমে নাই। লাউসেন অদ্বিতীয়। বর্ধমান ভাতশালার মতিলাল রায়ের যাত্রাও খুব নাম করিয়াছিল।[৩] মতিলালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধর্মদাস রায় বাণীকণ্ঠ দল চালান। ইনি 'কবচ-সংহার' প্রভৃতি রচনা করেন।

নড়াইল মহকুমার মল্লিকপুর-নিবাসী পণ্ডিত অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ অনেকগুলি গীতাভিনয় রচনা করিয়াছেন—কল্কি অবতার,

---

১ ইঁহার অপর নাম বকো শেখ (বক্স ইলাহি) বা বকাউল্লা শেখ (সেখ বকাউল্লা), হুগলী জেলায় ইহার জন্ম। অনুপ্রাসে গীত রচনায় খুব দক্ষ ছিলেন।

২ তিনটি গান, নলদময়ন্তীর একটি, ও কলঙ্কভঞ্জনের একটি গান সাহিত্যে (১৩১৫, চৈত্র, ৬৬১-৬৬৩) প্রকাশিত।

৩ মতিলাল রায়ের গ্রন্থাবলী—সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ, নিমাইসন্ন্যাস, ভীষ্মের শরশয্যা, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ, বিজয়চণ্ডী, রাবণবধ, ভরতমিলন, লক্ষ্মণভোজন, পাণ্ডবনির্বাসন, কর্ণবধ, ব্রজলীলা, শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য।

অনন্ত মাহাত্ম্য, অদৃষ্ট, অকালমৃগয়া, অনিরুদ্ধ, মগধ বিজয়, পুত্র পরিচয় মরুত্ত যজ্ঞ, হরিশাস্ত্র, সমুদ্রমন্থন, চিত্রাঙ্গদা, তরণীর যুদ্ধ, বিজয়বসন্ত, ধাত্রীপান্না, সতী, চন্দ্রকেতু, সংসার চক্র, মহাসমর, সপ্তরথী, তারকাসুর, মিবার কুমারী, নহুষ উদ্ধার, লক্ষবলি, রাধামতী, নর্মদা, কুরু পরিণাম, পাপের পরিণাম, বাসববিজয়, শান্তি, মহামিলন, সুনন্দা, ধর্মের জয়, সাবিত্রী, শ্রীবৎস, বেহুলা, শ্রীমন্ত ও দময়ন্তী। এই গীতাভিনয়গুলি কলিকাতা ও মফঃস্বলে বিভিন্ন দলে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হয়।

খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছিলেন ঈশ্বর চক্রবর্তী।

হুগলী গোপীনাথপুরের কৃত্তিবাস মণ্ডলের গয়াসুরের হরিপাদ-পদ্মলাভ পালা মন্দ ছিল না।

কৃষ্ণযাত্রায় নাম কিনিয়াছিলেন—দুর্লভ দাস (শাহনগর), মাধবদাস (সিঙ্গুর পলাশপাই) ও রাইচরণ বেরা (মহাকালপুর)।

বলাই ঠাকুরের কালিয়দমন,—গোবিন্দ পাঠকের হরিশ্চন্দ্র, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, কীচকবধ, দানপরীক্ষা ও নরমেধযজ্ঞ, নীলাম্বর পাইনের কংসবধ, হরিশ্চন্দ্র, বক্কেশ্বর পাইনের নরমেধ যজ্ঞ, নবীন ডাক্তারের সীতার পাতাল প্রবেশ এবং শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর লক্ষ্মণের শক্তিশেল—এগুলি বেশী পুরাতন না হইলেও মন্দ ছিল না।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে শ্রীবাস দাস নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এত ভাল 'সুবলসংবাদ' যাত্রা করিতেন যে লোকে বলিত নীলকণ্ঠ তেমন পারিতেন না। নীলকণ্ঠের কবিত্ব, আর শ্রীবাসের পাণ্ডিত্য।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের নটবর দাস 'কৃষ্ণলীলা' যাত্রা করিতেন। বিষ্ণুপুরের নিকট রাধানগরে রামেশ্বর শর্মা 'রাবণবধ' ও 'রামলীলা' যাত্রা করিতেন। বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব মহৎদাস 'কৃষ্ণলীলা' যাত্রা করিতেন। চন্দ্রকোনায় আর একজন গোবিন্দ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রা করিতেন।

অধিক দিনের কথা নয় ভূষণ দাস যাত্রা করিয়া বেশ নাম করিয়া ছিলেন। যাদব বন্দ্যোপাধ্যায় 'দক্ষযজ্ঞ', 'সতীনাটক' যাত্রা করিতেন। অভয় দাসের 'যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ' ও 'অভিমন্যু'র পালা বেশ জঁাকিয়াছিল।

মেদিনীপুর পাটনা বাজারের অক্রূর প্রামাণিকের যাত্রা খুব বিখ্যাত; মেদিনীপুর কোতবাজারের পূর্ণেন্দু সাহার যাত্রাও নাম করিয়াছিল। মেদিনীপুর শ্রীমন্তপুর-নিবাসী শ্রীনাথ চক্রবর্তী ও গিরিশ চক্রবর্তী বিখ্যাত ছিল।

ঝালকাঠির মথুর সাহার 'লক্ষবলি' পালা, খুলনা বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে অভিনীত হইয়া খুব নাম করিয়াছিল। বারাসাতেও একজন মথুর সাহা ছিল।

মৈমনসিংহে গৌরমোহন অধিকারী প্রাচীন যাত্রাওয়ালা। তিনি ধ্রুবচরিত্র, নিত্যমিলন, নরমেধযজ্ঞ, মার্কণ্ডেয়ের হরিপাদ-পদ্মলাভ অভিনয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিখ্যাত ইন্দ্র-মোহন নট (নট্ট নয়) তাঁহার বায়েণ ছিলেন। ইহার মতো বায়েণ পূর্ববঙ্গে বিরল। সনাতন অধিকারী মৈমনসিংহে মতি রায়ের যাত্রাভিনয়ের পালা গাহিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতেন।

ফরিদপুরের চন্দ্রকান্ত অধিকারীর মতো ভাবপ্রবণ যাত্রাওয়ালা বড় বেশী নাই। মাদারিপুরে কালীনাথ ভট্টাচার্য ও গোবিন্দ (কীর্তনিয়ার) নট্টের ডাক-নাম খুব ছিল। গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র পালং গ্রাম নিবাসী ব্রজবাসীও ভাল যাত্রা করিতেন।

বরিশালের নাগ কোম্পানির ব্রজবাসী অধিকারী নিপুণ যাত্রা-ওয়ালা ছিলেন। বরিশালের অন্তর্গত মাহিলাড়া গ্রাম-নিবাসী গোবিন্দ ধুপী যাত্রার সঙ্গে ঢপ গান করিতেন।

শ্রীহট্টে গিরিশচন্দ্র চৌধুরী যাত্রাভিনয় করিতেন। ইঁহার যাত্রা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল।

নড়াইল মহকুমার কালনা গ্রামের গৌর প্রামাণিকের দল এক সময় বেশ নাম করিয়াছিল।

পূর্ববঙ্গে উমানাথ ঘোষাল, অহিভূষণ ভট্টাচার্য রচিত সুরথ-উদ্ধার তুলসীলীলা, দণ্ডীপর্ব, উত্তরা-পরিণয়, বোধনে বিসর্জন, রাই উন্মাদিনী ও রামাশ্বমেধ পালা অভিনয় করিতেন।

যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ নট্ট পূর্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার নিবাস ফরিদপুর জেলার পালং গ্রামে। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজবাসী।

বরিশাল জেলায় মাহিলাড়া গ্রাম-নিবাসী গোবিন্দ ধুপী যাত্রার সঙ্গে গান করিতেন। ইঁহার বর্ণজ্ঞান ছিল না। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশুদ্ধভাবে সংগীত আলাপ করিয়া লোককে মোহিত করিতেন।

পীতাম্বর পাইনের পুত্র ত্রৈলোক্য পাইনেরও একটি যাত্রার দল ছিল। ঐ দলের সুখ্যাতিও খুব ছিল। বর্ধমান খাঁড়গ্রাম নিবাসী উগ্রক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ধনকৃষ্ণ সেন ঐ দলের পালা লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত পালার মধ্যে সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক, মালাবতী, কর্ণবধ, পৃথুর শত অশ্বমেধ যজ্ঞ উল্লেখযোগ্য।

সত্যম্বর চাটুজ্যে, গণেশ উকিল, শশী হাজরা, শ্রীচরণ ভাণ্ডারী, শশী অধিকারী প্রভৃতির যাত্রাদলের বেশ নাম ছিল।

বরিশালের মুকুন্দ দাস স্বদেশী যাত্রা করিয়া খুব নাম করেন।

গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের শেষ অধিকারী গগন দাস স্বয়ং গানে, বক্তৃতায়, নৃত্যে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। গগন সুশ্রী ছিলেন।

এ ছাড়া সাঁতরা কোম্পানি, নারায়ণ দাস প্রভৃতি আরও অনেক যাত্রাওয়ালা ছিল। কত নাম করিব।

ওড়িষা ও আসাম প্রদেশে অনেক দিন হইতে যাত্রা চলিয়া আসিতেছে। আসামের শঙ্করদেব শিষ্য মাধবদেব রচিত 'নাম ঘোষা' হইতে আসামে কতকগুলি প্রাচীন বাঙলাযাত্রার উপকরণ

পাওয়া যায়। ওড়িষার বর্তমান যাত্রা বঙ্গদেশের অনুকরণে সংস্কৃত হইতেছে। ওড়িষার প্রাচীন যাত্রায় দেখিবার মতো জিনিস 'মুখোস'। পূর্বে মুখোস না হইলে ওড়িষার যাত্রা হইত না, এখনও মুখোসের রীতি অপ্রচলিত হয় নাই।

সেকালে যাত্রায় যেখানে কৃষ্ণলীলার গান দিতে হইত, সেখানে যাত্রাদলের ছোট ছোট ছেলেরা ঘুমুর বাঁধিয়া নাচিত। তাহারা গাহিবার সময় তালে তালে পা ফেলিত। তাহাতে ঝুমুর ঝুমুর মিঠে আওয়াজ হইত। এই গানের নাম ছিল 'ঝুমুর', এই ঝুমুর গান হইতে পরবর্তিকালের ঝুমুরের দলের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

সেকালে যাত্রার আসরে নাচের ব্যবস্থাটা কিছু গুরুতর ছিল। পাত্র-পাত্রী সকলকেই নাচিতে হইত। রাধাকৃষ্ণ, বিদ্যাসুন্দর, অভিমন্যু, উত্তরা, অর্জুন, দ্রৌপদী—কেহই নাচ হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। শ্রোতাদের তুষ্টি সম্পাদনের জন্য সকলকেই একবার নাচিতে হইত।

যাত্রার সং দেওয়া একটা অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িল। তা সে সং হউক, কেলুয়া ভলুয়া হউক বা মট্‌রুই হউক। মট্‌রু সেকালে তারিফের সং।

কবিগান

বহুদিন ধরিয়া বাঙলাদেশে এক রকম গানের সূত্রপাত হয়—তার নাম 'কবিগান' বা 'কবি'। এই গানে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য কোন জাতির মধ্যে এরূপ গান দেখা যায় না। এই গান সুন্দর সুন্দর পালা করিয়া গাওয়া হইত। বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য ও রসিকতা কবিগানকে হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিত। ভাষা ও বর্ণনায় লোকে মাতিয়া উঠিত। সুর-তালে এই গানের সৌন্দর্য ও বাহার খুলিত।

কবিগানের প্রধান অঙ্গ রাধাকৃষ্ণ লীলা আর মান, মাথুর বিরহ, গোষ্ঠ, সখী-সংবাদ প্রভৃতি ইহাতে গাওয়া হইত। কবিগানকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পালা আরম্ভ করিবার পূর্বেই পরমার্থবিষয়ক গান গাওয়া হইত।

দেবদেবীর সম্মুখে যখন কবিগান হইত তখন সাধারণত ঐ সকল দেবদেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক ও ভবানী-বিষয়ক 'সপ্তমী' গান গাহিবার রীতি ছিল। এই সপ্তমী গান মহাসপ্তমীতেই গীত হইত। মালসী, সখীসংবাদ, গোষ্ঠ ও কবি—কবিগানের চারিটি প্রধান অংশ। যে গানে ভক্তি ও বৈরাগ্য উদ্দীপিত করা হইত তাহা মালসীর অন্তর্ভুক্ত। মালসীর নামান্তর 'ডাক মালসী'। ভগবানের নাম লইয়া তাঁহাকে ডাকা হইত বলিয়া 'ডাক মালসী' নামের উৎপত্তি। মালসীর মধ্যে যেগুলি বিস্তারিত এবং নানারকম সুর-তাল দিয়া গীত হইত সেগুলিকে ভবানী-বিষয়ক বলা হইত। সপ্তমী ও অন্যান্য ভবানী-বিষয়ক গানগুলি একটু দীর্ঘ এবং মালসী অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। সুর ও বাজনার কায়দা দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রথমে ডাক মালসী গাওয়া হইত। ডাক মালসীর পরেই ভবানী-বিষয়ক গান। ভবানী-বিষয়ক গানে যেমন ভক্তি রসের পরিচয়

পাওয়া যাইত তেমনই সহজ সরল কবিতায় ধর্মতত্ত্বেরও সন্ধান পাওয়া যাইত। অতঃপর সখীসংবাদ। নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বিক্ষোভ প্রভৃতির বিকৃতি লইয়াই এই সখীসংবাদ। বসন্ত, বিরহ, মান, মাথুর, ভোর প্রভৃতি গান ইহার অঙ্গীভূত। বিরহগানে অনেক সময়ে এক পক্ষ পুরুষ ও অপর পক্ষ রমণী হইয়া অপর পক্ষকে অনুযোগ করিত।

গোষ্ঠ কবিগানের আর একটি অংশ। বাৎসল্যরসাত্মক প্রভাস এই গোষ্ঠের অন্তর্ভূত। কৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোচারণ, যশোদার কাতরোক্তি এই গানের বিষয় বলিয়া ইহা 'গোষ্ঠ' নামে অভিহিত।

ব্যঙ্গোক্তিজনক হাস্যরসাত্মক গানের নাম টপ্পা। ইহার নামান্তর 'কবি' বা খেউড়'। হাস্যরসাত্মক গান যখন সাদা এক সুরে গাওয়া হইত তখন তাহাকে 'লহর' বা 'কবির লহর' বলা হইত।

কবিগান বাঙালীর এক সময়ে বিশেষ গৌরবের সামগ্রী ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আনন্দচন্দ্র মিত্র, ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ আলোচনা করিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে ইহার পরিচয় সম্পর্কে দু'এক কথা বলিলাম।

কলিকাতায় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে পাড়ায় পাড়ায় 'কবিগান' ও আখড়াই সংগীতের অভিনয় চলিয়াছিল। সেই সময় গোঁজলা গুঁই নামে একজন কবিওয়ালার খুব নাম[১]। ইহার পূর্বেও কবিওয়ালা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের গান এমন কি নামেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। শোনা যায় পর্বোৎসবে রাজা সীতারামের

১ গোঁজলা গুঁই-এর একটি মাত্র গান 'গুপ্তরত্নোদ্ধারে (পৃ° ২০৫) পাওয়া যায়। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে (পৃ° ১৫৫১) এই গানটি উদ্ধৃত হইয়াছে—কেবল শেষের চারিটি পংক্তি বাদ। এই গান অন্যত্রও আছে—যথা, সাহিত্য-সংহিতা (৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩১২, পৃ° ৩১৯); বঙ্গের কবিতা পৃ° ৩০৮; নব্যভারত ও ডক্টর সুশীলকুমার দের Bengali Literature in the Nineteenth Century দ্র°।

সভায় অনেক রকম সংগীতামোদ হইত, কবিগানও হইত। সে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি কোন সময়ের কথা। অষ্টাদশ শতকেরও প্রারম্ভে গোঁজলা গুঁই-এর নামমাত্র জানিতে পারা যায়, আর তাঁহার দুইটি গান পাওয়া যায়। গোঁজলা গুঁই-এর পরে বংশীবদন সরকার খুব বড় কবিওয়ালা ছিলেন। দেশবিদেশে শ্রীকৃষ্ণলীলার মান, মাথুর, গোষ্ঠ গাইয়া বেড়াইতেন। লোকে তাঁহাকে বংশী বৈষ্ণব, বংশী বৈরাগীও বলিত। ইহার পৌত্র বিখ্যাত কবিওয়ালা বলরাম বৈষ্ণব।

গোঁজলা গুঁই-এর তিনজন নামজাদা সাগরেদ ছিল; তাঁহাদের নাম—রঘুনাথ দাস[১], লালু নন্দলাল[২] ও রামজী দাস[৩]। ফরাসডাঙ্গার গোন্দলপাড়ার রাসু নৃসিংহ নামে দুই সহোদর রঘুনাথের শিষ্য হন। ঐ সময় রঘুনাথ দাস ওস্তাদ কবি ছিলেন। রাসু নৃসিংহ[৪] দুই ভ্রাতায় মিলিয়া ১১৫৭ সালে এক কবির দল খুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন গান বাঁধিতেন ও একজন সুর দিতেন। ইঁহাদের সখীসংবাদ ও বিরহগান শুনিয়া লোকে মাতোয়ারা হইত। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে রাসুর মৃত্যু হয়। নৃসিংহ আর কিছুদিন বাঁচিয়াছিলেন। ১৮০৬-৭ সাল পর্যন্ত ইঁহাদের দলের অস্তিত্ব ছিল। রাসুর জন্ম- ১১৪১ সালে (১৭৩৫ খ্রী°), নৃসিংহ ১১৪৪ সালে (১৭৩৮ খ্রী°) জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা কায়স্থ। ইঁহাদের পিতার নাম আনন্দীরাম রায়। ইনি ফরাসডাঙ্গার সেনাবিভাগে চাকুরী করিতেন। বাল্যকালে রাসু ও নৃসিংহ বড় দুরন্ত ছিলেন। পিতা লেখাপড়া কিছু হইতেছে

---

১ ইনি জাতিতে তন্তুবায়। কেহ কেহ বলেন, রঘুনাথ মুচি। তিনি মুচি ছিলেন না।

২ গুপ্তরত্নোদ্ধার (পৃ° ২০৭)

৩ রামজী দাস না বলিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন মতিলাল। সে মতে তিনজনের নাম হয়—'রঘু, মতে ও নন্দ'।

৪ ইঁহাদের গান প্রাচীন কবি-সংগ্রহে দ্র°।

না দেখিয়া দুইজনকে চুঁচুড়ায় মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দেন। সেখানে পাদ্রেদের বাঙলা স্কুলেও তাঁহাদের কিছু হইল না দেখিয়া মাতুল পুনরায় গোন্দলপাড়ায় পাঠাইয়া দেন। অল্পকাল পরে পিতার মৃত্যু হইলে দুই ভ্রাতায় মিলিয়া কলিকাতায় আসিয়া কবির দল করেন। তাঁহাদের গানে দুইজনেরই ভণিতা থাকিত। তাঁহাদের একটি গানের নমুনা দিব। রাধার রূপ ও কুব্জার রূপের পার্থক্য ইঁহারা দেখাইতেন—

"শ্যাম রূপেরো বিচারো, যদি মনে কর,
মজেছ যাহারো কারণে।
ওহে, লক্ষ-কুবুজারো, রূপেরো ভাণ্ডারো,
শ্রীমতী রাধারো চরণে ॥"

হরেকৃষ্ণ সিমুলিয়ার কল্যাণচন্দ্র দীঘড়ীর (দীর্ঘাড়ীর) পুত্র। ইঁহার জন্ম ১১৪৫ সালের (১৭৩৮ খ্রী°) অগ্রহায়ণ মাসে। ছেলেবেলা থেকেই ইনি কবিতা ও সংগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব ও সংগীতের অসাধারণ কৃতিত্ব কবিওয়ালাদিগের নিকট জাহির হইয়া পড়িল। রঘুনাথ দাস জাতিতে তন্তুবায় হইলেও হরেকৃষ্ণের পিতৃবন্ধু ছিলেন। তিনি হরেকৃষ্ণের রচিত গান সংশোধন করিয়া দিতেন। হরেকৃষ্ণকে রঘুনাথ আপনার দলে সহজেই ভিড়াইয়া লইলেন। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে হরেকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া 'হরুঠাকুর' নামে খ্যাত হইলেন। প্রথমে হরুঠাকুর একটি সখের দল করিয়া রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে গান করেন। তাঁহার সংগীত-মাধুর্যে প্রীত হইয়া রাজা তাঁহাকে একজোড়া শাল পুরস্কার করেন। হরুঠাকুর শাল ঢুলীকে দিয়া দেন। নবকৃষ্ণ ইহাতে বিরক্ত হইলে তিনি বলেন, আমি পেশাদার নই। কাজেই পুরস্কার নিজে লইয়া ঢুলীকে দিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজা খুসী হইয়া হরুঠাকুরের বৃত্তি করিয়া দিলেন। তাঁহাকে একটি কবির দল করিতে বলিলেন। এই দলের ব্যয়

রাজা নিজে বহন করিতেন। নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি দল তুলিয়া দেন। ১২৩১[১] বঙ্গাব্দ (১৮২৪ খ্রী°) তাঁহার মৃত্যু হয়। হরুঠাকুর সখী-সংবাদ রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন। বর্ধমান-রাজসভায়, কৃষ্ণনগর-রাজসভায় ও শোভাবাজার রাজবাড়িতে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সমস্যাপূরণেও তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের বর্ণনা-কৌশল তাঁহার অদ্ভুত।

হরুঠাকুরের সময়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দল কেষ্টা মুচির [কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকারের[২]]। হরুঠাকুরের দলে একজন ওস্তাদ ঢুলী ছিল। তাহার মতো ঢোল বাজাইতে তখন আর কেহ পারিত না। হরুর দলের এই অদ্বিতীয় ঢুলীর নাম—দীনবন্ধু বা দীনে ঢুলী। হরুঠাকুর বলিতেন—"আমি যখন গান ধরি, দীনে যদি তখন ঢোল বাজায়, তবে দেশসুদ্ধ লোককে আমি মাৎ করিয়া দিতে পারি।"

হরুঠাকুরের শিষ্য বাগবাজারের মিঠাইওয়ালা ভোলাময়রাও[৩]

---

১ হরুঠাকুরের মৃত্যু শুক্রবার ২৩এ শ্রাবণ ১২৩১ বঙ্গাব্দ (৬ই অগস্ট ১৮২৪ খ্রী°)। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ২১এ অগস্ট তারিখের 'সমাচার-দর্পণ' হইতে তাঁহার মৃত্যুর তারিখটি জানিতে পারা যায়। ডক্টর সুশীলকুমার দে হরুঠাকুরের মৃত্যুর তারিখ দিয়াছেন ১৮২২ খ্রীস্টাব্দ। দীনেশবাবুর মতে হরুঠাকুরের মৃত্যু ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে। 'প্রীতি-গীতি'-কার বলেন ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে; 'বঙ্গভাষার লেখক' বলেন ১৮১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাচার-দর্পণ হইতে হরুঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভারতবর্ষ)। হরুঠাকুরের জীবন-সম্বন্ধে বঙ্গভাষার লেখক পৃ° ২৬৭-২৬৯, গুপ্তরত্নোদ্ধার, পৃ° ১০-১৩, 'অর্চনা' দ্র°। গান সম্বন্ধে গুপ্ত-র° পৃ° ৫১-৮২ ; প্রাচীন কবি-সংগ্রহ, পৃ° ১৩-১৮ ; বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৩৬৮-৬৯ দ্রষ্টব্য ; সমস্যাপূরণ—বঙ্গভাষার লেখক, পৃ° ৩৬৭।

২ ইঁহার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। একটি গানের কিয়দংশ দ্রষ্টব্য গুপ্ত-র°, পৃ° ২০৬।

৩ ভোলা ময়রার ছেলে চিন্তামণি ও মাধবেরও দল ছিল। চিন্তামণির দলে গান বাঁধিতেন সীতানাথ মুখোপাধ্যায় (প্রা-ক-স° ৭৬-৭৮)। মাধবের জামাই নবে ময়রাও দল করিয়াছিল।

একটি দল খোলেন। ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল বাগবাজারের জগন্নাথ বেনের[১]। দুই দলে খুবই লড়াই চলিত। ভোলাময়রার দলে গান বাঁধিতেন নদীয়ার ঠাকুরদাস চক্রবর্তী[২], গদাধর

গদাধর মুখোপাধ্যায় (প্রা-ক-স°) ও সাতু রায় (প্রা, পৃ° ৭৪-৭৫) ভোলা ময়রার দলে গান বাঁধিতেন। ভোলানাথ গানে নিজ পরিচয় দিয়াছেন। প্রতিপক্ষ ভোলানাথ নামে শিবত্ব আরোপ করিয়া গান ধরিল; উত্তরে ভোলানাথ গাহিল,—

আমি সে ভোলানাথ নই
আমি সে ভোলানাথ নই
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, বাগবাজারে রই ॥
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
তোরা সবাই বিল্বদলে আমায় পূজলি কই ?

অন্যত্র—"নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস।" তিনি নিজ ব্যবসায় পরিচয় দিয়াছেন,—

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা   বাগবাজারে রই।
আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা   ময়রাই বার মাস
জাতি পাতি নাহি মানি   (ওগো) কৃষ্ণ-পদে আশ ॥

ভোলা ময়রার পিতার নাম কৃপারাম, মাতার নাম গঙ্গামণি। 'বঙ্গভাষার লেখকে'র ৩৮২ পৃষ্ঠায় আছে, 'ইনি কলিকাতা সিমুলিয়াবাসী'। প্রা-ক-সংগ্রহেও (পৃ° ।●) তাই। ডক্টর সুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন (পৃ° ৩৮৪) "was a sweetmeat vendor at Bagbazar"। ভোলা ময়রার জীবন-সম্বন্ধে ভারতী ১৩০৪, পৃ° ৫৯-৬৬; নব্যভারত ১৩১৪, পৃ° ৬৭-৬৩; পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর, বসুমতী দ্র°।

১ ইনি জগন্নাথ দাস বা জগদাস নামেও পরিচিত।

২ ইনি কালীঘাটের দলেও গান দিতেন। নদীয়া জেলায় মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম। সম্ভবত ১২০৯ সালে। জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরীগিরি কাজ ছাড়িয়া ভোলা ময়রা, এন্টনিদের সঙ্গে মেশেন। তাঁহার গানের রচনা-চাতুর্য দেখিয়া নানা দল হইতে তাঁহার ডাক হইত। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার,

মুখোপাধ্যায়[১] ও সাতু রায়[২]। ঠাকুরদাস হাড়কাটাগলি-নিবাসী রামসুন্দর স্বর্ণকারের[৩] দলে, এণ্টনির[৪] দলে, বলরাম বৈষ্ণবের[৫] দলেও গান বাঁধিতেন। হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও লোকে যুগীর (লক্ষ্মীনারায়ণ যোগীর) দল ছাড়া ঠাকুরদাস চক্রবর্তী সকল

মৃত্যু ঘটে। ইঁহার গান গুপ্ত-র°, পৃ° ২৬১-২৬৩। প্রা-ক-স°, পৃ° ২, ২৩, ২৪ ২৮, ৩২, ৩৭, ৫২, ৬৭, ৭৩, ৯১, ১১৪, ১৪৭ দ্র°।

১ গদাধরের জন্ম চব্বিশ পরগনায় অনূ্যন ১১৫৩ সালে। প্রতিপক্ষের ধরতার উত্তরে ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইনি কালীঘাটের দলে, লক্ষ্মীনারায়ণ যোগীর দলে ও নীলমণি পাটুনির দলেও গান বাঁধিতেন। ইনি দাঁড়াকবির দলের জন্য মোহনচাঁদ বসুর সুরে গান বাঁধিতেন। হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীঘাটের দলে সেগুলি গীত হইত। ইঁহার গান প্রাচীন কবি-সংগ্রহে পৃ° ১২, ২১, ২২, ২৭-২৮, ৩৬, ৫০, ৬৩, ৬৪, ৭২, ৮৯, ৯৪, ১১৫, ১১৮, ১২১, ১২৪, ১২৮, ১৩০; গুপ্ত-র°, পৃ° ২-২৪৭ দ্র°।

২ নদীয়া শান্তিপরের নিকট বৈঁচীতে ইঁহার জন্ম সম্ভবত ১২০৯ সালে। সাতকড়ি রায়ের পিতার নাম পীতাম্বর রায়। ১২৭৩ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়। পূর্বে শান্তিপুরে জমিদারী সেরেস্তায় ও গোস্বামীদের নিকট কার্য করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় রানাঘাটের পালচৌধুরীদের কার্য করিতেন। ভোলাময়রা ইঁহার নিকট হইতে অনেক গান লইয়াছিলেন। গরানহাটার শিবচন্দ্র সরকারের দলেও গান বাঁধিয়া দিতেন। গান বাঁধিয়া তিনি পয়সা লইতেন না।

৩ পূর্বে ইনি কোন অফিসের কেরানী ছিলেন, পরে কবিওয়ালা হইয়াছিলেন। ইঁহার কয়েকটি গান প্রা-ক-সংগ্রহে দ্র°।

৪ এণ্টনি ফিরিঙ্গী জাতিতে ফরাসী কি পর্তুগীজ। বাঙালীর সংসর্গে বেশ বাঙলা শিখিয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণ-রমণীর প্রণয়ে পড়িয়া তাঁহাকেই গৃহের কর্ত্রী করেন। প্রথমে তিনি সখের কবির দল করেন। পরে তাহাতে সর্বস্বান্ত হইয়া পেশাদারী দল করেন।

৫ জাতিতে সদ্গোপ, উপাধি সরকার। জন্ম হুগলী জেলার পিয়ানপাড়া গ্রামে। পিতার নাম রামকমল সরকার। ইনি ফরাসডাঙ্গায় থাকিতেন। বলরামের পৌত্রাদি না থাকায় দৌহিত্র কৃষ্ণদাস বলরামের দল চালাইয়াছিলেন।

দলেই গান বাঁধিতেন। ঠাকুর সিংহেরও[১] একটি দল ছিল। এণ্টনির দলের সঙ্গে ইঁহার দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। দর্পনারায়ণ কবিরাজ[২] গুরুদম্বো ও রামসুন্দর স্বর্ণকারের দলে গান বাঁধিতেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ যোগী, সৃষ্টিধর সূত্রধর, বলরাম বৈষ্ণব ও রামসুন্দর স্বর্ণকারের দলে গান বাঁধিতেন রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়[৩]।

হরুঠাকুরের অপর শিষ্য নীলুঠাকুর[৪] ও নীলমণি পাটুনি[৫] কবিওয়ালার খুব পসার ছিল। নীলুঠাকুরের দলে 'যজ্ঞেশ্বরী'[৬] নামে এক রমণী গান বাঁধিয়া দিতেন। রাম বসু[৭], গদাধর মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য[৮], কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়[৯] ও ঠাকুরদাস চক্রবর্তী নীলুর দলে গান বাঁধিতেন।

হরুঠাকুরের যখন খুব প্রতিপত্তি তখন রামজী দাসের সাগরেদ

---

১ ইঁহাকে ঠাকুরদাস সিংহও বলিত।

২ ইহার গান প্রা-ক-স°, পৃ° ৬৬, ৮৫ দ্রষ্টব্য।

৩ প্রা-ক-স°, পৃ° ৪৭, ৬৫,৬৯, ৯৮ দ্র°।

৪ নীলুঠাকুরের মৃত্যু ২৬এ কার্তিক, ১২৩২ বঙ্গাব্দ। 'তিমির-নাশক' হইতে সমাচার-দর্পণ (৫ অগ্রহায়ণ, ১২৩২ ; ১৯ নভেম্বর, ১৮২৫) এই সংবাদটি দিয়াছে। নীলুঠাকুরের উপাধি চক্রবর্তী। ইঁহার ভ্রাতার নাম রামপ্রসাদ ঠাকুর। সিমুলিয়া হেদুয়ার নিকট ইঁহাদের বাড়ি ছিল। নীলুঠাকুরের মৃত্যুর পর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। ইঁহাদের দৌহিত্রেরা দল চালায়।

৫ সোমবার ৬০ কার্তিক, ১২৩২ বঙ্গাব্দে জ্বরবিকার রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।—সমাচার-দর্পণ ২৬ নভেম্বর, ১৮২৪ ; ১২ অগ্রহায়ণ, ১২৩২।

৬ ইঁহার গান প্রা-ক-স° (পৃ° ১০৩, ১১২) দ্র°।

৭ রাম বসুর গান প্র বে স (পৃ° ১-৫, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৫৪, ৫৯, ৬৮, ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৪-৮, ১১১, ১৬০, ১৬১,) ও গুপ্ত-র° (পৃ° ৯৩-১৭৫, ২৯৬-৩০৪) দ্র°।

৮ ইঁহার গান গুপ্ত-র°, পৃ° ২১০। প্রা-ক-স°, পৃ° ৯-১০, ২০, ২৯, ৪১, ৭৫, ৪৮, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৬২, ৭১, ৭২, ৮৩, ৯৩, ৯৭।

৯ ইঁহার গান প্রা-ক-স°, পৃ° ২২, ৩৪ দ্র°।

ভবানীবেনের[১] বেশ নাম হয়। ভবানীবেনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া রাম (মোহন) বসু কবিওয়ালা হইয়া উঠেন। ক্রমে রাম বসুর দলের অভ্যুদয় হয়। রাম বসু শালিখার রামলোচন বসুর পুত্র। প্রভাকর (১লা আশ্বিন, ১২৬১) বলেন—"রাম বসু ভবানী বিষয়, সখী-সংবাদ, বিরহ, খেউড়, লহর, সপ্তমী, শ্যামা বিষয়ের রণ-বর্ণনা, টপ্পা প্রভৃতি সমুদায় গান উত্তম রচিতেন। তন্মধ্যে সপ্তমী ও বিরহ তুলনা-রহিত। এই দুই গানে তিনি অধিক প্রশংসিত হয়েন।

"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।"

রাম বসুর নিজের দল ছিল। তাহা ছাড়া তিনি নীলুঠাকুরের দলে, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ ও বলরাম বৈষ্ণবের দলে গান বাঁধিতেন। রাম বসুর নিজের দলেও যজ্ঞেশ্বরী গান বাঁধিতেন।

লালু নন্দলালের শিষ্য ছিলেন নিতাই বৈরাগী[২]। তাঁরও দল

---

১ হরুঠাকুর (প্রা-ক-স°, পৃ° ১৩-৩০) ও রামসুন্দর রায় (ঐ, পৃ° ২৫-২৬, ৮০) ভবানীবেনের দলে গান বাঁধিতেন। রামসুন্দর বলরাম বৈষ্ণবের দলেও গান বাঁধিতেন (ঐ, পৃ° ২৫-২৬, ৮০)। ভবানী ছিলেন গন্ধবণিক্। বর্ধমান জেলায় অম্বিকা কাল্‌নার নিকট সাতগেছে গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। ইনি ব্যবসা করিতে কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় জোড়াসাঁকোয় থাকিতেন। নিতাই বৈরাগী ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ভক্তিতত্ত্বের গান ও সখী-সংবাদ ইনি নিজেই রচনা করিতেন। রচনাও যেমন, গান করিতেও তেমন ইঁহার শক্তি ছিল।

২ ইঁহার নাম নিত্যানন্দ দাস। চন্দননগরে জাতি বৈষ্ণবের গৃহে

ছিল। গৌর কবিরাজ পূর্বে নীলু ঠাকুরের দলে ছিলেন। পরে নিতাই-এর দলে আসেন। নবাই ঠাকুরও[১] এই দলে গান বাঁধিতেন।

নিতাই-এর চেলা রামানন্দ নন্দীরও দল ছিল।

গোরক্ষনাথেরও[২] একটি দল ছিল। পূর্বে গোরক্ষনাথ এণ্টনি ফিরিঙ্গীর দলের বাঁধনদার ছিলেন। এণ্টনির সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় নিজেই দল করেন। রামানন্দের দলের সঙ্গে এই দলের পাল্লাপাল্লি চলিত। খাঁটি বাঙালী কবি ঈশ্বরগুপ্ত[৩] প্রধানত সখের দাঁড়াকবির দলে গান বাঁধিতেন। কালীঘাটের দলে, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে, ভবানীপুরের দলে, ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের দলে বেশী গান বাঁধিতেন।

১১৫৮ (১৭৫১ খ্রী°) সালে ইঁহার জন্ম,—১২২৮ (১৮২১ খ্রী°) সালে মৃত্যু। ভবানীবেনে ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। লোকে "নিতে ভবানীর লড়াই"কে "বাঘে মহিষে লড়াই" বলিত। "এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমার-হট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ ভদ্র ও অভদ্র লোকে নিতাই-এর নামে ও ভাবে গদ্‌গদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইঁহারা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না; যেন হৃতসর্বস্ব হইতেন—এমনি জ্ঞান করিতেন।"—প্রভাকর।

১ ইঁহার গান প্রা-ক-স° (পৃ° ৬১, ৮১) দ্র°।

২ ইঁহার গান গুপ্ত-র°, পৃ° ২৯৪-২৯৫; প্রা-ক-স° পৃ° ৪৩, ৭০, ১১০।

৩ ইনি কাঁচড়াপাড়ার হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। জন্ম ১২১৩ সালে, মৃত্যু ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ। ইনি যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে সাপ্তাহিক সংবাদ-প্রভাকর ১৩৩৭ সালে প্রকাশ করেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্র ঠাকুরের মৃত্যুতে কাগজখানি উঠিয়া যায়। ১২৪২ সালে কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে সংবাদ-প্রভাকর পুনঃপ্রকাশ করেন। ১২৪৫ সালে ইহা দৈনিক হয়। ১২৫৩ সালে পাষণ্ড-পীড়ন, ১২৫৪ সালে সাধুরঞ্জন প্রকাশ করেন।

উৎকলে সুন্দরদাস বলিয়া একজন বড় কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁহার দলে বর্ধমানের অক্ষয়কুমার ঘোষ (গোপ) বাজনা বাজাইতেন। ইঁহার পুত্র নটবর ঘোষ ২৪ পরগনার উঁচুদরের কবিওয়ালা ছিলেন।

বীরভূম সিউড়ীতে একজন ভাল কবিওয়ালা ছিলেন; তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ—নাম, নন্দলাল চৌধুরী। ইনি একটু খঞ্জ ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'খোঁড়া নন্দ' বলিত।

দাশরথি রায় পাঁচালীকার হইবার পূর্বে তাঁহার মাতুলালয় বর্ধমান পীলাগ্রামে নীলকণ্ঠ হালদার অশ্লীল শব্দে ও ভাবে 'লহর' গাহিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। দাশরথি তাহা দেখিয়া চটিয়া নিজে গ্রামে কবির গান গাহিয়া বেড়াইতেন। এই সময় নিধিরাম সাহা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে গান করিত। নিধি জাতে শুঁড়ি—বাড়ি জামড়া। দাশু রায়ের আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—তিনি কালিকাপুরের পুরুষোত্তম বৈরাগী।

ঢাকা জেলায় পাগলা গ্রামে নিমচাঁদ ঠাকুর ছিলেন বিখ্যাত কবিওয়ালা।

পরিশিষ্ট—ক

নির্ঘণ্ট

ভারত-৪৯

পরিশিষ্ট—খ

অমূল্যচরণের রচনাবলী

গ্রন্থাবলী ঃ

১। চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ (ব্রজলীলা)। বৈশাখ ১৩১৯। পৃ ৮+৮২

গ্রন্থটি ভারত-চিত্র-মন্দির, ১৪২ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, পোঃ শিবপুর (হাওড়া) হইতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ৪১টি চিত্র আছে।

২। সরস্বতী ১ম খণ্ড। ১৩৪০। পৃ ৮+১৩৮

এই গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন শচীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩১ তেলিপাড়া লেন, শ্যামবাজার। এতে ৪৯টি চিত্র আছে।

৩। মহাভারতের কথা। (আষাঢ়, ১৩৪৭) ১৯৪০। পৃ ২০৮

প্রকাশক—বরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

৪। আধুনিক বাঙ্গালা রচনা। ১৯৫৫। পৃঃ x+৬৫৪+৫৪

এই গ্রন্থের প্রকাশক পি. সি. মজুমদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, কলিকাতা

৫। The Theatre of the Hindus. ১৯৫৫। পৃঃ ৫+২২৪

প্রকাশক—Sushil Gupta (India) Ltd. এই গ্রন্থের অন্যান্য লেখক—এইচ. এইচ. উইলসন, ভি. রাঘবন ও কে. আর. বিশরোতি।

৬। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য। ১৯৬২। পৃঃ ১৩৬।

প্রকাশক—ভারতী লাইব্রেরি, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

৭। লক্ষ্মী ও গণেশ। ১৯৬৩। পৃ ১৩৮

প্রকাশক—সুকুমার চৌধুরী, পুরোগামী প্রকাশনী, কলিকাতা-৪

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী ঃ

১। বঙ্গীয় মহাকোষ। ১ম খণ্ড—১৯৩৫, পৃঃ ১৪+৮৪৬। ২য় খণ্ড—১৯৩৮ (?), পৃঃ ৮+৭২৪। ৩য় খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠা হিসাবে ২টি সংখ্যা ১৯৪৪ (?)

২। জৈনজাতক (Punjab Sanskrit Series-এর অন্তর্ভুক্ত)।

৩। Sheir Mutakserin, Vol 1.

৪। বিদ্যাপতি। ১৯৩৪। পৃ ১২+১৵০+৩৬০।

৫। শ্রীকৃষ্ণবিলাস। ১৩২৬। পৃ ৪+।০+৯২।

৬। কৃষ্ণকর্ণামৃতম্। ১৩১৯। পৃ (ক-ঘ)+।৶০+২৩৩।
এই গ্রন্থটি অমূল্যচরণ চারুচন্দ্র মিত্রের সহিত সম্পাদনা করেন।

৭। শ্রীশ্রীসংকীর্তনামৃত। ১৩৩৬। পৃ ৬+॥০+১৭০।

৮। আপিশলী শিক্ষা। ১৩৪২।

৯। শিক্ষাকোষ। ১৩১৪।

ভূমিকা সংবলিত গ্রন্থাবলী

১। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—প্রাচীন ভারত, প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব। ১৯১৩।

২। মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী অনূদিত—মহাভাষ্য। ১৩১৩।

৩। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের ইতিহাস। ১৯০৯।

৪। রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব। তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৭।

৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার বেগম। ১৯১২।

৬। তারকনাথ বাগচী—চিত্রে ভাববৈচিত্র্য। ১৯২৩।

৭। রাজকুমার চক্রবর্তী ও অনঙ্গমোহন দাস—সন্দীপের ইতিহাস। প্রথম সংস্করণ। ১৩৩০।

৮। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অষ্টাদশপর্ব মহাভারত। ১৯৩১।

৯। যোগেশচন্দ্র বসু—মেদিনীপুরের ইতিহাস। দ্বিতীয় সংস্করণ।

১০। স্বামী সত্যানন্দ তীর্থ—রাধাকৃষ্ণ চরিতামৃত। ১৯৩২।

১১। শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ—বাসন্তী গীতা। ১৯৩৬।

পরিশিষ্ট—গ

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধাবলীর প্রকাশকাল

সংস্কৃতি ও সাহিত্য

১.	ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা	— প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪১
২.	আর্য ও অনার্য	— বঙ্গীয় মহাকোষ, ২য় খণ্ড
৩.	অসুরজাতি	— মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩
৪.	বিষ্ণু	— সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৯২১
৫.	অগ্নি	— বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড
৬.	অদিতি	— ঐ
৭.	ঋষি অত্রি	— ঐ
৮.	অথর্ববেদ	— ঐ
৯.	মহাভারত	— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অষ্টাদশপর্ব মহাভারতের ভূমিকা, ১৯৩১

দর্শন, ধর্ম ও সম্প্রদায়

১.	শঙ্করদর্শন ও অধ্যাস	— উদ্বোধন, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩২৪ ; যমুনা, চৈত্র ১৩২৯
২.	অধ্যাস-বিশ্লেষণ	— প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৬
৩.	মায়াবাদ	— উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩২৪
৪.	বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন	— ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৪৪
৫.	ভাগবতধর্ম	— উদ্বোধন, ১৩২৫-২৬
৬.	পঞ্চরাত্রতত্ত্ব	— শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, কার্তিক ১৩৩৩
৭.	নারায়ণতত্ত্ব	— উদ্বোধন, ১৩২৫-২৬
৮.	শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	— শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, অগ্রহায়ণ ১৩৩২
৯.	প্রাচীন সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ	— যমুনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০
১০.	রাধাতত্ত্ব	— শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ভাদ্র ১৩৩৪

১১. বৈষ্ণবের প্রেম — স্বাধিকার
১২. মাধ্বদর্শন বা পূর্ণপ্রজ্ঞমত — হরপ্রসাদ সংবর্ধনমালা, ২য় খণ্ড
১৩. শক্তিতত্ত্ব — প্রবর্তক, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৪৭
১৪. জৈনধর্ম — উপাসনা, শ্রাবণ ও কার্তিক ১৩১৬
১৫. রামানন্দী সম্প্রদায় — কায়স্থ-পত্রিকা
১৬. নাথপন্থ — প্রবাসী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৮
১৭. কবীরপন্থী — শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, আশ্বিন-মাঘ ১৩৩০
১৮. বল্লভাচার্য — ঐ
১৯. তুকারাম — ঐ
২০. দাদুপন্থী — ঐ
২১. রাধাবল্লভী — ঐ
২২. বৈরাগী — ঐ
২৩. নিমাবৎ — ঐ
২৪. রাধাস্বামী সম্প্রদায় — ঐ
২৫. রয়দাসী — ঐ
২৬. উদাসী — ঐ
২৭. সেনপন্থী — ঐ
২৮. গোসাঁই — ঐ
২৯. লিঙ্গায়ত — ঐ
৩০. অঘোরপন্থী — ঐ

নাটক ও নাট্যশালা

১. ভারতীয় নাটকের গোড়ার কথা — প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৬
২. ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র — মাধবী, চৈত্র ১৩৩১, বৈশাখ ১৩৩২
৩. নাট্যশাস্ত্রে নাটকের উৎপত্তি —
৪. বঙ্গীয় নাটকের গোড়ার কথা —
৫. ভারতীয় নাট্যশালার গোড়ার কথা — প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৩৬

৬.	রামগড়ের নাট্যশালা	— নবযুগ, ফাল্গুন ১৩৩১
৭.	বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালা	— সারদা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১
৮.	কন্নড নাটক	—
৯.	কেরল নাটকচক্র	—
১০.	প্রাচীন ভারতে নৃত্যকলা	— নাচঘর, ১৯ আষাঢ়,
		— ১ শ্রাবণ ও ১০ পৌষ ১৩৩২
১১.	যাত্রা	— প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮
১২.	কবি গান	— সুবর্ণবণিক সমাচার, শ্রাবণ ১৩৩৯

পরিশিষ্ট—ঘ

অমূল্যচরণের প্রবন্ধের বিষয় বৈচিত্র্য দেখানোর উদ্দেশ্যে নিম্নে কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইল।

সাহিত্য

১. বঙ্গসাহিত্য	—	প্রতিভা, চৈত্র ১৩২৪
২. বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ	—	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৬শ ও ১৭শ বর্ষ
৩. সাহিত্যিকের নিবেদন	—	ঝরনা, শীতসংখ্যা ১৩৪৪
৪. নূতন খাতা	—	মানসী ও মর্মবাণী, ফাল্গুন ১৩১৯
৫. নববর্ষে	—	মানসী, ফাল্গুন ১৩২১
৬. নিবেদন	—	পঞ্চপুষ্প, আষাঢ় ১৩৩৬
৭. সাহিত্যের ধারা	—	পাথেয়, ৪৩-৪৬ সংখ্যা, ১৩৪২
৮. কথা ভাষা	—	পাথেয়, ৪৫ সংখ্যা, ১৩৪২

ভাষাতত্ত্ব

১. বাঙ্গলা ভাষা	—	উপাসনা, ১৩১৪-১৫
২. অ-কার তত্ত্ব	—	বঙ্গীয় মহাকোষ, ১ম খণ্ড

ধর্ম ও দর্শন

১. দেবতত্ত্ব	—	যমুনা, কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩২৯
২. যজ্ঞ	—	বিশ্ববাণী, ১৩৩৪
৩. রথযাত্রা	—	ভারতবর্ষ, ১৩২০
৪. গোষ্ঠীবিহারে দেশসেবা	—	প্রবাসী, পৌষ ১৩২৯
৫. প্রাচীন আরব জাতির ধর্মবিশ্বাস		বঙ্গভাষা, আশ্বিন ১৩১৫

জাতিবিজ্ঞান

১. জাতিবিজ্ঞান	—	ভারতবর্ষ, আষাঢ়-আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১৩২৮; শ্রাবণ, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩২৯; বৈশাখ ১৩৩০

২. জাতিবিজ্ঞান — সুবর্ণবণিক সমাচার, ১৩শ বর্ষ ২য় সংখ্যা

৩. জাতিবিজ্ঞান — মাধবী, ফাল্গুন ১৩৩২

৪. জাতিবিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদ — কায়স্থ পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২

৫. বগধ জাতি — প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯

৬. কেবট জাতি — প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩১

৭. দ্রবিড় জাতি — প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৮

৮. চেরো জাতি — প্রবাসী, পৌষ. ১৩২৮

৯. বাঙ্গালীর ইতিহাস — প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৮

১০. বাঙ্গালী ও দ্রবিড় — প্রবাসী মাঘ ১৩২৮

ইতিহাস

১. ইতিহাস — মানসী ও মর্মবাণী, বৈশাখ-জৈষ্ঠ ১৩২৯

২. বিদেশের মুখে বাংলার কথা — বাণী, বৈশাখ-জৈষ্ঠ ১৩১৭

৩. আর্যজাতির আদিম নিবাস — মানসী ও মর্মবাণী, আশ্বিন ১৩২০

৪. চীন পরিব্রাজকদিগের বঙ্গ বিবরণ— জাহ্নবী, ভাদ্র ১৩১৫

৫. বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস — বিশ্ববাণী, পৌষ ১৩৩৫

৬. ইউরোপীয়গণের ছাপা প্রথম বাংলা বই — প্রবাসী, ১৩৩৭

৭. প্রথম বঙ্গাক্ষর — প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭

৮. ফরাসী বাংলা অভিধান — ভারতী, জৈষ্ঠ ১৩৩০

৯. প্রথম বাংলা অভিধান — ভারতী, পৌষ ১৩২৯

১০. প্রথম বাংলা ব্যাকরণ — ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯

১১. প্রথম মুদ্রাযন্ত্র — কায়স্থ পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৪১

১২. প্রথম বাংলা অভিধান — প্রবাসী, মাঘ ১৩২৯

ভারতীয় অঙ্ক

১. ভারতীয় অঙ্করীতি — নব্যভারত, কার্তিক ১৩২৯

২. সপ্তর্ষি সংবত — নব্যভারত, মাঘ ১৩২৯
৩. যুগবিচারে কল্যব্দ — মানসী, কার্তিক ১৩১৯
৪. বিক্রম সংবতের উৎপত্তি — মানসী, মাঘ ১৩১৮
৫. বুদ্ধনির্মাণ সংবত — সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২২শ বর্ষ
৬. বিক্রম সংবত — উপাসনা, ১৩১৫-১৬
৭. গুপ্ত বলভী সংবত — সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

পুরাতত্ত্ব

১. পতঞ্জলির কালনির্ণয় — জাহ্নবী, বৈশাখ ১৩১৬
২. শঙ্করাচার্যের কালনির্ণয় — সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩১৫
৩. মধ্বাচার্যের কালনির্ণয় — নব্যভারত, বৈশাখ ১৩৩০

লিপিতত্ত্ব

১. ভারতীয় লিপির প্রাচীনতা
২. লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্র- — সাহিত্য, পৌষ ও ফাল্গুন ১৩১৮
শাসন — ভারতবর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩২

মূর্তিতত্ত্ব

১. চামুণ্ডা — প্রবর্তক
২. কৈলাস — প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৬

ভারতীয় দেবদেবী

১. লক্ষ্মী — প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
২. সরস্বতী — প্রবাসী, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৩৪
৩. সরস্বতী প্রসঙ্গ — প্রবর্তক, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬
৪. সরস্বতী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা — মানসী ও মর্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৬
৫. দেবী সারদা — কায়স্থ পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৬
৬. দেবী দুর্গা — প্রবর্তক কার্তিক ১৩৩৫

জীবনী

১. সাহিত্যানন্দ বাণীনাথ — মানসী, আশ্বিন ১৩৩৫
২. সাধু লালজী — মানসী, পৌষ ১৩৩৫
৩. অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার — মানসী, পৌষ ১৩৩৪
৪. দ্বিজেন্দ্রলাল — ভারতবর্ষ, ১৩২০
৫. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — বাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪
৬. মধ্বাচার্য — নব্যভারত, আষাঢ় ১৩৩০

অনুবাদ

১. অশ্বঘোষ-কৃত বুদ্ধচরিতের
বঙ্গানুবাদ — পঞ্চপুষ্প, ১৩৩৯-৪০

ইহা ছাড়া অমূল্যচরণের বহু ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যাহার উল্লেখ এখানে করা হয় নাই।
